।। সূচকপত্র ।।

অধ্যায় ঃ এক

দেশ, কাল, নৃতাত্ত্বিক তথা জাতি ও ভাষা পরিচয়

[এক] দেশ ও কাল পরিচয়

গুপ্তকবি সখেদেই বলেছিলেন, 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে-ভরা'। বস্তুতঃ বঙ্গদেশের ভৌম-পরিচয়ে বার বার এত পরিবর্তন সাধিত হ'য়েছে যে বঙ্গদেশ তথা বাঙলাদেশের কোন স্থায়ী বা সুস্পষ্ট সীমা-নির্ধারণ এক অসম্ভব ব্যাপার। আমরা অর্থাৎ বাঙলা ভাষা-ভাষী জনগোষ্ঠী যে অঞ্চলে বাস করি, সাধারণভাবে ঐটি 'বাঙলাদেশ' তথা 'বঙ্গদেশ' নামে অভিহিত হ'লেও যুগে যুগে কালে কালে এর নাম-পরিচয় এবং আকার-আয়তন এতভাবে পরিবর্তিত হ'য়েছে যে বর্তমান প্রজন্মের বাঙালীর নিকট তা বিস্ময়কর মনে হ'তে পারে। প্রচলিত কথায় আমাদের বাসভূমিকে আমরা 'বাঙলাদেশ' নামে অভিহিত করলেও বাস্তবে বহির্ভারতীয় অপর একটি স্বাধীন রাষ্ট্র এই নামে বর্তমানে বিশ্বের স্বীকৃতি লাভ করেছে—আর রাষ্ট্রনৈতিক বিচারে আমাদের বাসভূমি 'পশ্চিমবঙ্গ' নামে কবন্ধরূপে বিরাজ করছে। ১৯৪৭ খ্রীঃ ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ যে স্বাধীনতা লাভ করে, তার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বর্তমানে 'বাঙলাদেশ' নামে পরিচিত ঐ স্বাধীন রাষ্ট্র এবং ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রাজ্য 'পশ্চিমবঙ্গ' মিলিতভাবে ছিল প্রকৃত বঙ্গদেশ বা 'বাঙলাদেশ'। তারও আগে ডাইনে-বাঁয়ে অর্থাৎ পূর্বে-পশ্চিমে আরো কিছু অঞ্চল ছিল বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত—কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতালোভীদের ইচ্ছা-পূরণার্থে বারবারই দেশমাতৃকার অঙ্গমাংস লালসার অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়েছে। তাই বড় দুঃখেই কবি বলেছিলেন, 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে-ভরা'। কিন্তু তাঁর উক্তির পরে বিগত দেড় শতকের মধ্যেও দেশের সীমা পরিবর্তিত হ'য়েছে একাধিকবার। এ যুগের বাঙালীর দেশই সর্বকালের মধ্যেও সঙ্কুচিত ও ক্ষুদ্রতম বাঙলা তথা 'পশ্চিমবঙ্গ' বা West Bengal। পূর্বতন 'বঙ্গ দেশে'র পূর্বাংশের অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের তথা, বাঙলাদেশের অধিবাসীরা আজ আর জাতিগতভাবে বাঙালী নয়, তাঁরা এখন 'বাঙলাদেশি' নামেই আত্মপরিচয় জ্ঞাপন ক'রে থাকেন। বস্তুত বঙ্গের ইতিহাস শুধু ভাঙ্গারই ইতিহাস। যাহোক, আলোচ্য গ্রন্থে আমরা 'বঙ্গ দেশ' বা 'বাঙলাদেশ' বলতে বিভাগ-পূর্ব সমগ্র বঙ্গকেই বুঝবো; প্রসঙ্গক্রমে রাষ্ট্রনৈতিক দিক থেকে বর্তমান 'বাঙলাদেশে'র উল্লেখ করতে হ'লে তৎস্থলে আমরা 'পূর্ববঙ্গ' শব্দটি ব্যবহার করব। বাঙালাদেশ, বাঙালী জাতি, বাঙলা ভাষা ও বাঙলা-সাহিত্য বলতে সেই অখণ্ড দেশ, জাতি, ভাষা ও সাহিত্যেরই বোধ জন্মায়।

দেশনাম-বৈচিত্র্য

গত তিন হাজার বছরে বাঙলাদেশ বা তার অংশবিশেষ বিশেষ নাম বা অভিধা প্রাপ্ত হ'য়েছে এবং কখনও কোন একটি নাম যেমন সমগ্র দেশকে বুঝিয়েছে তেমনি কখনও খণ্ডাংশকে বুঝিয়েছে। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে এত সমস্ত নামের মধ্যে 'বঙ্গ' নামটিই সর্বপ্রাচীন এবং সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তিনটি প্রাচীন জাতি 'হারিয়ে গেছে' — ঋগ্বেদে উল্লেখিত এই প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঐতরেয় আরণ্যকে বলা হয়েছে — 'তিস্রো অত্যায়মায়ংস্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গা বগধাশ্চেরপাদাঃ' — অর্থাৎ 'হারিয়ে যাওয়া জাতি তিনটি হলো এইসব পাখি — বঙ্গ, বগধ ও চেরপাদরা (বা ইরপাদেরা)'। এখানেই স্পষ্টতই বোঝা যায় যে বঙ্গ এবং অপর দুটি জাতিকে পাখির ন্যায় অব্যক্তভাষী বলা হচ্ছে; সোজা কথায়, এরা ছিল অনার্য-ভাষাভাষী, আর্যগণ এদের কথা বুঝতে পারতেন না। যাহোক, বঙ্গজাতি বিষয়ে এটিই প্রাচীনতম উল্লেখ বলে মনে হয়। পরবর্তীকালে অথবা সব-সময়েই হয়তো বঙ্গ জাতির নামে বঙ্গদেশের নামকরণ করা হ'য়েছিল।

বঙ্গের প্রাচীনতম উল্লেখ

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বাঙলার একটি অধিবাসী গোষ্ঠীর উল্লেখ করা রয়েছে — 'পুণ্ড্র'। উত্তর বাঙলার এই জাতিকে দস্যু বলে অভিহিত করা হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেই একটি কাহিনীতে বিশ্বামিত্রের যে পুত্রগণ শাপগ্রস্ত হ'য়ে সমাজচ্যুত হয়, তাঁদেরই একজন পুণ্ড্র। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে বাঙলাদেশে প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন শিলালিপিতে পুণ্ড্রনগরের ('পুডনগল') নাম পাওয়া যায় — মৌর্যযুগে খোদিত এই লিপিটি বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে পাওয়া যায়। 'জৈনশাস্ত্রে' উল্লেখ করা হ'য়েছে যে মহাবীর নাকি পুণ্ড্রনগরে কিছুকাল অবস্থান ক'রেছিলেন।

মহামুনি পাণিনির অবির্ভাব কাল আ. খ্রীঃ পূঃ সপ্তম-ষষ্ঠ শতক; তাঁর 'অষ্টাধ্যায়ী' গ্রন্থে উল্লেখিত 'গৌড়পুর' বাঙলাদেশের অন্তর্ভুক্ত কোন নগরী হওয়া সম্ভব। পাণিনির ভাষ্যকার পতঞ্জলি বঙ্গরাজ-এর উল্লেখ করেছেন এবং অপর ভাষ্যকার কাত্যায়নের রচনায় পাওয়া যায় বঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্রের অধিবাসীদের উল্লেখ — এঁরা যথাক্রমে পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন।

রামায়ণে ও বিভিন্ন দেশের উল্লেখ প্রসঙ্গে বঙ্গ এবং পুণ্ড্রের নাম রয়েছে। মহাভারতের একটি কাহিনীতে বলা হয়েছে যে অসুর-রাজ বলির পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে ঋষি দীর্ঘতমার ঔরসে পাঁচটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে — অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম। এঁদের নামেই পাঁচটি দেশের নামকরণ করা হয়। অতএব বেদ-ব্রাহ্মণ-আরণ্যকের যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে মহাভারতে আমরা অন্ততঃ বাঙলাদেশের তিনটি অংশেরই উল্লেখ পাচ্ছি — পূর্ববঙ্গ 'বঙ্গ' নামে, উত্তরবঙ্গ 'পুণ্ড্র' নামে এবং পশ্চিমবঙ্গ 'সুহ্ম' নামে তৎকালে পরিচিত ছিল।

বিভিন্ন প্রাচীন জৈন এবং বৌদ্ধগ্রন্থেও বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উল্লেখ বর্তমান। খ্রীঃপূঃ ষষ্ঠ শতকে জৈনগুরু মহাবীর 'লাঢ়' (রাঢ়) দেশের অন্তর্গত 'বজ্জভূমি' (বজ্রভূমি) ও সুব্ভ-ভূমি'তে (সুহ্মভূমি) ধর্মপ্রচারে বহির্গত হ'য়েছিলেন বলে 'আয়ারাঙ্গ সুত্তে' (আচারাঙ্গ

সূত্র) উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন বৌদ্ধধর্মগ্রন্থেও বঙ্গ, সুহ্ম, রাঢ়, পুণ্ড্রবর্ধন প্রভৃতি জনপদের নাম পাওয়া যায়। 'বঙ্গ' শব্দ দ্বারা মূলতঃ পূর্ববঙ্গ তথা সমগ্র বাঙলাদেশের একটা অংশকে বোঝালেও শেষ পর্যন্ত সমগ্র বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল বোঝাতে এটিই সর্বাধিক সার্থকভাবে প্রযুক্ত হ'য়েছে। অঞ্চল-বাচক অপর নামগুলি কালক্রমে প্রায় লোপ পেয়ে গেছে। অতএব বুদ্ধদেবের সমকালে অথবা তৎপূর্বেই বঙ্গদেশে আর্যসভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

গৌড়বঙ্গ

পরবর্তী পর্যায়ে বঙ্গ-ছাড়া যে নামটি অসাধারণ গুরুত্ব লাভ করেছিল, তা' হ'চ্ছে 'গৌড়'। পাণিনি 'গৌড়পুর' নামের উল্লেখ করলেও এটি পরবর্তীকালের গৌড়কেই বোঝাচ্ছে কিনা, এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মনে সংশয় রয়েছে। গুপ্তযুগের পরবর্তীকালে মহারাজ শশাঙ্কের সময় থেকে 'গৌড়' নামের ক্রমাধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। 'গৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণ ক'রে এই অঞ্চলের অধিপতিগণ মর্যাদার অধিষ্ঠিত হ'তেন। এক সময় বাঙলাদেশের পশ্চিমাংশ 'গৌড়' ও পূর্বাংশ 'বঙ্গ' নামে এবং সমগ্র দেশ 'গৌড়বঙ্গ' নামে অভিহিত হ'তো। সংস্কৃত সাহিত্যে 'গৌড়ীয় রীতি' এবং 'গৌড়ীয় প্রাকৃতে'র নামকরণ থেকে গৌড়ের গুরুত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে এবং আধুনিক যুগের প্রারম্ভকালে 'গৌড়ীয় ভাষা' এবং 'গৌড়জন' প্রভৃতির ব্যবহার লক্ষণীয়।

সমগ্র বঙ্গদেশকে 'বাঙলা' নামে অভিহিত করা হয় মুঘল যুগ থেকেই। আকবরের শাসনকালে 'আইন-ই আকবরী' গ্রন্থে এ দেশের নামকে বলা হয়েছে 'সুবা বাঙলা'। অনেকের ধারণা শব্দটির উদ্ভবও ঘটেছিল ঐ কালেই। কিন্তু এই অনুমান যথার্থ নয়। কারণ আমরা চর্যাপদে 'বঙালী' শব্দ পেয়েছি ('আজি ভুসুকু বঙালী ভৈলী'); 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামক সঙ্কলন গ্রন্থে বাঙলা ভাষার উল্লেখ রয়েছে ('গঙ্গা বঙ্গাল বাণীচ')। কাজেই 'বঙ্গাল' বা 'বাঙালী' শব্দ অতি প্রাচীন, যদিও এঁর ব্যাপক প্রয়োগ ঘটে মুঘল যুগ থেকেই।

বঙ্গের সীমানা

বিভিন্ন কালে বাঙলাদেশের বিভিন্ন অংশ সাময়িকভাবে বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছে — উত্তরবঙ্গ 'বরেন্দ্রভূমি' এবং পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অংশ 'সমতট' ও 'হরিকেল' নামে পরিচিত ছিল। এক সময় বঙ্গের পশ্চিমসীমা দ্বারভাঙ্গা ('দ্বারবঙ্গ') পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্বসীমায় ছিল ত্রিপুরা ও আসামের বরাক উপত্যকা। উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর বাঙলাদেশের সীমানা এখনো রক্ষা ক'রে আসছে। রাজনৈতিক কারণে পশ্চিম প্রান্তের সিংহভূম, মানভূম বিহারের অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছে, উত্তরবঙ্গের কতকাংশ সহ সমগ্র পূর্ববঙ্গ ও শ্রীহট্ট জেলা এক সময় পাকিস্তান নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চল রূপে গঠিত হ'য়েছিল—এখন তা' স্বাধীনতা লাভ করে 'বাঙলাদেশ' নাম গ্রহণ করেছে। ত্রিপুরা ছিল করদরাজ্য, এক্ষণে ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত একটি রাজ্য। বরাক উপত্যকা আসাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অনেক আগেই। অবশিষ্ট অংশ 'পশ্চিমবঙ্গ'-রূপে ভারত রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যরূপে বর্তমান রয়েছে।

[দুই] নৃতাত্ত্বিক জাতি-পরিচয়

বাঙালী যে মিশ্রজাতি এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু কোন্ কোন্ জাতির মিশ্রণে বাঙালী জাতির উদ্ভব ঘটেছে, এ বিষয়ে পণ্ডিতবর্গ ঐকমত্যে উপনীত হ'তে পারেন নি। বিষয়টি বোঝাবার জন্য ভারতের জাতিতত্ত্ব বিশ্লেষণ করা দরকার।

বাঙলায় বা ভারতবর্ষে কোন জাতির উদ্ভব ঘটেনি, কালস্রোতে যুগে যুগে বিভিন্ন জাতিসত্তার আগমন ও মিশ্রণ দ্বারাই বাঙালী জাতির উদ্ভব ঘটেছে। প্রখ্যাত বাঙালী নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নবিদ্যাবিশারদ পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত ১৯৭৮ খ্রীঃ মেদিনীপুর জেলায় কংসাবতী নদীর তীরে এক প্রাগৈতিহাসিক চত্বরের নিম্নে সিজুয়া নামক অঞ্চলে একটি অতীত মানবের জীবাশ্ম—একটি ভগ্ন চোয়াল আবিষ্কার করেন। তিনি বলেন, "উল্লিখিত নিদর্শনটি যে ভারতে আবিষ্কৃত নরকঙ্কালসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ ... সমগ্র বিবেচনায় ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে এর প্রাচীনত্ব মোটামুটি দশ হাজার বছর।"

ভারতের প্রাচীনতম্ অধিবাসী ছিল সম্ভবতঃ 'নিগ্রোবটু' (Negrito) জাতির কোন একটি শাখা। কালক্রমে এরা ভারতের বুক থেকে প্রায় লুপ্ত হ'য়ে যায়—উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগাদের মধ্যে এদের অস্তিত্বের কিছু নিদর্শন রয়ে গেছে, আর আন্দামানের জারোয়া, ওঙ্গি প্রভৃতি আদিবাসী আরণ্য জাতির মধ্যে এর ক্ষীণ রেশ এখনো বর্তমান।

এরপর 'প্রাথমিক-অস্ত্রালাকার' (Proto-Austroloid) জাতির আগমন ঘটলেও ভাষায় এদের কোন নিদর্শন নেই, তবে কোন কোন নিম্নশ্রেণীর জাতির সঙ্গে এদের মিশ্রণ ঘটে থাকতে পারে। বর্তমানে ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম এসেছিল 'নিষাদ' বা 'অস্ট্রীক জাতি'র একটি শাখা। এরা দক্ষিণ-পূর্ব দিক্ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল, অথবা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে এদের আগমন ঘটেছিল, এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভবপর নয়। তবে এরা যে মধ্যভারত এবং পূর্বভারতেই বসতি বিস্তার করেছিল, তার প্রমাণ এ কালেও বর্তমান। বর্তমান ভারতের সাঁওতাল, মুণ্ডারি, হো, শবর, ভূমিজ, খাসী, নিকোবরী প্রভৃতি আদিবাসীরা সেই প্রাচীন নিষাদ জাতির বংশধর।

নিষাদ

'দ্রাবিড়'-জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটে সম্ভবতঃ নিষাদদের পরেই। পণ্ডিতদের অনেকেই অনুমান করেন যে মূলতঃ এরা ছিল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অধিবাসী। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে এরা সুদীর্ঘকাল পূর্বে ভারতে আগমন করে। অনেকের অনুমান, এদেরই কোন শাখা হয়তো অতি সুপ্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার পত্তন ক'রেছিল। এবং এদের ভারতীয় শাখাই হরপ্পা-মোহেঞ্জোদড়ো-কালিবঙ্গান প্রভৃতি অঞ্চলে সিন্ধু সভ্যতার প্রবর্তক—এই অভিমত প্রায় সর্বজনমান্যতা লাভ করেছে। পরবর্তীকালে আর্যরা এদেরই 'দাস-দস্যু' প্রভৃতি নামে অভিহিত ক'রে এদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত হ'য়ে এদের পরাভূত করে। ফলে দ্রাবিড়গণ আত্মরক্ষার

দ্রাবিড়

প্রয়োজনে দক্ষিণ ভারতে বসতি স্থাপন ক'রে। তেলুগু-তামিল-মালয়ালম-কানাড়ী-ভাষী জনগোষ্ঠী এই দ্রাবিড়দেরই বংশধর।

কিরাত

ভারতের অপর একটি জনগোষ্ঠী 'কিরাত' বা মঙ্গোলজাতীয় ভোটবর্মী গোষ্ঠী। এরা প্রধানতঃ পূর্বোত্তর ভারতেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছে। কিন্তু এরা কখন ভারতে উপনীত হয়েছিল, এ বিষয়ে পণ্ডিতবর্গ কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন নি।

আর্য

ভারতের জন-জীবনে সর্বাধিক প্রভাব সৃষ্টি করে যে জনগোষ্ঠী তারা ছিল আর্যভাষাভাষী। আনু. খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতকের দিকে ইরান থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে এদের ভারতে আগমন ঘটে—য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এই বিশ্বাসে দৃঢ়মূল। তবে ভারতীয় ঐতিহ্যমতে আর্যগণ ভারতেরই আদিম অধিবাসী—কোনক্রমেই এদের বহিরাগত বলা চলে না। যাহোক, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মতে, এই আর্যগণ সপ্তসিন্ধু-তীরবাসী দ্রাবিড়দের তাড়িয়ে নিজেরা এই অঞ্চল অধিকার ক'রে বসতি স্থাপন করেন এবং ক্রমশঃ গঙ্গা-যমুনার দুই তীর ধরে পূর্বদিকে অগ্রসর হ'তে থাকেন। অপর একটি মতে আর্যদের প্রধান ধারা ছিল দুটি — প্রথমাগতরা ছিলেন আর্যদের আল্পীয় গোষ্ঠী, এঁরা ছিলেন অবৈদিক। কারো কারো মতে এঁরাই সিন্ধু সভ্যতার প্রবর্তক। পরবর্তীকালে আগত নর্ডিক বা উদীচ্য আর্যগোষ্ঠী এদের সিন্ধুকূল থেকে তাড়িয়ে দিলে এঁরা প্রধানতঃ পূর্বভারতে ছড়িয়ে পড়েন।

বাঙালীর দেহে এই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর রক্তই ন্যূনাধিক পরিমাণে বর্তমান। কারো কারো মতে বাঙালী জাতি প্রধানতঃ অষ্ট্রীক ও দ্রাবিড় জাতির মিশ্রণে উদ্ভূত— তার মধ্যে অল্পস্বল্প আর্যরক্তের মিশ্রণ ঘটেছে। অপর মতে, বাঙালী জাতি প্রধানতঃ আল্পীয় আর্যদের বংশধর, তবে তার মধ্যে কিছু পরিমাণ অনার্য রক্তের মিশ্রণ থাকা সম্ভবপর।

প্রাচীন বঙ্গের সভ্যতা

বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে, বিভিন্ন মহাকাব্য এবং বৌদ্ধ-জৈনসূত্র মতে ভারতের পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল 'অসুর, ম্লেচ্ছ, ব্রাত্য' প্রভৃতি। বাঙলাদেশের সঙ্গে অসুর সম্পর্কের কথাও নানাস্থলে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু অসুররা যে অনার্য ছিল, এমন কথা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভবপর নয়। ঋগ্বেদে প্রধান দেবতাদের 'অসুর' বলা হ'য়েছে; মহাভারতে অসুরদিগকে দেবতাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা-রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এমন কি বাঙলাদেশে যারা অন্ত্যজশ্রেণী রূপে গণ্য, তারাও যে অনার্যবংশধর, তা নাও হ'তে পারে। ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "চণ্ডাল ও ডোম দুই জাতিই বরাবর আর্য-ভাষী ছিল।" অতএব জাতি-হিশেবে বাঙালী যে বিভিন্ন অনার্য জাতির মিশ্রণে উদ্ভূত হ'য়েছে—সম্ভবতঃ এমন কথা আর স্বীকার ক'রে নেওয়া চলে না। বিশেষতঃ সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গের পাণ্ডুরাজার ঢিবি, বাণেশ্বরডাঙ্গা, চন্দ্রকেতুর গড়, মহিষাদল, পোখরনা প্রভৃতি স্থান উৎখননের ফলে যে সকল প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু অবিষ্কৃত হ'য়েছে, তা' থেকে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে বাঙলার ঐ সভ্যতা ছিল সুপ্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার সমকালীন। পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত "প্রাচীন সভ্যতার এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন

কৃষ্ণবর্ণের 'ষ্টিয়াটাইট' (Steatite) পাথরে খোদিত একটি শীলমোহর। এই শীলমোহরটি গোলাকার এবং এর উপর খোদিত আছে একটি মাছ ও ঢেউখেলা রেখা। এদের নিম্নে প্রদর্শিত আছে একটি গোলাকার চিহ্ন এবং সর্বোপরি আঁচড়ে উৎকীর্ণ হয়েছে রেখা। এই চিহ্নগুলি দেখে একজন ইংরেজ গবেষক মাইকেল রিড্‌লে অনুমান করেন এখানে সুদূর ক্রীট দ্বীপের লিপি 'লিনীয়ার এ' (Linear A) এবং...লিপিদ্বয় এইভাবে পঠিত হ'য়েছে ঃ AETEA '' (পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত)। অতএব এটি কি অনুমান-সাধ্য নয় যে, প্রাচীন তাম্রাশ্মীয় যুগে, খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় সহস্রাব্দেই বাঙলার সঙ্গে সুদূর ক্রীট দ্বীপের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হ'য়েছিল? প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকগণ যে Prasoi (প্রাচ্যরাজ্য), Gangaridae (গঙ্গারাঢ়ী রাজ্য) বা গঙ্গে নগরের এত প্রশংসা করেছেন, সেগুলিও এই বাঙলাদেশেই বর্তমান ছিল বলে মনে করবার কারণ রয়েছে। অতএব জাতি হিশেবে বাঙালী মিশ্র উপাদানে গঠিত হলেও প্রধান উপাদান ছিল আল্পীয় আর্যগোষ্ঠী — সম্ভবতঃ এ অনুমান যুক্তিসঙ্গত।

প্রাচীনত্বের প্রমাণ

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন ঃ "আর্যভাষা প্রতিষ্ঠার পূর্বে এদেশে কোল (অস্ট্রিক) ও দ্রাবিড় শ্রেণীর ভাষাই লোকে বলিত; এবং উত্তর ও পূর্ব বাঙ্গালায় নবাগত ভোট-চীন বা ভোট-ব্রহ্ম গোষ্ঠীর ভাষাও কতকটা নিজস্থান করিয়া লইয়াছিল। অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোট-চীন, এই বিভিন্ন জাতির মানুষকে একই ভাষা-সূত্রে এবং একই ধর্ম ও সংস্কৃতির সূত্রে বাঁধিয়া দিয়া বিহারের পথ ধরিয়া আগত উত্তর ভারতের আর্যভাষা।..... চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন খ্রীষ্টীয় ৪০০-অব্দের দিকে ভারতে তীর্থ দর্শন উপলক্ষ্যে আসেন, তাহার ভ্রমণকথা হইতে বুঝা যায় যে ঐ সময়ের মধ্যে বাঙ্গালা দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। ... খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙ্গালার সুবিখ্যাত পাল রাজবংশের অভ্যুদয় ঘটে, মনে হয়, সেই সময়ে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোট-চীন জাতীয় লোকেরা উত্তর ভারতের ও বিহারের আর্যভাষী ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে সমভাষী হইয়া যাইবার ফলে এক ভাষার সূত্রে গ্রথিত একটি বিশিষ্ট nation বা জনগণ-এ পরিণত হইয়াছিল।"

[তিন] বাঙলা ভাষা-পরিচয়

আদি আর্যভাষা

আনুমানিক পাঁচ হাজার বছর আগে মধ্যয়ুরোপ অথবা মধ্য এশিয়ার কোন এক স্থানে একভাষা-ভাষী বা সমভাষা-ভাষী ভিন্নজাতির লোক বাস করতো। এতকাল পর্যন্ত এদেরই 'আর্যজাতি' বলে অভিহিত করা হতো। কিন্তু এখন বলা হয়, 'আর্য' নামে কোন বিশেষ জাতি কোনকালে বর্তমান ছিল না, সম্ভবত বিভিন্ন জাতির লোক পরস্পরের পক্ষে বোধগম্য এক বা একাধিক ভাষায় কথা বলতো— উক্ত ভাষার নাম 'আর্যভাষা' এবং এই ভাষা-ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর নাম

'আর্যভাষা-ভাষী সম্প্রদায়'। এই আর্যভাষা বা আদি আর্যভাষা'ই কালক্রমে স্থানভেদে রূপান্তর লাভ করে য়ুরোপ ও ইরান-ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষায় পরিণত হয়েছে। এইহেতু এই ভাষার নাম ইন্দো-য়ুরোপীয় পিতৃভাষা বা আদি আর্যভাষা (Indo-European Parent Speech) বা ইন্দো-জার্মান আর্যভাষা। এই ভাষারই অপর একটি লুপ্ত শাখা—হিত্তী (Hittite)। অবশ্য অনেকে মনে করেন হিট্টাইট বা হিত্তীভাষা আদি আর্যভাষার শাখা নয়, তাঁর ভগিনী-স্থানীয়।

কালক্রমে ইন্দো-য়ুরোপীয় আর্যভাষা দু'টি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হয় —একটি প্রধানতঃ পূর্বদেশীয় বা 'সতম্ গোষ্ঠী', অপরটি প্রধানত পশ্চিমদেশীয় বা 'কেন্তুম গোষ্ঠী'। সতম গোষ্ঠী থেকে রুশীয়, ইরানীয় ও ভারতীয় আর্যভাষা এবং কেন্তুম্ গোষ্ঠী থেকে ইংরাজী, ফরাসী, জর্মান, গ্রীক প্রভৃতি য়ুরোপীয় ভাষার উদ্ভব হয়। পূর্বদেশীয় তুষারভাষা (Tokharian) -ও এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। খ্রীষ্টজন্মের দেড়-দুই হাজার বছর আগেই ভারতীয় আর্যভাষা ইরানীয় আর্যভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্রতা লাভ করে। ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন ঋগ্‌বেদের ভাষা।

ভারতীয় আর্যভাষা তিনটি যুগে বিভক্ত ঃ

১. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা
২. মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা
৩. নব্য ভারতীয় আর্যভাষা

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা

১. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার নিদর্শন বৈদিক সাহিত্যে বিধৃত। এর একটি রূপ বৈদিক সংস্কৃত, অপরটি লৌকিক সংস্কৃত। বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতর গ্রন্থগুলি বৈদিক সংস্কৃতে রচিত এবং অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্য ও মহাকাব্য-আদি গ্রন্থ লৌকিক সংস্কৃতে রচিত। লৌকিক সংস্কৃত ভাষার ব্যবহারকে অবশ্যই কোন যুগে সীমাবদ্ধ করা সম্ভবপর নয়; কারণ সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ ক'রে প্রায় অপরিবর্তিতরূপে ইদানীন্তনকাল পর্যন্ত এই ভাষা সমানভাবে চলে আসছে। যা হোক বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার যুগ প্রসারিত। বৈদিক ভাষার একটি কথ্যরূপও সমকালে প্রচলিত ছিল, তার কোন নিদর্শন পাওয়া না গেলেও এই কথ্যভাষাই ক্রমবিবর্তিত রূপে পরবর্তী পর্যায়ে রূপান্তরিত হ'য়ে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা বা প্রাকৃত নামে পরিচিত হয়েছে।

২. বুদ্ধদেব জনগণের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় ধর্মোপদেশ দানের আদেশ প্রচার ক'রেছিলেন ব'লে জানা যায়। বস্তুত, বুদ্ধদেবের কাল থেকেই 'পালি-প্রাকৃত' তথা মধ্যভারতীয় আর্যভাষার যুগারম্ভ। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা বলতে প্রধানত প্রাকৃত ভাষাকে বুঝালেও প্রাচীন প্রাকৃত, পালি এবং অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ এর অন্তর্ভুক্ত। অশোকের শিলালিপিতে ও প্রাচীন প্রাকৃত, বৌদ্ধধর্ম-গ্রন্থসমূহে ও জাতক গ্রন্থাদিতে পালি এবং বিভিন্ন

নাটকে কাব্যে মহাকাব্যে বিভিন্ন সাহিত্যিক প্রাকৃতের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী ও পৈশাচী প্রধান। অপভ্রংশ ভাষাতেও বহু গ্রন্থাদি রচিত হয়েছিল। একমাত্র শৌরসেনী প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত অপভ্রংশ অবহট্‌ঠ ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়, অপর কোনটিরই কোন নিদর্শন লভ্য নয়। অপভ্রংশ ভাষা ক্রমবিকাশের পথে নব্য ভারতীয় আর্যভাষার পরিণত হ'বার সুদীর্ঘকাল পর পর্যন্তও এর অর্বাচীন রূপ অবহট্‌ঠ ভাষার ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা

৩. প্রাকৃত ভাষা সুপ্রাচীনকালেই অঞ্চলভেদে রূপভেদ লাভ করেছিল। গিরিগাত্রে উৎকীর্ণ অশোকের শিলালিপিগুলিতেই তার নিদর্শন বর্তমান। আনুমানিক খ্রীঃ অষ্টম নবম শতকের দিকেই মধ্যভারতীয় আর্যভাষা সুস্পষ্টভাবে আঞ্চলিক ভাষার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য লাভ করে, এই ভাষাই 'নব্য ভারতীয় আর্যভাষা'। বাঙলা, অসমীয়া, উড়িয়া, হিন্দী, মরাঠী, পঞ্জাবী প্রভৃতি উত্তর ভারতীয়, পাকিস্তানে প্রচলিত ভাষাগুলি এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। নব্য ভারতীয় আর্যভাষা এবং অবহট্‌ঠ ভাষা সমান্তরালভাবে দীর্ঘকাল প্রবাহিত হচ্ছিল বলেই সম্ভবত সর্বপ্রকার আঞ্চলিক ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শনপ্রাপ্তি দুলর্ভ হয়ে উঠেছে। প্রাচীন বাঙলা ভাষায় রচিত চর্যাপদই সম্ভবত নব্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। খ্রীষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হয়েছিল, অনুমান করা চলে। কোন কোন ভাষাবিজ্ঞানীর মতে এর রচনাকালের সূত্রপাত ঘটেছিল; খ্রীঃ অষ্টম শতকেই অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় রচিত কোন গ্রন্থই এত প্রাচীন নয়।

নব্য ভারতীয় আর্যভাষা

বাঙলা এবং এর সহোদরাস্থানীয় উড়িয়া ও অসমীয়া দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙলা ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় নি বলেই অনুমিত হয়। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পর উড়িয়া এবং ষোড়শ শতাব্দীর দিকে অসমীয়া ভাষা স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছিল। এর পর এদের গতিপথ স্ব স্ব ধারায় চিহ্নিত হ'য়েছিল।

দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে ভাষা এবং সাহিত্যের রূপান্তর ঘটলেও জীবজগতের মতই এখানেও বংশপ্রভাবকে অস্বীকার করা চলে না। পরিবেশ অবশ্যই ভাষা ও সাহিত্যের গঠনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে থাকে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সুপ্রাচীন কাল থেকে ভাষা এবং সাহিত্যের যে ধারা অবস্থান্তরের মধ্য দিয়ে নব্য ভারতীয় আর্যভাষা ও সাহিত্যের জন্মদান করেছে, তার প্রভাবও সামান্য নয়। বস্তুত, প্রাচীন এবং মধ্যযুগের ভারতীয় আর্যভাষা এবং সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে বাঙলা কিংবা অপর কোন নব্য ভারতীয় আর্যভাষা ও সাহিত্যের চর্চা সম্ভবপর নয়। এই কারণেই বিস্তৃতভাবে সম্ভব না হওয়ায় সংক্ষিপ্ততম আকারে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় আর্য ভাষার কিঞ্চিৎ পরিচয় দান করা হ'লো।

[চার] গোত্র-পরিচয়

বাঙলা ভাষার গোত্র-নির্ণয়ে তাকে নিঃসন্দেহে সুপ্রাচীন ইন্দো-য়ুরোপীয় তথা আদি আর্যভাষার সন্তান বলেই মেনে নিতে হয় তবে বাঙলা ভাষা আর নৈকষ্য কুলীন নয়, এবং এই মূল ভাষার কোন সন্তানই তা নয়। ভাষা-প্রবাহের পর্বে পর্বে তাতে এসে মিশেছে কত ভিন্ন গোত্রীয় রক্তধারা এবং তারই একদিকের চরম পরিণত ঘটেছে বাঙলা ভাষায়ও। এত ভিন্ন রক্তের মিশ্রণেও কিন্তু বাঙলা ভাষার মূল প্রকৃতিতে তার আর্যধারায় রূপটিই প্রধান হ'য়ে রয়েছে।

আদি আর্য

অনুমান প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে যে আদি আর্যভাষাভাষী জনগোষ্ঠী য়ুরোপ-এশিয়ার সঙ্গম-স্থলে যাযাবর জাতি-রূপে বর্বর জীবন যাপন করতো, তাদেরই একটি শাখা কালস্রোতে ভাসতে ভাসতে প্রধানতঃ পশ্চিম য়ুরোপ-খন্ডে ছড়িয়ে পড়ে, সেখানে আদি আর্যভাষা যে রূপ ধারণ করে, তার মূলটিকে ভাষাবিজ্ঞানীগণ 'কেন্তম্ গোষ্ঠী' নামে অভিহিত করেন। তার চারটি ধারা — গ্রীক, টিউটোনিক লাতিন ও কেল্টিক নামে য়ুরোপ খণ্ডে এবং 'তুখার' বা 'তুষার' নামে পশ্চিম এশিয়ায় অপর একটি ধারা প্রচলিত হয়। এই ধারাগুলি থেকেই বর্তমানকালের ও গ্রীক, জার্মান ও তদ্বংশজ ইংরেজি, ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভৃতি এবং লাতিন ও তদ্বংশজাত 'ইতালীয়, ফরাসী, পর্তুগীজ' আর কেল্টিক বংশজাত ওয়েলস, আয়ার প্রভৃতি ভাষার উদ্ভব ঘটে। 'তুখার' বা 'তুষার' ভাষা সহস্রাধিক বৎসর পূর্বেই লোপ পেয়েছে।

কেন্তম্ গোষ্ঠী

আদি আর্যভাষার অপর একটি ধারা পূর্ব য়ুরোপ ও এশিয়ার পশ্চিমাংশ জুড়ে 'সতম্ গোষ্ঠী' নামে অভিহিত হয়। এটি 'বালতো-স্লাব' রূপে শ্লোভাক দেশগুলিতে, রশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে, আর্মেনিয়ান রূপে আর্মেনিয়ায়, 'আলবেনিয়ান' রূপে আলবেনিয়ায় ও 'ইন্দো-ইরানীয়' তথা আর্যভাষা রূপে ইরান অঞ্চলে পরিচিত। শেষোক্ত এই আর্য বা ইন্দো-ইরানীয় শাখাটিই কালে ত্রিধা বিভক্ত হয়। এর একটি ধারা ইরানে থেকে যায় 'ইরানী ভাষা' রূপে যা থেকে সৃষ্ট হ'য়েছে একালের ফার্সি, পস্তু, আফগান প্রভৃতি ভাষা, অপর ধারা দরদীয় শাখা' — যা থেকে একালে কাশ্মীরী, শীনা, চিত্রালি প্রভৃতি ভাষার উদ্ভব ঘটেছে এবং অপর শাখাটি 'ভারতীয় আর্যভাষা' নামে পরিচিত। এই 'ভারতীয় আর্যভাষা'রই প্রত্যক্ষ গোত্র সন্তান আমাদের 'বাঙলা ভাষা'।

সতম্ গোষ্ঠী থেকে বাঙলা

আঃ সাড়ে তিন হাজার বছর ধরে ভারতীয় আর্যভাষা কিছুটা স্বভাবধর্মে, কিছুটা স্থানাগত ও কালগত প্রভাবে, কিছুটা বা পরিবেশের প্রভাবে রূপ থেকে রূপান্তরের ভিতর দিয়ে আঃ খ্রীষ্ট্রীয় অষ্টম-নবম শতাব্দীর দিকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ লাভ করে। এইরূপ একটি আঞ্চলিক রূপই ভারতের পূর্বপ্রান্তস্থিত, বর্তমান বঙ্গ-ভাষা-ভাষী অঞ্চল জুড়ে সাধারণভাবে 'বাঙলা ভাষা' নামে এখন পরিচিত। ভারতীয় আর্যভাষা প্রথম

সহস্রবর্ষকাল 'প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা' তথা 'সংস্কৃত ভাষা' রূপে, পরবর্তী দেড় হাজার বৎসর 'মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা' তথা প্রাকৃত-অপভ্রংশ অবহট্‌ঠ ভাষা-রূপে এবং শেষ এক হাজার বছর নব্য ভারতীয় আর্যভাষা-রূপে সমগ্র উত্তর ভারত, পাকিস্তান, বাঙলাদেশ এবং ভারত ও বর্হিভারতেরও কোন কোন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে প্রচলিত রয়েছে, যেমন — বাঙলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, মৈথিলি, হিন্দি, মরাঠী, গুজরাতি, সিংহলী প্রভৃতি।

ভারতীয় আর্যের তিন যুগ

অতএব বাঙলা ভাষার গোত্রপট বিচারে আমরা দেখাতে পাচ্ছি যে ১. ইন্দো-য়ুরোপীয় তথা 'আদি আর্যভাষা', ২. সতম্ গোষ্ঠী, ৩. ইন্দো-ইরানীয় তথা 'আর্য', ৪. ভারতীয় আর্য (ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্য, তথা সংস্কৃত, (খ) মধ্যভারতীয় আর্য তথা প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ এবং (গ) 'নব্যভারতীয় আর্য তথা বাঙলা' — এই ক্রম পর্যায়ে বাঙলা ভাষার উদ্ভব ঘটেছে, কিন্তু লক্ষণীয় এর প্রতি পর্বেই কিন্তু মূল ভাষার সঙ্গে মিশ্রণ ঘটেছে অপর কোন কোন ভাষার এবং সেটি প্রধানতঃ প্রতিবেশী অপর কোন অন্-আর্য ভাষার সঙ্গেই। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় এইভাবে বেশ কিছু দ্রাবিড়, অস্ট্রীক বা নিষাদ এবং ভোট-চীন তথা কিরাত ভাষাও সাঙ্গীকৃত হ'য়ে ভাষাদেহে মিশ্রিত হ'য়ে গেছে। এমন কি, এই পর্বে কিছু বিদেশি, কিন্তু আর্যবংশ-জাত গ্রীক-পারসিক ভাষারও আত্মীকরণ ঘটেছে। মধ্য পর্বে অর্থাৎ প্রাকৃত পর্বেও এরূপ প্রচুর নিদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। নব্য ভারতীয় ভাষা তথা বাঙলায়ও বিভিন্ন পর্বে এর প্রভূত পরিমাণ দৃষ্টান্ত সুলভ।

ইন্দোয়ুরোপীয় থেকে বাঙলা

হাজার বছরে বাঙলা ভাষাও কিন্তু তিনটি পর্বে সুস্পষ্টভাবে তিনটি লক্ষণীয় বিবর্তিত রূপ লাভ করেছে। ভাষা তার গতিপথে দেশকালোচিত স্বাভাবিক পরিবর্তন ছাড়া প্রথম পর্বে অর্থাৎ আদিপর্বে মূলতঃ হিন্দুবৌদ্ধ যুগে ছিল প্রধানতঃ খাঁটি বাঙলা অর্থাৎ তদ্‌ভব শব্দের উপর নির্ভরশীল। তার সঙ্গে স্বল্পমাত্রায় অর্ধতৎসম, তৎসম ও কিছু দেশি শব্দের মিশেল ছিল। দ্বিতীয় পর্ব বা মধ্যযুগে রাজনৈতিক বিচারে মুসলিম যুগে বাঙলা ভাষায় ক্রমশঃ বহিরাগত বিদেশি তথা ফারসি-মাধ্যমে আগত তুর্কী ও আরবী শব্দের মিশ্রণ ঘটে। এইসঙ্গে তৎসম শব্দ ব্যবহারেরও ক্রম বৃদ্ধি ঘটাতে থাকে। খাঁটি তদ্‌ভব শব্দ একদিকে কিছু বেড়েছে, কিন্তু কিছু আবার লোপ পেয়েছে। অন্তিম পর্বে তথা আধুনিক যুগে অর্থাৎ ইংরেজ রাজত্বকালে বিদেশি য়ুরোপীয় ভাষা-সমূহের, বিশেষভাবে পর্তুগীজ ও ইংরেজি এবং তার মাধ্যমে অপরাপর ভাষার শব্দ বাঙলা ভাষায় গৃহীত হ'য়ে তার শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছে। বর্তমানে বাঙলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ সংখ্যার শতকরা প্রায় ৪৮-৪৯ অংশ তদ্ভব বা খাঁটি বাঙলা, ৪৪ শতাংশ তৎসম এবং অবশিষ্ট দেশি-বিদেশি বা মিশ্র ভাষা। অতএব বাঙলা ভাষার গোত্র-পরিচয় যাই হোক না কেন, বাস্তব বাঙলা ভাষার এইটিই মূল চিত্র।

বাঙলা ভাষার তিন যুগ

[পাঁচ] বঙ্গলিপির উদ্ভব

মনোভাব-প্রকাশের তাগিদেই যাবতীয় মানবীয় ভাষার সৃষ্টি। কিন্তু মুখের এই ভাষা স্ব-কালে ও স্ব-স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে। এই সীমার বন্ধন থেকে ভাষাকে মুক্ত করবার প্রয়োজনেই লিপির উদ্ভব ঘটে।

মানুষের ভাষা প্রথম লিপি-রূপ পায় সম্ভবতঃ চিত্রাঙ্কনের ও গ্রন্থিলিপির মাধ্যমে। তাই 'আলেখ্য ও স্মারক চিত্র পদ্ধতি'কেই লিপির প্রথম পর্যায় বলে মনে করা হয়। এর দ্বিতীয় পর্যায় 'ভাবচিত্র পদ্ধতি'—অনেকেই একে পৃথকভাবে ভাষালিপি (Ideogram) ও চিত্রলিপি (Pictogram) নামে অভিহিত করেন। তৃতীয় পর্যায়ে 'চিত্রপ্রতীকে'র (Hieroglyph) সাহায্যে শব্দলিপি (Phonograph) রচিত হয়। চীনালিপি এবং প্রাচীন মিশরীয় লিপিতে এই পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। শব্দলিপি থেকে চতুর্থ পর্যায়ে সৃষ্ট হ'লো 'অক্ষরলিপি' (Syllabic Script)। বাঙলা এবং ভারতের অন্যান্য লিপি এই পর্যায়ভুক্ত কারণ এই লিপিতে প্রতিটি ব্যঞ্জনকেই 'অ' স্বরধ্বনিযুক্ত ক'রেই পড়তে হয়। পঞ্চম পর্যায়ে অক্ষরলিপির পরবর্তী স্তর 'ধ্বনিলিপি' (Alphabetic Script)। এই লিপিতে প্রতিটি ধ্বনির জন্য এক একটি বর্ণ (letter) নির্দিষ্ট রয়েছে। রোমক লিপি (A, B, C, D প্রভৃতি) এই পর্যায়ভুক্ত।

লিপি বৈচিত্র্য

বর্তমান কালে পৃথিবীতে যত প্রকার লিপি প্রচলিত রয়েছে, তাদেরকে পাঁচটি বা ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। (১) সুমেরীয় লিপি – প্রাচীন সুমের জাতির ব্যবহৃত এই লিপি সম্ভবতঃ ছ'হাজার বছরের প্রাচীন। তীরের ফলার মত অক্ষরগুলিকে বলা হয় বাণমুখ লিপি বা 'কীলকাক্ষর লিপি' (Cuneiform)। পারস্যের প্রাচীন হখামনীয় লিপিতেও এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। (২) 'মিশরীয় লিপি' — প্রাচীন মিশরের পিরামিডে প্রাপ্ত এই লিপিতে চিত্র, ভাব ও ধ্বনির সমন্বয় ঘটেছে। এই দুই জাতীয় লিপি বর্তমানে অপ্রচলিত। (৩ক) 'ফিনিসীয় লিপি' – সম্ভবতঃ মিশরীয় লিপিকে মূল রূপে গ্রহণ ক'রে ফিনিসীয় বণিকগণ ২২টি বর্ণের সাহায্যে এই লিপি সৃষ্টি করেছিল। এই লিপির চরম বিকাশ ঘটে গ্রীকদের হাতে। বর্তমান কালে য়ুরোপে প্রচলিত যাবতীয় লিপির মূলে আছে এই লিপি। (৩খ) 'আরামীয় লিপি' – মিশরীয় লিপিরই অপর একটি ধারা এই আরামীয় লিপি। হিব্রু, আরবী, ফারসী-আদি এবং অশোকের শিলালিপিতে ব্যবহৃত 'খরোষ্ঠী লিপি' এ থেকে উদ্ভূত। এটি ডানদিক থেকে বাঁ দিকে লেখা হয়। (৪) 'চীনালিপি' — এটি মূলতঃ চিত্রলিপি থেকে উদ্ভূত হলেও এটি এখনো ধ্বনিলিপিতে পৌঁছতে পারেনি। চীনা লিপিতে প্রতিটি শব্দের জন্য এক একটি অক্ষর রয়েছে। ফলতঃ চীনা লিপিতে অক্ষরের সংখ্যা অন্যূন ৫০ হাজার। জাপানীর চীনালিপিকে মূল হিশেবে গ্রহণ করেও তাকে ধ্বনিলিপিতে পরিণত ক'রে নিয়েছে। ফলে জাপানী লিপিতে অক্ষর সংখ্যা মাত্র ৪৭টি। (৫) 'ভারতীয় লিপি' — ভারতীয় লিপির উদ্ভব সম্বন্ধে নানা মতান্তর থাকলেও অনুমান করা হয়, স্বাধীনভাবেই এই লিপি ভারতে উদ্ভূত হয়েছিল। একালের পণ্ডিতদের ধারণা খ্রীঃ পূঃ

লিপির প্রকারভেদ

পঞ্চদশ শতকেই বেদের মতো উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হলেও তৎকালে ভারতবর্ষে কোন লিপি প্রচলিত ছিল না। অশোকের শিলালিপিকেই ভারতের প্রাচীনতম লিপি বলে মনে করা হয়। অশোক-অনুশাসনে দু'জাতীয় লিপি পাওয়া যায় -- একটি আরামীয় লিপি-জাত 'খরোষ্ঠী লিপি', অপরটি 'ব্রাহ্মীলিপি'। এই ব্রাহ্মীলিপিই রূপান্তরিত হ'য়ে কালে কালে ভারতবর্ষের যাবতীয় লিপি, শ্রীলঙ্কা, মায়ন্‌মার বা ব্রহ্মদেশ, তিব্বত, থাইল্যাণ্ড, কোরিয়া প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন লিপির জন্মদান করেছে।

এই পাঁচটির বাইরে রয়ে গেছে আরো কিছু প্রত্নলিপি যাদের পাঠোদ্ধার না হবার ফলে এদের গোত্রনির্ণয় সম্ভবপর নয়। এদের মধ্যে আছে ক্রীট দ্বীপে প্রাপ্ত খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় সহস্রাব্দের 'মিনোয়ান লিপি', আমেরিকার আদি অধিবাসীদের ব্যবহৃত 'মায়ালিপি', 'আজতেক লিপি' প্রভৃতি এবং পাক-ভারত উপমহাদেশ প্রাপ্ত প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন 'সিন্ধুলিপি'। সিন্ধুলিপির অন্যূন ৪০০ টি প্রতীকচিহ্ন পাওয়া যাওয়াতে মনে হয় যে এগুলি ছিল ভাবচিত্রলিপি ও ধ্বনিমূলক চিহ্ন।

ভারতীয় আর্যদের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদের নামান্তর 'শ্রুতি'। মনে হয় শুনে শুনেই এই গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করতে হতো। এতে 'লিপি' বা লেখার পদ্ধতি-বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই, এমন কি এ জাতীয় কোন শব্দও পাওয়া যায় না। অবশ্য বৈদিক যুগের পূর্বেই সিন্ধু সভ্যতার যুগে লিপির প্রচলন ছিল, কিন্তু এই লিপির পাঠোদ্ধার না হওয়াতে এর সঙ্গে বৈদিক যুগের অথবা পরবর্তী যুগের লিপি পদ্ধতির কোন সম্পর্ক ছিল কিনা, তা' বলা সম্ভব নয়। অশোকের শিলালিপিতেই আমরা ভারতীয় লিপির প্রাচীনতম নিদর্শন পাই বলা চলে। এই লিপির নাম 'ব্রাহ্মীলিপি'। অশোক-অনুশাসনে প্রাপ্ত অপর লিপি খরোষ্ঠী ক্রমশঃ লোপ পেয়ে যায়।

ব্রাহ্মীলিপি

ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব-বিষয়ে মতান্তর থাকলেও এই বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত এই -- ব্রাহ্মীলিপি স্বাধীনভাবে ভারতে উদ্ভূত এবং বিকশিত হয়েছে। এই ব্রাহ্মীলিপি থেকেই পরবর্তীকালে বঙ্গলিপি-আদি যাবতীয় ভারতীয় লিপির উদ্ভব ঘটেছে। বঙ্গদেশে প্রাপ্ত প্রাচীন লিপি খ্রীঃ পূঃ যুগের মহাস্থানগড় লিপিও ব্রাহ্মীলিপির রূপভেদ মাত্র। গুপ্তযুগেই (খ্রীঃ চতুর্থ শতক থেকে) ব্রাহ্মীলিপির ভিন্ন ভিন্ন রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুগের লিপিকে সাধারণভাবে 'গুপ্তলিপি' নামে অভিহিত করা হয়। এই সময়েই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য-ভেদে লিপি দুটি ধারায় বিভক্ত হয়। জাপানের হরিয়ুজি নামক এক বৌদ্ধমঠে আনু. ৫২০ খ্রীঃ রচিত দু'খানি পুথি পাওয়া যায়। এদের লিপির সঙ্গে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় লিপির সাদৃশ্য পাওয়া যায়। গুপ্তযুগেব পর খ্রীঃ সপ্তম থেকে নবম শতকের মধ্যে বর্ণের উপর মাত্রাদানের ফলে 'কুটিল লিপি'র উদ্ভব ঘটে। পূর্বাঞ্চলীয় এই কুটিল লিপির নাম 'সিদ্ধমাতৃকা'। লিপির বিবর্তনে মধ্য পশ্চিমাঞ্চলে 'নাগরলিপি' এবং উত্তরাঞ্চলে 'শারদা লিপি'র সৃষ্টি হয়।

বঙ্গলিপির উদ্ভব

নবম শতাব্দীতে রচিত নারায়ণপালের 'তাম্রশাসনে' কুটিল লিপি থেকে উদ্ভূত 'বঙ্গ-লিপি'র প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। এই কালের লিপিকে 'পাল-লিপি' নামে অভিহিত

করা হয়। একাদশ শতকের বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপিতে আধুনিক বঙ্গাক্ষরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এ যুগের লিপির প্রচলিত নাম 'সেন-লিপি'। দ্বাদশ শতকে লক্ষ্মণসেনের 'তর্পণদীঘি'তেও বঙ্গলিপির নিদর্শন রয়েছে।

বাঙলা ভাষায় রচিত প্রাচীনতম গ্রন্থ 'চর্যাপদে' এবং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' যে লিপি ব্যবহৃত হয়েছে, তা খ্রীঃ চর্তুদশ থেকে যোড়শ শতকের বলে অনুমিত হয়। এগুলিতে ব্যবহৃত কোন কোন সংযুক্ত বর্ণের আকার বর্তমান কাল থেকে পৃথক। এর পরবর্তীকালে বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে যে সকল পুরনো হাতের লেখা পুথি পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে মোটামুটি অক্ষর সাদৃশ্য থাকলেও অঞ্চলভেদে ও ব্যক্তিভেদে কিছুটা বৈচিত্র্যেরও সন্ধান পাওয়া যায়। বস্তুতঃ মুদ্রণের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত লিপির কোন সুনির্দিষ্ট মান স্থাপিত হতে পারেনি।

বাঙলা লিপির মুদ্রিত রূপের প্রাচীনতম নিদর্শন ১৬৯২ খ্রীঃ লিখিত একখানি গ্রন্থে পাওয়া যায়। ১৭২৫ খ্রীঃ জার্মানিতে মুদ্রিত Urent Szeb নামক গ্রন্থে কয়েকটি বাঙলা সংখ্যা এবং "শ্রীসরজন্ত বলপকাং মার" (Sergeant Wolfgang Meryer)—এই নামটি বাঙলা অক্ষরে মুদ্রিত হয়েছে।

ভারতবর্ষে মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থ ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড-রচিত (১৭৭৮ খ্রীঃ) 'A Grammar of the Bengal Language' -এর বাঙলা অক্ষরের ছাঁচ তৈরি করেছিলেন পঞ্চানন কর্মকার ও তাঁর জামাতা মনোহর কর্মকার। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হুগলি কুঠির এক ইংরেজ রাইটার চার্লস উইলকিন্‌স্ প্রাচীন পুথির অক্ষরের সঙ্গে কালীকুমার রায় ও খুশমৎ মুন্সী নামক দুই ব্যক্তির হস্তাক্ষর মিলিয়ে যে বাঙলা অক্ষরের কাঠামো করে দেন, তাকেই আদর্শরূপে গ্রহণ ক'রে মুদ্রণের অক্ষর তৈরি হয় এবং এখন পর্যন্ত মোটামুটিভাবে বাঙলা অক্ষরের এই আদল চলে আসছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এর কিছুটা সংস্কার সাধন করেছিলেন বলে জানা যায়।

অধ্যায় ঃ দুই　　　　বাঙলা সাহিত্যের তিন যুগ

[এক]　　বাঙলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

বাঙলা সাহিত্যের বয়স ন্যূনাধিক হাজার বছর। এই হাজার বছরের বাঙলা সাহিত্যে ভাষা, ভঙ্গি, ভাব ও বিষয়ের বৈচিত্র্য যথেষ্টই দেখা দিয়েছে, অতএব এদের সুশৃঙ্খলভাবে গুছিয়ে না নিলে এরা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন কতকগুলি তথ্যের সমষ্টিতে পরিণত হ'তে পারে, ক্রমপরম্পরাসূত্রে বিধৃত ইতিহাস হ'বে না। অতএব বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনার আরম্ভেই এদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন, একাধিক শৃঙ্খলাপদ্ধতির কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য।

যুগবিভাগের ভিত্তি

জীবজগতে কাল-ভেদে যে রূপান্তর দেখা যায়, সম্ভবত এটিই সর্বাধিক সুপরিস্ফুট। সমগ্রভাবে না হ'লেও সাহিত্য জীবজগতের মত কালে কালে যে রূপান্তর লাভ ক'রে থাকে এবং তাতে সমসাময়িক যুগচেতনার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনটি আর কোথাও পাওয়া যায় না। তাই সর্বদেশেই প্রধানত কালকে ভিত্তি ক'রেই সাহিত্য-ইতিহাসের মুখ্য বিভাগ কল্পিত হ'য়ে থাকে। তাই সাহিত্যের ইতিহাসে 'যুগবিভাগ' কথাটা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই যেন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যুগবিভাগের রীতি অবশ্যই দেশ-কাল-অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।

যুগবিভাগের প্রাচীন রীতি

বিগত শতাব্দীতে রামগতি ন্যায়রত্ন 'বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে বাঙলা সাহিত্য-আলোচনার গোড়াপত্তন করলেও অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস সর্বপ্রথম রচনা করেন ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন। তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-ই প্রকৃতপক্ষে বাঙলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস। দীনেশবাবু তাঁর গ্রন্থে কালানুক্রমিক পদ্ধতি গ্রহণ ক'রে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকে নিম্নোক্ত ক্রমে বিভক্ত ক'রেছেন ঃ

১. হিন্দু-বৌদ্ধযুগ ঃ (ক) শূন্যপুরাণ (খ) নাথগীতিকা ঃ গোরক্ষবিজয় (গ) কথাসাহিত্য (ঘ) ডাক ও খনার বচন।

২. গৌড়ীয় যুগ বা শ্রীচৈতন্য-পূর্ব সাহিত্য ঃ (ক) অনুবাদ শাখা ঃ কৃত্তিবাস, সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী, পরাগল খাঁ. মালাধর বসু; (খ) লৌকিক সাহিত্য ঃ কানা

হরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত,,নারায়ণদেব, জনার্দন; (গ) পদাবলী শাখা ঃ চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি; (ঘ) কুলজী সাহিত্য।

৩. শ্রীচৈতন্যসাহিত্য বা নবদ্বীপে প্রথম যুগ ঃ (ক) পদাবলী সাহিত্য ঃ চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, মুসলমান কবিগণ; (খ) চরিত শাখা; (গ) অনুবাদ গ্রন্থ।

৪. সংস্কার যুগ ঃ (ক) লৌকিক শাখা ঃ চণ্ডী; (খ) অনুবাদ শাখা।

৫. কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ বা নবদ্বীপে দ্বিতীয় যুগ ঃ (ক) কাব্যশাখা ঃ বিদ্যাসুন্দর, আলাওল, কালীকীর্তন; (খ) গীতিশাখা ঃ কবিওয়ালা প্রভৃতি।

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, যুগের নামকরণ যা'ই করে থাকুন না কেন, গ্রন্থকার কালকেই ভিত্তিরূপে গ্রহণ ক'রেছেন এবং তার পর বিষয়ভিত্তিক উপবিভাগ কল্পনা ক'রেছেন।

পরবর্তী ঐতিহাসিক এবং সমালোচকগণ নানা কারণে দীনেশবাবু-কৃত এই যুগবিভাগ এবং নামকরণকে সমর্থন করতে পারেন নি। প্রথমত, কোন আভ্যন্তর লক্ষণ বা যুগচেতনার ভিত্তিতে এই বিভাগ কল্পিত না হওয়ায় এটি বিজ্ঞানসম্মত নয়। দ্বিতীয়ত, যুগবিভাগের মানদণ্ড একান্তভাবে অস্থির, — কোথাও ধর্ম, কোথাও ব্যক্তি, কোথাও বা মনোভাবই যুগের নিরিখ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্মকে ভিত্তি করে বাঙলা সাহিত্যের যুগবিভাগ চলতে পারে না এই কারণে যে, সুদীর্ঘ হাজার বছরের বাঙলা সাহিত্যে অহিন্দু মনোভাব প্রায় কিছুই নেই বললেই চলে। যে ছিটেফোঁটা বৌদ্ধ ও ইস্‌লামী প্রভাব বাঙলা সাহিত্যে বর্তমান, তা' কখনও যুগ-লক্ষণ হ'য়ে দাঁড়াতে পারে না। শ্রীচৈতন্যদেব অবশ্যই যুগন্ধর পুরুষ — তাঁর আবির্ভাবে এবং প্রভাবে বাঙলা সাহিত্যে যে নতুন যুগের সৃষ্টি হয়েছে, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু যে কারণে চৈতন্যদেবকে অবলম্বন ক'রে যুগবিভাগ কল্পিত হয়, সেই কারণে কখনও কৃষ্ণচন্দ্রের নামে যুগকে চিহ্নিত করা চলে না। তিনি নিঃসন্দেহে দু'জন সমকালীন শ্রেষ্ঠ কবির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, কিন্তু শুধু এই কারণে তিনি যুগাধিনায়ক বিবেচিত হতে পারেন না। ভিক্টোরিয়া এবং এলিজাবেথ ইংলণ্ডের অধীশ্বরী ছিলেন; তাঁদের রাজত্বকালে ইংরেজী সাহিত্যে যে সমৃদ্ধি দেখা দিয়েছিল, সেই কারণেই ইংরেজী সাহিত্যের যুগ তত্তৎ নামে অভিহিত হ'য়ে থাকে। সেইদিক থেকেও কৃষ্ণচন্দ্রের নামে যুগের নামকরণ করা চলে না, কারণ তিনি কখনই সারা বাঙলার অধিপতি ছিলেন না, অথচ তখনও তাঁর রাজত্বের বাইরে বাঙলা সাহিত্যের চর্চা যথেষ্টই ছিল। নবদ্বীপ বা অপর কোন স্থানের নামেও সাহিত্যের কোন যুগের নামকরণ সঙ্গত নয়। কারণ সমসাময়িক কালে কোন কোন দিক থেকে নবদ্বীপের গুরুত্ব স্বীকৃত হলেও তা' কখনও সাহিত্যচর্চার কেন্দ্রভূমি হ'য়ে দাঁড়ায় নি। বাঙলা সাহিত্যের আধুনিক যুগকে 'কলকাতা যুগ' বলে অভিহিত করলে যদিও তা' হাস্যাস্পদ বলে মনে হ'তে পারে, তবু এর পশ্চাতে যতখানি যুক্তি আছে, বাঙলা সাহিত্যের কোন যুগকে 'নবদ্বীপ যুগ' বলে অভিহিত করার পশ্চাতে ততখানি যুক্তিও নেই। অতএব, দীনেশবাবু-কৃত যুগবিভাগ অচল। তিনি

প্রাচীন রীতির ত্রুটি

প্রতি যুগে যে সকল শাখা-বিভাগ কল্পনা করেছেন, তা'ও তথ্যভিত্তিক নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে যে, হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে যে সকল গ্রন্থ রচিত হ'য়েছে বলে তিনি উল্লেখ ক'রেছেন, তাদের কোনটিই ঐ কালে রচিত হয় নি, এটিই সাম্প্রতিক অভিমত। দীনেশবাবু যে কালে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছেন, তৎকালে বহু উপাদানই দুলর্ভ ছিল এবং তখন মাত্র গ্রন্থের রচনাকাল-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার সূত্রপাত হ'য়েছে; অতএব দীনেশবাবুর রচনায় তথ্যগত প্রমাদও প্রচুর। অধুনা, যখন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস-সম্পর্কে আলোচনা অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে, এবং অনুসন্ধান ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে বহু নতুন তথ্যও আবিষ্কৃত হ'য়েছে, তখন দীনেশবাবুর প্রাচীন অনৈতহাসিক অভিমত বর্জন করাই বিধেয়।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমাব সেন প্রভৃতি মনীষীরা ভাষা-আদি বিভিন্ন লক্ষণ বিচার ক'রে পাশ্চাত্য রীতি-অনুযায়ী বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনটি প্রধান যুগে বিভক্ত করেছেন ঃ

১. আদি যুগ ঃ আ ঃ ৯৫০ খ্রীঃ হইতে ১২০০ খ্রীঃ পর্যন্ত, অর্থাৎ তুর্কী-আক্রমণ-পূর্ব যুগ। (ভিন্ন একটি মতে এই যুগটির আরম্ভ অষ্টম শতক থেকেও হ'তে পারে।)
১ক. যুগসন্ধিকাল ঃ ১২০০-১৩৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত, অর্থাৎ তুর্কী শাসনের প্রথম ভাগ। (এটিকে কেউ কেউ আদিযুগের, কেউ বা মধ্যযুগের অন্তর্ভুক্ত ক'রে থাকেন।)
২. মধ্যযুগ ঃ আঃ ১৩৫০-১৮০০ খ্রীঃ পর্যন্ত অর্থাৎ পাঠান-মুঘল শাসনকাল।
   (ক) আদি-মধ্যযুগ বা চৈতন্য-পূর্ব যুগ ঃ আঃ ১৩৫০-১৫০০ খ্রীঃ।
   (খ) অন্ত্যমধ্যযুগ বা চৈতন্যোত্তর যুগ ঃ আঃ ১৫০০-১৮০০ খ্রীঃ।
২ক. যুগসন্ধিকাল ঃ মোটামুটি ১৭৬০-১৮৫৮ খ্রীঃ অর্থাৎ কোম্পানীর শাসনকাল।
৩. আধুনিক যুগ ঃ ১৮০০ খ্রীঃ—

১. আদি যুগ ঃ বাঙলা সাহিত্যের আদি যুগের ব্যাপ্তি দুই শ' বছরের বেশি হলেও একালে বাঙলা ভাষায় রচিত হয়েছিল তেমন একটি মাত্র গ্রন্থেরই পরিচয় পাওয়া গেছে।

চর্যাপদ

গ্রন্থটির নাম 'চর্যাপদ' বা 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' অথবা 'চর্যাগীতিকোষ'; অবশ্য গ্রন্থ একটি হ'লেও এর অন্তর্ভুক্ত পদগুলির তেইশজন রচয়িতার নাম পাওয়া যায়। এঁরা একই কালে বর্তমান ছিলেন না, — কেউ বা দশম শতাব্দীর অথবা পূর্ববর্তী কালের, কেউ বা দ্বাদশ শতাব্দীর। যে সকল সিদ্ধাচার্য চর্যাপদের পদগুলি রচনা করেছিলেন, তাদের জীবৎকাল-সম্বন্ধে যে সকল তথ্য পাওয়া গেছে, তার ভিত্তিতে আদিযুগের পরিসর নির্দেশ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ব্রাহ্মণ্যপন্থী অর্থাৎ হিন্দু শিক্ষিত বাঙালী এই যুগে সাহিত্য সাধনা করেছেন সংস্কৃত অথবা প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ ভাষায়। তারা মূলতঃ ছিলেন রক্ষণশীল এবং প্রাচীন রীতির অনুসরণ করেছেন। উক্ত ভাষা-সমূহে রচিত যথেষ্ট সাহিত্য পাওয়া গেছে।

এই যুগে রচিত বাঙলা ভাষায় যে একটিমাত্র গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে তার বৈশিষ্ট্য

নিম্নোক্তক্রমে বিবৃত করা চলে ঃ রচনায় কবি কল্পনা ও আবেগের স্বল্পতা থেকে মনে হয়, কবিগণ সজ্ঞানে সাহিত্য রচনা করতে বসেননি। ধর্ম তথা বৌদ্ধ সহজ-সাধন পদ্ধতিই ছিল তাদের প্রতিপাদ্য বিষয়। রচনায় প্রবাদবাক্য এবং ধাঁধাঁ জাতীয় ছড়ার সন্ধান পাওয়া যায়। তবে এই রচনাগুলিতে পরবর্তী কালে বহুল প্রচলিত পদাবলী বা খণ্ড কবিতার পূর্বাভাষ পাওয়া যায়। সংস্কৃত কবিতায় অন্ত্যানুপ্রাস বা মিল ছিল না, চর্যাপদের কবিতাগুলিতে প্রাকৃত-অবহট্ঠ-সুলভ মিল বর্তমান। লেখকের ব্যক্তিগত স্পর্শও এই যুগের রচনার বৈশিষ্ট্য। বিশেষতঃ ভাষার দিক থেকে এ যুগের বিশিষ্টতা অবশ্য স্বীকার্য।

১ক. যুগসন্ধিকাল ঃ তুর্কী আক্রমণকাল থেকে আরম্ভ ক'রে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত বাঙলাদেশে শাসন-সৌকর্যের যথেষ্ট অব্যবস্থা ছিল। অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, এই কালে, যখন সাধারণ মানুষের মনে শান্তি-স্বস্তির অভাব ছিল, তখন স্বভাবতঃই কেহ সাহিত্য রচনার প্রতি বিশেষ আগ্রহবোধ করেননি। ফলত, একালে রচিত হ'য়েছে, এরূপ কোন সাহিত্য-নিদর্শন আমরা পাই নি। তবে অনুমান করা চলে, পরবর্তীকালে যে মঙ্গলকাব্য-সাহিত্য বিরাট মহীরুহের আকার ধারণ করেছিল, তা হয়তো এই যুগসন্ধিকালে পাঁচালী-বীজরূপে বর্তমান ছিল। এই কালটি সম্ভবত ছিল বাঙালীর 'মানস-প্রস্তুতি'র কাল। ১৩৪৫ খ্রীঃ শামস্উদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাঙলাদেশের দীর্ঘস্থায়ী বিশৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলিত করে দেশে শান্তি স্থাপন করেন। তিনি শিল্প-সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। মনে হয়, এই সময় যুগসন্ধিকালের অবসান ঘটে এবং নোতুন যুগের সূচনা দেখা দেয়।

প্রস্তুতির কাল

২. মধ্যযুগ ঃ বলতে গেলে সমগ্র মুসলমান-শাসন যুগটাকেই বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগ নামে অভিহিত করা হয়। বহিঃশক্তির প্রচণ্ড আঘাত এবং আক্রমণের আকস্মিকতা বাঙালীকে কূর্মবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য করেছিল। বাঙালী তখন আশ্রয় খুঁজেছিল ধর্মের নামে দেবতা তথা উপদেবতার কাছে। তখনই বাঙালী উচ্চবর্ণের হিন্দু এবং অন্ত্যজ ও আদিবাসী প্রাগার্যের সঙ্গে বোঝাপড়ার ফলে আর্য-অনার্য সংস্কৃতি-সমন্বয় ঘটেছিল। বস্তুত, এই যুগের সাহিত্য প্রধানত অনার্য দেব-দেবী এবং অবতার-সর্বস্ব ধর্মের গুণকীর্তনেই নিয়োজিত ছিল। সাহিত্যিকগণ ছিলেন জীবন-বিমুখ, পরপ্রত্যাশী, সাহিত্যও ছিল বস্তুনিষ্ঠ। ব্যক্তিজীবন তথা সমাজ-জীবন-সম্বন্ধেও তাঁরা ছিলেন উদাসীন। চিরাচরিত প্রথায় তাঁরা কাহিনীর পর কাহিনী রচনা করে গিয়েছেন, আপনার অন্তরের দিকে তাকাবার অবকাশ তাদের ছিল না। জীবনযাত্রার জটিলতা কম ছিল, যুক্তি-বুদ্ধির চর্চাও সাধারণের মধ্যে প্রায় ছিল না বললেই হয় — প্রধানত এই কারণেই তখনও গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব সূচিত হয় নি। কবিতার ছন্দও ছিল গতানুগতিক।

বৈশিষ্ট্য

(ক) অদি-মধ্যযুগ বা চৈতন্য-পূর্ব যুগ ঃ চর্যাপদের পর সুদীর্ঘকাল বাঙলা সাহিত্যভূমি ছিল বন্ধ্যা। সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দীর শেষদিকে অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বড়ু চণ্ডীদাস রচনা করেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বা 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারের জন্য এর মূল্য

অপরিসীম, কিন্তু সাহিত্যকীর্তি-হিশেবে এটি এমন কিছু মূল্যবান নয়। কৃত্তিবাস পণ্ডিত-রচিত 'রামায়ণ পাঁচালী' এবং মালাধর বসু-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'ও পঞ্চদশ শতকেই রচিত হ'য়েছিল। কেউ কেউ অনুমান করেন, মনসামঙ্গল কাব্যের কয়েকজন কবিই (বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, নারায়ণদেব) এই শতকে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু এমন কোন আভ্যন্তর কিংবা বহির্লক্ষণ পাওয়া যায় না, যার ফলে এই বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা চলে। আদি-মধ্যযুগের ইতিহাস এখানেই সমাপ্ত। একালে রচিত সাহিত্যের মধ্যে নব সৃষ্টির উল্লাস একান্তভাবে অনুপস্থিত। তবে আদি যুগের রচনার সঙ্গে প্রধান পার্থক্য এইখানে যে, রচনার বিষয় ধর্মীয় হলেও কবিরা সজ্ঞানে সাহিত্য রচনা করেছেন, উৎকর্ষ অবশ্য সর্বত্র একরূপ নয়।

সৃষ্টির অপ্রাচুর্য

(খ) অন্ত্য-মধ্য যুগ বা চৈতন্যোত্তর যুগ ঃ মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সাধারণত ধর্মীয় নেতা বলে পরিচিত হলেও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে ও বাঙালী সমাজে তাঁর প্রভাব ছিল অসাধারণ। তাঁর আবির্ভাবের ফলে বাঙালীর চিন্তাধারায় এবং সমাজ-ব্যবস্থাতেও যথেষ্ট পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। এতকাল পর্যন্ত সমাজে একটা বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত শ্রেণীই স্বীকৃতি লাভ করেছিল। চৈতন্যদেবই প্রথম উচ্চকণ্ঠে প্রচার করলেন — 'চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরি-ভক্তি-পরায়ণঃ'। অন্ত্যজশ্রেণীর অধিকার স্বীকৃত হবার পর সমাজজীবন এবং সাধারণ মানুষের চিন্তাধারায় যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আভাষিত হয়েছিল, তার প্রভাব পরবর্তী কালের সাহিত্যে সুস্পষ্ট। দেবতা এবং ধর্ম তখনও পর্যন্ত সাহিত্যভূমি অধিকার করে থাকলেও কবিদের মন যে ক্রমশ জীবনমুখী হয়ে উঠেছিল, তার পরিচয়ও দুর্লক্ষ্য নয়। চৈতন্যোত্তর যুগে একদিকে যেমন বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছিল, তেমনি অন্যদিকে জীবনীসাহিত্য এবং পদাবলী সাহিত্যও বাঙলা সাহিত্যের একটা বিরাট অংশকে অধিকার করেছিল। বস্তুত বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে স্থান পেতে পারে, সমগ্র আদি ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের তেমন যে একটি মাত্র শাখাই বর্তমান, সেই পদাবলী-কাব্যসাহিত্য এ যুগে রচিত হয়েছিল। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন অনুবাদ-সাহিত্যও এই যুগের সাহিত্যসাধনাকে পরিপুষ্ট করেছে। চৈতন্যোত্তর যুগের শেষভাগে যে কাব্যধারা পরিপূর্ণভাবে জীবনমুখী হয়ে উঠেছিল, সেই লৌকিক কাব্যশাখার একদিকে গীতিকা সাহিত্য, অপরদিকে শাক্ত পদাবলী। অশিক্ষিত অথবা অর্ধশিক্ষিত পল্লীকবিদের হাতে রচিত গীতিকাগুলি পরিমার্জিত কিংবা সুসংস্কৃত নয়, কিন্তু বাস্তব-অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ এবং জীবনরসে পুষ্ট। শাক্তপদাবলী বৈষ্ণবপদাবলীর অনুকরণে রচিত হ'লেও এতে বাস্তবজীবনের সঙ্গে যোগ ঘনিষ্ঠতর। এই লৌকিক সাহিত্যেরই আর একটি ধারা মুসলমানী সাহিত্য বা কিস্‌সা সাহিত্য। এই ধারায় উপকথা-রূপকথা-জাতীয় কাহিনী প্রাধান্য লাভ করলেও যে এগুলি জীবনরসে সমৃদ্ধ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রচনা-প্রাচুর্য

১৭৬০ খ্রীঃ রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের মৃত্যু এবং ১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশীর যুদ্ধ সমসাময়িক ঘটনা। উক্ত যুগের শেষতম প্রতিনিধিস্থানীয় কবি ভারতচন্দ্র। তাঁর রচনাও পুরাণধর্মী মঙ্গলকাব্য, কিন্তু সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে দেবতা ও ধর্ম এখানে একেবারেই উপলক্ষ্য,

কবির দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ। বস্তুত তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মধ্যযুগের সমাপ্তি ঘটে।

(২ক) যুগসন্ধিকাল ঃ পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে সিপাহী-বিদ্রোহ পর্যন্ত শতাব্দীকালকে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে আর এক বন্ধ্যাকাল বলে উল্লেখ করা হয়। এটিও একটি 'যুগসন্ধিকাল'। এই শতবর্ষকালে বাঙলার সমাজজীবন এবং জনজীবন একদিকে যেমন দুঃশাসন ও নৈরাশ্যের ভারে পীড়িত, অন্যদিকে তেমনি উষালগ্নের আবির্ভাব-সম্ভাবনায় ইঙ্গিতময়। ইংরেজ বণিক কোম্পানীর স্বেচ্ছাচারিতা ও শোষণস্পৃহা একদিকে যেমন বাঙালীর শান্তি সমৃদ্ধিকে বিনষ্ট ক'রে বাঙালী-মানসকে সাহিত্যসৃষ্টির প্রতিকূল ক'রে তুলেছিল, তেমনি অপরদিকে ইংরেজী সাহিত্যের সংস্পর্শে আসবার ফলে বাঙালীর জীবনে নতুন আশার আলোকরেখাও ফুটে উঠছিল। এই কালেই শ্রীরামপুরে মিশন, মুদ্রণালয় ও কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮০০ খ্রীঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হ'বার পরই বাঙলায় সর্বপ্রথম গদ্যসাহিত্যের সৃষ্টি সম্ভব হ'য়েছিল, আর হিন্দু কলেজের রিচার্ডসন-ডিরোজিও-র ছাত্রবৃন্দ পাশ্চাত্ত্য ভাবাধারায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে সর্বপ্রথম আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টিতে উদ্যোগী হ'য়েছিলেন। বস্তুত, এই যুগে বাঙলা গদ্যসাহিত্য একেবারে সূতিকাগৃহ থেকে বাল্যাবস্থা পার হয়েছিল। কাব্যের দিক দিয়ে এই যুগ অবশ্যই পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী কোন যুগেরই তুল্য নয়। কবিগান, তর্জা, টপ্পা, খেউর, আখড়াই, হাফ আখড়াই, যাত্রা, প্রভৃতি নিম্নরুচির পরিচায়ক কাব্যধারাই সাধারণ মানুষের রসপিপাসাকে নিবৃত্ত করেছিল। অপরেরা সংস্কৃত, ফারসী এবং সদ্য-আগত ইংরেজী সাহিত্য চর্চাতেই নিযুক্ত ছিলেন।

নবযুগের প্রস্তুতি

৩. আধুনিক যুগ ঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের স্থাপনা এবং মুদ্রণযন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকালকেই বাঙলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের আরম্ভ বলে অভিহিত করা হ'লেও আধুনিক যুগের যথার্থ কাব্যসাহিত্যের সৃষ্টি আরও কিছুটা বিলম্বিত হয়েছিল। সাহিত্যে এই যুগের লক্ষণ বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ উভয় দিকেই প্রকট। বহিরঙ্গের দিক থেকে সমগ্র গদ্যসাহিত্য ও নাট্যসাহিত্য এবং কাব্যসাহিত্য, গীতিকবিতা, মহাকাব্য, সনেট ইত্যাদি বহুবিধ রূপের সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। আর গদ্যেও গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ-আদি কত রূপের প্রকাশ। অন্তরঙ্গ বিচারে দেখা যাবে, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণভাবেই পরবর্তিত হ'য়ে গেছে। দেবতা ও ধর্ম বিদায় নিয়েছে, মানুষ তৎস্থলে আপনাকেই প্রতিষ্ঠা করেছে। মানুষ শুধুই জীবনমুখী নয়, অন্তরমুখী হ'য়ে উঠেছে। বস্তুত, বাঙলা সাহিত্য পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় পুষ্টি লাভ ক'রে যেন নোতুন ভাবেই আত্মপ্রকাশ লাভ করল। আদি ও মধ্যযুগের সঙ্গে এ যুগের সংযোগসূত্র অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ বলেই প্রতীয়মান হয়। এই যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, মধুসূদন, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র-আদি প্রধান।

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, বাঙলা সাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগের মধ্যে কোন দিক দিয়েই সীমারেখা টানা সম্ভব নয় এবং এতদুভয়ের মধ্যে কোন লক্ষণীয় পার্থক্যও নেই।

তাঁদের মতে উভয় যুগকে সম্মিলিতভাবে 'প্রাচীন যুগ' বলে অভিহিত করাই সঙ্গত। সাধারণভাবে আলোচনায় অবশ্য অনেকেই প্রাচীন সাহিত্য বলতে উভয় যুগের সাহিত্যকেই বুঝিয়ে থাকেন।

[দুই] প্রাচীন যুগ ঃ যুগলক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য

বাঙলা সাহিত্যের আদিযুগ ও মধ্যযুগের পার্থক্য শুধুই ভাষাগত — বিষয়, ভাব, দৃষ্টিভঙ্গি কিংবা প্রকরণগত দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে সীমারেখা টানা প্রায় অসম্ভব। তাই যথার্থ বিচারে আদিযুগ ও মধ্যযুগকে প্রাচীন যুগের অন্তর্ভুক্ত করে এর সঙ্গে আধুনিক যুগের পার্থক্য বিধান করা এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই উভয় যুগের বিশিষ্ট লক্ষণসমূহ বিবৃত করা চলে ।

খুব মোটা কথায় প্রাচীন ও আধুনিক যুগের পার্থক্য বোঝাতে গেলে বলতে হয় যে প্রাচীন যুগের সাহিত্য দেবাশ্রয়ী, সামূহিক ও বস্তুনিষ্ঠ; পক্ষান্তরে আধুনিক যুগের সাহিত্য মানবাশ্রিত, একক ব্যক্তিমানসজাত। বাঙলা ভাষায় সাহিত্য রচনার পূর্বে বাঙলার সাহিত্য-রচনার ভাষা ছিল প্রধানতঃ সংস্কৃত এবং স্বল্পপরিমাণ অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ। আমাদের যাবতীয় প্রাচীনতর সাহিত্য অবশ্যই সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল—কিন্তু ধর্মেতর বিষয়েও (Secular) যে সংস্কৃত ভাষায় অতিশয় উৎকৃষ্ট বহু সাহিত্য সৃষ্ট হয়েছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা সেই ঐতিহ্যকে উত্তরাধিকার সূত্রে গ্রহণ করতে পারিনি। ফলতঃ ধর্মেতর সংস্কৃত সাহিত্যে যে উদারতা, সার্বজনীনতা ও মননশীলতা বর্তমান ছিল, আমাদের প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে এর কোনটিই উপস্থিত নেই।

প্রায় সহস্রবর্ষ-পরিব্যাপ্ত এই প্রাচীন যুগের একটা ঐতিহাসিক চিত্রদান করেছেন বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষ। তিনি লিখেছেন ঃ "কৃষক ও কারিগরদের কয়েকটি পরিবার নিয়ে একটি গ্রাম, তারই সংলগ্ন চাষের জমি, চারণ-ভূমি। .... কৃষক যতদিন জমি আবাদ করে এবং তার দেয় রাজস্ব দেয়, ততদিন জমি তার, পুরুষানুক্রমে তার ভোগ করতে বাধা নেই। কারিগর, কারুশিল্পী ও অন্যান্য বৃত্তিজীবী যারা তারা তাদের নিজেদের প্রয়োজন মেটায় এবং তার বদলে উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ তারা পায়। গ্রামের হাট বা সীমানার বাইরে যাবার তাদের দরকার হত না। ... খেয়ে পরে কাজ করে গ্রামের মধ্যেই বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে জীবনের দিনগুলি কেটে যেত। তখন উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা উদ্যম কোনটারই মূল্য ছিল না মানুষের কাছে। তাই পরম নিশ্চিন্তে আমাদের গ্রাম-সমাজ অচল অটল হিমালয়ের মতন সমস্ত ঝড়-ঝঞ্ঝা মাথা পেতে সহ্য করেছে।" বাঙালী জীবনের এই জড়-ধর্মী ভাবালু-প্রধান গতিহীন, উদ্যমহীন চিত্রই সমগ্র প্রাচীন যুগের সাহিত্যে রূপান্তরিত হ'য়েছে। বাঙালীর এই স্বভাবধর্ম, এই মানসিকতা সে উত্তরাধিকার সূত্রে আয়ত্ত করেছে তারই পূর্বপুরুষ বাঙলার আদিপুরুষ প্রাগার্যদের নিকট থেকে। সুপণ্ডিত অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন ঃ "এই হৃদয়াবেগ ও ভাবালুতা যে

প্রাচীন যুগের বাঙালীর ঐতিহাসিক চিত্র

বহুলাংশে আদিম নরগোষ্ঠীর দান তাহা আজিকার সাঁওতাল, শবর প্রভৃতিদের জীবনযাত্রা, পূজানুষ্ঠান, সামাজিক আচার, স্বপ্নকল্পনা, ভয়-ভাবনার দিকে তাকাইলে আর সন্দেহ থাকে না। আর্য ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধ জৈন সাধনাদর্শে এই ঐকান্তিক হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতার এতটা স্থান নাই। সেখানে ইন্দ্রিয়ভাবনা বস্তুসম্পর্কচ্যুত, ভক্তি জ্ঞানানুগ, হৃদয়াবেগ বুদ্ধির অধীন। বস্তুত বাংলার অধ্যাত্ম সাধনার তীব্র আবেগ ও প্রাণবন্ত গতি সনাতন আর্যধর্মে অনুপস্থিত।"

তৎকালীন অবক্ষয়িত বাঙালী জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে প্রাচীন বাঙলা সাহিত্য হ'য়ে উঠেছিল অতিশয় সঙ্কীর্ণ, অনুদার, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং ভাবালুতাগ্রস্ত। দশম থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সুদীর্ঘ কালে পরিব্যাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে কোন বৈচিত্র্য নেই, কোন শতাব্দী-লক্ষণও ফুটে উঠে নি। ঐকালে বাঙলার রাজনৈতিক জীবন বারবার ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হলেও সাহিত্যে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিফলন ঘটেনি। সম্ভবতঃ দীর্ঘ আট শতাব্দীকালে একমাত্র চৈতন্যদেবের আবির্ভাবই সমাজে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার কিছুটা প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় সাহিত্যক্ষেত্রে। আজকের দিনে আমরা চৈতন্যদেবকে যেভাবে যুগন্ধর পুরুষ-রূপে দেখে থাকি, সমসাময়িক কালে কিন্তু ভক্তের চোখে তিনি সেভাবে ধরা পড়েন নি। তিনি ধর্মীয় নেতারূপেই বিবেচিত হ'য়েছিলেন বলে তাঁকে অবলম্বন ক'রে রচিত সাহিত্যও খাঁটি মানবিক সাহিত্যরূপে গড়ে উঠবার অবকাশ পেলো না। ফলতঃ ধর্মীয় সাহিত্যের বাইরে বেরিয়ে আসবার একটা অপূর্ব সুযোগ নষ্ট হ'লো। অতএব শেষ পর্যন্ত প্রাচীন বাঙলা সাহিত্য ধর্মান্ধ, জীবন-বিমুখ এবং ভাবালুতাগ্রস্তই রয়ে গেলো, যেখানে আধুনিক যুগের সাহিত্যে আমরা পাচ্ছি বাস্তবমুখীনতা, জীবন-সচেতনা ও মননশীলতা।

অবক্ষয়িত বাঙালী জীবন ঃ চৈতন্যদেব

প্রাচীন যুগের সাহিত্যের শুরুতে রয়েছে দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যের দ্বারা রচিত 'চর্যাপদ' এবং শেষে রয়েছে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতচন্দ্র-রচিত 'অন্নদামঙ্গল কাব্যে'। চর্যাপদে বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের গুহ্য সাধন-প্রণালী সাংকেতিকভাষায় বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তীকালে রচিত কোন কোন সাহিত্যে অল্প কিছু বৌদ্ধপ্রভাব লক্ষিত হ'লেও বাঙলা ভাষায় অপর কোন বৌদ্ধধর্মীয় সাহিত্যেব সন্ধান পাওয়া যায় না। চর্যাপদের পর দীর্ঘকাল পরে রচিত হ'য়েছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ, মনসা-চণ্ডী-ধর্মঠাকুর প্রভৃতির মাহাত্ম্যসূচক বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, চৈতন্যজীবনী, শাক্ত পদাবলী প্রভৃতি হিন্দু ধর্মীয় সাহিত্য। এ যুগের সর্বশেষ সাহিত্য — ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল কাব্য'। আধুনিক কালের যুগলক্ষণ (প্রায় সমকালীন ঐতিহাসিক কাহিনী) অনেকাংশে পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠা সত্ত্বেও এটিতে অন্নদা-মাহাত্ম্য প্রক্ষেপ করতে হয়েছে এবং এর লৌকিক অংশ বিদ্যাসুন্দরেও কালিকা-মাহাত্ম্য স্থাপন করতে হ'য়েছে। সমগ্র প্রাচীন যুগের সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে যে দুটি শাখা দৈবী-প্রভাবমুক্ত এবং আধুনিক জীবন-লক্ষণে সমৃদ্ধ, তা চিরকাল সুধীজনের দৃষ্টির বাইরে

মধ্যযুগের কাব্য পবিচয

থেকে গেছে—এ দুটি 'লৌকিক সাহিত্য'-ভুক্ত শাখা, 'পল্লীগীতিকা' ও 'কিস্‌সা সাহিত্য'। পক্ষান্তরে এ কালের সাহিত্যে মানুষ দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে উঠে দেবতাকে আসনচ্যুত করেছে। আধুনিক যুগের যে সাহিত্যসৃষ্টিতে আধুনিকতার লক্ষণ সর্বভাবে প্রকটিত সেই 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র রাক্ষসরাজ রাবণই নায়ক, অবতার-শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র আমাদের চোখে কৃপার পাত্র।

সামূহিকতা প্রাচীন সাহিত্যের অপর বিশিষ্ট লক্ষণ। অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্য অতি সঙ্গতভাবেই এই সামূহিক সাহিত্যকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—(ক) সভাসাহিত্য, (খ) গোষ্ঠীসাহিত্য এবং (গ) জনসাহিত্য। এদের মধ্যে সভাসাহিত্য ছিল ভূস্বামী এবং সভাসদ্‌দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এতে ঠাঁই পেয়েছেন পৌরাণিক দেবতারা। রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ ও অন্নদামঙ্গলকে এই ধারার অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

সামূহিকতা

গোষ্ঠীসাহিত্য বিশেষ বিশেষ ধর্মীয়-সম্প্রদায় দ্বারা ছিল নিয়ন্ত্রিত। সম্প্রদায় বিশেষের ইষ্টদেবতাই এ কাব্যসমূহের অধিদেবতা। গোষ্ঠীসাহিত্যের দুটি ধারা — সাধনাসঙ্গীত ও প্রচার সাহিত্য। চর্যাপদ, বৈষ্ণবপদ, শাক্তপদ ও বাউলগানকে 'সাধনাসঙ্গীত' এবং 'চৈতন্যমহাপ্রভু' ও তাঁর অনুগামীদের 'জীবনীগ্রন্থ' আর বৈষ্ণবতত্ত্ব সাহিত্যকে 'প্রচার সাহিত্য-রূপে' গ্রহণ করা চলে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা চলে, সাধনাসঙ্গীতগুলি গোষ্ঠীসাহিত্য হওয়া সত্ত্বেও এদের অন্তরালে যে উদার মানবিকতার স্রোত প্রবাহিত হয়েছে, তা' কিন্তু সম্প্রদায়-নির্বিশেষে যে কোন পাঠকের প্রাণেই রসের উদ্বোধন ঘটাতে সক্ষম। ভাব-ভাষা-কল্পনায় এগুলি গীতিকবিতারই অন্তর্ভুক্ত, অধিকাংশই রোমান্টিক, কিছু বা মিস্টিক।

গোষ্ঠীসাহিত্যে গীতিকাব্য

'জনসাহিত্যে' গ্রামদেবতার প্রাধান্য, কিন্তু এগুলি গোষ্ঠীসাহিত্যের বিপরীত কোটিতে অবস্থিত। ঐতিহাসিকতায় আস্থাশীল বারোয়ারি জনতার মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে তত্ত্ববর্জিত এ জাতীয় কাব্যে কাহিনীই প্রধান স্থান অধিকার করে। এক সময় এতে কিছু রূপ-রূপান্তর থাকলেও শেষ পর্যন্ত এগুলি লৌকিক পাঁচালীতেই পরিণতি লাভ করে। আদি পাঁচালী কালে মঙ্গলকাব্যে রূপায়িত হয়। বস্তুতঃ বহুশাখায় বিভক্ত মঙ্গলকাব্যগুলিই জনসাহিত্যের সার্থক প্রতিনিধি। এই ধারাই অর্বাচীন রূপ 'খেউড়, ঝুঁমুর, পাঁচালী'তে পরিণত হ'য়েছে।

জনসাহিত্য

আধুনিক যুগের সাহিত্য একান্তভাবেই ব্যক্তি-সাহিত্য—এর প্রধান লক্ষণ ঐহিকতা, মানবিকতা ও মননশীলতা। অনেকের ধারণা—ইংরেজ শাসন তথা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠাই বাঙলা সাহিত্যে আধুনিকতার জন্মদান করেছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেএ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে বাঙলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর কাব্যে', 'ময়মনসিংহ গীতিকা'য়,'শাক্ত পদাবলীতে'তেএবং 'নিধুবাবুর টপ্পা'য় জীবনধর্মিতা ও

আধুনিকতার লক্ষণ

মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। মননশীলতা কখনও অনুকরণলভ্য হ'তে পারে না। তবে এ কথাও স্বীকার্য, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা বাঙলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের শৈশব অবস্থাকে অতি দ্রুত যৌবনে উত্তীর্ণ করতে অনেকখানি সহায়তা দান করেছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজেই বাঙলা গদ্যসাহিত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলতঃ যুক্তিবাদী, জীবনধর্মী মননশীল সাহিত্যের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। কাব্যসাহিত্যে এই দৃষ্টিভঙ্গির আবির্ভাব কিছুটা বিলম্বিত হ'য়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল এবং মধুসূদনের কাব্যেই আধুনিকতার যুগলক্ষণ সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠে। বাঙলা সাহিত্য এদের হাতে পড়েই দেবতাবর্জিত ঐহিক ও মানবিক গুণে সম্পন্নতা লাভ করে। সভাসাহিত্য, গোষ্ঠীসাহিত্য এবং জনসাহিত্যের ধারাবাহিকতা এখানে এসেই খণ্ডিত হয়, পরিবর্তে ব্যক্তি-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে। ঐতিহ্যাশ্রিত পৌরাণিক কাহিনী এ কালের সাহিত্যে গৃহীত হ'লেও এদের প্রাচীন মূল্যবোধ বর্জিত হয় এবং নোতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষাপটে এদের নোতুন মানবিক মূল্যায়ন ঘটে।

অধ্যায় ঃ তিন বাঙালীর সাহিত্য সাধনা ঃ প্রাক্-প্রস্তুতি

[এক] গৌড়বঙ্গের ঐতিহাসিক পরিচয় ও সাহিত্যসাধনা

বর্তমান বাঙলাদেশের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত ভগ্ন শিলালিপি থেকে অনুমিত হয়, মৌর্য যুগেই সম্ভবতঃ সারা বাঙলায় মৌর্য-অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এর সমর্থক অপর কোন প্রমাণ অবশ্য এখনো পর্যন্ত কিছু পাওয়া যায় নি। অতঃপর 'গৌড়ভুজঙ্গ' শশাঙ্কই প্রকৃতপক্ষে গৌড়বঙ্গকে ভারতের বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনিও কোন উত্তরাধিকার প্রকৃতপক্ষে রেখে যেতে পারেন নি। এর পূর্বে অবশ্য খ্রীঃ তৃতীয় - চতুর্থ শতাব্দীকাল থেকে গৌড়-বাঙলার বুকে বিচ্ছিন্নভাবে গুপ্তসম্রাটগণ দীর্ঘকাল তাঁদের অধিকার বজায় রাখলেও এখানে স্থায়ী কোন পরিচয় রেখে যেতে পারেন নি, এমন কি তখনো জাতি-রূপে বাঙালী গড়ে উঠতে পারেনি। একমাত্র শুশুনিয়া পাহাড়ে প্রাপ্ত গুপ্তযুগের একটি লিপিই গুপ্ত শাসনের স্মারকচিহ্ন। মহারাজ শশাঙ্কের (সপ্তম শতাব্দী) পর বেশ কিছুকাল গৌড়বঙ্গের বুকে মাৎস্যন্যায় চলবার পর খ্রীঃ অষ্টম শতকে গোপালদেবের কাল থেকে যথাৰ্থভাবে বাঙলাদেশে পাল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠায় বাঙালী একটি জাতিরূপে সংহতি লাভ করে। ভাষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে উত্তরাধিকার সে প্রাপ্ত হ'লো, তা অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ। সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতেপ্রাচীন যুগের সংস্কৃত দৈনন্দিন ব্যবহারে অচল, মধ্যযুগের প্রাকৃতও তার অন্তিম দশায় উপনীত, অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ ভাষারই আঞ্চলিক রূপভেদ তখন দৈনন্দিন জীবনের বাগ্‌ব্যবহারে নিয়োজিত। হয়তো গৌড়বঙ্গে এই রূপভেদেই 'গৌড়ীভাষা' নামে প্রচলিত ছিল। কারণ এরও পূর্বে দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শে' পাওয়া যাচ্ছে, অপরাপর প্রাকৃতের সঙ্গে 'গৌড়ী' প্রাকৃতেরও উল্লেখ — 'শৌরসেনী চ গৌড়ী চ লাটী চান্যা চ তাদৃশী'।

বাঙালী জাতির উদ্ভব

শশাঙ্কদেবের দৌলতে গৌড়বঙ্গ যে সীমাতিশয়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তা' ইতিহাস-সমর্থিত, এমন কি তৎপূর্বেই, সম্ভবতঃ সংস্কৃত সাহিত্যে বিশিষ্টতার জন্য গৌড়বঙ্গীয়দের রচনা 'গৌড়ীয় রীতি' নামে আখ্যাত হ'তো। সুপণ্ডিত ঐতিহাসিক ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন ঃ "এই গৌড়ী রীতির উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস প্রাচীন বাঙলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিক হইতে গভীর অর্থবহ।....ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি

গৌড়ের বৈশিষ্ট্য

হইতেই গৌড়জনেরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন হইতে আরম্ভ করেন...মধ্যভারতীয় রাষ্ট্রীয় প্রভাব হইতে মুক্ত, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রই হইয়া উঠিল গৌড়তন্ত্রের রাষ্ট্রাদর্শ। সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এই গৌড়তন্ত্র রূপলাভ করিল গৌড়ী রীতিতে—সর্বভারতীয় বৈদর্ভী রীতিকে অস্বীকার করিয়া, তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন স্বতন্ত্র রীতির উদ্ভবে ও বিকাশে।" কিন্তু তখনো তারা 'বাঙালী-সত্তা' লাভ করতে পারেনি।

যথার্থ বাঙালী জাতি-রূপে গৌড়-বঙ্গের অধিবাসীরা সংহত হ'য়ে উঠেছিল সম্ভবতঃ খ্রীঃ অষ্টম শতকে পাল রাজবংশীয়দের কাল থেকেই। পালরাজগণ ধর্মে বৌদ্ধ হ'লেও তখনো পর্যন্ত বিভিন্ন শাস্ত্রীয় রাজকীয় কাজকর্ম নির্বাহিত হ'তো সম্ভবতঃ সংস্কৃত ভাষাতেই। কারণ তৎকালের যতখানি বস্তুনিদর্শন একাল পর্যন্ত এসে পৌঁচেছে তা' থেকে এই অনুমানই সমর্থিত হয়। পরবর্তী সেনরাজগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মানুগামী — অতএব তাদেরও রাজকীয় ক্রিয়াকর্ম সাধনের ভাষা ছিল সংস্কৃত। ফলতঃ খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীকাল পর্যন্ত যে বৌদ্ধ-হিন্দু শাসকদের যুগ, সেই যুগটিই বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের আদিযুগের ব্যাপ্তিকাল। যখন রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে সংস্কৃত ভাষার উপর, দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য-সংস্কৃতির সামগ্রিক ভারও বহন করে আসছে এতকাল অবধি ঐ সংস্কৃত ভাষাই, তখন পণ্ডিতবর্গ এবং কবিরাও যে স্বভাবতঃই সংস্কৃত ভাষাতে সাহিত্য-রচনায় উদ্বুদ্ধ হ'বেন, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

সংস্কৃত প্রাধান্য

সত্য বটে, বাগ্-ব্যবহারে দীর্ঘকাল পূর্ব থেকেই দেশের অধিবাসীরা আঞ্চলিক প্রাকৃত এবং পরবর্তীকালে অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ ভাষাতেই অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু তৎকালে সমগ্র দেশেই শিক্ষিতের হার ছিল অতিশয় সীমিত, তাই যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি সাহিত্যচর্চা করতেন, তারা ছিলেন সমাজের উচ্চস্তরের শিক্ষিত ব্যক্তি। তারা স্বভাবতঃই ঐতিহ্য-পূত মার্জিত সংস্কৃত ভাষার (সম্ভবতঃ তখনও সমাজে একালের মত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেনি) কিছু লোক, ক্বচিৎ বা নিম্নশ্রেণীরও কেউ মাতৃভাষা প্রাকৃত অপভ্রংশের দ্বারস্থ হতেন। তাই প্রাকৃত-অপভ্রংশ ভাষায় রচিত সাহিত্য তো প্রায় নেই বল্লেই চলে। যদি বা বাঙালী দ্বারা রচিত সামান্য কিছু সাহিত্যিক রচনার নিদর্শন রয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়, কিন্তু বাঙলা ভাষার জননী-স্বরূপা কোন প্রাকৃত-অপভ্রংশের কোন নিদর্শন আজও পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ ভাষাবিজ্ঞানী পণ্ডিতগণ যে অনুমান করেন, মাগধী প্রাকৃত ও তদুদ্ভূত মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ ভাষা থেকে বাঙলা ভাষা উদ্ভূত, সেই মূলভাষায় রচিত কোন গ্রন্থের বা রচনার সন্ধান আজও পাওয়া যায়নি। মাগধী প্রাকৃতের একমাত্র নিদর্শন পাওয়া যায় সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন নাটকের কিছু নিম্ন শ্রেণীর অশিক্ষিত পুরুষের বাগ্-ব্যবহারে, তার বাইরে কোথাও নেই। কিন্তু সেই মাগধী প্রাকৃতও আবার নাকি একটা কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা। অতএব বাঙলা সাহিত্যের আদিযুগে বাঙালীর সাহিত্য সাধনার কথা বলতে গেলে প্রথমে অবশ্যই আসবে সংস্কৃত সাহিত্যের কথা।

মাগধী প্রাকৃত

[দুই] বাঙালীর সংস্কৃত সাহিত্য-চর্চা

বাঙলা ভাষার জন্ম হয় ন্যূনাধিক হাজার বছর আগে। তার আগে এবং পরেও অনেকদিন পর্যন্ত বাঙালীর সাহিত্যচর্চার অন্যতম ভাষা ছিল সংস্কৃত এবং কচিৎ কখনো বা প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ। অবশ্য সেই অবহট্‌ঠ ছিল উত্তর ভারতের 'শৌরসেনী অবহট্‌ঠ'। তবে প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ ভাষায় রচিত বাঙালীর সাহিতকীর্তির কোন নিশ্চিত এবং উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায় না। সহজিয়াপন্থী বৌদ্ধগণ তখন সদ্য-সৃষ্ট বাঙলা ভাষায় চর্যাপদ রচনা করলেও তখন পর্যন্ত শিষ্টজনের স্বীকৃত সাহিত্যের ভাষা ছিল অবহট্‌ঠ। তাই দেখা যায় সরহ্‌-আদি কোন কোন সিদ্ধাচার্য বাঙলা ভাষায় চর্যাপদ রচনা করলেও আবার তৎ-কাল-প্রচলিত অবহট্‌ঠ ভাষায় বেশ কিছু দোহা রচনা করেছেন। এর কিছু কাল পর মৈথিল কবি বিদ্যাপতি অবহট্‌ঠ ভাষায় 'কীর্তিলতা' রচনা প্রসঙ্গে যে উক্তিটি করেছেন, তার মধ্য দিয়ে সমসাময়িক বাঙালী-মানসিকতার পরিচয়টিও সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি লিখেছেন,

> 'সক্কঅ বাণী বুহজন ভাবই।
> পাউঅ রসকো মম্ম ন পাবই।।
> দেসিল বঅন সবসন মিট্‌ঠা।
> তেঁ তৈঁসন জম্পঞি অবহট্‌ঠা।।'

অর্থাৎ – 'সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিতগণ চিন্তা করেন, প্রাকৃত রসেরও মর্ম পাওয়া যায় না। দেশীয় বচনই সবচেয়ে মিষ্ট, তাই অবহট্‌ঠ ভাষাতে জল্পনা করছি।'

প্রাকৃত ভাষায় রচিত কিছু প্রকীর্ণ শ্লোকের সঙ্কলন 'গাহাসত্তসঈ' (গাথাসপ্তশতী) এবং ছন্দোগ্রন্থ 'প্রাকৃতপৈঙ্গলে'ও এমন কিছু শ্লোকের সন্ধান পাওয়া যায়, যাতে সমসাময়িক বাঙালী-জীবন ফুটে উঠেছে বলে অনুমান করা চলে—অতএব এগুলি বাঙালীর রচিত, এ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক না হওয়াই সম্ভব। যেমন –

> 'ওগ্‌গর ভত্তা রম্ভঅ পত্তা
> গাইক ঘিত্তা দুদ্ধসজুত্তা।
> মোঅলি মচ্ছা নালিচ গচ্ছা
> দিজ্জই কন্তা খা পুনবন্তা।'

অর্থাৎ—'ওগরা ভাত (হাঁড়ি থেকে উদ্‌গীর্ণ), কলাপাতায় গাওয়া ঘি ও দুগ্ধ-সংযুক্ত এবং মৌরলা মাছ ও নালিতা গাছ (পাট শাক) যদি কান্তা পরিবেষণ করে, তবে যে খায় সে পুণ্যবান্‌।'

বাঙলাদেশের বাইরে এ জাতীয় পদ রচিত হয়েছিল বলে কল্পনা করা যায় না।

ব্রাহ্মণ্যধর্মাশ্রিত সমাজে সংস্কৃত ভাষায় শাস্ত্র এবং সাহিত্যালোচনা সমগ্র দেশেই চিরকাল প্রশস্ত বিবেচিত হ'তো। এমন কি যখন দেশজ ভাষাসমূহও ভাবপ্রকাশের উপযোগী হ'য়ে উঠলো তখন যাতে তা' সংস্কৃত ভাষার প্রতিযোগী হ'য়ে উঠতে না পারে, তার জন্য

শাস্ত্রকারগণ অনুশাসন রচনা করলেন—

'অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতাণি চ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।।'

অর্থাৎ—'অষ্টাদশ পুরাণ বা রামচরিতাদি গ্রন্থ যদি কেউ ভাষায় (দেশজ ভাষায়) শোনে, তবে তাকে রৌরব নরকে যেতে হ'বে।'

এই অনুশাসনের পর ধর্মভীরু জনসাধারণের পক্ষে মাতৃভাষার সাহিত্য রচনার উদ্যোগ গ্রহণ খুব সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে সকল দুঃসাহসী এই নিষেধবাণী অমান্য ক'রে ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছিলেন, সম্ভবতঃ তাদের উপলক্ষ্য ক'রেই এই প্রবাদবাক্য-তুল্য কটূক্তি রচিত হ'য়েছিল — 'কৃত্তিবেসে কাশীদেসে আর বামুন ঘেষে—এ তিন সর্বনেশে।'

অতএব আবহমানকাল বাঙালী সংস্কৃত ভাষায়ও সাহিত্য সৃষ্টি করে এসেছেন—এ কথা অনুমান করা চলে। তবে এ দেশের প্রাচীনতর সাহিত্য রচনার নিদর্শনসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রত্নলিপি ও ভূমিদানপত্র এবং প্রশস্তি রচনাতে নিবদ্ধ ছিল। সমুদ্রগুপ্তের শাসনকালে শুশুনিয়া পাহাড়ে খোদাই-করা চন্দ্রবর্মার লিপিটিই সংস্কৃত ভাষায় রচিত বাঙালীর প্রাচীনতম কীর্তি বলে মনে করা যেতে পারে। এরপর বিভিন্ন গুপ্ত সম্রাটের শাসনকালে রচিত অনেকগুলি ভূমিদানপত্রে সংস্কৃত রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়। গৌড়-ভুজঙ্গ শশাঙ্কের সমকালীন ভাস্করবর্মার সভাকবিও গদ্য রচনায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

বাঙলাদেশে পাল বংশের রাজত্বকাল থেকে দেখা যায় যে ভূমিদানপত্রের প্রারম্ভে রাজবংশের প্রশস্তি রচনা করা হ'তো। ডঃ সুকুমার সেনের ভাষায়, "বাঙলাদেশে শিষ্ট সাহিত্য সৃষ্টির ইতিহাস এ প্রশস্তি হইতে শুরু হইয়াছে।" এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে খ্রীঃ সপ্তম শতকের পূর্ব থেকেই সাহিত্যসৃষ্টির একটি রীতিকে গৌড়ীরীতি বলে উল্লেখ করা হ'য়েছে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য 'অক্ষর ডম্বর'। বাণভট্ট, বামন, দণ্ডী, রাজশেখর, বিশ্বনাথ প্রভৃতি সকলেই গৌড়ী-রীতির কথা বলেছেন, কিন্তু বাঙলাদেশে রচিত খুব অল্প পরিমাণ সাহিত্যেই এর প্রয়োগ ঘটেছে বলে মনে হয়। কোন কোন প্রশস্তি রচনায় সজ্ঞান সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস লক্ষিত হয় এবং তাদের কোথাও কোথাও গৌড়ী-রীতির নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়।

খালিমপুর অনুশাসনে পাল বংশের রাজ্যপ্রাপ্তির ইতিহাস জানা যায়। পালরাজাদের শাসনগুলিতে যেমন 'বুদ্ধবন্দনা' স্থান পেয়েছে, সেনরাজাদের শাসনে তেমনি 'শিববন্দনা'র পরিচয় পাওয়া যায়, এগুলি অধিকন্তু সাহিত্যগুণোপেত। কোন কোন শিব-স্তুতিতে শিবের 'অর্ধনারীশ্বর' মূর্তির, কোথাও বা বাৎসল্যের অনুপম চিত্র ফুটেউঠেছে। বাঙলা মঙ্গলকাব্যে দেবাদিদেব মহাদেবের যে গৃহস্থ রূপের পরিচয় পাওয়া যায়, তারই পূর্বাভাষ রয়েছে।

কতকগুলি প্রত্নলিপিকে 'প্রশস্তিকাব্য' বলেই অভিহিত করা সঙ্গত। নারায়ণপালের মন্ত্রী ভট্ট গুরবমিশ্র-প্রতিষ্ঠিত গরুড়স্তম্ভের প্রশস্তিটি প্রকৃতপক্ষে একটি আটাশ শ্লোকযুক্ত খণ্ডকাব্য। মহামন্ত্রী বৈদ্যদেবের মনোরথ-রচিত প্রশস্তিকাব্যটিও প্রশংসার্হ। ভুবনেশ্বরের অনন্তবাসুদেব মন্দিরে বাঙালী মনীষী 'বালবলভী ভুজঙ্গ' ভট্ট ভবদেবের কবি বাচস্পতি-রচিত প্রশস্তিতে

উত্তম কাব্যগুণের পরিচয় পাওয়া যায়। সভাকবি উমাপতিধরের লিখিত বিজয়সেনের প্রশস্তিবাচক 'খণ্ডকাব্য'ও এ জাতীয় একটি উল্লেখযোগ্য রচনা।

এ সমস্ত তাম্রশাসন বা প্রশস্তিলিপির প্রসঙ্গ বাদ দিলে আমরা প্রাচীন বাঙলায় সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন শাস্ত্র সংহিতা, অভিধান, আয়ুর্বেদ বা ব্যাকরণ-আদির সন্ধান পেলেও সচেতন সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াসরূপে উৎকৃষ্ট রসসাহিত্যের বিশেষ নিদর্শন খুঁজে পাইনে। সমকালীন বাঙলীর জ্ঞানচর্চার তথা পাণ্ডিত্যের প্রতি সমধিক আগ্রহই এ থেকে প্রমাণিত হয়। হয়তো তাদের ততখানি রসপিপাসা ছিল না। যে নিদর্শনসমূহকে আমরা বাঙালী কবির প্রতিভাজাত সৃষ্টি বলে উল্লাস বোধ ক'রে থাকি, তাঁদের অনেকেরই বাঙালীত্বের প্রামাণিকতা সন্দেহাতীত নয়।

কিছু লোকশ্রুতি, চর্যাপদের উল্লেখ প্রভৃতি থেকে প্রাচীন বঙ্গে নাট্যাভিনয় এবং নাট্যসাহিত্যের বিদ্যমানতা সম্ভব বলেই মনে হয়। এই সম্ভাবনা থেকে অনুমান করা হয় যে বিশাখদত্ত-রচিত

বাঙালী-রচিত সংস্কৃত নাটক

'মুদ্রারাক্ষস' ভট্টনারায়ণ-রচিত 'বেণীসংহার', মুরারি-রচিত 'অনর্ঘ-রাঘব' এবং ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ডকৌশিক' বাঙলাদেশে অথবা বাঙালী-রচিত সাহিত্যের নিদর্শন। এঁদের মধ্যে ভট্টনারায়ণকে প্রাচীন ঐতিহ্যক্রমে বাঙালী বলে মনে করা হয়। কান্যকুব্জ থেকে আদিশূর-আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের একজনের নাম ছিল 'ভট্টনারায়ণ'। এটি লোকবিশ্বাস মাত্র, এখনও ইতিহাসের স্বীকৃতি পায়নি। বৈদিক ব্রাহ্মণদের একজন আদিপুরুষ মুরারির সঙ্গে সম্ভবতঃ নর্মদা-তীরবর্তী কোন মুরারির নামসাদৃশ্যহেতু বিভ্রাট ঘটে থাকবে। 'চণ্ডকৌশিক' নাটকের প্রস্তাবনায় মহীপালের নাম থাকাতেই ক্ষেমীশ্বরকে বাঙালী বলে অনুমান করা হয়, কিন্তু এই মহীপাল ছিলেন গুর্জর প্রতীহারের রাজা, অতএব ক্ষেমীশ্বরের বাঙালীত্বের দাবিও অচল।

প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যকারদের মধ্যে 'রামচরিত' নামক রামায়ণ-বিষয়ক কাব্যপ্রণেতা অভিনন্দ দেবপালের সভাকবি ছিলেন। 'নৈষধচরিত' নামক মহাকাব্য-প্রণেতা শ্রীহর্ষ বাঙালী

সংস্কৃতি কাব্য

ছিলেন—এরূপ অনুমানের স্বপক্ষে বিশেষ যুক্তি না থাকলে ও কুলজীশাস্ত্রমতে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণবংশীয় মেধাতিথির পুত্র শ্রীহর্ষের নামসাদৃশ্য-হেতু এই বিভ্রাট ঘটে থাকতে পারে। নীতিবর্মার 'কীচকবধ' নামক অলঙ্কার-বহুল ক্ষুদ্র কাব্যটির সব ক'টি প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিই বঙ্গাক্ষরে লিখিত বলে কবি বাঙলাদেশেরই অধিবাসী ছিলেন বলে অনুমিত হয়। পাল বংশের রামপালদেব এবং তৎপুত্র মদনপালদেব রাজনৈতিক জীবনকে কেন্দ্র ক'রে পৌণ্ড্রবর্ধনবাসী 'কলিকালবাল্মীকি' সন্ধ্যাকর নন্দী যে দ্ব্যর্থবোধক শ্লিষ্টকাব্য 'রামচরিত' রচনা করেন, সেটিকে আমরা নিঃসন্দেহে বাঙালী-রচিত সংস্কৃত সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করতে পারি।

বাঙলা সাহিত্যের আদিযুগে যে পঞ্চকবিপ্রতিভার আলোকে গৌড়বঙ্গের শেষ স্বাধীন সম্রাট লক্ষ্মণসেনের রাজসভাকে উজ্জ্বল ক'রে বাঙলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোকশিখা

তুলে ধরেছিলেন, তাঁরা হলেন—উমাপতিধর, শরণ, ধোয়ী, গোবর্ধন আচার্য ও জয়দেব। স্বয়ং জয়দেব তাঁর 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে বন্ধুচতুষ্টয়ের নাম উল্লেখ করেছেন। উমাপতি সেনবংশের বিজয়সেন, বল্লালসেন এবং লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে যুক্ত থেকে থাকতে পারেন। তাঁর কোন গ্রন্থ না পাওয়া গেলেও 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামক সঙ্কলন গ্রন্থে তাঁর রচিত প্রায় শতখানেক শ্লোক পাওয়া যায়। তা ছাড়া কোন কোন প্রশস্তিলিপিও বিশেষত বিজয়সেনের প্রশস্তিবাচক লিপিটি তাঁর রচিত বলে জানা যায়। শরণের রচিত কোন কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না, তবে 'সদুক্তিকর্ণামৃত' এবং অপর কোন কোন সঙ্কলন-গ্রন্থে তাঁর নামাঙ্কিত অল্পসংখ্যক শ্লোকের সন্ধান পাওয়া যায় —এ থেকে তাঁর প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

লক্ষ্মণসেনের রাজসভা

এই পর্বে রচিত বেশ কিছু প্রকীর্ণ সরস সংস্কৃত প্রাকৃত অপভ্রংশ অবহট্‌ঠ শ্লোক এবং তাদের সঙ্কলন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এ জাতীয় বিচ্ছিন্ন শ্লোকগুলিতে কোন আখ্যান উপাখ্যান বা নীতিকথার সমাবেশ নেই, রয়েছে কাব্যশ্রীমণ্ডিত সরস প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র জীবনলীলা প্রভৃতির অনুপম বর্ণনা বা চিত্র। সংস্কৃত এবং বিভিন্ন স্তরের প্রাকৃত ভাষায় রচিত প্রকীর্ণ শ্লোকগুলির বেশ কিছু পরিমাণে যে বাঙালী কবিদের দ্বারা রচিত, তা' প্রসঙ্গ, বিষয়বস্তু বা কবিদের নাম-পরিচয় থেকেই অনুমান করা যায়। প্রাপ্ত এরূপ কয়েকটি সংকলন গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয়'। গ্রন্থটির সঙ্কলন-কাল আঃ খ্রীঃ একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী, অতএব শ্লোকগুলির রচনাকাল আরও পূর্ববর্তী। অনুমান, এটিই সংস্কৃত প্রাচীন শ্লোকের প্রাচীনতম সঙ্কলন। গ্রন্থটির প্রথম সম্পাদক গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে— 'কবীন্দ্রবচনানি' শব্দগুচ্ছ থেকে সঙ্কলনের নামকরণ করেন, কারণ প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে লিখিত পাণ্ডুলিপিটি খণ্ডিত থাকায় গ্রন্থনামটি পাওয়া যায়নি। পরবর্তী সংস্করণকর্তা বলেন, মূল গ্রন্থের নাম 'সুভাষিত রত্নকোষ'। গ্রন্থটির সঙ্কলিয়তা সম্ভবতঃ ছিলেন বৌদ্ধ, নাম বিদ্যাকর। গ্রন্থে ১১১ জন কবির নাম এবং ৫২৫টি শ্লোকের সন্ধান পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ 'অনুমান করেন, যে সকল কবির নামের পাশে 'ওক' যুক্ত আছে, তারা হয়তো বাঙালী ছিলেন, যেমন ডিম্বোক, সিদ্ধোক, ললিতোক, বিতোক, বৈদ্দোক, প্রভৃতি। এ ছাড়াও গৌড় অভিনন্দ, ধর্মকর, শুভঙ্কর, বুদ্ধকরগুপ্ত, কুমুদাকরমতি, বিনয়দেব, শ্রীধর নন্দী, অপরাজিত রক্ষিত, মধুশীল, বীর্যমিত্র, বৈদ্যধন্য প্রভৃতি বাঙালী ছিলেন বলে অনুমিত হয়। গ্রন্থে যে সব কবির শ্লোক গৃহীত হ'য়েছে, তাঁদের অনেকেই শ্রুতকীর্তি, তাদের অনেকেই গ্রন্থকারও ছিলেন। আবার বহু কবির রচনা অন্যত্র দুর্লভ। গ্রন্থের বহু শ্লোকে বাঙলার প্রকৃতি এবং বাঙালীর জীবনযাত্রার পরিচয় ও বৈষ্ণব কাব্যে বর্ণিত ব্রজলীলার পূর্বাভাষ পাওয়া যায়। এ থেকেও বাঙালী লেখকের উপস্থিতি অনুমিত হয়।

'কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয়'

'সদুক্তিকর্ণামৃত'ই এ পর্যন্ত জ্ঞাত সর্ববৃহৎ সঙ্কলন গ্রন্থ। গ্রন্থ-সঙ্কলক শ্রীধর দাস ১২০৬-০৭ খ্রীঃ গ্রন্থটি সঙ্কলন করেন। তিনি ছিলেন লক্ষ্মণসেনের প্রতিরাজ এবং বন্ধুস্থানীয় বটুদাসের পুত্র এবং স্বয়ং ছিলেন 'মহামাণ্ডলিক'। গ্রন্থে প্রাপ্ত শ্লোকের সংখ্যা দু'হাজার

তিন শতকের অধিক এবং কবির সংখ্যা ৪৮৫ জন। গ্রন্থটি পাঁচটি 'প্রবাহে' বিভক্ত — প্রতিটি প্রবাহ বিষয়ানুগামী — প্রথম প্রবাহ 'দেব-লীলা'। দ্বিতীয় 'প্রেম ও প্রকৃতি' বিষয়ক, তৃতীয় চাটু বা রাজবৃত্ত ও যুদ্ধাদি বর্ণনা, চতুর্থ গার্হস্থ্যজীবন এবং পঞ্চম উচ্চাবচ, অর্থাৎ বিবিধ-বিষয়ক। প্রবাহগুলি আবার 'বীচি' বা 'তরঙ্গে' বিভক্ত, বীচিগুলিতে আবার ৫টি করে শ্লোক আছে। কবিদের অনেকেই ছিলেন রাজপুরুষ। এমন কি স্বয়ং লক্ষ্মণসেন, কেশবসেন, যুবরাজ দিবাকর প্রভৃতি, খ্যাত-কীর্তি কবি উমাপতিধর, ধোয়ী, গোবর্ধন আচার্য, নট গাঙ্গে াক ইত্যাদিও রয়েছেন। কবিদের অনেকেই যে বাঙালী ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁদের নাম, উপাধি-বাচক গাঞি এবং কাব্যের আভ্যন্তর লক্ষণ থেকে ঃ এঁদের মধ্য রয়েছেন ভবগ্রামীয় বাথোক, তৈলবাটীয় গাঙ্গোক, কেশররোণীয় নাথোক, শকটীয় শবর, করঞ্জ, ধনঞ্জয় প্রভৃতি। এ ছাড়াও গুপ্ত, ঘোষ, দত্ত, নন্দী, পাল, চন্দ্র প্রভৃতি পদবীধারীদেরও সাধারণভাবে বাঙালী বলে মেনে নিতে হয়। শ্লোকের বিষয়বস্তুর বিচারেও বেতাল, বিরিঞ্চি, উদয়াদিত্য প্রভৃতি অনেক কবিকেই বাঙালী বলে মনে করবার কারণ রয়েছে। কবিদের অনেকেই বৌদ্ধ ছিলেন আর ছিলেন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, এমন কি কেওট, নট প্রভৃতিও। কবিদের একজনের নামই ছিল 'বঙ্গাল'। তাঁর একটি শ্লোকে পাওয়া যাচ্ছে—

'ঘনরসময়ী গভীরা বক্রিম সুভগোপজীবিতা কবিভিঃ।
অবাগাঢ়া চ পুনীতে গঙ্গা-বঙ্গালবাণী চ।।'

এর তাৎপর্য এই — 'কাঁধে বাঁকে নিয়ে আসা গঙ্গাজলের মতোই কবিদের দ্বারা অনুশীলিত ঘনরসময়ী, গভীরা এবং বক্রোক্তিশোভিত বঙ্গাল-বাণীতে স্নান করলে পুণ্য হয়।' এখানে বঙ্গাল-বাণী শব্দের অর্থ, 'বঙ্গাল নামক কবি-রচিত বাণী' অথবা 'বাঙলা ভাষায় রচিত বাণী' বা 'বাঙালীর বাণী' অর্থও হ'তে পারে। মনে হয় 'বঙ্গাল' শব্দের এটিই প্রাচীনতম প্রয়োগ।

'সদুক্তিকর্ণামৃতে'র কোন কোন শ্লোকে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা এবং হরগৌরীর গার্হস্থ্যজীবনের এমন কিছু কিছু চিত্র পাওয়া যায়, আমাদের মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের বৈষ্ণব পদাবলীতে এবং শাক্ত পদাবলীতে ও মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ডে যার অনুবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়।

ধোয়ী তাঁর 'পবনদূত' কাব্যের জন্য সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছেন। কাব্যটি মেঘদূতের অনুসরণে মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত। এর একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই — তিনি এই কাব্যে একজন সমসাময়িক নরপতি রাজা লক্ষ্মণসেনকে নায়ক ক'রে গ্রন্থটি রচনা করেছেন। মেঘদূতের অনুসরণে রচিত যাবতীয় দূতকাব্যের মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হ'য়ে থাকে। ধোয়ী অপর কাব্য রচনা করলেও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি।

'আচার্য' উপাধিক গোবর্ধন সম্ভবতঃ পাণ্ডিত্যের জন্য বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন। হাল-এর 'গাহাসত্তসঈ' (গাথাসপ্তশতী) নামক প্রাকৃত প্রকীর্ণ শ্লোক-গ্রন্থের অনুকরণে গোবর্ধনাচার্য সংস্কৃত ভাষায় আর্যা ছন্দে সাত শ' শ্লোক রচনা ক'রে তাঁর 'আর্যাসপ্তশতী' নামক গ্রন্থে নিবদ্ধ করেন। গ্রন্থের অধিকাংশ শ্লোক আদিরসাত্মক হলেও কোন কোন শ্লোকে বাঙালী জীবনের উৎকৃষ্ট চিত্র ফুটিয়ে তোলা হ'য়েছে।

[তিন] জয়দেব ঃ গীতগোবিন্দ

পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী জয়দেব গোস্বামী ভারতীয় গীতিকাব্য-রচয়িতাদের মধ্যমণিরূপে বিবেচিত হ'য়ে থাকেন। আচার্য সুকুমার সেন জয়দেব সম্বন্ধে বলেন, "জয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যের শেষ, বড় মৌলিক কবি।" সংস্কৃত সাহিত্য-সাধনার গোড়ার দিকে বাঙালী ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, অন্ততঃ শেষ পর্যায়ে যে বাঙালীর শিরেই গৌরবোজ্জ্বল মুকুট শোভা পেল— এটিই আমাদের পরম তৃপ্তির বিষয়।

জয়দেব গোস্বামী অজয় নদের তীরবর্তী কেন্দুবিল্ব গ্রামের অধিবাসী ছিলেন—এ বিষয়ে ভিন্নতর দাবি উপস্থাপিত হ'লেও মোটামুটিভাবে জয়দেবের বাঙালীত্বের স্বীকৃতি সহজে খন্ডনীয় নয়। তাঁর কাব্যের নাম 'গীতগোবিন্দ'। কাব্যটি ভাগবতপুরাণের দ্বাদশ স্কন্ধের অনুসরণে দ্বাদশ সর্গে রচিত। কাহিনীর বিষয়বস্তু— রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা। লক্ষণীয় বিষয়, ভাগবতে কিন্তু শ্রীমতী রাধিকার নামও নেই, কিন্তু 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে রাধাই প্রধান চরিত্র, ভারতবর্ষে রাধাকৃষ্ণের কাহিনী যে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, তার মূলে রয়েছে 'গীতগোবিন্দে'র প্রভাব। বাইরের দৃষ্টিতে এটা প্রেমবাক্যরূপে পরিচিত হ'লেও কোন কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিকট বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিকট 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থটি ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা লাভ করে থাকে।

'গীতগোবিন্দ' কাব্যে তিনটি চরিত্র — শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমতী রাধিকা এবং জনৈকা সখী। 'গীতগোবিন্দ' ভারতীয় সাহিত্যে এক সম্পূর্ণ নোতুন ধরণের সৃষ্টি—বস্তুতঃ এটিকে জয়দেবের মৌলিক সৃষ্টি বলেই অভিহিত করা হয়। গতানুগতিক রীতিতে আবদ্ধ না থাকায় এব প্রকৃতি সম্বন্ধেও তাই নানাজনে নানা অভিমত পোষণ করেন।

জোন্সের মতে এটি জননাট্য (pastoral drama); লসন -এর মতে গীতিনাট্য, ভন শ্রয়ডার -এর মতে মার্জিত যাত্রা; পিশেল এবং সিলভাঁ লেভি এটিকে গীতি ও নাটকের মাঝামাঝি স্থাপন করেছেন। এটিকে অলঙ্কার শাস্ত্রসম্মত মহাকাব্যের পোষাক পরানো হ'লেও ডঃ সুকুমার সেনের মতে গীতগোবিন্দ আসলে গীতিনাট্য। তিনি আরও বলেন, "গীতগোবিন্দকে কবি মঙ্গল বলিয়াছেন—'মঙ্গলম্ উজ্জ্বলগীতি'। ইহা যে মঙ্গল গানের মতই দল বাধিয়া গাওয়া হইত তাহাও কবির উক্তি হইতে অনুমান করিতে পারি।"

চব্বিশটি গান বা পদ কয়েকটি শ্লোকের টানা-পোড়েনে বুনট হ'য়ে 'গীতিগোবিন্দ' কাব্যে রূপায়িত হ'য়েছে। কাব্যের বিষয় যৎসামান্য। শ্রীরাধাকে এড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণ অপর গোপীর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন—এ কথা জানতে পেরে শ্রীমতী রাধিকা মান ক'রে কৃষ্ণকে ভৎর্সনা করে পরিত্যাগ করেন। অতঃপর সখীর সহায়তায় মানের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রমের পর শেষ পর্যন্ত রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটে । কাহিনীটি উক্তি-প্রত্যুক্তি-ক্রমে গড়ে উঠেছে—তবে তিন পাত্রপাত্রীর মধ্যে সখীর ভূমিকাই সর্বাধিক সক্রিয়।

গীতগোবিন্দ কাব্যে জয়দেব যে ভাষা ও ছন্দ ব্যবহার করেছেন, তা' সমালোচক মহলে নানা দ্বিধার সৃষ্টি করেছে। যেমন, লসন এবং পিশেল অনুমান করেন যে গীতগোবিন্দের গানগুলি মূলতঃ অপভ্রংশ অথবা কোন দেশীয় ভাষায় (বাঙলায়?) রচিত হ'য়েছিল, পরে জয়দেব এগুলিকে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ ক'রে গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করেন। এই অনুমানের একটা প্রধান কারণ এই, গীতগোবিন্দে ব্যবহৃত ছন্দ সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের মতে ত্রুটিযুক্ত — বলা যায়, এতে প্রাকৃত অবহট্‌ঠের ছন্দ ব্যবহৃত হ'য়েছে। তবে এই অভিমতটি পরবর্তীকালে পরিত্যক্ত হ'য়েছে। ডঃ সুকুমার সেন জয়দেবের গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকৃতি জানিয়েছেন এর ধ্বনিঝঙ্কার এবং ছন্দোলালিত্যকে। প্রাকৃতে এ ধরনের ধ্বনিঝঙ্কার সম্ভব নয় বলেই তিনি মনে করেন, "গীতগোবিন্দের পদাবলীর ঝঙ্কার প্রাকৃত ভাষায় অমন করিয়া বাজিতে পারিত না। যুক্ত ব্যঞ্জন—যুগ্ম নয়—সংস্কৃতের বাহিরে মিলে না। সুতরাং প্রাকৃতে এমন ধ্বনিতরঙ্গ তোলা সম্ভব হইত না।"

বাঙলা সাহিত্যে অন্তর্ভুক্তির সার্থকতা ঃ গীতগোবিন্দ কাব্যের ভাষা সংস্কৃত — অতএব বাঙলা সাহিত্যের আলোচনায় এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা একান্ত স্বাভাবিক। বিশেষতঃ আরো অনেক বাঙালী কবিই যখন প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় বহু কাব্য রচনা ক'রে গেছেন তখন বাঙলা সাহিত্যের আলোচনায় শুধু জয়দেবের অন্তর্ভুক্তির যাথার্থ্য নিয়ে কেউ কেউ মনে সংশয় পোষণ করে থাকেন। অতএব বিষয়টি নিয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন।

বঙ্কিমচন্দ্র জয়দেব গোস্বামীকে 'বাঙালী কবি' এবং 'বাঙলার প্রাচীন কবি' বলে উল্লেখ করেছেন, কাজই অন্ততঃ এই হিশেবেও আমরা বাঙলা সাহিত্যের আলোচনায় তাঁকে স্থান দিলে অযৌক্তিক হয় না। কিন্তু এটি নঞর্থক দিক, সদর্থক দিক্ থেকে আমরা বলতে পারি যে জয়দেব গোস্বামীকে বাদ দিয়ে সামগ্রিকভাবে বাঙলা সাহিত্যের আলোচনা সম্ভবপর নয়। কারণ তিনি শুধু বাঙলার আদি কবিই নন, তাঁকে যদি বাঙলা সাহিত্যের স্রষ্টা বা পথপ্রদর্শক বলা যায়, তাহলেও অত্যুক্তি হয় না। ডঃ সুকুমার সেনও বলেন, "ইনি এক হিসাবে বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক আর্যভাষার আদিকবিও বটেন। ইঁহারই গীতিকবিতার আদর্শে বাঙ্গালা দেশে, মিথিলায় ও অন্যত্র রাধাকৃষ্ণ পদাবলী ও অনুরূপ গীতিকবিতার ধারাস্রোত নামিয়াছিল।"

সত্য বটে, ঐতিহাসিক দিক্ থেকে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য-রচিত 'চর্যাপদ'গুলিই বাঙলা ভাষায় রচিত সাহিত্য-প্রচেষ্টার আদি নিদর্শনরূপে গৃহীত হয়ে থাকে, কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের ধারায় এটি একান্তই নিঃসঙ্গ পথিক—এর কোন উল্লেখযোগ্য উত্তরসূরী নেই বললেই চলে। পক্ষান্তরে চর্যাপদের সমকালেই জয়দেব গোস্বামী সংস্কৃত ভাষায় 'গীতগোবিন্দ' রচনা করলেও, এর অব্যবহিত পরেই, আদি-মধ্যযুগ থেকে বাঙলা সাহিত্য যে ধারাবাহিকতা নিয়ে এগিয়ে চলতে থাকে, তার প্রায় সর্বত্র গীতগোবিন্দের প্রভাব সুস্পষ্ট। বড়ু চণ্ডীদাস-রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এবং বিদ্যাপতিতে যার শুরু, সেই জয়দেব-প্রভাব রবীন্দ্রসাহিত্যেও স্তিমিত নয়। কাজেই

বাঙলা সাহিত্যের প্রায় সর্বদেহে পরিব্যাপ্ত জয়দেব-প্রভাব যখন অনস্বীকার্য তখন বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনায় জয়দেবের অন্তর্ভুক্তি শুধু প্রাসঙ্গিকই নয়, অপরিহার্যও বটে।

অনুবাদ সাহিত্যকে বাদ দিলে মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের দু'টি ধারাই প্রধান—একটি গীতিকবিতার, অপরটি কাহিনীকাব্যের। গীতিকাব্যের ধারা বলতে প্রধানতঃ বৈষ্ণবপদ-সাহিত্যকেই বুঝিয়ে থাকে এবং নিঃসন্দেহে বলা চলে এই ধারাটির সৃষ্টি 'গীতগোবিন্দ'কে অনুসরণ ক'রেই। কাব্যের গঠন এবং বিষয় উভয় দিক থেকেই আমরা জয়দেবকে অনুসরণ করেছি। যতখানি সম্ভব যুক্তাক্ষর-বর্জিত সরল ধ্বনিযুক্ত শব্দ ব্যবহার এবং ছন্দের সঙ্গে ভাবের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপন ক'রে যে অমৃতমধুর বৈষ্ণব পদাবলী দীর্ঘকাল বাঙলা ভাষায় রচিত হ'য়ে আসছে তার আদর্শ জয়দেব। 'চল সখি কুঞ্জং'-জাতীয় চতুর্মাত্রক পদ যে অভিসারের পক্ষে উপযোগী এবং মানভঞ্জনে প্রয়োজন 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি'— জাতীয় মন্থর পঞ্চমাত্রক ছন্দ—একালের রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই কাব্যবোধ প্রসারিত হ'য়েছে।

বিষয়ের দিক থেকেও দেখা যায় যে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার মধ্য দিয়েই যে মানবিক আকুতি সার্থকভাবে প্রকাশিত হ'তে পারে, তারও প্রথম নিদর্শন পাই 'গীতিগোবিন্দে'। তারপর গোটা মধ্যযুগ ধরে সহস্র বৈষ্ণবপদে তারি অনুসৃতি লক্ষ্য করি। রাধাকৃষ্ণের কাহিনী সর্বাধিক বিস্তৃতভাবে পরিবেষিত হ'য়েছে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এবং সেখানে রাধা ছিলেন কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী। কিন্তু সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে যে পরকীয়া প্রেমেরই জয়-জয়কার ঘোষিত হ'য়েছে, তারও মূল রয়েছে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'। ধর্মীয় সাহিত্যে তত্ত্বপ্রাধান্য লক্ষ্য করা গেছে বাঙলা ভাষায় রচিত প্রথম গ্রন্থ চর্যাপদে। কিন্তু পরবর্তী বাঙলা সাহিত্যে এই রীতি বর্জিত হ'য়েছে, পক্ষান্তরে অবলম্বিত হ'য়েছে জয়দেব রীতি—যেখানে মধুর রসের আস্বাদনেই ভগবৎপ্রেমেরই উপলব্ধি ঘটে।

চর্যাপদের পরই বাঙলা ভাষায় রচিত সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বড়ু চণ্ডীদাস-রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। গ্রন্থটি একেবারে গীতগোবিন্দের আদলে তৈরি। গীতগোবিন্দের মতোই এখানেও রাধা, কৃষ্ণ এবং বড়াই—পাত্রপাত্রী এই তিনজনের উক্তি-প্রত্যুক্তি-মাধ্যমে এই নাট-গীতি রচিত হ'য়েছে। গীতগোবিন্দের বহু পদের আক্ষরিক অনুবাদও এই গ্রন্থে রয়েছে।

প্রথম বৈষ্ণবপদকর্তা বিদ্যাপতি ঠাকুর যে 'নবজয়দেব' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন তা থেকেই, তাঁর উপর জয়দেবের প্রভাব অনুভূত হয়। তিনি জয়দেবের মতোই 'বিলাসকলাকুতূহল' পদই রচনা করেছেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের লীলা-বৈচিত্র্য অবস্থান্তরের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন গীতিপ্রাণ পদের সৃষ্টির প্রথম প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় বিদ্যাপতি ও চৈতন্য-পূর্ব চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব পদে — বলা যায় বিদ্যাপতিই এই ধারার প্রথম প্রবর্তক।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সাগ্রহে জয়দেবের পদের রস অস্বাদন করতেন। তাঁর রাধাকৃষ্ণ-প্রেম- বিহ্বলতার মূলেও জয়দেবের ভূমিকা অবশ্যই স্বীকার ক'রে নিতে হয়। সব মিলিয়ে দেখা যায়, বৈষ্ণব পদ সাহিত্যের এবং গীতিকবিতার সৃষ্টি ও পুষ্টিতে জয়দেবের দানই সম্ভবতঃ সর্বাধিক।

শুধু এ জাতীয় গীতকাব্যেই নয়, কাহিনী-কাব্যধারায়ও যে জয়দেবের প্রভাব বর্তমান ছিল, তার প্রমাণ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এবং মঙ্গলকাব্যগুলি। রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন ক'রে একটি কাহিনী গড়ে তুলেছিলেন বিদ্যাপতি, এই কাহিনী কাব্যের ধারাই এই দু'টি অনুসরণ করেছে। জয়দেব তাঁর কাব্যকে বলেছেন, 'মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি'—পরবর্তী মঙ্গলকাব্যে যে দল বেঁধে পালা গাওয়া হ'তো, এই রীতিটিও গীতগোবিন্দের ক্ষেত্রেই প্রথম গৃহীত হ'য়েছিল।

এই সমস্ত কারণেই বাঙলা সাহিত্য আলোচনায় জয়দেব অপরিহার্য। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "জয়দেবকে বাদ দিয়া কি প্রাচীন, আর কি আধুনিক—বাংলা সাহিত্যের কোন যুগের আলোচনা পূর্ণ হইতে পারে না।"

অধ্যায় ঃ চার বাঙলার সাহিত্য,ভাষা, জাতি-ধর্ম ও সম্প্রদায়গত সমন্বয়, বিভেদ ও বৈচিত্র্য

[এক] জাতিগত বৈচিত্র্য

শাশ্বত ভারতধর্ম-রূপে যে সত্যটিকে একালের মনীষীরা বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে চান, তা' হ'লো 'বহুর মধ্যে একে'র উপলব্ধি। সর্বার্থেই এই সত্যটি প্রযোজ্য ব'লেই প্রাচীন-মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের প্রতি পর্বেই সত্যটিকে আমরা প্রত্যক্ষ করবাব সুযোগ পাচ্ছি। জাতি-ধর্ম ও সম্প্রদায়গতভাবে বাঙালী এত বহুধা বিভক্ত এতবার তার রঙ বদল হ'য়েছে, কত দিক্ থেকে কত বিচিত্র জাতি, ধর্ম, ভাষা-সংস্কৃতির ধারা এসে এই সঙ্গমে মিলিত হ'য়েছে, ইতিহাস তার কতটুকুই বা সন্ধান দিতে পারে। কিন্তু বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য, বাঙালী জাতি ও সংস্কৃতি তা' এমনভাবে আত্মসাৎ ক'রে নিয়েছে যে মূলতঃ বহু বিভেদ ও বৈচিত্র্য-সত্ত্বেও তার একীকরণ বাধা প্রাপ্ত হয়নি। তার সমন্বয়ের সুরটিও অশ্রুত নয়। আবার বাঙালীর এই জাতি-ধর্ম ও সম্প্রদায়গত বিভেদ-বৈচিত্র্য, এমন কি, বৈরিতার রূপটিও তাদের যথাযথ পরিচয়-চিহ্ন রেখে দিয়েছে, সাহিত্যের পাতায় পাতায়। আমরা বাঙলা সাহিত্যের বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন পর্বের, বিভিন্ন ধারার ইতিহাস আলোচনা- প্রসঙ্গে কখনো জাতিগত, কখনো ধর্ম বা সংস্কৃতিগত, কখনো বা সম্প্রদায়গত বিভেদ, বৈচিত্র্য, কখন বা বৈরিতারও সন্ধান পেয়ে আসছি বরাবর। কিন্তু লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই, এতৎ সত্ত্বেও কিন্তু কোথাও স্থায়ী বিদ্বেষ বা বিচ্ছিন্নতার ভাব ধরা পড়েনি, বাঙালীর সপ্তস্বরা মুরলীর সপ্তছিদ্র দিয়ে একটি অখণ্ড ঐক্যের মিলিত সুরই চিরকাল ধ্বনিত হ'য়ে এসেছে। সেটি সমন্বয়ের সুর।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য

বাঙালীর জাতিত্ব-বিচারে আমরা দেখেছি, নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু, প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড, অস্ট্রীক বা নিষাদ, দ্রাবিড়, ভোট-চীনা তথা কিরাত এবং আর্যভাষী গোষ্ঠীর মিলিত সত্তাই প্রথম পর্বে বাঙালী জাতি গঠন করেছিল। তারপর দীর্ঘ কালপরিক্রমায় কত 'শক-হুন দল পাঠান মোগল' এই দেহে লীন হ'য়েছে। এসেছে তুর্ক, তাতার-আফগানরা, এর পর পাঠান-মোগলের দল, এদেরও কিছু কিছু বাঙলার রক্তধারায় মিশে গেছে। সর্বশেষ পর্বে য়ুরোপীয়দের মধ্যে বিশেষভাবে পর্তুগীজ আর ইংরেজ রক্তধারা তো বাঙালীর দেহে এখনো নতুনভাবে মিলিত হ'য়ে চল্ছে। দক্ষিণ বাঙলায় পর্তুগীজ হার্মাদরা অনেকেই এখানে স্থায়িভাবে বসবাস করতে করতে কখনো শুধু নামের দিক থেকে এবং অংশগতভাবে ধর্মগতভাবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যটুকু বজায় রাখতে পেরেছে, নতুবা এদের দেহের কাঠামো, গাত্রবর্ণ, ভাষা, কথাবার্তা, দৈনন্দিন

বহু জাতি গোষ্ঠীর আগমন

জীবনচর্যা, এমন কি আচার-বিচারেও বাঙালী হিন্দুর সঙ্গে তাদের কোন পার্থক্য নেই। আর ইংরেজদের সঙ্গে যে সংমিশ্রণ ঘটেছে, সেখানে পিতা যেখানে বাঙালী প্রায় সর্বক্ষেত্রেই সেখানে মা ইংরেজ কিংবা ভিন্ন-দেশীয় হ'লেও সন্তানগণ মোটামুটিভাবে সাধারণ বাঙালী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে পড়ে। কিন্তু পিতা যেখানে য়ুরোপীয় মা সেখানে বাঙালী দুহিতা হ'লেও সাধারণতঃ তারা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বা য়ুরোশিয়ান কিংবা বিদ্রূপাত্মক ভাষায় 'ট্যাশ ফিরিঙ্গি' নামে পরিচিত হ'য়ে নিজেদের একটা সমাজ গড়ে নিয়ে বাস করেন। ব্রিটিশ আমলে তারা বাঙালী-সমাজকে সম্পূর্ণতঃই অস্বীকার করলেও তাদের বংশধরদের কেউ কেউ অস্ট্রেলিয়া কিংবা ইংরেজী ভাষা-ভাষী অপর কোন দেশে চলে গেছে, কিছু বা এদেশীয় বাঙালী সমাজের সঙ্গে মিশে যেতে চেষ্টা ক'রেও সম্পূর্ণভাবে একাত্ম হ'তে পারছেন না, ভাষাগত বিভেদ তার একটা বড় কারণ হ'তে পারে, এবং একটা সামান্য অংশ এখনো বিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের একটা সমাজ গড়ে সঙ্কীর্ণভাবে অবস্থান করছেন। এই ব্যতিক্রমটুকু মেনে নিলে আমরা বাঙালীর জাতিগত বিভেদ-বৈচিত্র্য নিয়ে খুব একটা পীড়া বোধ করি না।

ভাষাগত দিক্ থেকে পূর্বাগত যারা এখনো নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছে, তারাও বাঙলাদেশের বুকে সানন্দে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অবস্থান ক'রে যাচ্ছে। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মুণ্ডা ভাষা গোষ্ঠীর নিষাদ জাতি অর্থাৎ সাঁওতাল-আদি আদিবাসী সম্প্রদায়, বাঙলাদেশে এই গোষ্ঠীর সাঁওতালরাই প্রধান। এদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ মাত্র, প্রধানতঃ পশ্চিম প্রান্তিক অঞ্চল — ঝাড়খণ্ড-এর অংশরূপে পরিচিত পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলেই এরা সমাজবদ্ধভাবে বাস করে থাকে, আর বিচ্ছিন্নভাবে এরা বাঙলার বহু স্থানেই ছড়িয়ে রয়েছে। এদের মধ্যে অনেককেই প্রধানত জীবিকার্জনের প্রয়োজনে দ্বিভাষিকতার (Diglossia) আশ্রয় নিতে হ'য়েছে। অর্থাৎ একই সঙ্গে তাদের মাতৃভাষা সাঁওতালী এবং একপ্রকার মিশ্র বাঙলা ব্যবহার করতে হয়। এদের মধ্যে অনেকেই এখন বাঙলা ভাষায় বেশ সুশিক্ষিত। সাম্প্রতিক কালে, তাদের নিজস্ব ভাষায় কিছু কিছু সাহিত্য রচনার প্রচেষ্টাও চলছে এবং এই উদ্দেশ্যে 'অলচিকি' নামে একটি নতুন লিপির ব্যবহারও তাদের মধ্যে আরম্ভ হ'য়েছে। এদের ব্যবহৃত 'সাঁওতালী ভাষা' বা 'খেরওয়ারি ভাষা' অষ্ট্রীক ভাষাগোষ্ঠী তথা মুণ্ডারী গোষ্ঠীর একটি শাখা। বাঙলা ভাষার সান্নিধ্যহেতু উভয় ভাষার মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব বর্তমান। বাঙলা ভাষায় প্রভূত শব্দ অষ্ট্রীক ভাষা থেকে গৃহীত। আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল-ভিন্ন অপর কোন গোষ্ঠীরই সংখ্যাগত কিংবা ভাষাগত কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই।

ভাষাগত বৈচিত্র্য : অষ্ট্রীক

দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর ও একটি আদিবাসী শাখা বাঙলায় সামান্য সংখ্যায় রয়েছে — এরা ওঁরাও ভাষাশাখার 'মালপাহাড়ী'-ভাষী। এরাও কোনদিক থেকেই উল্লেখযোগ্য না হ'লেও বাঙলা ভাষায় দ্রাবিড়গোষ্ঠীর বেশ কিছু শব্দ রয়েছে এবং দ্রাবিড় ও অষ্ট্রীক এই উভয় ভাষাই বাঙলা ভাষার গঠনে বেশ কিছু প্রভাব বিস্তার করেছে।

দ্রাবিড়

দেশি ভাষাসমূহের মধ্যে অপর একটি শাখা 'কিরাত' বা 'ভোট-বর্মী' ভাষার কোন কোন শাখার কিছু অধিবাসী উত্তর এবং পূর্ববঙ্গে বর্তমান — জাতিগতভাবে কোচ, হাজং প্রভৃতি কিছু সংখ্যক বাঙলায় রয়েছে। এরা নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীগত ভাষা ব্যবহার করলেও সাধারণতঃ একপ্রকার মিশ্র বাঙলা ভাষা-ব্যবহারে প্রায় সকলেই অভ্যস্ত। বাঙলা ভাষার উপর এই ভাষার প্রভাব নিতান্ত সামান্যই, জাতিগতভাবেও এদের সঙ্গে বাঙলা ভাষা-ভাষী বাঙালীর তেমন কোন বিরোধের উপলক্ষ্য ঘটেনি।

ভোট-বর্মী

মোটামুটিভাবে জাতিগতভাবে এই অষ্ট্রীক বা নিষাদ, দ্রাবিড় এবং কিরাত বা ভোট-বর্মী-ব্যতীত অপর যে শাখাটি বাঙলায় বর্তমান তা' হ'লো আর্যশাখা। এই আর্যশাখার ভাষাই বাঙলা ভাষা এবং বাঙালীরা সকলেই মূলতঃ বাঙলা ভাষা-ভাষী এবং নৃতাত্ত্বিক কিংবা ভাষাতাত্ত্বিক কোনদিক থেকেই এদের মধ্যে বিচ্ছেদরেখা টানা আদৌ সম্ভবপর নয়। এরাই মূলতঃ বাঙালী জাতি এবং নিঃসন্দেহে একটি মিশ্র জাতি, কারণ এদের দেহে নিশ্চিতভাবেই আদিবাসী কোন এক বা একাধিক ধারার (দ্রাবিড়, নিষাদ, কিরাত-সহ) রক্তধারা বইছে এবং সম্ভবতঃ পরিমাণগতভাবে ঐটিই প্রধান। (আর্যজাতি ও বাঙালী সম্পর্কে কিছু বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক। তার জন্য 'বাঙালী জাতির উদ্ভব'-শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

আর্য

জাতিগতভাবে মূলতঃ এই চারটি ধারার অধিবাসীদের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক চিরকাল একইরকমভাবে চলছে, তা' নয়, গিরিবাসী প্রাগার্যদের তথা আদিবাসীদের সঙ্গে সাধারণ সমতলবাসী গ্রাম্য ও নাগরিক বাঙালীর বিরোধ যে কখনো দেখা দেয়নি, তেমন নয়। ওরা ধর্মের দিক্ থেকে অনেকেই হিন্দু হলেও কিছু খ্রীষ্টানও রয়েছে, কিন্তু তা'সত্ত্বেও এরা প্রধানতঃ প্রকৃতির উপাসক। সমতলবাসী হিন্দু তথা 'দিকু'রা আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে যখনই তাদের অরণ্য-অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে উদ্যত হয়, তখনই ওরা উদ্ধত হ'য়ে ওঠে। 'সাঁওতাল-বিদ্রোহ' তথা 'খেরোয়া হুল' খুব সাম্প্রতিক কালের কিংবা 'দিকু'দের বিরুদ্ধে না হ'লেও বাঙলার ইতিহাসে এটি এক স্মরণীয় ঘটনা। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই, মূলতঃ এটি ছিল তাদের স্বাধিকার-রক্ষা-প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টার একটি সাম্প্রতিক পরিণতি 'ঝাড়খণ্ড আন্দোলন'। সাধারণভাবে এটি সবকার-বিরোধী আন্দোলন হ'লেও এতে যে জাতি-বৈরিতার সুরটি অস্ফুট নয়, যে-কোন মনস্ক ব্যক্তিই তা' লক্ষ্য ক'রে থাকবেন। জাতিগতভাবে তাদের অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে যদি তারা সাধারণ-ভাবে সমতলবাসীদের দ্বারা প্রতিহত হ'চ্ছে বলে মনে করে, তবে জাতিগত বিদ্বেষের আগুন জ্বলে ওঠা অসম্ভব নয়। তবে, আনন্দেব বিষয় এই, সাধারণ বাঙালী তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন কাজেই আশাঙ্কার কোন কারণ নেই বলেই মনে হয়। 'জাতি'র সঙ্গে 'ধর্ম' ও 'সম্প্রদায়' - শব্দ দুটির সম্পর্ক এমন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যে জাতি বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ধর্ম এবং সম্প্রদায়কে বাইরে রাখা যায় না।

চারি গোষ্ঠীর সম্পর্ক

ধর্ম এবং সম্প্রদায় সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই উভয়ের সংজ্ঞা তথা স্পষ্টতা নির্ধারণ ক'রে নেওয়া প্রয়োজন। কারণ দুটি শব্দই যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হ'য়ে চলছে এবং কোনটিরই যথার্থতা বজায় নেই। যেমন — 'ইসলাম' কিংবা 'খ্রীষ্টান' যে অর্থে ধর্ম, 'হিন্দু' শব্দ দ্বারা কি তেমন কোন পরিচয় পাওয়া যায়? বৌদ্ধধর্ম বা জৈনধর্মও চলতে পারে কারণ প্রত্যেকটি ধর্মই কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বারা সীমাবদ্ধ। কিন্তু হিন্দুধর্মকে কি এভাবে কোন সংজ্ঞা দ্বারা বোঝানো যায়? বাঙালী ঐতিহাসিক যখন বলেন, 'ধর্ম-কলহে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি' — তিনি হয়তো শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব, কিংবা চণ্ডী, মনসা, ধর্ম প্রভৃতি দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার সম্বন্ধেই ইঙ্গিত করেন, তখন কি শাক্ত ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম, প্রভৃতিই বোঝানো হয় না? তবে এগুলি তো হিন্দুধর্মেরই অংশ। মূলও ধর্ম, অংশও ধর্ম — অতএব সমস্যা থেকেই গেল। তাই ধর্মগত বিরোধ বল্‌তে কী বোঝায়, সেটি স্পষ্ট ক'রে নেবার প্রয়োজন রয়েছে।

'ধর্ম' ও সম্প্রদায় ঃ অর্থবিভ্রাট

প্রসঙ্গক্রমে 'সম্প্রদায়' শব্দটিও এসে যাচ্ছে, বরং এর দুর্গতি আরও অনেক বেশি। শব্দটি বহুবিধ উপায়ে ব্যবহারযোগ্য হ'লেও এটিকে মূলতঃ আমরা একটি সঙ্কীর্ণতম অর্থে সীমাবদ্ধ ক'রে এনেছি। যখনই বলা হয়, 'সাম্প্রদায়িক সমস্যা' তখনই 'হিন্দু-মুসলিম' সমস্যাই হ'য়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ একবার হিন্দু কিংবা ইসলাম বলতে ধর্মকে বোঝালো, আবার এখানে উভয়ই 'সম্প্রদায়' হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। আবার 'ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়', 'বাঙাল সম্প্রদায়', 'দরিদ্র সম্প্রদায়', 'শিক্ষিত সম্প্রদায়', 'পুরুষ সম্প্রদায়', 'মাড়োয়ারি সম্প্রদায়' এ সবও চল্‌ছে। অতএব এই বহুর্থক শব্দের মীমাংসাও প্রয়োজন। কিন্তু পুথিগতভাবে এটি করা সম্ভবপর হ'লে বাস্তবে তার রূপায়ণ আর সম্ভব নয়। কারণ, এই দীর্ঘকালের ব্যবহারে এদের প্রয়োগ-সিদ্ধি ঘটে গেছে। তবে মোটামুটিভাবে এটুকু মেনে নেওয়া চলে যে, সাধারণভাবে ভারতে উদ্ভূত যাবতীয় ধর্মই হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত এবং এই বৃহত্তর জাতিসত্তাভুক্ত; পারমার্থিক মতবাদ ধর্ম সংজ্ঞাভুক্ত। বস্তুতঃ একালে যাকে 'হিন্দুধর্ম' বলা হয় প্রাচীনকালে তাকেই বলা হ'তো 'ব্রাহ্মণ্যধর্ম' এবং এটিই ছিল যথার্থ পরিচয়। বর্তমানে ধর্ম বলতে 'Religion' এবং সম্প্রদায় বলতে Sect বা Community — উভয়কেই বুঝিয়ে থাকে।

'সম্প্রদায়' অর্থ

[দুই] বাঙলার রাজনৈতিক পটভূমি

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে তাতে জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিভেদ-বৈচিত্র্য কিংবা বৈরিতার পরিচয় থাকলে, তাও অবশ্য আলোচ্য বিষয় বলেই গ্রহণ করতে হ'বে এবং এর জন্য প্রয়োজন বাঙলার রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের একটা পটভূমি। বাঙলায় মৌর্যযুগেই যে উত্তর ভারত থেকে আর্যগণ এখানে উপস্থিত হ'য়েছিলেন, তার প্রমাণ-চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে আঃ খ্রীঃ পূঃ

মৌর্যযুগে বাঙলা

তৃতীয় শতকে রচিত বর্তমান বাঙলাদেশের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত এক শিলালিপিতে; সেখানে বর্ধিষ্ণু 'পুন্ড্রনগরে'র কথা উল্লেখ করা হ'য়েছে। আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে আগত গ্রীক ঐতিহাসিকগণ যে গঙ্গাহৃদি বা গঙ্গারিডাই (Gangaridai) এবং 'প্রাচী'-'প্রাচ্যা' তথা প্রাসোই (Prasoi) নামে যে রাজ্য দু'টির কথা উল্লেখ করেছেন, সে দু'টি রাজ্যই বাঙলাদেশে ছিল বলে একালের ঐতিহাসিকগণ অভিমত পোষণ করেন। হিউএন্ সাং-এর বিবরণী থেকেও জানা যায় যে তিনি তাম্রলিপ্তি, কর্ণসুবর্ণ এবং সমতটে অশোকের স্তম্ভ দেখতে পেয়েছেন।

গুপ্তরাজাদের কালে কোন গুপ্ত সম্রাটই সমগ্রভাবে বাঙলাদেশ অধিকার ক'রে তা' পূর্বাপর সাম্রাজ্যভুক্ত করে রাখতে পেরেছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে শ্রীগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত প্রভৃতি প্রত্যেকেই কখনো বাঙলার কোন অংশ জয় করেছেন, তেমন প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু মৌর্য সাম্রাজ্যের পর থেকেই বাঙলাদেশেরই বিভিন্ন অঞ্চলে যে ছোটখাটো অনেক রাজাই, স্বাধীনভাবে রাজত্ব ক'রে গেছেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রীঃ তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে বাঙলার বুকে একদিকে গুপ্ত সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা এবং অন্যদিকে বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন ভূপতিদের আত্মরক্ষার অধিকার বজায় রাখার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যে শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির জয় ঘটেছিল, তারই প্রমাণ পাওয়া যায় চীনা পরিব্রাজক ই-সিং এর বিবরণীতে, নেপালে প্রাপ্ত কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে, দিল্লীর মেহেরাউলি লৌহস্তম্ভলিপিতে, সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে, ফরিদপুব অঞ্চলে প্রাপ্ত গুপ্ত সম্রাটদের মুদ্রাঙ্কিত বিভিন্ন স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রায়, দামোদরপুরের তাম্রপট্ট এবং কুমিল্লা জেলার গুনাইগড় সীলমোহব প্রভৃতি বিচিত্র উপকরণের মধ্যে। তবে পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়া জেলার পুষ্করণা-কেন্দ্রিক রাজ্য এবং পূর্ববঙ্গের 'সমতট রাজ্য' যে তৎকালে দীর্ঘকাল স্বীয় অধিকার বজায় রাখতে পেবেও শেষ পর্যন্ত 'বঙ্গ' সহ সকলেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল, — এই কথাই একালের ঐতিহাসিকগণ বিশ্বাস করেন। কিন্তু কখন, কীভাবে বাঙলা থেকে গুপ্ত-সাম্রাজ্য উৎখাত হ'য়েছিল, তার যথার্থ কারণ এখনো নির্ণয় করা সম্ভব হয নি। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরই পশ্চিমে গৌড় এবং পূর্বদিকে বঙ্গরাজ্য আবার নোতুনভাবে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল।

গুপ্তযুগে বাঙলা

আঃ ৫২৫-৫৭৫ খ্রীঃ সময়-সীমার মধ্যে 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং সমাচারদেব বাঙলায় রাজত্ব করেছিলেন বলে মনে হয়। গোপচন্দ্র ১৮ বৎসর রাজত্ব করবার পর ধর্মাদিত্য তৎস্থলবর্তী হন। এরপর 'নরেন্দ্রাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করে সমাচারদেব ১৫ বৎসর রাজত্ব করেন। এঁরা সকলেই পূর্ববঙ্গের 'বরাক (বারক) মণ্ডল' - এর অধিপতি ছিলেন বলে জানা যায়। বঙ্গে পৃথুবিবাজ এবং সুধন্যদেব নামক দু'জন নৃপতির নাম ছাড়া অন্য কিছু জানা যায় না। পরবর্তী ইতিহাস কিছুকালের জন্য প্রায়ান্ধকার অবস্থা।

৬০৬ খ্রীঃ কর্ণসুবর্ণকে রাজধানী করে শশাঙ্কদেব গৌড়ের নৃপতি হয়ে বসেন। গৌড়ভুজঙ্গ শশাঙ্কদেবের পূর্ব ইতিহাস অজ্ঞাত। অনেকের মতে তিনি গুপ্তবংশধর; কেউ বলেন, তিনি

গুপ্তদের ভাগিনেয়; আবার অপর অনুমান, শশাঙ্ক সমগ্র অঞ্চল অধিকার করে প্রথমে রাজ্যকে সুস্থিত এবং পরে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। সম্প্রতি উৎখননের ফলে তাঁর রাজধানী আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি মুর্শিদাবাদের চিরুটি ষ্টেশনের নিকটবর্তী যদুপুর গ্রামে প্রাপ্ত 'শ্রীরক্তমৃত্তিকা বিহার' নামক বিহারকে ঘিরে সমগ্র অঞ্চলটি, যা 'রক্তমৃত্তিকা' বা 'রাঙামাটি' নামে প্রচলিত। পরিব্রাজক ই-সিং-এর মতে শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ নগরীতেই শ্রীরক্তমৃত্তিকা বিহার অবস্থিত ছিল। গৌড়ভুজঙ্গ শশাঙ্কদেব মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত হয়েই সম্ভবত সমগ্র বাঙলাদেশকেই তার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, তবে বঙ্গ-সম্বন্ধে কিছু সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। পরে তিনি তাঁর রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হয়ে প্রথমেই উৎকল ও কলিঙ্গ অধিকার করে পশ্চিমদিকে রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হয়ে প্রথমে বারাণসী পর্যন্ত এবং পরে কনৌজ ও থানেশ্বরও অধিকার করে এক বিশাল গৌড় সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। কিন্তু এই বিশাল সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। আঃ ৬৩৭ খ্রীঃ শশাঙ্কদেবের মৃত্যুর পরই সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এমন কি গৌড় রাজ্যও পাঁচটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে— কজঙ্গল, পুন্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্ত ও সমতট। এরপর শতাধিক বৎসর সমগ্র বাঙলাদেশে চলে মাৎস্যন্যায়। এই পর্বে দেশের বিভিন্ন রাজা ও রাজবংশের নাম পাওয়া যায়। এদের মধ্যে শশাঙ্কের বংশধর মানবদেব, কনৌজাধিপতি হর্ষবর্ধন, কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্মা প্রভৃতি। এরপর জয়নাগ নামক জনৈক ব্যক্তি 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করে মোটামুটিভাবে পুনর্বার গৌড়রাজ্য সুগঠিত করেন। তাঁর মৃত্যুর পর আবার পূর্বাবস্থা। এই সময় বঙ্গরাজ্যে নেপাল বা তিব্বত থেকে আগত বৌদ্ধধর্মীয় খড়্গ বংশীয় পর পর চার পুরুষ রাজত্ব করেছিলেন।

প্রথম বাঙালী নৃপতি

এরপর কিছুকাল পৌণ্ড্রদেশে শৈলবংশ, প্রায় সর্ববঙ্গে কনৌজরাজ যশোবর্মন এবং তাঁকে পরাজিত করে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য এবং ভগদত্ত-বংশীয় হর্ষ গৌড়ে রাজত্ব করেছিলেন। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় যে পূর্ববঙ্গে রত-বংশীয় জীবধারণ ও শ্রীধারণ এবং চন্দ্রবংশীয় গোবিন্দচন্দ্র ও ললিতচন্দ্র রাজত্ব করেন। শশাঙ্কদেবের মৃত্যুর পর এই সুদীর্ঘকাল বাঙলার বুকে বিদেশীয়দের অধিকার স্থাপন এবং অরাজকতার ফলে দেশময় যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই পুঞ্জীভূত অসন্তোষের কারণেই প্রজাসাধারণ সচেতন হয়ে তার প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে আঃ ৭৫০ খ্রীঃ গোপালদেবকে ত্রাণকর্তারূপে মনোনীত করেন।

[তিন] জাতি-রূপে বাঙালীর গড়ে ওঠা : পাল বংশ

ক্ষত্রিয় বংশীয় দয়িতবিষ্ণুর পৌত্র এবং বপ্যটের পুত্র বৌদ্ধধর্মাবলম্বী গোপালই অতঃপর গৌড়াধিপতির পদে অধিষ্ঠিত হন (৭৫০ খ্রীঃ)। গোপালদেব থেকেই প্রকৃতপক্ষে বাঙলার বুকে প্রথম একটা স্থায়ী রাজবংশের আরম্ভ এবং এই স্থায়ী শাসনব্যবস্থার সুযোগেই জাতিসত্তা-রূপে বাঙালী একটা সংহতি-সূত্রে আবদ্ধ হয়। সম্ভবতঃ এই সময় থেকেই জাতি-হিশেবে

বাঙালী স্বাতন্ত্র্য লাভ করে নিজস্ব ভাষা-বিষয়েও অবহিত হয়। এবং এর ফলেই বাঙালী জাতি ও বাঙলা ভাষার উদ্ভবকাল রূপে পাল বংশীয় প্রথম নরপতি গোপালদেবের গৌড়বঙ্গের উপর আধিপত্য বিস্তারের কাল খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীকেই চিহ্নিত করা হয়। প্রকৃত বাঙলাদেশের ইতিহাসের সমারম্ভও এখান থেকেই।

পালরাজাগণ বাঙলার বুকে দীর্ঘকাল রাজত্ব করলেও (৭৫০ খ্রীঃ-১১৫৫ খ্রীঃ) তা অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয় নি। গোপালদেব ওবংশানুক্রমিকভাবে ধর্মপাল ও দেবপাল তাঁদের রাজ্য সমগ্র উত্তর ভারত, কাশ্মীর থেকে আসাম এবং হিমালয় থেকে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত বিস্তার করেছিলেন। যবদ্বীপ ও সুমাত্রার সঙ্গেও দেবপালের যোগ ছিল। ৮৫০ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যুর পরই প্রধানতঃ বৈদেশিক আক্রমণে পাল সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এরপর ক্রমে বিগ্রহপাল (প্রথম), নারায়ণপাল, গোপাল (দ্বিতীয়), বিগ্রহপাল (দ্বিতীয়) খণ্ড-বিচ্ছিন্ন পালরাজ্যের অংশবিশেষের উপর ৯৮৮ খ্রীঃ পর্যন্ত অধিকার স্থাপন করতে পেরেছিলেন। এই অন্তর্বর্তী সময়ে পালরাজ্য-আক্রমণকারীদের মধ্যে ছিল রাষ্ট্রকূট ও প্রতীহার বংশীয়গণ, কামরূপ-রাজ ও উড়িষ্যার শৈলোদ্ভব বংশ এবং বৈদেশিক চান্দেল্ল, কলচুরীয় আর কম্বোজগণ।

পালবংশ ঃ
১ম পর্যায়

৯৮৮ খ্রীঃ প্রথম মহীপালদেব বিজেতাদের বিতাড়িত করে আবার অনেকখানি পূর্বরূপে ফিরিয়ে আনেন। মহীপালের পর নয়পাল ও পরে বিগ্রহপাল (তৃতীয়) ১০৯০ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। এদের রাজত্বকালে কলচুরি, চালুক্য ও সোমবংশীয় এবং চন্দ্র ও বর্মণগণ পাল সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিল। ১০৭০ খ্রীঃ তৃতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালের খুব উল্লেখযোগ্য ঘটনা 'কৈবর্ত-বিদ্রোহ'। মহীপাল তার দুই ভ্রাতা রামপাল এবং শূরপালের এক ষড়যন্ত্রের গুজব শুনে কোন খোঁজ-খবর না নিয়েই তাঁদের কারাগারে নিক্ষেপ করলে সামন্ত নৃপতি এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠে। তার ফলে দ্বিতীয় মহীপালের মৃত্যু হয় এবং বিদ্রোহের নায়ক কৈবর্ত বংশীয় 'দিব্য' বা 'দিব্বোক' মহীপালের সিংহাসন অধিকার করেন। এই বিদ্রোহই ইতিহাসে 'কৈবর্ত-বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। দিব্বোক ছিলেন মূলতঃ বরেন্দ্রভূমির অধিপতি। দিব্বোকের সঙ্গে বঙ্গের বর্মণ-বংশীয় জটাবর্মণের সংঘর্ষ হ'য়েছিল। সম্ভবত দিব্বোক শুধু বরেন্দ্রভূমির উপরই আপন অধিকার বজায় রাখতে পেরেছিলেন। দিব্বোকের পর রুদোক ও পরে ভীম সিংহাসনের অধিকার লাভ করেন। ভীম খুব প্রতাপশালী নৃপতি ছিলেন এবং সম্ভবতঃ তিনি দেশে পুনর্বার শান্তি-স্বস্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন। বগুড়ায় 'ভীমের জাঙ্গাল' আজও তার স্মৃতি বহন করে চলছে। কিন্তু ভীম সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করতে পারেন নি। মগধে পলায়িত শূরপাল ও তদ্ভ্রাতা রামপাল তথাকার সিংহাসন অধিকার করেন ও রামপাল ভীমকে পরাজিত করেন।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ
কৈবর্ত-বিদ্রোহ

রামপাল ভীমকে পরাজিত করে বরেন্দ্র অধিকার করেন এবং তৃতীয়বারের মতো পাল-সাম্রাজ্যকে সংগঠিত করেন। পাল সাম্রাজ্যের শেষ উল্লেখযোগ্য কীর্তিমান সম্রাট ছিলেন

রামপাল। তাঁর মৃত্যুর (১১২০ খ্রীঃ) পর নামে মাত্র তিনজন — কুমারপাল, তৃতীয় গোপাল ও মদনপালের রাজত্বের পরই (১১৫৫ খ্রীঃ) বস্তুতঃ পালসাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হ'য়ে যায়। রাঢ় অঞ্চল অবশ্যই পূর্বেই পাল সাম্রাজ্যের বহির্ভূত ছিল।

সমগ্র বাঙলাদেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন বংশীয় নরপতিগণ আধিপত্য বিস্তার করলেও রাঢ়াধিপতি বিজয়সেনই মদনপালের বরেন্দ্র তথা গৌড় অধিকার করেন। পাল রাজবংশ ছিল বৌদ্ধধর্মাশ্রিত। সেনগণ কর্ণাটক থেকে আগত ব্রহ্মক্ষত্রিয়। সামন্তসেনই পালদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে একাদশ শতকের শেষদিকে রাঢ় অধিকার করেছিলেন। তৎপুত্র হেমন্তসেন সুদীর্ঘকাল (১০৯৫-১১৫৮ খ্রীঃ) রাজত্ব করেছিলেন। তিনি গৌড়, বঙ্গ এবং সম্ভবতঃ কলিঙ্গ, কামরূপ ও উত্তর বিহার অধিকার করে তার রাজ্যসীমা অনেকখানি বাড়িয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র বল্লালসেন বাঙলার সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি প্রধানতঃ সাহিত্য রচনা, সমাজ-সংস্কার এবং শান্তিপ্রতিষ্ঠায় ব্যাপৃত থাক্‌লেও মগধ এবং মিথিলা অধিকার করেছিলেন বলেই মনে হয়। বল্লালসেনের মৃত্যুর পর ৬০ বৎসর বয়স্ক লক্ষ্মণসেন পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হন। যৌবনে পিতামহের সেনাপতিরূপে লক্ষ্মণসেন গৌড়, কলিঙ্গ, কামরূপ জয় করেছিলেন। এবার তিনি কাশী এবং এলাহাবাদ পর্যন্ত বিহারের প্রায় সমগ্র অংশই অধিকারভুক্ত করেছিলেন বলে মনে হয়। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষদিকে পাল সাম্রাজ্যেও কিছুটা ভাঙন ধরে, ১১৯৬ খ্রীঃ দক্ষিণবঙ্গে ডোম্মনপাল খাড়িমণ্ডল এবং পূর্ববঙ্গে দেববংশ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। ১২০৪ খ্রীঃ মহম্মদ বক্তিয়ার নামে এক তুর্কী সেনাপতি বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনের অস্থায়ী রাজধানী নবদ্বীপ (নুদিয়া) অকস্মাৎ আক্রমণ করে সৈন্যদের পর্যুদস্ত করলে লক্ষ্মণসেন পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন। তিনি সেখানেই রাজত্ব করতে করতে সম্ভবতঃ ১২০৫ খ্রীঃ পরলোক গমন করেন। তারপর তার বংশের যথাক্রমে বিশ্বরূপসেন এবং কেশবসেন পূর্ববঙ্গে এবং সম্ভবতঃ দক্ষিণবঙ্গে ১২৪৫ খ্রীঃ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁরা তুর্কী আক্রমণ তৎ-তৎ অংশে প্রতিরোধ করলেও এবপর সমগ্র বাঙলাদেশেই তুর্কী শাসন প্রবর্তিত হয়।

সেন বংশ

বস্তুতঃ খ্রীঃ দ্বাদশ শতক পর্যন্তই বাঙলায় যথাক্রমে গুপ্ত পাল ও সেন রাজত্ব বজায় ছিল। মূলতঃ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাল এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী সেন বংশীয়দের কিঞ্চিদধিক চারিশতক কালের ইতিহাসই বাঙলা সাহিত্যের 'আদিযুগ'। এরপর থেকে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতকের আরম্ভকাল থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর 'মধ্যকাল' পর্যন্ত কার্যতঃ মুসলিম শাসনকালই বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগ এবং তৎপরবর্তী কাল থেকেই ব্রিটিশ রাজত্বকাল ও স্বাধীনতা-উত্তরকাল বাঙলা সাহিত্যের 'আধুনিক যুগ' নামে পরিচিত। এই যুগত্রয় বিভাজিত বাঙলা সাহিত্যেও কালে কালে রূপান্তর ঘটেছে। রাষ্ট্রনীতির পরিবর্তনে সমাজব্যবস্থায় যে পরিবর্তন অনিবার্য, তার প্রতিফলন সমকালীন সমাজে পড়বেই — এটিই একান্ত স্বাভাবিক। কার্যতঃ ঘটেছেও তাই। জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়গতভাবে যেমন, তেমনি বিষয় ও ভাববস্তুর দিক থেকেও সেই পরিবর্তন

বাঙলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

ছিল অবশ্যম্ভাবী। এইভাবেই বাঙলা সাহিত্যের আদিযুগোচিত স্থবির, রক্ষণশীল, দেব-ধর্ম-নির্ভর বিষয় ও মনোভাব কখনো উপল-মন্থর গতিতে, কখনো বা প্রবল প্রবাহে ক্রমশঃ আধুনিক কালের প্রগতিমুখী মানব-নির্ভর সাহিত্যে পরিণত হয়েছে।

বাঙলা সাহিত্যের এই সহস্রবর্ষের সুদীর্ঘ পরিক্রমা-পথে জাতিতে জাতিতে, ধর্মে ধর্মে বা সম্প্রদায়গতভাবে যে বিরোধ.বা বৈরিতার রেখাচিহ্ন পড়েনি, তা বলা যায় না। তবে বাস্তবের কতটুকু সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে, তার পরিমাপ করবেন ঐতিহাসিক ।

পাল বংশীয়দের রাজাদের কাল থেকেই বাঙলা সাহিত্যের আরম্ভ। পাল-রাজত্বকালে, কৈবর্ত-জাতীয় দিব্যোক-এর অভ্যুত্থান, কৈবর্ত-বিদ্রোহ ও উক্তবংশীয ভীমের রাজত্বই পালযুগে জাতি-বৈরিতার একমাত্র পরিচয। সমকালের সংস্কৃত কাব্য সন্ধ্যাকব নন্দী-রচিত 'বামচবিত' কাব্যে তার উল্লেখ পাওয়া গেলেও বাঙলা সাহিত্যে তার কোন উল্লেখ নেই।

আদিযুগ

আদিযুগ তথা হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের বাঙলা সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদ — এটি সহজিয়াপন্থী বৌদ্ধদের রচনা। বৌদ্ধধর্ম তখন চরম অবক্ষয়েব পর্যায়ে নেমে এসেছে। আর সহজিয়াপন্থী বৌদ্ধগণও এসেছিলেন সম্ভবতঃ সমাজেব একেবাবে নিম্নবর্গ, একেবারে অন্ত্যজশ্রেণী থেকে। তাই আলোচ্য কাব্যে বর্ণাশ্রমী হিন্দুসমাজেব বহির্ভূত অস্পৃশ্য চণ্ডাল, ডোম, শবর, জেলে, তাঁতী, ধুনুরি প্রভৃতিব জীবনচিত্রই এতে ধরা পড়েছে। বটু বা উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণের প্রতি কটাক্ষপাত করা হয়েছে। কিন্তু এতে কোন জাতি-ধর্ম বা সম্প্রদায়গত বিদ্বিষ্ট মনোভাবের পবিচয় নেই।

আদি যুগের অন্ত্য ঘটে,তুর্কী আগমনে। তুর্কী আক্রমণের প্রথম ধাক্কায় বর্ণাশ্রমী সমাজ প্রথমে গুটিয়ে গেলেও ক্রমে সমাজরক্ষায় সচেতন হয়ে এতকালের অনার্য অস্পৃশ্যদের সঙ্গে যূথবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল বলে মনে হয়। কারণ ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সাম্যভাব, রাজশক্তির আনুকূল্য এবং হয়তো বা কিছুটা জোর-জুলুমের ফলে হিন্দু সমাজের

তুর্কী-আক্রমণ ঃ
সামাজিক বিপর্যয়

তলার দিকে বিশেষভাবেই বৌদ্ধসমাজে ভাঙন ধরেছিল — প্রচুর বাঙালী তখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ফলে প্রাগার্য তথা নিম্নবর্ণের হিন্দুসমাজেরও অন্ত্যজশ্রেণীর সঙ্গে উচ্চবর্ণের একাট সমীকরণ প্রচেষ্টা দেখা দেয়। তারি ফলে তাদের অনেক ধর্মাচার, রীতি-নীতি, এমন কি দেব ধর্ম, পূজাও উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজে গৃহীত হয়। হিন্দুর সাধারণ-জীবনচর্যায়, ধর্মাচরণে বেশ পরিবর্তন সাধিত হয় এবং নবাগত দেবতাদের মাহাত্ম্য কীর্তনের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হলো বাঙলা সাহিত্যের এক নতুন ধারা — মঙ্গলকাব্য সাহিত্য।

[চার] বাঙলা সাহিত্যে বিভেদ-বৈচিত্র্য

ভারতবর্ষে 'জাতি', 'ধর্ম' এবং 'সম্প্রদায়' — এই তিনটি শব্দেরই অর্থ এমন বিপর্যস্ত হ'য়ে রযেছে যে, ব্যবহারিক দিক থেকে এদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ এক দুরূহ ব্যাপার। যেমন, — হিন্দু-মুসলিম-সম্পর্ক আর্য-অনার্য-সম্পর্ক, বৈষ্ণব-শৈব-শাক্ত-সম্পর্ক। — এগুলি কি

জাতি-সম্পর্ক, ধর্মীয় সম্পর্ক, অথবা সাম্প্রদায়িকসম্পর্ক ? বস্তুতঃ নির্বিশেষে এদের মধ্যবর্তী পারস্পরিক বিভেদের কিছু কিছু চিত্র মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে ভালোই ধরা পড়েছে।

বাঙলায় তুর্কী আগমনের পর মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধি যে গতিতে অগ্রসর হয়েছে, তার পশ্চাতে ধর্মান্তরীকরণের ভূমিকা কম নয়। রাজার জাতি প্রজা ও শোষিতদের উপর অত্যাচার করছে, তার চিত্র সাহিত্যেও দুর্লভ নয়। প্রখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্তা বিদ্যাপতি তাঁর অবহট্‌ঠ ভাষায় লিখিত 'কীর্তিলতা' নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

'কতহুঁ তুরুক বরকর। বাট জাইতেঁ বেগারধর।।
ধরি আনএ বাঁভন বড়ুআ। মথাঁ চড়াবএঁ গাইক চড়ুআ।।
ফোট চাট জনউ তোড়। ... দেউল ভাঁগি মসীদ বাঁধ।। ...
হিন্দুবোলি দূরহি নিকার। ছোটেও তুরুকা ভভকী মার।।'

অর্থাৎ — 'কত তুরুক পথে যেতে বেগর ধরে। ব্রাহ্মণ বটুকে ধরে এনে তার মাথায় চড়িয়ে দেয় গোরুর রাং। ফোঁটা চাটে, পৈতে ছিঁড়ে দেয় ... দেউল ভেঙে মস্‌জিদ বানায়। .... হিন্দুকে বলে, দূর-নিকালো তুরুক ছোট হলেও বড়কে মারতে যায়।' মুসলিম শাসনকালের বর্ণনা দিতে গিয়ে অধ্যাপক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন ঃ "শাসনকর্তৃগণই পরাভূত হিন্দুকে কখনো নির্বিচারে হত্যা করিয়া, কখনো বা বলপূর্বক ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া এদেশে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য নানাপ্রকার ছল, বল ও কৌশলের সাহায্য লইতেন। ইখতিয়ার হইতে শুরু করিয়া হোসেন শাহী আমলের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমান শাসকগণ হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করা আবশ্যিক পবিত্রকর্ম বলিয়া মনে করিতেন।" অপর একজন একালের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক তুর্কী শাসন এবং তদুত্তর পাঠান শাসন আমলে বাঙলার গ্রামজীবনের কথা বল্‌তে গিয়ে লিখেছেন ঃ "মুসলমান রাজশক্তির বিস্তার এবং ধর্ম প্রচার পৃথিবীর সর্বত্র সমানতালে এগিয়েছে। বাঙলাদেশেও তার অন্যথা হয়নি। অমুসলমান কাফেরদের ধ্বংসসাধন এবং তাদের মন্দির, মঠ, দেব-বিগ্রহ, ধর্মগ্রন্থ বিনষ্ট করাকে পুণ্যকর্ম বলে আক্রমণকারীরা মনে করত। গ্রামের দূরতম প্রান্ত পর্যন্ত ইস্‌লাম ধর্ম প্রচারের জন্য পীর-ফকিরের দল সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। সামান্য প্রয়োজনেই রাজশক্তির সশস্ত্র সহায়তা লাভ করতো তারা। তুর্কী সৈন্য ও অভিজাতরা গ্রামের কৃষিপণ্য জবরদখল করে বা শ্রমজীবীদের বেগার খাটিয়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব গড়ে তুলল। ব্রাহ্মণদের ধরে জোর ক'রে গোমাংস খাইয়ে জাতিচ্যুত করা হতে লাগল। ... ধর্মকেন্দ্রিক সমাজ জীবন তুর্কিবিজয়ের অত্যল্পকাল মধ্যে দারুণ আন্দোলনে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। হিন্দুধর্মের উপর প্রত্যক্ষ অত্যাচার, ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচার, শাসকশক্তির সহযোগিতা, বৌদ্ধধর্মীয় নেতৃত্বের বিলোপ, শাসকের ধর্মগ্রহণের বাস্তব জাগতিক সুবিধা বাঙলার সমাজ জীবনে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করল।"

তুর্কী আগমন ও হিন্দু সমাজে তার প্রভাব

তিনি আরও লিখেছেন ঃ "সেন আমল থেকেই বৌদ্ধপ্রভাবের কিছুটা ন্যূনতা ঘটেছিল। মুসলমানেরা এসেই বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্রগুলি ভেঙ্গে দিল। বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নিহত হলেন,

অনেকে পলায়ন করে ধর্ম ও প্রাণ রক্ষা করলেন। জোর করে ও লোভ দেখিয়েও কিছু সংখ্যক অভিজাত বৌদ্ধকে ধর্মান্তরিত করা হল। ফলে তুর্কী-বিজয়ের প্রথমদিকেই বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতৃত্ব একেবারেই লুপ্ত হল।" এই প্রসঙ্গে একটি সত্য কথা বলা প্রয়োজন। পালরাজগণ ছিলেন বৌদ্ধ, কিন্তু তাঁদের অপর ধর্মীয়দের প্রতি অর্থাৎ তৎকালীন ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাশ্রিত তথা হিন্দু-ধর্মাবলম্বীদের প্রতি যথেষ্ট সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়। চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, হিউএন সাং, ই-সিং প্রভৃতির বিবরণী থেকে জানা যায় যে, তাঁদের বাঙলাদেশ পরিভ্রমণ-কালে দেশের প্রায় সর্বত্র হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মমন্দির বর্তমান ছিল। এদের সবই মুসলিমরা বিধ্বস্ত করেছিল', এরূপ মনে করবার কারণ নেই। ব্রাহ্মণ্যধর্মাশ্রিত সেনবংশীয়দের রাজত্বকালে যে ভিন্নধর্মীয়দের উপর যথেষ্ট অত্যাচার উৎপীড়ন চলত, এটাই ঐতিহাসিক সত্য। বৌদ্ধ নেড়া-নেড়ীকে কেন মুসলিম নেড়া-নেড়ীতে পরিণত হতে হয়েছিল, তার ইতিহাস তলিয়ে দেখলেই প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে।

ইসলামীকরণ

যা হোক, ধর্মান্তরীকরণ এবং পরস্পরের প্রতি ধর্মীয় অক্রোশের একটা প্রমাণ বাঙলার সাহিত্যের পৃষ্ঠায় এখনও বর্তমান রয়েছে। শ্রদ্ধেয় ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক গ্রন্থে 'শূন্যপুরাণে' 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামক যে পদটিকে প্রক্ষিপ্ত বলেও আদিযুগের পদ বলে গ্রহণ করেছেন, এটিকে পরবর্তীকালের সহদেব চক্রবর্তী-লিখিত 'অনিল পুরাণে' (১৭৩৫ খ্রীঃ) পাওয়া গেছে। তবে 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' (নামান্তর — 'কালিমা জালাল') এত অর্বাচীন কালেরও নয়। সম্ভবতঃ প্রাচীনতর কালেই রচিত এই অংশটি 'অনিল পুরাণে'ও প্রক্ষিপ্ত বলেই অনুমান করি। এ রচনাটিতে প্রকৃতপক্ষে যুগসন্ধিকালের একটা সংঘাতের চিত্রই ফুটে উঠেছে। এতে বৌদ্ধধর্মের উপর হিন্দুর অত্যাচার এবং বৌদ্ধ ধর্ম-কর্তৃক হিন্দু দেবতাদের মুসলিম ধর্মীয় প্রধান-রূপে রূপান্তর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে—

'এইরূপ দ্বিজগণ করে সৃষ্টি সংহারণ / ই বড় হইল অবিচার।
বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম, মনেতে পাইয়া মর্ম / মায়াতে হইল অন্ধকার।।
ধর্ম হৈল্যা জবনরূপী মাথাত কালটুপী / হাতে শোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয় / খোদায় বলিয়া এক নাম।। ..
ব্রহ্মা হৈল মহম্মদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর / আদম্ফ হৈল শূলপাণি।
গণেশ হইআ গাজী কার্ত্তিক হৈল কাজি / ফকির হইল্যা জত মুনি।।...
জতেক দেবতাগণ হয্যা সভে একমন / প্রবেশ করিল জাজপুর।।
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা কিড়্যা খায় রঙ্গে / পাখড় পাখড় বলে বোল।।
ধরিয়া ধর্মের পায় রামাঞি পণ্ডিত গায় / ই বড় বিসম গণ্ডগোল।।'

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন এর উপর মন্তব্য করেছেন ঃ "কোন্ ঐতিহাসিক মুসলমান উপদ্রবকে লক্ষ্য করিয়া এই কবিতা রচিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ-কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ মনে করিয়া সদ্ধর্মীরা (বৌদ্ধগণ) যে হিন্দু দেবমন্দির প্রভৃতির উপর

উৎপাত দর্শনে হৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে।" তুর্কী শাসনকালে বাঙলার ধর্মীয় - সাম্প্রদায়িক প্রধান ত্রিশক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের যে চিত্র আলোচ্য পদটিতে ধরা পড়েছে, তাতে সম্পর্কের স্বরূপটির স্বপ্রকাশ ঘটেছে— অধিক বিশ্লেষণ অনাবশ্যক।

[পাঁচ] আর্য ও অনার্য সংস্কৃতি সমন্বয়

আর্য-অনার্য-সম্পর্ককে যদি জাতিগত সম্পর্ক বলে গ্রহণ করি, তবে তাদের অন্তর্বর্তী সংঘর্ষের চিত্র খুব প্রামাণিক কিছু না পাওয়া গেলেও তা অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাদের মধ্যে যে ধর্ম তথা সংস্কারগত, এককথায় বলতে পাবি, সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের একটা স্থায়ী এবং সুদৃঢ় ভিত্তি তুর্কী-শাসন যুগে, সাহিত্যের ইতিহাসে যাকে 'যুগ-সন্ধিকাল' কিংবা 'অন্ধকার যুগ' অথবা 'অবক্ষয় যুগ' নামে অভিহিত কবা হয়েছে এবং আলোচ্য গ্রন্থে যাকে বলা হযেছে 'মানস প্রস্তুতিব যুগ' তখনই স্থাপিত হ'য়েছিল, এবং তাকে আশ্রয় ক'রেই পরবর্তী বাঙালী হিন্দুব ধর্মাচার ও জীবনচর্যা পরিচালিত হ'য়ে আসছেএ সত্য অস্বীকার করবার উপায নেই। সম্ভবতঃ তখন থেকেই প্রাগার্য আদিবাসীরাও হিন্দু-ধর্মে আশ্রয লাভ করে তাদেব জীবনে তাব কতক গ্রহণ ক'বেছিল এবং বর্ণ-নির্বিশেষে সমস্ত হিন্দুব জীবনচর্যা এবং ধর্মাচাবেই বিস্তব অনার্য উপাদান প্রবেশাধিকার পেয়ে গিযেছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে এই সঙ্কটকালে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মেব মধ্যেও সমন্বয সাধিত হযেছিল। বর্তমানে বাঙলাদেশেব অর্থাৎ পূর্ব প্রান্তিক সীমান্তে সামান্য সংখ্যক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বর্তমান থাক্‌লেও সমগ্র বাঙলা কার্যতঃ প্রায় বৌদ্ধহীন হযে পড়েছিল, তাদের কতক অংশ হিন্দুদেব সঙ্গে মিশ্রিত হযে আত্মবক্ষা করেছিল, তবে তান্ত্রিক বৌদ্ধদেব বহু ধর্মাচাবই হিন্দুধর্মেব মধ্যে মিশ্রিতভাবে কিন্তু ববাবব বর্তমান থেকে গেছে। ফলতঃ অনার্য-আর্য এবং বৌদ্ধদেব ধর্মীয-সাংস্কৃতিক মিশ্রণই বাঙালী সংস্কৃতিকে গড়ে তুলেছে, বাঙালীব জীবনচর্যায এই সংস্কৃতিবই প্রতিফলন ঘটেছে। সমন্বযেব প্রসঙ্গই যখন বলা হচ্ছে, তখন এই সুযোগে, পববর্তীকাল অর্থাৎ অন্ত্যমধ্যযুগ তথা চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রসাবেব মধ্যে ইসলামী সুফী-সাধনার প্রভাব যে সংক্রামিত হয় নি, এমন কথাও বলা যায় না। বস্তুতঃ বহু বিচিত্র ও বিমিশ্র উপাদানে গঠিত বাঙালীব মৌলিক ধর্ম বলতে এই সমন্বিত সংস্কৃতিকেই বুঝতে হবে — এদের কোনটিকে বাদ দেবার প্রচেষ্টাকে ছুৎমার্গিতা বলেই মনে কবতে হবে। বিষযটিকে আমাদেব সংস্কাবমুক্ত মন নিয়েই বিচার করতে হবে। বাঙালী সংস্কৃতিব প্রামাণিক বক্তা আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যের কিয়দংশ উদ্ধার করলেই বিষয়টি স্পষ্টতর হবে। তিনি বলেন ঃ "কর্মবাদ, জন্মান্তববাদ, যোগদর্শন, যোগের নির্দিষ্ট সাধনা, আদ্যাশক্তির আরাধনা ও শিব-শক্তিবাদ, বিষ্ণুর আরাধনা প্রভৃতি লইয়া হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য, সে সমস্ত জিনিষ মুখ্যতঃ অনার্য ধর্মজগত হইতেই গৃহীত।"

যুগসন্ধিকাল

আচার্যদেব পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিতে যে সমস্ত বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন, এগুলি হিন্দুশাস্ত্রেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বাঙালীর ধর্মাচার ও জীবনচর্যায় বর্তমানে এমন আরও অনেক বিষয়ই অনায়াস-প্রবেশ লাভ করেছে যে এদের পিছনে কোন শাস্ত্রীয় সমর্থন বা পুরাণের সমর্থন না থাকলেও এগুলি আমাদের জীবনে স্থায়ী আসন লাভ করে নিয়েছে। এ সবই

বাঙালীয়ানা একটা সমন্বিত সংস্কৃতি

সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ফল এবং বাঙালী সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ বলেই বিবেচিত হয়। বাঙালীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান যেভাবে পরিবেশিত হয়, তাদের প্রত্যেকটিই নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। বাঙালী শিশুর নামকরণ, অন্নপ্রাশন, হাতে-খড়ি, তার বিবাহ, তাদের বারো মাসে তেরো পার্বণ, জগদ্ধাত্রী পূজা, কার্ত্তিক পূজা, সরস্বতী পূজা, গাজন, চড়ক প্রভৃতি একান্তভাবেই বাঙালীর নিজস্বই শুধু নয়, এদের অনেকগুলির সঙ্গেই আমাদের পূর্ববর্তী অধিবাসী অনার্যদেরও যোগ রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন বৃক্ষের পূজা প্রভৃতি যে প্রাগার্য ধর্ম-সংস্কৃতির উত্তরাধিকার, এতথ্যও সর্বজন স্বীকৃত।

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের প্রবলতম ধারাটিই কিন্তু মূলতঃ সমন্বিত সংস্কৃতি প্রচার প্রচেষ্টারই ফল। অনার্য সমাজ থেকে যে সমস্ত দেবতাকে আর্যসমাজ স্বীকার করে নিযেছে, তাদের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে বাঙলা সাহিত্যে 'মঙ্গলকাব্য' ধারার উদ্ভব ঘটে। চণ্ডী, মনসা, ধর্ম প্রভৃতিকে অবলম্বন করে যে মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হয়, তাদের মধ্যে একদিকে

মঙ্গলকাব্যে অনার্য দেব-দেবী

যেমন অনার্য সমাজের স্মারক বহু চিহ্ন বর্তমান, তেমনি তাদের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যেই পৌরাণিক সম্পর্ককে যোগ-যুক্ত করে অনার্য দেব-দেবীকে পৌরাণিক মর্যাদা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'গোধা' গোষ্ঠী প্রতীক, অরণ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী, ব্যাধ কালকেতুর নায়ক পদ, মহিলাদের দ্বারা পূজিতা 'মঙ্গলচণ্ডী', ওঁরা-ওদের দেবী চণ্ডীর সঙ্গে নাম সাদৃশ্য প্রভৃতির দ্বারা চণ্ডীকে পার্বতীর সঙ্গে অভিন্নরূপে দেখানো, শিবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা, পৌরাণিক গজলক্ষ্মীর অবতারণার মধ্য দিয়ে সমন্বিত সংস্কৃতির রূপটিই ধরা পড়ে। অনুরূপ কাহিনী অপর মঙ্গলকাব্যগুলি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। মনসামঙ্গল কাব্যেও একদিকে অনার্য নাগপূজা, দ্রাবিড়দের 'মনে মঞ্চাম্মা', দেবীর ক্রুরতা ও প্রতিশোধ-পরায়ণতা, অন্যদিকে মহাদেবের সঙ্গে কন্যাসম্পর্ক স্থাপন, শিব-পূজক চাঁদের হাতে পূজা-গ্রহণের জন্য লোলুপতা, আবার মুসলমান হাসান-হোসেন পালা সংযোজন সংস্কৃতি সমন্বয়েরএকেবারে চূড়ান্ত অবস্থা। ধর্মমঙ্গল কাব্যের ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধদের ধর্ম (ধম্ম) এবং পৌরাণিক শিব, বিষ্ণু, কিংবা যম রাজার সঙ্গে যুক্ত করে জাতে তুলবার চেষ্টা করা হলেও ধর্মপূজায় ডোমজাতীয় পুরোহিত, কবুতর-কুক্কুট এবং মদ্যদ্বারা পূজা সম্পাদন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এর অনার্য স্বরূপটি আজও ঢাকা পড়েনি। শনিঠাকুরকে পৌরাণিক দেবতা মনে করা হ'লেও উঠানে তার পূজা এবং ঘরের মধ্যে তার প্রসাদ পর্যন্ত নিয়ে যাবার নিষেধ — এটি আর্যামি রক্ষার সতর্কতা ছাড়া কিছু নয়। শীতলা, ষষ্ঠী, সুবচনী এবং বহুদেবদেবীর পূজায় অনেক সময় ব্রাহ্মণ

পুরোহিতেরও প্রয়োজন হয় না, আর বহু ব্রত-পূজাই তো একান্তভবে মহিলা সমাজেরই অধিকারভুক্ত। মুসলমান শাসকদের সঙ্গে একদিকে যেমন তাদের কঠোর রক্ষণশীল সনাতনপন্থী শরীয়তীরা এসেছিল, তেমনি প্রেম-ধর্মের প্রচারক উদারপন্থী সুফী সাধনার একটা ধারাও বাঙলার বুকে ঠাঁই করে নিয়েছিল। তাদের উদারপন্থী প্রেমধর্মের সঙ্গে বাঙলার গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সমন্বয় সাধন খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল না। ফলতঃ উভয় ধর্মমতই পরস্পরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হবার ফলে বাঙলার হিন্দু এবং মুসলিমদের জীবনযাত্রায়ও একটা সমন্বয়ের পথ তৈরি হয়েছিল। ব্রিটিশ আমলে উত্তর ভারত থেকে আগত কিছু শরীয়তী মুসলমানদের প্রভাবের পূর্ব পর্যন্ত বস্তুতঃ বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মীয় জীবনের বহির্ভূত সাংস্কৃতিক জীবনে তেমন একটা পার্থক্য ছিল না। হিন্দু মুসলিম-সম্পর্কও তুর্কী শাসনের পরবর্তী যুগে যে যথেষ্ট হৃদ্য এবং সহনশীল ছিল, তার ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব নেই।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থের কালকেতু-পর্বে কালকেতু-কর্তৃক নগর বিন্যাসে মুসলিম জীবনের যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, তাতে তাঁর শ্রদ্ধাশীল মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এ ছাড়া পাঠান শাসকদের কেউ কেউ বিদেশ থেকে আগত হলেও তারা সকলেই জীবনাচরণের দিক থেকে বাঙালীই হয়ে গিয়েছিলেন। সুলতানদের অনেকেই বাঙালী হিন্দু কবিদের শুধু পৃষ্ঠপোষকতাই করেন নি, বহু ক্ষেত্রেই তাঁদের আদেশে হিন্দু কবিগণ বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা বা অনুবাদ করেছেন এবং এদের মধ্যে হিন্দু ধর্মগ্রন্থও অপ্রতুল নয়। বহু হিন্দু কবিই তাদের গ্রন্থে সশ্রদ্ধভাবে এই সব সুলতান বা পৃষ্ঠপোষকের নাম উল্লেখ করে গেছেন – চৈতন্যযুগের পূর্বেই মালাধর বসু তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে লিখেছেন — "গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান।" এই গৌড়েশ্বর ছিলেন সম্ভবতঃ রুকনুদ্দিন বরবক্ শাহ্। মালাধর বসু তাঁর গ্রন্থে অবশ্য মুসলিম অত্যাচারেব কথাও উল্লেখ কবেছেন–

মধ্যযুগেব সাহিত্যে সম্প্রীতি-চিত্র

'ম্লেচ্ছ জাতি রাজা হব অধর্ম পালিব।
জার ধন দেখিব তার সব হরি লব।।'

ষোড়শ শতকের গোড়াব দিকেই গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের সেনাপতি চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসনকর্তা পবাগল খাঁর নির্দেশে অনূদিত কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত 'পরাগলী মহাভারত' নামেই পরিচিত। আবাব পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর নির্দেশে শ্রীকর নন্দী 'জৈমিনি মহাভারতে'ব অশ্বমেধ পর্বের যে অনুবাদ রচনা করেন, তা 'ছুটি খাঁর মহাভারত'রূপে প্রসিদ্ধ। – বরিশালের কবি বিজয়গুপ্ত তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যে নৃপতি হোসেন শাহের উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর কাব্যে হাসান-হোসেনের পালাও সংযোজন করেছেন। এরপর বৈষ্ণব ভাবধারায় যেমন সুফী প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল, তেমনি শতাধিক মুসলমান কবিও বৈষ্ণব পদ রচনা করেছিলেন। যেমন – সৈয়দ মর্তুজা, নসির মামুদ, আলাওল, আলি রাজা, সেখলাল, চাঁদকাজী, লাল মামুদ, কবীর প্রভৃতি। এঁদের কারো কারো রচনায় গভীরতর

প্রাণের স্পর্শও অনুভব করা যায়। কাজেই প্রায় সমগ্র মধ্যযুগ ধরেই সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব বলতে সাধারণভাবে আমরা সম্প্রীতি ও সমন্বয়ের মনোভাবই দেখতে পাই।

তবে বাঙলা সাহিত্যে একান্তভাবেই মুসলিম সাহিত্য বা ইস্‌লামী সাহিত্য নামে এক বিশেষ জাতীয় সাহিত্যধারা সপ্তদশ শতক থেকে বেশ সচল ছিল, তাতে একটা সম্প্রদায়ের নাম যুক্ত থাক্‌লেও তার সঙ্গে কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবুদ্ধি জড়িত ছিল না। রোসাঙ রাজসভায় এর উদ্ভব এবং পরে সর্বত্র প্রসারিত; মুসলমান কবিদের দ্বারাই রচিত, এদের বিষয়বস্তু একেবারেই লৌকিক এবং সবই ছিল প্রধানত ফার্সী ও হিন্দী/উর্দু থেকে অনূদিত। প্রথম পর্বের লেখক দৌলত কাজী, সৈয়দ আলাওল প্রভৃতির রচনার ভাষা একেবারেই সাধু বাঙলা। পরবর্তী কালের অনেক মুসলিম কবিও এই ধারা অনুসরণ করেন। আরও আশ্চর্যের বিষয়, কাহিনীর বিষয়বস্তু আরবী-ফার্সী থেকে গ্রহণ করা হলেও অনেক কাব্যেই পৌরাণিক দেব-দেবীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ থেকে মুসলিম কবিদের অসাম্প্রদায়িক এবং সমন্বয়ী মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

ইসলামী সাহিত্য

সপ্তদশ শতকের শেষদিকে আব্দুল হাকিম তাঁর 'নূরনামা'য় লেখেন ঃ

'যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।।
দেশীভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়।
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশে না যায়।।'

আঃ সপ্তদশ শতকে সৈয়দ সুলতান তাঁর 'নবী বংশে' লিখেছেন ঃ

'আছিল আরবী ভাষা হিন্দুয়ালি কৈলু।
বঙ্গদেশী বুধে মত প্রচারিয়া দিলু।।
ন বুঝি আরবিশাস্ত্র জ্ঞান না পাইলা।
হিন্দুয়ালি ভাষা পাই আচারে রহিলা।।'

তবে প্রয়োজনে আরবী-ফারসি শব্দ প্রয়োগে যে সব সমকালীন হিন্দু কবিগণও বাধ্য হয়েছিলেন, তার প্রমাণ কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য'। মুসলিম সুফীদের জীবনাচরণ বর্ণনায় তিনি লিখেছেন ঃ

'দশ বিশ বেরাদরে বসিয়া বিচার করে
অনুদিন কেতাব কোরান।
কেহ বা বসিয়া হাটে পীরের শিরনি বাঁটে
সাঁজে বাজে দগড় নিশান।।'

তবে সচেতনভাবে ইস্‌লামী সাহিত্য তথা কিস্‌সা সাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দের প্রয়োগ আরম্ভ ক'রেছিলেন সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে নবাব মীরজাফর-পুত্র নজমুদ্দৌল্লাহ্‌র সময়ে রচিত 'ইউসুফ জোলেখা'য় —

"সোনাভান' নাম মোর ছিলু আরামেতে।
তোমার ছুরত আমি শুনিনু কামেতে।।
সেই হৈতে দিল মেরা আছে বেকারার।
থাকিতে না পারি আইলুম দেখিতে দিদার।।"

অবশ্য এর আগেই রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে কাব্যকে 'প্রসাদগুণ' সম্পন্ন এবং 'রসাল' ক'রে তোলবার উদ্দেশ্যে 'যাবনী মিশাল' ভাষা ব্যবহার করেছিলেন।

আরবী-ফারসির অন্তর্ভুক্তি

বাঙলা ভাষায় সচেতনভাবে, বিশেষতঃ গদ্যসাহিত্যে প্রভূত পরিমাণ আরবী ফারসি ভাষা মিশেল দিয়ে একপ্রকার 'মুসলমানী বাঙলা' প্রচলনের চেষ্টা শুরু করেছিলেন উত্তর ভারত থেকে আগত কিছু 'আশরাফ' মুসলমানরূপে খ্যাত উর্দু-ভাষী অভিজাত মুসলমান এবং তাদের এদেশীয় কিছু চেলা-চামুণ্ডা। উনিশ শতকের ত্রিশের দশকে ফারসি ভাষাকে সিংহাসনচ্যুত করে ইংরেজিকেই সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করবার পর থেকেই সেই অভিজাত মুসলমানদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল। শতকের শেষার্ধে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর থেকেই উর্দু ভাষার প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের মধ্যে সচেতন প্রচেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু অতিস্বল্পকাল মধ্যেই সাধারণ বাঙালী মুসলমানের মনে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ১৯০০ খ্রীঃ 'নূর-আল-ইমান' নামক মুসলিম পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হয়েছে, "আমাদের বঙ্গীয় মুসলমানের কোন ভাষা নাই। শরিফ-সন্তানেরা এবং তাদের খেদমৎগারগণ উর্দু বলেন, বাঙালা ভাষা ঘৃণা করেন, বাঙ্গালা ভাষাকে হিন্দুর ভাষা বলিয়া ঘৃণা না করিয়া আপনাদের অবস্থা ও সময়ের উপযোগী করিয়া লউন।" এর তিন বৎসর পর 'নবনূর' পত্রিকায় 'মাতৃভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান' প্রবন্ধের লেখক লিখেছেন ঃ "বঙ্গভাষা ব্যতীত বঙ্গীয় মুসলমানেরা মাতৃভাষা আর কি হইতে পারে? যাহারা উর্দুকে বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃভাষার আসন প্রদান করিয়া সমগ্র ভারতে মুসলমানের একই মাতৃভাষা করিতে চান, তাহারা কেবল অসাধ্য সাধনের জন্য প্রয়াস করেন মাত্র।" এই প্রচেষ্টা ও প্রতিক্রিয়ার টানা-পোড়েনের অন্ত্য ঘটে ১৯৭১ খ্রীঃ বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর। ভাষার ক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের এই সমন্বয়ীভাব বস্তুতঃ এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত — বাঙালী সংস্কৃতির এটি একটি অত্যুজ্জ্বল দিক।

লোকসাহিত্যে সমন্বয়

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে রচিত যে গাথাকাব্যগুলি 'ময়মনসিংহ-গীতিকা'য় এবং "পূর্ববঙ্গ-গীতিকা'য় সঙ্কলিত হ'য়েছে এবং এখনো হয়ে চলছে, এদের প্রতিটি কাহিনীতেই সমন্বিত সংস্কৃতির রূপটিই ধরা পড়ে। কী অনায়াস দক্ষতায় হিন্দুকবি মুসলিম এবং মুসলমান কবি হিন্দু জীবনের লৌকিক জীবন কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করেছেন এবং উভয় ধর্মীয় কবিই কাব্যের নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে একজন হিন্দু ও অপর জন মুসলমান এরূপ অসম সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে গেছেন, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তার জন্য যে

কোন কবিকে ধিকৃত হতে হয়েছিল কিংবা তৎকালে কোন সমাজ-বিপর্যয় ঘটেছিল, তেমন কোন প্রমাণ নেই। বস্তুতঃ হিন্দু-মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সহনশীলতার মনোভাবই তৎকালে বাঙালী সংস্কৃতির বুনিয়াদ গড়ে তুলেছিল। এই সহনশীলতার পরিচয় যে ঐ কালে উভয়-সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে প্রসারিত হয়েছিল, তার রেশ এবং পরিচয় একালেও বর্তমান।

হিন্দুর ধর্ম বড় ছুঁৎমার্গী, অর্থাৎ স্পর্শদোষে তার জাতি-ধর্ম বিনষ্ট হয়, আর মুসলিম ধর্ম একেশ্বরবাদী, কোন পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় সেখানে নেই, অথচ কী অনায়াসেই 'সত্যনারায়ণ/ সত্যপীর, দক্ষিণরায়, গাজীওলা বিবি' প্রভৃতি কত সহজেই উভয় সমাজে যথেষ্ট প্রশ্রয় লাভ করেছে। এছাড়া পল্লীবাঙলার লোকসঙ্গীতগুলিতে তো ঐই সমন্বয়ী মনোভাবেরই প্রতিফলন ঘটেছে — বাউল, মুর্শিদা, গাজীপীরের গান, দেহতত্ত্বের গান, এমন কি সারি, জারি, ভাটিয়ালি প্রভৃতি গানে এবং 'কর্তাভজা', 'সাহেবধনী', প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক মতবাদেও সেই হিন্দু-মুস্লিম সমন্বয়-সুর ধ্বনিত হ'য়ে চলছে।

[ছয়] বাঙালী জাতির উদ্ভব

পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে এবং প্রসঙ্গক্রমে পরেও বহুবারই বাঙালী জাতি এবং তার উদ্ভব-বিষয়ে কিছু আলোচনা কিংবা মন্তব্য করা হয়েছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে মূলতঃ একটি কথাই বলা হয়েছে যে বাঙালী এক মিশ্রজাতিএবং তার উপাদানসমূহ প্রধানতঃ ভাবতের প্রাগার্যজাতিসমূহ, যথা — (১) 'নিষাদ' বা 'প্রোটো-অস্ট্রীক' বা 'অস্ট্রীক' জাতি — বর্তমান কালে প্রধানতঃ পূর্ব ও মধ্যভারতের নিবসিত কোল-ভীল-সাঁওতাল-মুণ্ডা গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ; (২) 'দ্রাবিড়' — বর্তমান কালে ভারতবর্ষের দক্ষিণ অঞ্চলের তামিল, তেলুগু, কানারিজ ও মালয়ালী গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ, যাদের সামান্য কিছু অংশ পশ্চিম বাঙলার 'ওঁরাও', বেলুচিস্তানের ব্রাহুই-ভাষী এবং মধ্যপ্রদেশের আরও কিছু গোষ্ঠীর মধ্যেও বর্তমান; (৩) 'কিরাত' বা 'ভোটবর্মী' তথা মঙ্গোলগোষ্ঠী —— যাদের মধ্যে ভুটান, সিকিম ছাড়াও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের নাগা, কুকি, লেপ্‌চা, গারো প্রভৃতি এবং সামান্য পরিমাণে উত্তর-পূর্ব বাঙলায় দেখা যায়; (৪) এর উপর রয়েছে আর্যগোষ্ঠীর কিছু অংশ। এদের সংমিশ্রণজাত বাঙালীর রক্তে উপাদান হিশেবে 'নিষাদ-দ্রাবিড়' অংশই প্রধান অথবা 'মোঙ্গল রক্তে'রও বড় অংশ রয়েছে — পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এই অভিমত নিয়ে দীর্ঘকাল বিতর্ক চলছিল। ছিটে-ফোটা আর্য রক্ত যে তাতে মিশেছে, তাও স্বীকার্য এবং সেটি সম্ভতঃ অন্তিম পর্বের ঘটনা। তবে রক্তগত তথা বংশগত বিচারে এই মিশ্রত্ব স্বীকৃত হ'লেও 'বাঙলা ভাষা' এবং 'বাঙালী সংস্কৃতি' যে মূলতঃ আর্যধারা থেকে আগত, এবং তাতে প্রাগার্য উপাদান অনেক স্বল্পতর ও পরবর্তীকালে সাঙ্গীকৃত — এই তত্ত্বও প্রায় সকলেই স্বীকার ক'রে থাকেন। বস্তুতঃ এই তত্ত্বটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তীকালে একজন প্রধান ইংরেজ রাজপুরুষ স্যর হাবার্ট রিজ্‌লে আই. সি. এস.-কর্তৃক প্রচারিত।

প্রচলিত অভিমত

রিজ্‌লে স্বয়ং নৃবিজ্ঞানী ছিলেন না। পূর্বকৃত বিভিন্ন মতবাদ এবং ভারতের লোকগণনার বিভিন্ন প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করেই তিনি এই তত্ত্বে উপনীত হয়েছিলেন এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষিত সমাজে এই অভিমতই প্রায় সর্বজন-দ্বারা গৃহীত ও প্রচারিত হয়ে আসছিল। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থেও পূর্বাবধি এই অভিমতটিই গৃহীত ও আলোচিত হয়ে আসছে এবং এরই ভিত্তিতে আনুষঙ্গিক সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত ও আলোচিত হয়েছে।

সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ বর্তমান গ্রন্থকারের মনে এই অভিমতটির গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে তীব্র সংশয় অনুভূত হয়েছিল। যে সকল সূত্রের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয় তার সমীচীনতা এবং গ্রহণযোগ্যতা যে কিছুতেই বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে না এ কথাই মনে হয়েছিল। এর কারণটাও সহজ। বাঙালী জাতির মূলভিত্তি যদি গঠিত হয়ে থাকে প্রাগার্য উপাদানের সাহায্যে, তবে তার ভাষা এবং সংস্কৃতির মূলভিত্তিও রচনা করবে এই প্রাগার্য ভাষা ও প্রাগার্য সংস্কৃতি — এ ছাড়া এর দ্বিতীয় কোন পরিণতি সম্ভবপর নয়। পরবর্তীকালে সামান্যতঃ আর্যরক্তের মিশ্রণ ঘটে থাক্‌লে ভাষা এবং সংস্কৃতিতেও তার প্রভাব তত্তুল্য সামান্য পরিমাণই হ'তো এটাই হ'তো একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু বাস্তবে যা আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা' সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। বাঙালীর দৈহিক গঠনে প্রাগার্য তথা অনার্য উপাদান আর মুখের ভাষা ও মানসিক সংস্কৃতিতে আর্যধারা — এ জাতীয় 'বকচ্ছপ' সঙ্কর জীবের অস্তিত্ব রূপকথার জগতে চল্‌তে পারে, বাস্তবে নয়। অতএব পূর্বোক্ত অভিমতটি যাচাই ক'রে ভিন্নতর গবেষণা থেকে আহৃত উপাদানের সাহায্যে প্রকৃত তথ্য ও অভিমত সংগ্রহের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

সংশয়ের ভিত্তি

স্যর হাবার্ট রিজ্‌লের মতবাদের যাথার্থ্যের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম অঙ্গুলি সংকেত করেন প্রখ্যাত বাঙালী গবেষক মনীষী রমাপ্রসাদ চন্দ। তিনি ১৯১৬ খ্রীঃ তাঁর *The Indo-Aryan Races* নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। সেই গ্রন্থেই তিনি প্রথম রিজ্‌লে-বর্ণিত 'মোঙ্গল-দ্রাবিড়' সংমিশ্রণে উদ্ভূত গোলমুণ্ড মিশ্রজাতি-রূপে বাঙালীর পরিচয় অস্বীকার করেন এবং তৎ-পরির্বতে বাঙালী যে আর্যজাতিরই একটি শাখা — এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

বাঙালীব আর্যত্ব

প্রখ্যাত পর্যটক ও পুরাতত্ত্ববিদ স্যার অরেলস্টাইন হিন্দুকুশ, পামীর ও পূর্ব তুর্কীস্থানের অধিবাসীদের বিষয়ে নানা তথ্য সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন যে প্রাচীনকালে সমগ্র পূর্ব তুর্কীস্থানে এক 'অমোঙ্গলীয়' গোলমুণ্ড জাতি বাস করতো এবং এদের ভাষা ছিল আর্যগোষ্ঠীর ভাষা। তাকলামাকান ও লব মরুভূমির বালুকাস্তরের নিম্নে বিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপে এই জাতির অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রসিদ্ধ নৃবিজ্ঞানী-ও এই তত্ত্ব সমর্থন ও প্রচার করেছেন। রমাপ্রসাদ চন্দ মনে করেন, পূর্ব তুর্কীস্থানের আদিম অধিবাসী আর্যভাষাভাষী গোলমুণ্ড এই জাতি পামীর ও হিন্দুকুশ অতিক্রম করে সিন্ধু উপত্যকায় উপনীত হয়। সেখান থেকে সম্ভবতঃ ভারতের

আদি বাসস্থান ঃ
পূর্ব তুর্কীস্থান

পশ্চিম উপকূল ধরে দক্ষিণে গুজরাট, মহারাষ্ট্রে এসে পূর্বদিকে বিন্ধ্যপর্বতের পাশ কাটিয়ে কর্ণাটক-অন্ধ্রের কিছু অংশের উপর দিয়ে উড়িষ্যায় উপনীত হয়। তৎপর সম্ভবতঃ জল-জঙ্গলে পরিপূর্ণ গঙ্গার বদ্বীপ অঞ্চল এড়িয়ে বিহারের ভিতর দিয়ে উত্তর বাঙলায় উপনীত হয়েছিলেন। যে গোলমুণ্ড আর্যগণ মধ্য ও উত্তর ভারতকে এড়িয়ে পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্বভারত পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল, রমাপ্রসাদ চন্দ এদের 'অবৈদিক আর্য' এবং মধ্যদেশের আর্যদের বৈদিক আর্য নামে চিহ্নিত করেছেন। ভাষাগত শ্রেণীভেদের এই তত্ত্ব তৎপূর্বেই *Inner Aryan and Outer Aryan Theory* নামে স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন পূর্বেই প্রচার করেছিলেন। তবে তাঁর গবেষণার সূত্র ছিল ভিন্নতর। প্রসিদ্ধ ইতালীয় নৃবিজ্ঞানী জিফ্রিদা রুগ্গেরিও বাঙালীর মধ্যে মোঙ্গল মিশ্রণ-তত্ত্ব অস্বীকার ক'রে রমাপ্রসাদ চন্দের যুক্তি স্বীকার করে নিয়েছেন। ডাঃ হেডনও মোটামুটি এই তত্ত্ব মেনে নিয়েছেন।

এখানে আর একটি প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে। যুরোপীয় ভাষা-বিজ্ঞানী পণ্ডিতমণ্ডলীর অভিমত শিরোধার্য করে আমরা এতকাল স্বীকার করে আসছি যে, আর্যগণ ভারতবর্ষে বহিরাগত এবং তাদের আগমনকাল মোটামুটি খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দ কিংবা বড়জোর খ্রীঃ পূঃ ১৭০০ অব্দ থেকে আরম্ভ। কিন্তু রমাপ্রসাদ চন্দের অভিমতটি স্বীকার করতে গেলে এই বহুপোষিত বিশ্বাসটিকে বিসর্জন দিতে হয়। কারণ যে সমস্ত নৃতাত্ত্বিক গবেষক হরাপ্পা-মোহেঞ্জোদরোয় প্রাপ্ত নরকঙ্কালসমূহ পরীক্ষা করেছেন, তাঁদের মতে রমাপ্রসাদ চন্দ কথিত পূর্ব তুর্কীস্থানের তাকলামাকান ও পামীরে প্রাপ্ত 'a very brachycephalic population of Aryan or Indo-European Speech' গোলমুণ্ড আর্যভাষীগণ সিন্ধু উপত্যকায় তাম্রযুগেই উপস্থিত ছিলেন এবং সেই সময়টা অনুমিত খ্রীঃ পূঃ ৩৫০০-৩২৫০ অব্দ। তাহলে ভারতে আর্যজাতির আগমন যুরোপীয় পণ্ডিতগণ-নির্ধারিত সময়ের অনেক পূর্বেই সে সাধিত হয়েছিল, 'নৃবিজ্ঞানের সাক্ষ্যে'তা মেনে নিতে হয়। এবং প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য — বৈদিক সাহিত্য ও মহাকাব্যাদির সাক্ষ্য এর পরিপূর্ণ সমর্থক।

আর্য-আগমন-কাল

প্রখ্যাত বাঙালী নৃতাত্ত্বিক, বিজ্ঞানী ডঃ বিরজাশঙ্কর গুহের কথা এতক্ষণ উল্লেখ করা হয় নি। হয়তো যুরোপীয় বিজ্ঞানীদের প্রতি অতিশয়িত শ্রদ্ধাভক্তিই এর মূল কারণ। কিন্তু বৈদিক সাহিত্য ও রামায়ণ-মহাভারত আদি প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হবার পরই যুরোপীয় পণ্ডিতদের তত্ত্ব-বিষয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। এমন কি আর্যগণ যে বাইরে থেকে ভারতবর্ষে আগমন করেছেন, এই বিশ্বাসেও চিড় ধরেছিল। বেদ-পুরাণ-ইতিহাস-মহাভারত-আদিতে সৃষ্টিকাল থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় কাহিনী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করে যেতে কল্পনা কখনো বাধাপ্রাপ্ত হয়নি, সদ্য-অতীতের কথা তারা ঘুণাক্ষরে ইঙ্গিতেও প্রকাশ করলেন না কেন, এই প্রশ্নের কোন মীমাংসা ক'রে উঠতে পারিনি। ডঃ গুহ এবং তৎসহ পরবর্তীকালের অনেক বৈজ্ঞানিক রচনা থেকে তার একটা সম্ভাব্য উত্তর পাওয়া গেছে।

ডঃ গুহ এবং কর্ণেল সেওয়েল হরপ্পা-মোহেঞ্জোদাড়োয় প্রাপ্ত নরকঙ্কালগুলির মধ্যে পূর্বকথিত ইরানো - পামীর গোষ্ঠীর গোলমুণ্ড বৈদিক পূর্বযুগের কোন জাতির উপস্থিতি লক্ষ্য

করেছেন। ডঃ গুহ এই নরগোষ্ঠীকে প্রাচ্যগোষ্ঠী (Mediterranean Stock, Oriental Type) নামেই অভিহিত করেন। ইতঃপূর্বেই ফিশার এবং আইকস্টাইড্ এই নামটি ব্যবহার করেছেন। এই গোষ্ঠী পূর্বোক্ত স্যর হার্বার্ট রিজ্‌লে কথিত 'ইন্দো-আরিয়ান' এবং ডঃ হেডন ও অপরদের দ্বারা অভিহিত কথিত 'ইন্দো-আফগান' গোষ্ঠী।

সমাধান

এইবার একটি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ দীর্ঘকাল সাড়ম্বরে প্রচার করে আসছেন এবং আমরাও সরল অন্তকরণে বিশ্বাস করে আসছি যে, সিন্ধুতীর এবং গঙ্গার উত্তর তীরস্থ মধ্যভারতে দীর্ঘমুণ্ড আর্যগণই বেদ রচনা করেন এবং তাঁরা আঃ খ্রীঃ পূঃ সপ্তদশ শতকের দিকে ভারত-ভূমিতে প্রবেশ করেন। এদের মূল বাসস্থান ছিল দক্ষিণ-পূর্ব রাশিয়া কিংবা উত্তর-পশ্চিম খিরঘিজ প্রান্তর। এখান থেকেই একটি ধারা ক্রমশঃ য়ুরোপ খণ্ডে এবং অপর একটি ধারা ইরান হয়ে ভাবতের সিন্ধু-গঙ্গা বরাবর বিস্তার লাভ করে। এরা শ্বেতকায়, দীর্ঘদেহী, উন্নতনাসা এবং দীর্ঘমুণ্ড আর্যজাতি। ভারতবর্ষে এরা বৈদিক সাহিত্য রচনা করে 'বৈদিক আর্য-রূপে খ্যাত। এবং এই তত্ত্বটি 'য়ুরোপীয় আর্যবাদ' নামে প্রচলিত। ভারতবর্ষের জাঠ, রাজপুত প্রভৃতি মধ্য ভারতীয় অঞ্চলের গোষ্ঠীগুলিকে স্যর রিজ্‌লে যে 'দীর্ঘমুণ্ড' বলে অভিহিত করে 'ইন্দো-আরিয়ান' সংজ্ঞায় ভূষিত করেছেন, তার কৈফিয়ৎ-স্বরূপ তিনি স্বীকার করেছেন, এর পশ্চাতে ছিল ঐতিহ্যগত বিশ্বাস এবং ভাষাবিজ্ঞানের যুক্তি, কিন্তু তিনি নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের কোন প্রমাণ এর সমর্থনে পান নি।

বৈদিক আর্য

দীর্ঘমুণ্ডগোষ্ঠীর বৈদিক আর্যদের মতোই দীর্ঘমুণ্ডগোষ্ঠীর ইরানীদের দ্বারা 'আবেস্তা' রচনার ঐতিহ্যও দীর্ঘকাল প্রচলিত। বর্তমানকালে দীর্ঘমুণ্ড আফগান ও পাঠানদের উক্ত প্রাচীন ইরানীদের বংশধবরূপে দাঁড় কবিয়ে উক্ত যুক্তির সারবত্তা প্রমাণ করা যায়। কিন্তু নৃ বিজ্ঞানীগণ সেখানেও বাদ সাধলেন। তারা বলেন, প্রাচীন ইরানীদের বংশধর হলো বর্তমান তাজিক জাতি এবং এরা গোলমুণ্ড। কাজেই বস্তুতঃ নৃ-বিজ্ঞানীদের যুক্তিতে 'আবেস্তা' প্রণেতা ইরানী এবং বেদপ্রণেতা ভারতীয়গণ সাধারণভাবে সকলেই গোলমুণ্ড আর্যভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর বংশধর, এই তত্ত্বই মেনে নিতে হয়।

কিন্তু এত দীর্ঘকাল যাবৎ দীর্ঘমুণ্ড গোষ্ঠীর যে তত্ত্ব ঐতিহ্য-রূপে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং বর্তমান আফগান, পাঠান কিংবা বাজপুত, জাঠ কিংবা গঙ্গাকূলবর্তী অপর কোন কোন জাতির মধ্যে দীর্ঘমুণ্ডগোষ্ঠীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তাবও একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নৃ-বিজ্ঞানের সহায়তা না পাওয়া গেলেও তাত্ত্বিকগণ এদের 'প্রোটো-নর্ডিক' গোষ্ঠী নামে অভিহিত করে থাকেন। ডঃ গুহ এই কল্পিত 'প্রোটো-নর্ডিক' গোষ্ঠীকে মেনে নিয়েছেন এবং আর্যদের মধ্যে এরাই হযতো সর্বশেষে আগত — এরূপ মনে করে থাকেন।

আফগান পামীর, রাশিয়ান পামীর ও চীনা পামীর এবং তাকলামাকান অঞ্চলের নৃতাত্ত্বিক

তথ্য যা স্যর অরেলস্টাইল সংগ্রহ করেছেন, এবং মিঃ জয়েস কর্তৃক বিশ্লেষিত হয়, আর প্রসিদ্ধ নৃতাত্ত্বিক উজ্ফাল্ভীর তথ্য যে সিদ্ধান্তের প্রতি অঙ্গুলি-সঙ্কেত করে, তা' হলো — সদ্যঃ উল্লেখিত পামীর জাতি, তাকলামাকান উপজাতি, ডঃ গুহ-সমর্থিত 'প্রোটো-নর্ডিক' উপজাতি — এই সমস্ত অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে পামীরী-ইরানী গোষ্ঠীর গোলমুণ্ড - মানুষেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। কাজেই আর্যভাষী ইরানী জাতিও যে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, তার সমর্থন পাওয়া যায়।

তাহলে 'আর্যজাতি' কারা? ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক সকলেই 'আর্য' নামক কোন জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। একটা বিশেষ ভাষাগোষ্ঠীই 'আর্যভাষা' নামে পরিচিত এবং এই সূত্রেই এই আর্যভাষা-ব্যবহারকারীরাও বাক্-সংক্ষেপ করে নিজেদের 'আর্যজাতি' নামে অভিহিত করে থাকেন। কিন্তু নৃ-বিজ্ঞানের গোষ্ঠী-বিচারে আর্যভাষা-ব্যবহার-কারীরা বহু বিচিত্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত, একেব সঙ্গে অপরের কোন মিল না-ও থাকতে পারে।

'আর্য' শব্দটি মূলতঃ ভাষা-বাচকও নয়, আদৌ এটি সম্ভবতঃ জাতিবাচক অর্থেই ব্যবহৃত হতো এবং এই অর্থেই হযতো দেশ-নাম ছিল 'আইরাণ'। অনুমান করা যেতে পারে প্রাচীন পারসিক তথা ইরানী ভাষায় শব্দটি ছিল 'আইরানাং বএজো' অর্থাৎ 'আর্যানাং বএজো' - যার সমরূপ ও সমার্থক হতে পারে সংস্কৃত 'আর্যানাং বীজঃ' উচ্চারণে প্রায় 'আইরানাং বীজঃ'। আর্যদের বীজভূমি তথা মূলভূমি — এইরূপ অর্থে দেশনাম-হিশেবে আমরা বলি 'ভোষ্টানাং দেশঃ' = 'ভোটান/ভুটান'। বর্তমান কালের 'ইরানে'র মূলে রয়েছে এই 'আইরান' বা 'আইরিয়ানা' শব্দ, যেমন, ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষা পরিবারের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত 'আয়ার্ল্যাণ্ডে'র 'আয়ার' শব্দের মূলে এই 'আর্য' বা 'আরিয়' শব্দটি।

আইবান

প্রাচীন 'আইরিয়ানা' বা 'আইরান' দেশটির পূর্ব সীমান্ত ছিল পামীর মালভূমি, উত্তরে অক্সাস উপত্যকা, পশ্চিমে সম্ভবতঃ ইরাক ও দক্ষিণে সাগর। ফলে সিন্ধু উপত্যকা, আফগানিস্থান ও ইরাক প্রভৃতি অঞ্চল ছিল, এই 'আইরিয়ানা'/'আইরান' এর অন্তর্ভুক্ত এবং এর অধিবাসীরাই 'আর্য'/'আরিয়'/ 'আইরি'ও নামে পরিচিত ছিল। একালের ভাষাবিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর যে বংশগত শ্রেণীবিভাগ কল্পনা করেন তাতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাষারূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে, 'ইন্দোয়ুরোপীয় গোষ্ঠী' তথা 'আদি আর্যভাষা'। তার দু'টি প্রধান পরিবারের একটি সতম্ গোষ্ঠীর চারটি ধারার মধ্যে প্রধানতমটিই হ'লো 'ইন্দো-ইরানীয়' তথা সদ্যঃ-কথিত এই 'আর্য'-জাতির ভাষা 'আর্য/আরিয়/আরিও'। আর এরই একটি শাখা ইরানে 'ইরানী' ভাষা ও ভারতে 'ভারতীয় আর্যভাষা' নামে অভিহিত হয়।

অতএব পূর্বোক্ত অলোচনা থেকে প্রতিপন্ন হয়, ভারতবর্ষে আর্যগণ অভিযাত্রী কিংবা আক্রমণকারী বহিরাগত কোন জাতি বা গোষ্ঠীর লোক নন, তারা ভারতেরই প্রাচীন অধিবাসী। সিন্ধু অঞ্চলেই এদের আদি নিবাস ছিল। প্রাচীন আইরিয়ানার দক্ষিণ অংশের অধিবাসীরাই রচনা করেছিলেন ঋগ্বেদ বা বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতর অংশ এবং উত্তরাংশের

অধিবাসীরা কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালে রচনা করেন 'আবেস্তা'। ঋগ্বেদ ও আবেস্তার ভাষা-বিচারেও এই সূত্র সমর্থিত হয়। অতএব য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের আর্য-কর্তৃক ভারত অভিযান তত্ত্ব আর সমর্থনযোগ্য নয়। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ বা সপ্তদশ শতকে নয়, তার বহুপূর্বেই বেদ-আবেস্তা রচনার বহুপূর্বে, এমন কি হরপ্পা-মোহেনজোদড়োতে এক জাতীয় নাগরিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠারও পূর্বেই ইরানো-পামীরী গোষ্ঠীর গোলমুণ্ড আর্যগণ যে প্রায় সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার নৃতাত্ত্বিক সাক্ষ্য প্রমাণও পাওয়া গেছে। অতএব ভারতবর্ষে আর্যজাতি, আর্যভাষা ও আর্য সভ্যতার বিস্তার বিষয়ে নোতুন ভাবনা এবং গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষতঃ দীর্ঘমুণ্ড আর্যদের সমস্যাটির এখনো কোন নৃতাত্ত্বিক সমর্থন পাওয়া যায় নি। যে খিরঘিজ অঞ্চলকে আদি আর্যভূমি-রূপে পূর্বে কল্পনা করা হতো তা প্রাচীন আইরিয়ানা থেকে বহুদূরে অবস্থিত।

আর্যগণ বহিরাগত নয়

প্রসিদ্ধ নৃবিজ্ঞানী গবেষক ননীমাধব চৌধুরী লিখেছেন ঃ "ঋগ্বেদ ও আবেস্তা রচিত হইবার বহুপূর্বে আর্যভাষাভাষী বলিয়া অনুমান করা হয় এইরূপ একটি জাতিকে সিন্ধু সভ্যতার যুগে সিন্ধুদেশে ও পাঞ্জাবে দেখা যায়। এই জাতি কোন মতে বেলুচিস্থান, সিন্ধু, কচ্ছ, গুজরাট, মারাঠা দেশ, কর্নাট দেশ, তামিল দেশ, মধ্যভারত, পূর্ব উপকূলের অন্ধ্র ও উড়িষ্যা হইয়া বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়াছিল, কোন মতে সিন্ধু-গাঙ্গের উপত্যকা বাহিয়া পূর্বমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। এই জাতি প্রাচীন আইরিয়ানার অধিবাসী ও আর্য নামের দাবীদার ছিল। সুতরাং বৈদিক যুগ ভারতবর্ষে আর্য সভ্যতা বিকাশের প্রথম অধ্যায় নহে, আর্য জাতির ভারতবর্ষে উপস্থিতির সমসাময়িক ব্যাপার নহে, অনেক পরে, আর্যপদ যখন জাতিবাচক অর্থ হারাইয়া কৃষ্টিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখনকার ব্যাপার। ঋগ্বেদের আমলে রাজকুল এবং ঋষিকুল উভয়েই যে মিশ্রগোষ্ঠী লইয়া গঠিত ছিল ঋগ্বেদে তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে।"

অতএব আমরা নিশ্চিতভাবে এক্ষণে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, বাঙালী জাতির মূল কাঠামোটি গঠিত হ'য়েছে ইরানো-পামীর অঞ্চল থেকে সিন্ধু-সভ্যতার পূর্ববর্তী আগত গোলমুণ্ড আর্যভাষী জনগোষ্ঠীর বংশধরদের দ্বারা। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষা-ভাষী অনেকে এবং উত্তর ভারতের সমগ্র আর্যভাষাভাষী জনগোষ্ঠীই মূলতঃ তথাকথিত আর্যজাতির বংশধর। বর্তমানে প্রচলিত তথাকথিত 'হরিজন'রাও তার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু 'আদিবাসী' বা 'গিরিজন' সাধারণতঃ নিষাদ বা অষ্ট্রীক গোষ্ঠীভুক্ত, দক্ষিণ ভারতের কেরালা তামিলের অনেকাংশও কর্ণাটকের কিছু অংশের অধিবাসীরা প্রধানতঃ 'দ্রাবিড়-গোষ্ঠীভুক্ত' এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্তের কিছু অংশের অধিবাসীরা প্রধানতঃ 'দ্রাবিড়-গোষ্ঠীভুক্ত' এবং ভারতের উত্তর -পূর্ব সীমান্তের গারো, নাগা, মণিপুরী, লেপ্চা, কুকী প্রভৃতি এবং অসমীয়াদের কতক 'ভোটবর্মী' বা 'কিরাত গোষ্ঠীভুক্ত'। কিন্তু এদের কেউ কেউ যেমন পরিপূর্ণভাবে আর্যসংস্কৃতিভুক্ত, তেমনি আবার আর্যগোষ্ঠীভুক্ত নিম্নস্তরের উপাদানের মধ্যে পরিমাণগতভাবে আদিবাসী উপাদানও যথেষ্ট রয়েছে। নৃতাত্ত্বিক

সিদ্ধান্ত

স্তর এবং সাংস্কৃতিক স্তর সর্বত্র সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়নি। বহুস্থলেই তাদের মিশ্রণ ঘটায় ভেদরেখাটিকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা কখনো সম্ভবপর নয়।

অবশ্য এ কথাও সত্যি যে বাঙলা কিংবা ভারতের কোন জাতিসত্তাকেই অবিমিশ্র আখ্যা দেওয়া চলে না। সম্প্রতি ইরানো-পামীর গোষ্ঠীর আর্যজাতির যে ভারত আগমন এবং তার প্রসারণের কথা বলা হলো অথবা আইরিয়ানার আর্যদের ভারতেরই অধিবাসী বলে যে অভিমত প্রকাশ করা হলো, তাতে শুধু ভারতের আর্যজনগোষ্ঠীরই পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের সমগ্র জনগোষ্ঠীর তা' এক অংশমাত্র।—এই তত্ত্ব দ্বারা ভারতে 'অস্ট্রীক' বা 'নিষাদ', 'দ্রাবিড়' এবং 'ভোট-বর্মী' বা 'কিরাত' জাতির আগমন ও প্রতিষ্ঠাতত্ত্ব খণ্ডিত হয় না। ওরা পূর্বেই ভারতবর্ষে উপনীত হয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হয়েছিল এবং আর্যদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ এবং সমন্বয় যুগপৎ অথবা যথাক্রমে সাধিত হয়েছিল। ফলে জাতিগত মিশ্রণের আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা সংস্কৃতি-সমন্বয়। উন্নত ও শক্তিমান সংস্কৃতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল সংস্কৃতিকে সহজেই গ্রাস করে প্রথমে এবং এর ফলে অনেক অনার্যেরই অন্তর্ভুক্তি ঘটেছিল প্রথমে সংস্কৃতি স্তরে আর পরে তা' একেবারে জাতিসত্তায় লীন হয়ে যায়। কাজেই আজকের বাঙলাভাষী বাঙালীমাত্রই বংশগতভাবে আর্যসন্তান কিনা, নৃতাত্ত্বিক বিচার ছাড়া এর সিদ্ধান্ত হওয়া কঠিন। কাজেই সাধারণভাবে বাঙালী জাতিকে আর নিষাদ-দ্রাবিড়-কিরাত গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে কিঞ্চিৎ আর্যরক্তের মশলায় পাক করা মিশ্রজাতি বলে বিড়ম্বিত করা নিষ্প্রয়োজন — বাঙালী অন্যান্য আর্যভাষী ভারতীয়দের মতোই প্রাচীন আর্যজাতির বংশধর —.এইটিই বৈজ্ঞানিক সত্য। তবে সর্বত্রই কিছু কিছু সংমিশ্রণের সত্যতা অস্বীকার করবার কোন কারণ নেই।

বাঙালী সংস্কৃতি

[এক] বাঙালী সংস্কৃতির উৎস ও ভিত্তি

'সংস্কৃতি' শব্দটির ব্যবহার বাঙলায় খুব বেশিদিন নয়। তার কিছুকাল পূর্ব থেকেই সংস্কৃতি অর্থে 'কৃষ্টি' (Culture) অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছিল। কিন্তু এর সঙ্গে কৃষি-মূলক কৃষ্ ধাতুর সম্পর্ক রয়েছে, এ ছাড়া বেদে Tribe বা জন-জাতি-রূপেও এর ব্যবহার রয়েছে। সর্বোপরি 'কৃষ্টি' শব্দটিও শ্রুতি-সুভগ নয়। হয়তো রবীন্দ্রনাথও এই সমস্ত কারণেই শব্দটির ব্যবহারে সন্তুষ্ট হন নি। আচার্য সুনীতিকুমার মারাঠী ভাষায় Culture -এর প্রতিশব্দরূপে 'সংস্কৃতি' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করেন এবং বিষয়টির প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তিনি সেটি অনুমোদন করেন। সম্ভবতঃ তারপর থেকেই বাঙলা ভাষায় শব্দটি ব্যবহৃত হতে থাকে। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন বৈদিক. সাহিত্যেই 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' বর্তমানে প্রচলিত অর্থেই 'সংস্কৃতি' শব্দটির ব্যবহার পেয়েছেন — 'আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি' অর্থাৎ 'এই শিল্পসমূহই হচ্ছে আত্মার সংস্কৃতি'। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, বর্তমানে বাঙলায় 'সংস্কৃতি' শব্দটির পাশাপাশি 'কৃষ্টি' শব্দটিও প্রচলিত রয়েছে।

সংস্কৃতি

যে কোন জাতির সুদীর্ঘ জীবনচর্যায় তার একটা নিজস্ব সংস্কৃতি ফুটে ওঠে। কিন্তু তার বিশেষ রূপটিকে ভাষার চিত্রে যথাযথভাবে প্রকাশ করা একটা কঠিন ব্যাপার। তবু 'সংস্কৃতি' বল্‌তে কী বোঝায়, তা বল্‌তে অসুবিধে নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে একটি প্রধান চরিত্রের মুখ দিয়ে সংস্কৃতি বা culture বল্‌তে বুঝিয়েছিলেন যে কমলহীরের টুকরো হলো যেন বিদ্যা আর তা থেকে নির্গত দ্যুতিটাই সংস্কৃতি। এখানে বিদ্যা বল্‌তে অবশ্য শুধু পুথিগত বিদ্যা বা জ্ঞানকেই বোঝানো হয়নি, এটা হোল অর্জিত জ্ঞানসমষ্টি, আর সংস্কৃতি হলো তারই নির্যাস। প্রথমটার রয়েছে বস্তুভার, পরেরটিতে তার ভাবরূপ। আচার্য সুনীতিকুমার খুবই স্পষ্ট করে বলেছেন ঃ "Civilisation বা 'সভ্যতা' বলিলে আমরা ব্যাপকভাবে উৎকর্ষপ্রাপ্ত বা উন্নত মানব সমাজের বহিরঙ্গ — তাহার উন্নত জীবনযাত্রা পদ্ধতি, তাহার সামাজিক রীতিনীতি, তাহার রাষ্ট্রনীতি, তাহার রূপশিল্প, বাস্তুশিল্প, পূর্ত, সাধারণভাবে তাহার সাহিত্য ও ধর্ম, এইসব বুঝি, এবং Culture বা সংস্কৃতি বলিলে বুঝি — তাহার উন্নত জীবনের অন্তরঙ্গ বস্তুগুলি — তাহার আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবন, তাহার সামাজিক জীবনের সৌন্দর্যময়

'সংস্কৃতি'র অর্থ

প্রকাশ, তাহার সাহিত্য সৌন্দর্যবোধ, তাহার বাহ্য সভ্যতার আভ্যন্তর প্রাণবস্তু যাহা, মুখ্যতঃ তাহাই বুঝি। সভ্যতাতরুর পুষ্প যেন সংস্কৃতি।"

'বাঙালী সংস্কৃতি' বল্‌তে যথার্থ কী বোঝায়, তা বুঝতে হলে 'বাঙালী জাতির সংস্কৃতি' এবং 'বাঙালী জাতির ইতিহাস'-বিষয়ে বিশেষ অবহিত হওয়া প্রয়োজন, কারণ এ দুটির ইতিহাস একেবারে অভিন্ন সূত্রে জড়িত। এ বিষয়ের আলোচনায় বাঙালী সংস্কৃতি-চর্চার প্রাণপুরুষ এবং প্রামাণিক ব্যক্তিত্ব আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতামত শিরোধার্য করে গুটিকয় উদ্ধৃতি সন্নিবেশ করা হচ্ছে। এর ফলেই বাঙালী জাতির ইতিহাস ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বাঙালী সংস্কৃতির উৎস-আদির সামগ্রিক পরিচয়ের একটি সুস্পষ্ট ধারা বিষয়ে অবহিত হবার সুযোগ পাওয়া যাবে। এ বিষয়ে তাঁর 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি' নামক প্রবন্ধটির সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে।

ইতিহাস ও সংস্কৃতি

আচার্যদেব বলেন ঃ "কোনও জাতির বা মানব সমাজের ইতিহাস হইতেছে, তাহার সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস। বাঙ্গালীর ইতিহাসের আলোচনা করিতে গেলে, তাহার সংস্কৃতির আলোচনাই মুখ্যবস্তু হইয়া পড়ে।" অন্যত্র বলেছেন, "বাঙ্গালীর ইতিহাস অর্থাৎ বাঙ্গালীর সংস্কৃতির ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি ধরিয়াই আরম্ভ করিতে হয়।" এ থেকে আমরা সূত্র পেলাম যে, বাঙালী জাতির ইতিহাসকে অবলম্বন করেই বাঙালী সংস্কৃতির উদ্ভব ও ভিত্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু সমস্যা হলো, বাঙালী জাতিত্বের সূত্রপাত কখন থেকে, তা নির্ণয় করবার উপায় কি, কোন্ সূত্রকে নির্ভর করে জাতি হিশেবে বাঙালী জাতি গড়ে উঠে। আচার্যদেব তার উত্তরে বলেন ঃ "আজকাল সমভাষিতা জাতীয়তার প্রধান লক্ষণ বলে ধরা হয়। যতদিন বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব হয় নাই, ততদিন বাঙ্গালী জাতি বলিয়া একটা কিছুব কল্পনা করা যায় না। বাঙ্গালী জনগণের পূর্বপুরুষ যখন অন্য ভাষায় কথা বলিত, তখন তাহাদের ঠিক বাঙালী বলা চলে না।" অতএব বাঙালী জাতি, বাঙালী সংস্কৃতি এবং বাঙলা ভাষার ইতিহাস এক অভিন্নসূত্রে গ্রথিত হ'য়ে যথার্থ বাঙলা ও বাঙালীর ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এইবার বাঙলা ভাষার উৎপত্তি কাল নির্ণয় করতে হয়। "খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙ্গলায় সুবিখ্যাত পাল রাজবংশের অভ্যুদয় ঘটে। মনে হয়, সেই সময়ে অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোট-চীন জাতীয় লোকেরা উত্তর ভারতের ও বিহারের আর্যভাষী ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে সমভাষী হইয়া যাইবার ফলে এক ভাষার সূত্রে গ্রথিত একটি বিশিষ্ট **nation** বা জনগণ-এ পরিণত হইয়াছিল।" এইকালে বাঙালী জাতি-রূপে গড়ে উঠলেও বাঙলা ভাষার সন্ধান অর্থাৎ যথার্থ নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে আরও কিছু পর থেকে। তবু সংস্কৃতির বিচারে আমরা বাঙালী জাতির উদ্ভব-কাল থেকেই বাঙালী সংস্কৃতির সন্ধান করতে পারি। কথাটা আর একটু স্পষ্টতর করা যেতে পারে।

[দুই] বাঙালী সংস্কৃতির স্বরূপ ও বিকাশ

আচার্য সুনীতিকুমার বিচার করে দেখিয়ে দিয়েছেন অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোট-জাতীয় লোকেদের সঙ্গে উত্তর ভারত ও বিহারের আর্যভাষাভাষী ঔপনিবেশকদের অর্থাৎ আর্যদের সমভাষিত্বে মিশ্রিত হবার পরই বাঙালী একটি nation বা জাতিরূপে গড়ে ওঠে। অতএব বাঙালী জাতির সংস্কৃতি বল্‌তে এই ভিন্ন প্রজাতির মিশ্রিত সংস্কৃতিকেই বোঝায়। কিন্তু বাঙলাদেশে এক এক সময় এক একটি জাতি এসে বসবাস করবার ফলে তাদের প্রত্যেকের সংস্কৃতি প্রথমে স্বতন্ত্রভাবে এবং পর্যায়ক্রমে মিশ্রিতভাবে রূপ থেকে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে সংমিশ্রিত হতে হতে যখন চারিটি ভিন্নজাতির সমীকরণের ফলে এক অভিন্ন জাতি-রূপে পরিণত হলো, তখনই তা 'বাঙালী সংস্কৃতি' রূপে পরিচিত হবার যোগ্যতা অর্জন করলো। কাজেই বাঙালী জাতির উদ্ভবকাল-রূপে যদি খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীকে ধরে নেওয়া যায়, তবে তার উৎস-রূপে পাওয়া যাচ্ছে, পৃথক পৃথক ও সম্মিলিতভাবে অষ্ট্রিক বা কোল-সাঁওতাল জাতি, দ্রাবিড় জাতি, ভোট-চীন এবং আর্যভাষী জাতির যে ধারাগুলি বাঙলাদেশে এসে এক জাতিত্বে পরিণত হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের স্বকীয় সংস্কৃতি এবং মিলিত সংস্কৃতিকেই। সেই বাঙালী সংস্কৃতি জড় নয়। প্রাগার্যরা বাঙলার বুকে যে সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল, আর্য-সংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বয় হেতু তা আবার নোতুন সংস্কৃতির রূপ লাভ করে। ইতিহাসের সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমার কতকটা আপন স্বভাব ধর্মে কতকটা বহিঃ-প্রভাবহেতু সেই বাঙালী-সংস্কৃতি নব নব রূপে পরিবর্তিত হতে হতে আজ বিশ্ব সংস্কৃতির সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটাতে যাচ্ছে। বাঙালী সংস্কৃতির স্বরূপ এবং তার বিকাশের একটা রূপরেখা দান প্রয়োজন।

মিশ্র সংস্কৃতি

প্রাগার্য অষ্ট্রিক বা কোল-সাঁওতাল, দ্রাবিড় এবং ভোট-চীনা গোষ্ঠীর কারা কখন কোথায় এসে বাঙলার বুকে স্থায়িভাবে বসতি স্থাপন করেছিল, সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কারো পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে আর্যদের আগমন ঘটেছিল অন্ততঃ মৌর্যযুগেই, এটুকু নিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে। তৎপূর্বে অর্থাৎ পূর্ববর্তী কালে বাঙলাদেশে যে সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়, তা কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু-নিদর্শন। বাঙলার বিভিন্ন স্থানে যেমন পাণ্ডুরাজার ঢিবি, চন্দ্রকেতুর গড় প্রভৃতি উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু-নিদর্শন থেকে এদের উদ্ভব কাল প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার সমকাল বলে অনুমান করা হয়। এরপর আর্য আগমন ও সমভাষিতার ফলে "প্রাচীন অনার্য ভাষা, অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় স্বয়ং লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এগুলি প্রাচীন আর্যভাষার প্রকৃতিকে নানা বিষয়ে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে, এবং প্রচ্ছন্নভাবে খিড়কি দরজা দিয়া বহু অনার্য শব্দ আর্যভাষায় স্থান করিয়া লইয়াছে।" নৃতাত্ত্বিক বিচারে গড় বাঙালীর দেহে রয়েছে বিভিন্ন প্রাগার্য ও আর্যজাতির মিশ্রণ এবং বাঙালীর ভাষা প্রধানতঃ আর্যকুলজাত হলেও তাঁতে যেমন বেশ কিছু প্রাগার্য শব্দ প্রবেশ লাভ

প্রাগার্যকালের বস্তু-নিদর্শন

করেছে, তেমনি বাঙলার মূলভাষা-প্রকৃতিকেও প্রাগার্য ভাষা কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করেছে। এ ছাড়া বাঙলাদেশে বাঙালী সংস্কৃতির উদ্ভবের কালে প্রাগার্যদের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য-ভাস্কর্য-সাহিত্য আদি কোন বাস্তব সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়নি। কিন্তু যা পাওয়া যায়, তা হলো তাদের ভাবনা-কামনা, ধ্যান-ধারণা, এক কথায় তাদের জীবন চর্যায় প্রতিফলিত আচার-অনুষ্ঠান, ধর্ম-দেবতা প্রভৃতি সম্বন্ধীয় নিদর্শন। এগুলিকে তারা যে শুধু সযত্নে নিজেদের ব্যবহারে সীমাবদ্ধ রেখেছে, তা নয়, তা সমগ্রভাবে বাঙালী জাতির সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সৃজনকালে বাঙালী জাতি ঐ সংস্কৃতিরই অধিকারী ছিল এবং তার সঙ্গে আর্য সংস্কৃতির সমীকরণের ফলে বাঙালী-সংস্কৃতি পূর্ণায়ত রূপ লাভ করে। নিম্নে উভয় সংস্কৃতির কিছু পরিচয় প্রদত্ত হ'লো।

প্রাচীন আর্যজাতির তথা বৈদিক আর্যদের ধর্ম ছিল 'হবন'-মূলক অর্থাৎ যাগ-যজ্ঞানুষ্ঠানমূলক, আর অনার্য-জাতির ছিল 'পূজার্চনা'মূলক ধর্মানুষ্ঠান। এই উভয়ের সমীকরণেই পরবর্তী পৌরাণিক তথা হিন্দু ধর্মের উদ্ভব ঘটে। আর এরি ফলে হিন্দুশাস্ত্রে "যে কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ, যোগদর্শন ও যোগের নির্দিষ্ট সাধনা, আদ্যাশক্তির আরাধনা ও শিব-শক্তিবাদ, বিষ্ণুর আরাধনা প্রভৃতি লইয়া হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য, সে সমস্ত জিনিষ মুখ্যতঃ অনার্য ধর্মজগৎ হইতেই গৃহীত।" আমাদের লোকধর্মেরও অনেক কিছু প্রাগার্য সমাজ থেকে গৃহীত। পশ্চিম ও দক্ষিণবঙ্গে প্রচলিত ধর্মঠাকুরকে বিষ্ণু, শিব কিংবা সূর্যের সঙ্গে অভিন্নরূপে দেখাবার চেষ্টা হলেও তা যে প্রাগার্য কোল গোষ্ঠীর 'দড়াম্' (কচ্ছপ-রূপী) প্রস্তরখণ্ডের পূজা, এ সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই। ডোম-জাতীয় পুরোহিত, মোরগ-মদ্য প্রভৃতি পূজার উপকরণই এর অন্যতর প্রমাণ। আবার বাঙলাদেশে প্রচলিত সহজিয়া উপাসনা, তান্ত্রিকতা, ধর্ম, সর্পদেবতা মনসাপূজা, ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের পূজা প্রভৃতি বাঙালী সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপ প্রাগার্য সমাজ থেকেই আগত। বৌদ্ধদের স্তূপ, চৈত্য-আদি, বাঙলায় তথা ভারতে আগত মুসলিমদের 'মাজার' এ সব ও দরগা প্রভৃতি প্রথাও মূলতঃ আদি অনার্য সমাজ থেকে আগত।

অনার্য উপাদান

পাল ও সেন রাজবংশের রাজত্বকালেই প্রকৃতপক্ষে বাঙালীর জাতীয় সংস্কৃতি তার বিশিষ্ট রূপ পেতে আরম্ভ করে। মূলতঃ কৃষিভিত্তিক বাঙলাদেশে তখন কৃষি, মৎস্যশিকার এবং অল্পস্বল্প গোচারণ ছিল বাঙালীর আজীবিকার উপায়। বাঙলার বণিকেরা ক্বচিৎ কখনো বাণিজ্য ব্যপদেশে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বা সিংহলে, এমন কি সুদূর পারস্য দেশে গেলেও বাঙলাদেশ কখনো স্বাভাবিক বাণিজ্যস্থল হয়ে উঠতে পারে নি। এমন কি এখানে দক্ষিণ ভারত কিংবা উত্তর বা পশ্চিম ভারতের মতো কোন বড় নগরও গড়ে উঠেনি। এখানকার অর্থনীতিক ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায়, গুপ্তযুগে এখানে আর্যবংশীয় বণিক ও ব্যবসায়ীদেরই প্রাধান্য ছিল, তবে পাল-সেন বংশের রাজত্বকালে প্রাগার্য কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের প্রাধান্যও ক্রমস্বীকৃতি লাভ করে।

কৃষি-প্রধান

খ্রীঃ দশম শতকের দিক থেকেই বাঙালী সংস্কৃতিতে সম্ভবতঃ নিরক্ষর ও অনার্যসমাজোদ্ভূত

বাঙালী জনগণের প্রয়োজনভিত্তিক বাঙলা তথা গৌড়ীয় ভাষা সাহিত্যে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করে প্রধানত বেদ-বিরোধী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য ও নাথপন্থী সাধকদের দ্বারা; অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য সমাজও বৈষ্ণব ভক্তিবাদ এবং তান্ত্রিক শক্তিপূজার সঙ্গে পৌরাণিক ধর্মের সংমিশ্রণে একটা নবশক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে সচেষ্ট ছিল। এমন সময় তুর্কী-আক্রমণ সমস্ত ভাবনা-চিন্তায় একটা বিপর্যয় সৃষ্টি করলো।

সংঘর্ষ ও সমন্বয়

ঐস্‌লামিক শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে দেখা দিল। এ সংঘর্ষের পরিণতিতে বাঙলার সংস্কৃতিতে একটা সমন্বয় সাধিত হলো। একদিকে শরীয়তী ইস্‌লামের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষাব জন্য পৌরাণিক ভক্তিবাদ ও রামায়ণাদির অনুবাদ শুরু হলো, অন্যদিকে তেমনি ইস্‌লামী উদার সুফীবাদ-প্রভাবিত একটা সাধনমার্গও বাঙালী সংস্কৃতিতে স্থান ক'বে নিল, বৈষ্ণবধর্মে, কীর্তন গানে যার প্রভাব লক্ষ্য কবা যায়।

ইসলাম ধর্মের আগমনে বাঙালী অধিবাসীদের একটা বিরাট অংশই, তাদের মধ্যে রযেছে বৌদ্ধ, হিন্দু এবং অনার্য প্রকৃতি-পূজকরাও — ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাবা শরীযত পথে না গিয়ে প্রধানতঃ সুফীধারার পথিক ছিল বলেই বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে অসুবিধে হযনি। বিশেষতঃ যোড়শ শতকে চৈতন্য-প্রভাবিত বাঙালী হিন্দুসমাজও মোটামুটি এই ধারাই অনুসবণ কবে চলছিল। খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতকের প্রাবম্ভেই বাঙলাদেশে তুর্কী আক্রমণেব কাল থেকে শুরু কবে মোটামুটি অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী পলাশীব যুদ্ধ পর্যন্ত সুদীর্ঘকালব্যাপ্তবাঙালী সংস্কৃতিব এই ধারায হিন্দু-মুসলিম বিভেদ বড় একটা ছিল না।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে উনিশ শতাব্দীরও কতকটা জুড়ে বাঙলায বিদেশীয, বিজাতীয ও বিধর্মীয় ইংবেজদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কালে বাঙলার রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতি — সর্বত্র একটা প্রবল আলোড়ন দেখা দিয়েছিল এবং সম্পূর্ণতঃ প্রভাব বিস্তাব করেছিল বাঙালী হিন্দুসমাজের উপর। কাবণ, ইংবেজরা মুসলমান নবাবেব হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিযে নিযেছিল বলেই সাধাবণতঃ মুসলমানরা ইংবেজদেব প্রতি এবং তাদের তথা পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানেব প্রতি ছিল

হিন্দু-বেনেসাঁস

সম্পূর্ণ উদাসীন। এই অবস্থাব সুযোগ গ্রহণ করে এতকালেব পেছনে-পড়ে-থাকা বাঙালী হিন্দুবা মুসলমানদের ডিঙিযে অনেকটা সামনের দিকে এগিয়ে গেলো। উভযেব পা আব সমতালে পড়ছে না। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি যাতে বাঙলার গ্রাম্য সংস্কৃতিকে গ্রাস কবে না ফেল্‌তে পারে, সেইজন্য বাঙালী মনীষীরা প্রাচীন ধ্রুপদী সাহিত্যেব অনুশীলনীব মাধ্যমে আমাদেব সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতি দ্বারা গ্রাম্য সংস্কৃতিকে সবল কবে তুলে তাব সঙ্গে সদ্যঃ আগত পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতিব সমন্বয় সাধন করে বাঙলার সংস্কৃতিকে আবও পূর্ণতব, মহত্তর করে তুললেন। উনিশ শতকেব মাঝামাঝি এই কালটিকেই বলা হয বাঙালীব নবজাগবণ বা বেনেসাঁসের যুগ।

প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত অথচ পাশ্চাত্ত্য ভাবধাবা-পুষ্ট এই সংস্কৃতি কিন্তু প্রায সম্পূর্ণভাবে সমাজেব একাংশেব অর্থাৎ হিন্দু-সংস্কৃতি, স্বল্প-সংখ্যক জাতীয়তাবাদী শিক্ষিত মুসলমান এই

সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্মতার ভাব পোষণ করলেও বৃহত্তর অংশই ছিল উদাসীন। বরং তাবা একটা বিচ্ছিন্নতাবাদের পথ অবলম্বন করলো। সাময়িকভাবে কখনো কখনো মুসলমানদের মধ্যে একটা দ্বিধার ভাব এলেও তার একটা প্রবলতর ধারা ক্রমে 'দ্বিজাতিতত্ত্বে'র ভিত্তিতে ভারতভূমিকে ত্রিখণ্ড করে মূল ভারতের পশ্চিম এবং পূর্বপ্রান্তস্থ দুটি খণ্ডকে মুসলিম রাজ্য পাকিস্তান রূপে গড়ে তুললো। তারা ধর্মের ভিত্তিতে জাতি ও সংস্কৃতিকে বিভক্ত করে পশ্চিমখণ্ডের প্রধানতঃ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্বদিকে বাঙলার পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের কতকটা ও আসামের শ্রীহট্ট জেলা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিল।

কৃত্রিম ধর্মের বন্ধন অপেক্ষা জাতীয় সংস্কৃতি ও ভাষাব বন্ধন যে অনেক দৃঢ়, সেই অদূরদর্শী রাজনৈতিক নেতারা এই পরম সত্যকে ভুলে গিয়ে সেদিন তারা বাঙালীর সংস্কৃতিকেও দ্বিধাবিভক্ত করতে দুঃসাহসী হযেছিলেন। ১৯৭১ খ্রীঃ পূর্ববঙ্গেব বাঙালীরা পাকিস্তানেব হাত থেকে মুক্তি নিয়ে আবাব স্বাধীন বাঙলাদেশে পবিণত হযেছে। আজ বঙ্গদেশ রাজনৈতিকভাবে দ্বিধাবিভক্ত হলেও ভারতবর্ষেব পশ্চিমবঙ্গের ও বাঙলাদেশেব তথা পূর্ববঙ্গের 'বাঙালী সংস্কৃতি' এক ও অভিন্ন।

অধ্যায়ঃ ছয় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে আঞ্চলিকতা—সাম্প্রদায়িকতা এবং বৈদেশিক ঋণ ও রূপে-রসে বিবর্তনের ধারা

[এক] ভাষা-সাহিত্যে আঞ্চলিকতা

বাঙলাদেশে পাল রাজবংশের শাসনকাল থেকেই বস্তুতঃ বাঙালী জাতি ও বাঙলা ভাষার উদ্ভব বলে ধরে নেওয়া হয়। জাতি হিশেবে বাঙালী এক সুপ্রাচীন মহৎ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। তার পূর্বপুরুষেরা প্রধানতঃ সংস্কৃত এবং প্রাকৃত অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ ভাষার মাধ্যমে তাদের মনোভাব প্রকাশ করে এসেছেন এবং সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। বাঙালীও জাতি-গঠনের সূচনা পর্বে ঐ ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে এসেছে। তারপর অবহট্‌ঠের খোলস ভেঙে বাঙলা ভাষা যখন স্বাধীন সত্তা লাভ করে, তখন থেকেই সাহিত্য রচনা-প্রচেষ্টা শুরু হয় সদ্যঃ-প্রসূত এই বাঙলা ভাষাতেই। আঃ খ্রীঃ অষ্টম শতকের দিকে কিংবা কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী কালেই বাঙালী জাতির উদ্ভব ঘটে, আর বাঙলা ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি-প্রক্রিয়াও আরম্ভ হয়েছিল হয়তো সমকাল কিংবা কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী কাল থেকেই। ঐ সৃজ্যমান পর্বে বাঙলা ভাষার জননীস্বরূপা অবহট্‌ঠ ভাষার প্রভাব যথেষ্টই পড়েছিল। তখন হয়তো বাঙলা ভাষা একান্তভাবে 'বাঙলা' হয়ে ওঠে নি। এটা পূর্বাঞ্চলীয় 'গৌড়ীয় ভাষা' – যা' থেকে ক্রমে তিনটি মূল ভাষা বেরিয়ে আসে – বাঙলা, ওড়িয়া ও অসমীয়া।

তবে ঐ ভাষার নিদর্শন রূপে আমরা যা' পাচ্ছি, সেই 'চর্যাপদে'র ভাষায় বাঙলা ভাষার লক্ষণ বিশিষ্ট হ'য়ে উঠলেও তাতে অপর দু'টি ভাষার এবং এমন কি পূর্বাঞ্চলীয় 'মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরিয়া'র মতো বিহারী ভাষার আঞ্চলিক লক্ষণও যথেষ্টই খুঁজে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ গঠন-পর্বে তখনো পর্যন্ত সব ভাষা স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে উঠতে পারেনি। এখানে 'চর্যাপদে'র ভাষা সম্পর্কে একটা প্রশ্ন জাগে – চর্যাপদের ভাষার যথাথ স্বরূপ কী। ঐতিহাসিক বিচারে দেখা যায় চর্যাপদ-রচয়িতাদের মধ্যে সম্ভবতঃ পূর্বে আসাম থেকে পশ্চিমে উড়িষ্যা ও মিথিলা অঞ্চলের অধিবাসীও থাকতে পারেন, অন্ততঃ সকলেই যে বঙ্গদেশের একই অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন না, এটি নিশ্চিত। এরপর এর রচনাকালও অন্ততঃ খ্রীঃ দশম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত, কারো কারো মতে তা আরও আগে থেকেই হতে পারে। আর এই দীর্ঘ সময়-সীমায় ব্যাপ্ত কোন সৃজ্যমান ভাষার রূপ যে একই প্রকার থাকবে না, এটিই একান্ত স্বাভাবিক। বিভিন্ন কালে প্রসূত বিভিন্ন অঞ্চলে লেখকদের লিখিত

আদিযুগের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য

চর্যাপদগুলির ভাষায় আঞ্চলিক এবং কালিক বৈচিত্র্যই ছিল প্রত্যাশিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তেমন কোন পরিচয় কোন চর্যাগীতির রচনায় পাওয়া যায় নি। তাই অনুমান করা হয়, হয়তো চর্যাপদগুলি সঙ্কলনের পর কোন বিজ্ঞ সম্পাদক এদের ভাষা সংস্কার করে আঞ্চলিক লক্ষণ মুছে দিয়ে তার ভাষাকে একটা সর্ববঙ্গীয় সাধুভাষার রূপদান করেছিলেন। ফলে, চর্যার ভাষায় কোন আঞ্চলিক লক্ষণ নেই বলেই মনে হয়, অন্ততঃ সমকালীন অপর কোন নিদর্শন বর্তমান না থাকায় তুলনামূলক বিচারও সম্ভবপর নয়। বাঙলা-ভাষার আদিপর্বে অপর কোন সাহিত্য প্রচেষ্টার সন্ধান আজও পাওয়া যায় নি।

(ক) বিদেশীয় আগমন ঃ সাম্প্রদায়িকতা ও বৈদেশিক ঋণ

এখানে একটি প্রাসঙ্গিক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন। যখনই বাঙলায় কোন বিদেশি, বিভাষী কিংবা বিধর্মী জাতির যোগাযোগ ঘটেছে বাঙালীর ভাষা ও সাহিত্যে তখনই তাতে যেমন সাম্প্রদায়িক বৈচিত্র্য-সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তেমনই বৈদেশিক ঋণের সম্পর্কও সৃষ্টি হয়েছে। উভয়ই অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়াতেই বাঙলাদেশে তুর্কী আক্রমণ ঘটে এবং এরপর দেড়শত বৎসর বাঙলার রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং সমাজব্যবস্থায় যে বিপর্যয় চলে, তার জের গড়ায় চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে শাম্‌স্‌-উদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ (১৩৪২ খ্রীঃ - ১৩৫৮ খ্রীঃ) বাঙলার শাসনরজ্জু হস্তগত করার পূর্ব পর্যন্ত। ইতিহাসে এই অন্তর্বর্তী পর্বটিকে যুগসন্ধিকাল কিংবা বন্ধ্যাযুগ নামেও অভিহিত করা হয়। এই কালটি বাঙালীর 'মানস প্রস্তুতি'র কাল। অনেক ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে পরবর্তী পর্বের জন্য বাঙালী প্রস্তুত হ'চ্ছিল — তার মানসিকতায় তখন বিস্তর পরিবর্তন সাধিত হয়, যার প্রতিফলন ঘটে পরবর্তী মধ্যযুগের (১৩৫০ খ্রীঃ - ১৮০০ খ্রীঃ) 'আদি-মধ্য পর্ব' তথা 'চৈতন্যপূর্ব যুগে' (১৩৫০-১৫০০ খ্রীঃ)।

যুগসন্ধিকাল

আদি-মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের যে স্বল্প কয়টি নিদর্শন এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে, তাদের যথার্থ রচনা-কাল নির্ধারণ দুষ্কর এবং রচনায় প্রক্ষিপ্ততা ও নকলবাগীশের হস্তাবলেপ চিহ্ন এত সুস্পষ্ট যে, এর উপর একান্তভাবে নির্ভর করা যায় না। কিন্তু নিরুপায় হয়েই তা মেনে নিতে হচ্ছে। চৈতন্য-পূর্ব যুগের রচনা বলে যাকে প্রায় নিশ্চিতভাবেই স্বীকার করে নেওয়া চলে, তা হ'লো বড়ু চণ্ডীদাস-রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামক নাট্যগীতিকাব্য। গ্রন্থটি রচনাকালের অল্প পরই বোধ হয় লোক-লোচনের বহির্ভূত হয়ে পড়েছিল, এবং সম্ভবতঃ এর কোন অনুলিপিও প্রচলিত ছিল না, ফলতঃ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন লিপিতে লিখিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র রচনার ভাষা হয়তো অবিকৃতই রয়েছে। এর ভাষা-বিচারে এটিকে চর্যার ভাষার বিবর্তিত রূপ বলে মেনে নিতে বিশেষ অসুবিধে নেই। তবে একদিকে লিপি-প্রমাদ, অপর দিকে লিপির দুষ্পাঠ্যতা-হেতু পাঠোদ্ধারে মতান্তরের অবকাশ রয়েছে। তবে এর ভাষার কয়েকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন ছাড়াও এতে চর্যাপদের তুলনায় তদ্ভব শব্দ অপেক্ষা তৎসম

আদি-মধ্যযুগ

শব্দের ক্রম-বৃদ্ধি এবং মুসলিম শাসনের প্রত্যক্ষ প্রভাব হেতু অল্প-স্বল্প আরবী-ফার্সী অর্থাৎ বিদেশী শব্দেরও অন্তর্ভুক্তি ঘটে। ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের বিচারে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র ভাষায় আদি-মধ্য যুগের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে বলেই মনে হয়। যদিও এর সমকালীন রূপে পরিচিত অপর কোন গ্রন্থের ভাষাতেই সমকালের রূপ আব অক্ষুণ্ণ নেই, তাই তুলনামূলক বিচার সম্ভবপর নয়। কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' ব্যবহৃত ভাষা কোন অঞ্চল-বিশেষের ভাষা হওয়াই সম্ভব, তবে তা'র প্রমাণীকরণ সহজ নয়। জনৈক গবেষক 'ধলভূম' অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে এই ভাষার অনেক সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র ভাষাকে বাঙলার পশ্চিমপ্রান্তস্থিত 'ধলভূমের আঞ্চলিক ভাষা' রূপে নির্দেশ করতে চাইছেন। কিন্তু ধলভূমের সাম্প্রতিক কালের ভাষার সঙ্গে পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন এই কাব্যভাষার সাদৃশ্য থেকে কি অনুরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থনযোগ্য? 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র বিষয়বস্তু যদিও রাধাকৃষ্ণের লীলামূলক, তবু আধ্যাত্মিকতা-বর্জিত এই লৌকিক কাহিনী বৈষ্ণব পদাবলীর মতো বৈষ্ণবজনের প্রিয়বস্তু তো নয়ই, বরং মনে হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় কর্তৃক এটি অনাদৃত ও উপেক্ষিত হয়েছিল বলেই এতকাল লোকলোচনের অন্তরালে ছিল।

আদিযুগের অপরাপর সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে মনসামঙ্গল কাব্যের একাধিক পুথি, রামায়ণ ও ভাগবত-পুরাণের আংশিক অনুবাদ এবং বিদ্যাপতির পদাবলী। তন্মধ্যে বিদ্যাপতি-রচিত পদাবলীর ভাষা 'ব্রজবুলি' — অবহট্‌ঠ থেকে উদ্ভূত একটা কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা এবং এতে বাঙলা মৈথিলী ও হিন্দী ভাষারও কিঞ্চিৎ প্রভাব রয়েছে। এর বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা অবলম্বনে রচিত কিছু বিচ্ছিন্ন পদ — রাধাকৃষ্ণের যুগলাবতার রূপে বন্দিত চৈতন্যদেব বিদ্যাপতির পদের রসাস্বাদ করতেন সাগ্রহে। এটি একটি গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের সাহিত্য হলেও কাব্যগুণে যে-কোন রসিক পাঠকেরই মনোহবণে সমর্থ। মালাধরবসু-কৃত শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণের আংশিক ভাবানুবাদে মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণ-জীবনকাহিনীই বর্ণিত হয়েছে। ভক্ত বৈষ্ণবের নিকট এর বিশেষ সমাদর থাকলেও এটি একান্তভাবে কোন সাম্প্রদায়িক সাহিত্য নয়। কৃত্তিবাস-রচিত বাল্মীকি রামায়ণের বাঙলা ভাবানুবাদে বস্তুতঃ বাঙালী মাত্রেরই পরম রসাস্বাদের বস্তু। বাঙালী মুসলমান পাঠকও এর প্রতি বিমুখ নন। কাজেই এটিকেও সাম্প্রদায়িক সাহিত্য বলা যায় না। মনসামঙ্গল কাব্যের তিনজন রচয়িতা বরিশালের বিজয়গুপ্ত, ময়মনসিংহের নারায়ণদেব এবং চব্বিশ পরগণার বিপ্রদাস পিপ্‌লাই। তিনজনের কাব্যেই ভাষাগত আঞ্চলিকতা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বর্ণনায়ও আঞ্চলিক ধর্ম যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি বিষয়গতভাবেও এটি একটি বিশেষ গোষ্ঠী মনসা-ভক্ত গোষ্ঠীরই সাহিত্য। তুর্কী আক্রমণ যুগেই অনার্যসমাজ থেকে যে সব দেব-দেবী আর্যসমাজে গৃহীত হয়েছিলেন, মনসা তাদেরই একজন। তাদেরও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যেমন নিজস্ব ভক্তমণ্ডলীর সহায়তার প্রয়োজন ছিল, তেমনি নিজেদের মধ্যেও ছিল পরস্পবেব সঙ্গে দ্বন্দ্ব-রেষারেষি। মনসামঙ্গল কাব্যেও মনসা ও তার সৎমা চণ্ডীর কলহ এবং শিবভক্ত চাঁদসদাগরের সঙ্গে প্রায় মরণপণ সংগ্রাম সেই আত্মপ্রতিষ্ঠারই কাহিনী, অপর সব মঙ্গলকাব্য ও এরূপ 'গোষ্ঠীসাহিত্য'ই। আদি-মধ্য যুগের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই পর্বে, তুর্কী আগমন ও ফার্সী ভাষা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে

বাঙলা ভাষায় বেশ কিছু তুর্কী, আরবী ও ফার্সী শব্দও বাঙলা ভাষার অঙ্গীভূত। এ জাতীয় শব্দসংখ্যা খুব অধিক না হলেও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। বস্তুতঃ বিদেশি জাতির সঙ্গে ভাষার প্রভাব একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপারই।

'অন্ত্যমধ্যযুগ' তথা চৈতন্যোত্তর যুগে (১৫০০-১৭৬০ খ্রীঃ) বাঙলা সাহিত্য পূর্বোক্ত ধারাগুলিকে পুষ্ট করা ছাড়াও আরও কিছু নোতুন ধারাপথ সৃষ্টি করে চলছিল। তাদের মধ্যে রয়েছে 'চরিত শাখা', অনুবাদ শাখায় মহাভারত, মঙ্গলকাব্য-ধারায় 'চণ্ডীমঙ্গল', 'ধর্মমঙ্গল' এবং অনেক গৌণ মঙ্গল কাব্য, এমন কি পৌরাণিক দেবতাদের নিয়েও বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'শিবায়ন কাব্য', বাঙলা ভাষায় 'বৈষ্ণব পদসাহিত্য', 'বৈষ্ণবতত্ত্বসাহিত্য', 'শাক্তপদাবলী', 'নাথ সাহিত্য', 'লৌকিক সাহিত্য', 'গাথা কাব্য', 'লোকগীতি' প্রভৃতি।

(খ) সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীসাহিত্য

মধ্যযুগীয় সাহিত্য বল্‌তে এককথায় ধর্মীয় সাহিত্যকেই বোঝায় এবং এই ধর্ম শব্দটিও অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ ধর্মসম্প্রদায় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। আরও সহজ ভাষায় বলতে গেলে এদের সাম্প্রদায়িক সাহিত্য বলেই অভিহিত করা চলে। কিন্তু অর্থবিভ্রাটের আশঙ্কায় একে 'গোষ্ঠী সাহিত্য' বলাই বিধেয়। অনেকেই এ যুগের সাহিত্যকে ধর্ম-দ্বন্দ্বের সাহিত্যও বলে থাকেন। অতএব, এ থেকেই এ পর্বের সব সাহিত্যেরই স্বরূপ বুঝতে অসুবিধে হয় না।

মঙ্গলকাব্যে গোষ্ঠী সাহিত্য

এই ধর্ম-দ্বন্দ্ব বল্‌তে যে শুধু নিজেদেব গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের ও তার সঙ্গে যুক্ত দেব-দেবীর প্রতিষ্ঠা লাভের প্রচেষ্টাই দেখা যায়, তা নয়, অনেক সময ধর্মীয় রেষারেষি, এমন কি অসহিষ্ণুতার চিত্রটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিব-ভক্ত চাঁদ মনসার পূজায় অনিচ্ছুক, এই অপবাধে মনসাব ক্রোধ কোন সীমা মানে না। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডী সাধারণভাবে মঙ্গল-বিধায়িনী 'মঙ্গলচণ্ডী' হলেও তার ভক্ত কালকেতুর বাজ্যে আগমনে অনিচ্ছুক কলিঙ্গের প্রজাদেব উপব যথেষ্টই অত্যাচারও কবেন। এই প্রসঙ্গে চণ্ডী ও গঙ্গার কলহও শীলতার সীমা অতিক্রম কবে। অপব সকল মঙ্গলকাব্যেও দেব-দেবীরা এবং তাদের ভক্তদের মধ্যে এই সাম্প্রদায়িকতাব ভাবটাই পরিস্ফুট বলে এদের নিঃসন্দেহে সাম্প্রদায়িক তথা গোষ্ঠীসাহিত্য আখ্যা দেওয়া চলে।

চৈতন্যদেব ছিলেন উদার মানবিকতা-বোধের প্রবক্তা। তাঁব মহৎ জীবন-কাহিনী অবলম্বনে যে কয়েকটি চবিত সাহিত্য বচিত হয়েছিল, সেগুলিও তাঁব ভক্ত কবিদেব

চরিত সাহিত্য ও গোষ্ঠী সাহিত্য

কল্যাণে গোষ্ঠী-দ্বন্দ্ব ও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদাযিকতাব উর্ধ্বে উঠতে পাবে নি। একদিকে যেমন সমসামযিক কালেব বাস্তব-চিত্র অঙ্কন কবতে গিযে বৈষ্ণব কবিবা ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত অর্থাৎ শাক্তদের সম্বন্ধে যথেষ্ট বিদ্রূপাত্মক উক্তি কবেছেন, তেমনি আবাব শাক্ত-বৈষ্ণব দ্বন্দ্বেব একটা বিশ্বাস্য চিত্রও উপস্থাপিত কবেছেন। কিন্তু তাদেব সম্বন্ধে অতি বিনযী চৈতন্য-চরিতকার বৈষ্ণব কবিরাও

মাঝে মাঝে এতখানি অসহিষ্ণু হয়ে উঠতেন যে, এমন কথা বলতে তাঁদের মুখে আটকাযনি যে, 'তবে লাথি মারোঁ তার মাথার উপরে।' বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতো মনস্বী প্রতিভাসম্পন্ন কবিরাও বৈষ্ণবধর্ম ও তার মাহাত্ম্য-প্রচার বিষয়েই এত ব্যস্ত ছিলেন যে, "শ্রীচৈতন্যের ক্ষুরধার বুদ্ধি ও কর্মকৌশল, তাঁহার জাতীয়তাবোধ, তাঁহার সংগঠনী শক্তি, উদ্ভাবনী-প্রতিভা, সংঘ-পবিচালন দক্ষতা, এমন কি দূরদর্শিতা, বৈপ্লবিক চিন্তা প্রভৃতি ব্যবহারিক গুণপনায় বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাসের চিত্ত আকৃষ্ট হয নাই।" (ডঃ তারাপদ ভট্টাচার্য্য) বস্তুতঃ সাম্প্রদায়িক তথা ধর্মীয় মতবাদের প্রচারই চৈতন্য-জীবনী বচনাব উদ্দেশ্য ছিল বলেও এই চরিত-সাহিত্য সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী সাহিত্যই হয়ে দাঁড়ায়।

বৈষ্ণব সাহিত্য ঃ অসাম্প্রদাযিক

বাঙলা সাহিত্যে এক আশ্চর্য্য ব্যতিক্রম বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য। একান্তভাবে ভক্তিবাদ প্রচাবই এব উদ্দেশ্য। বৈষ্ণবদের চিব উপাস্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁব লীলাসঙ্গিনী বাধাব প্রেমলীলা-বর্ণনাই পদাবলীব বিষয়, কাজেই একান্তভাবেই একটা গোষ্ঠী-সম্প্রদাযেব সাহিত্য হ'যেও বৈষ্ণবপদগুলি বচনা-গুণে সার্বজনীন আদবেব সামগ্রী হযে উঠেছে। একটা সম্প্রদাযেব সাহিত্য হলেও এদের সাম্প্রদায়িক সাহিত্য আখ্যা দেওযা চলে না। এই কাবণেই শতাধিক মুসলমান কবিও বৈষ্ণব পদ বচনা কবেছেন।

মুসলিম কবি

মধ্যযুগেব বাঙলা সাহিত্যেব খুব একটা উল্লেখযোগ্য পর্ব সপ্তদশ শতকে বোসাঙ বাজদববাবে বাঙলাব মুসলিম কবিদেব আবির্ভাব। বাঙলাব বুকে দীর্ঘকাল মুসলিম কবিব দেখা পাওযা যাযনি, যদিও সংখ্যায মুসলমানদেব ক্রমবৃদ্ধি ঘটেই চলছিল দেখা যায। আরাকান বোসাঙ -এব বাজাবা জাতিতে বর্মী এবং ধর্মে বৌদ্ধ হলেও বাঙলাদেশেব চট্টগ্রামেব সন্নিহিত অঞ্চলে বসবাস হেতু বাঙালী সংস্কৃতিব সঙ্গে তাদেব ঘনিষ্ঠ পবিচয ও সম্পর্ক স্থাপিত হযেছিল বলেই অনুমান কবা চলে। বাজাদেব অমাত্য নিযুক্ত হতেন দেখা যায বাঙালী মুসলমানদেব মধ্য থেকে। তাদেবই পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্যে বাঙালী যে-জাতীয সাহিত্য-বচনায উদ্বুদ্ধ হযেছিল, তাতে বাঙলা সাহিত্যেব দিগন্ত যেমন অনেকখানি বিস্তীর্ণ হযেছিল, তেমনি নোতুন নোতুন বিষযবস্তু ও ভাবধাবায ধর্মীয সাহিত্যেব বাইবে প্রথম মানবিক তথা লৌকিক সাহিত্যধাবাবও পত্তন হযেছিল। বোসাঙবাজ থিবি থু ধর্ম্মাব(শ্রীসুধর্মা) সেনাপতি আশবফ খাঁব আনুকূল্যে বাঙালী কবি দৌলৎ কাজীব হিন্দী-উর্দু লোক-গাথা অনুসবণে বচিত সাধনেব 'সতী মৈনাবত' নামক হিন্দী কাব্যেব ভাবানুবাদ রূপে 'সতী মযনামতী' বা 'লোবচন্দ্রানী' (১৬২২ ৩৮ খ্রীঃ ব মধ্যে) গ্রন্থটি বচনা আবম্ভ কবেন। তিনি শেষ কবে যেতে পাবেন নি, শেষ কবেন পববর্তী কবি সৈযদ আলাওল। আবব্য-পাবস্য-কাহিনী অবলম্বনে বচিত হিন্দী উর্দু কাব্য কিংবা সবাসবি মূলভাষায বচিত কাব্যেব অনুসবণে বচিত বাঙলা কাব্যেব যে ধাবা অতঃপব বাঙালী মুসলমান কবিদেব দ্বাবা বচিত হতে থাকে, সেগুলি নানাদিক থেকেই মুসলমান কবিদেব এবং বাঙলা সাহিত্যেব ইতিহাসে নানা কাবণেই

উল্লেখযোগ্য। অন্ত্যমধ্যযুগ বস্তুতঃ মুস্‌লিম শাসনের অব্যাহত প্রাধান্যের যুগ। এই পর্বে মুসলিম রাজশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত, ফার্সি ভাষা স্বীকৃত রাজভাষা, অতএব ব্যাপক তার প্রচার, এমন কি দৈনন্দিন জীবনেও আরবী-ফার্সি শব্দ নিত্য ব্যবহার্য হ'য়ে বাঙলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং কালে একেবারে বাঙলা ভাষার অঙ্গীভূত হ'য়ে অপরিহার্য হ'য়ে উঠে। ফলে ভাষার ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ অনেকটাই বেড়ে যায়। যে কোন বাঙলা গ্রন্থেই প্রচুর ফার্সি শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় ঐ যুগে।

'মুসলমানী সাহিত্য' বা 'কিস্‌সা সাহিত্য' নামে পরিচিত এই সাহিত্যের প্রায় সব টুকুই এক অর্থে সাম্প্রদায়িক সাহিত্য নামে অভিহিত হতে পারে। একদিকে এদের রচয়িতা যেমন সবাই মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত, তেমনি এদের কাহিনীগুলিও গ্রহণ করা হয়েছে প্রধানত মুসলমানী সমাজ থেকে। অবশ্য কোন কোন কবি এদের দেশীয়করণ করে দেশ-কালোপযোগী করে নিতে চেষ্টা কবেছেন। কিস্‌সা কাহিনী একান্তভাবে লৌকিক, মানবিকভাবে পরিপূর্ণ এবং এগুলিতে রোমান্সের সুর প্রবল। এ জাতীয় কাহিনী বাঙলা সাহিত্যে পূর্বে কখনো পাওয়া যায় নি। এগুলি অনুবাদমূলক হলেও কোথাও আক্ষরিক অনুবাদ নেই, কোথাও ভাবানুবাদ, কোথাও স্বাধীন অনুবাদ থাকায় কবিদের মৌলিক প্রতিভা-প্রদর্শনেরও সুযোগ ছিল। প্রথমদিকে কবিরা রচনার ভাষাগত বিশুদ্ধি বজায় রাখতে চেষ্টা করলেও বিষয় ও ভাবের প্রয়োজনে বিদেশীয় আরবী-ফার্সি ভাষার অনুপ্রবেশ ক্রমশঃ অবারিত হয়ে ওঠে। শেষদিকে 'কিস্‌সা সাহিত্যে' আরবী-ফার্সি ভাষার বাহুল্যই নজরে পড়ে। বিভিন্ন গ্রন্থে সুফী ধর্মের প্রভাব তো বর্তমান ছিলই, এমন কি নানা কারণেই এদের মধ্যে মুসলিম শরীয়তী ধর্মমত এবং ধর্মকাহিনীর অন্তর্ভুক্তি অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। অতএব এতকাল বাঙলা সাহিত্য যে একটা বদ্ধজলায় আবদ্ধ ছিল, তাতে নানা বিদেশীয় ভাব-কাহিনীস্রোত মিশ্রিত হবার ফলে তাতে যে স্পন্দন জেগেছিল, তা সমকালীন ও পরবর্তী সাহিত্য ধারাকে অবশ্যই প্রভাবিত করেছিল।

'কিস্‌সা-সাহিত্য' সাম্প্রদায়িক কিন্তু লৌকিক

কিস্‌সা সাহিত্যের কবিগণ যে বিদেশীয় কাহিনীসূত্রে লৌকিক জীবনেও রোমান্টিক অনুভূতি বাঙলা সাহিত্যে আমদানি করেছিলেন, সম্ভবতঃ তারি প্রত্যক্ষ প্রভাবে বাঙালী হিন্দু ও মুসলিম কবিগণ সমকাল ও পরবর্তী কালে দেশীয় মৌলিক কাহিনীতে অনুরূপ লৌকিকতা ও রোমান্টিকতা সহ গাথা-কাব্য তথা ময়মনসিংহ-গীতিকা-আদি গীতিকাগুলি রচনা করেছিলেন। ইতঃপূর্বে বাঙলা ভাষায় রচিত কোন মৌলিক সাহিত্যে এদের মতো এমন লৌকিক জীবনের কাহিনী কখনো চিত্রিত হয়নি। এর মূলে রয়েছে সম্ভবতঃ বৈদেশিক কিস্‌সা সাহিত্যেরই প্রভাব।

'শাক্ত পদাবলী'র পদগুলি বৈষ্ণব পদের সাদৃশ্যে রচিত হলেও এবং এগুলি সাধারণভাবে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী সাহিত্য বলে বিবেচিত হলেও শাক্ত পদাবলীর আগমনী ও বিজয়ার পদগুলিতে যে লৌকিক-মানবিক জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, তার পশ্চাতে উক্ত বৈদেশিক সাহিত্যের প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়।

সম্ভবতঃ সমকালেই রচিত বাউল, মুর্শিদা, মারফতি প্রভৃতি লোকসঙ্গীতে ধর্ম-সমন্বয়ের সুন্দর একটি রূপ ধরা পড়েছে। এই পথের সহজিয়া সাধকগণ কোন প্রচলিত ধর্মীয় মতবাদ বা শাস্ত্রীয় আঁচারাদিতে কিংবা কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদ-ও স্বীকার করতেন না। বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, "সপ্তদশ শতকেই বাউল গানেরও উদ্ভব ঘটেছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়।" এঁদের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িকতা বোধ না থাকলেও এঁরা নিজেরাই এক একটা সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিলেন, এদের মধ্যে 'সাঁই, কর্তাভজা, দরবেশ,' প্রভৃতি গোষ্ঠীও রয়েছে। মধ্যযুগের অন্তিম পর্বে এদের আবির্ভাব ঘটলেও এই ধারা এখনো সমভাবেই প্রবহমাণ।

(গ) য়ুরোপীয় প্রভাব ঃ বিষয়-বৈচিত্র্য ও বৈদেশিক ঋণ

১৭৬০ খ্রীঃ ভারতচন্দ্রের মৃত্যু এবং তার অব্যবহিত পূর্ববর্তী ১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের মৃত্যুর পর কার্যতঃ বাঙলার শাসন-কর্তৃত্ব যেমন ইংরেজদের হাতে চলে যায়, তেমনি এই সঙ্গে মধ্যযুগেরও সমাপ্তি ঘটে। ব্রিটিশ শাসনের আরম্ভকাল থেকে পাশ্চাত্যের ভাবধারার সঙ্গে বাঙালীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে এবং বাঙালীর ভাবনা-চিন্তায়, জীবনচর্যায়, এমন কি ভাষা-সাহিত্যেও তার প্রতিফলন ঘটে। ইতঃপূর্বেও বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে বৈদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের ঋণের কিছু পরিচয় আমরা মুসলমান যুগ তথা মধ্যযুগে পেয়েছি, কিন্তু এই পর্বে তা পরিমাণগত এবং গুণগতভাবে অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। তা ছাড়া সাহিত্যের রূপে-রসে যে বিবর্তন ও পরিবর্তন এসেছে, তা বিশেষভাবেই লক্ষণীয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বণিক-ব্যবসায়ীদের সাহচর্যে এসে বাঙালী হিন্দুরা প্রধানতঃ অর্থ-সম্পদের দিক্ থেকেও বেশ লাভবান হয়ে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-সংস্কৃতিরও কিছুটা সংস্পর্শে এলো। ১৮০০ খ্রীঃ খ্রীস্টান মিশনারিদের শ্রীরামপুরে মিশন প্রতিষ্ঠা ও মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন এবং কোম্পানির কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপনের

যুগসন্ধিকাল

পরবর্তী অর্ধশতাব্দীকাল-ব্যাপী চলে পাশ্চাত্ত্য ও শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বয়সাধনের পর্ব এবং এরপরেই দেখা যায় বেঙ্গল রেনেসাঁস বা বাঙলার নবজাগরণের যুগ। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীকাল পর্যন্ত ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন। ১৮৫৭ খ্রীঃ 'সিপাহি বিদ্রোহে'র পরই ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আসে বাঙলা তথা প্রায় সমগ্র ভারত। এই কোম্পানির শাসন-কালই তথা অন্তর্বর্তী কাল বা 'যুগসন্ধিকাল'ই ছিল বাঙলা সাহিত্যের 'আধুনিকযুগে'র প্রতিষ্ঠা পর্ব। এই সময়টিতেই প্রত্যক্ষভাবে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির সংস্পর্শ এসে বাঙলায় হিন্দুমধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। এঁরাই বস্তুতঃ দেশের যাবতীয় কর্মতৎপতায় কাণ্ডারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বাঙালী মুসলমানরা তখন অভিমান-ভরে পাশ্চাত্ত্য সংস্পর্শ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল, ফলে তারা সব দিক্ থেকেই পড়লো পিছিয়ে। বাঙলা সাহিত্যেও এই অন্তর্বর্তী পর্বেই ভাবনা-কামনার দিক্ থেকে, ভাষা-আদি

বস্তুগত দিক্ থেকে এবং রূপ ও রসের দিক্ থেকেও প্রভূত পরিমাণে বিদেশি ঋণ গ্রহণ ক'রে আপন ভাণ্ডারকে ঋদ্ধ ক'রে তুলে। এরপর আধুনিক যুগেই তার স্বাতন্ত্র্য লাভ।

এই পর্বে বৈদেশিক সহায়তা শুরু হয়েছিল পর্তুগীজ পাদ্রিদের দ্বারা। তারাই সর্বপ্রথম বাঙলা ভাষায় প্রথম বাঙলা গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। ম্যানুএল-দ্য-আস্সাম্পসাঁও নামক একজন পর্তুগীজ পাদ্রি স্বয়ং অথবা দেশীয় লোকের সহায়তায় 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' নামে বাইবেলের গদ্য অনুবাদ রচনা করেন। বইটি সরল সাধু গদ্যে (পূর্ববঙ্গীয় ভাষার প্রভাব-সহ) ভাওয়াল পরগণায় রচিত হয়। ১৭৩৪ খ্রীঃ এবং ১৭৪৩ খ্রীঃ পর্তুগালের রাজধানী লিস্‌বন শহরে রোমান্ হরফে মুদ্রিত হয়। এই সময়ই হার্মাদ জলদস্যুরা ভূষণার রাজকুমারকে অপহরণ ক'রে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করে এবং তিনি 'দোম্ আন্তনিও' নাম নিয়ে 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' নামে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার-বিষয়ক এক পুস্তক রচনা করেন। এরপর ইংরেজরা বিচ্ছিন্নভাবে কিছু বাঙলা গদ্য রচনা করলেও তা কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি।

গদ্য সাহিত্যের আবির্ভাব

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে উইলিয়ম কেরী এবং তাঁর অনুবর্তী পণ্ডিত-মুন্সিরা প্রাথমিক পর্বে যে বাঙলা গদ্য বচনা করেছিলেন, তা ছিল প্রধানতঃ বিভিন্ন সংস্কৃত এবং ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ কিংবা ভাবানুবাদ। এই সমস্ত গ্রন্থে কিন্তু সংস্কৃত এবং ইংরেজী বাগ্‌রীতির কিছু কিছু অনুসরণ লক্ষিত হলেও স্মরণ রাখতে হবে, তৎপূর্বেই বাঙলা বাক্য-গঠনের একটা রীতি পয়ার ছন্দেই রচিত হয়ে গিয়েছিল — যার অপূর্ব নিদর্শন পাওয়া যায় বৈষ্ণবতত্ত্ব গ্রন্থগুলিতে, বিশেষতঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'। বাঙলা গদ্যের এই কাঠামোটিই সাধারণতঃ বজায় ছিল। তবে সুদীর্ঘ মুসলিম শাসন কালে ফার্সী রাজভাষা থাকাকালে ব্যবহারিক প্রয়োজনে বিস্তর বিদেশি তুর্কী-আরবী ও ফার্সী শব্দ বাঙলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে ক্রমবৃদ্ধি ঘটাচ্ছিল, এমন কি বাগ্‌ভঙ্গিতে তখন কিছু প্রভাব এসে গিয়ে থাকতে পারে।

গদ্যের গঠন-পর্ব

পাশ্চাত্ত্যের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসবার পর কিছু পর্তুগীজ এবং বিস্তর ইংরেজি ও তৎমাধ্যমে আগত অপর কিছু বিদেশি শব্দ তো ছিলই, এমন কি ১৮৩৫ খ্রীঃ ফার্সী ভাষাকে স্থানচ্যুত করে ইংরেজি ভাষার অনুশীলনও বৃদ্ধি পায় এবং ইংবেজদের আনুকূল্যে সৃষ্ট বাঙলা গদ্য-সাহিত্য এবং গদ্যভাষাকেও ক্রমশঃ সুসমঞ্জস ও সুগঠিত করে তোলবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে শিল্প-সুষমামণ্ডিত সর্বাঙ্গসুন্দর করবার প্রচেষ্টাও দেখা দিয়েছিল। এই প্রচেষ্টা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে শুরু হয়ে একটা পরিণতি প্রাপ্ত হয়েছিল মহামতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে। তিনি এবং তাঁর গোষ্ঠীভুক্ত অনুসারীরা মূলতঃ সংস্কৃতভাষা এবং সাহিত্যে কৃতবিদ্য হলেও প্রত্যেকেই কিন্তু গদ্যভাষার প্রসাধনে ইংরেজির সহায়তাই গ্রহণ করেছিলেন।

ইংবেজি-প্রভাব

বিদ্যাসাগর এবং তাঁর অনুবর্তীরা বাঙলা বাক্য গঠনে ইংরেজ প্রভাবে প্রত্যয় ব্যবহারের পরিবর্তে সংযোজক অব্যয় 'এবং' ব্যবহার শুরু করেন। 'নিত্য-সম্বন্ধী' অব্যয়-ব্যবহারেও

তিনি অনেক সময় অনুগামী অব্যয়টি পরিহার করেছেন। মিশনারিদের পর বিদ্যাসাগরই প্রথম যথাযথভাবে যাবতীয় ইংরেজি যতিচিহ্ন (প্যারেন্থেটিক-সহ) বাঙলায় ব্যবহার করেন। বাঙলা যৌগিক ও জটিল বাক্যে ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজির মতোই প্রধান বাক্য ও অধীন খণ্ডবাক্য-সজ্জায় বাক্য-গঠনের শৃঙ্খলার প্রতিই দৃষ্টি রাখতেন, সংস্কৃতের মতে শ্রুতিমাধুর্যের প্রতি নয়। ইংরেজিতে কৃতবিদ্য বিদ্যাসাগর বাক্যে শক্তি বিবর্ধনের জন্য নানা প্রকার ইংরেজি অলঙ্কারও যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়া বাঙলা বাক্যেও প্রয়োজন মতো ইংরেজি শব্দ প্রয়োগ ও স্ব-উদ্ভাবিত পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করেছেন।

তবে লক্ষণীয় এই, বিদ্যাসাগর নির্বিচারে ইংরেজির দ্বারা প্রভাবিত হননি। একমাত্র বাঙলা ভাষার সৌন্দর্য ও শক্তিবৃদ্ধি এবং ভাষাকে সর্বপ্রকার ভার-বহন করবার উপযোগী ক'রে তোলাব সাধনাই তিনি আজীবন ক'বে গেছেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের পাঠক্রম পবিবর্তন প্রসঙ্গে ১৮৫২ খ্রীঃ 'Notes on Sanscrit College' এ লিখেছিলেন ঃ "The creation of an enlightened Bengali Literature should be the first object of those who are entrusted with the superintendence of education in Bengal. Such a literature cannot be formed by the exertions of those who are not competent to collect the materials from European sources and to dress them in elegent expressive idiomatic Bengali."

এবপব বাঙলা গদ্যভাষা স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে, বৈদেশিক সহায়তা যা লাভ করেছে তা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক থেকে এবং রস ও রূপেব দিক থেকে বাঙলা গদ্য এবং কাব্য উভয়ক্ষেত্রে বাঙলা সাহিত্য আধুনিক যুগে প্রভূত পরিমাণেই বিদেশি সাহিত্যের নিকট ঋণী। বাঙলা গদ্যসাহিত্যে প্রথম পর্বে ছিল একান্তভাবে 'মনন-ধর্মী জ্ঞানের সাহিত্য' (Literature of Knowledge) — শুধু জ্ঞান-বিতরণ ব্যতীত সাহিত্যের অপর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। উনিশ শতকেব শেষার্ধেই প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যে 'প্রাণধর্মী ভাবের সাহিত্যে'ব (Literature of Power) ঢল নামে, বৈচিত্র্যেও তেমনি অজস্রতা। বাঙলা গদ্যে এলো একটা প্রধান ধাবা 'কথাসাহিত্য' — এব উপন্যাস-শাখা এলো বঙ্কিমের হাত ধবে, আব ছোটগল্প এলো রবীন্দ্রনাথেব হাত ধরে। প্রবন্ধ সাহিত্যের রম্যবচনা প্রাণধর্মী বচনাই। এছাড়াও 'পত্রসাহিত্য', 'ভ্রমণ সাহিত্য' ,'জীবনী সাহিত্য ' প্রভৃতি কত তাব বৈচিত্র্য।

কাব্যেব ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য এলো আবো বেশি। রূপে-রসে মধুসূদন থেকে আরম্ভ করে 'মহাকাব্য', 'পত্রকাব্য', 'সনেট', 'গীতিকাব্য' প্রভৃতি কত তাব বৈচিত্র্য, পূর্ববর্তী কাহিনী-কাব্যেব, ধর্মযাজী সাহিত্যের ধারা লোপ পেলো। এলো পূর্ণ মানবতাবাদী সাহিত্য, এলো মনের কথা উজাড় ক'রে দেবার সুযোগ। এ সব তো বাঙালী কবিরা আগে কখনো পান নি। পাশ্চাত্তের প্রভাবই এভাবে রূপে-রসে একালের সাহিত্যকে ভবপূর করে রেখেছে।

এলো নাটক। আমাদের সংস্কৃত নাটক এবং মধ্যযুগের যাত্রার প্রভাব-বর্জিত একেবারে পাশ্চাত্তের আদর্শে গঠিত নাটক। তারও মধ্যে কত বৈচিত্র্য — সবই পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে। যেমন আছে ঐতিহাসিক-পৌরাণিক, তেমনি আছে সামাজিক-পারিবারিক, আছে ট্রাজেডি-কমেডি প্রভৃতি। এককথায়, রূপ ও রসগত যাবতীয় বৈচিত্র্য-সহ বাঙলা নাটক সবটাই পাশ্চাত্ত্য প্রভাব-প্রসূত।

আদি যুগের বাঙলা ভাষার সময়-সীমা সাধারণভাবে খ্রীঃ দশম থেকে আরম্ভ করে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত মেনে নেওয়া হলেও কোন কোন ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে তার আরম্ভ কালকে খ্রীঃ অষ্টম শতক পর্যন্ত পিছিয়ে নেওয়া হয়। ঐ সময়ই বাঙালী জাতি ও বাঙলা ভাষার উদ্ভব ঘটে – একরূপ অনুমানের অবশ্য যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি রয়েছে। এ ছাড়া এ যুগে যে সমস্ত সিদ্ধাচার্য 'চর্যাপদ' রচনা করেছেন, তাঁদেরও কেউ কেউ দশম শতকের পূর্বেই বর্তমান ছিলেন। তার স্বপক্ষেও কেউ কেউ যুক্তি উত্থাপন করেছেন। আবার আদিযুগের শেষ প্রান্তকেও কেউ কেউ মধ্যযুগের আরম্ভকাল অর্থাৎ চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত টেনে নিতে চাইছেন। বস্তুতঃ সমগ্র ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে কোন রচনা পাওয়া যায়নি বলেই এই কালখণ্ডটি বিষয়ে সংশয় রয়ে গেছে। আলোচ্য গ্রন্থে এটিকে মধ্যযুগের 'মানস প্রস্তুতি' কাল রূপে গ্রহণ করে এর 'অন্তর্বর্তী কাল' বা 'যুগসন্ধিকাল' নামকরণ করা হয়েছে এবং কার্যতঃ একে মধ্যযুগেরই অন্তর্ভুক্ত রূপে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

যুগ সীমা

আদিযুগের বাঙলা সাহিত্যে প্রাচীনতম বাঙলা ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। বাঙলা ভাষার এই প্রাচীনতম রূপটি লক্ষ্য করা যায় চর্যাপদে। আবার সমসময়েই ভিন্নতর অবহট্‌ঠ বা অপভ্রংশ ভাষায়ও যে বাঙলাদেশে সাহিত্যচর্চা চলছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় দোহাগুলিতে। প্রাচীনতম বাঙলা এবং অবহট্‌ঠ ভাষার সম্পর্কটি তাই বিচার করা প্রয়োজন।

সংস্কৃত নাটকগুলিতে বিভিন্ন প্রাকৃতের ব্যবহার লক্ষ্য করে অনুমান করা হয় যে, এক সময়ে শৌরসেনী প্রাকৃতই ছিল সমগ্র উত্তর ভারতের অভিজাত সম্প্রদায়ের ভাষা। পরবর্তীকালে শৌরসেনী প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত শৌরসেনী অপভ্রংশ তথা অবহট্‌ঠ ভাষা উক্ত প্রাকৃতের স্থান অধিকার করে। উত্তর ভারতের (মনে হয় সমকালীন বাঙলাদেশসহ) শিষ্ট সমাজ অবহট্‌ঠ ভাষাকেই সাহিত্যচর্চার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করলেন অবশ্য তখনও পর্যন্ত প্রতাপ ছিল সংস্কৃতের। মনে রাখতে হবে, উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কথ্যভাষারূপে তখন বিভিন্ন অপভ্রংশ এবং পরবর্তীকালে ভিন্নতর নব্য ভারতীয় আর্যভাষার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ যে কালে বাঙলাদেশে শিষ্ট সমাজের ভাষা তথা সাধু ভাষা 'অবহট্‌ঠ' সাহিত্য রচনায় ব্যবহৃত হচ্ছিল, সেই কালেই গোটা বাঙলাদেশ জুড়ে জনসাধারণের কথোপকথন চলছিল প্রাচীন বাঙলার মাধ্যমে। পঞ্চদশ শতকে মিথিলার কবি বিদ্যাপতিই সম্ভবতঃ অবহট্‌ঠ ভাষায় শেষ কাব্য রচনা করেছেন।

শিষ্ট সমাজের ভাষা অবহট্‌ঠ

দীর্ঘকাল পূর্বে, বুদ্ধদেবের কালে, যখন সমগ্র ভারতেই সাহিত্য সৃষ্টি হতো সংস্কৃত ভাষা তথা সাধুভাষায়, তখনই বৌদ্ধসমাজ জনগণের কথ্যভাষা পালিকে গ্রহণ করেছিল ধর্ম ও সাহিত্য-সাধনার মাধ্যমরূপে। ব্রাহ্মণ্যপ্রথা-শাসিত সমাজব্যবস্থায় বৌদ্ধগণ বরাবরই একটা স্বাতন্ত্র্য এবং সার্বজনীন মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। অতএব, এই সূত্র ধরে অগ্রসর হলে আমরা স্বভাবতই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, প্রাচীন যুগে বাঙলাদেশে যখন ব্রাহ্মণ্যপ্রথা শাসিত সমাজব্যবস্থায় তথা হিন্দুসমাজে সাধুভাষা অবহট্‌ঠ সাহিত্যিক ভাষার মর্যাদা লাভ করেছিল, তৎকালে বৌদ্ধসমাজ জনসাধারণের কথ্যভাষা প্রাচীন বাঙলাকেই সাহিত্য-রচনার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেছিল। অতএব, একই কালে বাঙলাদেশে পাশাপাশি চলছিল দুটি সাহিত্যের ভাষা, একটি সাধুভাষা অবহট্‌ঠ, অপরটি কথ্যভাষা বাঙলা। কথ্যভাষা বাঙলার উপর শৌরসেনী অবহট্‌ঠের কিছু প্রভাব পড়ে থাকতে পারে, যদিও বাঙলা শৌরসেনী অপহট্‌ঠজাত নয়।

[এক] আদি যুগের উপকরণ-বৈচিত্র্য তথা উপাদান বিচার

পূর্বেই বলা হয়েছে যে আদি যুগের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদই একমাত্র গ্রন্থ, যদিও এটিকে সার্থক সাহিত্য কিংবা সজ্ঞান সাহিত্যসৃষ্টি বলে অভিহিত করা যায় না। এতদ্ব্যতীত, ঐকালে রচিত হয়েছে তেমন অপর কোন বাঙলা গ্রন্থের সন্ধানও পাওয়া যায় না। চর্যাপদের সঙ্গে যে দোহাগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে, তা সমসাময়িক কালে রচিত হলেও এদের ভাষা বাঙলা নয়, অবহট্‌ঠ—এই কমরণেই বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এদের কোন স্থান নেই। তবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এরূপ কতকগুলি দোহা বা রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, যাদের ভাষা হয় আদি যুগের বাঙলা অথবা এর অব্যবহিত পূর্ববর্তী 'প্রাক্-বাঙলা' (Proto-Bengali)। প্রাচীন যুগের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের উপাদান-বিচারে এদের মূল্য একেবারে অস্বীকার করা চলে না।

চর্যাপদ

মালবে প্রাপ্ত একটি ভগ্ন শিলালিপিতে ৮টি আঞ্চলিক ভাষারূপের নিদর্শন পাওয়া যায়। এদের 'প্রত্ন নব্য ভারতীয় আর্যভাষা' রূপে গ্রহণ করা হয়। এদের মধ্যে একটি 'গৌড়ীয়' বা 'প্রত্ন বাঙলা'। সাধারণভাবে এদের 'অবহট্‌ঠ' নামে পরিচিত করা হলেও এগুলি শৌরসেনী অপভ্রংশ-জাত নয়, কারণ এখানে ভাষা ছাঁদের সম্পূর্ণ ভিন্ন আটটি আঞ্চলিক রূপ রয়েছে। আচার্য সুকুমার সেনও এদের 'আঞ্চলিক অবহট্‌ঠ' নামে অভিহিত ক'রে সামগ্রিকভাবে এদের নোতুন নামকরণ করেছেন, 'প্রত্ন নব্য ভারতীয় আর্যভাষা'। 'গৌড়ীভাষা'র নির্দশনও এখানে পাওয়া যায়।

গৌড়ীভাষা

মহারাষ্ট্রের চালুক্য বংশীয় কোন এক রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই 'মানসোল্লাস' বা 'অভিলাষার্থ চিন্তামণি' নামক একখানি সঙ্কলন-গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এতে বিভিন্ন ভাষায় রচিত অনেকগুলি লোকসঙ্গীতের নিদর্শন উদ্ধৃত হয়েছে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এদের কোন কোনটিকে বাঙলা ভাষায় রচিত বলে মনে করেন —

মানসোল্লাস

'.....ছাড়ু ছাড়ু মই জাইবো গোবিন্দসহ খেলন' অথবা 'জে ব্রাহ্মণের কুলে উপজিয়া কাতবীর্যা জিনে বাহু ফরসে খণ্ডিআ পরশুরামু দেবু সে মোহার মঙ্গল করউ।'

চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রাকৃত ছন্দের লক্ষণ-বিচার-বিষয়ক একটি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, এর নাম 'প্রাকৃত পৈঙ্গল'। অর্বাচীন অপভ্রংশ ভাষায় গ্রন্থটি রচিত হলেও এর কোন কোন শ্লোক প্রাচীন হিন্দী ও প্রাচীন বাঙলায় কিংবা প্রাক্-বাঙলায় রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। অন্ততঃ অনেক ক্ষেত্রেই নবীন আর্যভাষার মতো বাঙলা ভাষারও কিছুটা আদল এর কোন কোন কবিতায় পাওয়া যায়।

প্রাকৃত পৈঙ্গল

'ওগ্গর ভত্তা রম্ভঅ পত্তা গাইক ঘিত্তা দুগ্ধ সজুত্তা।
মোইলি মচ্ছা নালিচগচ্ছা দিজ্জই কন্তা খা পুনবন্তা।।'

অর্থাৎ 'ওগরা ভাত' ('ওগরা' চালের ভাত অথবা হাঁড়ি থেকে সদ্যঃ উদ্গীর্ণ গরম ভাত) কলাপাতা, গাওয়া ঘি, দুধমাখা ভাত, মৌরলা মাছ (পাঠান্তব, 'মোইনি' বা মযনা মাছ), নালিতা গাছ (পাট শাক) – কান্তা (স্ত্রী) দেয়, পুণ্যবান খায়।

সহজিয়া বৌদ্ধদের রচিত 'চর্যাপদ'কে বাদ দিলে পরবর্তী যুগের বাঙলা সাহিত্যেব শুরুতেই পাওয়া যাচ্ছে রাধা-কৃষ্ণের লীলা অবলম্বনেবচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ও অসংখ্য বৈষ্ণব পদ।এই ঐতিহ্য বাঙলা সাহিত্যের নিজস্ব। ঠিক অনুরূপ বিষযে রচিত একটি শ্লোক পাওয়া যাচ্ছে 'প্রাকৃতপৈঙ্গলে'। এটি যে বাঙালী কবি-কর্তৃক প্রাক্-বাঙলায বচিত এরূপ অনুমান যথার্থ হওয়াই সম্ভব।

অরে রে বাহিহি কাহ্ন নাব
ছোড়ি ডগমগ কুগই ন দেহি।
তুই এখনই সন্তার দেই
জো চাহসি সো লেহি।।'

অর্থাৎ—'ওরে রে কানাই, নৌকা বেয়ে চল, ডগমগ ছেড়ে দাও, কুগতি দিয়ো না। তুমি এখনই খেয়া পার করে দিয়ে যা চাও, তাই নাও।'

পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী জয়দেব গোস্বামী-রচিত 'গীতগোবিন্দ' অবশ্যই সংস্কৃত ভাষায় রচিত বাঙালীর গর্ব করবার উপযুক্ত একখানি কাব্য। কিন্তু অনেকে সন্দেহ করেন যে গ্রন্থটি বাঙলা অথবা অপভ্রংশ ভাষায় রচিত হয়েছিল, পরে সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত হয়। এরূপ সন্দেহের একটি অন্যতম কারণ এই যে, গ্রন্থের কোন কোন স্থলে এরূপ ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা সংস্কৃত ছন্দ-

জয়দেব : গীতগোবিন্দ

শাস্ত্র-অনুযায়ী অশুদ্ধ; প্রাকৃত ছন্দে পঠিত হলে কোন গোলযোগ থাকে না। গ্রন্থটির ভাষাও স্থানে স্থানে এত সহজ যে সংস্কৃত ভাষায় এরূপ রচনা অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়। এ ছাড়া পরবর্তী বাঙলা সাহিত্যের উপর বিশেষভাবে পদাবলী সাহিত্যের উপর এর প্রভাবের কথা মনে করলে প্রাচীন যুগের বাঙলা সাহিত্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে এর কথা উল্লেখ না করে উপায় থাকে না। [এ বিষয়ে আলোচনা অন্যত্র দ্রষ্টব্য]

'টীকা-সর্বস্ব'

বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দ অমরকোষের 'টীকাসর্বস্ব' নামে যে টীকা রচনা করেন, তাতে তিন শতের অধিক বাঙলা শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে অবশ্যই এদের কোন স্থান নেই, কিন্তু আদিযুগের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য এমন অভিন্নভাবে জড়িত যে, একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নয়। এরূপ আর একটি গ্রন্থ হেমচন্দ্র-রচিত 'দেশীনামমালা'। এতেও কতকগুলি বাঙলা শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়।

তাম্রশাসন

পূর্বে যে সকল সূত্রের উল্লেখ করা হয়েছে, এর বাইরে আর উল্লেখ করবার মতো কোন নিদর্শন নেই। সাহিত্যকীর্তি-হিশেবে অবশ্য এগুলি উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, কিন্তু যেকালে সাহিত্যের উপাদান একেবারেই দুর্লভ, সেইকালে যা কিছু পাওয়া যায়, তাই মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। প্রাচীন বাঙলার কতকগুলি তাম্রশাসনে কিছু কিছু স্থান-নাম পাওয়া যায়, —এগুলিকে তাই প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের সম্পদ বলে গ্রহণ করা হয়।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে প্রাচীন বাঙলায় রচিত বলে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলির কথা উল্লেখ করেছেন যদিও অপর কোন ঐতিহাসিক এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন না।

(অ) রামাই পণ্ডিত-রচিত 'শূন্যপুরাণ' ঃ দীনেশবাবু মনে করেন খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আদি ধর্মপূজক রামাই পণ্ডিত গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থের 'শূন্যপুরাণ' নাম সম্পাদক-প্রদত্ত। দীনেশবাবু-ব্যতীত অপর কোন ঐতিহাসিকই গ্রন্থের এই প্রাচীনত্ব স্বীকার করেন না। রামাই পণ্ডিতকে দ্বাদশ শতাব্দীর লোক বলে মেনে নিলেও তাঁর গ্রন্থকর্তৃত্ব নিঃসংশয়িত নয়। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় মনে করেন যে ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে অন্তত পাঁচজন কবির হস্তাবলেপ এতে বর্তমান। এর অন্তর্গত 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' অংশটি নিঃসন্দেহে অনেক অর্বাচীন কালের রচনা। সহদেবের 'ধর্মমঙ্গলকাব্যে' এই 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' অংশটি পাওয়া গেছে। রচনার কোন কোন অংশ দুর্বোধ্য। এর কোন অংশকে বাঙলা ভাষার আদি গদ্য-রচনার নিদর্শনরূপেও উল্লেখ করা হয়ে থাকে। —'হথ পাতিয়া লহহ সেবকর অগঘ পুপ্ফ পাণি।'

(আ) 'মানিকচন্দ্রের গান ও গোরক্ষবিজয়' ঃ স্যর জর্জ গ্রীয়ার্সন রংপুর থেকে নাথ-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রন্থ আবিষ্কার করে এর নাম দেন 'মানিকচন্দ্রের গান' (The song of Manik Chandra)। মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদও এই জাতীয়

একটি কাব্যকাহিনী আবিষ্কার করে 'গোরক্ষবিজয়' বা 'মীনচেতন' নামে প্রকাশ করেন। উভয় গ্রন্থেই গোরক্ষনাথ-মীননাথ-কানুপা-হাড়িপা প্রভৃতি নাথপন্থী সাধকদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এরা সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং খ্রীঃ দশম-একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান থেকে থাকতে পারেন। এই কারণেই পূর্বোক্ত গ্রন্থ দুটিকে আদি যুগের রচনা বলে পরিচায়িত করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই ধরনের আরও অনেক গ্রন্থই আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু দুভার্গ্যক্রমে কোনটিরই কোন প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয় নি। গ্রন্থ দুটির মূল কাঠামো যদিও আদি যুগে রচিত হয়ে থাকে তবু যে আকারে পাওয়া গিয়েছে, তা'তে ডঃ সুকুমার সেন এগুলিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী রচনা বলে স্বীকার করেন না। [বিস্তৃত আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য]

(ই) ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মনে করেন যে, 'রূপকথা' এবং 'ডাক ও খনার বচন'গুলিও আদি যুগের অন্তর্ভুক্ত। অপভ্রংশ ভাষায় লেখা 'ডাকার্ণব' নামক একখানি গ্রন্থ ঐ যুগে রচিত হলেও 'ডাক ও খনার বচন' যে রূপে প্রচলিত আছে তাতে কিছুতেই ঐগুলিকে আদি যুগের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা চলে না। সত্য বটে, ডাক ও খনার বচনের বাক্যাংশে কখনও প্রাচীন রীতি আমেজ পাওয়া যায় এবং কোন কোন শব্দও এব প্রাচীনত্বের সাক্ষ্যই দান করে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এদের প্রাচীনত্ব সমর্থনযোগ্য নয়। আব যদি বাঙলা সাহিত্যের আদি যুগেই এদেব সৃষ্টি হযে থাকে, তবু এদেব আকারে প্রকারে এত পরিবর্তন ঘটেছে যে এদের প্রাচীন বলবার কোন সার্থকতা থাকতে পারে না।

ডাকার্ণবঃ

রূপকথাগুলি কোন যুগে প্রথম জন্মলাভ করেছিল তা অনুমান করাও দুঃসাধ্য। এদের সম্বন্ধে কোন কিছু নিশ্চিতভাবে বলবার পক্ষে প্রধান বাধা এই যে এদের কোন লিখিত রূপ পাওয়া যায় না। কোন কোন গল্পের ভিতর সমাজব্যবস্থার কাঠামো পর্যালোচনা করলে মনে হতে পাবে এগুলি প্রাক্-ইসলাম যুগেই রচিত হযেছিল। কিন্তু সুদীর্ঘকাল মুখে মুখে প্রচার লাভ করেছে বলে এর প্রাচীনত্ব আর কিছুই নেই। বিশেষত এদের কোন লিখিত রূপ পাওয়া না যাওয়ায় এগুলোকে সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করাও কঠিন।

[দুই] সংস্কৃত ও প্রাকৃত-অবহট্‌ঠের গুরুত্ব

বাঙলা সাহিত্যের আদিপর্বের উপাদান বিচার করতে গিয়ে বাঙলা এবং সংস্কৃত ছাড়াও প্রাকৃত-অবহট্‌ঠের প্রসঙ্গ এসেছে। এখন এই তিনের পাবস্পরিক সম্পর্কটি আলোচনা প্রসঙ্গে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে সংস্কৃত ও প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ সাহিত্য আলোচনার প্রাসঙ্গিকতাটুকুও একটু বিচার কবে দেখা প্রয়োজন। তা হলেই আপাততঃ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়টিরও গুরুত্ব অনুধাবন করা যাবে।

এটি এখন প্রমাণিত সত্য যে, সংস্কৃত তথা প্রাচীন ভাবতীয় আর্যভাষা ক্রম-বিবর্তিত হযে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা তথা প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ স্তব পার হয়ে বাঙলা-আদি নব্য ভাবতীয় আর্য ভাষার জন্মদান করেছে। কাজেই জন্মসূত্রেই সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ-বাঙলা

একই ভাষা-শৃঙ্খলের পরম্পরিত রূপ এবং একটি থেকে আরেকটি অবিচ্ছিন্ন ধারায় সৃষ্ট হয়েছে। কাজেই বংশের কনিষ্ঠ বাঙলা যে উত্তরাধিকার-সূত্রে পূর্বপুরুষের কিছু রিক্‌থ ও দায় বহন করবে, এটা তো একান্ত স্বাভাবিক। কাজেই পরস্পরের সঙ্গে প্রাসঙ্গি-কতার প্রশ্নটাই একান্ত অপ্রাসঙ্গিক এবং অকারণ। তবু, যে কোন সংস্কৃত বা প্রাকৃত সাহিত্যের সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যের সম্পর্ক-সূত্র আবিষ্কার দুষ্প্রচেষ্টা বলেই মনে করা সঙ্গত।

সংস্কৃত-প্রাকৃত-বাঙলা

কিন্তু একই কালে এবং একই স্থানিক পটভূমিতে, কচিৎ হয়তো বা একই ব্যক্তি দ্বারা তিন ভাষায় বা যে কোন দুই ভাষায় কাব্য রচিত হয় কিংবা একই পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কাব্য বচিত হয়, তখন কি এদের সম্পর্ক-সূত্র থাকাই স্বাভাবিক নয়? ঐকদেশিক সমকালীন মানুষের মধ্যে মানসিক সাম্যই তো স্বাভাবিক। অতএব, বাঙলা সাহিত্যের আদিপর্বে সংস্কৃত ও প্রাকৃত-অবহট্‌ঠের সঙ্গে বাঙলাব সম্পর্ক একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে এখানে পারস্পরিকতা সম্ভব নয়, কারণ জন্মধারা উল্টাস্রোতে চলে না। পূর্বপুরুষদেরই দাতা ও মহাজনের ভূমিকা, অধস্তন উত্তব পুরুষেরা গ্রহীতা এবং অধমর্ণের ভূমিকায়ই থাকবে — এটা প্রকৃতির নিযম, লজ্জাব বিষয নয়।

এই পর্বে সংস্কৃত সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি, দুটি 'রামচরিত', লক্ষ্মণসেনেব সভাকবিদের কিছু বচনা—তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দ', কিছু প্রাচীন শ্লোক ও প্রশস্তি বাক্য, অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠে রচিত কয়েকটি সঙ্কলন গ্রন্থস্থ প্রকীর্ণ শ্লোকই প্রধান। এদেব সঙ্গে সমকালীন বাঙলা সাহিত্যের সম্পর্ক বিচাব এক দুঃসাধ্য কর্ম,

সমকালীন বাঙলাব সঙ্গে যোগ

একমাত্র বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধন পদ্ধতি-বিষয়ক গ্রন্থ 'চর্যাপদ' ছাড়া একালে রচিত বাঙলা সাহিত্যের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। সামান্য কিছু বাঙলা শব্দ ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন উপাদান থেকে কিছু পাওয়া যায় মাত্র, কাজেই সম্পর্ক-বিচারের জন্য, অথবা স্পষ্ট করে বলা যেতে পাবে বাঙলা সাহিত্যের আলোচনায় সংস্কৃত-অবহট্‌ঠের প্রাসঙ্গিকতা বিচারে আমাদের প্রধানতঃ উত্তরপর্বের বাঙলা সাহিত্যেবই দ্বারস্থ হতে হবে।

সম্ভবতঃ সমকালীন রচনা সংস্কৃত 'গীতগোবিন্দ' এবং বাঙলা ভাষায় রচিত প্রথম গ্রন্থ 'চর্যাপদে'র মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকেই সমধর্মিতার পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যধারায ব্যতিক্রমী 'গীতগোবিন্দ' যেমন কতকগুলি ক্ষুদ্রাবযব পদের সাহায্যে গঠিত,

গীতগোবিন্দ

অন্ত্যানুপ্রাস বা মিলযুক্ত রচনা এবং মাত্রাচ্ছন্দে রচিত, চর্যার পদগুলি অনুরূপ ধর্মযুক্ত। — 'চর্যাপদে'র পরবর্তী উল্লেখযোগ্য বাঙলা গ্রন্থই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এটি একেবাবে 'গীতগোবিন্দে'র আদর্শে গঠিত। এতেও রয়েছে 'গীতগোবিন্দে'র মতই বাধা, কৃষ্ণ এবং বড়াই বুড়ি— তিনটি মাত্র চরিত্র এবং উভয়ত্র তিনজনেব উক্তিপ্রত্যুক্তিক্রমে এবং গীতধাবার মাধ্যমে একটি নাটকের অভিনয় হচ্ছে — এই নাট্যগীতির বিষয়বস্তু মূলতঃ বাধাকৃষ্ণেব প্রেম হলেও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র পবিধি অনেকটা

ব্যাপক। শেষোক্ত ক্ষেত্রে অন্ত্যানুপ্রাস বজায় রয়েছে এবং সব মিলিয়ে একটা কাহিনীকেই গড়ে তোলা হয়েছে। শুধু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নয়, পরবর্তী বাঙলা সাহিত্যেও 'গীতগোবিন্দে'র ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

বাঙলা সাহিত্যে চৈতন্য-পূর্বকাল থেকেই বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-আদি মহাজনগণ গীতগোবিন্দের আদর্শেই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা-অবলম্বনে যে বৈষ্ণবপদ রচনা করে গেছেন, তারও প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এমন কি স্বয়ং চৈতন্যদেবও এ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। আর শুধু বিষয়বস্তুর দিক থেকেই নয়, গীতাত্মক পদ রচনার রীতি এবং অন্ত্যানুপ্রাসও গীতগোবিন্দের প্রভাব-জাত। অন্ত্যানুপ্রাস বস্তুতঃ পরবর্তী বাঙলা কবিতার স্বাভাবিক রীতি হয়েই দাঁড়িয়েছিল এবং বাঙলায় স্বল্পাবয়ব কবিতা রচনা একই প্রভাবজাত বলে মেনে নিতে হয়।

সংস্কৃত 'রাম-চরিত' -এর মতোই ধ্রুপদী মহাকাব্য 'রামায়ণ' অনুসরণে চৈতন্য-পূর্ব বাঙলা সাহিত্যেই রামায়ণের অনুবাদ শুরু হয়েছিল, পরে ভাগবত এবং মহাভারতও অনূদিত হয়।

প্রাকৃত অবহট্‌ঠ ভাষায় রচিত প্রকীর্ণ শ্লোকগুলিও যে মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য-রচনায় যথেষ্ট সহায়তা করেছে, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। যারা আদিপর্বে বাঙলা ভাষায় 'চর্যাগীতি' রচনা করেছেন, তাদের মধ্যেও কেউ কেউ অবহট্‌ঠ ভাষায় দোহা রচনা করেছেন, যেমন সরহপা, কাহ্নপা। কাজেই উভয়ের মধ্যে অন্ততঃ মানসিকতার দিক থেকেও একটা সাধর্ম্য প্রত্যাশিত। বস্তুতঃ কোন কোন চর্যাপদের ভাষাতেও কিছু অবহট্‌ঠের মিশ্রণও ঘটে গেছে। তা ছাড়াও, সংস্কৃত এবং প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ প্রকীর্ণ শ্লোকে রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক প্রসঙ্গ এসেছে বারবার, বাঙলা সাহিত্যের একটা বিরাট অংশই তো তাতে পূর্ণ। প্রাকৃত অবহট্‌ঠ রচনার মাত্রামূলক ছন্দও বাঙলা ব্রজবুলি ভাষায়-রচিত শ্লোকে প্রত্নমাত্রাবৃত্ত রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অনেক সময় এই ছন্দও আধুনিক কবিতা বা গানেও ব্যবহৃত হয়। মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ডে, শিবায়ন কাব্যে কিংবা শাক্তপদাবলীতে যে হর-গৌরীর কাহিনী দেখতে পাই তাও কিন্তু প্রকীর্ণ শ্লোকে বর্তমান। অন্ততঃ দরিদ্র গৃহস্থ শিবের রূপটি কিন্তু অবহট্‌ঠে ভালোই ফুটেছে।

বাঙলা মঙ্গলকাব্য নামে যে আখ্যায়িকা কাব্যধারা মধ্যযুগে একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, সেই আখ্যায়িকা-রচনার প্রবণতাটুকু জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র সাদৃশ্যেই সঞ্চারিত হ'য়েছিল, মনে করলে সম্ভবতঃ ভুল হবে না।

[তিন] খ্রীঃ পঞ্চম শতক থেকে আদিযুগ পর্যন্ত

(১) বাঙলার ঐতিহাসিক পটভূমি

১। গুপ্ত শাসনকাল — আ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দী

২। রাজা শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত — আ ৬০৬-৬৩৫ খ্রীঃ?

৩। মাৎস্যন্যায় — আঃ ৬৩৫-৭৫০ খ্রীঃ
৪। পাল বংশ — অষ্টম শতাব্দী-১১৬০ খ্রীঃ
গোপালদেব, ধর্মপাল, দেবপাল, মহীপাল, রামপাল প্রভৃতি।
(অ) খড়্গ বংশ — ৬৫০-৭০০ খ্রীঃ (আঞ্চলিক অধিকার)
(আ) বর্মণ বংশ — ১০৭৫-১১৫০ খ্রীঃ
৫। সেন বংশ — ১১২৫ (?) -১২৩০ খ্রীঃ
হেমন্তসেন, বিজয়সেন, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন প্রভৃতি।
(লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ পরে দীর্ঘকাল পূর্ববঙ্গে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করে গেছেন।)

(২) জ্ঞান সাহিত্য (সংস্কৃত ভাষায়)

১। চন্দ্রগোমীর 'ব্যাকবণ', সুভূতিচন্দ্রের 'কামধেনু', সর্বানন্দের 'টীকাসর্বস্ব'।
২। পালকাপ্যের 'হস্ত্যায়ুর্বেদ', মাধবের 'রোগবিনিশ্চয়', চক্রপাণির 'চিকিৎসা-সার সংগ্রহ'।
৩। শ্রীধরের 'ন্যায়কন্দলী', গৌড়পাদের 'আগমশাস্ত্র'।
৪। ভবদেবের 'ব্যবহারতিলক', 'প্রায়শ্চিত্তকরণ', জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ', হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব'।

(৩) রস সাহিত্য

১। নাটক ঃ ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার', মুরারির 'অনর্ঘরাঘব', বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ডকৌশিক'।
২। কাব্য ঃ অভিনন্দের 'রামচরিত', সন্ধ্যাকব নন্দীর 'রামচরিত', ধোয়ীর 'পবনদূত', গোবর্ধন আচার্যের 'আর্যাসপ্তশতী', জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'।
৩। বর্বিঙ্গে সঙ্কলিত 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় / সুভাষিত রত্নকোষ', লক্ষ্মণসেনের এক প্রধান কর্মচারী শ্রীধবদাস-সঙ্কলিত 'সদুক্তিকর্ণামৃত' সঙ্কলন গ্রন্থে বাঙালীদের রচিত শ্লোক।

(৪) প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ পরিচয়

'গাহাসত্তসঈ' ('গাথাসপ্তশতী') এবং 'প্রাকৃতপৈঙ্গলে' প্রাপ্ত বাঙালীজীবনের চিত্র।

[চার] চর্যাপদ

বাঙলা সাহিত্যের আদি যুগের ইতিহাসে যে একটি মাত্র গ্রন্থকে নিঃসন্দেহে সাহিত্য-রূপে স্থান দান করা যেতে পারে তা 'চর্যাপদ' বা 'চর্যাগীতিকোষ'। চর্যাপদের আবিষ্কার কাহিনী কৌতূহলোদ্দীক। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল রাজদরবার থেকে কয়েকখানি

পুরানো পুথি আবিষ্কার করে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে ১৩২৩ বঙ্গাব্দে একসঙ্গে প্রকাশ করেন। শাস্ত্রী মহাশয় ধারণা করেছিলেন, এদের সব কটিই আদি যুগের বাঙলায় লিখিত। কিন্তু ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য মনীষীরা স্থির সিদ্ধান্ত করেছেন যে এদের মধ্যে একমাত্র চর্যাপদের পুথিটিই বাঙলা ভাষায় রচিত। এটি ছাড়া ছিল সরহ ও কাহ্নপাদের রচিত দুটি 'দোহাকোষ' এবং 'ডাকার্ণব' নামে দোহাবলী। দোহাগুলি পশ্চিমা অপভ্রংশে রচিত বলে এগুলিকে আলোচনার বাইরে রাখা হলো।

প্রাচীনতম বাঙলা গ্রন্থ

বৌদ্ধ গানগুলিকে সাধারণভাবে 'চর্যাপদ' নামে অভিহিত করা হলেও শাস্ত্রী মহাশয় এর নাম দিয়েছিলেন 'চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়'। মুনিদত্তের টীকায় পাওয়া যায় 'আশ্চর্য চর্যাচয়'। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন যে এর নাম হওয়া উচিত 'চর্যাশ্চর্যাবিনিশ্চয়'। পরবর্তীকালে প্রমাণিত হ'য়েছে যে গ্রন্থটির প্রকৃত নাম ছিল 'চর্যাগীতিকোষ'। গ্রন্থের নাম যাই হোক, এটি যখন বাঙলা ভাষায় রচিত, তখন নেপাল থেকে এর আবিষ্কার বিস্ময়কর। মনে হয়, বাঙলাদেশে তুর্কী-আক্রমণের ফলে একদল উদ্বাস্তু আপনাদের ধর্ম-সংস্কৃতি রক্ষা-মানসে শরণার্থীরূপে হিন্দুরাজ্য নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। বাঙলাদেশে পাওয়া যায় নি, উদ্বাস্তুদের দ্বারা নীত বইটি পাহাড়ী অঞ্চলে কোনক্রমে কালসাগর অতিক্রম করবার সুযোগ পেয়েছিল।

গ্রন্থটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া গিয়েছে। এতে সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ এবং তেইশজন কবির ভণিতা পাওয়া যায়। একটি তিব্বতী অনুবাদে আরও সাড়ে তিনটি পদ আবিষ্কৃত হয়। অতএব চর্যাপদ গ্রন্থে সাকুল্যে ৫১ টি পদ এবং ২৪ জন কবির ভণিতা ছিল বলে অনুমান করা যায়। মনে হয়, মোট সঙ্কলিত পদের সংখ্যা ছিল ১০০ টি। তন্মধ্যে মুনিদত্ত ৫০টির টীকা রচনা করেন। উত্তরকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক ও তাৎকালিক বাঙলার বিভাগীয় প্রধান ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত চর্যাপদ বিষয়ে অধিকতব জ্ঞান লাভ ও অনুসন্ধিৎসা-হেতু নেপাল গমন করেন এবং আরও কিছু প্রাচীন চর্যাপদেব সন্ধান লাভ করেন। তিনি এ জাতীয় কিছু পদ সংগ্রহও করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতায় জানা গিয়েছিল, সেখানে এখনো মুখে মুখে এ ধরনের গানও প্রচলিত রয়েছে — সেগুলিকে 'চর্চাগীত' নামে অভিহিত করা হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে শ্রদ্ধেয় শশিবাবুর আকস্মিক ও অকাল প্রয়াণে ঐ চর্যাগীতগুলি আব সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হবার সুযোগ পায়নি। এ ছাড়া পণ্ডিতপ্রবর রাহুল সাংস্কৃত্যায়নও নেপাল - তিব্বত অঞ্চল থেকে কিছু চর্যাপদ উদ্ধার করেছেন। তাদের কোন কোনটি পূর্বাবিষ্কৃত চর্যার প্রতিরূপ। অপরগুলি সম্ভবতঃ কিঞ্চিৎ পববর্তী কালের । তাঁর বচনায় তিনজন নোতুন চর্যাকারের নাম পাওয়া যাচ্ছে—বিনয়শ্রী, সরুঅ এবং অবধূ।

পুথি-পবিচয়

চর্যাপদের রচয়িতাদের সাধারণত 'সিদ্ধাচার্য' নামে অভিহিত করা হয়। এঁদের প্রত্যেকেরই নামের পর পা 'পাদাচার্য' উপাধিটি ব্যবহার করা হয়। যে ২৪ জন সিদ্ধাচার্যের নাম পাওয়া

গিয়েছে তাদের মধ্যে 'কৃষ্ণপাদাচার্য' বা কাহ্নপা-ই প্রধান, এঁর রচিত পদের সংখ্যা বারোটি। চিত্রধর্মী কবি ভুসুকুপার রচিত পদের সংখ্যা আট। সরহপার রচিত পদের সংখ্যা চার। ইনি অপভ্রংশ ভাষায় দোহাও রচনা করেছিলেন। কুক্কুরীপাদের ভণিতায় পাওয়া যায় চারিটি পদ। লুইপা-রচিত পদের সংখ্যা মাত্র দুটি হলেও প্রাচীনত্বে ইনি প্রথম। কেউ কেউ মনে করেন যে নাথ-গুরু মীননাথ এবং লুইপা (রোহিতপাদ) অভিন্ন ব্যক্তি। শান্তিপাদ এবং শবরীপাদ প্রত্যেকেই দুটি করে পদ রচনা করেছেন। অপর সকল সিদ্ধাচার্যই একটি করে পদ রচনা করেছেন। কুক্কুরীপা, বীণাপা, তন্ত্রীপা, কঙ্কণপা প্রভৃতি সিদ্ধাচার্য ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয়।

সিদ্ধাচার্য-পরিচয়

ডঃ শহীদুল্লাহ মনে করেন যে আদি সিদ্ধাচার্য লুইপা খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর দিকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এ কথা সত্যি হলে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস আরও প্রাচীনতর বলে প্রমাণিত হতো। কিন্তু ডঃ সুনীতিকুমার এবং অন্যান্য ভাষাবিজ্ঞানিগণ সিদ্ধাচার্যদের দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর অন্তর্বর্তীকালের বলে মনে করেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণরত্নাকর' গ্রন্থে যে চৌরাশী সিদ্ধার নাম প্রদত্ত হয়েছে তাদের অনেকেই চর্যাপদের রচয়িতা। এ থেকে একটি বিষয় অন্তত নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে চর্যাপদের রচনাকাল নিশ্চিতভাবে চতুর্দশ শতাব্দীব পূর্ববর্তী।

বচনাকাল

চর্যাপদের ভাষা আদিযুগের বাঙলা। এই ভাষার সঙ্গে অবহট্‌ঠের সাদৃশ্য অনেকটা প্রকট। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে চর্যাপদের ভাষা প্রায় অবিকৃতরূপেই পাওয়া গেছে বলে আমরা প্রাচীন বাঙলার রূপটি সম্বন্ধে অবহিত হবার সুযোগ পেয়েছি। চর্যার শব্দরূপ, ধাতুরূপ এবং বাগ্‌ধারায় বাঙলা ভাষার বিশিষ্ট রূপটিরই সন্ধান পাওয়া যায়। এতে এমন কতকগুলি লক্ষণ প্রকট, যার ফলে একে নিশ্চিতভাবেই বাঙলা বলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। যেমন কর্মকারকে 'কে -রে, -ক' বিভক্তি, সম্বন্ধ পদে '-র, -এর' বিভক্তি, অধিকরণে '-ত, -তে', বিভক্তি, অতীতকালে '-ইল' এবং ভবিষ্যৎ কালে 'ইব' বিভক্তি', আন্তর, মাঝ, সাঙ্গ-, প্রভৃতি অনুসর্গ, অসমাপিকা ক্রিয়ায় '-ইতে, -ইয়া, -ইলে' বিভক্তি ব্যবহার এবং বাঙলার কতকগুলি বাগ্‌ব্যবহার নিশ্চিতভাবেই চর্যার ভাষার সমস্যা-সমাধানে সহায়ক — এ সবই বাঙলা ভাষার একক বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থটি আবিষ্কৃত হবার পরই আমাদের প্রতিবেশীরা একে আপনাদের ভাষায় রচিত বলে যে দাবি জানিয়েছিলেন, ভাষাতাত্ত্বিক কারণে তাদের সেই দাবি অগ্রাহ্য হয়েছে।

ভাষা

চর্যাপদের ভাষাকে 'সন্ধ্যাভাষা' বা 'আলো-আঁধারি' ভাষা বলে অভিহিত করা হয়। এর কিছুটা বোঝা যায়, কিছুটা বোঝা যায় না, এই কারণেই একে সন্ধ্যাভাষা বলা হয়। অপর কেউ অনুমান করেন যে কথাটি 'সন্ধাভাষা' অর্থাৎ বিশেষরূপে অনুধাবন করেই এর অর্থ বার করতে হয়। ভাষার নাম যাই হোক, চর্যাপদের অর্থ যে সহজ নয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। চর্যাপদের একটি পদ ধরা যাক —

সন্ধ্যাভাষা

'আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্ন বিমন ভইলা।।'

—'আলিতে ও কালিতে পদ বন্ধ করেছে দেখে কানুপা বিমনা হলেন।' আলি কালি বলতে 'অ'কারাদি স্বরবর্ণ এবং 'ক'কারাদি ব্যঞ্জনবর্ণ বোঝায়। আর একটু অগ্রসর হয়ে অনুমান করা যায়, বিভিন্ন বর্ণের সাহায্যে গঠিত বিদ্যায় ভক্তির পথ রোধ করেছে। কিন্তু অর্থ এতেও সুস্পষ্ট হলো বলে মনে হয় না।

(ক) চর্যার ধর্মতত্ত্ব

বৌদ্ধ সহজপন্থী সাধকদের সাধন-ভজন-সম্পর্কিত কিছু গূঢ় তত্ত্ব বা সাধন-সঙ্কেত চর্যাপদের বিষয়বস্তু।

'চর্যা' শব্দের সাধারণ অর্থ 'আচরণীয়' — এমনিভাবে বোঝা যায়, সহজিয়া-পন্থী বৌদ্ধদেব সাধন-ভজন-সম্পর্কিত যে সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে হয়, তারই নিয়ম নির্দেশ হয়তো বা মূলে এর উদ্দিষ্ট ছিল। 'মানসোল্লাসে' 'চর্যা-প্রবন্ধে'র সংজ্ঞা এবং দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে —

'অর্থশ্চাধ্যাত্মিকঃ প্রাসঃ পাদদ্বিতয়শোভনঃ।
উত্তরার্ধে ভবেদেবং চর্যা সা তু নিগদ্যন্তে।।'
'সংসার সাঅর উত্তরে কায়রহিতে চাড়িয়া।
কোহ-লোহ-মোহ-বহুকে না ভরিয়া।।
ইন্দ্রিয়-পবন খর বেগ বহন্তি।
দুক্কিয় লহরী নিমজ্জি ন পারথি।।'
ঈদৃক্ পদানি চত্বারি দর্শিতানি ময়াধুনা।
অধ্যাত্মকার্যযুক্তানি চর্যা-নাম্নি প্রবন্ধকে।।'

অর্থাৎ — 'অর্থ আধ্যাত্মিক, পদ দুটি মিল-যুক্ত; পরে তাই — একে বলা হয় চর্যা। ' (এটি সংস্কৃতে লিখিত)

'সংসার সাগর' উত্তীর্ণ হবার জন্য চড়া হ'য়েছে। ক্রোধ-লোভ-মোহ দ্বারা বহুলভাবে ভরা হ'য়েছে। ইন্দ্রিয়-পবন খরবেগে বইছে, দুষ্কৃত লহরী নিমজ্জিত করতে পারছে না।' (এটি দৃষ্টান্তরূপে আহৃত চর্যাপদ)।

'এই চারটি পদ আমি এখানে দেখালাম, অধ্যাত্মকার্যে নিযুক্ত 'চর্যা' নামক প্রবন্ধকে।' (এটিও সংস্কৃত)।

সিদ্ধাচার্যগণ যে সাহিত্য সাধনার উদ্দেশ্য নিয়ে চর্যাপদগুলি রচনা করেন নি, তা সহজেই অনুমান করা চলে। সিদ্ধাচার্য বা বৌদ্ধ সহজিয়াপন্থী সাধকগণ আপনাদের সাধন-ভজন-পদ্ধতি নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবার উদ্দেশ্যেই সঙ্কেতবাক্যে এদের প্রচার করেছিলেন। এই কারণেই চর্যার পদগুলির একটা সাধারণ অর্থ সহজেই বের

করা সম্ভবপর হলেও এর গূঢ় অর্থ হয়তো এখনও পর্যন্ত রয়েছে আমাদের অজ্ঞাত। তাঁদের সাধনতত্ত্বগুলিকে বিভিন্ন রূপকের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়েছে। হতে পারে, হিন্দুসমাজ-সম্বন্ধে সহজিয়াদের মনোভাব প্রতিকূল থাকায় তারা আপনাদের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন, এই কারণেই তাদের এই সতর্ক গোপনীয়তা। চর্যার টীকাকার মুনিদত্ত এর দার্শনিক তত্ত্ব উদ্ধার করতে চেষ্টা করেছেন।

এর দর্শনকে 'শূন্যবাদ' বলে অভিহিত করা চলে। শূন্যতাই একমাত্র সত্য— শূন্যতার মধ্যেই সুখ-দুঃখাদির লোপ ঘটে এবং এতেই মানুষের অস্তিত্ব নিহিত। এটিই অদ্বয় ও সহজ অবস্থা। একমাত্র গুরুর উপদেশেই মহাসুখময় নির্বাণ লাভ করা যেতে পারে, এর জন্য যোগসাধনাদির প্রয়োজন নেই। মোটামুটি এটিই চর্যাপদের দার্শনিক তত্ত্ব।

মনে হয় চর্যাপদগুলি গীত হবার জন্য রচিত হয়েছিল। প্রতিটি পদের পূর্বে তার রাগ, রাগিণী ও তালের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এই ধর্মসঙ্গীত প্রচারের সাহায্যেই হয়তো তাদের সাধন-ভজন চল্‌তো। পরবর্তীকালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব কিংবা বাউলদের যেমন এই সঙ্গীত প্রচাবই তাদের সাধন-ভজনের অঙ্গ, সহজিয়া বৌদ্ধদেরও হয়তো তাই ছিল। অনুমান করতে দোষ নেই, উত্তরকালে সহজিয়া বৈষ্ণব এবং দেহবাদী বাউল সাধকও বৌদ্ধ সহজ-সাধনারই উত্তরসূরী।

বৌদ্ধ সহজবাদী সাধকদের ভাববাদী দর্শনে বস্তুবিশ্বের অস্তিত্ব বস্তুতঃ অস্বীকৃত— যা কিছু আমরা দেখি শুনি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও প্রত্যক্ষগোচর, সেই সবই ভ্রান্ত চিত্তের প্রতিভাস। এই ধারণা থেকেই তাঁরা শূন্যতাবাদের তত্ত্বে উপনীত হয়েছেন। একটি চর্যাপদে রূপে-রেখায় এই তত্ত্বটি বিশদ হয়ে উঠেছে —

'মরুমরীচি গন্ধর্বণঅরী দাপণ পড়িবিম্বুজইসা।
বাতাবত্তে সো দিঢ় ভইআ অপে পাথর জইসা।।
বান্ধিসুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিধ খেলা।
বালুআ তেলেঁ সসরসিংগে আকাশ-ফুলিলা।।'

অর্থাৎ '(পৃথিবীটা) মরু মরীচিকা, গন্ধর্বের নগর, দর্পণের প্রতিবিম্ব যেমন (ভ্রান্ত), বাতাবর্তে যেমন পাথরের মতো দৃঢ় হয়, বন্ধ্যাসুত যেমন কেলি করে, বহুবিধ খেলা করে অথবা বালুর তেল, শশকের শৃঙ্গ কিংবা আকাশ কুসুম (যেমন অপ্রাকৃত অলীক জগৎও তাই)।'

শূন্যতায় পর্যবসিত যে অদ্বয়চেতনা, সেখানে পৌঁছনোর জন্য জপতপ-আদি নয়, দেহ-সাধনাই তার একমাত্র উপায়। পরবর্তীকালের সহজিয়াবাদী বৈষ্ণবদের রাগাত্মিক তত্ত্বে এবং বাউল সঙ্গীতে একই দেহ-সাধনার ধারা অনুসৃত হয়েছে। গবেষক অধ্যাপক ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন ঃ " The Sahajia cult, as an offshoot of Tantric Buddhism lays the highest stress on the practical method for realising the sahajia nature of all the self and of all Dharmas."

চর্যাপদের যে কোন পদেই এই শূন্যবাদ তথা 'অদ্বয় সাধনা'র এবং সহজিয়া দেহ-সাধনার

কথা হয়েছে, কিন্তু কোথাও স্পষ্টভাষায় নয় — কখনো সান্ধেতিকার মাধ্যমে কখনো বা রূপকের সহায়তায়। ফলতঃ প্রতিটি পদ হয়ে উঠেছে দ্ব্যর্থবোধক, তাঁর একটি ব্যবহারিক অর্থ রয়েছে, যা মোটামুটি সহজবোধ্য একমাত্র। কিন্তু তারই অন্তরালে একটা রয়েছে গূঢ়তত্ত্ব, যার অর্থ গুরুর উপদেশেই জানা যাবে। এইজন্য বলা হয়েছে — 'গুরু পুচ্ছিঅ জান।' সহজবাদী ব্যতীত অপরের নিকট তা জ্ঞেয় নয়। সাধনতত্ত্বে এই গোপনীয়তার জন্য হয়তো বৌদ্ধধর্মে এত সম-বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে তা প্রসারলাভ করতে পারে নি। ভারতের বাইবে যে বৌদ্ধধর্মের প্রসার, তা এই সহজ পন্থা নয়।

(খ) চর্যাপদের কাব্যমূল্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব

একথা প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে সহজিয়াপন্থী চর্যাকাবগণ সজ্ঞানে সাহিত্য সাধনা করতে বসেন নি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও চর্যাপদ যে একান্তভাবেই ধর্মগ্রন্থ হয়ে উঠেনি, এটি আমাদের সৌভাগ্য। সিদ্ধাচার্যদেব অনেকেরই স্বাভাবিক কবিদৃষ্টি ছিল যার ফলে চর্যাপদে কখন কখন উৎকৃষ্ট শিল্পপ্রকৃতিবও পরিচয় অস্পষ্ট থাকে নি। পরবর্তীকালে বাঙলা সাহিত্যে কবিদেব যে আত্মবিবিক্ত নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গিব পবিচয় পাওয়া যায়, চর্যাপদ তা থেকে অনেকাংশে মুক্ত। চর্যাপদে কবিদেব ব্যক্তিত্ব-সম্পর্ক সুনিবিড় এবং এই কারণেই এর কোন কোন পদ শুধুমাত্র কবিতা নয়, একেবারেই গীতিকাব্যের মর্যাদা লাভের যোগ্য। বস্তুতঃ এতে বাঙালীর স্বভাবধর্মেরই পরিচয় পাওয়া যায়। চর্যাপদের mystic বা অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদী রূপটি ব্যাখা করতে গিযে সমালোচক বলেন, 'অনুভূতির' অনির্বাচ্যতা ব্যঞ্জনাময় প্রকাশরীতিকে আশ্রয় কবে অপূর্ব বহস্যমণ্ডিত হযে উঠেছে।

ব্যক্তি-সম্পর্ক

সাধন-সম্পর্কিত তত্ত্বকে স্বগোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবার প্রয়োজনেই চর্যাকারগণ নানা প্রকাব রূপকের আবরণে তাদের বক্তব্যবে প্রচ্ছন্ন করে বেখেছেন, ফলে তাঁদেব মূল তত্ত্ব গোপন থাকলেও সাধারণ পাঠকেব নিকট রূপকগুলি অতিশয় উপভোগ্য হযে উঠেছে। এই রূপকেব মধ্যে আমরা পাই অসাধারণ কিছু রূপকল্প ও চিত্র রচনা। সিদ্ধাচার্যগণ নির্বাণের আনন্দকে নৈবাত্মা বা নৈবামণি নামে অভিহিত করে কখনও তাঁকে করিণী-রূপে, কখনো হরিণীরূপে, কখনো ছলনাময়ী বিলাসিনী বা স্বৈরিণীরূপে কল্পনা করে তাঁব সঙ্গে মানসবিহারে মিলিত হন। আবাব এই চির-আকাঙ্ক্ষিতা নৈবামণিই কখনো বা শবরী — তার মাথায় ময়ূরপাখা, গলায় গুঞ্জামালা, কানে কুণ্ডল।

রূপক

চর্যাপদের রূপক-প্রতীকগুলির মধ্যে যে চিত্রকল্পে সহজ সৌন্দর্যের আকর্ষণ বা লোকজীবনের ছাযাপাত ঘটেছে তেমন পদ-বিশ্লেষণে তাব কাব্যশ্রী সহজেই অনুভূত হতে পারে। ষষ্ঠ সংখ্যক পদে বেড়া হাঁকের মধ্যে ('বেঢ়িল হাঁক পড়য়ে চৌদীস') কি ভাবে হবিণী এসে হরিণকে নিযে মাংসলোলুপ শিকাবীদের হাত থেকে উদ্ধার করে বন ত্যাগ করে ভিন্ন বনে আশ্রয়ের জন্য

ধাবিত হয় — এই পদের চিত্রমূল্য কি অস্বীকার করা যায় ? ২৮-সংখ্যক পদ — 'উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী' — এটিকে সজ্ঞান সাহিত্যসৃষ্টি বলে অভিহিত করলে কোন দোষ ঘটে না। পর্বতবাসিনী' শবরকন্যা এবং উন্মত্ত শবরের আসক্তিপূর্ণ জীবনলীলার যে চিত্র চর্যাকার ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতে তাঁর কবি-ধর্মই প্রাধান্য লাভ করেছে। ৩৩ সংখ্যক পদে টিলার উপর বাস করে যে গৃহস্থবধূ, যার কোন প্রতিবেশী নেই অথচ নিত্য আসে অতিথি—তার দারিদ্র্য-বিড়ম্বিত জীবনের চিত্রটিতে যেন একটি নিটোল ছোটগল্পের আমেজ অনুভূত হয়।

চিত্রকল্প

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী,
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।।

এরূপ কয়েকটি অসাধারণ রূপকল্প এবং চিত্রসম্পদ ছাড়াও পদ-ব্যবহারে কোন কোন চর্যাকার অসাধারণ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। অধ্যাপক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "কবিত্ব বলিতে যে গতানুগতিক 'কনভেনশন' গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে বুঝিলে অবশ্য চর্যায় কবিত্ব লক্ষ্য কবা যাইবে না। কিন্তু কনভেনশনের চশমা খুলিয়া সহজ প্রতীতির দৃষ্টিতে দেখিলে চর্যার অধ্যাত্মতত্ত্ব-বিষয়ক পদেও চিত্রসৃষ্টি, প্রতীকদ্যোতনা, শব্দ চয়ন কৌশল ও আবেগের সন্ধান পাওয়া যাইবে। ইহাকেই কবিত্ব বলে।" এই দৃষ্টিভঙ্গি বিচার করলে আমরা চর্যার প্রহেলিকা-জাতীয় উক্তিগুলির কথাও উল্লেখ করতে পাবি। গূঢ়তাৎপর্যপূর্ণ এই প্রহেলিকাগুলিতে একটা স্ববিরোধিতা আপাত-লক্ষ্য হলেও তাৎপর্য-উপলব্ধিতে এর মধ্যে গভীরতব সঙ্গীতিই আবিষ্কার করা যায়। 'নিতি নিতি সিআলা সীহসম যুঝই' (নিত্য নিত্য শিয়াল সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে), 'রুখের তেন্তলী কুম্ভীরে খাঈ' (গাছেব তেঁতুল কুমীরে খায়), কিংবা 'কাছিম দুহিয়া পাত্রে ধরে না', 'বলদ বিয়াইল গাই বন্ধ্যা বহিল' প্রভৃতি উক্তির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য গভীব ব্যঞ্জনাময়।

পদ-ব্যবহাব

চর্যাপদের কাবমূল্য-বিষয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে অধ্যাপক তাবাপদ ভট্টাচার্য বলেন, "চর্যার বিষয়বস্তু যাহাই হউক চর্যাব উদ্দেশ্য কিন্তু তাত্ত্বিক নহে, সাহিত্যিক। চর্যাকারদিগের দৃষ্টি দার্শনিকের দৃষ্টি নহে, কবি-দৃষ্টি। চর্যার বিষয় সহজিয়া তত্ত্ব হইলেও এই তত্ত্বের মূল বুদ্ধির স্তব অতিক্রম করিয়া বিশ্বাসের স্তরে প্রবেশ করিয়াছে। চর্যার তত্ত্বে থিয়োরির সংশয়িত রূপ দেখা যায় না, সত্যের দৃঢ়তাই আসিয়া গিয়াছে; যুক্তি তর্ক বা সন্দেহের চিহ্নমাত্র নেই, সমস্তই স্বাভাবিক ও সহজ হইয়া উঠিয়াছে। এই ব্যাপার সম্ভব হইয়াছে কেবল কবিদৃষ্টির ফলে। চর্যার ভাষাও শাস্ত্রভাষা নহে, কবি-ভাষা মাত্র—উপভোগধর্মী বক্রোক্তি, বাগ্‌বাহুল্য ও সরসতা শাস্ত্রীয় স্পষ্ট ভাষণের রীতিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ... চর্যাভাষার বিন্যাস গদ্যধর্মী নহে, কাব্যধর্মী...।"

কাব্য-মূল্য

চর্যাপদগুলির কাব্যমূল্য-নির্ধারণের প্রয়োজনে এর ছন্দ অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্যও উল্লেখযোগ্য। চর্যার যুগে বাঙলার নিজস্ব উচ্চারণ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি, সম্ভবতঃ সেই কারণেই ছন্দের দিক

দিয়েও ছিল তার পরনির্ভরতা। বস্তুতঃ প্রাকৃত অবহট্‌ঠে ব্যবহৃত মাত্রামূলক ছন্দোরীতিই চর্যাপদে গৃহীত হয়েছিল। পরবর্তীকালে বাঙলা কবিতায় যে অন্ত্যানুপ্রাস ব্যবহৃত হতো, তার যথাযোগ্য ব্যবহার পাওয়া যায় চর্যাপদে—সংস্কৃতে কিন্তু এই রীতি সুলভ ছিল না। চর্যাপদে প্রচলিত নানাবিধ অলঙ্কার ব্যবহৃত হলেও রূপকের ব্যবহার ছিল একেবারে অপরিহার্য এবং কবিরা অন্যবিধ অলঙ্কার ব্যবহারেও যথেষ্ট সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন।

ছন্দ

(গ) চর্যাপদে সমাজচিত্র

চর্যাপদের কবিগণ সচেতনভাবে সাহিত্য সৃষ্টি করতে বসেন নি, এ কথা যেমন সত্য, তেমনি তাঁরা যে সমাজ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন, তাও একান্ত সত্য। কবিরাও সমাজের সৃষ্টি এবং সাহিত্য সমাজেরই দর্পণ—এ সহজ সত্যকে স্বীকার করে নিলেই আমরা বুঝতে পারি, সাধনসঙ্গীত রচনা করতে গিয়েও চর্যাকারগণ কীভাবে তাতে খণ্ড খণ্ড সমাজচিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। তাঁরা সাধনতত্ত্বকে যে সকল রূপকের সাহায্যে প্রস্ফুট করে তুলেছেন, সেই রূপকগুলিকে গ্রহণ করেছিলেন বাস্তব জীবন থেকেই। তাই চর্যাপদগুলিতে সমকালীন জীবনযাত্রার ও বাস্তব সমাজব্যবস্থার যে পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র আমরা পাই, তেমনটি প্রাচীন যুগের অপর কোন কাব্যেই সুলভ নয়।

চর্যা রচনাকালে বাঙলায় পাল বংশ ও সেন বংশের রাজত্ব চলছিল। ঐ সময় সমাজে বর্ণাশ্রমধর্ম পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। সমাজে অন্ত্যজ শ্রেণীর স্থান ছিল সর্বনিম্নে।

'দেখু চণ্ডালীর বাম্মণ জার,
পাঞ্চ ভইল একাকার।'

সহজিয়াপন্থী বৌদ্ধদের অনেকেই এসেছিলেন এই অন্ত্যজশ্রেণী থেকে। তা ছাড়া বাঙলায় এই সময়টা ছিল বৌদ্ধধর্মের চরম অবনতি ও অবক্ষয়ের যুগ। কাজেই সমাজের উচ্চকোটি থেকে বোধ হয় বৌদ্ধরা ছিলেন নির্বাসিত। তাই চর্যাপদগুলিতে আমরা নিম্নবর্ণ ও নিম্নবিত্ত সমাজের সঙ্গে কবিদের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের চিহ্ন খুঁজে পাই।

সমাজে অন্ত্যজ শ্রেণী ছিল অস্পৃশ্য—লোকালয়ের বাইরে উচ্চকোটির নাগরিকদেব থেকে দূরতর স্থানে নিরাপদ ব্যবধানে ছিল ওদের বাসভূমি। এক টিলার উপর প্রতিবেশীহীন জীবনযাপনের পরিচয় দিচ্ছে এক শবর — 'টালাত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।' ডোম, চণ্ডাল, জেলে, তাঁতী, ধুনুরি মাঝি প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের কথাই কিন্তু চর্যাকারগণ বারবার উল্লেখ করেছেন। ডোমদের সম্বন্ধে কবি বলছেন — 'নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।' বাঁশের তাঁত, চুবড়ি, চাঙ্গাড়ি প্রভৃতি বোনা ও বিক্রয় করাই ছিল তাদের পেশা। নৌকা বাওয়া, মাছ ধরা, নদী প্রভৃতির প্রসঙ্গ বারবারই আসছে, তাতে মনে হয়, চর্যাকারদের জীবনের সঙ্গে নদীর ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। ধীবরবৃত্তি, ব্যাধবৃত্তি, মদ-চোঁয়ানোর ব্যবসা, বৃক্ষচ্ছেদন, ধুনুরির কাজ প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তির উল্লেখ থেকে তৎকালীন সমাজ জীবনের বাস্তবতার দিকটি প্রকট হয়ে ওঠে।

নটবৃত্তি, 'বুদ্ধ নাটকে'র উল্লেখ প্রভৃতি থেকে মনে হয় যে সমাজে নৃত্যগীত অভিনয়েরও প্রচলন ছিল—তা সে মনোরঞ্জনের জন্যই হোক অথবা ধর্মীয় প্রয়োজনেই হোক্। বিবাহযাত্রা, দাবাখেলা বা মদ্যপান প্রভৃতির উল্লেখ থেকে সমাজজীবন এবং গার্হস্থ্য জীবনের একটা অন্তরঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। বিবাহযাত্রায় মাদল, দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যভাণ্ডের ব্যবহার ছিল। বাসরঘরে যথেষ্ট আমোদ-প্রমোদের অবকাশ ছিল। বিবাহে যৌতুক পাওয়া যেতো এবং যৌতুকের লোভে অনেকেই নীচকুলেও বিবাহ্ করতো। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিধবা বিবাহেরও প্রচলন ছিল। সম্পন্ন গৃহে কর্পূরবাসিত তাম্বুল সেবনের প্রথা ছিল —

'হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।'

সমাজে চুরি-ডাকাতি যথেষ্টই হতো, গৃহস্থজীবনে ব্যভিচারও বড় কম ছিল না। ভদ্রশ্রেণীর মধ্যেও জীবনযাত্রার নৈতিক মান খুব উঁচু ছিল না।

'ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালেঁ লেলী।'

সেকালে যৌথ পরিবার প্রথাই প্রচলিত ছিল দেখা যায়। শ্বশুর-শাশুড়ি, ননদ-শ্যালিকা— সবাইকে নিয়েই পরিবার গড়ে উঠতো। হরিণমাংস প্রীতির কথা এসেছে প্রসঙ্গ ক্রমে। পদ্মাতীরে জলদস্যুদের কথা বলা হয়েছে – তারা নির্দয়ভাবে বাঙলাদেশ লুট করেছিল। শুল্ক সংগ্রাহকদের উপদ্রব এবং শান্তিরক্ষকদের অত্যাচার উৎপীড়নের কথাও কোন কোন পদে পাওয়া যায়।

চর্যাপদে প্রাপ্ত সমাজজীবনের পরিচয়-বিষয়ে অধ্যাপক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "ইহাতে যে সমাজজীবন ও গার্হস্থ্য-জীবনের রূপক ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা অবলম্বনে তৎকালীন ভদ্রেতর সমাজের একটা ছায়ারূপ অবধারণ করা যায়। সে সমাজ ঈষৎ হীন অন্ত্যজের সমাজ; সে ানে ।যৌনজীবন কিছু শিথিল, আসবমত্ততা নিন্দনীয় নয়, দারিদ্র্য নিত্যসঙ্গী, শ্বশুর-শাশুড়ী ননদ-বহুড়ী পরিণত বৃহৎ সংসার, হীনবৃত্তিজীবী অষ্ট্রীক কৌমের জনসাধারণের জীবনায়ন, জলদস্যুদের উৎপাত, পথে বাটপাড়ের ভয়। তাঁতি, শুঁড়ি, ধুনুরী, কৃষাণ, কৈবর্ত, ডোম-শবরী প্রভৃতি নিম্নস্তরের মানুষ ও জীবনের যে প্রতীকগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার দ্বারা খ্রীঃ দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর বাঙলাদেশের ভদ্রেতর সমাজের একটা স্থূল চিত্ররূপলাভ করা যায়।"

(ঘ) চর্যাপদের গুরুত্ব

চর্যাপদের আবিষ্কার বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে সম্ভবতঃ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বস্তুতঃ এই আবিষ্কারের ফলেই আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বয়োজ্যেষ্ঠের মর্যাদায়ই শুধু ভূষিত হয়নি, অবহট্‌ঠ ও তজ্জাত বাঙলা ভাষার মধ্যে যে ব্যবধান বর্তমান ছিল, তাদের মধ্যেও একটা সংযোগসেতু রচিত হলো। বস্তুতঃ এখনও পর্যন্ত চর্যাপদই আঞ্চলিক ভাষায় রচিত প্রাচীনতম সাহিত্যের সার্থক দাবিদাররূপে স্বীকৃত।

খ্রীঃ দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে সহজিয়াপন্থী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাধন প্রণালী সাঙ্কেতিক ভাষায় এই গ্রন্থের বিভিন্ন পদে বর্ণিত হওয়াতে এতে যেমন একটা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাধন-ভজনের ইতিহাস পাওয়া যায়, তেমনি সমসাময়িক সমাজ জীবনের একটা বাস্তব, প্রত্যক্ষ এবং বিশ্বস্ত নিপুণ আলেখ্যও এতে বর্তমান থাকায় তৎকালীন সামাজিক ইতিহাসের পৃষ্ঠপটও এতে বিধৃত হয়েছে। পাল ও সেন বংশের রাজত্বকালের তথা প্রাক্-ইসলাম যুগের এমন সমাজজীবনের চিত্র অন্যত্র দুর্লভ।

চর্যাকারগণ ধর্মীয় গুরু হলেও এদের অনেকেই যে কবিপ্রাণ ছিলেন, বিভিন্ন চর্যাপদের বিশ্লেষণে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু চর্যার সাহিত্যগুণ যদি অস্বীকৃতও হয়, তৎসত্ত্বেও এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব একটুও ক্ষুণ্ন হয় না। কারণ চর্যাপদ ছাড়া বাঙলা ভাষায় রচিত এমন কোন গ্রন্থ নেই, যেখানে আদিযুগের বাঙলা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে। ফলতঃ ভাষাতাত্ত্বিক কারণে এই গ্রন্থটি বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

চর্যাপদে যে প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তা সাধারণতঃ ব্রজবুলি ভাষায় রচিত বৈষ্ণব পদেই শুধু অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু এই মাত্রামূলক ছন্দই যে ক্রমবিবর্তিত হয়ে পরবর্তীকালে বহুল ব্যবহৃত অক্ষরমূলক ছন্দে রূপান্তরিত হয়েছে, ছান্দসিকদের অনেকেই তা স্বীকার করে নিয়েছেন। কাজেই বাঙলা ছন্দের গঠনেও এর গুরুত্ব স্বীকৃত। বাঙলা কবিতায় যে অন্ত্যমিল ব্যবহৃত হয়, তারও মূল এই চর্যাপদে।

চর্যাপদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব-বিষয়ে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ''মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অপভ্রংশ দোহাবলী ও চর্যাগীতিকা আবিষ্কার করিয়া প্রাচীনতম বাঙলা সাহিত্যের বিস্তৃত পরিচয় উদ্ধার করিয়াছেন ... উক্ত গ্রন্থগুলির সাহিত্যিক মূল্য যাহাই হোক না কেন তৎকালীন বাঙালীর ধর্ম, সমাজ ও মানস জীবনের মূল্যবান দলিল হিসাবে সরহ, কাহ্ন ও তিল্লোপাদের দোহা এবং নানা সিদ্ধাচার্যের রচিত চর্যাগীতিকার ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদের গুরুত্ব শুধু এটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়, পরবর্তীকালের বাঙলা সাহিত্যকেও যে এটি নানাভাবে প্রভাবিত করেছে, এই সত্য অনস্বীকার্য।'' অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্য্য বলেন, ''চর্যাকবির কবিত্ব অর্ধ-প্রকাশিত ও দুর্বল বটে কিন্তু নিষ্ফল নহে। চর্যাকবিগণ বঙ্গসাহিত্যে যে প্রাণের বীজ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে পরবর্তী বৈষ্ণব পরকীয়া রসতত্ত্ব, রাগাত্মিক পদাবলী ও বাউলগান অঙ্কুরিত হইয়াছে। নৈরামণির পরিকল্পনা বাদ দিলেও চর্যাকবির কল্পনাজাত রূপকল্প (imagery) বাঙালী ভুলিতে পারে নাই। পরবর্তী যুগের সঙ্গীতে মনহরিণ, কায়া, নৌকা, মনমাঝি প্রভৃতি রূপকল্প চর্যাকবির কল্পনার অমরতা প্রমাণ করে।''

অতি প্রাচীনকালেও যে চর্যাপদের একটা বিশিষ্ট আসন ছিল, সংস্কৃত ও তিব্বতী ভাষায় রচিত তার টীকা থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুত, এই ধরনের টীকা না পাওয়া গেলে চর্যাপদের অর্থনিষ্পত্তি সম্ভবপর হয়ে উঠত না।

[পাঁচ] প্রাচীন যুগ অর্থাৎ আদি ও মধ্যযুগের সাহিত্যে মানব-ভূমিকা

আদি ও মধ্যযুগের অর্থাৎ প্রাচীন বাঙলা সাহিত্য-বিষয়ে একটা অতি প্রচলিত ধারণা তথা সাধারণ অভিযোগ এই যে, এই সুদীর্ঘকাল-ব্যাপী সাহিত্য ধর্মীয় বা 'দেবযাজী'। বস্তুতঃ শেষ পর্বের অল্প কিছু লৌকিক সাহিত্যকে ব্যতিক্রম-রূপে গ্রহণ করলে প্রতিটি ধারার সাহিত্যেই ধর্ম বা দেব-মাহাত্ম্য কীর্তনকে একটা বিশেষ ভূমিকায় দেখা যায়। মানব-ভূমিকা যে সেখানে অনুপস্থিত, তা নয়, বরং সাধারণ মানব-মানবীর ভূমিকাই কাহিনীর বিরাট অংশ অধিকার করে রয়েছে। তা হলে পূর্বোক্ত ধারণা বা অভিযোগটি কেন? এর যথার্থতা এবং যৌক্তিকতা বিচার করে দেখা যেতে পারে — কোন সত্যকে নির্বিচারে গ্রহণ না করাই শ্রেয়।

দেবযাজী বা ধর্মীয় সাহিত্য

বাঙলা সাহিত্যের উদ্ভব ঘটেছিল পাল রাজত্বকালে, কবিদের জীবন-কালের বিচারে এবং রচনার বিষয়বস্তুর বিচারে এই তথ্য সমর্থনযোগ্য। প্রথম সাহিত্যগ্রন্থ 'চর্যাপদ'গুলির রচয়িতা কবিরা ছিলেন সহজিয়াপন্থী বৌদ্ধ, ইতিহাসে এঁদের অনেকেরই সন্ধান পাওয়া যায়। রচনার বিষয়ও বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনপন্থা বর্ণনা — এটি কোনক্রমেই সজ্ঞান সাহিত্য-রচনা-প্রচেষ্টা নয়। বুদ্ধদেবের নির্দেশে তাঁর শিষ্যবর্গ 'সকায় নিরুত্তিয়া' অর্থাৎ নিজস্ব ভাষায় বুদ্ধবচন ও ধর্ম-বিষয়ক যাবতীয় আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন, অতএব উক্ত ধারা এবং ঐতিহ্য অনুসরণে স্বকালে প্রচলিত স্বীয় মাতৃভাষা সদ্যঃ-উদ্ভূত বাঙলাকে তাদের ধর্মসাধনার বাহন-রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তৎকালে শিক্ষিত জনসাধারণ সাহিত্য রচনা করতো যে ভাষায় সেই 'সংস্কৃত' এবং 'অবহট্‌ঠ' ভাষাও তারা গ্রহণ করেনি, আবার যে লৌকিক বিষয়-অবলম্বন করে তারা সাহিত্য রচনা করতো, সেই বিষয়-গত ঐতিহ্যও অনুসরণ করেনি। ফলতঃ বাঙলা ভাষায় গোড়াপত্তনে 'বৌদ্ধধর্মীয় সাধনা-তত্ত্ব'ই বাঙলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন-রূপে গৃহীত হ'লো।

আদিযুগ ঃ সহজিয়া সাধনপন্থা

এই আদিযুগের পর সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে মধ্যযুগের সাহিত্য রচনা প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। কিন্তু এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী পর্বটিতে বাঙলার রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিহাসে বিরাট বিপর্যয় ঘটে গেছে। বাঙলায় বিধর্মী, বিদেশি ও বিভাষী তুর্কী জাতির রাজত্ব শুরু হয়েছে। বাঙলার সামাজিক জীবনও বিপর্যস্ত! একদিকে বৌদ্ধ-হিন্দু-মুসলিম ধর্মের পারস্পরিক আঘাত-সংঘাত, ভাঙা-গড়ার খেলা, অপরদিকে আর্য-অনার্য-সমন্বয়। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজ অন্ত্যজশ্রেণী এবং প্রাগার্য আদিবাসীদেরও স্ব-সমাজের অঙ্গীভূত করে নেবার ফলে বৃহত্তর হিন্দু সমাজে যে একটা সমন্বয়ী মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল, তার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। বাঙলা সাহিত্য ক্ষেত্রকে তা প্রবলভাবে অভিভূত করেছিল।

ইতিপূর্বে আর্যদের এদেশে আগমনের কালে প্রথমে এখানকার আদিবাসী অনার্যদের সঙ্গে

সংঘর্ষ ও পরে সংমিশ্রণ ও সমন্বয় সাধিত হবার ফলে দেশে হিন্দুজাতি তথা হিন্দু-ধর্মের উদ্ভব ঘটে, ফলতঃ উভয়ই হলো আর্য-অনার্য সংস্কৃতির ফল। সেই ব্রাহ্মণ্যধর্মাশ্রিত হিন্দুরাই ক্রমবর্ধিত আকারে সমগ্র ভারত অধিকার করে বাঙলা-আসাম পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে। তারপর তাদের সঙ্গে নব-আগন্তুক ইস্‌লাম-ধর্মী তুর্কী-পাঠান-মোগলদের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে অতীব রক্ষণশীল তৎকালের শরীয়ৎ-পন্থী মুসলিম সমাজে ভাঙন ধরানো যায়নি, বরং তারাই হিন্দু-বৌদ্ধ সমাজ ভেঙে তাদের কলেবর বৃদ্ধি করেছে। পক্ষান্তরে হিন্দুরা আদিবাসী অনার্যদের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে নিজেদের আত্মরক্ষা করেছে। একে তো প্রথম পর্বেই আর্য-অনার্য সমন্বয়ের ফলে হিন্দুজাতির ভাবনা-কামনায় প্রচুর অনার্যোচিত আচার-বিচার, ভাবনা-কামনা এসে গিয়েছিল এবং বাঙালী উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজে পূর্বাবধি ঐ ধারাই প্রচলিত ছিল, এক্ষণে তুর্কী-আক্রমণের ফলে নোতুনভাবে আর্য-অনার্য ধারায় আবার সংস্কৃতি সমন্বয় ঘটলো। তার অনিবার্য ফল দেখা দিল মধ্যযুগীয় জীবনচর্যায়, তার ধর্মীয় আচরণে, তার সাহিত্যে, তার সামগ্রিক মনোভাবেও।

সমন্বয়

অরণ্যের অধিবাসী আদিবাসী অনার্য গিরিজন-হরিজনরা ছিল একান্তভাবে প্রকৃতি-নির্ভর। প্রকৃতির অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী আদিবাসীদের আত্মনির্ভরতা ছিল না, যাবতীয় ফল-প্রাপ্তির পিছনেই তারা প্রকৃতির একটা অলৌকিক শক্তির প্রতিই ছিল আস্থাশীল! তাদের এই ধ্রুব বিশ্বাস ও একান্ত নির্ভরতার ফলই ধর্মভাবনা ও দৈবশক্তির উৎস। সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ফলে তাদের এই ধর্ম-দেবতার তত্ত্ব ও প্রাধান্য সামগ্রিকভাবে হিন্দুসমাজেও সঞ্চারিত হয়েছিল। সমকালীন অবস্থার প্রেক্ষিতে বাঙালী হিন্দু সমাজও এই দৈবশক্তি ও ধর্মভাবনাকে অস্বীকার করতে পারেনি। তাই সমকালীন বাঙলা সাহিত্যে এই মনোভাবেরই প্রতিফলন ঘটেছে। এই কারণেই মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের গোড়া থেকেই অনার্য- ভাবোচিত দেবতা ও ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত অবহট্‌ঠ ভাষায় রচিত সমকালীন লৌকিক ঐতিহ্য বাঙলায় অনুসৃত হয়নি।

হিন্দুভাবনায় অনার্য-প্রভাব

এখন প্রশ্ন হলো, সমগ্র মধ্যযুগের অথবা এককথায় প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে কি শুধুই দেবতা আর ধর্মের কথা ? মানুষের কি কোন সক্রিয় ভূমিকাই নেই সেখানে যে কোন তন্নিষ্ঠ পাঠকেরই উত্তরটি 'নঞর্থক' হ'বে মনে হয়। বস্তুতঃ আপাততঃ-দৃষ্টিতে ঐ যুগের প্রতিটি গ্রন্থই কোন-না-কোন কাহিনী-ভিত্তিক এবং এই সমস্তই কাহিনীতে রয়েছে সমাজের নানা স্তরের বিচিত্র মানব-মানবীর আনাগোনা — তাদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের কাহিনী। অবশ্য প্রতিটি গ্রন্থে দেবতা বা ধর্মেরও উপস্থিতি রয়েছে, কিন্তু তাদের ভূমিকা কোথাও সক্রিয়, কোথাও বা নিষ্ক্রিয়, সেই দেবতাদের কেউ বা অতি নিষ্ঠুর, জোর করে, ভয় দেখিয়ে ভক্তি আদায় করতে চাইছেন, কোথাও বা দেবতার ভূমিকা মঙ্গলময়, নিজের গরজেই ভক্তের উপকার সাধন করেন। কোন গ্রন্থের দেবতার ভূমিকা অতি প্রত্যক্ষ, কোথাও বা পরোক্ষ। গ্রন্থ-পাঠে যে কোন নিরপেক্ষ পাঠকেরই মনে হতে পারে, মানব-কাহিনী রচনাই ছিল লক্ষ্য, দেবতা বা

দেবধর্মের প্রাধান্য বনাম মানবিকতা

ধর্ম সেখানে উপলক্ষ্য মাত্র — যেন জোর করেই গ্রন্থকারের ঘাড়ে দেবতা বা ধর্মের মাহাত্ম্য আরোপ করবার দায় চাপানো হয়েছে। ভক্ত পাঠক হয়তো বা ভক্তি বিশ্বাসের দায়ে তার উদ্দিষ্ট দেবতা বা ধর্মের মাহাত্ম্য-বিষয়ক কাব্যটি পাঠ করবেন, কিন্তু যে কোন কাব্যরসিক পাঠকই দেবতা-ধর্মকে বাদ দিয়েও কাব্যপাঠে জীবন-রস-সুধা থেকে বঞ্চিত হবেন না এবং সেই রস তিনি আহরণ করবেন গ্রন্থে বর্ণিত মানব-জীবন-কাহিনী থেকেই। প্রাচীন যুগের বাঙলা সাহিত্যে মানব-ভূমিকার স্বরূপটি এ থেকেই বোঝা যাবে।

এবার সে যুগের বিভিন্ন ধারার সাহিত্য বিশ্লেষণ ক'রে বিভিন্ন কাব্যে মানব-ভূমিকাটি অধিকতর স্পষ্ট করে দেখা যেতে পারে। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে, যে কয়টি প্রধান ধারা প্রচলিত ছিল, সেগুলি হলো — 'অনুবাদ সাহিত্য', 'মঙ্গলকাব্য', 'চরিতশাখা', 'পদাবলী শাখা' ও 'লৌকিক সাহিত্য শাখা'। অবশ্য এর বাইরেও রয়ে গেছে 'বৈষ্ণব তত্ত্ব সাহিত্য', 'নাথ সাহিত্য', 'কুলজী সাহিত্য' প্রভৃতি, যেগুলি সাধারণতঃ কোন প্রধান ধারা-রূপে বিবেচিত হয় না।

অনুবাদ সাহিত্যের দু'টি ধারা মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল — একটি প্রাচীন সংস্কৃত পুরাণ-মহাকাব্যের অনুবাদ, অপরটি অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে 'হিন্দী-ফার্সি' গ্রন্থের অনুবাদ। শেষোক্তটি-সম্বন্ধে 'লৌকিক সাহিত্য'-বিভাগে অলোচিত হ'বে। আলোচ্য অনুচ্ছেদে সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারত এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতপুরাণের অনুবাদই স্থান পাবে। এই তিনটি মহাগ্রন্থেরই অংশ-বিশেষের সংক্ষিপ্তাকৃতির ভাবানুবাদ বাঙলায় অনূদিত হয়েছিল। এই অনুবাদগুলি রচিত হয়েছিল সমকালীন সমাজের সম্মুখে আদর্শ মানব-রূপ ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজনেই। অনুবাদে লেখকের স্বাধীনতা থাকে না, কাজেই মূল কাহিনীকেই যতটা সম্ভব বজায় রাখতে হয়। তৎসত্ত্বেও অলোচ্য ক্ষেত্রে রামায়ণের রামচন্দ্র এবং ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণকে সমসাময়িক কালের বাঙালী চরিত্র করেই গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন লেখক এবং কাহিনীগুলির বিভিন্ন চরিত্রে যতখানি সম্ভব মানবিক গুণ-ধর্মই আরোপ করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁরা অনুবাদ গ্রন্থগুলিতে মূলের অতিরিক্ত কোন ধর্মীয় গুরুত্ব আরোপ করতে চেষ্টা করেন নি। বাঙলা রামায়ণে আমরা ভ্রাতৃপ্রেম, পিতৃভক্তি, পাতিব্রত্য, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি এবং ভাগবত পুরাণে মানবপ্রেমের বিভিন্ন লীলা আদি মানবিক গুণেরই বিকাশ লক্ষ্য করি।

অনুবাদ-সাহিত্যে মানবিকতা

মঙ্গলকাব্যধারার মধ্যে প্রধান কয়টি হলো — অনার্য সমাজ থেকে আগতা দেবী মনসার মাহাত্ম্যসূচক 'মনসামঙ্গল কাব্য', দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্যসূচক 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য', ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যসূচক 'ধর্মমঙ্গল কাব্য' এবং পৌরাণিক দেবতা শিবের মাহাত্ম্যসূচক 'শিবায়ন কাব্য'। 'মনসামঙ্গল কাব্যে' দেবী মনসা জোর ক'রে চাঁদসদাগরের পূজা-আদায়ের উদ্দেশ্যে তাকে বার বার চরমভাবে দুর্দশাগ্রস্ত করেন, কিন্তু পৌরাণিক দেবতা শিবের উপাস্য চাঁদসদাগর বারবারই বলে,

মঙ্গলকাব্য ধারা

'যেই হাতে পূজি আমি দেব শূলপাণি।
সেই হাতে না পূজিব চ্যাংমুড়ি কানী।।'

চাঁদসদাগরের আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য মনসার নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম সমগ্র মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে মানবিক ধর্মের মহত্তম প্রকাশ। কাহিনীর শেষতম অংশে চাঁদ বেহুলার অনুরোধে দেবী মনসার পায়ে ফুল-জল দিয়েছিলেন, কিন্তু মনসার প্রতি ভক্তিতে নয়, কন্যা-তুল্যা বেহুলার প্রতি বাৎসল্যবশতঃই – এখানেও কিন্তু দেবতার নিকট পরাজয়-স্বীকারের মধ্যেও মানবিক স্নেহের প্রবণতাই লক্ষ্য করা যায়।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে'র দেবী চণ্ডীও অনার্য সমাজ থেকে আগতা। তৎসত্ত্বেও তিনি প্রথমে অনার্য ব্যাধ সন্তান ব্যাধ কালকেতুকে আশ্রয় করেই প্রতিষ্ঠা লাভ এবং স্বীয় মাহাত্ম্য-প্রচারে সচেষ্ট। এই কাহিনীতে দেবী চণ্ডীর কোন চণ্ডরূপের প্রকাশ নেই। তিনি স্বেচ্ছায় ব্যাধসন্তানকে কৃপা করেন এবং অকারণেই বারবার মানুষের উপর করুণা প্রদর্শন করেন। মাতৃস্বরূপা দেবীর এই আচরণে মহৎ মানবধর্মেরই প্রকাশ। একটি বারই শুধু কলিঙ্গবাসীদের পরিণাম-রমণীয়তার কথা ভেবেই তাদের উপর সাময়িক উপদ্রব চাপিয়েছিলেন। এটিও মানবিক ধর্মই। তাছাড়া কালকেতু-ফুল্লরার সমগ্র জীবনকাহিনীতে কোথাও ধর্ম বা দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের তেমন কোন উগ্রতা কিংবা উল্লেখযোগ্য প্রকাশও লক্ষ্য করা যায়নি। কাহিনীটিকে একান্তভাবে মানবিকতা-নির্ভর মানব-মানবীর চিরন্তন সুখ-দুঃখের বাস্তব কাহিনীর প্রতিরূপ বলে অভিহিত করলেও কোন দোষ হয় না। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে আর একটি কাহিনী রয়েছে ধনপতি সদাগরের কাহিনী। এখানে দেবী চণ্ডী নারীজাতি এবং বণিক জাতির পূজাগ্রহণে এবং তাদেরই মাধ্যমে মাহাত্ম্য প্রচারে আগ্রহী। দেবী এখানেও মূলতঃ কল্যাণময়ী, দয়া তাঁর অযাচিত। শিবভক্ত ধনপতি দেবীর ঘটে লাথি মেরে তাকে অপমান করবার ফলে দেবীর রোষে তাকে কিঞ্চিৎ দণ্ডভোগ করতে হয়েছিল। এটুকু শাস্তি কোন মানুষকে অপমান করলেও প্রাপ্য হতো। এটি মূলতঃ একটি পারিবারিক কাহিনী এবং সামগ্রিকভাবেই দুটি খণ্ডে মিলিয়ে দেবী চণ্ডীর ভূমিকা একান্তই গৌণ, মানব-কাহিনী ও মানবাভিমুখিতাই মুখ্য।

'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের কাহিনীটি অতি বিস্তৃত এবং সেখানে ধর্ম ঠাকুরের অনার্য রূপটি পুরো চাপা পড়েনি এবং তাঁর মাহাত্ম্যের প্রসঙ্গ বার বারই এসেছে, কিন্তু গ্রন্থে নায়কের পদের দাবিদার মানবসন্তান লাউসেন এবং তার মাহাত্ম্যকে বহুগুণিত করবার উদ্দেশ্যেই তাকেও অলৌকিক শক্তির অধিকারী করা হ'য়েছে। অপরাপর 'গৌণমঙ্গলকাব্য' – 'শীতলামঙ্গল', 'ষষ্ঠীমঙ্গল', 'রায়মঙ্গল' প্রভৃতি যেখানে দেব-দেবীরা অনার্য সমাজ থেকে আগত, সর্বত্রই শেষ পর্যন্ত দেব বা ধর্মমাহাত্ম্য উপলক্ষ্য হ'য়ে পড়েছে। মানব-ভূমিকাই সব স্থলে প্রাধান্য লাভ করেছে।

পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য 'শিবায়নে'র গঠন একটু পৃথগ্‌জাতীয়। এখানে পৌরাণিক দেবতা শির তাঁর মাহাত্ম্য-প্রচারের উদ্দেশ্যে কোন মানব-মানবীর সহায়তা গ্রহণ করেন নি, পক্ষান্তরে শিব নিজেই মানব-সন্তানরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন এবং সামগ্রিকরূপে একেবারেই নির্ভেজাল নিম্নবর্ণের কৃষক জীবন যাপন করেন। স্বয়ং পার্বতী বাগ্দিনী-রূপে অবতীর্ণ হন। শিব আবার শাঁখারির বেশও ধারণ করেছিলেন। তিনি প্রণয়-সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন কোচ-নারী ও বাগ্দিনীর সঙ্গেই। বস্তুতঃ এই মঙ্গলকাব্যটিতে শিবের কোন দৈব

বা ধর্ম-মাহাত্ম্য প্রচারের বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টারও পরিচয় নেই, এটি একান্তভাবেই নিম্নবিত্ত বাঙালীর জীবনধর্মী আলেখ্য। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত যথার্থই মন্তব্য করেছেন : "এ দেবাদিদেব মহেশ্বর এবং জগন্মাতা পার্বতীর কৈলাস জীবন নয়, এ অতীত বাঙলার কোন শিবদাস ভট্টাচার্য এবং তস্য ভার্যা পার্বতী ঠাকুরাণীর জীবন কাহিনী।"

মধ্যযুগে চরিত সাহিত্য বল্‌তে প্রধানতঃ 'চৈতন্য-জীবনী' এবং স্বল্পপরিমাণ 'অদ্বৈত-জীবনী' এবং তদীয় পত্নী 'সীতা-জীবনী'ই একমাত্র উপজীব্য। নরদেহধারী এই তিন ব্যক্তির জীবন-কাহিনীতে অবশ্যই মানব-ভূমিকাই বর্তমান, যদিচ ধর্ম-প্রচারের বিষয়টিও অনুল্লেখ্য নয়। কখনো কখনো চৈতন্য-জীবনে কিছু কিছু অলৌকিকতা আরোপ করা হলেও তাঁর ব্যক্তি-চরিত্রটি চাপা পড়েনি। এটা শুধু প্রচার-ধর্মীয় নয়, ধর্ম-প্রচারও এর মূল, তবু মানব-ভূমিকাই লক্ষ্য।

পদাবলী সাহিত্য

পদাবলী সাহিত্য বল্‌তে প্রধানতঃ বৈষ্ণব-পদ-সাহিত্য এবং সেই ধারা প্রায় লুপ্ত হবার পর তারই অনুসরণে রচিত শাক্ত পদাবলীকেই বোঝায়। মূলে হয়তো কোন লৌকিক আকর্ষণেই রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলাকে অবলম্বন করে পঞ্চরসাত্মক পদ রচনা শুরু হয়েছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর তাঁরই প্রভাবে এই বৈষ্ণব পদে আধ্যাত্মিকতা আরোপিত হয় —পণ্ডিতগণ এরূপ অনুমান করেন। ফলতঃ এই 'বৈষ্ণবপদ'গুলি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিকট ধর্মীয় সঙ্গীতের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ ভক্ত বৈষ্ণব কবিরা ধর্মের অঙ্গরূপেই রাধা-কৃষ্ণের লীলা-বর্ণনা করে ধর্মীয় কৃত্য সাধন করতেন, কিন্তু এর বাইরেও রয়েছে কিছু সত্য। সাধারণ পাঠক পদগুলিকে মানবিক প্রেমের ঐকান্তিক প্রকাশ বলেই মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন :

'সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি।'

এর অন্তর্নিহিত উত্তরটি হলো : বৈষ্ণব কবিগণ ব্যক্তিজীবনের প্রেম-অনুভূতিই রাধা-কৃষ্ণের বেনামিতে প্রচার করেছেন। এই কারণেই, বাইরের বিচারে বৈষ্ণব পদাবলী একটা সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর ধর্মীয় সাহিত্য বলে পরিচিত হলেও এর সার্বজনীন মানবিক অনুভূতিই একে পরিপূর্ণ মহিমা দান করেছে। অতএব এখানেও বস্তুতঃ মানব-ভূমিকাই প্রধান এবং এই কারণেই শতাধিক বাঙালী মুসলমান কবিও রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ে পদ রচনা করেছেন।

শাক্ত পদাবলীর 'আগমনী-বিজয়া' পর্যায়ের গানগুলি একান্তভাবেই মানবিক বাৎসল্য রসে ভরপূর। এখানে দেবতা কিংবা ধর্মের কোন স্থান নেই, অবশ্য অল্প কয়েকটি পদে উমার ভগবৎ-সত্তার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ কবিতাতেই মানবিক অনুভূতি বৈষ্ণব পদ অপেক্ষাও স্পষ্টতর। 'শাক্ত পদাবলীর অপরাংশে অবশ্য আর কন্যা কিংবা মাতা মেনকার কোন প্রসঙ্গ নেই — এই অংশটি সাধারণভাবে 'শ্যামাসঙ্গীত' নামে পরিচিত এবং ভক্তিভাবে পূর্ণ। প্রথমাংশ 'উমাসঙ্গীত'ই মানব-মহিমায় ভরপূর।

প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের অপর প্রধান শাখা 'লৌকিক সাহিত্য', এর একটি ধারা অনুবাদ সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত, অপরটি মৌলিক সাহিত্য। ধারাটির নাম থেকেই অনুমেয় যে এই

ধারাটি দেব-ধর্ম সম্পর্ক-বর্জিত, মানব-ভূমিকা শুধু প্রধানই নয়, বস্তুতঃ একমাত্র ভূমিকা। অনুবাদ শাখাটি সাধারণতঃ 'কিস্‌সা-সাহিত্য' বা 'মুসলমানী সাহিত্য' নামে পরিচিত। এদের উদ্ভব ঘটে আরাকান তথা রোসাঙ রাজসভায় সম্ভবতঃ খ্রীঃ সপ্তদশ শতকেই। বর্মীবংশোদ্ভূত বৌদ্ধ নৃপতিদের মুসলিম অমাত্যদের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমান কবিরা কিস্‌সা বা কাহিনী-মূলক আরবী-ফার্সী বা হিন্দী-উর্দু গ্রন্থ 'হিন্দুয়ালী' তথা 'বাঙালী' ভাষায় অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন। পরবর্তীকালে বহু শত মুসলমান কবিই (খুব অত্যল্প সংখ্যক হিন্দু কবিরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়) এই ধারা অনুসরণ করে গেছেন, যাদের পরিচয় ইতিহাসেও নেই। গ্রন্থোক্ত কাহিনীতে অবশ্য অলৌকিকত্ব এবং রূপকথার মতো কল্পকথার পরিচয়ও রয়েছে। কাহিনীগুলির সূত্র বৈদেশিক — সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় কোথাও থাক্‌লেও দেব-ধর্ম সম্পর্ক-বর্জিত। সাধারণভাবে মানব-ভূমিকাই এতে একমাত্র উপাদান।

লৌকিক সাহিত্য

লৌকিক সাহিত্যের যে ধারাটি মৌলিক, সেখানে আশ্চর্যজনকভাবে আধুনিকতার সুরটি বর্তমান। এর লেখকগোষ্ঠীতে হিন্দু এবং মুসলমান দুই-ই রয়েছেন এবং কাহিনীর বিষয়ও সম্প্রদায় নির্বিশেষেই আহরণ করা হয়েছে। এমন কি, কাহিনীর নায়ক-নায়িকা দুজন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত, যা একালের উপন্যাসেও দুর্লভ। এরূপ ধর্ম-নিরপেক্ষ এবং সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক মনোভাব যে কাহিনীর বিষয়বস্তু, সেখানে ধর্ম এবং দেবতার প্রসঙ্গই অবান্তর। একান্তভাবেই মানবিক মহিমায় প্রদীপ্ত এই লৌকিক সাহিত্যধারাটি প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের একান্ত গৌরবের বস্তু-রূপেই বিবেচ্য। এইগুলি 'গাথাকাব্য' বা 'পল্লীগীতিকা'।

মধ্যযুগেই লোকসঙ্গীতের উদ্ভব হো'লেও তাদের প্রসার এ কাল পর্যন্ত চলছে। কবি, যাত্রা, পাঁচালী, টপ্পা, আখড়াই প্রভৃতি লোকসঙ্গীত 'পর্যায়ভুক্ত হো'লেও নাগরিক সভ্যতা-আশ্রিত বলেই এখানে ধর্মভাব কমই। তবু কোন কোন রচনায় ধর্মীয়তা যুক্ত হ'য়েছে, নতুবা এগুলিকে একান্তভাবেই মানবিকগুণসম্পন্ন বলেই অভিহিত করা হয়। 'বাউল', 'মুর্শিদা', প্রভৃতি গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত থাকলেও এরা ছিল সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী মানবিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ। এদের ধর্মতত্ত্বেও কোন ভেদ-বুদ্ধি নেই, দেহ-সাধনাই এদের সহজ-ধর্ম বিবেচিত হয়।

অধ্যায় ঃ আট

যুগসন্ধিকাল

[এক] তুর্কী-আক্রমণ ও তার ফলাফল

১২০০ খ্রীঃ কিংবা তৎ-সন্নিহিত কোন কালে বাঙলাদেশে সর্বপ্রথম তুর্কী-আক্রমণ ঘটে। মাত্র সপ্তদশ কিংবা অষ্টাদশ তুর্কী অশ্বারোহী বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেনকে পরাজিত করে বাঙলাদেশ অধিকার করেছিল, এই উপকথা এখন বিশ্বাসের অযোগ্য বলে মেনে নিলেও তুর্কী-আক্রমণ যে সমসময়েই সমগ্র বাঙলাদেশে একটা প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তা অস্বীকাব করবার উপায় নেই। ভারতের বুকে পারসিক, গ্রীক, শক, হুন-আদি, বিদেশি বিধর্মী শক্তি বার বার আঘাত হেনেছে। কিন্তু তা কখনও প্রত্যক্ষভাবে বাঙলাদেশকে আহত করতে পারেনি। ফলে ভারতবর্ষে বার বার বহু শক্তির উত্থান পতন ঘটলেও এবং রাজশক্তির পরিবর্তন ঘটলেও সাধারণ বাঙালীর সামাজিকজীবনে তার কোন প্রতিফলন ঘটেনি। তুর্কী-আক্রমণই সর্বপ্রথম বাঙলাদেশকে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করেছিল। এই আঘাত ছিল একান্তভাবেই আকস্মিক, এই আঘাতের জন্য কারও কোন মানসিক প্রস্তুতিও ছিল না, প্রত্যাঘাত করবার চিন্তা তো অকল্পনীয়। আকস্মিকতা ছাড়াও বিপর্যস্ত হবার প্রধান কারণ — বাঙালীর সংহতি শক্তির অভাব।

আক্রমণের আকস্মিকতা

উত্তর ভারতে আর্যভাষী জনগণের আর্বিভাব অবশ্যই অনেক প্রাচীনতর ঘটনা, কিন্তু বাঙলাদেশে তাদের আগমন ঘটেছে সম্ভবত সর্বপ্রথম মৌর্যযুগে এবং পরে ব্যাপক হারে গুপ্তযুগে। আর্যদের আগমনের পূর্বে বাঙলাদেশে বাস করত বিভিন্ন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কয়েক প্রকার প্রাগার্য জাতি। এদের মধ্যে কোল-ভীল-সাঁওতাল প্রভৃতি অষ্ট্রীক বা নিষাদ জাতির নরগোষ্ঠী, দ্রাবিড় নরগোষ্ঠী এবং কিছু কিছু কিরাত বা মঙ্গোল জাতীয় লোকও বর্তমান ছিল। এদের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার প্রত্যেকটিই ছিল পরস্পর থেকে ভিন্ন। আবার কালক্রমে বাঙলাদেশে যে আর্য সভ্যতা দৃঢ়মূল হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার সঙ্গেও ওদের ব্যবধান ছিল দুস্তর। বস্তুত সমসাময়িক বাঙলাদেশে আর্য ও অনার্য তথা প্রাগার্য সভ্যতার দু'টি ধারা চলেছিল পাশাপাশি। মনে হয়, এদের মধ্যে রেষারেষিব ভাবটাই ছিল প্রবল, উভয়ের উপর পারস্পরিক প্রভাব-সত্ত্বেও উভয়ে মিলে কোন একটি বিশিষ্ট সংহত শক্তিতে রূপায়িত হয়ে উঠেনি। বরং অনার্য সভ্যতা থেকে আর্য সভ্যতাকে পৃথক

সমকালীন বাঙলার সমাজ-জীবন

এবং বিচ্ছিন্ন করে রাখবার প্রচেষ্টার আর অন্ত ছিল না। বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের বেড়াজালে পড়ে আর্যসমাজ ক্রমশই সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল। যে প্রবল সঙ্ঘশক্তি বহিরাঘাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারত, তার সম্যক অনুপস্থিতির ফলে বাঙলাদেশে তুর্কী-আক্রমণ অপ্রতিহত হয়েছিল।

বিদেশি শক্তির প্রথম আঘাতে বাঙালী বিমূঢ় হয়ে পড়ল। যখন সেই আঘাতকে প্রতিহত করতে পারল না, তখন একান্ত স্বাভাবিক কারণেই বাঙালী কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করে আত্মরক্ষায় প্রয়াসী হলো, তার দৃষ্টি হোল অন্তর্মুখী। রাজশক্তি প্রতিকূল, আত্মশক্তিতেও ভরসা নেই, — এই অবস্থায় দৈবের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর গতি কি।

অনার্য জাতি দীর্ঘকাল আর্যদের পাশাপাশি বাস করছিল এবং তৎসত্ত্বেও যেখানে উভয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য-বিধানের স্পৃহা দেখা যায় নি, বাইরের এই প্রবল আঘাত তাদের নিকট শাপে বর হয়ে দেখা দিল। দীর্ঘকাল প্রতিবেশিত্বের ফলে তাদের মিলন না ঘটলেও একটা সমান অনুভূতির ভাব নিশ্চয়ই গড়ে উঠেছিল, এবার উভয়ের সম্মুখে একই শত্রু-বিদেশি-বিধর্মী অপরিচিত একটা জাতি, অতএব আর্য-অনার্য জাতির মিল ত্বরান্বিত হয়ে উঠবার সুযোগ পেল। সঙ্ঘ-শক্তির উপযোগিতাও নিশ্চয় অনুভূত হয়েছিল। কালের প্রভাবে স্বাভাবিকভাবেই হয়তো কখনো এই মিলন ঘটত, কিন্তু আত্মরক্ষার তাগিদে তাদের অকালেই মোহমুক্তি ঘটল—আর্য-অনার্য জাতির সংমিশ্রণে বিরাট হিন্দুজাতির অভ্যুদয় ঘটল। তুর্কী-আক্রমণে বাঙালীর জাড্য নাশ করেছিল, ক্রমে তার সুপ্তি ভাঙিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলল। বাঙলাদেশে তুর্কী আক্রমণের এই পরোক্ষ সুফলটিকে অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই।

অন্তর্মুখিতা ও মোহমুক্তি

তুর্কী আক্রমণের প্রথম পর্বে আক্রমণকারী শক্তি মহোৎসাহে মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ এবং কাফেরকে পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করবার প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছিল এ ঘটনা ঐতিহাসিক সত্য। অতএব বাঙলার অধিবাসীরা অতি সন্তর্পণে আপনাদের সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট ছিল। কিন্তু শাসকরাও সুখশয্যার অধিকারী ছিলেন না। প্রথম তুর্কী শাসকদের অনেকেই ঘাতকের হস্তে নিহত হলেন। ক্রমে একটা সময়ে বাঙলাদেশের শাসনব্যবস্থা এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়ালো যে, তাকে দুঃশাসন বললেও যথেষ্ট বলা হয় না। ন্যূনাধিক দেড়শত বৎসর কাল বাঙলার বুকে দুঃশাসনের বিভীষিকা—সর্বত্র অরাজকতা, সন্ত্রাস, অশান্তি। গণজীবনে তখন ভাঙাগড়ার খেলা চলছে। আঘাতে আঘাতে বাঙলা বাঁচবার শক্তি অর্জন করছিল। বাইরের আঘাত প্রবলতর হয়ে উঠলে বাঁচবার প্রচেষ্টাও প্রবলতর হলো। আবার, এই অবসরে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণে নূতন জাতির সৃষ্টি হলো তাও জেগে উঠে অনুকূল ক্ষেত্রের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। মনে হয়, এই কালটা ছিল বাঙালীর 'মানস-প্রস্তুতির কাল'।

[দুই] অবক্ষয় যুগ তথা মানস-প্রস্তুতির কাল

তুর্কী-আক্রমণ যুগের দেড়কে দুইশত বর্ষকালকে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে সাধারণভাবে 'যুগসন্ধিকাল' বা 'অন্ধকার যুগ' নামে অভিহিত করা হয়। প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের শুধু মূল্যবোধেরই নয়, প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস, রীতিনীতি, ঐতিহ্য প্রভৃতি সবকিছু — মূলতঃ যা কিছু সব একটা জাতির জীবনে আশ্রয়-রূপে বর্তমান থাকে, তাতেও ক্ষয় দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তারপরই মধ্যযুগে যে নোতুনভাবে সাহিত্য-মাধ্যমে নোতুন জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া গেল, তা কি কোন আকস্মিক ঘটনা, কিংবা ভুই-ফোঁড় সৃষ্টি? তা নয়, — বস্তুত ঐ অন্তর্বর্তী অবক্ষয় যুগটাই ছিল বাঙালীর মানস-প্রস্তুতির কাল—সময়-সীমার মধ্যে বাঙালী জাতি দেবতা-ধর্ম, আচার-বিচার, ভাবনা-কামনা সমস্ত কিছুকে একটা সমন্বিত নোতুন রূপ দেবার প্রয়োজনে ব্রতী হতে বাধ্য হ'য়েছিল, আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সমীকরণ করে নিয়ে পরবর্তী আত্মপ্রকাশে উন্মুখ হয়ে উঠছিল। এই পর্বটিকে তাই বলা চলে বাঙালীর মানস-প্রস্তুতির কাল।

তুর্কী আক্রমণ কালে বাঙলার বুকে যে অত্যাচার অনাচারের সূত্রপাত ঘটেছিল, বাঙলার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে দেড় শতাব্দীকালে চলছিল তারই আবর্তন। কখনো পাঠান, কখনো দিল্লীর ফরমান বাঙলার ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে।

অবশেষে এক সময় দুর্দিনের মেঘ অপসৃত হলো। চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় শামস্‌উদ্দিন ইলিয়াস শাহ দিল্লীর শাসন-শৃঙ্খল থেকে বাঙলাকে মুক্ত করে এক স্বাধীন রাজ্য সৃষ্টি করে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। বাঙলাদেশের মধ্যযুগের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম দেশবাসীর ভাবনা-কল্পনাকে শাসনকর্তা আপনার বলে গ্রহণ করলেন। ইলিয়াস শাহ-সম্বন্ধে ঐতিহাসিক অভিমত এই যে, তিনি 'represented Bengal's hopes and aspirations and had almost become a national institution.' দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই, যে জাতি জাগরণের উপযুক্ত অবসরের জন্য প্রতীক্ষা করছিল, তা উচ্চকণ্ঠে আত্মপ্রতিষ্ঠা ঘোষণা করল—বাঙলাদেশে আবার নোতুন করে সাহিত্য সাধনা শুরু হলো।

বাঙলাদেশে সুদীর্ঘকাল ইলিয়াস শাহী রাজত্ব চলছিল। মাঝখানে একজন মাত্র হিন্দু (রাজা গণেশ) এবং তাঁর মুসলমান বংশধরগণ কিছুদিন রাজত্ব করেছিলেন। বস্তুত এই সুদীর্ঘকাল যে রাজশক্তি অখণ্ড প্রতাপে বাঙলাদেশে আপনার বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন রেখেছিলেন, তাঁরা বিধর্মী, বিজাতি এবং সম্ভবত ভিন্নভাষীও বটে। তবে সম্ভবতঃ ধীরে ধীরে দেশীয় ভাষায়ও অধিকার অর্জন করেছিলেন। কারণ সানন্দে লক্ষ্য করা যায় যে, এঁদের প্রায় সকলেই বাঙলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন। সমসাময়িক বাঙালীকবিদের অনেকে সশ্রদ্ধভাবে এই সকল মুসলমান নরপতির নামও উচ্চারণ করেছেন। মনে হয়, যদি দুর্ভাগ্যক্রমে (?) বাঙলাদেশে আকস্মিকভাবে তুর্কী-আক্রমণ না ঘটত, তবে হয়তো বাঙলা সাহিত্যের এতখানি প্রসার সম্ভবপর হতো না, বাঙলা সাহিত্যে নবজাগরণ অনেকটা

বিলম্বিত হতো। ব্রাহ্মণ্যব্যবস্থাধীন আর্য-সমাজে দেশি ভাষা যে শুধুই অপাংক্তেয় ছিল, তা নয়, দেশি ভাষায় সাহিত্যচর্চাও ছিল নিষিদ্ধ।

'অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।'

মাতৃভাষায় শাস্ত্র শ্রবণ করলেও রৌরব নরক-প্রাপ্তি অনিবার্য — এটি ছিল শাস্ত্রের নির্দেশ। বিদেশি বিধর্মী রাজশক্তি অবশ্যই এই শাস্ত্রীয় নির্দেশের আওতায় আসে না। অতএব তাঁরা বাঙলাদেশে বসবাস করে বাঙালী বনে গিয়ে বাঙলা ভাষারই যদি পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন, তবে কারও কিছু বলবার ছিল না। বস্তুত এইরূপই ঘটেছিল। বাঙলা ভাষা রাজ-শক্তির আনুকূল্য লাভ করে স্বচ্ছন্দগতিতে প্রবাহিত হতে লাগল। ইলিয়াশ-শাহী শাসনারম্ভ কাল থেকেই বাঙলার নবজাগৃতি ঘটল এবং যুগান্তর কালেরও অন্ত ঘটল।

পূর্বে যে আর্য-অনার্য-সংস্কৃতি সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে, এবার তার ফল ফললো। অনার্য জাতির যে নিজস্ব ধর্ম-সংস্কৃতি ছিল, আর্য সংস্কৃতির সংঘর্ষে কিংবা সংমিশ্রণে তা একেবারে বিপর্যস্ত হয়নি। বস্তুত অনার্যরা তাদের ধ্যান-ধারণা ও দেবতা-ধর্ম-শুদ্ধই আর্যসমাজে গৃহীত হয়েছিল। আর্যরা মহতী বিনষ্টির মুখে পড়ে যখন কোন দৈবশক্তির অনুগ্রহ কামনা করছিল, তখনই আর্য-অনার্য মিশ্রণের ফলে আর্যসমাজে ঐ সকল নোতুন দেবতার আবির্ভাব ঘটছিল। ঐ সমস্ত দেবতা বা দেবী অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, এই ভরসায় নবগঠিত হিন্দু জাতি এদের মধ্যেই আশ্রয় এবং সান্ত্বনা লাভের জন্য সচেষ্ট হলেন। কারণ হিন্দু সমাজের প্রাক্তন দেবতারা যে আপৎ-কালে তাদের উদ্ধারে এগিয়ে আসেন নি, তা তো সদ্যঃ-সদ্যঃই প্রমাণিত হয়েছে। অতএব সমাজে নবপ্রবিষ্ট দেবতাদের জাতে তুলবার দায়িত্বও গ্রহণ করলেন সমাজের উচ্চস্তরে আসীন শিক্ষিত ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যগণ। সদ্য-উন্নীত দেবতাদের প্রশস্তিবন্দনার উদ্দেশ্যে তাঁরা রচনা করলেন এক নোতুন কাব্যধারা 'মঙ্গলকাব্য'। সংস্কৃত কাব্য-প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেছে, ইতিমধ্যে মাতৃভাষাই মনোভাব-প্রকাশের তথা সাহিত্য-রচনার আশ্রয়ভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে, অতএব বাঙলা-ভাষাতেই পুরাণ জাতীয় এই নোতুন কাব্যধারা সৃষ্টি করতে হ'লো। পরবর্তীকালে এই মঙ্গলকাব্য শাখাই মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের একটা বিরাট বিস্তৃত অংশ অধিকার করেছিল।

পূর্বেই বলা হয়েছে তুর্কী আক্রমণ থেকে দেড়শ বছর পর্যন্ত বাঙলাদেশে যে অরাজকতা ও অশান্তি চলছিল, তা সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল ছিল না। এই কালে বাঙলাদেশে বাঙলা ভাষায় যে কোন সাহিত্য রচিত হয়েছিল, এখন পর্যন্ত তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তবে বাঙালীর যে মানস-প্রস্তুতি চলছিল, তা অনুমান করা চলে।

সদ্য-কথিত এই মঙ্গলকাব্য শাখার কয়েকজন কবির নাম পরবর্তী কবিগণ সশ্রদ্ধভাবে উচ্চারণ করেছেন। 'মনসামঙ্গল কাব্য'-রচয়িতা কানা হরিদত্ত, 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য'-রচয়িতা মানিক দত্ত এবং 'ধর্মমঙ্গল কাব্য'-রচয়িতা ময়ূরভট্টের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এঁদের রচনার বিশেষ কোন প্রামাণ্য পরিচয় পাওয়া যায় নি, যা-ও পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে

কবিদের সম্বন্ধে কিছু জানবার উপায় নেই। নানা কারণেই অনুমান করা হয় যে, পূর্বোক্ত কবিগণই স্ব স্ব কাব্যের আদি রচয়িতা। আরও অনুমান করা হয় যে, এই সকল কবি সম্ভবত এই যুগসন্ধিকালেই বর্তমান থেকে পাঁচালীর আকারে মঙ্গলকাব্যের বীজ কাহিনী রচনা করেন, পরবর্তীকালে এই বীজরূপই প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হয়েছিল। এই কারণেই যুগান্তর কালকে বাঙালীব 'মানস-প্রস্তুতির কাল' বলে অভিহিত করলেও অন্যায় হয় না।

[তিন] তুর্কী-আক্রমণোত্তর কালের সামাজিক অবস্থা

তুর্কী আক্রমণের পূর্বে বাঙলাকে কখনো প্রত্যক্ষভাবে বিদেশি আক্রমণের মুখে পড়তে হয় নি। তুর্কী-আক্রমণকালে বাঙলা ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্মের পবিপোষ্টা সেন বংশীয় লক্ষ্মণসেনের অধীন। সেনবংশের পূর্বে দীর্ঘকাল ধবে বাঙলার বুকে সমাজব্যবস্থা যেভাবে গড়ে উঠেছিল, ফার্সীভাষী ইসলামধর্মী তুর্কীদেব এবং পরে পাঠানদেব রাজত্বকালে সেই সমাজব্যবস্থা যে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, এ সত্য স্বীকার করে নিতে অসুবিধে নেই।

তুর্কী-আক্রমণের পূর্ববর্তী অবস্থা

তুর্কী আক্রমণের পূর্বেই পাল রাজবংশের কালে বাঙালী জাতি-গঠনেব কাজটি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল এবং তাব পর পাল ও সেনবংশের রাজত্বকালে বৌদ্ধ-হিন্দুসমাজ-বন্ধনও স্থিতিলাভ কবেছিল। একদিকে রাজানুকূল্য ও উচ্চবিত্ত ভূম্যধিকারীদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং অপরদিকে বৌদ্ধ বিহার ও সঙাবাম, হিন্দুদের মঠ ও মন্দিরগুলিকে আশ্রয় কবে বাঙালীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে উঠেছিল। তুর্কী-আক্রমণে সাধাবণভাবে গ্রাম্য জীবন উৎপীড়িত হয নি। কিন্তু সদ্য আগন্তুক বাজশক্তির প্রত্যক্ষ সহাযতায অত্যুৎসাহী অনেকেই মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুকে এবং ধনলোভে উচ্চবিত্তদের উপব চড়াও হয়ে, তাদেব ধর্মান্তরীকরণে ও অর্থাপহবণে যে তৎপব হয়ে উঠেছিল, তার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য- প্রমাণ রয়েছে। এই সময় তাদের বিশেষ দৃষ্টি পড়েছিল বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মস্থান — বিহাব ও মঠ-মন্দিবগুলির উপব। কিঞ্চিৎ উত্তরকালেই মৈথিল কবি বিদ্যাপতি তাঁর 'কীর্তিলতা'য় লিখেছেন যে, ওরা দেউল ভেঙে মসজিদ বানায়। ফলতঃ তুর্কী-আক্রমণের ফলে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি-কেন্দ্র, সাহিত্য আলোচনার পাদপীঠসমূহ বিধ্বস্ত হয়েছিল। অধিকন্তু সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক বাজন্য ও ভূস্বামীদের উপর অত্যাচারের ফলে কবি-সাহিত্যিকরাও তাঁদের আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হলেন। — এ সমস্ত কারণেই তুর্কী-আক্রমণ যুগটি বাঙালী জীবনে তমসাচ্ছন্ন যুগেই পরিণত হয়েছিল।

গুপ্ত সাম্রাজ্যকালেই বাঙলায় আর্যপ্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণতা লাভ কবে। এর পূর্বে বাঙলার অধিবাসীদের একটা বিরাট অংশ ছিল- অনার্য জনগোষ্ঠী। এ ছাড়াও ছিল পূর্বাগত

আর্যগোষ্ঠীর বংশধরগণ — যারা নবাগত আর্যদের নিকট ব্রাত্য-রূপেই পরিচিত ছিল। ডঃ সুকুমাব সেন লিখেছেন, "নবীন স্তরের ব্রাহ্মণেরা ও তাঁহাদের শিষ্য-ভৃত্যেরা ছিলেন সংস্কৃতাশ্রয়ী এবং প্রাচীন ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণেরা ছিলেন প্রাকৃতাশ্রয়ী এবং কোন একটি নির্দিষ্ট ধর্মমতে নিষ্ঠাহীন। অনেকেই জৈন, বৌদ্ধ অথবা যোগপন্থী ছিলেন। মনোধর্মের দিক দিয়া নবীনেরা ছিলেন চিন্তাশীল শাস্ত্রাদর্শবাদী যজ্ঞপরায়ণ তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ও সংযমনিষ্ঠ, আর প্রবীণেরা ছিলেন দৈববাদী ব্রতপরায়ণ কর্মস্পৃহালু ভাববিলাসী সঙ্গীত-সাহিত্য-রসলিপ্সু ও অধ্যাত্মনিষ্ঠ।" পাল এবং সেন বংশের রাজত্বকালে অর্থাৎ প্রাক্‌-তুর্কী-আক্রমণ যুগে উচ্চবর্ণের এই ছিল সামাজিক পটভূমি। সমাজ-শাস্ত্রীগণ নিম্নশ্রেণীর জনগোষ্ঠীকে সৎশূদ্র-অসৎশূদ্র, উত্তমসঙ্কর, মধ্যমসঙ্কর ও অধমসঙ্কর প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ শ্রেণীতে বিভক্ত করে শ্রেণী-বিদ্বেষের ভাবটি চিরস্থায়ী করে রেখেছিলেন। সেন রাজত্বকালে বৌদ্ধরাও প্রকৃতপক্ষে নিম্নশ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়লো।

বিদেশি বিধর্মী তুর্কীগণ বাঙালী সমাজের এই শ্রেণীবিদ্বেষের পরিপূর্ণ সুযোগ লাভ কবেছিল। তুর্কী-আক্রমণের আকস্মিক আঘাত সমাজে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিযার সৃষ্টি করে। সমাজ-শাসনে উৎপীড়িত নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং বৌদ্ধদের একটা বিরাট অংশ কিছুটা নিপীড়ন এড়িযে যাবার আশায়, কিছুটা শাসক সম্প্রদায়ের অনুগ্রহ লাভেব ভরসায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কবে। অবশ্য বাঙলায় ইসলাম প্রাধান্যের এটিকেই একমাত্র কারণ-রূপে গ্রহণ করলে খুবই

বাঙলায ইসলাম

ভুল করা হবে। মুসলিম শাসনের প্রথমদিকে শাসকদের অত্যাচারেও যে বহু হিন্দুকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হয়েছে, এটি ঐতিহাসিক সত্য। অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "শাসনকর্তৃগণ পরাভূত হিন্দুকে কখনও নির্বিচারে হত্যা করিয়া, কখনও বা বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া এদেশে মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধি করিবার জন্য নানাপ্রকার ছল, বল ও কৌশলের সাহায্য লইতেন। হিন্দুকে হয় স্বধর্মত্যাগ না হয় গ্রামত্যাগ ইহার যে কোন একটি বাছিয়া লইতে হইত। ইখতিয়াব হইতে শুরু করিয়া হুসেন শাহী আমলের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমান শাসকগণ হিন্দুকে ধর্মান্তরিত কবা আবশ্যিক পবিত্র কর্ম বলিয়া মনে করিতেন।"

প্রখ্যাত মৈথিল কবি বিদ্যাপতি চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে বর্তমান ছিলেন। তাঁর 'কীর্তিলতা' নামক গ্রন্থে আমরা তুর্কী শাসনব্যবস্থার প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাই। তিনি লিখেছেন —

'কতহুঁ তুরুক বরকর। বাট জাইতেঁ বেগার ধর।।
ধবি আনএ বাঁভন বড়ুআ। মথাঁ চড়াবএ গাইক চড়ুআ।।
ফোট চাট জনউ তোড়।.. দেউল ভাঁগি মসীদ বাঁধ।।...
হিন্দু বোলি দুরহি নিকার। ছোটেও তুরুকা ভভকী মার।...'

অর্থাৎ—"কত তুরুক পথে যেতে বেগার ধরে। ব্রাহ্মণ-বটুকে ধবে এনে তার মাথায চড়িয়ে দেয় গোরুর রাং। ফোঁটা চাটে, পৈতে ছিঁড়ে ... দেউল ভেঙ্গে মসজিদ বানায়। ... হিন্দুকে বলে, দূব নিকালো — তুরুক ছোট হলেও বড়কে মারতে যায়"।

উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সামাজিক শাসন এবং বিধর্মী মুসলমান শাসকদের অত্যাচার ছাড়াও একটা তৃতীয় কারণের উল্লেখ করা চলে যা প্রাচীন বাঙালী সমাজের ভাঙনে সহায়ক হয়েছিল। মুসলিম পীর-ফকির ও সুফী সাধকগণও কালে কালে সমাজে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাদের উদার নীতির ফলে বহু হিন্দুই যে তাদের আশ্রয় গ্রহণ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাই নয়, স্বধর্মে আস্থিত থেকেও অনেক হিন্দু এদের বন্দনা গান গেয়েছেন।

বাঙলায় তুর্কীদের শাসন চলছিল ন্যূনাধিক আশি বছর। ঐ সময় এবং এর পরও কিছুকাল পর্যন্ত চলছিল অত্যাচারের বন্যা। বস্তুতঃ শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ্-ই (১৩৪২-৫৮ খ্রীঃ) দীর্ঘকাল পর বাঙলায় শাসনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। পরবর্তী পাঠান সুলতানদের অনেকেই হিন্দুবিরোধিতা শুধু বর্জনই করেন নি, বহু হিন্দুকে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ শাসনভারও অর্পণ করেছিলেন। দেশে পরিপূর্ণ শান্তি-শৃঙ্খলা এবং শাসন সৌকর্যের জন্য অবশ্যই অপেক্ষা করতে হয়েছিল আরো কিছুকাল — সুলতান হোসেন শাহের (১৪৯৩ খ্রীঃ-১৫১৯ খ্রীঃ) আবির্ভাবের জন্য।

সমাজব্যবস্থায় মুসলিম ভূমিকা

তুর্কী-আক্রমণের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপই প্রাচীন সমাজব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে নিয়ে নোতুন সমাজ গড়ে উঠলো, যাতে মুসলিম্‌দেরও রয়েছে একটা বিরাট ভূমিকা। চৈতন্যজীবন কাহিনীতে দেখি মুসলমান কাজী চৈতন্যদেবের সঙ্গে একটা আত্মীয় সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। ষোড়শ শতকে রচিত মুকুন্দ চক্রবর্তী কাব্যে নব-প্রতিষ্ঠিত গুজরাট নগরের একটা বৃহৎ অংশ মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন--আর এই মুসলমানদের মধ্যেও বৃত্তি ও শ্রেণী অনুযায়ী বহুপ্রকার বিভাগ দাঁড়িয়ে গেছে। হিন্দু সমাজের পাশাপাশি মুসলিম সমাজের উদ্ভব তুর্কী-আক্রমণেরই প্রত্যক্ষ ফল।

সুদীর্ঘকালের পাঠান শাসন আমলে মাত্র রাজা গণেশই একমাত্র হিন্দু, যিনি কিছুকালের জন্য বাঙলার ভাগ্যবিধাতা হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তবে পরবর্তী কালে বহু হিন্দু অবশ্য উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই হিন্দুরা মুসলিম আদবকায়দা গ্রহণ করলেও মানসিক দিক থেকে স্বাজাত্যবোধ অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। "তাঁহাদের মনের চারিদিকে সুদৃঢ় পৌরাণিক সংস্কৃতির বেষ্টনী তখনও অটুট ছিল, তাহা ভেদ করিয়া ইসলাম ধর্ম বাঙালীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারে নাই।"

আর্থনৈতিক দিক্ থেকে তৎকালীন বাঙালী মোটামুটি সচ্ছল অবস্থায় ছিল বলেই মনে হয়। পরবর্তী মোগল ও ইংরেজ শাসনকালে বাঙলার ঐশ্বর্যের একটা অংশ যেমন বাইরে চলে যেতো, পাঠান আমলে তেমনটি হতো না – দেশের সমৃদ্ধি দেশেই রয়ে গিয়েছিল ; কারণ পাঠান শাসকগণ বাঙলাকেই তাঁদের স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন। চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে প্রখ্যাত পর্যটক ইবন বতুতা বাঙলা ভ্রমণ করে এখানকার যে বিবরণ লিখে রেখে গেছেন, তাতে বাঙালীর দারিদ্র্যের কোন ইঙ্গিত নেই।

তুর্কী-আক্রমণ ও তজ্জনিত অভিঘাতের ফলে বাঙলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে বিপর্যয় আশঙ্কিত ছিল, ভাগ্যক্রমে তেমন কোন বিপর্যয় ঘটে নি। ইসলামের প্রচণ্ড আঘাত সমাজদেহেই সীমাবদ্ধ ছিল, মনোজীবনে তার প্রভাব তেমন কার্যকর হয়নি। তবে অন্য দিক থেকে একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। প্রাক্-ইসলাম

বহিঃপ্রভাব

যুগে বাঙালীব সভ্যতা-সংস্কৃতি ছিল একান্তভাবে গ্রামকেন্দ্রিক। মুসলিম যুগেই বহু নগর-বন্দর পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাতেও নাগরিক সভ্যতার লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগলো। ভিন্নদেশীয় বাজপুরুষ, ব্যবসায়ী, ধর্মযাজক প্রভৃতির সংস্পর্শে আসবার ফলে বাঙালীর চিত্ত দুয়ারও অনেকটা মুক্ত হলো, বাইরেব জগতের সংস্পর্শে বাঙালীর মানস-জগতেও কিছুটা পরিবর্তন দেখা দিল।

সাহিত্য-সংস্কৃতিব চর্চা একালেও প্রধানতঃ ঐতিহ্যাশ্রিত সংস্কৃত ভাষায় নিষ্পন্ন হলেও ধীবে ধীরে বাঙালী মাতৃভাষাব সহায়তাও নিতে আবম্ভ করে এই কালেই। এ বিষয়েও শাস্ত্রের নিষেধ থাকা সত্ত্বেও সেই নিষেধকে অমান্য করবাব শক্তি অনেকেই অর্জন করেছিলেন। এ বিষয়ে খুব সম্ভব বহু কবিই মুসলমান সুলতানদেরও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। অন্ততঃ চৈতন্য পূর্ব যুগেই একাধিক কবির বচনায় এর স্বীকৃতি পাওযা যায়।

তুর্কী-আক্রমণেব একটা প্রধান সুফলেব কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। প্রাক-মুস্‌লিম যুগেব বাঙলায যে প্রাচীন ও নবীন দুটি স্তবের মধ্যে ভেদ বর্তমান ছিল, তুর্কী আক্রমণের আকস্মিক আঘাতে সেই ভেদ লুপ্ত হ'লো—ফলে প্রাচীন সমাজের বহু লৌকিক দেব-দেবী হিন্দু সমাজে গৃহীত হলেন, তাদের বৃক্ষপূজা, প্রস্তব-পূজা সহ বিভিন্ন গ্রাম-দেবতাব পূজা, নানা প্রকাব মেয়েলি ব্রত-আচবণ ইত্যাদিও হিন্দুসমাজ গ্রহণ কবে নিল এবং তাদের মাহাত্ম্য-প্রচাবেব জন্য গড়ে উঠলো এক নোতুন ধারাব সাহিত্য—মঙ্গলকাব্য। আবার এই সব মঙ্গলকাব্যে শিব, কৃষ্ণ, উমা-পার্বতী প্রভৃতি পৌরাণিক দেব-দেবীদেরও একেবারে লৌকিক দেবতাব আকার দিযে অনার্যদের নিকট তাঁদের গ্রহণযোগ্য কবে তোলা হল। তাছাড়া, অনার্য দেব-দেবীদেরও প্রতিষ্ঠার জন্য পৌরাণিক দেব-দেবীদের সঙ্গে বিভিন্ন সম্বন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ কবা হলো। তুর্কী-আক্রমণ এইভাবেই বঙ্গীয় সমাজে ভালো-মন্দ মিশিয়ে যুগান্তব সৃষ্টি করে।

অধ্যায় ঃ নয় আদিমধ্য যুগ

[এক] রাজনৈতিক ইতিহাস

খ্রীষ্টীয় ১৩৫০-১৫০০ বাঙলা সাহিত্যের আদি-মধ্যযুগ। অর্থাৎ এই যুগে একটিই মাত্র পুথি এতাবৎকাল পাওয়া গেছে। স্বল্পায়তন এবং স্বল্পসমৃদ্ধ হলেও প্রকৃতপক্ষে এই কালেই বাঙলা সাহিত্যের বুনিযাদ গড়ে উঠে। এর পূর্ববর্তী কালে রচিত গ্রন্থের সংখ্যা মাত্র একটি এবং এটির সঙ্গে পরবর্তী সাহিত্যধারার প্রত্যক্ষ যোগ অনুমান করা কঠিন। এই কারণেই বলতে হয যে, আদিমধ্য যুগেই প্রকৃতপক্ষে বাঙলা সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

দিল্লীতে পাঠান বংশীয সুলতানগণেব রাজত্বকালে বাঙলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভিন্ন ভিন্ন নায়কের আবির্ভাবে ও তিবোভাবে বাঙলার শাসনব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছিল। দীর্ঘকাল এইভাবে চলবার পব অবশেষে ১৩৫২-৫৩ খ্রীঃ কিংবা কিঞ্চিৎ পূর্বে (১৩৪২ খ্রীঃ) হাজী ইলিয়াস বাঙলাদেশকে দিল্লীর শাসনশৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে শামসউদ্দিন ইলিয়াস্ শাহ্ নাম গ্রহণ-পূর্বক রাজত্ব আবম্ভ কবেন। ইলিয়াস্ শাহ্ (১৩৪২-৫৮ খ্রীঃ) বাঙলার স্বাধীন সুলতানদেব অন্যতম। তাঁব বাজত্বকালে বাঙলায শান্তি-সমৃদ্ধি কতকাংশে ফিবে এলো এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য, স্থাপত্যশিল্প এবং অপরাপব সাংস্কৃতিক কার্যকলাপও ধীবে ধীবে যেন নবযুগের দিকে অগ্রসব হতে লাগল। বস্তুত ইলিয়াস্ শাহেব বাজত্বকাল থেকেই আমবা আদিমধ্য যুগের আবম্ভ বলে গ্রহণ কবতে পাবি।

ইলিযাস শাহের মৃত্যুব পব তৎপুত্র সিকন্দর শাহ্ (১৩৫৮-৯১ খ্রীঃ) বাঙলাব সুলতান হন। তাঁর রাজত্বকালে বাঙলাদেশকে আবার দিল্লীর অধীনে আনবাব চেষ্টা চলেছিল, কিন্তু সুদক্ষ শাসক সিকন্দবেব চেষ্টায বাঙলাব স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রইল। পিতার মত সিকন্দরও ছিলেন শিল্প-সাহিত্য-আদিব পৃষ্ঠপোষক। তাঁর রাজত্বকালেই পাণ্ডুযাব বিখ্যাত আদিনা মস্‌জিদটি প্রতিষ্ঠিত হয। সিকন্দবেব নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রার সৌন্দর্য উল্লেখযোগ্য। সিকন্দরের পুত্র ঘিযাসউদ্দিন আজম (১৩৯১-১৪১০ খ্রীঃ) পিতৃহন্তা হলেও অতি ন্যাযনিষ্ঠ এবং দক্ষ শাসক ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে বাঙলার শান্তি সমৃদ্ধি ছিল অক্ষুণ্ণ। বিখ্যাত কবি হাফেজের সঙ্গে তাঁর পত্র-বিনিময এবং চীনদেশের সঙ্গে দূত-বিনিময় চলত। ১৪১০ খ্রীঃ আজমের মৃত্যুর অব্যবহিত পবে উত্তরবঙ্গে গণেশ (১৪১৪, ১৪১৭-১৮ খ্রীঃ) নামক হিন্দু জমিদার ক্রমে অতি ক্ষমতাশালী হয়ে উঠে ইলিয়াস

বাজনৈতিক পটভূমিকা

শাহের বংশধরদের অপসারিত করে স্বাধীন বাঙলার রাজা হয়ে বসেন। এই সময়েই দনুজমর্দনদেব নামক যে প্রবল প্রতাপান্বিত এক স্বাধীন রাজার সন্ধান পাওয়া যায়, অনেকেই মনে করেন যে তিনি এবং রাজা গণেশ অভিন্ন। অনুমান, এরই পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি কৃত্তিবাস তাঁর অনুপম 'রামায়ণ পাঁচালী' রচনা করেছিলেন। গণেশের পুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জালালউদ্দিন (১৪১৫-১৬, ১৮৩৩ খ্রীঃ) নাম ধারণ করেন। তাঁর পুত্র শামস্‌উদ্দিন আহম্মদ শাহ্‌ (১৪৩৩-৩৬ খ্রীঃ) রাজা হলেন। ইনি অতিশয় অত্যাচারী ছিলেন বলে তাঁর কর্মচারিগণ তাঁকে হত্যা করে পূর্ববর্তী ইলিয়াসশাহী বংশের নাসিরউদ্দিন মামুদ (১৪৩৮-৫৯ খ্রীঃ) বাঙলার সিংহাসনে স্থাপন করেন। নাসিরউদ্দিন মামুদ শান্তিপ্রিয় এবং শিল্প-সাহিত্যাদি সংস্কৃতির একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে বাঙলাদেশে কয়েকটি উৎকৃষ্ট মস্‌জিদ স্থাপিত হয়েছিল। নাসিরউদ্দিন-এর মৃত্যুর পর তৎপুত্র রুকন্‌উদ্দিন বারবক্‌ শাহ্‌ (১৪৫৯-৭৪ খ্রীঃ) এবং তৎপুত্র য়ুসুফ শাহ্‌ (১৪৭৪-৮০ খ্রীঃ) দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিলেন। তাঁরা উভয়েই বাঙলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলে মনে হয়। মালাধব বসু এঁদেরই কোন একজনের নিকট থেকে 'গুণরাজ খান' উপাধি লাভ করেছিলেন।

শেষ ইলিয়াস শাহী সুলতানদের রাজত্বকালেই হাবসী খোজাদের (১৪৮৭-৯৬ খ্রীঃ) আধিপত্য বাড়তে আরম্ভ করেছিল। অবশেষে এদেরই হস্তে ইলিয়াস শাহী বংশের পতন ঘটে এবং কিছুকাল বাঙলাদেশে আবার অরাজকতা চলতে থাকে। এই অরাজকতার জ্বালায় অস্থিব হযে দেশের হিন্দু ও মুসলমান আমীরগণ শেষ হাবসী সুলতানকে (১৪৯১-১৪৯৩ খ্রীঃ) হত্যা কবে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্‌কে সুলতান নির্বাচিত করেন। ইনিই সুলতান হোসেন শাহ্‌ নামে বাঙলার ইতিহাসে অতিশয় সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। হোসেন শাহী আমল বাঙলাদেশের ইতিহাসে সুবর্ণযুগ নামে আখ্যাত হবার দাবি রাখে। বস্তুত হোসেন শাহের রাজত্বকালেই মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য এক নতুন পথের সন্ধান লাভ করে অন্য যুগের সৃষ্টি কবে। আদি মধ্য যুগের সমাপ্তিও এইখানেই।

[দুই] রাজনৈতিক পটভূমি ও সাহিত্য

বাঙলা সাহিত্যের আদিমধ্য যুগে বাঙলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের পটভূমি সম্বন্ধে একটু সচেতন থাকা প্রয়োজন। নিম্নোক্ত পৃষ্ঠপটে তার একটা মোটামুটি বিবরণ দেওয়া হলো, তবে প্রদত্ত সন তারিখ-ব্যাপারে কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিমতের অবকাশ রয়েছে।

(ক) খিলজি আমীর-ওমরাহদের অধীন বাঙলা — ১২০৩-১২২৭ খ্রীঃ

১। ইখতিয়ারউদ্দিন বিন বক্তিয়ার খিলজি (১২০৩-১২০৬ খ্রীঃ)

২। আলাউদ্দিন আলি মর্দান (১২০৬-১২১৩ খ্রীঃ)

৩। গিয়াসউদ্দিন ইয়াজ খিল্‌জি হুসামউদ্দিন (১২১৩-১২২৭ খ্রীঃ)

(খ) দিল্লী সুলতানের অধীনে বাঙলা — ১২২৭-১৩৪১ খ্রীঃ
১। মামলক শাসন — (১২২৭-১২৮৭ খ্রীঃ)
২। বলবন শাসন —(১২৭৮-১৩৪০ খ্রীঃ)

(গ) ইলিয়াস শাহী বংশ — ১৩৪২-১৪১২ খ্রীঃ
১। শামস্উদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ (১৩৪২-১৩৫৮ খ্রীঃ)
২। সিকন্দর শাহ্ (১৩৫৮-১৩৯১ খ্রীঃ)
৩। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ (১৩৯১-১৪১০ খ্রীঃ)
৪। সৈফুদ্দিন হামজা শাহ্ (১৪১০-১৪১২ খ্রীঃ)

(ঘ) বায়াজিদ বংশ — ১৪১২-১৪১৪ খ্রীঃ
১। শিহাবুদ্দিন বায়াজিদ শাহ (১৪১২-১৪১৪ খ্রীঃ)
২। আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ (১) (১৪১৪ খ্রীঃ)

(ঙ) রাজা গণেশের বংশ — ১৪১৪-১৪৩৬ খ্রীঃ
১। গণেশ দনুজমর্দনদেব (১৪১৫, ১৪১৭-১৮ খ্রীঃ)
২। যদু জালালউদ্দিন মুহম্মদ শাহ্ (১৪১৫-১৬, ১৪১৮-৩৩ খ্রীঃ)
৩। মহেন্দ্রদেব (১৪১৮ খ্রীঃ)
৪। শামস্উদ্দিন আহম্মদ শাহ্ (১৪৩৩-১৪৩৬ খ্রীঃ)

(গ) মামুদ শাহী বংশ — ১৪৩৬-১৪৮৭ খ্রীঃ
১। নাসিরুদ্দিন মামুদ শাহ্ (১ম) (১৪৩৬-৫৯ খ্রীঃ)
২। রুকনউদ্দিন বারবক শাহ্ (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রীঃ)
৩। শামস্উদ্দিন য়ুসুফ শাহ্ (১৪৭৪-১৪৮০ খ্রীঃ)
৪। শিকন্দর শাহ্ (১৪৮০-১৪৮১ খ্রীঃ)
৫। জালালউদ্দিন ফতে শাহ্ (হোসেন শাহ্) (১৪৮১-১৪৮৭ খ্রীঃ)

(ছ) সুলতান শাহ্জাদা ও হাবসী সুলতান — ১৪৮৭-১৪৯৩ খ্রীঃ
১। বারবক সুলতান শাহ্জাদা (১৪৮৭ খ্রীঃ)
২। সৈফুদ্দিন ফিরোজ শাহ (হাবসী) (১৪৮৭-১৪৯০ খ্রীঃ)
৩। নাসিরউদ্দিন মামুদ শাহ্ ('') (১৪৯০-১৪৯১ খ্রীঃ)
৪। শামস্উদ্দিন মুজাফ্ফর শাহ্ ('') (১৪৯১-১৪৯৩ খ্রীঃ)

(জ) হোসেন শাহী বংশ —১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রীঃ
১। আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ)
২। নাসিরুদ্দিন নসরৎ শাহ্ (১৫১৯-১৫৩২ খ্রীঃ)
৩। আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ্ (২) (১৫৩২-১৫৩৩ খ্রীঃ)
৪। গিয়াসউদ্দিন মাহ্মুদ শাহ্ (১৫৩৩-১৫৩৮ খ্রীঃ)

সাহিত্যের উপর দেশকালের প্রভাব অপরিসীম। দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি কিভাবে দেশের সাহিত্যকে প্রভাবিত করে থাকে, পূর্বোক্ত ইতিহাস থেকে তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে। দেশে যখনই কোন অরাজকতা বা অশান্তি দেখা দিয়েছে, তখনই শিল্প-সাহিত্যের গতি হয়েছে স্তব্ধ। আবার গোলযোগ মিটে গেলেই নতুনভাবে সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা জেগেছে। বিশেষভাবে রাজশক্তির আনুকূল্য যে সাহিত্যসৃষ্টিতে যথেষ্ট পরিমাণ সহায়তা করেছে, তার ভূয়ো নিদর্শন বর্তমান।

সাহিত্যসৃষ্টিতে পরিবেশ

আদি-মধ্যযুগে রচিত সাহিত্যের পরিমাণ কম হলেও ঐ কালের কবিদের প্রত্যেকেই আপন আপন ক্ষেত্রে একজন দিক্‌পাল ছিলেন। এদের মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস, 'রামায়ণ পাঁচালী'র কবি কৃত্তিবাস এবং 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-রচয়িতা মালাধর বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তীকালে (সেন রাজত্ব-কালে) সংস্কৃত ভাষায় জয়দেব গোস্বামী রচিত 'গীতগোবিন্দ' নাট্যগীতি অবলম্বনেই বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর কাব্যটি রচনা করেন। আর সম্ভবতঃ কোন আদর্শ পুরুষের চিত্র নবজাগ্রত জাতির চোখের সামনে তুলে ধরবার প্রয়োজনেই প্রকৃত জাতীয় বীরের অভাবে পুরাণ-মহাকাব্যের জগৎ থেকে মালাধর বসু এবং কৃত্তিবাস তাঁদের কাব্যদ্বয় রচনা করেছিলেন। মাতৃভাষায় বস্তুতঃ কোন সাহিত্যের আদর্শ সামনে না থাকাতেই সম্ভবতঃ প্রথম প্রচেষ্টারূপে কবিত্রয় অনুসরণ ও অনুবাদের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর গ্রন্থে কোন রাজশক্তির কথা কিংবা অপর কোন কাল-জ্ঞাপক লক্ষণের উল্লেখ না করায় তাঁর কাল সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধভাবে কোন কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না। কৃত্তিবাস তাঁর কাব্যে যে গৌড়েশ্বরের কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি রাজা গণেশ বলেই অনুমিত হয়। আর মালাধর বসু যে পৃষ্ঠপোষক রাজার কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি সম্ভবত ইলিয়াস-বংশীয় রুকনুদ্দিন বারবক শাহ্ কিংবা তৎপুত্র য়ুসুফ শাহ্ হতে পারেন। মহামতি হোসেন শাহ সম্বন্ধে অনেকেই সপ্রশংস উক্তি করে গেছেন। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে সুলতান হোসেন শাহ্ এত প্রশংসার যোগ্য ছিলেন না — তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের পরিমাণও যথেষ্ট। তাঁর রাজত্বকালে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা—মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। বলা বাহুল্য, হোসেন শাহ্ যদি পরধর্মসহিষ্ণু, উদার এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক না হতেন, তবে হয়তো চৈতন্যদেবের পক্ষেও ধর্মমত প্রচার কিংবা ভাব-বিপ্লব ঘটানো সহজসাধ্য হতো না। পটভূমিকা' অনুকূল ছিল বলেই চৈতন্যদেব যে নতুন ভাবনার বীজ ছড়িয়ে দিলেন, তা অনতিবিলম্বে পত্রে-পুষ্পে-পল্লবে মহীরুহের আকার ধারণ করেছিল।

সুলতানদের সহায়তা

আদি মধ্য যুগেই মঙ্গলকাব্য শাখার অন্তত একটি অথবা একাধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, এইরূপ অনুমান একান্ত অসঙ্গত নয়। এই যুগে মঙ্গলকাব্যের আবির্ভাব একান্ত স্বাভাবিক এবং প্রকৃতই যে এই প্রকার ঘটেছিল, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। যুগসন্ধিকালে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ফলে যে সকল নব দেবতার উদ্ভব হয়েছিল, এই কালেই তাদের প্রশস্তি বন্দনা করে কাব্য রচিত হবে, কালানুরোধে এই সত্যকে অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই।

স্বল্প-পরবর্তী কালে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে স্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছে যে— 'দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোন জনে' এবং 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।' অনুমান অসঙ্গত নয় যে, চৈতন্য-পূর্ব কালে তথা আদিমধ্য যুগেই 'মনসামঙ্গল' কাব্য এবং 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের উদ্ভব ঘটেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এই কালে রচিত কোন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। অবশ্য কেউ কেউ অনুমান করেন যে কবিচন্দ্র শঙ্কর কিঙ্করের 'গৌরীমঙ্গল' কাব্যও এই কালে রচিত হয়ে থাকতে পারে। তবে অন্ততঃ এরূপ তিনটি 'মনসামঙ্গল' কাব্যের নাম উল্লেখ করা চলে, যাদের রচয়িতাগণ আদি-মধ্য যুগে বর্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান করবার পক্ষে সঙ্গত কারণ বর্তমান। বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী- নিবাসী কবি বিজয়গুপ্ত, ময়মনসিংহ জেলার বোরগ্রামের কবি নারায়ণদেব এবং চব্বিশ পরগণার বাদুড্যা-বটগ্রাম-নিবাসী কবি বিপ্রদাস পিপ্পলাই এই কালে (একই কালে না হলেও) বর্তমান ছিলেন—এই উক্তির সমর্থনে যুক্তি একেবারে ভিত্তিহীন নয়।

বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য

পূর্ববর্তী যুগসন্ধি কালের আলোচনা-প্রসঙ্গে উক্ত কালকে 'মানস প্রস্তুতির কাল' বলা হয়েছে। সেই হিশেবে আলোচ্য আদি-মধ্য-যুগকে 'ভিত্তিভূমি নির্মাণের কাল' বলে অভিহিত কবলে অসঙ্গত বিবেচিত হবে না।

আব একজন কবির কথা উল্লেখ করা না হলে আদি-মধ্য যুগের আলোচনা অসমাপ্ত থেকে যাবে, তিনি 'অভিনব-জয়দেব' কবি বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতি বাঙলাদেশের অধিবাসী নন, তিনি মিথিলার কবি, মিথিলার রাজকবি। এই কারণেই বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত হবার কোন প্রত্যক্ষ কারণ নেই। কিন্তু তাঁর কাব্যের সঙ্গে বাঙালীর হৃদয়ের যোগ বর্তমান, তাঁর কাব্যের প্রভাব বাঙলা সাহিত্যের উপর প্রভূত পরিমাণ এবং বাঙলাদেশে রচিত রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলী সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর কাব্যের যোগ এত ঘনিষ্ঠ যে, বিদ্যাপতিকে বাদ দিলে বাঙলা সাহিত্যের একটা বিশেষ শাখা-সম্বন্ধে আলোচনা একেবারে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বিদ্যাপতির কালনিরূপণ-বিষয়ে কিছু জটিলতা থাকলেও তিনি যে আদি-মধ্য তথা চৈতন্য-পূর্ব যুগে বর্তমান ছিলেন, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

বিদ্যাপতি

আদি-মধ্য যুগে রচিত সাহিত্যের সংখ্যাল্পতার কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ নির্ণয় করা চলে। বাঙালীর সদ্য জাগরণ ঘটেছে—অতএব সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হবার জন্য প্রথমদিকে কিছুটা সময় অপচয়িত হয়ে থাকতে পাবে। ঐ কালেও যে প্রবলভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা বর্তমান ছিল এবং উচ্চশিক্ষিত অনেকের মধ্যেই যে দেশি ভাষা-সম্বন্ধে বিরূপ ভাব বর্তমান ছিল তারও প্রমাণ বর্তমান। বিদ্যাপতি অবহট্‌ঠ ভাষায় রচিত একটি পদে স্বীকার কবেছেন যে, 'সক্কঅবাণী বুহঅন ভাবই' অর্থাৎ বুধজন সংস্কৃত ভাষায় চিন্তা করে থাকে। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে এই মনোভাব সহায়ক নয়। এমনও হতে পারে যে, এই কালে হয়তো আরও অনেক সাহিত্যিক কাব্য রচনা করে গিয়েছেন, কিন্তু বাঙলার জলীয় পরিবেশ ও কীটাদির অত্যাচারে স্মৃতিমন্দির

সংখ্যাল্পতার কাবণ

থেকে তিনি নির্বাসিত হয়েছেন। এ ছাড়া অকৃতী কবিদের রচনা অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে বিলুপ্ত হয়ে থাকতে পারে। যা হউক, সংখ্যায় এই যুগ সমৃদ্ধ না হলেও উৎকর্ষে যে সম্ভাবনাময় ছিল, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

যুগান্তর কালের অলোচনা-প্রসঙ্গে আদি মঙ্গলকাব্যসমূহের আদিকবিদের কথা উল্লেখ করেছি। বলাবাহুল্য, তাদের সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয়েছে, সব একান্তভাবে অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে। অসম্ভব নয়, হরিদত্ত, মাণিকদত্ত এবং ময়ূরভট্ট হয়তো এই আদি মধ্য যুগেই বর্তমান ছিলেন।

[তিন] বড়ু চণ্ডীদাস ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

প্রাচীন যুগের চর্যাপদ রচনার মধ্য দিয়ে যে গীতিকাব্যের সূত্রপাত হয়েছিল তারই পরবর্তী প্রকাশ চণ্ডীদাসের পদাবলীতে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে চর্যাপদ বৌদ্ধধর্ম ও সহজিয়া সাধন পদ্ধতির অনুগামী আর পদাবলীর বৈষ্ণব ধর্ম অনেকের মতে সহজিয়া সাধনপদ্ধতির অনুগামী। বাঙলা সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-সম্বলিত কাহিনীর প্রথম দর্শন পাওয়া যায় পদাবলী সাহিত্যে। অবশ্য এর পূর্বেই জয়দেব গোস্বামীর 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থে এই কাহিনী পরিপূর্ণ মর্যাদা লাভ করেছে। ভাষার প্রশ্ন বাদ দিলে চণ্ডীদাসের পদাবলী সাহিত্য জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'রই প্রকৃত উত্তরসূরী।

আদি বৈষ্ণব কবিতা

চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতি (বাঙালী না হওয়া সত্ত্বেও) সুদীর্ঘ পঞ্চশতাব্দী যাবৎ বাঙালীর হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বর। বিভিন্ন জীবনী এবং সমসাময়িক গ্রন্থে চণ্ডীদাসের পদাবলী সাহিত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। তৎপর যুগে যুগেই চণ্ডীদাসের পদাবলী বাঙালীর মনে অতুলনীয় রস-সৃষ্টি করে চলেছে।

১৩১৬ বঙ্গাব্দে বসন্তরঞ্জন রায় কোন এক গ্রামের গোশালা থেকে আদ্যন্ত খণ্ডিত একখানি পুঁথি আবিষ্কার করেন এবং ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পাঠক ও সমালোচক-মহলে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হ'লো, ঐতিহ্য মতে এবং পুরুষানুক্রমে চণ্ডীদাসের যে সমস্ত পদ দীর্ঘকাল বাঙালীর রস-পিপাসাকে নিবৃত্ত করে এসেছে, আলোচ্য গ্রন্থে তাদের অনুপস্থিতি বিস্ময়কর মনে হ'লো। অধিকন্তু, আদ্যন্ত খণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও এতে একটি সুগঠিত কাহিনী পাওয়া গেল। অথচ, চণ্ডীদাসের পরিচিত পদগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, তাদের সমবায়ে এমন কোন কাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এর উপর আবার গ্রন্থের ভণিতায় পাওয়া গেল 'বড়ু চণ্ডীদাস' বা 'অনন্তবড়ু' চণ্ডীদাস নাম। অথচ পরিচিত পদাবলীগুলির প্রায় সর্বত্র দীন বা দ্বিজ উপনাম-সমন্বিত চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য এই গ্রন্থটিকে অবলম্বন করে দীর্ঘকাল বাঙলা সাহিত্যে যে বাদানুবাদ চলেছিল, আপাতত তা অনেকটা শান্ত বলে মনে হলেও আসলে সমস্যার সমাধান ঘটে নি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঃ চণ্ডীদাস

বসন্তবাবুর আবিষ্কৃত গ্রন্থখানি আদ্যন্ত খণ্ডিত বলে এতে গ্রন্থকারের নাম-পরিচয় ও কাল-জ্ঞাপক কোন পুষ্পিকা কিংবা গ্রন্থনাম পাওয়া যায় নি। সম্পাদক বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য রেখে এর নামকরণ করলেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। অন্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত লক্ষণ-বিচারে মনে হয়, গ্রন্থখানির নাম ছিল 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের গ্রন্থশালায় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি বোধ হয় সংরক্ষিত ছিল। পাণ্ডুলিপিটির ভিতর একখানি চিরকুটে 'কৃষ্ণসন্দর্ভ' নামক যে গ্রন্থের কয়েকটি পৃষ্ঠা ধার নেওয়া হয়েছিল বলে উল্লেখ করে হয়েছে, সেই 'কৃষ্ণসন্দর্ভ', সম্ভবত আলোচ্য গ্রন্থটি। তা ছাড়া চৈতন্য-পূর্ববর্তীকালে কীর্তন শব্দের ব্যবহার সংশয়জনক। আবার বৈষ্ণব পদাবলী যে অর্থে 'কীর্তন', গ্রন্থের আলোচ্য গ্রন্থটি তজ্জাতীয়ও নয়। এই সমস্ত কারণে গ্রন্থের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামটি অনেকেই মন থেকেই গ্রহণ করতে পারেননি। তবু যা হোক, সম্পাদক-প্রদত্ত নামই গ্রন্থটি শিরোভূষণ করে নিয়েছে। গ্রন্থের ভণিতায় সর্বত্রই চণ্ডীদাসের নাম, অতএব গ্রন্থকার যে চণ্ডীদাসই তাতে কোন সন্দেহ নেই। সন্দেহ জাগিয়েছে উপনামে। ভণিতার প্রায় সর্বত্র 'বড়ু' এবং ক্বচিৎ 'অনন্তবড়ু' উপনাম। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, কবির নাম ছিল 'চণ্ডীদাস' এবং 'বড়ু' তাঁর উপাধি অথবা কবির নাম 'অনন্ত' উপাধি ছিল 'বড়ু চণ্ডীদাস'। আশ্চর্যের বিষয় 'দীন' বা 'দ্বিজ' উপনাম গ্রন্থে একবারও ব্যবহৃত হয় নি।

গ্রন্থনাম ও গ্রন্থকার

গ্রন্থে কালজ্ঞাপক কোন পুষ্পিকা না থাকায় এ বিষয়েও সংশয় উপস্থিত হয়েছে। এদিকে বিভিন্ন চৈতন্য-জীবনী গ্রন্থে চণ্ডীদাসের উল্লেখ থাকায় চণ্ডীদাস যে চৈতন্যপূর্ব যুগে বর্তমান ছিলেন, তা অনুমান করা চলে। চৈতন্যচরিতকার বলেছেন —

'বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত।।'

যদি কেউ কূটতর্ক তুলে বলেন যে, চৈতন্যদেব বড়ু চণ্ডীদাসের গ্রাম্য ও অশ্লীল 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' শ্রবণে নিশ্চয়ই পুলকিত হতেন না, তিনি নিশ্চয়ই দ্বিজ বা দীন চণ্ডীদাসের মধুর রসাশ্রিত পদাবলীসমূহ শ্রবণ করতেন, তবে তাদের সন্দেহ নিরসন করবার জন্য সনাতন গোস্বামী-কৃত 'বৈষ্ণবতোষণী' নামক টীকার কথা উল্লেখ করা যাবে। উক্ত টীকায় 'চণ্ডীদাসাদিদর্শিত দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি'র উল্লেখ রয়েছে। যত রকম চণ্ডীদাসের পদ পাওয়া যায় তাদের মধ্যে একমাত্র বড়ু চণ্ডীদাস-রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থেই দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদির বর্ণনা পাওয়া যায়। অতএব চৈতন্যদেব যে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করতেন একথা অস্বীকার করা মুস্কিল। এইহেতু, তিনি যে চৈতন্যপূর্ববর্তী-কালেই বর্তমান ছিলেন, তাও সন্দেহাতীত ব্যাপার। গ্রন্থের আভ্যন্তর লক্ষণও এই অভিমতের পরিপোষক।

কালবিচার

যে পুথিটি গোশালা থেকে বসন্তবাবু উদ্ধার করেছিলেন, তা যদি চণ্ডীদাসের স্বহস্তলিখিত হতো তবে লিপিতাত্ত্বিক প্রমাণের সাহায্যে এর কাল-নির্ণয় সম্ভবপর হতো। অথচ গ্রন্থে অন্তত তিনজনের হস্তলিপি বর্তমান এবং লিপির ধাঁচও ঠিক এক নয়। ফলত লিপিতাত্ত্বিকদের

অভিমতেও ঐক্যের অভাব দেখা যায়। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন যে, গ্রন্থের লিপি ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী নয়, আবার রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে লিপি ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী। অপর কারো মতে গ্রন্থের লিপিকাল খ্রীষ্টাব্দের পঞ্চদশ শতক।

ভাষাতত্ত্বের বিচারে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থটিকে আদি-মধ্য যুগের রচনা বলে মনে করেন। ডাঃ সুকুমার সেন বড়ু চণ্ডীদাসকে ষোড়শ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত করলেও এর ভাষাকে আদি-মধ্যযুগের নিদর্শন রূপেই গ্রহণ করেছেন। অতএব চণ্ডীদাসের জীবৎকাল-সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত তথ্যে উপনীত হতে না পারলেও তিনি যে চৈতন্য-পূর্ব যুগে বর্তমান ছিলেন, তাতে কোন সংশয় নেই।

চণ্ডীদাস-পরিচয়

চণ্ডীদাস বাসলীপূজক ছিলেন, এই বহুশ্রুত কিম্বদন্তীটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'ও সমর্থন লাভ করেছে। চণ্ডীদাস যে বাসলীর সেবক ছিলেন, তা' এই গ্রন্থের বহু ভণিতায়ই উক্ত হয়েছে। 'বাসলী মাহাত্ম্য' নামক একটি সংস্কৃত পুস্তিকায় পাওয়া যায় যে চণ্ডীদাসের পিতার নাম ছিল নিত্যনিরঞ্জন এবং মাতার নাম বিন্ধ্যবাসিনী। কিন্তু পুস্তিকাটির প্রামাণিকতায় সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। 'সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়' নামক অপর এক গ্রন্থে তারা নামে চণ্ডীদাসের এক রজকী সাধন-সঙ্গিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। হয়তো এ থেকেই কালক্রমে রামতারা ও রামীধোপানী নামক চণ্ডীদাস-সঙ্গিনীর উপকাহিনীর সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে।

চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পদে জানা যায় যে চণ্ডীদাসের বাড়ি ছিল নানুর বা নান্নুর গ্রামে; গ্রামটির বর্তমান নাম নাদুড়, জেলা বীরভূম। এই গ্রামের চণ্ডীদাসের ভিটা নামক স্তূপ খুঁড়ে চতুর্ভুজা বাসলী মূর্তিও পাওয়া গিয়েছে। বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামও আবার চণ্ডীদাসের বাসভূমির দাবিদার। এখানেও বহুকাল বাসলীদেবী পূজিত হয়ে আসছেন, কাছেই নুনুরহাট নামে একটি স্থানও বর্তমান। এই ছাতনা থেকেই 'বাসলী মাহাত্ম্য' নামক পুস্তিকাটি আবিষ্কৃত হয়েছে। অতএব বড়ু চণ্ডীদাস নানুর বা ছাতনা, কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তৎসম্বন্ধেও সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না।

কাব্যের কাহিনী

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে একটি অখণ্ড কাহিনীকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছে—এ বিষয়ে এটি অন্যান্য বৈষ্ণবপদাবলী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। বৈষ্ণব পদাবলীতে গোষ্ঠ, অভিসার, মান, মাথুর ইত্যাদি কাহিনী বা ভাবকে উপজীব্য করে বিচ্ছিন্ন পদ রচনা করা হয়েছে, পক্ষান্তরে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-কাহিনীতে একটা সামগ্রিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড এবং বিরহখণ্ডে বিভক্ত এই কাহিনীটি স্বরূপতঃ পদাবলী সাহিত্য থেকে পৃথক। পৃথিবীকে কংসের অত্যাচার থেকে মুক্ত করবার জন্য ভগবান নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হলেন। অন্যদিকে স্বয়ং লক্ষ্মীও পিতা সাগরের ঘরে মাতা পদুমার গর্ভে রাধা-রূপে জন্মগ্রহণ করলেন। নপুংসক আইহনের সঙ্গে রাধার বিবাহ হলো। আইহন রাধা চরিত্রের বিশুদ্ধতা বজায় রাখবার জন্য

বাধার মায়েব পিসি বডাই বুডিকে বাধাব বক্ষক নিযুক্ত কবলেন। কিন্তু বক্ষকই ভক্ষক হযে উঠল। এই বডাই বুডিব দৌত্যেই বাধাকৃষ্ণেব মিলন ঘটতে লাগল। এই মিলনেব উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ কখনও 'দানী' সাজছেন, কখনও বা নৌকাব 'পাবানি' সাজছেন। আবাব কখনও বা কৃষ্ণ 'ভাবী' সেজে বাধাব দধি-সবেব পসবা মথুবা হাটে নিযে যান, কখনও বৌদ্রাতপ থেকে বক্ষা কববাব জন্য বাধাব মাথায ছত্র ধাবণ কবেন। কৃষ্ণ কখনও পুষ্পকুঞ্জ নির্মাণ কবে বাধাব জন্য অপেক্ষা কবেন, কখনও বা কালীযদমন, বস্ত্রহবণাদি লীলায নিবিষ্ট হন। লক্ষ্য কববাব বিষয, — বাধা যে সর্বত্রই একান্তভাবে কৃষ্ণেব হাতে আত্মসমর্পণ কবেছেন, তা নয। কখনও তিনি দূতী বডাইকে তাব অন্যায প্রস্তাবেব জন্য প্রহাব কবেন, কখনও বা কৃষ্ণেব উৎপীডনে বিবক্ত হযে কৃষ্ণ-জননী যশোদাব কাছে নালিশ কবেন। আবাব বাণখণ্ডে দেখছি –মদনশববিদ্ধা বাধা উন্মাদিনীব মতো কৃষ্ণকে অন্বেষণ কবে বেডাচ্ছেন, এদিকে কৃষ্ণ বাঁশী বাজিযে দূব থেকে বাধাকে উতলা ক'বে তোলেন। আবাব সুযোগ পেযেই বাধাকৃষ্ণেব মোহন বাঁশী চুবি কবে পালিযে যান। বাঁশী প্রত্যর্পণেব মধ্য দিযে তাদেব মিলনও ঘটে। আবাব মিলনতৃপ্তা বাধাকে নিদ্রিতাবস্থায পবিত্যাগ ক'বে কৃষ্ণ মথুবা চলে গেলেন। খণ্ডিত গ্রন্থখানিব এইখানেই সমাপ্তি। পূর্ববর্তী খণ্ডগুলিব মধ্যেও আবাব কোন কোনটি খণ্ডিত।

বাঙলা ভাষায বচিত প্রথম কাহিনী কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। বডু চণ্ডীদাস বিভিন্ন সূত্র থেকে উপাদান আহবণ কবে বিভিন্ন ঘটনা পবম্পবাব মধ্য দিযে এটিকে একটি আখ্যাযিকাব বূপদান কবেছেন। অনুমান কবা চলে, গ্রন্থ বচনাকালে তিনি জযদেব গোস্বামী-বচিত 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থখানিকে তাঁব আদর্শবূপে গ্রহণ ক'বেছিলেন। কাবণ 'গীতগোবিন্দে'ব মতোই এটিও বাধাকৃষ্ণেব প্রণযকাহিনী অবলম্বনে বচিত। উভয গ্রন্থেই এই দুটি ছাডা আব একটি মাত্র তৃতীয চবিত্র বযেছে। 'গীতগোবিন্দে'ব চবিত্রটি কোন এক সখীব, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' এটি বাধাব মাতামহী বডাই বুডীব কিন্তু এব ভূমিকা সখীবই অনুবূপ। এই তিনটি চবিত্রেব উক্তি-প্রত্যুক্তিব মাধ্যমেই প্রধানতঃ কাহিনী গডে উঠেছে বলে এই আখ্যান-কাব্যটি নাট্যধর্মী। আবাব দুটিতেই গীতবাহুল্য লক্ষ্য কবা যায উভযক্ষেত্রে বিভিন্ন বাগ-বাগিণী এবং তালেব উল্লেখ কবেছেন। এই জন্য অনেকেই উভয গ্রন্থকে 'নাট্যগীতি' বলে উল্লেখ কবে থাকেন। বডু চণ্ডীদাস জযদেবেব 'গীতগোবিন্দ' থেকে প্রচুব উপাদান আহবণ কবেছেন, এমন কি পূর্বোক্ত গ্রন্থেব বহু শ্লোকেবই আক্ষবিক অনুবাদও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' সংযোজন কবেছেন। বডু চণ্ডীদাস জযদেবেব অনুসাবী হলেও তত্তুল্য কৃতিত্বেব অধিকাবী হতে পাবেন নি। গৌডেশ্ববেব সভাকবি জযদেবেব বচনায যে পবিশীলিত রুচি ও বাগ্বৈদগ্ধ্যেব পবিচয পাওযা যায, গ্রাম্য কবি চণ্ডীদাসেব বচনায তা আশা কবা যায না।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস-আদি বিশিষ্ট বৈষ্ণব মহাজন পদকর্তাদেব বচনায যে অমৃতমধুব বসেব আস্বাদ লাভ কবা যায, বডু চণ্ডীদাসেব বচনায তাব অভাব থাকলেও ভিন্ন কাবণে বাঙলা সাহিত্যেব ইতিহাসে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' অসাধাবণ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থবূপেই বিবেচিত হযে থাকে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যেব ভাষা, বিষয-বিন্যাস, রুচিপ্রকৃতি, লিপি এবং আভ্যন্তব ও বহিঃপ্রমাণেব উপব নির্ভব কবে ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিকগণ গ্রন্থটিকে চৈতন্য-পূর্ব আদি-

মধ্য যুগের সাহিত্য-প্রচেষ্টার নিদর্শন বলে গ্রহণ করে থাকেন। সম্ভবতঃ এই গ্রন্থের সমকালেই অর্থাৎ আদি-মধ্য যুগেই বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাস, মালাধর-আদি কবিরাও স্ব স্ব কাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের কাব্যের প্রাচীন পাণ্ডুলিপির দুষ্প্রাপ্যতাহেতু কোনটিতেই প্রাচীন ভাষার নিদর্শন অক্ষতভাবে পাওয়া যায় নি। যে কোন কারণেই হোক, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি দীর্ঘকাল অপ্রচলিত থাকায় এবং ভাগ্যক্রমে এর প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হবার ফলেই আমরা কালানুক্রমিক বিবর্তন সূত্রটি লাভ করবার সুযোগ পেয়েছি বলেই বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে ভাষাতাত্ত্বিক কারণে এর অসাধারণ ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বীকৃত হয়ে থাকে। কৃষ্ণ-কাহিনীর মূল উৎস ভাগবতপুরাণ, হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ। এইসব পুবাণে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় বৃন্দাবনের গোপীপ্রেম থাকলেও তথায় রাধার উল্লেখ নেই, পরন্তু কৃষ্ণলীলার বিশিষ্ট রূপ প্রকাশ পেয়েছে অঘাসুর বকাসুরবধ, কালীয় দমন প্রভৃতি বীরত্বব্যঞ্জক কার্যাদির মধ্য দিয়ে। পক্ষান্তরে বাঙলাদেশে বহুল প্রচলিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম সাধনায় এবং বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের লৌকিক প্রেমই একটা আধ্যাত্মিক আববণে প্রকাশ পেয়েছে, এই মাধুর্য-রসের ব্যবহার ইতঃপূর্বে ছিল না, বাঙলায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'ই প্রথম কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য-রসের সঙ্গে মাধুর্য-রসের প্রথম পরিবেষণ। অতএব এরও ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য পাঠে অনেকেই এর অনেক দোষের সন্ধান পেয়ে থাকেন। আধ্যাত্মিক অথচ মধুর-বসাশ্রিত পদাবলী সাহিত্যের রস-সুধাপানে তৃপ্ত সাধারণ পাঠক, বিশেষতঃ ভক্ত বৈষ্ণবগণ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-পাঠে বিব্রত হয়ে পড়েন। কারণ এতে শ্রীকৃষ্ণের যে ঐশ্বর্য ভাবের প্রকাশ ঘটেছে তা তাঁদের সংস্কার-বিরুদ্ধ। বিশেষত এতে শুধুই সম্ভোগের কথাটা — যেন কোন গ্রাম্য বিকৃত-রুচি নর-নারীর একান্ত লৌকিক প্রেমকাহিনীই রাধাকৃষ্ণের বেনামীতে বর্ণিত হয়েছে। এর গ্রাম্যতা, অশ্লীলতা এবং সম্ভোগলিপ্সাকে ভক্ত বৈষ্ণব সুনজরে দেখতে রাজি নন। কিন্তু সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গ্রন্থটিকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, গ্রন্থকারের প্রচেষ্টা কখনও একেবারে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়নি। এতে একই ধরনেব বাদানুবাদ, নীতিবাক্য ও শাস্ত্রের দোহাই, ঘটনার পুনরুক্তি-আদি দোষ থাকা-সত্ত্বেও এতে যে বলিষ্ঠ জীবনবোধের প্রকাশ ঘটেছে, তার তুল্য রচনা সমগ্র প্রাচীন ও মধ্য যুগে একান্ত দুর্লভ।

কাব্য-বিচার

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'ব যথার্থ মূল্যায়ন করতে গিয়ে অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্য বলেছেন, "আসলে বড়ু চণ্ডীদাস সৌন্দর্যবসিক গীতিকবি নহেন, সত্যনিষ্ঠ ঔপন্যাসিক। চবিত্রচিত্রণই তাঁহার মুখ্য কাজ। তিনি সাহিত্যধর্মে আধুনিক যুগের ঔপন্যাসিকদের পূর্বপুরুষ।"

গ্রন্থটির গঠন-বৈশিষ্ট্যও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সমগ্র প্রাগাধুনিক সাহিত্যে নাটক নেই অথচ প্রথম যুগের বাঙলা ভাষায় রচিত এই গ্রন্থটিকে তার একটা আদল ছিল, এই ধারাটি অনুসৃত হলে বাঙলা নাট্যসাহিত্য মধ্যযুগেই পূর্ণ পরিণতি লাভ করতে পাবতো। তিনটি মাত্র চরিত্রের কথোপকথন এবং কতিপয় গীতের মধ্য দিয়ে এমন নাট্যগুণান্বিত পরিপূর্ণ কাহিনী গড়ে তোলা যথেষ্ট কৃতিত্বের

নাটকীযতা

পরিচায়ক। কথোপকথনে যথেষ্ট ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি হয়েছে। এমন কি গীতি-প্রাধান্য সত্ত্বেও নাটকীয়তা ক্ষুণ্ণ হয় নি।

গ্রন্থে অনেকগুলি গান রয়েছে। কিন্তু বৈষ্ণবপদের মতো এতো কাব্যগুণ-সমৃদ্ধ না হলেও কোন কোন কবিতা যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী, কোন কোনটি তো বৈষ্ণব কবিতারই তুল্য। যেমন, — 'কেন বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে' পদটি।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' তিনটি মাত্র চরিত্র — শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা ও বড়াই বুড়ী। অথচ এই স্বল্পতম চরিত্রের সহায়তায়ই কবি মাঝে মাঝে উৎকৃষ্ট নাটকীয়তা সৃষ্টিতে সাক্ষম হয়েছেন। বিশেষত রাধা চরিত্রের চিত্রণে কবি অপূর্ব দক্ষতা ও চাতুর্যের পরিচয় দান করেছেন। সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা, অশিক্ষিতা গ্রাম্য বালিকা কীভাবে স্তরে স্তরে বিবর্তিত হয়ে প্রৌঢ়পারাবর্তী শ্রীরাধায় পরিণত হয়েছেন, — তা প্রকৃতই উপভোগের বিষয়। পদাবলীর রাধিকার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধিকার যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। পদাবলীর রাধিকা প্রথম যৌবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র রাধিকা যেন এক দুরন্ত বালিকা, কৃষ্ণের দেবত্বে সে আস্থাহীনা। তাম্বুলখণ্ডে রাধা শ্রীকৃষ্ণকে অপমানিত করেন, তার মনে তখন প্রবল ঘৃণা ও ক্রোধ। তারপর দানখণ্ডে, নৌকাখণ্ডে কৃষ্ণ তাকে জোর করবার পর রাধার মনে ক্রমশঃ মোহ সৃষ্টি হয়। সে ভারখণ্ডে ও ছত্রখণ্ডে কৃষ্ণের সেবা গ্রহণ করেছে। ক্রমশঃ রাধা প্রলুব্ধা হয়ে ওঠে। এইভাবে বাল্য থেকে জীবনের বিভিন্ন স্তর ও অভিজ্ঞতার পর্যায় অতিক্রম করে রাধিকা যখন বৃন্দাবনখণ্ডে উপনীত হয়, ততদিনে তার দেহে, মনে যৌবন এসে গেছে, কৃষ্ণবিদ্বেষ ক্রমে কৃষ্ণপ্রেমে রূপায়িত হয়েছে। বংশীখণ্ডে সেই প্রেম সার্থক পরিণতি লাভ করেছে, এবাবে রাধার দেহমাত্র নয়, মন ভুলিয়াছে, কৃষ্ণের রূপে নয়, কৃষ্ণের স্বরূপে। অবশেষে রাধাবিরহে এসে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা একেবারেই পদাবলীর রাধায় রূপান্তরিত হয়েছে। রাধার এই মনোবিকাশের চিত্রটি রূপে-রেখায় অনবদ্য হয়ে উঠেছে। রাধা-চরিত্র বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী যথার্থই মন্তব্য করেছেন, "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধার যেখানে শেষ পদাবলীর রাধার সেখানে আরম্ভ।"

চরিত্রসৃষ্টি

ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন, "চণ্ডীদাস এই নাম অথবা বড়ু চণ্ডীদাস এই উপাধির অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামে প্রকাশিত এই নাট্যগীতি কাব্যটি রচনা করেছিলেন তিনি মহাকবি, এবং অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত মহাকাব্য-লক্ষণের কিছুই ইহাতে না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মহাকাব্য।" 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার পর এর বহুবিধ দোষ ও গুণ বিশ্লেষণের পর নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে প্রাজ্ঞ অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থটি সর্ম্পকে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা' উদ্ধারযোগ্য। তিনি বলেন, "মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের উষারুণ-প্রত্যুষে বড়ু চণ্ডীদাসের আবির্ভাব নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য শুধু মধ্যযুগে নহে, সমগ্র বাঙলা সাহিত্যের একখানি অভিনব উপাদেয় গ্রন্থ তাহা কাব্যরসিকগণ স্বীকার করিবেন। একদা

ইহাব স্থূল বর্ণনাব অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম অধ্যাত্মব্যঞ্জনা নিশ্চযই সাধাবণ শ্রোতাকে মাতাইয়া তুলিত। (কিন্তু আধুনিক কালেব পাঠকেব নিকট ইহাব প্রত্যক্ষ মানববস অধিকতব উপাদেয হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।'')

[চার] চণ্ডীদাস-সমস্যা

বড়ু চণ্ডীদাস-বচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য' আবিষ্কৃত হবাব পবই 'চণ্ডীদাস-সমস্যা' জটিল আকাব ধাবণ কবলেও নিবিষ্ট পাঠকেব নিকট বহু পূর্বেই 'চণ্ডীদাস' এক সমস্যা হযে দাঁডিযেছিলেন। বিভিন্ন চৈতন্য জীবনীকাব স্বীকাব কবেছেন যে, মহাপ্রভু চণ্ডীদাসেব পদ আস্বাদন কবতেন, অথচ চণ্ডীদাস ভণিতা-যুক্ত পদে চৈতন্যদেবেব প্রভাব বর্তমান। চণ্ডীদাস-নামেব পূর্বে উপনামেব বৈচিত্র্যও পাঠকেব মনে সন্দেহেব সৃষ্টি কবতে পাবে তা ছাড়া বিভিন্ন উপনাম-যুক্ত চণ্ডীদাসেব পদে যে ভাবেব ও বচনাবীতিব বৈষম্য দেখা যায, তাও নিষ্ঠাবান পাঠকেব দৃষ্টি এডাতে পাবে না। কিন্তু এই সমস্ত-সত্ত্বেও দীর্ঘকাল কেউ উচ্চবাচ্য কবেন নি। কিন্তু পবে বসন্তবঞ্জন বাযেব বড়ু চণ্ডীদাস বচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' প্রকাশিত হলে, চাবিদিক থেকে সংশয বাণ নিক্ষিপ্ত হতে থাকে।

সমস্যাব উদ্ভব

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থেব ভণিতায কবিব নাম, হয নিরুপাধিক, নয 'বড়ু' অথবা 'অনন্ত বড়ু' উপনামযুক্ত। অথচ এতাবৎকাল 'দীন, দ্বিজ, দীনক্ষীণ, তরুণীবমণ' আদি যে সকল উপনাম চণ্ডীদাসেব নামেব সঙ্গে যুক্ত হত, তাদেব সামগ্রিক অনুপস্থিতি কৌতূহলোদ্দীপক। বিষয, ভাব, বচনাভঙ্গি, ভাষা আদি সর্বদিক থেকেই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'ব সঙ্গে প্রচলিত পদাবলী সাহিত্যেব পার্থক্য সুস্পষ্ট অতএব অতি সঙ্গত কাবণেই প্রশ্ন জাগল ঃ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-বচযিতা বড়ু চণ্ডীদাস কে এবং চণ্ডীদাসেব সংখ্যাই বা কত।

উপাধিব বৈচিত্র্য

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন সেই বিবাট সমস্যা-সত্ত্বেও চণ্ডীদাসেব একত্বে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁব ধাবণা, বালক বযসেব চপলতায চণ্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামক গ্রাম্য ও অশ্লীল গ্রন্থটি বচনা কবেছিলেন। কিন্তু বালক বযসেব চপলতাব দোহাই চলে না, কাবণ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে'ব ভাব-ভাষা-গঠন সৌকর্যে পূর্ণ পবিণতিব লক্ষণ সুস্পষ্ট। পবে পবিণত বযসে উৎকৃষ্ট মধুববসযুক্ত পদাবলী সাহিত্য বচনাব দোহাই অচল। রুচি আব বসেব পার্থক্যই যদি একমাত্র প্রশ্ন হত তবে সমস্যাব এই সমাধান মেনে চলা সম্ভবপব হতো। কিন্তু সমস্যা আবও অনেক গভীবে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলীব পার্থক্য

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আর পদাবলীব পার্থক্য-সম্বন্ধে ডক্টব শহীদুল্লাহ্ যে প্রবন্ধ বচনা কবেছেন তাব অংশবিশেষ থেকে সমস্যাব গভীবতা অনুভব কবা যাবে। তিনি দেখিযেছেন ঃ (১) "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনেব কোনও স্থানে দ্বিজ চণ্ডীদাস বা দীন চণ্ডীদাস ভণিতা নাই। (২) সর্বত্র

'গাএ' বা 'গাইল' আছে, কোথাও 'ভণে' 'কহে' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ নাই। (৩) ভণিতা কখনও উপান্ত চরণে হয় না। (৪) বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীমতী রাধিকার পিতা-মাতার নাম সাগর ও পদুমা বলিয়াছেন। (পদাবলী সাহিত্যে রাধিকার পিতা বৃষভানু এবং মাতা যমুনা। লেখকের বয়ঃ-পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে পিতা-মাতার নাম গোত্রের পবিবর্তন কোনক্রমেই যুক্তিসহ নয়।) (৬) বড়ু চণ্ডীদাস রাধার কোন সখী বা শাশুড়ী-ননদের নাম উল্লেখ করেন নাই। (পদাবলী সাহিত্যে 'জটিলা-কুটিলা'র উল্লেখ লক্ষণীয়।) তিনি বড়াই ভিন্ন কোনও সখীকে সম্বোধন কবেন নাই। (পদাবলীব ললিতা-বিশাখা স্মরণীয়।) (৬) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার নামান্তর চন্দ্রাবলী প্রতিনায়িকা নহেন। (৭) বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের কোন সখার নাম উল্লেখ করেন নাই। (পদাবলী সাহিত্যের শ্রীদাম-সুদাম-আদি প্রসিদ্ধ।) (৮) বড়ু চণ্ডীদাস সর্বত্র প্রেম-অর্থে 'নেহ' বা 'নেহা' ব্যবহাব করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কেবল চারিস্থলে 'পীরিতি' শব্দের প্রয়োগ আছে, কিন্তু তাহার অর্থ প্রীতি বা সন্তোষ। (৯) বড়ু চণ্ডীদাস কুত্রাপি শ্রীমতী রাধিকার বিশেষণে 'বিনোদিনী' এবং শ্রীকৃষ্ণ-অর্থে 'শ্যাম' ব্যবহার করেন নাই। (১০) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধিকা গোযালিনী মাত্র, রাজকন্যা নহেন। (১১) অধিকন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের নিকটে ব্রজবুলি অপরিচিত। এইগুলিব কষ্টিপরীক্ষায চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত অনেক পদ যে বড়ু চণ্ডীদাস ভিন্ন অন্য চণ্ডীদাসের, তাহাতে সন্দেহ থাকে না।" * ডক্টর শহীদুল্লাহ্ অবশ্য এখানেই তালিকা সমাপ্ত কবেছেন, কিন্তু আসলে এটি এ স্থানেই শেষ হবাব নয। প্রচলিত পদাবলী সাহিত্যেব সঙ্গে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র পার্থক্য আবও কতকস্থলে সুস্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে। ('শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ঐশ্বর্য বসেব কাব্য এবং এতে লৌকিক প্রেমের চরিত্রই অঙ্কিত হয়েছে। পক্ষান্তরে পদাবলী সাহিত্য মধুব বসের কাব্য এবং এর প্রেম একান্তভাবেই আধ্যাত্মিক।) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' রাধিকা লক্ষ্মীর অবতাব কিন্তু পদাবলীব রাধিকা লক্ষ্মীব মতই শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা এবং প্রিয়তমা প্রণযিনী। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র রাধা সংস্কৃত অলঙ্কাব-শাস্ত্রোক্ত নায়িকা– 'অজ্ঞাতযৌবন মুগ্ধাবস্থা' থেকে প্রগল্ভাবস্থায় উপনীত হযেছেন। আর পদাবলীব রাধিকা কৃষ্ণসমর্পিতপ্রাণা। সর্বোপবি, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে রাধা-কৃষ্ণের সম্পর্কটি যেভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে গৃহীত হয়েছিল, পদাবলীতে তার উৎকৃষ্ট পবিচয় পাওয়া গেলেও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' তা' একান্তভাবে অনুপস্থিত। এই সকল তত্ত্ব এবং তথ্য-আলোচনায় একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব-কল্পনা অপরিহার্যে হযে দাঁড়ায়।

একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার কবে নিলে আরও কতকগুলির সমস্যাব নিবসন ঘটে। দীর্ঘকাল যাবৎ একটি অভিমত প্রচলিত আছে যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ ঘটেছিল। চৈতন্য-পূর্ববর্তী বিদ্যাপতি ও চৈতন্যোত্তর চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎকাবকে এতাবৎকাল বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসকে চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগে স্থাপন কবলে এই লোকশ্রুতির মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে বক্ষিত হতে পাবে। অবশ্য দ্বিতীয় বিদ্যাপতিব বর্তমানতা দ্বারাও এই সমস্যাব সমাধান হ'তে পাবে। বীরভূম জেলাব নানুব

* উক্ত উদ্ধৃতিব ভিতব বন্ধনী-ভুক্ত অংশগুলি বর্তমান গ্রন্থকারের সংযোজন

এবং বাঁকুড়া জেলার ছাতনা উভয় গ্রামই চণ্ডীদাসের জন্মভূমি বলে দাবী করে থাকে। এদের উভয়ের পক্ষেই প্রচুর পরিমাণ যুক্তি বর্তমান থাকায় কোন দাবীকেই নস্যাৎ ক'রে দেওয়া সম্ভব নয়। অথচ একই চণ্ডীদাসের পক্ষে দুই স্থানে জন্মগ্রহণ করাও সম্ভবপর নয়। চণ্ডীদাস একাধিক হ'লে এই সমস্যার সমাধান হয়। নানুর এবং ছাতনা উভয় স্থলেই চণ্ডীদাস-কথিত বাসলী দেবী বর্তমান। কিন্তু বাসলী একস্থানে সরস্বতী-স্বরূপিণী ও অন্যত্র চণ্ডীরূপা। একই চণ্ডীদাস সরস্বতী ও চণ্ডীব পূজক ছিলেন, তা'ও মানতে কষ্ট হয়। কিন্তু একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলে আর কোন গোলযোগ থাকে না। এ ছাড়া রচনার বিষয়বস্তু, ভাষা, ভাব, রুচি, রসবোধ প্রভৃতি-বিচারে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র সঙ্গে চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদগুলির পার্থক্য সুস্পষ্ট। গভীবতর অনুধাবনে তো বটেই, এমন কি, প্রথম দৃষ্টিপাতেই সুচিহ্নিত হ'য়ে যায়। উপযুক্ত এতগুলি প্রমাণ হাতে থাকবার পরেও চণ্ডীদাসের একত্বে বিশ্বাসী থাকলে সত্যের অবমাননা কবা হবে আশঙ্কা হয়। তাই চণ্ডীদাসের সংখ্যা অন্তত একাধিক ছিল, তা' মানতেই হয়।

একাধিক চণ্ডীদাস

এখন প্রশ্ন, চণ্ডীদাস কয়জন ছিলেন? 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র চণ্ডীদাস এবং পদাবলীব চণ্ডীদাসকে নিয়ে যে সমস্যার উদ্ভব ঘটেছিল তাদের পৃথক ব্যক্তিরূপে নির্দেশ কবে সমস্যাব সমাধান করা হ'য়েছে বটে, কিন্তু পদাবলীর চণ্ডীদাস সমস্যার নিরসন এখনও হয নি। বিভিন্ন পদাবলীর 'দীন, দ্বিজ, দীনক্ষীণ, আদি, তরুণী-রমণ'—ইত্যাদি উপাধিযুক্ত এবং নিরুপাধিক চণ্ডীদাসেবও প্রচুর পদ বর্তমান। শুধু তাই নয়, রস-রুচি, উৎকর্ষ এমন কি গঠন-রীতির বিচারেও চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদগুলিতে প্রচুর পার্থক্য বর্তমান। সমস্যা, পদাবলী সাহিত্যেব এই সমস্ত পদই কি কোন একজন চণ্ডীদাসের রচনা? বলা বাহুল্য, এর উত্তরে নানাপ্রকার অভিমতের সৃষ্টি হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন বড়ু চণ্ডীদাস-ব্যতীত অপব কোন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করতে সম্মত ন'ন। তিনি মনে করেন যে, চণ্ডীদাসের কবি-খ্যাতিব সুযোগ নিয়ে অনেক অক্ষম কবিও ভণিতায় চণ্ডীদাসের নাম যোগ করেছেন; অনেক সময় কীর্তনীয়াবাও এই অপকর্মে সহায়তা করেছেন। ''চণ্ডীদাস-ফ্যাশন প্রবর্তিত হওয়ায শুধু যে চণ্ডীদাস-ভণিতায় নূতন পদ রচিত হইতে লাগিল এমন নহে, পুরাতন কবিদিগেব উৎকৃষ্ট পদগুলি চণ্ডীদাস ভণিতায় রূপান্তরিত হইতে লাগিল। ইহার জন্য দায়ী অবশ্য কীর্তনীযাবাই বেশী। এই কারণেই নরহরি সরকার, লোচনদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, নিত্যানন্দ দাস, রমগোপালদাস ইত্যাদি কবিব ভাল ভাল পদ পরবর্তীকালে পুঁথিতে কীর্তনীয়ার মুখে চণ্ডীদাসেব ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে।'' ডঃ সেন চণ্ডীদাস-বিষয়ে যে চরম অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তা' অবশ্য সর্বজনস্বীকৃত নয়।

পদাবলীর চণ্ডীদাস কয়জন?

অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু 'দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী' সঙ্কলন করতে গিয়ে চণ্ডীদাস-সমস্যার উপর অনেকখানি আলোকপাত করেছেন। তিনি চৈতন্যোত্তব যুগেব 'দীন চণ্ডীদাসকে'ই শুধু স্বীকার কবতে চান। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটিতে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত যে

সমস্ত পদ বর্তমান, প্রকৃতপক্ষে তাদের সবগুলিই চণ্ডীদাস-রচিত নয়। ভিন্ন সূত্রে এদের কোন কোনটির পৃথক রচয়িতার সন্ধানও পাওয়া গেছে। অতএব গ্রন্থোক্ত পদগুলির প্রামাণিকতা সন্দেহাতীত নয়। মণীন্দ্রবাবু দ্বিজ-উপাধিধারী পৃথক কোন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

দীন চণ্ডীদাস

ডঃ শহীদুল্লাহ্ কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাস ছাড়াও আরও দু'জন চণ্ডীদাসের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তিনি মনে করেন, "দীন চণ্ডীদাস একটি ধারাবাহিক কৃষ্ণযাত্রা রচনা করিয়াছেন যেমন বড়ু চণ্ডীদাস একটি ধারাবাহিক কৃষ্ণ-ধামালী রচনা করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিজ চণ্ডীদাস বিক্ষিপ্ত রচনা ভিন্ন কোন ধারাবাহিক কৃষ্ণলীলার বই রচনা করেন নাই। দীন-দ্বিজ চণ্ডীদাসের মধ্যে এই পার্থক্য তাহাদের রচিত পদগুলি সম্বন্ধে একটি দিগ্‌দর্শনীয় কাজ করিবে।" ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'দীন চণ্ডীদাস' ও 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' নামাঙ্কিত পদগুলির পার্থক্য-সম্বন্ধে সচেতন থেকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন শুধু দীন চণ্ডীদাসকেই। তাঁর মতে দ্বিজ চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত শ্রেষ্ঠ পদগুলি হয়তো দীন চণ্ডীদাস দ্বারাই রচিত।

চণ্ডীদাসের একত্ব

অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদার চণ্ডীদাসের বহুত্ব- বিষয়ে নিঃসংশয়। তিনি মনে করেন যে চণ্ডীদাস-উপাধিধারী বহু কবিই ভিন্ন ভিন্ন কালে বর্তমান ছিলেন। তাঁর মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস ছিলেন শ্রী চৈতন্যের সমসাময়িক। তাঁরও পূর্বে ছিলেন প্রকৃত চণ্ডীদাস, চৈতন্যদেব তাঁর পদ আস্বাদন করতেন, এই চণ্ডীদাসের পদগুলি চিনবার কতকগুলি লক্ষণও তিনি উল্লেখ ক'রেছেন। এই উপায়ে তিনি স্বয়ং শতাধিক পদও বাছাই করেছেন। বৈষ্ণব পদাবলী-সম্বন্ধে আর যারা আলোচনা করেছেন, তাদের মধ্যে অনেকেই আবার নোতুন নোতুন অভিমত পোষণ করে গেছেন। অতএব এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত যে মতান্তর বর্তমান, তার সমাধান সহজ নয় বলেই মনে হয়। চণ্ডীদাস-সম্বন্ধে আর নোতুন কোন প্রামাণিক সূত্র আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত চণ্ডীদাস-সমস্যা সমস্যাই থেকে যাবে —পাঠককে শুধু চণ্ডীদাসের পদের মধুর রস আস্বাদন করেই তৃপ্ত থাকতে হবে।

চণ্ডীদাসের বহুত্ব

কিন্তু তৎসত্ত্বেও অপর একটি সমস্যা যা চণ্ডীদাস সমস্যার বহুলতা সৃষ্টি করেছে, তার উল্লেখও অপরিহার্য। পূর্বোক্ত চণ্ডীদাসগণ ছাড়াও অপর এক সহজিয়াপন্থী চণ্ডীদাসের স্বীকৃতি না দিলেই চলে না। কারণ, তাঁর রচনা স্বরূপতই সম্পূর্ণ পৃথক্ ধারাভুক্ত। আপাততঃ যে কয়জন চণ্ডীদাসকে পৃথক্‌ভাবে চিহ্নিত করা হ'য়েছে, তাদের নিয়েই সমস্যা-সমাধানের চেষ্টা ছাড়া উপায়ান্তর নেই বলেই মনে হয়।

[পদাবলীর চণ্ডীদাস-সমস্যা -সম্বন্ধে 'চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলী-সাহিত্য' শীর্ষক আলোচনা যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।]

(অতএব চণ্ডীদাস সমস্যার সমাধান-কল্পে আমরা আপাততঃ চারজন চণ্ডীদাসকে স্বীকৃতি জানাতে পারি —(১) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-রচয়িতা 'বড়ু চণ্ডীদাস', যিনি চৈতন্য-পূর্ব কালে বর্তমান ছিলেন; (২) চৈতন্য-পূর্ববর্তী বা চৈতন্যসমকালীন 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' শ্রেষ্ঠ পদ

রচয়িতা, সম্ভবতঃ চৈতন্যদেব এঁরই পদ আস্বাদ করতেন; (৩) চৈতন্যোত্তর যুগের 'দীন চণ্ডীদাস'—যিনি পালাগান আকারে বিস্তর পদ রচনা করেছেন; এবং (৪) 'তরুণীরমণ চণ্ডীদাস'—যিনি সহজিয়াপন্থী পদ রচনা করেছিলেন।)

এ ছাড়াও সমস্যা রয়েছে : ১. এই চৈতন্যসমকালীন শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দমধুব্রত শ্রীচণ্ডীদাস-কৃত 'ভাবচন্দ্রিকা' নামক কাব্যে রাগমার্গ অবধি ভক্তিতত্ত্ব এবং মাধুর্য লীলার উৎকর্ষ নিরূপণ আছে। ২. এক 'কবিরাজ' চণ্ডীদাস 'গীতগোবিন্দে'র টীকাকার — ইনি কি কাব্যপ্রকাশের, 'ধ্বনি-প্রকাশে'র 'দীপিকা' নামক টীকাকার, যিনি ভক্তিপথের পথিক ছিলেন? এ সব চণ্ডীদাসকে আর সমস্যার সঙ্গে জড়িত না করাই শ্রেয়। তাতে শুধু সমস্যার জটিলতাই বৃদ্ধি পাবে।

[পাঁচ] বিদ্যাপতি

জয়দেব গোস্বামী সংস্কৃত ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের সূত্রপাত করেছিলেন, মৈথিলী কবি 'অভিনব-জয়দেব' বিদ্যাপতি ব্রজবুলি ভাষায় সেই পদাবলী সাহিত্যকে পূর্ণতা দান করেছিলেন। অবশ্য আদৌ রামগতি ন্যায়রত্ন, সারদাচরণ মিত্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি মনীষীদের ধারণা ছিল যে বিদ্যাপতি ছিলেন বাঙালী কবি, কাব্য রচনা করেছেন ব্রজবুলি ভাষায়। পরে সর্বপ্রথম জন্ বীম্‌স্ প্রকাশ করলেন যে, বিদ্যাপতি মিথিলার কবি; রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বীম্‌স্-এর অভিমত সমর্থন করলেন। স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সনই সর্বপ্রথম মিথিলার ভিক্ষুকদের মুখ থেকে শুনে বিদ্যাপতির পদ-সংগ্রহ প্রকাশ করলেন।

বিদ্যাপতি-চর্চা

ক্রমে বিদ্যাপতি-সম্বন্ধে বহু তথ্য প্রকাশ পেলো। দেখা গেলো, বাঙলাদেশে ব্রজবুলি ভাষার পদকর্তারূপে বিদ্যাপতি পরিচিত হলেও স্বদেশ মিথিলায় তিনি বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিতরূপেই অধিকতর পরিচিত। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর কোন এক সময় জন্মগ্রহণ ক'রে বিদ্যাপতি ঠাকুর পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালে মিথিলার সভাকবি-রূপে বর্তমান ছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর বিভিন্ন রচনায় তিনি মিথিলার কয়েকজন রাজা ও রাণীর পৃষ্ঠপোষকতার কথা উল্লেখ ক'রে গেছেন। ১৪১২ খ্রীঃ রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে বিস্‌পী গ্রাম দান করেছেন, —এরূপ ঘোষণাসূচক একটি তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হ'য়েছিল, পরে জানা গেল, দানপত্রখানি জাল। এটি ছাড়াও ১৪১২ খ্রীঃ থেকে ১৪৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত বিদ্যাপতির জীবৎকালের কতকগুলি লিখিত প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিদ্যাপতির পিতা গণপতি ঠাকুর রাজা গণেশ্বরের সুহৃদ ছিলেন। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে বংশ ছিল পণ্ডিতের বংশ।

বিদ্যাপতির-পরিচয়

বিদ্যাপতি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে যে সকল নরপতির কথা উল্লেখ করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন কীর্তিসিংহ (১৪০২-০৪ খ্রীঃ), রাজা দেবসিংহ, রাজা শিবসিংহ (১৪১০-১৪ খ্রীঃ)

রাজা পদ্মসিংহ, রাণী বিশ্বাসদেবী, রাজা নরসিংহদেব, রাণী ধীরমতী। রাজা শিবসিংহের পত্নী রাণী লছমীদেবীর সঙ্গে বিদ্যাপতির অন্তরঙ্গতা সম্পর্কে যে সরস কাহিনী প্রচার করা হ'য়ে থাকে, তা' ভিত্তিহীন বলে মনে হয়। অনুমান, বৈষ্ণব সহজিয়া-সাধকগণই এই অপ-রটনার জন্য দায়ী।

বিদ্যাপতি তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে (আনু ১৩৮০-১৪৬০ খ্রীঃ) বহু গ্রন্থই রচনা করেছেন। এই রচনাবলী থেকে তাঁর বহু ভাষাজ্ঞানের এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন বিষয়ে বিদ্যাপতি এত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যে, তৎকালে এটি এক বিস্ময়কর ব্যাপার বলেই পরগণিত হ'তো। তাঁর সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'বিভাগসার ও দানবাক্যাবলী' (১৪৪০-৬০ খ্রীঃ) স্মৃতিশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় এক বিচারগ্রন্থ; 'দুর্গাভক্তিরঙ্গিণী' (১৪৪০-৬০) 'গঙ্গাবাক্যাবলী', 'ব্যাড়ীভক্তি তরঙ্গিণী', 'শৈবসর্বস্বহার'(১৪৩০-৪০ খ্রীঃ) ও 'বর্ষক্রিয়া'য় বিভিন্ন পূজার্চনা পদ্ধতি-সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে; তাঁর অবহট্‌ঠ ভাষায় রচিত ইতিহাস গ্রন্থের নিদর্শন 'কীর্তিলতা' ও 'কীর্তিপতাকা' (১৪১০); 'ভূপরিক্রমা' নামক গ্রন্থে (দেবী সিংহের আদেশে) তীর্থকাহিনীচ্ছলে বিদ্যাপতি আপনার ভৌগোলিক জ্ঞানেরই পরিচয় দিয়েছেন; তাঁর 'পুরুষপরীক্ষা' (১৪১০) গ্রন্থে কথাসাহিত্যের গুণাবলী বর্তমান। এ'গুলি ছাড়াও তিনি অলঙ্কার-শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় 'লিখনাবলী' (১৪১৮) নামক গ্রন্থ রচনা করেন। 'হরগৌরী' বিষয়ক কিছু গান তিনি মাতৃভাষা মৈথিলীতে রচনা করেছিলেন। সর্বোপরি, যার জন্যে তাঁর খ্যাতি সর্বাধিক, সেই 'রাধা-কৃষ্ণ-লীলা'-বিষয়ক পদ রচনা করেছিলেন ব্রজবুলি ভাষায়। এ ছাড়াও আছে ভাষাগীতযুক্ত সংস্কৃতে লেখা ক্ষুদ্র নাট্যরচনা 'গোরক্ষ বিজয়', 'মণিমঞ্জরী'। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যথার্থই বলেছেন, "...যে গানে তাঁহার খ্যাতি, যে গানে তাঁহার প্রতিপত্তি, যে গানে তিনি জগৎ মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তিনি যদি ত হার একটি গানও না লিখিতেন, কেবল পণ্ডিতের মত স্মৃতি, পুরাণ, তীর্থ ও গেজেটিয়ার প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলেও বলিতে হইত, তাঁহার প্রতিভা উজ্জ্বল ও সর্বতোমুখী। বস্তুত স্বদেশে বিদ্যাপতি আপনার পাণ্ডিত্যের জন্যই প্রখ্যাত।"

বিদ্যাপতির গ্রন্থাবলী

বাঙলাদেশে বিদ্যাপতির খ্যাতি ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদাবলীর জন্য। কিন্তু তিনি যে ব্রজবুলি ছাড়াও অন্তত তিনটি ভাষায় পারঙ্গমত্ব লাভ করেছিলেন, তার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। তাঁর 'কীর্তিলতা' ও 'কীর্তিপতাকা' অবহট্‌ঠ ভাষায় রচিত সাহিত্যের উত্তম নিদর্শন। অবহট্‌ঠ ভাষায় রচনার কারণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি যে যুক্তিটি উত্থাপন করেছেন, তা' আধুনিক কালের এই ভাষা-সমস্যার দিনে দিগ্‌দর্শনের কাজ করতে পারে ঃ

সক্কঅবাণী বহুজন ভাবই।
পাউঅ-রসকো মম্ম না পাবই।।
দেসিল বঅনা সবসন মিঠ্‌ঠা।
তেঁ তইসন জম্পএ্যো অবহট্‌ঠা।।

—"বুধজন সংস্কৃতবাণীতে ভাবনা করেন, তাঁরা প্রাকৃতরসের মর্ম পান না। দেশি বচন সর্বাপেক্ষা মধুর, তা ঐরূপ অবহট্‌ঠ ভাষায় লিখছি।"

বিদ্যাপতির রচনা সমূহে বহুদেবতা-সম্বন্ধীয় প্রশস্তি অতিশয় সুলভ বলে তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মমত-সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে। বাঙলাদেশের ভক্ত বৈষ্ণবদের নিকট বিদ্যাপতি বৈষ্ণবচূড়ামণি-রূপেই প্রসিদ্ধ। স্বদেশে তিনি শৈবরূপে পরিচিত। তিনি স্বগ্রামে এক শিবমন্দির স্থাপন করেছিলেন বলেও জানা যায়। আবার দুর্গা, গঙ্গা, গৌরী প্রভৃতি শক্তি দেবীদের সম্বন্ধেও তিনি একাধিক গ্রন্থ ও বহু পদ রচনা করেছিলেন। এই সমস্ত কারণে তাঁর ধর্মমত-সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত উক্তি করা সহজ নয়। মনে হয়, এই বিষয়ে শাস্ত্রী-মহাশয়ের অভিমতই সর্বাধিক যুক্তিপূর্ণ। তিনি মনে করেন যে সাধারণ স্মার্তব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মতই তিনিও ছিলেন পঞ্চোপাসক অর্থাৎ গণেশ, সূর্য, শিব, বিষ্ণু ও দুর্গা —সকলকেই সমানভাবে পূজা করতেন।

বিদ্যাপতির ধর্মমত

বিদ্যাপতি বহু গ্রন্থপ্রণেতা হ'লেও যেহেতু বাঙলাদেশে তাঁর ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদাবলীই প্রচলিত এবং যেহেতু ব্রজবুলি ভারতের কোন অঞ্চল-বিশেষের নিজস্ব ভাষা নয়, এই কারণে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাপতির পদাবলীগুলিই মাত্র আলোচ্য হওয়া সঙ্গত। মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি কীভাবে বাঙলাদেশের হৃদয় অধিকার করলেন, তৎ-সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মনে একটি জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হ'য়ে থাকে। অনুমান হয়, বাঙলাদেশে মুসলমান-অধিকার বিস্তৃত হবার বহুকাল পর পর্যন্তও মিথিলা স্বাধীন হিন্দুরাজ্যরূপেই বর্তমান ছিল। তাই স্বধর্মাশ্রয়ী উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অনেকেই ঘনিষ্ঠভাবে মিথিলার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা ক'রে চলতেন। তা' ছাড়া মিথিলা সমসাময়িকযুগে ন্যায়শাস্ত্র-চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল বলে বহু বাঙালী মিথিলায় ছাত্রজীবন অতিবাহিত করতেন। তাদের মুখে মুখেও বিদ্যাপতির পদগুলি বাঙলাদেশে এসে থাকতে পারে। বিদ্যাপতির অব্যবহিত পরবর্তীকালেই মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বিদ্যাপতির মধুর পদ আস্বাদন করতেন, বৈষ্ণব সমাজে বিদ্যাপতির প্রচারের এটিও অন্যতম কারণ। সর্বোপরি দীর্ঘকাল বাঙলাদেশ ও মিথিলা একই সাম্রাজ্যের অধীন ছিল, অতএব তাদের মধ্যে একটা সহজ ঐক্যবোধের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়।

মিথিলার সঙ্গে বাঙলার যোগ

বিদ্যাপতির রচিত পদের ভাষা ব্রজবুলি। তিনি মৈথিলী ভাষাতেও কিছু কিছু পদ রচনা করেছিলেন—এরূপ কিছু পদ স্যর জর্জ গ্রীয়ার্সন আবিষ্কার ও প্রকাশ করেছেন। এক সময়ে কেউ কেউ ধারণা করতেন যে, ব্রজবুলি ভাষায় বিদ্যাপতির যে সকল পদ প্রচলিত আছে, তা মূলে মৈথিল ভাষাতেই রচিত হয়েছিল। এ বিষয়ে নগেন্দ্র গুপ্ত মহাশয় লিখেছেন, "বিদ্যাপতি খাঁটি মৈথিলীতেই পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন। বাঙলাদেশে ঐগুলি বিকৃতরূপ ধারণ করিয়া বাঙলা ভাষার কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। ঐ বিকৃত রূপই ব্রজবুলি নামে পদ-রচনার ভাষারূপে চলিয়াছে।" ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনও মোটামুটিভাবে এই অভিমত সমর্থন করেছেন। কিন্তু এই অভিমত গ্রহণ করায় বিপদ আছে ; কারণ, বিদ্যাপতির সব পদই যদি মৈথিলী ভাষায় রচিত হতো, তবে মিথিলায় অন্তত ঐ সমস্ত পদের মূলরূপ পাওয়া

যেতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্যর জর্জ গ্রীয়ার্সন বহু চেষ্টায় যে স্বল্প কয়টি পদ সংগ্রহ করেছেন, গুণের বিচারে এগুলি ব্রজবুলি পদ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। বিকৃত পদগুলি মূল থেকে উৎকর্ষ লাভ করবে, এই মত অশ্রদ্ধেয়। যদি লোকমুখেই কবিতাগুলি বিকৃত হ'তো তবে বিভিন্ন কবিতার রূপে কোন সাদৃশ্য ও সঙ্গতি থাকত না। কিন্তু বাস্তবে অন্যরূপই দেখা যায়। পদাবলীগুলি থেকে যে ব্রজবুলির পরিচয় পাওয়া যায়, তার মূলে সুষ্ঠু ব্যাকরণ-সঙ্গত কাঠামো বর্তমান। — কোন বিকৃত ভাষায়ই এরূপ ঘটনা ঘটতে পারে না। বাঙলাদেশের বাইরে উড়িষ্যা এবং আসামেও ব্রজবুলি ভাষায় যে সকল পদ রচিত হয়েছিল, তাদের কাঠামোও বাঙলাদেশের ব্রজবুলি থেকে অভিন্ন। অতএব, মৈথিলী ভাষা বিকৃত হ'য়ে ব্রজবুলি ভাষায় পরিণত হ'য়েছে, এরূপ অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। এই কারণে ব্রজবুলিকে স্বাধীনভাবে উৎপন্ন একটি ভাষা বলেই গ্রহণ করতে হয়। অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ব্রজবুলি কখনও ভারতের কোন অঞ্চলের কথ্যভাষা ছিল না, সাহিত্যিক ভাষারূপেই এর সৃষ্টি ও পুষ্টি। কেউ কেউ অনুমান করেন যে ব্রজের বুলি বলেই এর নাম ব্রজবুলি। কিন্তু এটি ব্রজের বুলি বা 'ব্রজভাষা' থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক ভাষা।

ব্রজবুলি

বস্তুত ব্রজবুলি কথাটিও খুব প্রাচীন নয়, অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেই এব উদ্ভব হয়। মূল শব্দটি সম্ভবত 'ব্রজাওলি' অর্থাৎ ব্রজ-সম্পর্কিত। সম্ভবত উনিশ শতকের পূর্বে কথাটির প্রচলন ছিল না; ব্রজধামের কাহিনী (রাধা-কৃষ্ণ কাহিনী) এই ভাষায় রচিত হয়েছিল বলেই 'এর নাম ব্রজবুলি, — এই অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নাও হতে পারে। ডঃ সুকুমার সেন প্রথমে অনুমান করেছিলেন, ''এই আধা-বাঙলা আধা মৈথিল রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক পদাবলীর ভাষা ব্রজবুলি নামেপরিচিত।'' কিন্তু মণীন্দ্রমোহন বসুই প্রথম প্রমাণ করেন যে, বাঙলা ভাষার কিংবা মৈথিল ভাষার সঙ্গে জন্মসূত্রে ব্রজবুলি ভাষার কোন সম্পর্ক নেই। তাঁর মতে, কৃত্রিম সাহিত্য ভাষা 'অবহট্‌ঠ' থেকে এই সাহিত্য-ভাষা ব্রজবুলির উদ্ভব। ডঃ সুকুমার সেনও পরে এই অভিমত সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ব্রজবুলির বীজ হইতেছে 'লৌকিক বা অর্বাচীন অবহট্‌ঠ। ... ব্রজবুলির বীজ লৌকিকের। ইহা অঙ্কুরোগদ্‌ম হয় মিথিলায় এবং প্রতিরোপ হয় বাঙ্গালায়।'' বাঙলাদেশে ব্রজবুলি ভাষায় রচিত যশোরাজ খানের যে পদটিকে ('এক পয়োধর চন্দন লেপিত'...) প্রাচীনতম বলে অনুমান করা হয়, তার ভণিতায় হোসেন শাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। অতএব এটি ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রচিত হ'য়েছিল, অনুমান করা চলে। প্রায় একই সময়ে উড়িষ্যাতেও রায় রামানন্দ 'পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল' নামক চৈতন্য-আস্বাদিত পদটি রচনা করেন। এর কিছুকাল পর আসামেও শঙ্করদেব স্বাধীনভাবে ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেন। ত্রিপুরার রাজা ধন্যমাণিক্যের (১৪৯০-১৫২২ খ্রীঃ) সভাকবি রাজপণ্ডিত জ্ঞানও ব্রজবুলিতে একটি পদ রচনা করেন। এই ধারা বাঙলাদেশে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমান বেগে চলছিল। এমন কি আধুনিক যুগেও রবীন্দ্রনাথ 'ভানুসিংহ' ছদ্মনামে ব্রজবুলি ভাষায় কয়েকটি সার্থক পদ রচনা করেছেন।

বিদ্যাপতি ব্রজবুলি ভাষার প্রথম কবি বলেই হোক, অথবা তাঁর অসাধারণ খ্যাতির জন্যই হোক, ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদমাত্রই যে বিদ্যাপতির, এরূপ একটা মনোভাব লক্ষ্য করা

যায়। তাই কাব্য-বিশারদের সংস্করণে বিদ্যাপতির পদের সংখ্যা দুই শতের কম হওয়া সত্ত্বেও নগেন্দ্রনাথের সংস্করণে তা প্রায় সহস্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এই পদগুলির অধিকাংশই যে কোন-না-কোন বাঙালী কবির রচনা, তা'তে সন্দেহ মাত্র নেই। উদাহরণ-স্বরূপ বিদ্যাপতির নামে প্রচারিত কয়েকটি প্রসিদ্ধ পদের কথা উল্লেখ করা চলে। সপ্তদশ শতকের শেষে রচিত 'অষ্টরস ব্যাখ্যায়' 'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর' কবিতাটি শেখরের (কবিশেখর) ভণিতায় পাওয়া যায়। অথচ এটি বিদ্যাপতির নামেই চলছে। 'রসকদম্ব'-প্রণেতা কবিবল্লভ-রচিত 'কী পুছসি অনুভব মোয়' কবিতাটিও বিদ্যাপতির নামেই প্রচারিত হ'য়ে থাকে। 'ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোন অনুসরই' নামক প্রসিদ্ধ পদটির রচয়িতাও বিদ্যাপতি ন'ন, বিদ্যাবল্লভ নামক কোন কবি। এইভাবে দেখানো যেতে পারে যে, কবিকণ্ঠহার, নৃপ-বৈদ্যনাথ, চম্পতি, ভূপতি প্রভৃতি বহু বাঙালী কবিরই ব্রজবুলি ভাষায় রচিত বহু কবিতা বিদ্যাপতির নামে প্রচারলাভ করেছে। সতীশচন্দ্র রায় 'বিদ্যাপতি বিচার' নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, বিদ্যাপতির নামে প্রচারিত অন্তত ২৬টি পদ আসলে বাঙালী কবি রায়শেখর-রচিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে যে বাঙলাদেশেও বিদ্যাপতি-উপাধি-ধারী একজন কবি পরবর্তীকালে ব্রজবুলি ভাষায় বহু পদ বচনা ক'রেছিলেন। ইনি শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন অথবা ছোট বিদ্যাপতি। এর রচিত বহু পদও বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত রয়েছে। ফলত, আদি বা মৈথিলকবি বিদ্যাপতির ('সপ্রক্রিয় সদুপাধ্যায় ঠক্কুর শ্রীবিদ্যাপতি') পদগুলি বাছাই করা দুরূহ ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যাপতি-বাহুল্যের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ কেউ কেউ বিদ্যাপতি নামক কোন কবির অস্তিত্বও স্বীকার করতে রাজি ন'ন। কিন্তু এটিও একপ্রকার চরম অভিমত, কারণ, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যে বিদ্যাপতির পদ আস্বাদ করতেন, কবিরাজ গোস্বামীর এই সাক্ষ্যকে কিছুতেই উপেক্ষা করা চলে না। অতএব সিদ্ধান্ত করা চলে, মৈথিলকবি বিদ্যাপতিই আদি কবি; বাঙলাদেশেও বিদ্যাপতি উপাধিধারী অপর একজন পরবর্তী কালের বিদ্যাপতিও ছিলেন; সংগ্রহকর্তা কীর্তনীয়াদের দৌলতে বিভিন্ন কবিদের ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদও বিদ্যাপতির নামে চলেছে; কোন কোন কবি আপনার রচনাকে অমর ক'রে রাখবার ইচ্ছায় ভণিতায় বিদ্যাপতির নাম ব্যবহার করে থাকতে পারেন।

বিদ্যাপতির সমস্যা: (১) বিদ্যাপতির খ্যাতি বিস্তৃতি

(২) বিদ্যাপতির বহুত্ব

বিদ্যাপতির কাব্য প্রতিভা।। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বিদ্যাপতির পদ আস্বাদন করতেন — বিদ্যাপতির কবি-প্রতিভার এটি এক অখণ্ডনীয় প্রমাণ: সংস্কৃত ভাষায় হ'লেও বাঙালী কবি জয়দেবই সর্বপ্রথম বৈষ্ণব পদ রচনা ক'রেছিলেন, কিন্তু তাঁর পদ কান্ত-কোমল হওয়া সত্ত্বেও মনে হয় উত্তরকালে বিদ্যাপতিই অধিকতর অনুকরণযোগ্য ব'লে বিবেচিত হ'য়েছিলেন। জয়দেব ও বিদ্যাপতি উভয়ের রচনায় কয়েকটি সাধারণ ধর্ম বর্তমান—উভয়েই দেহবিলাস এবং সম্ভোগ-বর্ণনার কবি। সম্ভবত উভয়েই রাজসভার কবি ছিলেন বলেই তাঁদের রচনায় আধ্যাত্মিকতা আরোপ করতে হয়, আসলে তা' দেহাসক্তিই বটে। তবে এও সত্য যে, আসলে

সৌন্দর্য-প্রীতির জন্যই তাঁরা দেহ-বর্ণনায় উপর এত গুরুত্ব দান করেছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই রূপাসক্তি ভোগাসক্তিকে অতিক্রম ক'রে গিয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাসের রচনার সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যাবে যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র তুলনায় বিদ্যাপতি-জয়দেবের রচনা কত মার্জিত, অগ্রাম্য ও শ্লীলতাপূর্ণ। বস্তুত, সম্ভোগ বর্ণনাও তাঁদের রচনায় এক কল্পজগতের বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যাপতি ও জয়দেব এই পর্যন্তই সদৃশ, এর পরই মনে হয় বিদ্যাপতি জয়দেবকে অতিক্রম ক'রে গিয়েছেন। জয়দেব রাধাকৃষ্ণের লীলার অংশমাত্র, তাঁদের যৌবন-বিলাসের কয়েকটি দিনের চিত্রমাত্র অঙ্কন করেছেন; আর বিদ্যাপতির রচনায় রাধাকৃষ্ণের লীলাবৈচিত্র্য পরিপূর্ণভাবে রূপলাভ করেছে। প্রেমোন্মেষ থেকে প্রেমের চরম পরিণতি পর্যন্ত স্তরে স্তরে বিভিন্ন অবস্থা-বর্ণনাতেও বিদ্যাপতি অনুপম কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। বিদ্যাপতি-বর্ণিত প্রেম অতি জটিল এবং মনস্তত্ত্বসম্মত। তিনি একে কেবল একটি জৈবিক বৃত্তি-মাত্র বলে মনে করেন নি, তাই তাঁর অঙ্কিত প্রেমের সঙ্গে জড়িয়ে আছে লজ্জা, ভয়, ঈর্ষা, ছলনা, উদ্বেগ, হর্ষ-আদি বিভিন্ন মানসিক বৃত্তি। "বিদ্যাপতির রাধা অল্পে অল্পে মুকুলিত বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। সৌন্দর্য ঢল ঢল করিতেছে। শ্যামের সহিত দেখা হয় এবং চারিদিকে যৌবনের কম্পন হিল্লোলিত হইয়া উঠে। খানিকটা হাসি, খানিকটা ছলনা, খানিকটা আড়চক্ষে দৃষ্টি। ... আপনাকে আধখানা প্রকাশ এবং আধখানা গোপন, কেবল উদ্দাম বাতাসের একটা আন্দোলন অমনি খানিকটা উন্মেষিত হইয়া পড়ে।" (রবীন্দ্রনাথ)। "বিদ্যাপতি এইভাবে তূলিকায় বিচিত্র বর্ণাধার থেকে এক একবার রঙ্ নিয়ে একটু একটু ছোঁয়াচ্ছেন, দেখছেন, আবার ছোঁয়াচ্ছেন এবং এইভাবেই পূর্ণতা দান করেছেন। এইজন্যই "ছন্দ, সঙ্গীত এবং বিচিত্র রঙে বিদ্যাপতির পদ এমন পরিপূর্ণ, এইজন্য তাহাতে সৌন্দর্য-সুখ-সম্ভোগের এমন তরঙ্গলীলা।" (রবীন্দ্রনাথ) বিদ্যাপতি প্রধানত সম্ভোগরসের কবি, তাঁর কাব্যে প্রেমের যে জীবন্ত রূপ ধরা পড়েছে, তা' ব্যক্তিসত্তার ঊর্ধ্বে সার্বজনীন অনুভূতি-লোকে উন্নীত হ'বার দাবি রাখে বলেই বিদ্যাপতিব প্রেম একান্তভাবে বৈষ্ণবোচিত না হওয়া সত্ত্বেও বৈষ্ণবজনের অন্তরের বস্তু। বিদ্যাপতি রাধিকার বিচিত্র অনুভূতির কথা প্রকাশ করলেও বিরহ-বেদনা এবং মিলনোল্লাস-বর্ণনাতেই যেন আপনাকে অতিক্রম ক'রে গেছেন। গীতিকাব্যের প্রাণরূপে পরিচিত ভাবাবেশ এখানেই সর্বাধিক গভীর। বিদ্যাপতির কাব্যে এই ভাবসমাবেশের জন্যই মহাপ্রভু অকৃপণভাবে সেই রস-উপলব্ধির সুযোগ পেয়েছিলেন। আজ ভারতের সর্বত্র তিনি বৈষ্ণব পদাবলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা-রূপেই কীর্তিত হ'য়ে থাকেন।

বিদ্যাপতির রচনা বৈশিষ্ট্য ও কাব্যবিচার

বিদ্যাপতির কাব্য-আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁর ব্যক্তি-জীবনের পরিবেশ থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখা সঙ্গত নয়। তাঁর রচনার দোষ-গুণ, কৃতিত্ব-অকৃতিত্ব প্রভৃতির জন্য সমভাবে দায়ী তাঁর জীবন-পরিবেশ। মনে রাখতে হ'বে বিদ্যাপতি পুরুষানুক্রমে এবং নিজের জীবনের সুদীর্ঘকাল মিথিলার রাজসভার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর কব্যে বারবারই তা ফুটে ওঠে এই সত্য যে তিনি রাজসভার কবি। বাঙলা ভাষার প্রথম কাব্য 'চর্যাপদ' একেবারেই

গ্রামীণ পরিবেশে রচিত হ'য়েছিল। পরবর্তী কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' কোন ধর্মীয় পরিবেশ পরিচয় পাওয়া না গেলেও তা' যে কোন ভাবেই গ্রাম্যতার উর্ধ্বে উঠতে পারেনি, এ সত্য অনস্বীকার্য। বাঙলা সাহিত্য যদি এই ধারাকেই অনুসরণ করতো, তবে তার পুষ্টি এবং পূর্ণতাসাধন নিঃসন্দেহে অনেক বিলম্বিত হ'তো। কিন্তু আমাদের ভাগ্যক্রমে পরবর্তী বাঙলা সাহিত্য আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিল গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনের রাজসভার কবি জয়দেব গোস্বামী এবং মিথিলারাজ শিবসিংহের সভাকবি বিদ্যাপতি ঠাকুরকে। রাজসভার কবি বিদ্যাপতি শুধু যে তাঁর নিজের রচনাকেই একটা বিশিষ্ট সাহিত্যমানে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিলেন তা নয়, তার প্রভাবে পরবর্তী বাঙলা সাহিত্যও গ্রাম্যতার উর্ধ্বে উঠবার অবকাশ পেয়েছিল।

রাজসভার কবি বিদ্যাপতি

এ বিষয়ে অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্যের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "সাম্প্রদায়িক কারণে বৈষ্ণবেরা জয়দেব ও বিদ্যাপতির সাধকত্ব প্রচার করিলেও ভুলিলে চলিবে না যে ইঁহাদের কেহই আধ্যাত্মিক কারণে লেখনী ধারণ করেন নাই। রাজার নর্মবিলাসের সহচর হিসাবে রাজার ও সভাসদ্‌দিগের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যেই ইহাদের কাব্যরচনা। যুবতী নারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য বর্ণনাও প্রধানতঃ প্রাচীন সংস্কৃত কবিতা হইতে নহে, জয়দেব ও বিদ্যাপতির রচনা হইতেই বৈষ্ণব পদাবলীতে আসিয়াছে। ... বিদ্যাপতির দেহ-বর্ণনার প্রধান উদ্দেশ্য দেহকে উপলক্ষ্য করিয়া বিচিত্র সৌন্দর্যের সৃষ্টি—বহুক্ষেত্রে রূপাসক্তি ভোগাসক্তিকে অতিক্রম করিয়াছে। ইঁহাদের সম্ভোগ বর্ণনাও যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইতর নহে, তাহা যে মার্জিত, অগ্রাম্য ও শিল্পসৌন্দর্যযুক্ত, তাহা বুঝা যায় বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র সম্ভোগচিত্রের সহিত তুলনায়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র রাধাকৃষ্ণ সত্যকার বাস্তব জগতের দেহসর্বস্ব মানুষ, তাহাদের ইন্দ্রিয়ভোগ শ্লীলতাবর্জিত লালসাপূর্ণ পাশবিক ব্যাপার। কিন্তু জয়দেব-বিদ্যাপতির বর্ণনায় সম্ভোগচিত্র হইয়া উঠিয়াছে কল্পজগতের বা ভাববৃন্দাবনের ব্যাপার। সেখানে দ্বন্দ্ব সংশয় বাধাবিপত্তির বাস্তবতা নাই। সে জগৎ চিরবসন্ত ও চিরযৌবনের অমরাবতী — সেখানের নায়ক-নায়িকা রাধাকৃষ্ণ ছায়াশরীরী, তাহাদের দেহবিলাসের সৌন্দর্যরসই মুখ্য, লালসা গৌণ।

বাঙলা সাহিত্যে বিদ্যাপতির অন্তর্ভুক্তি। বিদ্যাপতি বাঙালী ছিলেন না; তিনি সংস্কৃত, মৈথিলী, অবহট্‌ঠ এবং ব্রজবুলি ভাষায় বহু গ্রন্থ এবং পদ রচনা করলেও বাঙলা ভাষায় কিছুই লেখেন নি—অতএব বাঙলা সাহিত্যে তাঁর অন্তর্ভুক্তি নিয়ে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু বিষয়টি একটু গভীরভাবে অনুধাবন্ করলে একাধিক দিক থেকেই তাঁর এই যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা যায়। বাঙলা সাহিত্যে বিদ্যাপতির অন্তর্ভুক্তির প্রথম এবং প্রধান কারণটি পারিবেশিক। বিদ্যাপতি বিহারের যে অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই অঞ্চলটি দীর্ঘকাল ছিল গৌড়বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত—মিথিলার রাজধানী দ্বারবঙ্গের নাম থেকেই এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মিথিলা যখন পৃথক্ রাজ্য ছিল, তখনও এটি ছিল বাঙলার সন্নিহিত অঞ্চল—শিক্ষা-সংস্কৃতির ব্যাপারে উভয়ের সম্পর্ক ছিল অতি

পারিবেশিক কারণ

ঘনিষ্ঠ। অতএব ভাষার ব্যবধান বাঙালী ও মৈথিলীদের মধ্যে কোন দূরত্বের সৃষ্টি করতে পারেনি। বিশেষতঃ উভয় ভাষার মধ্যে পার্থক্যও তেমন দুস্তর নয়। অতএব বিদ্যাপতির পক্ষে বাঙালীর আপনজন হওয়াতে কোন বাধার সৃষ্টি হ'বার কথা নয়।

দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যাপতি যে বাঙালী ছিলেন না, দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই বোধও আমাদের ছিল না। এমন কি বিগত শতাব্দীতেও তাঁর জীবনী-রচনা প্রসঙ্গে লেখা হ'য়েছিল যে বিদ্যাপতি যশোহর জেলার বড়নাটোরের অধিবাসী এবং তাঁর প্রকৃত নাম বসন্ত রায়। মিথিলায় তিনি বিগত চারশত বৎসর প্রায় অখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। উনিশ শতকের শেষ পাদেই বৈষ্ণবগণ আবিষ্কার করেন যে বিদ্যাপতি বাঙালী ছিলেন না, তিনি ছিলেন মিথিলার অধিবাসী। অতএব দীর্ঘকাল যাবৎ বাঙালী-বোধে বিদ্যাপতির কাব্যের রসাস্বাদনে বাঙালী পাঠক যে তৃপ্তি লাভ ক'রে আসছেন, বিদ্যাপতির মৈথিলী-পরিচয় ভবিষ্যতেও আর বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি।

তৃতীয়তঃ, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বিমুগ্ধচিত্তে বিদ্যাপতির পদের রস আস্বাদন করতেন—ভাষার পার্থক্য তাতে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারেনি, ফলতঃ চৈতন্যভক্ত সাধারণ বাঙালীর নিকটও বিদ্যাপতি চিরকালই গ্রহণযোগ্য হ'য়ে রইলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় পদ-কীর্তনকে তাদের ধর্ম-সাধনার অঙ্গ বলে মনে করেন। অতএব স্বয়ং চৈতন্যদেব যাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, সেই বিদ্যাপতি যে বাঙালীর আপনজন হ'য়ে উঠবেন, তা' তো একান্ত স্বাভাবিক। বিদ্যাপতির মৈথিলী-পরিচয় জানা সত্ত্বেও তাঁর কাব্যের রস-আস্বাদনে কারো কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়নি।

চতুর্থতঃ, বিদ্যাপতি যে ভাষায় পদ রচনা করেছেন, সেই 'ব্রজবুলি' বাঙালীর যেমন স্বাভাবিক ভাষা নয়, তেমনি মৈথিলীদেরও নয়। সম্ভবতঃ বিদ্যাপতির সমকাল থেকেই বাঙলায়ও ব্রজবুলি ভাষার চর্চা আরম্ভ হ'য়েছিল এবং বহু বাঙালী কবিই ব্রজবুলি ভাষায় অসংখ্য পদ রচনা ক'রে গেছেন। তাদের অনেকের অনেক পদই বিদ্যাপতির নামেই প্রচলিত হ'য়ে গেছে। অতএব এইসব কবির পদ বাঙলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারলে বিদ্যাপতির পদের অন্তর্ভুক্তিতে বাধা কোথায়?

পঞ্চমতঃ, রসনিষ্পত্তিই যেখানে সাহিত্য-ব্যাপারে শেষ কথা, সেখানে ভাষার প্রশ্নটিই গৌণ। ভারতচন্দ্রের উক্তি উদ্ধার ক'রে বলা চলে, "যে হোক সে হোক ভাষা কাব্য রস লয়ে।" অতএব বিদ্যাপতির কাব্যে যে রসের আমন্ত্রণ রয়েছে, যুগ যুগ ধরে বাঙালী তারি আকর্ষণে কবি বিদ্যাপতিকে আপনার অন্তরের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। উপরে যে কারণগুলি উল্লেখ করা হ'লো তার বাইরেও একশ একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যেখানে পূর্বোক্ত যে কোন একটি কারণই বাঙলা সাহিত্যে বিদ্যাপতির অন্তর্ভুক্তির পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হ'তে পারে, সেখানে অধিক কারণের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

প্রধানত রসসম্ভোগের কবি বলে পরিচিত হ'লেও বিদ্যাপতি যে শান্তরসাশ্রিত প্রার্থনা পদাবলী রচনা করেছিলেন, সাহিত্যকীর্তি হিশেবে এবং সাধক-ভাবুকচিত্তে অপার্থিব রসের উদ্বোধনে এদের স্থানও অতি উচ্চে। বিদ্যাপতির রচনার সর্বত্র ঐশ্বর্যের প্রকাশ ঘটলেও অন্তত

'প্রার্থনা'র কবিতাগুলিতে যে আত্মদৈন্য, আত্মনিবেদন এবং ঈশ্বরভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তা একমাত্র চণ্ডীদাসের পদাবলীর সঙ্গেই তুলনীয় হ'তে পারে।

শান্তরস

রূপের আরাধনা করতে করতে একসময় বিদ্যাপতি অরূপের সন্ধান লাভ করলেন, রূপরসিক কবি সাধকচূড়ামণি-পদে উন্নীত হলেন।

[ছয়] কৃত্তিবাস ঃ রামায়ণ

জাতির জীবনে যখন জাগরণ ঘটে, তখন জাতি আপনাকে প্রকাশ করবার জন্য ব্যাকুল হ'যে উঠে। বাঙলায় তুর্কী-আক্রমণের ফলে যে যুগান্তরকাল দেখা দিয়েছিল, সুদীর্ঘকাল পর তার অবসান ঘটল, বাঙলায় নবজাগরণ দেখা দিল। সদ্য-জাগরিত জাতির তখন নোতুন উদ্যম, সম্মুখে নোতুন আশা। একটা কিছু করবার প্রেরণা তাকে পেয়ে বসেছে। কিন্তু তখনও বাঙলা ভাষা আড়ষ্টতা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারেনি। নোতুন কিছু ক'রে ওঠার পক্ষে এই ভাষাই প্রধান অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ালো। কিন্তু এতে নিরাশ হবারও হেতু নেই। আমাদেব পূর্বপুরুষগণ সংস্কৃত সাহিত্যে যে অমূল্য ভাণ্ডার রেখে গেছেন, তা' থেকে নতুনভাবে আহরণ করবার মত রত্নের অভাব নেই।

অনুবাদ সাহিত্য

অতএব, অতি সঙ্গত কারণেই, যুগান্তর কালের অবসানে সংস্কৃত সাহিত্যকেই অনুবাদ ক'রে বাঙলায় প্রকাশ করবাব ঝোঁক প্রবল হ'য়ে উঠল। সঞ্চয় সামান্য অথচ আশা অপরিমিত, এই অবস্থায় অনুবাদসাহিত্য-রচনায় উভয়কূল রক্ষিত হ'লো। এইভাবেই বাঙলার প্রথম অনুবাদ-সাহিত্য কবি কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ-পাঁচালী' রচিত হলো।

সংস্কৃত সাহিত্যে কবিগুরু বাল্মীকিকে 'আদিকবি' বলে অভিহিত করা হয়। বাঙলা-সাহিত্যেও প্রকৃতপক্ষে রামায়ণ-অনুবাদক কৃত্তিবাস 'আদিকবি' অভিধার যোগ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কৃত্তিবাস-সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কোন কিছু বলা সম্ভব নয়।

কৃত্তিবাস আদি-মধ্য যুগের কবি এবং তিনি চৈতন্যদেবের পূর্বেই বর্তমান ছিলেন, এই অভিমত সর্বথা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হ'য়ে থাকে। কিন্তু এ অভিমতকে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করবার পক্ষে একটি প্রবল বাধা এই যে, চৈতন্যজীবনীকারদের মতে চৈতন্যদেব জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস আদির কাব্যপাঠে আনন্দ লাভ করতেন অথচ এ প্রসঙ্গে তাঁর নিকট প্রতিবেশী নবদ্বীপের নিকটবর্তী ফুলিয়ার কৃত্তিবাসের মত কবির অথবা তাঁর কাব্যের অনুল্লেখ তাৎপর্যময়। নানাভাবে এর ব্যাখ্যাদানের চেষ্টা হওয়া সত্ত্বেও কোন ব্যাখ্যাই যথার্থ সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হ'তে

কৃত্তিবাসের আত্মজীবনী

পারে না। তবে চৈতন্য-জীবনীকার জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যে কৃত্তিবাস এবং তাঁর কাব্যের উল্লেখ করেছেন। বৃন্দাবন দাসও স্বীকার করেছেন যে, তৎকালে রামায়ণের প্রভূত প্রচলন ছিল। যা' হোক, সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত কৃত্তিবাস-সম্বন্ধে এর অধিক কিছু জানবার উপায় ছিল না। মাত্র বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে প্রাচ্যবিদ্যা- মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু এবং ডঃ দীনেশ

চন্দ্র সেন বলেন যে হারাধন দত্ত ভক্তনিধি নামক জনৈক ভদ্রলোক কৃত্তিবাসী রামায়ণের ১৪৩২ শকাব্দের (১৫০০ খ্রীঃ) পাণ্ডুলিপি থেকে কৃত্তিবাসের আত্মজীবনীমূলক কিছুটা রচনা উদ্ধার করেছেন। কিন্তু পুথিখানির পরবর্তীকালে আর কোন সন্ধান পাওয়া না যাওয়ায় উক্ত আত্মজীবনীমূলক রচনাটির প্রামাণিকতা স্বীকৃত হয় নি। তারপর, যখন ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী ভিন্নসূত্রে প্রাপ্ত কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে উক্ত অংশটি প্রকাশ করলেন, তখনই মনীষীদের ঐ দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। অতঃপর কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে আত্মজীবনীর আরও কিছু অংশ পাওয়া গেল। সাধারণভাবে পণ্ডিতমহলে এই আত্মজীবনী প্রামাণিক বলে স্বীকৃত হলেও ডঃ সুকুমার সেন এখনও সংশয়ান্বিত। তাঁর ধারণা, এতে কুলজী-বিশারদদেরও কিছুটা হাত থাকতে পারে। ডঃ মণীন্দ্রমোহন বসুই এই আত্মজীবনী-সম্বন্ধে সর্বাধিক কঠোর মন্তব্য জ্ঞাপন করেছেন। তাঁর মতে "এই তথাকথিত আত্মবিবরণী অবিশ্বাস্য এবং জাল। কৃত্তিবাসের বহু পরবর্ত্তীকালে কেহ রচনা করিয়া ইহা কৃত্তিবাসের নামে চালাইয়াছেন।" যাবৎ অপর কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হস্তগত না হয়, তাবৎ মনীন্দ্রবাবুর এই চরম অভিমতকেও মেনে নেওয়া সহজ নয়। অতএব কৃত্তিবাসের জীবনীর নিশ্চিততর উপকরণ লাভ না করা পর্যন্ত আমরা প্রচারিত আত্মজীবনীতেই আস্থা স্থাপন করবো।

কৃত্তিবাস আত্মজীবনীতে বলেছেন যে তাঁর পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা পূর্ববঙ্গের দনুজ (অথবা বেদানুজ) নামক রাজার পাত্র ছিলেন। অতঃপর পূর্ববঙ্গে বিপর্যয় দেখা দিলে তিনি পূর্ববঙ্গ ত্যাগ ক'রে গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এই বংশের বনমালী ওঝার পুত্র কবি কৃত্তিবাস। তিনি তাঁর জন্মদিন, বিদ্যাশিক্ষা এবং রাজদর্শন সম্বন্ধে বলেন ঃ

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ (পুণ্য?) মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।।...
এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ।।..
তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার।
যথা যথা যাই তথা বিদ্যার বিচার।।...
বিদ্যাসাঙ্গ করিতে প্রথমে হৈল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ঘরকে গমন।।...
রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে।
পঞ্চ শ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে।।...
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ।।...

মাত্র বার বৎসর বয়সে কৃত্তিবাস 'বিদ্যার উদ্ধার' করবার জন্য বড় গঙ্গা (পদ্মা?) পার হ'য়ে উত্তর দেশে গেলেন। তারপর তথায় বিদ্যালাভ ক'রে তিনি রাজা গৌড়েশ্বরের দরবারে উপস্থিত হ'য়ে সাতটি বা পাঁচটি শ্লোক উচ্চারণ ক'রে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। গৌড়েশ্বর কবির কবিত্ব-দর্শনে সন্তুষ্ট হ'য়ে তাঁকে পুষ্পমাল্য এবং 'পাটের পাছড়া' দিয়ে

পুরস্কৃত করলেন। তারপর তাঁর আজ্ঞায় কবি রামায়ণ রচনা করলেন। কবির 'আত্মপরিচয়' শীর্ষক অংশে আপনার বংশ পরিচয়, পরিবেশ-পরিচয় এবং আপনার শিক্ষাদীক্ষা আদি-সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বহু তথ্য পরিবেশন করেছেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, আপনার জন্মতারিখ-সম্বন্ধে তিনি মাস-বার-তিথি উল্লেখ করলেও শকাব্দটি সম্বন্ধে একেবারে মৌনী। আবার গৌড়েশ্বরের সভা এবং সভাসদ্‌দের নামধাম-পরিচয়-সম্বন্ধেও অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু গৌড়েশ্বরের নামটি উল্লেখ করেন নি। প্রাপ্ত তথ্যের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার দ্বারা আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় জ্যোতিষিক গণনায় স্থির করেছিলেন যে ১৩৫৪ শকের (১৪৩২-৩৩ খ্রীঃ) ২৯শে মাঘ রবিবার শ্রীপঞ্চমীর দিন কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এর সমীচীনতা সম্বন্ধে অনেক আপত্তি উত্থাপিত হ'য়েছে। কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের রাজসভার বর্ণনা দান করেছেন, তা' কোন হিন্দুরাজার হ'বারই সম্ভাবনা। কিন্তু ১৪১৫ খ্রীঃ-১৪১৮ খ্রীঃ রাজা গণেশ গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, এ ছাড়া কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানেও গৌড়ের সিংহাসনে অপর কোন হিন্দুরাজার সন্ধান পাওয়া যায় না। আচার্য যোগেশচন্দ্রের গণনার তারিখ মানতে হলে এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান কষ্টকর হ'য়ে উঠে। অতঃপর আচার্য 'পূর্ণ' স্থলে 'পুণ্য' পাঠ গ্রহণ করে আবার বিচার ক'রে স্থির করলেন, ১৩২০ শকাব্দে (১৩৯৮-৯৯ খ্রীঃ) ১৬ মাঘ রবিবার শ্রীপঞ্চমী তিথিতে কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। এই তারিখটিকে গ্রহণ করলে গৌড়েশ্বর রাজা গণেশের রাজসভায় কবি কৃত্তিবাসের উপস্থিতি সম্ভবপর হ'তে পারে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ডঃ ভট্টশালী প্রভৃতি এই অভিমতের পরিপোষক। কিন্তু যে সকল মনীষী উক্ত গৌড়েশ্বরকে রাজা গণেশ বলে মানতে রাজি নন, তাঁরা আচার্য রায়ের প্রথমোক্ত অভিমতেরই সমর্থক। তাঁদের কেউ মনে করেন, গৌড়েশ্বরকে রাজা গণেশ পুত্র রাজা যদু বা জালালুদ্দিনকে বোঝায়, কেউ বা তাহিরপুরের কংসনারায়ণের কথা উল্লেখ করেন। ডঃ সুকুমার সেন বলেন যে 'গৌড়ের অধিকারী' (শহর কোতোয়াল) সুবুদ্ধি রায়ের সভায়ই কৃত্তিবাস উপস্থিত হয়েছিলেন। এই সুবুদ্ধি রায়ের অধীনস্থ দারোগা হোসেন খাঁ 'হোসেন শাহ্' হ'য়ে গৌড় অধিকার করলে সুবুদ্ধি রায়ের সভাসদগণ হোসেন শাহের গৌড়দরবারে আসন গ্রহণ করেন। বসন্তরঞ্জন রায়ের মতে গৌড়েশ্বর আসলে তাহিরপুরের কংসনারায়ণ। তাঁর এবং হোসেন শাহের দরবারে উল্লিখিত ব্যক্তিদের অনেককেই পাওয়া যায়। এই হিশেবে কৃত্তিবাসের জন্ম ১৪৩৩ শক ধরা চলে। কৃত্তিবাস তাঁর পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝার পৃষ্ঠপোষক যে রাজার কথা উল্লেখ করেছেন, তাঁর সম্বন্ধেও মতভেদ বর্তমান। ইনি পূর্ববঙ্গের সেন বংশীয় দনুজমাধব (১২৮০ খ্রীঃ) হ'তে পারেন, কিংবা চট্টগ্রামের দনুজমর্দন (১৪১৭ ১৪১৮ খ্রীঃ) হতে পারেন। এমন কি দনুজমর্দন নাকি রাজা গণেশও হ'তে পারেন। এ সকল অনুমানারণ্যের মধ্য থেকে কৃত্তিবাস এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষক গৌড়েশ্বরকে উদ্ধার করা সহজ নয়। কিন্তু যেহেতু আচার্য রায়ের দ্বিতীয়বারে গণনার সঙ্গে গৌড়ের একমাত্র হিন্দু রাজা গণেশের কাল মিলে যায়, এইহেতু অপর কোন প্রবলতর প্রমাণের অভাবে, ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দেই কৃত্তিবাসের জন্মকাল বলে গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত।

আত্মজীবনী পরিচয়

কৃত্তিবাসের কাল

কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাণ্ডুলিপির অভাব নেই; কারণ, মনে হয়, বহুকাল পূর্বেই কৃত্তিবাসের রামায়ণ সারা বাঙলায় বহুল প্রচার লাভ করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কৃত্তিবাসী রামায়ণের কোন প্রাচীন পাণ্ডুলিপির সন্ধান এতাবৎকাল পাওয়া যায় নি। বর্তমান কালে যে আকারে কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাজারে প্রচলিত রয়েছে, তাতে আদি-মধ্য-যুগের ভাষার ছিঁটে-ফোঁটাও অবশিষ্ট আছে কিনা সন্দেহের বিষয়। নকলকারক, লিপিকর এবং গায়েনদের কল্যাণে মূল গ্রন্থের অনেক পরিবর্তন সাধিত হ'য়েছে। তাই অতি সঙ্গত কারণেই হীরেন্দ্রনাথ দত্ত দীর্ঘকাল পূর্বে রামায়ণ-সমূহের প্রামাণিকতায় দৃঢ় সংশয় পোষণ করেছিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রাচীনতম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮০৩ খ্রীঃ। তখনই লোকের মুখে মুখে মূলের ভাষা অনেকখানি বিকৃত হয়েছিল। তা' ছাড়া, গ্রন্থটি যখন প্রথম সম্পাদিত হয়, তখন সম্পাদকও এর উপর কিছু মাজা-ঘষা ক'রে কাব্যটিকে কিছুটা আধুনিক রূপ দান করেছিলেন। পরবর্তী কালে আরও বিভিন্ন সম্পাদকের হাতে পড়ে গ্রন্থটির রূপ আমূল পরিবর্তিত হ'য়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। কেউ কেউ আশঙ্কা করেন, বর্তমান প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে হয়তো কৃত্তিবাসের নাম ছাড়া তার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। প্রথমদিকে পাঁচালী-গায়কগণ যেমন ইচ্ছামত কাব্যের ভিতর নিজেদের রচনা চালিয়ে দিয়েছেন, পরবর্তীকালে সম্পাদকগণও তেমনি রুচি ও আধুনিকতার দোহাই দিয়ে পরিবর্তন সাধন করেছেন। ফলত, অধুনা প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণেরও কৃত্তিবাসের নাম-মাত্রই সার। মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রচেষ্টায় এক সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর পক্ষ থেকে কৃত্তিবাসের কাব্যেব মূল উদ্ধার করবার আয়োজন হ'য়েছিল। তার ফলে বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে কৃত্তিবাসী রামায়ণের অযোধ্যা ও উত্তরকাণ্ড প্রকাশিত হয়। উত্তর কাণ্ডটি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে অনুলিপি-কৃত বলে অনুমিত পুঁথি অবলম্বনে রচিত হলেও পণ্ডিতমণ্ডলী উক্ত কাণ্ড দুইটির প্রামাণিকতা অস্বীকার করেন। উত্তরকালে ডঃ ভট্টশালী কৃত্তিবাসী রামায়ণের মূল উদ্ধার ক'রে একটি প্রামাণিক সংস্করণ রচনায় ব্রতী হ'য়েছিলেন—এর অংশবিশেষ প্রকাশিত হ'য়েছিল। ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "ভট্টশালী মহাশয় যে প্রাচীনতর আদর্শ ঠিক করিয়াছেন, তাহাকে কাব্যের মূল রূপ বলা চলে না, তাহা composite text মাত্র।" অর্থাৎ বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির উৎকৃষ্ট অংশগুলির সঙ্কলন মাত্র এই খণ্ড। কিন্তু ডঃ ভট্টশালীর অকালমৃত্যুর জন্য সেই প্রচেষ্টাও খণ্ডিত রইলো। ফলত, বাজার-প্রচলিত সংস্করণই 'কৃত্তিবাসী সংস্করণ' বলে প্রচারিত হ'য়ে আসছে।

কৃত্তিবাসেব রচনায় প্রক্ষেপ

রামায়ণের আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বতঃই একটি প্রশ্ন মনে উদিত হয় : — রামায়ণ নামে প্রচলিত গ্রন্থটির প্রামাণিকতা যখন সন্দেহাতীত নয় তখন এর আলোচনার সার্থকতা কোথায়? এর উত্তরে বলা চলে যে, মূল সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারতের গ্রন্থকর্তৃত্ব নিয়েও যখন প্রচুর সংশয়ের অবকাশ রয়েছে, তখনও এর রসাস্বাদনে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। তবে আর অনুবাদের ক্ষেত্রে আপত্তি উত্থাপন ক'রে লাভ কি? বিশেষত প্রাচীন কালের যে সমস্ত কাব্যকে জনসাহিত্য বলে আখ্যাত করা চলে, তাদের মধ্যে কালে কালে বহু রচনাই প্রক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। একমাত্র ব্যক্তিবিশেষের রচিত সাহিত্যে, যেখানে ব্যক্তিমানসের ছায়াপাত

ঘটতে পারে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই রচনা-বিশুদ্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন হয়। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারত-আদি মহাকাব্য যদি ব্যক্তিবিশেষের দ্বারাও রচিত হ'য়ে থাকে, তবু এগুলি প্রকৃতিতে নৈর্ব্যক্তিক। তাই কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রক্ষেপ-বাহুল্য থাকলেও তার আলোচনায় আপত্তি থাকবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। এই প্রাপ্ত কাব্যের ভিত্তিতেই মহাকবি কৃত্তিবাসের প্রতিভা বিচার করা হ'বে।

আলোচনার উপযোগিতা

আমরা রামায়ণকে 'মহাকাব্য' রূপে অভিহিত করলেও কাব্যকার কৃত্তিবাস স্বয়ং একে 'পাঁচালী' বলে অভিহিত করেছেন। মধ্যযুগের বহু কাব্যই 'পাঁচালী' নামে অভিহিত হলেও বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য-আদি 'লৌকিক পাঁচালী' থেকে 'রামায়ণ-পাঁচালী' অনেকাংশে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র। রামায়ণ-মহাভারত-আদি গুরুগম্ভীর ভাবযুক্ত সাহিত্যকে 'পৌরাণিক পাঁচালী' নামে আখ্যায়িত করা উচিত। প্রায় সমশ্রেণীর আর একপ্রকার জনসাহিত্যও ঐ কালে প্রচলিত ছিল, তাদের 'ধামালী' নামে অভিহিত করা হয়। বড়ু চণ্ডীদাস-রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ঐরূপ 'ধামালী সাহিত্যে'র অন্তর্ভুক্ত। এই ধামালীর সঙ্গে পাঁচালী কাব্যের পার্থক্যটি বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন। ধামালীও জনসাহিত্য, প্রধানত গ্রাম্য জনগণের ইতর রুচির পরিপোষকতার জন্যই ঐ প্রকার ধামালীর সৃষ্টি হ'য়েছে। ধামালীতে কাহিনী আছে, কিন্তু তা' অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন পাত্রপাত্রীদের উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়েই পরিবেশিত হয়। ধামালী নৃত্য-গীত-অভিনয়সহ আসরে প্রচারিত হয়। এতে যে রস পবিবেষণ করা হয়, তা' অতিশয় স্থূল, গ্রাম্য, কুরুচিকর এবং কখনও কখনও অশ্লীল। পক্ষান্তরে পাঁচালী-সাহিত্যে কবিই কাহিনী পরিবেষণ করে থাকেন। এর বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য, মহান আদর্শ, পূতচরিত্র নায়ক নায়িকার সমাবেশ একে সমাজের অতি উচ্চস্তরে স্থান দান করেছে। এইদিক দিয়ে লৌকিক পাঁচালী থেকেও পৌরাণিক পাঁচালীগুলির স্থান অধিকতর উচ্চে।

পাঁচালী

কৃত্তিবাসী রামায়ণের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য। বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণ মহাকাব্য-জাতীয় গ্রন্থ; কৃত্তিবাস যদি এর হুবহু অনুবাদ করতেন, তবে হয়তো তাঁর বামায়ণকেও 'পাঁচালী' না বলে 'মহাকাব্য' নামেই আখ্যায়িত করতেন। কিন্তু তিনি যা' রচনা কবেছেন, তা' অনুবাদ হলেও আক্ষরিক নয়, ভাবানুবাদ তথা বিষয়ানুবাদ মাত্র। রামায়ণের মূল কাহিনীকেই তিনি গ্রহণ করেছেন; তবে মূল গ্রন্থের বহু অংশই তিনি বর্জন করেছেন, আবার অনেক অংশ সংযোজনও করেছেন।

কৃত্তিবাস গ্রহণ-বর্জনেব মাধ্যমে বাল্মীকির রামায়ণ মহাকাব্যকে যে বাঙলা 'বামায়ণ পাঁচালী'তে পরিণত করেছেন, তাতে তাঁব প্রতিভার মৌলিকত্বই প্রমাণিত হয। তিনি মূল রামায়ণের প্রধান কোন্ কোন্ বিষয় বর্জন করেছেন এবং বাঙলা বামাযণে নতুন কোন্ কোন্ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তার একটা সাধারণ তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো। — কার্ত্তিকেব জন্ম, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিসম্বাদ, বিশ্বামিত্র কাহিনী, অম্বরীষের যজ্ঞানুষ্ঠান, রামচন্দ্র-কর্তৃক আদিত্যহৃদয়

স্তোত্রপাঠ, মহাকাব্যের বর্ণনা-গাম্ভীর্য, এমন কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা এবং বিভিন্ন তত্ত্বকথা কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে বর্জন করেছেন। তিনি যখন বাল্মীকির অনুসরণ করেছেন, তখন অনেক সময়ই উল্লেখ করেছেন —

"বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
পাঁচালী প্রবন্ধে রচে বেদ রামায়ণ।। "

অপর যে সমস্ত সূত্র থেকে কৃত্তিবাস নতুন কোন উপাদান আহ্‌রণ করেছেন, অনেক সময় তিনি সেই সকল সূত্র উল্লেখ করেছেন যেমন —

'এ সব গাহিল গীত জৈমিনি ভারতে।'

কিংবা 'নাহিক এ সব কথা বাল্মীকি রচনে।
বিস্তারিয়া লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে।।'

কৃত্তিবাস যে সমস্ত কাহিনী ভিন্ন সূত্র থেকে আহরণ করেছেন, তাদের মধ্যে আছে— রত্নাকর দস্যুর কাহিনী, হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান, দিলীপের অশ্বমেধ যজ্ঞ, রঘুর দিগ্বিজয়, অজবিলাপ, গণেশের জন্ম, কৈকেয়ীর বরলাভ, গুহকের মিতালী, তরণীসেন কাহিনী, অহিরাবণ-মহীরাবণ-বৃত্তান্ত, রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব, রাবণের চণ্ডীপাঠ অশুদ্ধকরণ, হনুমান-কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ লাভ, রাবণ কর্তৃক রামচন্দ্রকে রাজনীতি শিক্ষাদান, লবকুশের যুদ্ধ প্রভৃতি বিস্তর কাহিনী। এইগুলি বিভিন্ন সূত্র থেকে আহৃত। সব কাহিনীর সকল সূত্র পাওয়া যায় না। জৈমিনি ভারত, অদ্ভুত রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, যোগবাশিষ্ট রামায়ণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, দেবীভাগবত, কালিকা পুরাণ, স্কন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণ, অন্যান্য পুরাণ ও কিছু লোকশ্রুতি থেকে এবং সম্ভবতঃ কতকটা কল্পনার সাহায্যেও কৃত্তিবাস কিছু কিছু মৌলিক কাহিনী সংযোজন করেছেন।

ভিন্ন সূত্র থেকে উপাদান গ্রহণ

কৃত্তিবাস গ্রন্থ-রচনা-কালে সম্ভবত যুগ-প্রবৃত্তির দিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন। বাঙলাদেশে তখন নিশীথের অন্ধকার, শিক্ষা-সংস্কৃতি, বিদ্যা-বৈদগ্ধ্য কোন দিক থেকেই আলোর স্ফুরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল না। এই অবস্থায় কৃত্তিবাস সম্ভবত বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছিলেন প্রাচীন যুগের মহান্ আদর্শের দিকে। রামায়ণের কাহিনী, রামলক্ষ্মণাদির চরিত্র, পিতৃভক্তি, পত্নীপ্রেম, ভ্রাতৃস্নেহ-আদি বাঙালীর সম্মুখে আদর্শরূপে বিরাজমান থেকে বাঙালীকে আত্মজাগরণে উদ্বুদ্ধ করবে, সম্ভবত কৃত্তিবাসের এইটুকুই ছিল আশা। তাই তিনি রামায়ণের দার্শনিক তত্ত্ব কিংবা তাত্ত্বিক বাদবিতণ্ডা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবর্ণনা, বিচিত্র অলঙ্কার-সমারোহ ইত্যাদি যতখানি সম্ভব এড়িয়ে চলেছিলেন। 'কৃত্তিবাস পণ্ডিত' যে ইচ্ছা করলে মূল রামায়ণের সামগ্রিক সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রেখে তা' অনুবাদ করতে পারতেন না, তা' বিশ্বাস করা যায় না। অতএব অনুমান করতে হচ্ছে, কৃত্তিবাস ইচ্ছা করেই অনুবাদকে মূলানুগ করেন নি। এমন কি, যখন তিনি রামলক্ষ্মণাদির চরিত্র অঙ্কন করেছেন, তখনও যুগের প্রভাবে তাদের চরিত্রকে নতুনভাবে

যুগপ্রবণতা

রূপায়িত করেছেন। এ বিষয়ে অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্যের কিছু অভিমত উদ্ধারযোগ্য। তিনি বলেন, "কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাত্র-পাত্রী পুরাতন পৌরাণিক চরিত্র হইলেও বাংলায় তাহাদের নবজন্ম হইয়াছে; তাহারা আচারে-ব্যবহারে ভাবে ভঙ্গীতে যথার্থ বাঙালী। কৃত্তিবাসী রামায়ণের দশরথ বাঙ্গালারই স্ত্রৈণ বৃদ্ধ, রাম পত্নীগতপ্রাণ বাঙালী যুবক, সীতা লজ্জাবনতা বাঙালী বধূ, রাবণ বাঙলারই লম্পট দুর্বৃত্ত এবং মুনিঋষিরা ভীরুঔদারিক বাঙালী ব্রাহ্মণ; মূল রামায়ণের ক্ষত্রিয় বীর্য, ব্রাহ্মণ্য তেজ, বাগ্‌যত প্রেম, নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা ও অন্তর্গূঢ় ভক্তি রামায়ণে অনুপস্থিত; তৎ-পরিবর্তে ইহাতে দেখা দিয়েছে বাঙালীর জাতীয় ভাবপ্রবণতাদি ভীরুতা, বাগ্‌যুদ্ধ, স্থূল পরিহাস ও ইনাইয়া বিনাইয়া ক্রন্দন। দোষে-গুণে সমস্ত বঙ্গীয়তা নিঃশেষে প্রকাশিত হইয়াছে এই কাব্যে।" শুধু এ সমস্ত দিক্ থেকে নয় —খুঁটিনাটি বর্ণনা দিতেও কৃত্তিবাস বাঙালীর অন্দর মহলে প্রবেশ করেছেন। বিভিন্ন সূত্রে খাদ্য তালিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন — সরুচাকলি, পুলি পিঠে, মুগের সাম্‌লী, মতিচুর, মণ্ডা, মনোহরা প্রভৃতি, শাক-সূপ-ভাজা ঝোল অম্বল প্রর্ভৃতির কথা, তিনি বলেছেন, বাংলার সারস, কাক, কাদাখোঁচা, চিল, ফিঙে প্রভৃতি পাখির কথাও। বাঙলার প্রধান খাদ্য ভাত এখানেও স্থান পেয়েছে। এমনকি কি বাটা-ভরা গুয়া-পানও বাদ যায়নি।

কৃত্তিবাসের বাঙালীয়ানা

চবিত্রসৃষ্টিতেও তিনি বাঙালীয়ানা নিয়ে এসেছেন। শুধু রামাদি প্রধান চরিত্রগুলিই নয়, রামায়ণের অধিকাংশ চবিত্রই, এমন কি মুনিঋষিরাও যেন সমসাময়িক যুগের প্রতিনিধিরূপে কৃত্তিবাসী রামায়ণে আবির্ভূত হয়েছেন। বাল্মীকির সেই মহাবাহু, বৃষস্কন্ধ রামচন্দ্র কৃত্তিবাসের হাতে নবনীকোমল দেহের অধিকারী। শুধু বীর্যবত্তার বিচারেই নয়, ধর্মভাবেও সমকালীন বাঙালীর ভক্তিভাব প্রবলভাবে বিভিন্ন চরিত্রকে অধিকার করেছে, শত্রুমিত্র আর ভেদজ্ঞান করেনি। হয়তো পরবর্তীকালের চৈতন্য -প্রভাব এতে সংক্রামিত হ'য়েছে। বাঙালী-চরিত্রের সাধারণ দোষগুণ, তাদের আচার-আচরণ, তাদের জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য সমস্তই কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রকট। মূল বাল্মীকির রামায়ণে সমসাময়িক ভারতীয় জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে অথবা অঞ্চলবিশেষের প্রভাব পড়েছে কিনা, জানিনা; তবে কৃত্তিবাসী-রামায়ণ যে বাঙালীর জাতীয় জীবনের দর্পণ-স্বরূপ, তা' অস্বীকার করবার উপায় নেই। ফলত, রামায়ণ-অনুবাদে যদি বা কৃত্তিবাসের অক্ষমতা প্রকাশ পেয়ে থাকে, তবে তা' শতগুণে পুষিয়ে গেছে কৃত্তিবাসের মৌলিকতায়। তাঁব রামায়ণ অনুবাদ নয়, মৌলিক রচনার স্বাদযুক্ত। কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুকরণ নয়, নূতন সৃষ্টি। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি স্মরণীয় ঃ "মূল রামায়ণকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর হাতে রামায়ণ স্বতন্ত্র মহাকাব্য হইয়া উঠিয়াছে। এই বাংলা মহাকাব্যে বাল্মীকির সময়ের সামাজিক আর্দশ রক্ষিত হয় নাই। ইহার মধ্যে প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজই আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে।"

কৃত্তিবাস তাঁর কাব্যে যা রচনা করে গেছেন পরবর্তীকালে তা'তে যে আরও অনেক কাহিনী যুক্ত হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা চলে যে বাঙলাদেশে

চৈতন্যদেবের প্রভাব বহু বিস্তৃত হবার পরই হয়তো কৃত্তিবাসী রামায়ণে বৈষ্ণব-শিরোমণি 'তরণীসেনের কাহিনী' যুক্ত হয়েছিল। এবং সম্ভবত এর প্রতিক্রিয়া রূপেই আরও পরবর্তীকালে কোন শাক্ত কবি-কর্তৃক রামায়ণে 'রামচন্দ্র-কর্তৃক দুর্গাপূজার কাহিনী' সংযুক্ত হয়েছিল। এরূপ আরও কোন কোন কাহিনী পরবর্তীকালে যুক্ত হ'য়ে থাক্‌তে পারে। লক্ষ্য করবার বিষয়, পূর্ববঙ্গে প্রাপ্ত পুথিগুলিতে এরূপ সংযোজিত উপকাহিনীর পরিমাণ অনেক কম। এরূপ বহু পুথিতেই তরণীসেন বধ, দুর্গাপূজা এবং রাবণের রামস্তব-আদি কাহিনী অনুপস্থিত দেখা যায়। কবিচন্দ্র নামক জনৈক কবির ভণিতায় প্রাপ্ত কোন কোন পুথিতে আবার এইসব কাহিনী বর্তমান। কাজেই অনুমান করা চলে অপর কোন কোন কবির রচনাও কৃত্তিবাসী রামায়ণের অঙ্গীভূত হয়েছে। কৃত্তিবাস -ভণিতাযুক্ত কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকারও সন্ধান পাওয়া যায়। এদের মধ্যে 'যোগ্যদ্যার বন্দনা','শিবরামের যুদ্ধ', 'রুক্মাঙ্গদরাজার একাদশী'র নাম উল্লেখ করা যায়। অনুমান, অল্পতব খ্যাত কোন কবি হয়তো আপনার অক্ষম রচনাকে চিরস্থায়ী করবার অভিপ্রাযে তা' কৃত্তিবাসেব নামে চালিয়ে দিয়েছেন।

কাব্যের রূপভেদ

কৃত্তিবাসের জনপ্রিয়তা। বামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত পুরাণ—মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে অনুবাদ গ্রন্থরূপে এগুলিই সমধিক প্রসিদ্ধ এবং এদের প্রতিটিই বহু ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনুবাদ করা সত্ত্বেও জনপ্রিয়তার দিক্ থেকে কৃত্তিবাসী বামায়ণের স্থানই যে সর্ব্বোচ, তা' নিঃসন্দেহে অনুমান করা যেতে পারে। বাঙলা সাহিত্য গ'ড়ে ওঠার প্রথম যুগে কৃত্তিবাসই সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম অনুবাদ কার্যে অগ্রসর হ'য়েছিলেন, তাই পথ প্রদর্শকরূপে তিনি কিছুটা অতিরিক্ত মান্যতা লাভের অধিকারী হ'লেও এটিকেই তাঁর জনপ্রিয়তার একমাত্র কাবণরূপে গ্রহণ করা চলে না।

মহাদেবেব জটাজাল থেকে গঙ্গাকে মুক্ত ক'রে তাঁকে পৃথিবীর বুকে বইয়ে দিয়ে ভগীরথ যেমন সমতলবাসীদের পিপাসা-নিবৃত্তির ব্যবস্থা ক'রেছিলেন, মহাকবি কৃত্তিবাসও তেমনি সংস্কৃত ভাষাব কঠোব শৃঙ্খলে আবদ্ধ অমৃতোপম রাম-কাহিনীকে স্বচ্ছন্দ গতিতে মাতৃভাষায় বইযে দিযে কোটি কোটি বাঙালীর রসপিপাসাকে তৃপ্ত ক'রেছিলেন। তৎকালে মুষ্টিমেয় সংস্কৃত পণ্ডিত ব্যক্তি ব্যতীত অপর কারো পক্ষে রামায়ণের স্বাদ গ্রহণ ছিল অসম্ভব। মহাকাব্য-পুবাণাদি গ্রন্থ মাতৃভাষায শ্রবণ ছিল শাস্ত্রনিষিদ্ধ। মহাকবি কৃত্তিবাসই বোধ হয় সর্বপ্রথম এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য কবে সাধারণ মানুষের কৃতজ্ঞতাভাজন হ'য়েছিলেন।

কৃত্তিবাস যেকালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন জাতির জীবনে সেই কালটি ছিল প্রায়ান্ধকার যুগ। বিদেশি-বিভাষী-বিধর্মী তুর্কী-পাঠানদের রাজনৈতিক খেয়োখেয়ি সমগ্র সমাজ জীবনের সামনে যেন মূর্তিমতী বিভীষিকারূপে বর্তমান ছিল। সুদীর্ঘ নিষ্ক্রিয়তার পর জাতি সবে জাগতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু সদ্যজাগ্রৎ জাতির সামনে কোন মহৎ উচ্চ আদর্শ নেই। জাতির জীবনেব এই সঙ্কটময় মুহূর্তে রামায়ণের পুণ্য প্রদীপ হস্তে অবির্ভূত হ'লেন সত্যকবি

কৃত্তিবাস। রামায়ণের পরম পবিত্র গার্হস্থ্য-জীবনের কাহিনীতে বাঙালী আপন জীবনের প্রতিফলন দেখতে পেলো। রামায়ণের রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-সীতা হনুমান প্রভৃতির চরিত্রে বাঙালী মহৎ জীবনের উচ্চ আদর্শের স্বরূপ দেখতে পেলো। কাজেই অতি স্বাভাবিক কারণেই বাঙালী কৃত্তিবাসকে আপনজন-রূপে গ্রহণ করে নিয়েছে।

কৃত্তিবাস যদি বাল্মীকির রামায়ণ হুবহু অনুবাদ করতেন, তবে তিনি এত জনপ্রিযতা পেতেন না, তিনি মূল রামায়ণকে ঢেলে সাজিয়েছেন। সমসাময়িক সমাজজীবনের প্রেক্ষাপটে বাঙালী জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান ক'রে তিনি রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্রগুলিকেই শুধু রূপায়িত করেন নি, মূলের বহু কাহিনী বর্জন ক'রে এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে নতুনতর বহু কাহিনী সংযুক্ত ক'রে ও সর্বত্র বাঙালী ভাবের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তিনি তাঁর বাঙলা রামাযণকে সাধারণ বাঙালীর নিকট গ্রহণোপযোগী ক'বে তুলেছিলেন। এ ছাড়াও তাঁর রচনায ইতস্ততঃ এমন অনেক বিষয় ছড়িয়ে রেখেছেন যাতে বাঙালী মাত্রই আনন্দ লাভ কবতে পারে। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, "এই সমস্ত উদাহরণ আলঙ্কাবিক নিপুণতা বাগ্‌ভঙ্গীর তির্যকতা — সর্বোপরি পৌরাণিক বাধা। পথের আলঙ্কারিক কৌশলের সহিত বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনচিত্র মিশ্রিত হইয়া বক্তব্যকে তীক্ষ্ণতর করিয়াছে। .. কৃত্তিবাসেরই অলঙ্কার সন্নিবেশ শুধু কৃত্রিম গতানুগতিক চিত্র গৃহীত হয় নাই, বাঙলাদেশেব দৈনন্দিন জীবনও কাব্যে স্থান পাইয়াছিল। এইজন্যই কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙলাদেশে এত অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে।"

[সাত] মালাধর বসু ঃ শ্রীকৃষ্ণবিজয়

বাঙলা সাহিত্যের আদি-মধ্য যুগে বিভিন্ন সংস্কৃত মহাকাব্য এবং পুরাণ-অনুবাদেব যে প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল, তাব অনাতম সার্থক পরিণতি মালাধর বসু-কৃত ভাগবত পুরাণের অনুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয' ('গোবিন্দবিজয়' বা 'গোবিন্দমঙ্গল') গ্রন্থে। সদ্য জাগরিত বাঙালীর সম্মুখে একটি আদর্শ কাহিনী ও চবিত্র-পরিবেষণের তাগিদেই হয়তো কবি এই অনুবাদ-প্রচেষ্টায় ব্রতী হযেছিলেন। বাঙলাদেশে তখন বিদেশি বিধর্মী এক ভিন্ন জাতির শাসনকর্তা বর্তমান, জাতির জাগরণের জন্য তাই এমন এক মহান আদর্শ পুরুষের চিত্র উপস্থাপনা দরকার, যিনি সর্বতোভাবে জাতিব জীবনে প্রেরণা জোগাতে পারবেন। এ বিষয়ে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ

ভাগবতেব অনুবাদ

পুরুষ, তাতে সন্দেহ কি? 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং ন চ পূর্ণঃ নচাংশকঃ' – কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান তিনি পূর্ণাবতারও নহেন, অংশাবতারও নহেন। অতএব কবি অতি সঙ্গত কারণেই কৃষ্ণ- কাহিনী নির্বাচন করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে কবি দ্বারস্থ হ'লেন 'ভাগবতপুরাণের'। অন্যান্য বহু পুরাণেই কৃষ্ণ-কাহিনী স্থান লাভ করলেও (এমনকি, 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে' এই কাহিনী 'ভাগবতপুরাণ' অপেক্ষা অনেক বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে), প্রামাণিকতায়, প্রাচীনতায় এবং সশ্রদ্ধ রচনার বিচারে ভাগবতপুরাণই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সমগ্র ভাগবতপুরাণ কৃষ্ণের কথায় পূর্ণ নহে, প্রধানত দশম ও একাদশ স্কন্ধেই

কৃষ্ণকাহিনী রূপায়িত হ'য়েছে। আমাদের কবির পক্ষেও তাই ভাগবতপুরাণের দশম এবং একাদশ স্কন্ধই গ্রহণযোগ্য ব'লে বিবেচিত হয়েছে। বস্তুত মালাধর বসু-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' সমগ্র ভাগবতপুরাণের অনুবাদ নহে, দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ মাত্র।

কবিরাজ গোস্বামী-কৃত 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে মালাধর বসুর সশ্রদ্ধ উল্লেখ পাওয়া যায়। স্বয়ং মহাপ্রভু চৈতন্যদেব মালাধর বসুর পৌত্র রামানন্দ বসুকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। এমন কি গুণরাজখান মালাধর বসুর জন্মভূমি কুলীনগ্রামেব প্রতিও মহাপ্রভুর শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না—

'কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্ট ডুরি লইয়া।।
গুণরাজখান কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।
তাঁহা এক বাক্য আছে মহাপ্রেমময়।।'

এই মহাকাব্যটি ছিল 'নন্দনন্দনকৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'— মালাধরের এই উক্তিটির জন্যই মহাপ্রভু তাঁর বংশের নিকট নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছিলেন।

এতদ্ব্যতীত জয়ানন্দ-কৃত 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থেও মালাধর বসুর উল্লেখ পাওয়া যায়। এ থেকে নিশ্চিতভাবে বলা চলে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-কর্তা মালাধর বসু চৈতন্যপূর্বকালে অর্থাৎ আদি-মধ্যযুগে বর্তমান ছিলেন।

১৮৮৭ খ্রীঃ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থ সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। এতে একটা শ্লোক সন্নিবিষ্ট আছে ঃ

'তেরশ পচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চর্তুদশ দুই শকে হইল সমাপন।।'

দুর্ভাগ্যক্রমে কোন প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে কাল-জ্ঞাপক এই শ্লোকটি পাওয়া যায় না বলে কেউ কেউ এর প্রামাণিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করেন। সংশয়ের আরও একটা কারণ বর্তমান। প্রাচীন কোন পুথিতেই এইভাবে সরাসরি শকাব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় না। (আর যদি তারিখটি প্রামাণিক হ'য়ে থাকে, তবে এটিই বাঙলা সাহিত্যে প্রাচীনতম কালজ্ঞাপক উক্তি।) অধিকাংশ ঐতিহাসিক এই কাল জ্ঞাপক পয়ারটি অবলম্বনেই মালাধর বসুর কালনির্ণয় ক'রে থাকেন।

কবি ১৩৯৫ শকাব্দে (১৪৭৩ খ্রীঃ) গ্রন্থারম্ভ করেন এবং ১৪০২ শকাব্দে (১৪৮০ খ্রীঃ) গ্রন্থটি সমাপ্ত হ'য়েছিল। কবি অন্যত্র উল্লেখ করেছেন, —

'গুণ নাই, অধম মুই, নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম, গুণরাজখান।।'

কবির গ্রন্থারম্ভকালে গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন রুকুনউদ্দিন বরবক শাহ্ (১৪৬০-১৪৭৪ খ্রীঃ) এবং সমাপ্তিকালে ছিলেন শামসউদ্দিন য়ুসুফ্ শাহ্, (১৪৭৪ খ্রীঃ --১৪৮১ খ্রীঃ)। উক্ত দুই সুলতানের মধ্যে মালাধর বসুকে কোন্ জন 'গুণরাজ খান' উপাধি দান করেছিলেন, তদ্বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। কেউ কেউ অনুমান করেন যে, কবির

গ্রন্থরচনায় প্রীত হ'য়ে য়ুসুফ শাহ্-ই তাঁকে উক্ত উপাধি দান করেন; আবার কেউ বা অনুমান করেন যে, যেহেতু গ্রন্থের প্রথমদিকের ভণিতায়ও 'গুণরাজ খান' উপাধি পাওয়া যায় তখন নিশ্চিত অনুমান করা চলে, গ্রন্থারম্ভের পূর্বেই রুকনউদ্দিন বারবাক শাহ্ কবিকে এই উপাধি দান ক'রেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আরও একটি অভিমত এই যে, মালাধর বসু যে গৌড়েশ্বরের কথা উল্লেখ করেছেন, তা গৌরবে মাত্র, আসলে তিনি হয়তো কোন হিন্দু জমিদারেরই পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন।

মালাধব বসুর পৃষ্ঠপোষক

কোন মুসলমান সুলতান যে হিন্দুর দেবদেবীর কাহিনী শুনে প্রীত হ'বেন, তেমন আশা কবা যায় না। অতএব, গৌড়েশ্বরের বিষয়ে আলোচনা নিরর্থক। উক্ত অভিমত সন্দেহ মাত্র, কোন যুক্তিসহ প্রমাণ এর পশ্চাতে না থাকায় এই অভিমত গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না।

মালাধর বসু বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ভগীবথ বসু এবং মাতা ইন্দুমতী। কুলজী সাহিত্যের মতে আদিশূরের রাজত্বকালে যে পঞ্চকায়স্থ বাঙলাদেশে এসেছিলেন, তাদের অন্যতম দশরথ বসুই মালাধর বসুর পূর্বপুরুষ। কবি আত্মপরিচয়-দান-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে তিনি ব্যাস-কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হ'য়ে ভাগবত-অবলম্বনে এই 'পাঁচালী কাব্য' রচনা করেন। কবি সর্বত্র কাব্যটিকে 'পাঁচালী' বলে অভিহিত কবেছেন।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে কাব্যখানি সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ নয়। মালাধব বসু ভাগবতপুরাণ থেকে দশম ও একাদশ দুটি স্কন্ধমাত্র গ্রহণ ক'রে অনুবাদ ক'রেছেন। এই অনুবাদও আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ, কোথাও বা অনূদিত সারাংশ মাত্র। তবে প্রয়োজনমত কবি অন্যান্য স্কন্ধ থেকেও উপাদান আহরণ ক'রে কৃষ্ণ-কাহিনীকে পূর্ণতা দান কবতে সচেষ্ট হ'য়েছেন। প্রথম স্কন্ধের বিভিন্ন অধ্যায় থেকে এর কতক অংশ গৃহীত হ'য়েছে। ভাগবতপুরাণ ব্যতীত অন্যান্য পুবাণ থেকেও কবি কিছু কিছু উপকরণ আপনার গ্রন্থে যোজনা ক'বেছেন। যেমন কৃষ্ণেব জন্মের অব্যবহিত পরেই মায়া-কর্তৃক কংসের নিধন-সম্পর্কে ভবিষ্যদ্‌বাণীর কথা ভাগবতপুরাণ, হরিবংশ কিংবা বিষ্ণুপুবাণে নেই। মনে হয় কবি এই অংশ ভবিষ্য-পুরাণ থেকে গ্রহণ করেছেন ; ভাগবতপুবাণ বৈষ্ণবদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থরূপে বিবেচিত হ'লেও বিস্ময়ের বিষয, এতে বাধার কাহিনী নেই, এমন কি তার নামও কোথাও উল্লেখ করা হয় নি। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে যে রাধাব উল্লেখ পাওয়া যায়, সম্ভবত তা' ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ থেকে গৃহীত হ'য়েছে। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কোন কোন পুথিতে শ্রীকৃষ্ণের 'দানলীলা', 'নৌকালীলা'-আদি বর্ণিত হ'যেছে। এই সমস্ত কাহিনী যে শুধু ভাগবতেই অনুপস্থিত তা' নয়, শ্রী কৃষ্ণবিজয়ের কোন কোন পুথিতেও তাদেব উল্লেখ নেই। তাই মনে হয়, ভাগবত-বহির্ভূত যে সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করা হ'যেছে, তাদেব সমগ্র অংশ অথবা একটা বৃহৎ অংশই প্রক্ষিপ্ত। পরবর্তীকালে ভাগবতপুরাণের যে বহুতর অনুবাদ 'কৃষ্ণমঙ্গল' কাহিনীরূপে রচিত হ'য়েছে, সেই সমস্ত গ্রন্থ থেকেও কিছু কিছু অংশ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' সংযোজিত হ'য়ে থাকতে পারে। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র কোন কোন গ্রন্থে

গ্রন্থেব উপাদান ও উৎস

'শ্যামাদাস' নামক ব্যক্তির ভণিতা পাওয়া যায়, উক্ত কবির রচনাও গ্রন্থমধ্যে প্রক্ষিপ্ত হ'য়ে থাকতে পারে। রামায়ণের মতই 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'রও খুব প্রাচীন কোন পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত না হওয়ায় মালাধর বসুর মূল রচনার পরিচয় পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

মালাধর বসু যদি ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ রচনা করতেন, তা'হ'লে তাঁর কাব্যের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে হ'তে পারতো। কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে অনুবাদ হ'লেও আসলে এটি মৌলিক রচনাই। এইহেতু গ্রন্থের উৎকর্ষ-অপকর্ষের দায়িত্বও গ্রন্থকারেরই। পূর্বে বলা হ'য়েছে যে, অনেকটা যুগ-প্রয়োজনেই হয়তো কবি গ্রন্থ-রচনায় উদ্বুদ্ধ হ'য়েছিলেন। অতএব মূল গ্রন্থের যে সমস্ত অংশ কবির উদ্দেশ্য পরিপূরণে সহায়ক হ'তে পারে, কবি সুবিধামত সেই অংশগুলিই গ্রহণ ক'রেছিলেন। সম্ভবত এই কারণেই তিনি মূলের অলঙ্কার-বাহুল্য বা আড়ম্বরপ্রিয়তাকেও বর্জন করেছিলেন। কিন্তু তাই বলে, যারা মনে করেন যে মালাধর বসু কবিত্ব-প্রকাশে সক্ষম ছিলেন না অথবা সক্ষম থাকলেও আগ্রহী ছিলেন না, তাদের উক্তিকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। প্রয়োজনবোধে কবি আপন কবিস্বভাবেরও পরিচয় দিয়েছেন; তবে কোথাও তিনি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেন নি—সর্বদাই সংযম রক্ষা ক'রে চলেছেন। কবি কৃষ্ণের ঐশ্বর্য-প্রকাশেই অধিকতর সচেতন ছিলেন, তাই কৃষ্ণলীলার কোমল কবিত্বময় অংশের প্রতি তাঁব কিছুটা উপেক্ষার ভাবই প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য এই উক্তি থেকে সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হ'বে না যে কবি ভক্ত কিংবা ভাবুক ছিলেন না। বস্তুত, রচনার বহুস্থলে কবির ভক্তি ও ভাবুকতা যথার্থভাবেই প্রকাশিত হ'য়েছে। আত্মনিবেদন ও ভক্তিভাব প্রকাশ করবার জন্য কবি অনেক সময় মূলের বাইরেও চ'লে গেছেন। ভাবুক বাঙালী কবি স্বকল্পিত যশোদা-সম্ভাষণে তাঁর স্বরূপের যথার্থ পরিচয় দিয়েছেন। মালাধর বসু যে কালে গ্রন্থটি রচনা ক'রেছিলেন, অনুমান সেকালে ধামালী-সাহিত্যেরও প্রচলন ছিল। অতএব কৃষ্ণলীলা-বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি রসের ও রুচির বিকার ঘটালেও সমাজে নিন্দিত হ'তেন না। কিন্তু সংযত-স্বভাব কবি এই সুযোগ স্বেচ্ছায় পরিহার ক'রে কাব্যটিকে ইতরতার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' বৈষ্ণবদের গ্রন্থ; পরবর্তীকালে রচিত 'চৈতন্যভাগবতে'ও যে পরিমাণ পরধর্ম-বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে, আশ্চর্যের বিষয়, 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' তা' একান্তভাবে অনুপস্থিত। এতে কবির ধর্মসহিষ্ণুতার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। এতে যে শুধু গোপীদের দ্বারা কাত্যায়নীপূজা করানো হ'য়েছে তা' নয়—স্বয়ং দেবকীও চণ্ডীর পূজা করছেন, দেখা যায়। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব-কর্তৃক বাঙলাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম-প্রচারের পূর্বে যে ক'জন মনীষী তার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন, তাদের মধ্যে মালাধর বসু অন্যতম। মালাধর বসুর এই কীর্তিকে চৈতন্যদেব যথার্থভাবেই পুরস্কৃত ক'রেছেন। বাঙালী-হিশেবে আমরা আরও এক কারণে মালাধর বসুর নিকট ঋণী। তিনিও তাঁর গ্রন্থে কৃত্তিবাসের ন্যায় বাঙালী-জীবনেরই পরিচয় দান করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুগাতিশায়ী পুরুষ হ'লেও তাঁর লীলাবর্ণন-প্রসঙ্গে বাঙালী কবি মালাধর বসু তাঁকে 'বাঙালী'-রূপেই অঙ্কন করেছেন।

কাব্য বিচার

ভাগবত কাব্যের জনপ্রিয়তার অভাব ও কাব্য-বৈশিষ্ট্য। অভিন্ন প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত হ'বার কারণে বাঙলা ভাষায় অনুবাদ-সাহিত্যের সৃষ্টি হ'য়েছিল আদি-মধ্য বা চৈতন্য-পূর্ব যুগেই। অনুবাদকদের মধ্যে রামায়ণকার কৃত্তিবাস এবং ভাগবতকার মালাধর বসুকে নিশ্চিতভাবেই এই যুগে স্থান দান করা হয়। অনেকের মতে মহাভারতের প্রথম অনুবাদও রচিত হ'য়েছিল এই যুগেই। তবে তার নিশ্চিত প্রমাণ এখনো পাওয়া যায় নি। তবে এই ত্রিবিধ কাব্যধারাই যদি আদি-মধ্য যুগে আত্মপ্রকাশ লাভ ক'রে থাকে, তবে বলতে হয়, তিনটি ধারা এ কাল পর্যন্ত পাঠকদের নিকট সম-মর্যাদা প্রাপ্ত হয়নি।

বিস্ময়ের বিষয় এই, কৃত্তিবাস-রচিত রামায়ণ সুদীর্ঘকাল ধ'রে যে ভাবে বাঙালী জনসাধারণের হৃদয়-মন অধিকার ক'রে রয়েছে, মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কিংবা অপর কোন কবিরই 'কৃষ্ণমঙ্গল'-আদি ভাগবতের অনুবাদ সেই জনপ্রিয়তার ধারে কাছেও আসতে পারেনি। এমন কি জনপ্রিয়তায় কাশীরাম দাসের মহাভারতের স্থানও ভাগবতের অনেক উর্ধ্বে। অথচ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-অবলম্বনে যে অসংখ্য বৈষ্ণব পদ রচিত হ'য়েছে, সেগুলি কিন্তু যুগযুগান্তর ধ'রে বাঙালীর হৃদয়ে স্থান লাভ করেছে; পক্ষান্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও মাহাত্ম্য অবলম্বনে রচিত ভাগবতের অনুবাদগুলি হ'য়ে রয়েছে উপেক্ষিত। ভাগবতের জনপ্রিয়তার অভাব অবশ্যই মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টি বিস্ময়কর মনে হ'লেও বিভিন্ন অনুবাদের তুলনামূলক আলোচনায় এবং বাঙালী মানসের বিশিষ্টতা উদ্‌ঘাটনে এই বিস্ময়কর সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়।

অপর অনুবাদের তুলনায় জনপ্রিয়তার অভাব

কুলীন গ্রামে মালাধর বসু বাঙলায় সর্বপ্রথম ভক্তিমূলক কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা করেন। স্বয়ং চৈতন্যদেব মালাধর বসুর এই মহৎ কীর্তিকে সশ্রদ্ধভাবে স্বীকৃতি দান করেছেন। প্রধানতঃ ভাগবতপুরাণের দশম ও একাদশ স্কন্ধ-অবলম্বনে মালাধর তাঁর গ্রন্থ রচনা করলেও প্রয়োজনবোধে ভিন্নসূত্র থেকেও কিছু কিছু উপাদান আহরণ করেছেন। তাঁর গ্রন্থের বিষয় পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের আদ্যলীলা (বৃন্দাবন খণ্ড), মধ্যলীলা (মথুরা খণ্ড) ও অন্ত্যলীলার (দ্বারকা খণ্ড) বিস্তৃত বর্ণনা দান। বৃন্দাবনলীলায় অন্যূন চল্লিশটি অধ্যায়ের মধ্যে মাত্র তিন চারটি অধ্যায়ে গোপীদের প্রসঙ্গ রয়েছে—তাতে শ্রীমতী রাধিকার উল্লেখমাত্র রয়েছে, রাধাকৃষ্ণলীলার বিস্তৃত বর্ণনা নেই। কোন কোন সমালোচক মনে করেন যে মূল ভাগবতের মতই 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' রাধার উল্লেখ ছিল না—'রাধা' পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত হ'য়েছে।

কাব্যেব বিষয়-পরিচয়

চৈতন্যদেবের প্রবর্তনায় বাঙলাদেশে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাতে রাধাকৃষ্ণের যুগললীলারই একচ্ছত্রাধিপত্য; বৈষ্ণব মহাজন পদকর্তাগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে অবলম্বন ক'রে মধুর রসাত্মক যে সকল পদ রচনা করেন, তার মধ্য দিয়েই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনা রূপায়িত হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' -গ্রন্থে শুধু শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলার প্রকাশ রয়েছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আকাঙ্ক্ষিত মধুর মূর্তি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। অতএব গ্রন্থটি ভগবান্

শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক শৌর্যবীর্যের কাহিনীতে পূর্ণ হ'লেও ভক্ত বৈষ্ণব যে এর প্রতি বিশেষ কোন আকর্ষণ বোধ করবেন না — এই অনুমানই একান্ত স্বাভাবিক। অথচ মূল গ্রন্থ 'ভাগবতপুরাণ', 'বিষ্ণুপুরাণ' এবং 'হরিবংশ' এই সমস্ত গ্রন্থে যুগপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের বীর্যমণ্ডিত জীবনকাহিনীর উপরই গুরুত্ব অরোপ করা হয়েছে। এমন কি ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের পুতনা বধ, অঘাসুর, বকাসুর বধের কাহিনীই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হ'য়েছে, সেখানে 'রাধা'র তো নাম-গন্ধই নেই, এমন কি গোপীলীলার পরিসরও অতিবিস্তৃত নয়। কবি মালাধর বসু যথাসম্ভব মূলেরই অনুসরণ ক'রেছিলেন, তাই পরবর্তীকালের ভক্তিপ্রাণ বাঙালীর রুচি রসবোধ তাতে তৃপ্ত হয় নি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, মালাধরবসুর এই কাব্য-প্রচেষ্টার ধারাটি আর পরবর্তীকালে অনুসৃত হয় নি বলাই সঙ্গত। কৃষ্ণ-জীবন-বিষয়ক সাহিত্যধারা 'কৃষ্ণমঙ্গল' কাব্য বস্তুতঃ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র অনুসারী নয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে — তবে শ্রীচৈতন্যদেব মালাধর বসুকে এত সম্মান জানিয়েছিলেন কেন? তাঁর উত্তরও পাওয়া যাবে কবিরাজ গোস্বামী রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে। কবিরাজ গোস্বামী বলেন যে, মালাধর বসুর গ্রন্থোক্ত একটি উক্তিই চৈতন্যদেবকে উতলা ক'রে তুলেছিল — 'নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' (অপর এক মতে বাক্যটি 'বসুদেব সুত পুত্র মোর প্রাণনাথ') শুধু এই বাক্যটির জন্যই চৈতন্যদেব মালাধর বসুর নিকট নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি যে আগ্রহ নিয়ে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বা রায় রামানন্দের রচনা পাঠ করতেন, মালাধর বসুর রচনায় তার তেমন কোন আসক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। অতএব চৈতন্যদেব যে মনোভাব নিয়ে মালাধর বসুর গুণকীর্তন করেছেন, সাধারণ ভক্ত বৈষ্ণবের সেই দায় ছিল না। এমন কি বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রাধাকৃষ্ণলীলাসূচক হওয়া সত্ত্বেও এই অজুহাতেই গ্রন্থটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়-কর্তৃক পরিত্যক্ত হ'য়েছিল। নতুবা এত দীর্ঘকাল গ্রন্থটি কেন লোকলোচনের অগোচরে ছিল তার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র এই ত্রুটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বলেছেন, "...শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কাহিনীতে আদিরস অপেক্ষা বীররসের প্রাধান্যই অধিক।...ভারতের ঐশ্বর্যাশ্রিত বীররসাত্মক কৃষ্ণলীলায় কৃষ্ণের যে পৌরুষব্যঞ্জক বিরাট চরিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা মাধুর্যভাবের সাধক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তগণের নিকট কিরূপ বোধ হইত, তাহা সংশয়ের বিষয়।"

বাঙালী বৈষ্ণব যখন ভাগবতের কোন অনুবাদকে একান্ত আপন ক'রে গ্রহণ করলো না, তখন সমাজের বৃহত্তর অংশ শাক্তগণ যে এর যথোপযুক্ত সমাদর করবে না এ তো একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। বিশেষতঃ মালাধর বসুর বহু পূর্ব থেকেই বহু শাক্ত মনীষী 'দেবী ভাগবতে'কে মহাপুরাণের অন্তর্ভুক্ত করবার মানসে 'ভাগবতপুরাণে'র প্রামাণিকতায় ছিলেন সন্দিহান।

অতএব বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, একদিকে শাক্ত সম্প্রদায় যেমন শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্যকে গ্রহণ করবার ব্যাপারে আগ্রহহীন, তেমনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণও রাধাবর্জিত কৃষ্ণকাহিনী এবং

কৃষ্ণের ঐশ্বর্যবসের প্রতি আকর্ষণহীনতাহেতু উদাসীন থাকবার ফলেই 'শ্রীকৃষ্ণবিজয' এবং এ জাতীয় ভাগবতের অনুবাদ বাঙালী পাঠকদেব মধ্যে আশানুরূপ জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয নি। এ বিষযে সবচেয়ে বড় কথা, বাঙলার মৃত্তিকার সজলতা এবং বাঙালীর হৃদযেব কোমলতাব জন্য হযতো স্বভাবগতভাবে বাঙালীমন বৈধী ভক্তির প্রতি উদাসীন এবং রাগানুগা ভক্তিব প্রতিই তার আকর্ষণ। তারি ফলে শ্রীকৃষ্ণজীবনের গোপীলীলা-আশ্রিত বৈষ্ণব পদাবলী তার হৃদযেব ধনরূপে গৃহীত হ'লেও শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যমণ্ডিত জীবনকাহিনী-আশ্রিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয' কাব্যের প্রতি সে বিমুখ।

অবশ্য সাহিত্যেব উপভোগ্যতা একান্তভাবে বিষযেব উপব নির্ভবশীল নয। কবিব যদি সাহিত্যবোধ থাকে, সাহিত্যকে যদি তিনি শিল্পে পবিণত কবতে পাবেন, তাহলেও সাহিত্য বসিক পাঠকেব নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হ'তে পাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, মালাধর বসু যত বড় ভক্ত ছিলেন, তত বড় কবি ছিলেন না। তাঁব সমকালীনদেব মধ্যে বিদ্যাপতি, বড়ু চণ্ডীদাস বা কৃত্তিবাস কবিত্বশক্তিতেও শক্তিমান্ ছিলেন। মালাধবেব কাব্যে কবিত্ব এবং শিল্পগুণেবও অভাব লক্ষিত হয। এই সমস্ত কাবণেই ভাগবতেব অনুবাদ জনপ্রিযতা লাভ কবতে পাবেনি।

মঙ্গলকাব্য-সাহিত্য

বাঙলাদেশে মঙ্গলকাব্য-সাহিত্যের উদ্ভব কবে, কোথায় এবং কীভাবে ঘটেছিল, তা আজ আর নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। বস্তুত এই বিষয়ে যে মতারণ্যের সৃষ্টি হ'য়েছে তা' মহারণ্যেরই তুল্য। তা থেকে প্রকৃত সত্যের উদ্ধার সাধন একরূপ অসম্ভব বললেই হয়।

[এক] উদ্ভবের সামাজিক পটভূমি

বাঙলা সাহিত্যের ঊষালগ্নেই যে মঙ্গলকাব্য-সাহিত্যেব উদ্ভব ঘটেছিল, তা' বিশ্বাস করবার সঙ্গত কাবণ বযেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রাবম্ভে মঙ্গলকাব্যেব যে সু-পরিণত রূপ দেখা যায়, তার পেছনে যে দীর্ঘদিনেব প্রচেষ্টা নিহিত ছিল, সাধারণ বুদ্ধিতেই তা' অনুমান করা চলে। তা ছাড়াও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন কয়েকজন মঙ্গলকাব্যকার সুস্পষ্টভাবেই তাদের পূর্বসূরীদের কথা সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করেছেন। তা' থেকেও অনুমান করা চলে যে উক্ত কবিদের দুই এক শতাব্দী পূর্বেই মঙ্গলকাব্যসমূহের পথ-প্রদর্শকগণ আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই হিশেবে তুর্কী আক্রমণের অব্যবহিত পরবর্তী যে কালকে আমরা 'যুগসন্ধিকাল' নামে অভিহিত করেছি, ঐ কালেই বাঙলাদেশে প্রথম মঙ্গলকাব্য-সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটেছিল, এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতে হয়। সিদ্ধান্তটির পরিপোষকতায় আর একটি সুদৃঢ় যুক্তি উত্থাপন করা চলে। তুর্কী-আক্রমণের ফলে দেশব্যাপী যে একটা বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল, তা থেকেও উদ্ধারের কোন উপায় বাঙালীর হাতে ছিল না, এই কারণেই দেশের স্বাধীনতাও বিনষ্ট হ'য়েছিল। অতএব সঙ্গত কারণেই সমসামযিক বাঙালী আপনাদের উদ্ধারের জন্য অপর কোন তৃতীয় শক্তির শরণ গ্রহণ ক'রেছিল। এই তৃতীয় শক্তিই দৈবী শক্তি, বস্তুত, সেই সংস্কারান্ধ মধ্যযুগে দৈবীশক্তিব আনুকূল্য কামনা ছাড়া আব কী ই বা করা চলত। আর ঠিক এই সময়ে বহিঃশক্তির আক্রমণের ফলে, বাঙালী পৌরাণিক আর্য ও লৌকিক অনার্য জাতির মধ্যে একটা সহজ সংমিশ্রণের প্রক্রিয়া চলছিল। বাঙলার অনার্য অধিবাসীরা পুরুষাণুক্রমে প্রাপ্ত ধর্মবিশ্বাস ও দেবতাদের নিয়ে বৃহত্তর হিন্দুসমাজে উন্নীত হ'লে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দৃষ্টিও তৎপ্রতি আকৃষ্ট হ'ল। সুচিকিৎসায় ব্যর্থ হ'লে যেমন জ্ঞানী বিচক্ষণ ব্যক্তিও কখন কখন

মঙ্গলকাব্যের পটভূমিকা

ঝাড়-ফুঁকের শরণ নিয়ে থাকেন, তেমনি পৌরাণিক দেবদেবীর সহায়তা লাভে ব্যর্থ হ'য়ে কিছু উচ্চবর্ণের হিন্দুও যে নবাগত অনার্য লৌকিক দেব-দেবীর কৃপালাভে আগ্রহ বোধ করবেন, এই অনুমান মনস্তত্ত্বসম্মত। সম্ভবত নবাগত দেব-দেবীদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবার অভিপ্রায়েই প্রাগুক্তকালে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য রচনার প্রচেষ্টা শুরু হ'য়েছিল। খুবই সম্ভব, উদ্ভবকালে কোন মঙ্গলকাব্যই পরবর্তীকালের মত স্ফীতকলেবরে রচিত হয় নি। হয়তো তখন ঐগুলি 'পাঁচালী' নামে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারে এবং জটিলতা বর্জিত, সহজ ও সরল কাহিনীর মাধ্যমে বর্ণিত হ'য়েছিল। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালেই ঐ পাঁচালীগুলি উপকাহিনী-সমন্বিত হ'য়ে মঙ্গলকাব্যের রূপ ধারণ করে। বস্তুতঃ মঙ্গল-কাব্যগুলি লৌকিক পাঁচালী-রূপে পরিচিত।

'মঙ্গলকাব্য' বলতে মধ্যযুগের এক বিরাট সাহিত্য-সংসারকে বুঝিয়ে থাকে। এতে একদিকে যেমন অনার্য দেব-দেবীদের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে, তেমনি পরবর্তীকালে কোন কোন আর্য দেব-দেবীও মঙ্গলকাব্যের বিষয়ীভূত হয়েছেন — লৌকিক অনার্য দেবদেবীদের মধ্যে রয়েছেন — 'মনসা, চণ্ডী, ধর্ম, শীতলা, ষষ্ঠী' প্রভৃতি এবং পৌরাণিক আর্যদেবদেবী অবলম্বনে রচিত 'শিব, শ্রীকৃষ্ণ, গঙ্গা, অন্নদা' প্রভৃতি। এমন কি সমসাময়িক যুগের কোন কোন মহাপুরুষের জীবনী অবলম্বন করেও কিছু কিছু মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে — যেমন 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্য। মনে হয়, পরবর্তীকালে বিশেষ কোন অর্থ ব্যতিরেকে গ্রন্থের অভিধায় 'মঙ্গল' শব্দ যুক্ত হতো। আধুনিককালেও তাই 'সারদামঙ্গল' নামক গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। দীর্ঘকাল প্রচলিত থাকবার পর বস্তুবিশেষের একটা goodwill বা ব্যবহার-মূল্য সৃষ্টি হ'য়ে থাকে, পরবর্তী 'মঙ্গলকাব্য'গুলির নামকরণে এই যুক্তি কিছুটা কাজ করতে পারে। কিন্তু গোড়ায় কী কারণে বিভিন্ন কাব্যেব নামকরণে 'মঙ্গল' শব্দ যুক্ত হ'য়েছিল, তার সূত্র নির্ধারণ করা কষ্টকর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, "ব্যক্তিগত কল্যাণ কামনায় দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া যে গান রচিত হয় তাহাকেই 'মঙ্গল' বা 'মঙ্গল গান' বলে।" অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বিস্তৃতভাবে 'মঙ্গল' শব্দের ব্যাখা ক'রে বলেছেন ঃ "মঙ্গলকাব্যগুলি গান করিয়া দেবতার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচার করা হইত। সেই গান একটি বিশেষ রকম সুরে হইত এবং সেই সুরকেও 'মঙ্গল' বলিত। বাঙলা যাত্রা মানে যেমন গান ও গমন উভয়ই, হিন্দিতে তেমনি মঙ্গল মানে মেলা, যাত্রা বা গমন। ... যে গান শুনিলে মঙ্গল হয়, যে গানে মঙ্গলকারী দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারিত, যে গান মেলায় গীত এবং যে গান একদিন যাত্রা করিয়া অর্থাৎ আরম্ভ হইয়া আটদিন ব্যাপিয়া চলে তাহাকেই মঙ্গল গান বলে।" সম্ভাব্য অমঙ্গলের হাত থেকে নিস্তার-মানসে দেবতার মাহাত্ম্য-কীর্তন সম্বলিত গ্রন্থই আদিতে 'মঙ্গল' নামে আখ্যাত হ'য়েছিল, এরূপ অনুমান বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন ব'লেই মনে হয়। গোড়ায় যা'ই হোক না কেন, পরবর্তী কালে যে পারিভাষিক অর্থেই 'মঙ্গল' শব্দটি ব্যবহৃত হ'তো তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'মঙ্গল' শব্দ ও মঙ্গলকাব্যের অর্থ

১. বাঙলা পুরাণ বা জাতীয় মহাকাব্য । প্রাচীনকালে যে-প্রয়োজনে বিভিন্ন সংস্কৃত পুরাণের উদ্ভব হয়েছিল, সেই একই প্রয়োজনের তাগিদেই যে বাঙলা ভাষায় মঙ্গলকাব্যসমূহ রচিত হ'য়েছিল, তা' অনুমান করা চলে। বৈদিক যুগের অবসানে জনসাধারণের মধ্যেও যখন ধর্মচেতনা তথা দেবচেতনার উদ্ভব হয়, বোধ হয় তখনই পুরাণগুলির সৃষ্টি হ'য়েছিল। এই সময় নবাগত বিভিন্ন দেব-দেবীর মাহাত্ম্য-প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পুরাণ রচিত হ'য়েছিল।

নায়ক-নায়িকাগণ নিম্নতর শ্রেণীভুক্ত

বৈদিক দেবতাদের কাল শেষ হ'য়ে এসেছে, নানা কারণেই নোতুন নোতুন দেবতার কাহিনীর উদ্ভব ঘটছে, এই অবস্থায় নিত্য নব পুরাণের সৃষ্টি অস্বাভাবিক ছিল না। কারণ, সমাগত বৈদিক আর্যগণ এদেশে আসবার পর থেকেই স্থানীয় বিভিন্ন প্রাগার্য জাতিসমূহের সঙ্গে প্রথমে সংঘর্ষ এবং পরে সমন্বযের মধ্য দিযে বৈদিক ও প্রাগার্য জাতিসমূহের ভাবধারায় যে নোতুন ধর্মবোধ সৃষ্টি হয়, তারই স্বাভাবিক পরিণতিতে এ জাতীয় পুরাণের আবির্ভাব সম্ভবপর হ'য়েছিল। মধ্যযুগে বাঙলাদেশেও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হ'য়েছিল, যার ফলে নোতুন পুরাণ-রচনার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু পরিবেশের পরিবর্তন ঘটায় এবং জনমানসের সঙ্গে যোগ ঘনিষ্ঠতর হওয়ায় সংস্কৃতে নবপুরাণ রচনার দিনও ফুরিয়ে আসছিল। অতএব নোতুন যুগের পুরাণ 'মঙ্গলকাব্য'গুলি রচিত হ'লো তৎকাল-প্রচলিত বাঙলা ভাষায়। অবশ্য অর্বাচীন পুরাণসমূহেও মঙ্গলকাব্যের কিছু কিছু দেব-দেবী কিছু কিছু স্থান পেয়েছেন। এবারের সমন্বয়ে দু'টি অংশীদার ছিল, একদিকে পূর্বোক্ত পৌরাণিক দেবদেবীদের পূজক আর্যবংশীয়গণ, অপরদিকে লৌকিক দেব-দেবীতে আস্থাশীল অনার্য আদিবাসীরা। মঙ্গলকাব্যগুলি বাঙলা ভাষায় রচিত হওয়ার পক্ষে আরও একটা প্রবলতর যুক্তি উত্থাপন করা চলে। পুরাণগুলিতে দেবতাদের সঙ্গে সঙ্গে বহুতর মানব-মানবীর কাহিনীও পরিবেশিত হ'য়েছে। কিন্তু এইসব মানব-মানবী সমাজের অতি উচ্চস্তরে ব্রাহ্মণ ও রাজন্যমণ্ডলীতে অবস্থান করতেন; সম্ভবত, পুরাণের শ্রোতৃমণ্ডলীও ছিলেন তৎকালের অভিজাতবর্গ, পক্ষান্তরে মঙ্গলকাব্যের যুগে দেবতারাও যেমন অনার্যদের মধ্য থেকে আগত, তেমনি কাহিনীর নায়ক-নায়িকারাও অনেকেই সমাজের নিম্নতর শ্রেণী থেকে উদ্ভূত। অতএব বাঙলা ভাষায় এদের কাহিনী পরিবেশনেই বাস্তবতার মর্যাদাও রক্ষিত হ'য়ে থাকে। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত — পুরাণের এই পঞ্চলক্ষণ সমগ্রভাবে মঙ্গলকাব্যসমূহে না পাওয়া গেলেও উক্ত কাব্যগুলি যে মূলত পুরাণের অনুসরণে রচিত হ'য়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মঙ্গল-কাব্যগুলিতে পুরাণের পরিবেশ সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অনার্য দেবদেবীর চরিত্রেও পৌরাণিক আকার দান করা হ'য়েছে। এছাড়াও অনেক মঙ্গলকাব্যের আদিতে একটা 'দেবখণ্ড' যোগ ক'রে তাতে পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনা করা হ'য়েছে। এমনকি গ্রন্থের মধ্যেও প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন পুরাণ কাহিনী উল্লেখ করা হ'য়েছে। এইদিক থেকেও বলা চলে যে মঙ্গলকাব্যগুলি বাঙলা পুরাণের মর্যাদা রক্ষা করে চলছে।

কোন কোন দিক থেকে মঙ্গলকাব্যগুলিকে বাঙলা 'পুরাণ' নামে অভিহিত করবার সার্থকতা দেখা গেলেও সার্বিক বিচারে এদের সত্যি সত্যি পুরাণের স্থান দান করা যায় না।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে পৌরাণিক দেবতাদের অবতারণা করা হয়েছে এবং এঁদের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যোক্ত দেবতাদের কোন-না-কোনভাবে সম্পর্কিত করার জনও যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে, তৎসত্ত্বেও এ সত্য অস্বীকার করা চলে না যে, যে-সকল দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনার জন্য মঙ্গলকাব্যগুলির সৃষ্টি হয়েছে, সেই মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকুর, শীতলা, বাসুলী, দক্ষিণরায় বা সত্যপীর মূলতঃ অপৌরাণিক অনার্য লৌকিক দেবতা। আর্যধর্মে দেবতাদেরও কর্মফলের অধীন বলে মনে করা হয়; এঁদেরও পাপ-পুণ্যের ফলভোগ করতে হয়। ধর্মবিধি লঙ্ঘন কররার অধিকার কোন পৌরাণিক দেবতারও নেই। কিন্তু মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত দেবতাদের স্বেচ্ছাচারিতা, স্বার্থপরতা, লোভ, হিংস্রতা এবং অপচিকীর্ষা-আদি পশুধর্ম পুরাণসম্মত নয়। মঙ্গলকাব্যের দেবতারা অলৌকিক শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তা' মানবের মঙ্গলকামনায় ব্যয়িত হয় নি, বরং মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের সর্বতোভাবেই অমঙ্গলের প্রতীক বলেই গ্রহণ করা চলে। এই দেবতাগণ মোক্ষদানের অধিকারী নন, ভক্তগণ মোক্ষ কামনাও করেন না। তারা ভয়-ভীতি, রোগ-শোক থেকে নিষ্কৃতি, অর্থ-বিত্ত কামনা এবং পরলোকে বৈকুণ্ঠে গিয়ে মর্ত্যেব অধিক সুখবাস কামনা করেন মাত্র।

মঙ্গলকাব্যের দেবতারা যে মনুষ্যসমাজ পূজা পেয়ে থাকেন, তার পিছনে ভক্তির লেশমাত্রও নেই--দেবতার রোষের ভয়েই ভক্তরা তাদের পূজা করে থাকেন। বিদগ্ধ সমালোচক মনে করেন, "এইজন্য মঙ্গলকাব্যের দেবতা পূজকদিগের ভয়েরই পাত্র, প্রীতির পাত্র নহেন। জনসাধারণ স্পষ্টই বুঝিয়াছে—ইহলোকে সাংসারিক ভালোমন্দের সহিত এই দেবতাদিগের সম্পর্ক মাত্র, ঐহিক উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে ইঁহাদিগকে নৈবেদ্যের ঘুষ দিতে হইবে, তাহার পরে পরলোকে ইঁহাদের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। পারত্রিক শক্তিহীনতার জন্য মঙ্গলকাব্যের কোন দেবতা কাহারও ইষ্টদেবতার স্থান গ্রহণ করিতে পারেন নাই, কোন ধর্মসম্প্রদায়ও সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। সেইজন্য কোন মঙ্গলকাব্যকে ধর্মীয় গ্রন্থ, সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ বা আধ্যাত্মিক গ্রন্থ বলা চলে না।" অতএব লৌকিক দেবতাদের অবলম্বন ক'রে যে মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হ'য়েছে, বাইরের বিচারে সংস্কৃত পুরাণগুলির সঙ্গে কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকলেও যথার্থ বিচারে এদের 'বাঙলা পুরাণ' নামে অভিহিত করা চলে না।

দেবতাদেব সীমাবদ্ধ ক্ষমতা

মঙ্গলকাব্যগুলি বাঙলার জাতীয় মহাকাব্য কিনা — এইরূপ একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হ'য়ে থাকে। এই বিষয়ে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যই সম্ভবত সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, "প্রথমতঃ সাম্প্রদায়িকতার নিম্নস্তর হইতে উদ্ভূত হইলেও কালক্রমে যখন এই সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গলকাব্যগুলি সাহিত্যের আদর্শের সেবায় নিয়োজিত হইল, তখনই এই শ্রেণীর কয়েকখানি কাব্য জাতীয় মহাকাব্য (National Epic) হিসাবে স্থান পাইবার যোগ্যতা অর্জন করিল।" এই বিষয়ে তিনি 'ধর্মমঙ্গল'গুলির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ ক'বে তাদের 'পশ্চিমবঙ্গেব জাতীয় মহাকাব্য' নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। তাঁর

মঙ্গলকাব্য কি জাতীয় মহাকাব্য?

মতে, এই কাব্যগুলিতে সমসাময়িক জাতীয় সংস্কৃতি এবং জাতীয় জীবনের শাশ্বত সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে যে সমস্ত চরিত্র চিত্রিত হ'য়েছে, এইগুলিও ডঃ ভট্টাচার্যের মতে বাঙালীগৃহের নিত্যকালের চিত্র। এদের মাধ্যমেই আমরা প্রাচীনকালের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারি। এই সমস্ত কারণেই ডঃ ভট্টাচার্য এইগুলিকে 'বাঙলার জাতীয় মহাকাব্য' বলে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু মাত্র এই কয়টি লক্ষণের জন্যই কোন কাব্য কিংবা কাব্যধারাকে 'জাতীয় মহাকাব্য' নামে আখ্যাত করা যায় কিনা, এই বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করেন।

কারণ, প্রথমতঃ পশ্চিমবঙ্গে বিশেষভাবে কোন পৃথক জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠেছে বলে মনে করা যায় না; বাঙালী জাতি-হিশেবে এক ও অখণ্ড, কাজেই 'পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় মহাকাব্য' — স্বতঃবিরোধী। তাছাড়া ধর্মমঙ্গল কাব্যের ব্যাপ্তি সর্ববঙ্গে নয়ই, এমন কি সমস্ত পশ্চিম বাঙলাযও পরিচিত নয়। পশ্চিম বাঙলায় নিম্নতর শ্রেণীতেই এর ব্যাপক প্রচার মাত্র। কাজেই ধর্মমঙ্গল কাব্য কোনক্রমেই জাতীয় মহাকাব্যের দাবিদার হ'তে পারে না। বরং তুলনামূলক বিচারে 'চণ্ডীমঙ্গল' এবং অবশ্যই 'মনসামঙ্গল' কাব্য সর্ববঙ্গে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে পরস্পর সম্পর্কহীন দুটি কাহিনী – কোনটি বিষয় বা চরিত্র গৌরবে মহাকাব্যের দাবিদার হ'বার যোগ্যই নয়। সেই বিচারে 'মনসামঙ্গল' কাব্যটি অনেক সুগঠিত, তাব নাযক চাঁদসদাগর অতি সমুন্নত ব্যতিক্রমী চরিত্রের পুরুষ, কাহিনীর ব্যাপ্তিও স্বর্গ-মর্ত্য জুড়ে। তবু 'মহাকাব্য' কিংবা 'জাতীয় জীবনের'ব প্রতিনিধিত্ব করবাব যোগ্যতা কি তাবই আছে?

কারণ, সমালোচকদের মতে জনজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হ'লেও মঙ্গলকাব্যগুলি শিশুমনের ন্যায় অপরিণত কবিমানসের সাহিত্য বলেই তাদের 'জাতীয় সাহিত্য' বলা যায় না; মঙ্গলকাব্যোক্ত চরিত্রগুলিও নিম্নস্তরের। বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি মঙ্গলকাব্যসমূহে প্রকট নয়। এছাড়াও এগুলিতে প্রাকৃতিক ও সামাজিক জীবনের পরিচয, কিংবা ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক জীবনেরও কোন সার্মগ্রিক পবিচয় এগুলিতে পাওয়া যায না। এমন কি মঙ্গলকাব্যসমূহে সমসাময়িক যুগের যে পরিচয় এগুলিতে পাওয়া যায়, তাকেও সমালোচকবৃন্দ জাতীয় জীবনেব পরিচাযক বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে, "মঙ্গলকাব্যেব জগৎ অপবিণত মনের কল্পনাবিলাস মাত্র।" অতএব, মঙ্গলকাব্যকে বাঙলাব জাতীয় ইতিহাস ব'লে অভিহিত করা চলে না। আমাদের মনে হয়, উভয় পক্ষই চরমপন্থা অবলম্বন করেছেন। বস্তুত জাতীয় মহাকাব্যে জাতির ভাবনা-কামনা-আদির যেরূপ সুষ্ঠু প্রকাশ ঘটা প্রয়োজন, কোন মঙ্গলকাব্যেই তা' ঘটে নি। আবার মঙ্গলকাব্যগুলিকে অপরিণত মনের কল্পনা-বিলাস বলেও উড়িয়ে দেওয়া চলে না। কারণ, মঙ্গলকাব্যসমূহে সমসাময়িক জীবনযাত্রার যেমন কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি জনজীবনেব সঙ্গেও এর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল বলে জাতীয় জীবন থেকে এদের বিচ্ছিন্নও করা চলে না। জাতীয় মহাকাব্য না হ'লেও যে এগুলি জাতীয় জীবনেব সঙ্গে যুক্ত, তা' অস্বীকার ক'রবার উপায় নেই।

মঙ্গলকাব্যগুলিব প্রকৃত পরিচয় – এগুলি জনসাহিত্য। জনজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে

জড়িত বলেই জাতীয় জীবনের কিছু-না-কিছু লক্ষণ এতে প্রকাশিত হ'তেই পারে। এতে সমাজ-জীবনের যে চিত্র অঙ্কিত হ'য়েছে, বস্তুতঃ তা' একান্ত নিম্নস্তরের। জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা বা সমুন্নত মহিমা কিংবা উচ্চ আদর্শের কোন প্রতিফলন এতে পড়ে নি। জাতীয় জীবনের কোন সমস্যা কিংবা গভীর আত্মোপলব্ধি এতে ধরা পড়ে নি। আছে কিছু কল্পিত ছবি যার সঙ্গে বাস্তবের কোন যোগ বা সম্পর্ক নেই। বিদগ্ধ সমালোচকের ভাষায়, "বাঙলা কাব্যে বাঙালীর জাতীয় চরিত্র-বৈশিষ্ট্য যথা—হৃদয়বত্তা, ভাবপ্রবণতা, তীক্ষ্ণ, নৈয়ায়িক বুদ্ধি, কর্মফলে বিশ্বাস, তন্ত্রে আসক্তি, অনুষ্ঠানপ্রিয়তা, মাধুর্যসাধনা প্রভৃতির প্রকাশ থাকিলে তবেই তাহাকে বাঙালীব জাতীয় কাব্য বলা চলে। বলা বহুল্য, মঙ্গলকাব্যে ইহার কিছুই নাই।" অতএব কোন মঙ্গলকাব্যকেই জাতীয় কাব্যের উচ্চ মর্যাদা দান কবা চলে না, যদিও জনসাহিত্যের লক্ষণ এদের মধ্যে পরিস্ফুট।

২. **রূপবৈচিত্র।** প্রধানত নবাগত লৌকিক চেতনা-সম্ভূত প্রাগার্য সমাজের কিছু দেব-দেবী, যাদের পৌরাণিক ভাবনার সঙ্গে সমীকবণের প্রয়োজনে আর্যীকরণেব সাহায্যে প্রচলিত হিন্দু সমাজের নিকটও গ্রহণযোগ্য ক'বে তোলা যায়, সেই উদ্দেশ্যেই আদৌ বাঙলা ভাষায় পুবাণের বিকল্প-রূপে 'মঙ্গলকাব্য' কাব্যধাবার উদ্ভব ঘটেছিল। অতএব প্রাথমিক প্রচেষ্টায় অনার্যভাবনা-প্রসূত যে সকল দেবদেবীর উদ্ভব ঘটেছিল, তাদের নিয়েই প্রাথমিক প্রচেষ্টা নিবদ্ধ ছিল। তাই প্রথমে অর্থাৎ আদি-মধ্যযুগে 'মঙ্গলকাব্যে'র সংখ্যা বেশি ছিল না।

মঙ্গলকাব্য-রচনার প্রথম যুগে যদিও দুটি তিনটি মাত্র মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি সম্ভব হ'য়েছিল, পরবর্তীকালে বিষয-বৈচিত্র্যে এবং সংখ্যায় তা বহুগুণিত হ'য়েছিল। প্রাচীনত্ব, সংখ্যা এবং উৎকর্ষের বিচারে মঙ্গলকাব্যগুলিকে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় — (১) প্রধান মঙ্গলকাব্য ঃ এই শ্রেণীতে পড়ে 'মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও শিবমঙ্গল বা শিবায়ন।' (২) অপ্রধান মঙ্গলকাব্য ঃ 'কৃষ্ণমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, রায়মঙ্গল, সাবদামঙ্গল' ইত্যাদি বহু কাব্যই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে পবিগণিত হয।

শ্রেণীবিভাগ

মঙ্গলকাব্যসমূহেব মধ্যে সম্ভবত 'মনসামঙ্গল' বা 'পদ্মাপুরাণের' প্রচার এবং জনপ্রিয়তাই সর্বাধিক। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন অন্যূন ৬২ জন 'মনসামঙ্গল' কাব্যকারের নাম উল্লেখ কবেছেন। তবে তিনিও সন্দেহ কবেন যে এদেব মধ্যে হয়তো অনেকেই 'গায়েন' ছিলেন, কৌশলে ভণিতায় নাম ঢুকিযে দিয়েছেন। মনসামঙ্গল-রচয়িতাদের মধ্যে কানা হবিদত্ত, বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব, বিপ্রদাস পিপিলাই, দ্বিজ বংশীদাস, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি প্রধান। মনসামঙ্গল কাব্যের একাধিক কবি যে চৈতন্য-পূর্ব যুগেই বর্তমান ছিলেন, তা'তে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। চণ্ডীমঙ্গলও প্রাচীনতব কাব্যসমূহের একটি। কিন্তু চৈতন্য-পূর্ব যুগে রচিত কোন কাব্যের সন্ধান এযাবৎ কাল পাওয়া যায় নি। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রধান কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী

প্রধান মঙ্গলকাব্য

মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান লাভ ক'রে থাকেন। অন্যান্য কবিদের মধ্যে দ্বিজ মাধব প্রধান। ধর্মমঙ্গল কাব্যের উদ্ভব এবং প্রসার প্রধানত রাঢ় অঞ্চলে। এই শাখার কবিদের মধ্যে মাণিক গাঙ্গুলি, ঘনরাম চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রধান মঙ্গলকাব্য শাখার অন্তর্ভুক্ত হলেও 'শিবায়ন' কাব্য পূর্বোক্ত কাব্যগুলির সহিত তুলিত হ'তে পারে না। কারণ এর দেবতা শিব পৌরাণিক ধারার অন্তর্ভুক্ত। অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে 'শীতলামঙ্গল' বহুল প্রচার লাভ করেছিল। শীতলামঙ্গলের কবিদের মধ্যে কৃষ্ণরাম, মাণিক গাঙ্গুলি, শঙ্কর, নিত্যানন্দ চক্রবর্তী প্রধান। 'ষষ্ঠীমঙ্গল'ও অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের কাব্য। কৃষ্ণরাম, রুদ্ররাম ও রামধন চক্রবর্তী এই কাব্যের প্রধান কবি। বাঘের দেবতা দক্ষিণরায়কে অবলম্বন ক'রে 'রায়মঙ্গল' কাব্য রচিত হয়েছে। 'রায়মঙ্গল কাব্য' চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেরই অনুকরণ। 'শীতলামঙ্গল' ও 'ষষ্ঠীমঙ্গলে'র কবি কৃষ্ণরামই 'রায়মঙ্গলের'ও কবি। রুদ্রদেবও 'রায়মঙ্গল' রচনা করেছেন। 'সারদামঙ্গল' কাব্যে সরস্বতীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। এই কাব্যের কবিদের মধ্যে দয়ারাম, বীরেশ্বর, মুনিরাম প্রভৃতি প্রধান। একালের কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী রচিত 'সারদামঙ্গল' নামে মঙ্গলকাব্য হ'লেও তা আধুনিক গীতিকাব্যপর্যায়ভুক্ত। 'কৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যের নায়ক শ্রীকৃষ্ণও পৌরাণিক দেবতা। 'কৃষ্ণমঙ্গল' বা 'কৃষ্ণায়ণ' কাব্যের রচয়িতাদের মধ্যে রঘুনাথ, মাধবাচার্য, কৃষ্ণদাস, কবিশেখর প্রভৃতি প্রধান। এগুলি ছাড়াও অপেক্ষাকৃত অপ্রধান আরও বহু কাব্যই রচিত হয়েছে। তবে এদের কোনটিই খুব প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের সাধারণ লক্ষণ-যুক্ত নয়। 'কৃষ্ণমঙ্গল' কাব্য প্রকৃতপক্ষে অনুবাদ শাখার অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়াও 'গঙ্গামঙ্গল', 'ভবানীমঙ্গল' প্রভৃতি পৌরাণিক ধারার অন্তর্ভুক্ত কিছু অপ্রধান মঙ্গলকাব্য রয়েছে। এই ধারার সর্বশেষ এবং সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য — এতে অবশ্য একটি লৌকিক কাহিনী এবং একটি ঐতিহাসিক কাহিনীও যুক্ত হ'য়েছে।

অপ্রধান মঙ্গলকাব্য

৩. **মঙ্গলকাব্যের সাধারণ লক্ষণ।** মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ঘটেছিল কবে, কীভাবে এবং তার যথার্থ কালই বা কী, আজ আর নির্দিষ্টভাবে বলবার কোন উপায় নেই। তৎসত্ত্বেও অনুমান করা যায় যে বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগ আরম্ভ হ'বার পূর্বেই এর প্রস্তুতিপর্ব শুরু হ'য়ে গিয়েছিল। আর অনার্য তথা প্রাগার্য সমাজের লৌকিক ধারণা-সম্ভব ধর্মভাবনা ও দেবদেবীদের সঙ্গে সমকালের পৌরাণিক আর্যভাবনার সমীকরণের উদ্দেশ্যেই এই মঙ্গলকাব্যধারার উদ্ভব ঘটেছিল। মঙ্গলকাব্যের পূর্বে বাঙলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য তেমন কোন সাহিত্য সৃষ্টিই হয় নি। কাজেই মঙ্গলকাব্যকারদের সামনে বাঙলা কাব্যের কোন আদর্শ ছিল না। কিন্তু এ জাতীয় আদর্শের সাক্ষাৎ তারা পেয়েছিলেন সংস্কৃত পুরাণে। অতএব পুরাণই ছিল মঙ্গলকাব্যের পূর্ব আদর্শ।

মঙ্গলকাব্যের পূর্ব আদর্শ

বিভিন্ন দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার-হেতু বিষয় এবং কাহিনীর বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও কতকগুলি পুরাণের লক্ষণও এতে বর্তমান। প্রতিটি মঙ্গলকাব্যের প্রথমেই 'বন্দনা' অংশ। এই অংশে উদ্দিষ্ট দেবতা ছাড়াও অন্যান্য প্রধান প্রধান দেবতা এবং তীর্থদেবতা ও স্থানীয়

দেবতাদেরও প্রশস্তি বন্দনা করা হয়েছে। এই বন্দনাংশে সাম্প্রদায়িকতার বিশেষ কোন স্থান নেই। বন্দনাংশের পরই কাব্যসমূহে 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' বর্ণনা করা হয়েছে। এই কারণ বর্ণনা-প্রসঙ্গেই কবিরা একদিকে যেমন আত্মকাহিনী বিবৃত করেছেন, তেমনি দৈবাদেশের কথাও উল্লেখ করেছেন। মনে হয়, জনসাধারণের সভয় ও সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই মূলে কবিরা 'দৈবাদেশ' বা 'স্বপ্নাদেশে'র কথা উল্লেখ করতেন। পরবর্তীকালে এটি প্রচলিত রীতিতেই পর্যবসতি হয়েছে। কারণ, অনেক গ্রন্থেই দৈবাদেশের পরও আবার পৃষ্ঠপোষক নরপতির আদেশেই গ্রন্থ রচিত হয়েছে, এরূপ উক্তি পাওয়া যায়। এর পরবর্তী অংশ 'দেবখণ্ড'। এই দেবখণ্ডেও সৃষ্টিপত্তন, দক্ষযজ্ঞ, উমার নবজন্মলাভ এবং হরগৌরীর সংসার-বৃত্তান্ত প্রায় সমস্ত মঙ্গলকাব্যেই একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে। মঙ্গলকাব্যের এই অংশটি কাহিনীর দিক্ থেকে পুরাণের অনুকবণ হলেও এর বিশদ বিবরণে লৌকিক জীবনের অনুসরণ রয়েছে। বস্তুত, এই অংশেবই শেষদিকে কোন শাপভ্রষ্ট দেবতার নরলোকে আবির্ভূত হবার কাহিনী বর্ণনা করে দেবখণ্ড এবং নরখণ্ডের মধ্যে সেতুবন্ধন করা হয়েছে। হরগৌবীর জীবনযাত্রা-কাহিনীতে প্রায় সর্বত্রই সমসাময়িক নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের সুন্দর পরিচয় দান করা হয়েছে। এই দেবখণ্ড দেখলে মনে হয়, প্রায় সমস্ত কবিই তাহাদেব উদ্দিষ্ট দেবতাকে শিবের সঙ্গে কোন-না-কোন উপায়ে যুক্ত করবার প্রয়াস পেয়েছেন। সর্বশেষ 'নরখণ্ডে' মূল কাহিনীটি বিবৃত হয়েছে। এইখানে দেখা যায়, শাপভ্রষ্ট দেবতা নবরূপে গ্রন্থোদ্দিষ্ট দেবতাব মাহাত্ম্য প্রচাবে কবে দেহান্তে আবার স্বর্গলোকে প্রযাণ করেন। বস্তুত, বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের পার্থক্যটি এই অংশেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তথাপি, লক্ষ্য করবার বিষয়, কাহিনীগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কবিগণ এই অংশে গতানুগতিকতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে পারেন নি। বারমাস্যা, নাবীদেব পতিনিন্দা, বিশ্বকর্মার কাঁচুলিনির্মাণ, বাঙলার রন্ধন প্রণালী ও ভোজ্যতালিকা, বাঙলাদেশেব ফল-ফুল-গাছ-পশু-পাখি ইত্যাদির নাম উল্লেখ, চৌতিশা স্তব, লোক-ঠকানো ধাঁধার অবতাবণা ও উত্তর-দান প্রভৃতি বিষয় প্রায় প্রতিটি গ্রন্থেই সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই সমস্ত লক্ষণযুক্ত কাব্যকেই সাধারণত মঙ্গলকাব্য নামে অভিহিত কবা হয়।

হরগৌরীর কাহিনী

মঙ্গলকাব্যগুলি আখ্যায়িকা তথা কাহিনীকাব্য। ডঃ সুকুমার সেন অনুমান কবেন জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে যে একে কবি, 'মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি'-রূপে আখ্যাযিত করেছেন, সেখানে এই 'মঙ্গল' শব্দটিই 'আখ্যায়িকা'ব দ্যোতক, এবং 'গীতগোবিন্দ' থেকেই এই ধাবাব সূত্রপাত।

বাঙলা মঙ্গলকাব্যগুলি মধ্যযুগের সৃষ্টি। তাতে কাহিনীগত বৈচিত্র্য থাকলেও এদেব প্রত্যেকটিতেই কিন্তু মধ্যযুগোচিত বাঙালীব গ্রামীণ জীবনের অনেক বাস্তব চিত্রই রূপাযিত হ'য়েছে। সাধাবণ মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে দশকর্মের নির্দেশ শাস্ত্রে রয়েছে, তা' সমাজের সর্বস্তরেই অনুসৃত হ'তো। বাঙালীর আহার-বিহার তথা ভোজন পারিপাট্য, তাদের আচার-ব্যবহাব, বস্ত্র-অলঙ্কারাদি,

বাঙালী জীবনের পবিচয়

হাট-বাজার থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ছাড়াও নামকরণ, অন্নপ্রাশন, বিদ্যারম্ভ, শিক্ষাব্যবস্থা, বিবাহের বিস্তৃত বিবরণ প্রভৃতি গ্রামীণ সম্পর্ক-বিচার-আদি বিষয়ের পরিচয় মঙ্গলকাব্য থেকে পাওয়া সম্ভব।

এই সমস্ত বিশিষ্ট লক্ষণগুলিই মঙ্গলকাব্যকে সমকালীন অন্যান্য কাব্য থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে।

৪. মঙ্গলকাব্যের সাহিত্যমূল্য

খ্রীঃ ত্রয়োদশে শতক থেকে আরম্ভ ক'রে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সুদীর্ঘ ছয় শতাব্দীকালে ব্যাপ্ত মধ্যযুগে 'মঙ্গলকাব্যধারা' একটি প্রধানতম ধারা-রূপে বিবেচিত হ'লেও সাহিত্যমূল্যের বিচারে কিন্তু এটিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দান করা যায় না। অনপেক্ষ বিচারেও এর সাহিত্যমূল্য খুব বেশি নয়। অবশ্য তার এই ন্যূনতার পিছনে যথেষ্ট কারণও রয়েছে। প্রথমতঃ, মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ঘটেছিল বাঙলা সাহিত্যের প্রায় শৈশবেই এবং প্রথমেই তার যে একটা কাঠামো সৃষ্টি হয়েছিল, পরবর্তীকালে সেই ধারারাই অনুবর্তন ঘটায় মঙ্গলকাব্যধারা আর খুব একটা উৎকর্ষ লাভের অবকাশ পায় নি। দ্বিতীয়তঃ, মঙ্গলকাব্য মূলতঃ প্রচারধর্মী কাব্য। নবাগত লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারই এর লক্ষ্য হ'বার কারণে এর রচনাগত উৎকর্ষের প্রতি দৃষ্টিদানের সুযোগই ছিল অপেক্ষাকৃত কম। প্রচারধর্মিতার এই বিপদ সর্বদেশের সর্বকালের পক্ষেই সমান। তৃতীয়তঃ, 'মঙ্গলকাব্য' একান্তভাবেই জনগণের সাহিত্য। জনগণের রুচির দাবি মেটানোর প্রতিই কবিদের নজর থাকতো, আর জনগণেব রুচি যে একটু স্থূল, সূক্ষ্ম সাহিত্যরসবোধ যে তাদের মধ্যে সাধারণভাবে অনুপস্থিত, সমকালীন কবিদের নিকট তা অজ্ঞাত ছিল না। দেবমাহাত্ম্যসূচক মঙ্গলকাব্যে যে সাহিত্যরসের অভাব ঘটবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু রাজসভার মনস্তুষ্টির প্রয়োজনে ভারতচন্দ্র যখন 'মঙ্গলকাব্য' রচনা করেছেন, তখন তা' রাজকণ্ঠের 'মণিমালা'ই হয়ে উঠেছে। এই সমস্ত স্থূল কারণ ছাড়াও কারণ অনেক রয়েছে। তবে সামগ্রিক বিচারে এই মঙ্গলকাব্যগুলিতে কাব্যমূল্য বেশি না থাকলেও জনপ্রিয়তায় এগুলি অনেকটাই এগিয়ে ছিল।

প্রচারধর্মিতা

জনসভা সাহিত্য

কাব্যহিশেবে মঙ্গলকাব্যগুলির মূল্য নিরূপিত হলে কালের দরবারে যে এদের অধিকাংশের আসন মিলবে না, তাতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাঙালীর জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাস থেকে এদের নাম মুছে ফেলবার উপায় নেই। ইতিহাস-বিমুখ বাঙালী জাতির কোন ইতিহাস নেই, — কথাটি আংশিক সত্য মাত্র, বস্তুত এই মঙ্গলকাব্যগুলিই যে বাঙলাদেশের মধ্যযুগীয় জীবনের অন্ততঃ আংশিক পরিচয় দান করে, তা' অস্বীকার করবার উপায় নেই। সমসাময়িক বাঙলাদেশের আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি, কিছু কিছু বাস্তব ঘটনা, বাঙলার রন্ধনপ্রণালী ও ভোজ্যতালিকা ইত্যাদির সঠিক বিবরণ পেতে হলে মঙ্গলকাব্যগুলির দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। এ ছাড়া সমাজের বৈশিষ্ট্য ও যুগপ্রবণতার পরিচয় পেতে হলেও মঙ্গলকাব্যের

কাব্যমূল্য

সহায়তা গ্রহণ অপরিহার্য। বাঙালী যে এককালে নৌবাণিজ্যে প্রাগসর ছিল, তার প্রমাণ মঙ্গলকাব্যে যতখানি বিধৃত রয়েছে, তেমন আর কোথায় পাওয়া যাবে? কাজেই সাহিত্যিক উৎকর্ষ যদি কিছু কম হয়, তবু জাতীয় জীবনের ইতিহাস-সঙ্কলনের পক্ষে মঙ্গলকাব্যগুলির দান স্বীকার করতেই হবে।

৫. মঙ্গলকাব্যের বিবর্তন। বাঙলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব সূচিত হয়েছিল সম্ভবতঃ তুর্কী আক্রমণ কালেই। তুর্কী আক্রমণের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার বাঙলায় সমাজব্যবস্থা প্রাথমিক আঘাত সামলে উঠে সমীকরণের পথ নিয়েছিল বলে মনে হয়। প্রথম উদ্যোগে অনার্য সমাজের বহু দেবদেবী, আচার-আচরণ ও ধর্মবিশ্বাস-আদি সমাজে আত্মীকৃত হ'য়েছিল। এই আত্তীকরণের প্রক্রিয়া চলছিল দীর্ঘকাল ধরেই, তাই পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্ম থেকেও বহু উপকরণ যে হিন্দু সমাজে গৃহীত হ'য়েছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় পরবর্তীকালের মঙ্গলকাব্যগুলিতে। দক্ষিণরায়, কালুগাজি, ওলাবিবি, সত্যপীর আদি বহু দেবতা বা দেবোপম চরিত্র শেষ পর্যায়ের মঙ্গলকাব্যের উদ্দিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

বাঙলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ঘটেছিল প্রধানতঃ ভিন্ন সমাজ থেকে আগত দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনের উদ্দেশ্যেই। অবশ্য কালস্রোতে এক সময় কিছু পৌরাণিক দেবদেবী অথবা হিন্দুসমাজের দেবোপম চৈতন্যাদি মহাপুরুষগণও মঙ্গলকাব্যের বিষয়ীভূত হয়েছিলেন। এই প্রক্রিয়া অবশ্য মধ্যযুগের কালসীমা অতিক্রম করে একাল পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছিল। তাই, একালের প্রথম আধুনিক গীতিকবি বিহারীলালও রচনা করেছিলেন 'সারদামঙ্গল'।

মধ্যযুগের প্রধান মঙ্গলকাব্যধারায় স্থান পেয়েছে 'মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল'। এই প্রধান ধারার শেষ সৃষ্টি 'শিবায়ন' নামতঃ এবং প্রকৃতির দিক থেকে অনেকটা স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হলেও মূল কাহিনীস্রোতের দিক থেকে মঙ্গলকাব্যধারারই অন্তর্ভুক্ত। পূর্বোক্ত তিন ধারার যাঁরা প্রধান এবং প্রথম কবি, তাঁরা কেউ পঞ্চদশ শতকের পূর্ববর্তী কালে বর্তমান ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের অনেকেই তাঁদের পূর্বসূরীদের নাম উল্লেখ করে যাওয়াতে অনুমিত হয় যে মঙ্গলকাব্যের প্রধান ধারাগুলির সূত্রপাত ঘটেছিল সম্ভবতঃ তুর্কী আক্রমণ যুগেই-- অর্থাৎ ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শতকে।

মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম প্রাচীন কবি বিজয়গুপ্ত উল্লেখ করেছেন — 'প্রথমে রচিল গীত কানা হরি দত্ত' এবং তিনি আরও বলেছেন, 'হরি দত্তের যত গীত লুপ্ত হৈল কালে।' অতএব পঞ্চদশ শতাব্দীর বিজয়গুপ্তেরও অন্ততঃ শতাব্দীকাল পূর্বে হরি দত্ত আবির্ভূত হয়ে থাকতে পাবেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সম্ভবতঃ প্রথম কবি মাণিক দত্তও ঐকালে বর্তমান থেকে থাকতে পারেন। তাঁর সম্বন্ধে কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করেছেন —

'মাণিক দত্তেরে বন্দোঁ করিয়া বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীত পথ পরিচয়।।'

ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম বলেছেন 'হাকন্দ পুরাণ মতে ময়ূরভট্টের পথে' তিনি গীত রচনা করেছেন। এই তিন কবির নামে যে সকল রচনাংশের পরিচয় পাওয়া যায় তা' অতিশয় অর্বাচীন কালের, মূল রচনা সম্ভবতঃ বিনষ্ট।

মঙ্গলকাব্যধারায় কাহিনী এবং পরিবেষণার দিক লক্ষ্য ক'রে অধ্যাপক তারাপদ ভট্টচার্য এদের পৃথক্ পৃথক্ বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করেছেন নিম্নোক্তক্রমে ঃ "কাব্যবর্ণিত অবান্তর বস্তুপুঞ্জ এবং উপাখ্যানাংশ বাদ দিয়া বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের মূল আখ্যায়িকা বিচার করিলে দেখা যায় — মনসামঙ্গল হইতেছে সেকালের থ্রিলার বা উত্তেজনা কাহিনী, ধর্মমঙ্গল হইতেছে অ্যাডভেঞ্চার চিত্র, চণ্ডীমঙ্গল হইতেছে সামাজিক উপন্যাস এবং শিবায়ন হইতেছে পারিবারিক ছোটগল্প।"

মনসামঙ্গল সর্বপ্রাচীন বলেই হয়তো এতে প্রাচীনত্বের লক্ষণ সর্বাধিক সুস্পষ্ট। তাই এতে চাঁদ ও মনসার মধ্যে ঘটিত দ্বন্দ্বযুদ্ধের উত্তেজনা যেমন অতিশয় প্রখর তেমনি বেহুলা -লখিন্দরের কাহিনীও আগাগোড়া রূপকথার রসে নিষিক্ত। সমাজে তখন বণিকদের অপ্রতিহত প্রভাব, তাই বণিককুলপতি চাঁদসদাগরের পূজা আদায়ের জন্য মনসা মরিয়া হ'য়ে লড়ছেন। শিবভক্ত চাঁদ কিন্তু কিছুতেই মনসার পূজা করবেন না —

মনসামঙ্গল

'যেই হাতে পূজি আমি দেব শূলপাণি।
সেই হাতে না পূজিব চ্যাংমুড়িকানি ।।'

অতিশয় ক্রুর এবং নিষ্ঠুর মনসা চাঁদকে নিরন্তর উৎপীড়িত ক'রে চলেছেন—আর সবল পৌরুষে চাঁদ মনসাকে অগ্রাহ্য ক'রে যাচ্ছেন। গ্রন্থের আরম্ভ থেকে শেষ অবধি এই দ্বন্দ্ব সংঘাত বর্তমান। বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী শুরু লোহার বাসরঘর থেকে। রূপকথার শুরুও এখান থেকেই। তারপর বেহুলার জীবনে পরীক্ষার পর পরীক্ষা—সবই প্রায় রূপকথার আঙ্গিকে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য চাঁদ বশ্যতা স্বীকার করলেন, কিন্তু ভয়ে বা ভক্তিতে নয়, পুত্রবধূ বেহুলার স্নেহের দাবিতে।

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে দু'টি কাহিনী। একটি কাহিনীতে দেবীচণ্ডী বণিককুলের পূজা নিয়েছেন, অপরটিতে অনার্য ব্যাধসন্তান কালকেতুর পূজা নিয়েছেন। দেবীর নাম চণ্ডী হ'লেও তাঁর মধ্যে উগ্রতার কোন প্রকাশ নেই, বরং তাঁর স্নেহাতুরা রূপটিই কাহিনীতে স্বতঃপ্রকাশ। চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীতে সমাজ-বিবর্তনের একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন বর্ণগত কৌলীন্যপ্রথা কীভাবে ক্রমশঃ কাঞ্চনকৌলীন্যের নিকট আত্মসমর্পণ করে, তারই উপাদেয় কাহিনী 'চণ্ডীমঙ্গলে' বিবৃত হ'য়েছে। আর্য-অনার্য সমীকরণ পদ্ধতিটি যে এখানে একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে, তা' যে কোন সমাজ-সচেতন পাঠকের চোখে পড়ে। এই সমীকরণ প্রক্রিয়ার ফলে সমাজে যে সহনশীলতার সৃষ্টি হ'য়েছিল তারও একটা পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় চণ্ডীর চরিত্র থেকে — তাঁকে কখনো মনসার মতো নিষ্ঠুরতার পথ গ্রহণ করতে হয়নি।

চণ্ডীমঙ্গল

'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে সমাজব্যবস্থার কাঠোরতা আরো হ্রাসপ্রাপ্ত হ'য়েছে। মনসা এবং চণ্ডী অনার্য সমাজ থেকে আর্যসমাজে উন্নীত হ'য়ে উচ্চবর্ণের হাতে পূজা পাবার জন্য লোলুপা হ'য়ে উঠেছিলেন। অনার্য সমাজ থেকে আগত ধর্মঠাকুর কিন্তু অনার্য গোষ্ঠীকেই আর্যের অধিকার দান করলেন। ধর্মঠাকুরের পূজার জন্য আর ব্রাহ্মণ পুরোহিতেব প্রয়োজন নেই, অনার্য ডোমজাতীয় পুরোহিতরাই ধর্মপূজার কাজ করে থাকেন। হয়তো বা ধর্মঠাকুরের বিলম্বিত আবির্ভাবের জনও আর তার প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধিত হয়নি, ফলতঃ উচ্চ সমাজে আরোহণেরও তার আর সুযোগ ঘটে'নি। তৎসত্ত্বেও যেহেতু ধর্মমঙ্গলকাব্যগুলি রচনা করেছিলেন উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই, সেই কারণে সম্ভবতঃ নিজেদের মুখ রক্ষার জন্যই কবিরা ধর্মঠাকুরকে বিষ্ণু, শিব বা বুদ্ধের প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

ধর্মমঙ্গল

দুঃসাহসিক ক্রিয়াকলাপের বর্ণনায় ধর্মমঙ্গল কাব্য অনন্য। এ প্রয়োজনে কবিরা রামায়ণ-মহাভারতের প্রচুর কাহিনীকে একটু রূপান্তরিত ক'রে এই কাব্যের অঙ্গীভূত করেছেন। ধর্মঠাকুর অতি সুকৌশলে আপন মাহাত্ম্য-প্রচারে সচেষ্ট। বাহ্যতঃ তাঁকে যথেষ্ট নিরীহ মনে হ'লেও এ কূটকৌশলী দেবতাটি আত্মপ্রচার, পূজালোলুপতা বা প্রতিহিংসাপরায়ণতায় অপর কারো চেয়ে কম নন। ধর্মমঙ্গলে ধর্মঠাকুরের আসল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চণ্ডীর সঙ্গে। ধর্মঠাকুর নানাভাবে চণ্ডীকে হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করলেও কিন্তু প্রকারান্তরে চণ্ডীর মাহাত্ম্য তিনি বাড়িয়েই দিয়েছেন। ফলতঃ পাঠকের সশ্রদ্ধ ভক্তি গিয়ে পৌঁছয় চণ্ডীর চরণেই।

মনসা, চণ্ডী বা ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে যেমন তত্তৎ নামীয় মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হয়েছে, 'শিবায়ন'কে কিন্তু সেইদিক থেকে 'শিবমঙ্গল'-রূপে অভিহিত করা সম্ভবপর নয়। কারণ, প্রথমতঃ, শিব অনার্য দেবতা নন, দ্বিতীয়তঃ, শিবায়ন কাব্যে শিবের মাহাত্ম্য প্রচারের কোন সজ্ঞান প্রচেষ্টা নেই। উদ্দেশ্যমূলকতাবিহীন এই শিবায়ন কাব্যটি তাই পারিবারিক ছোটগল্পের মতো আস্বাদ্যমানতা লাভ করেছে। অপরাপর মঙ্গলকাব্যে দেবদেবীরা মর্ত্যলোকে পূজা লাভের জন্য কোন বিশিষ্ট মানব বা মানবীকে আশ্রয় ক'রে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। আর ঐ সব মানব-মানবীরাও এই বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই স্বর্গ থেকে শাপভ্রষ্ট হ'য়ে মর্তলোকে নেমে আসেন। কিন্তু শিবায়ন কাব্যের নায়ক স্বয়ং শিব, তাঁর মাহাত্ম্য-প্রচারের জন্য তিনি কোন মানব-মানবীর সহায়তা গ্রহণ করেন না। অথবা স্পষ্ট করেই বলা চলে, মাহাত্ম্য প্রচারের কোন প্রচেষ্টাই তাঁর মধ্যে লক্ষিত হয় না।

শিবায়ন

শিব পৌরাণিক দেবতা। আলোচ্য কাহিনীতে তাঁর পৌরাণিকত্ব অনেকটা নেপথ্যগত। তাঁকে নিয়ে যে কাহিনী শিবায়নে পরিবেষণ করা হ'য়েছে, সেখানে তিনি লৌকিক শিব— কৃষকবৃত্তি তাঁরা জীবিকা। মর্ত্যলোকে তিনি অপর যে কোন ইতর শ্রেণীর লোকের মতোই এবং লাম্পট্যপ্রিয়। অপরাপর মঙ্গলকাব্যের নায়ক-নায়িকাদের যেমন অশেষ সদ্‌গুণে মণ্ডিত ক'রে তোলবার চেষ্টা দেখা যায়, এখানে ঘটেছে তার বিপরীত ক্রম। দেবতাকে মাটির বুকে

নামিয়ে এনে তাঁকে ধূলি-ধূসরিত মাটির মানুষে পরিণত করা হয়েছে। বস্তুতঃ শিবায়ন কাব্যে পুরাণের খোলসে পল্লীবাঙলার একটি সত্যকার সাধারণ মানুষের জীবন কাহিনীই পরিবেষিত হ'য়েছে।

[দুই] মনসামঙ্গল কাব্য

বাঙলাদেশে প্রচলিত মঙ্গলকাব্যসমূহের মধ্যে 'মনসামঙ্গল' কাব্যই প্রাচীনতম ব'লে অনুমিত হয়। 'মনসামঙ্গল' কাব্যের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় বৃন্দাবনদাস-রচিত 'চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে' ঃ

'দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন।।'

এবং 'দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরী।
তাহার সেবনে সবে মহা দম্ভ করি।।'

এ ছাড়াও চৈতন্যপূর্ব-যুগেই যে তিন-চারি জন মনসামঙ্গল-কাব্যকার জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তা' প্রায় সকলেই স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। প্রাচীনতায় যেমন, ব্যাপকতায়ও মনসামঙ্গল তেমনি অনন্যসাধারণ। সর্ববঙ্গেই এর ব্যাপ্তি ছিল বললেও যথেষ্ট বলা হয় না. কারণ বাঙলাদেশের বাইরেও মনসামঙ্গল কাব্যের যে বহুল প্রচলন ছিল, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এর একটি সম্ভাব্য কারণ এই হতে পারে যে, প্রধানত নিম্নভূমি বলে এবং বাঙলাদেশের বহু অঞ্চল অরণ্য-অধ্যুষিত বলে প্রায় সমগ্র বঙ্গেই চিরকাল সর্পের উপদ্রব খুব বেশি, — আর 'মনসামঙ্গল' কাব্যে সর্প-দেবতা মনসার মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। অতএব সর্পভয় নিবারণের জন্য বাঙলাদেশে যে অসংখ্য মনসামঙ্গল কাব্য রচিত হবে তাতে বিস্ময়ের কোন অবকাশ নেই।

মনসামঙ্গলের প্রচার

পুরাণে যে সকল দেব-দেবী যথেষ্ট অথবা আদৌ প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ লাভ করেন নি, প্রধানত সেই সকল লৌকিক দেবতা দেশভাষায় রচিত মঙ্গলকাব্যের আসর জাঁকিয়ে বসেছেন। কতকগুলি অর্বাচীন পুরাণে (পদ্মাপুরাণ, দেবীভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ) মনসার সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও তিনি যে প্রকৃতই পৌরাণিক দেবী নন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বস্তুত, বাঙলাদেশে এই লৌকিক দেবতা সর্পমাতা মনসার উদ্ভব-সম্বন্ধে এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। মনসাপূজা প্রকারান্তরে সর্পপূজা। বাঙলাদেশ এবং পার্শ্ববর্তী উড়িষ্যা এবং আসামেই এই পূজার বহুল প্রচলন। প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদে সর্পের উল্লেখ থাকলেও তা' অধুনা-প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। যজুর্বেদে 'সরীসৃপ' অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হলেও এবং উক্ত বেদে বহুপ্রকার মন্ত্রতন্ত্রের উল্লেখ থাকলেও সর্পমন্ত্রের কোন উল্লেখ নেই। গৃহ্যসূত্রে সর্পপূজার উল্লেখ এবং মহাভারতে নাগজাতির সম্বন্ধে বিস্তৃত আখ্যায়িকা প্রচলিত থাকলেও বস্তুত বাঙলাদেশে পূজিতা মনসাদেবী

মনসার উদ্ভব

এবং মনসামঙ্গল-কাহিনীর সঙ্গে এদের দূরতম সম্পর্কও অনুমান করা কঠিন। শবর-কুমারী-রূপিণী জাঙ্গুলীদেবী নামে বৌদ্ধদের একজন দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। সম্ভবত ইনি মূলে ছিলেন জঙ্গলবাসিনী। ইনি সর্প-বিষমোচয়িত্রী এবং বীণাবাদিনী। বৈদিক সরস্বতীর সঙ্গে জাঙ্গুলীদেবীর এইদিক থেকে সাদৃশ্য বর্তমান—কারণ বৈদিক সরস্বতীও সর্পবিষমোচয়িত্রী এবং শবরকন্যা। গুণসাম্যের দিক থেকে এইভাবে মনসার উপর বৈদিক ও বৌদ্ধপ্রভাব অনুমান করা চলে। কিন্তু শুধু এই ক্ষীণতম সূত্র থেকে মনসাপূজার বিস্তৃতির কোন ব্যাখ্যা হয় না। এর জন্য অন্য কোন প্রাচীন সূত্র সন্ধান করতে হবে। প্রাচীনতর পৃথিবীর বহুদেশেই সর্পপূজার প্রচলন ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রজনন শক্তির প্রতীক-রূপেই এই সর্পপূজার প্রচলন ছিল। প্রাচীন বাঙলায় প্রাপ্ত মনসা মূর্তিতে যে নরশিশু, ফল বা পূর্ণঘট খোদিত আছে, তা প্রজনন শক্তিরই প্রতীক। প্রাচীন তুরাণী জাতির মধ্যেই সর্বপ্রথম সর্পপূজার সৃষ্টি হ'য়েছিল, পণ্ডিতেরা এরূপ অনুমান করে থাকেন। আর এই তুরাণী জাতি থেকেই নাকি ভারতীয় দ্রাবিড় জাতির উৎপত্তি হ'য়েছে। শেষোক্ত সিদ্ধান্তটি সত্য হোক, মিথ্যা হোক, দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় জাতির মধ্যে সর্পপূজা যে অতি প্রাচীন এবং বহু-প্রচলিত ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মোহেঞ্জোদরোর অধিবাসীদের মধ্যে সর্পপূজার যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তা' থেকেও উপযুক্ত উক্তিটির পরিপূর্ণ সমর্থন মিলে। বিশেষত মাতৃতান্ত্রিক দ্রাবিড় জাতির মধ্যেই স্ত্রী-দেবতাদের পূজার প্রচলন স্বাভাবিক— পক্ষান্তরে বৈদিক আর্য-সমাজে স্ত্রীদেবতার কোন স্থান ছিল না। কার্যক্ষেত্রেও দেখা যায়, সমগ্র ভারতবর্ষে একমাত্র দাক্ষিণাত্য এবং দ্রাবিড়-প্রভাবিত বাঙলাদেশেই স্ত্রীদেবতা মনসার পূজা প্রচলিত। দ্রাবিড়দের মধ্যে 'মুদ্‌মা' এবং 'মনে মঞ্চাম্মা' নামে দু'জন সর্পদেবীর অস্তিত্ব আছে। 'মনে মঞ্চাম্মা' অবশ্য কোন দেবী নহেন, এক অজ্ঞাত-পরিচয় সর্পের নাম, কিন্তু সর্পদেবীরূপেই তিনি পরিচিতা। শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন অনুমান করেন, ''মাঞ্চীদেবীকে সেখানে 'মঞ্চাম্মা' বা 'মন্‌চা অম্মা' অর্থাৎ মন্‌চা মাতা বলে। ইহারা 'চ'-কে প্রায 'স'ব মত উচ্চারণ কবে। কাজেই 'মনচা অম্মা' 'মনসা মাতা'য় গিয়া দাঁড়ায়।'' শাস্ত্রী মহাশযেব এই অনুমান অসঙ্গত নাও হতে পাবে। খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাত্যায়ন-রচিত কার্তিকের 'মনসা দিব্যতে ...' থেকে কোন আলোক পাবার সম্ভাবনা নেই। অতএব মনে হয়, বৈদিক, বৌদ্ধ ও দ্রাবিড় প্রভাবের ফলেই বাঙলাদেশে মনসার সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল।

বাঙলাদেশে মনসাপূজার প্রচলন কবে থেকে আরম্ভ হ'য়েছে, তা সুস্থিরভাবে বলা সম্ভব না হ'লেও সেনরাজাদের রাজত্বকালেই যে অন্তত মনসামূর্তি নির্মিত হ'য়েছিল, তা' বিজয়সেন-নামাঙ্কিত মনসামূর্তি থেকেই অনুমান করা চলে। অসম্ভব নয় দাক্ষিণাত্য থেকে আগত সেন বংশীয রাজাদের সঙ্গেই মনসাপূজাও বাঙলাদেশে প্রবর্তিত হয়েছিল। বিজয়সেন খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান করা চলে। এই মূর্তিটি ছাড়া আরও বহু মনসামূর্তি বাঙলাদেশ ও সন্নিহিত অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাচীন মূর্তি-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন যে খ্রীষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই এই সকল মূর্তি নির্মিত হ'য়েছিল। এই সিদ্ধান্ত থেকে অনুমান করা চলে যে, বাঙলাদেশে যখন ব্যাপকভাবে মনসাপূজার প্রচলন

বাঙলায় মনসাপূজা

হ'লো, তখনই সমসাময়িককালে রচিত অথবা সংস্কৃত অর্বাচীন পুরাণগুলিতে মনসাদেবীর কাহিনী যুক্ত হ'লো। উক্ত পুরাণগুলির কোনটিই খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত নয় বলেই পণ্ডিতগণ মনে করেন। সংস্কৃত পুরাণে মনসা কাহিনী যুক্ত হ'বার ফলে পরবর্তীকালে উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও দেশভাষায় মনসা-কাহিনী বর্ণনা করবার সাহস এবং উৎসাহ লাভ করে থাকতে পারেন।

মনসার উদ্ভব এবং বাঙলাদেশে এর পূজা সম্বন্ধে এইবাবে একটা সম্ভাব্য ইতিহাস গড়ে তোলা সম্ভবপর হলেও মনসামঙ্গল কাহিনীর উদ্ভব-সম্বন্ধে আলোকপাত করা এখনও সম্ভবপর হয়ে উঠছে না। সংস্কৃত পুরাণের প্রভাবে মনসামঙ্গল কাব্যের প্রথমাংশ রচিত হ'য়ে থাকতে পারে; মহাভারতের আস্তীক মুনির কাহিনী থেকে মনসামঙ্গল কাব্যের আরও কিছু উপাদান আহৃত হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু উক্ত কাব্যের মূল কাহিনীটির উৎপত্তির উৎস কোথায়, তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। অনুমান, প্রাচীন কোন লৌকিক কাহিনীর উপর ভিত্তি করে মনসামঙ্গল কাব্যের মূল গল্পের কাঠামোটি গ্রহণ করা হ'য়েছে। কাব্যের প্রধান পাত্র-পাত্রীদের নাম—লখাই, বেহুলা, সায়বেনে প্রভৃতির নাম থেকে কাহিনীটির উপর অনার্য প্রভাবও অনুমান করা চলে। অন্ততপক্ষে, ব্রাহ্মণ্য-প্রধান সমাজব্যবস্থার সঙ্গে যে গল্পটিকে খাপ খাওয়ানো যায় না, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। বাঙলাদেশের এবং সন্নিহিত অঞ্চলের বহুস্থানেই এমন অনেক গ্রাম বা প্রাচীন কীর্তির সন্ধান পাওয়া যায়, যাদের সঙ্গে মনসামঙ্গল কাব্য-বর্ণিত চরিত্র অথবা ঘটনার সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হ'য়ে থাকে। এ থেকে অনেকেই অনুমান করেন যে মনসামঙ্গল কাব্যের মূল কাহিনীর কোন প্রাচীন ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকাও অসম্ভব নয়।

কাহিনীর উদ্ভব

প্রচলিত মনসামঙ্গলের কাহিনী তিনখণ্ডে বিভক্ত—প্রথম খণ্ডে পৌরাণিক কাহিনী—এতে মনসার উৎপত্তি-আদি ঘটনা বর্ণিত হ'য়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে মনসার মর্তলোকে পূজা-প্রচার-প্রসঙ্গে চাঁদসদাগরের সঙ্গে সংঘর্ষের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হ'য়েছে। তৃতীয় খণ্ডে বেহুলা ও লখীন্দরের কাহিনী পরিবেষণ করা হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে মূল মনসামঙ্গল কাব্যে শঙ্কর গাড়রী ও নেতা ধোপানীর কাহিনী আরও অনেক বেশ প্রাধান্য লাভ করেছিল—পরবর্তীকালে চাঁদসদাগরের ও বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনীই মূল কাহিনীর সবটুকু অধিকার ক'রেছে। কাহিনীতে পাওয়া যায়, শৈব চন্দ্রধর মনসার শাপে চম্পকনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর স্ত্রী সনকা মনসা পূজার আয়োজন করেছেন বলে শৈব চন্দ্রধর পদাঘাতে মনসার ঘট ভেঙে ফেললেন। এতে রুষ্ট মনসা অতিশয় প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে চাঁদের শত্রুতাসাধনে প্রবৃত্ত হ'লেন। মনসার রোষ-বহ্নিতে চাঁদের গুয়া-বাড়ি বিধ্বস্ত হ'লো; চাঁদের পরমবন্ধু ধন্বন্তরী ওঝা মনসার কৌশলে নিহত হ'লেন। তবুও ছিল চাঁদের মহাজ্ঞান, মনসা নটীর ছদ্মবেশে চাঁদকে ভুলিয়ে তার মহাজ্ঞানও হরণ করলেন। এর পর মনসা কৌশলে অন্নে বিষ মিশ্রিত ক'রে চাঁদের ছয়পুত্রকে হত্যা করলেন। চাঁদসদাগর তবুও অটল, শিবের প্রতি তার ভক্তি অচলা, মনসা তার নিকট

মনসামঙ্গলের কাহিনী

অতিশয় ঘৃণার পাত্র। কিন্তু চাঁদের অজ্ঞাতে সনকা মনসার পূজা করে পুত্রবর লাভ করেন। সর্পের দেবতা অনিরুদ্ধ-পত্নী ঊষা সায়বেনের ঘরে জন্ম নিলেন। চাঁদসদাগর চোদ্দ ডিঙ্গা সাজিয়ে দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্যে বেরিয়েছেন। বাণিজ্যে প্রচুর লাভ ক'রে চাঁদ যখন ফিরে আসেন, তখনও পথিমধ্যে মনসা চাঁদের পূজা প্রার্থনা করেছেন, — কিন্তু চাঁদ অবিচল। মনসার রোষ রুদ্ররূপ ধারণ করল—চাঁদের চোদ্দ ডিঙ্গা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হ'লো। চাঁদসদাগরের মৃত্যুই ঘটত — কিন্তু চাঁদের মৃত্যু হলে মর্ত্যলোকে মনসার পূজা-প্রচারের কোন সম্ভাবনা নেই বলে মনসাই চাঁদকে বাঁচিয়ে রাখলেন। অনাহারক্লিষ্ট চাঁদ দেশে ফিবে এসে দেখলেন, পুত্র লখীন্দর পূর্ণ যৌবনে উপনীত। তিনি সায়বেনের কন্যা বেহুলার সঙ্গে লক্ষীন্দরের পরিণয়কার্য সম্পন্ন করে বরবধূকে লোহার বাসরে আবদ্ধ রাখলেন। কিন্তু মনসার নির্মমতায় বিবাহরাত্রে লোহার বাসরেই সর্পাঘাতে লক্ষীন্দর প্রাণ হারালো। বেহুলা স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে স্বামীর মৃতদেহ কলার ভেলায় ভাসিয়ে চলল স্বর্গের উদ্দেশ্যে—আত্মীয়-স্বজনদের কোন অনুরোধই বেহুলা গ্রাহ্য করল না।পথেব বহু বাধা-বিপত্তি, ভয়-প্রলোভনকে জয় ক'রে বেহুলা পৌঁছলো নেতাধোপানীর ঘাটে। তারপর নেতার সহায়তায় বেহুলা দেবরাজের সভায় উপনীত হ'য়ে নৃত্যে দেবতাদের তুষ্ট ক'রে স্বামীর প্রাণভিক্ষা পেলো। কিন্তু তাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হ'লো, দেশে ফিরে শ্বশুরকে দিয়ে বেহুলা মনসার পূজা করাবে। এইবার বেহুলা পুনর্জীবিত স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরে এলো। পুত্রবধূর সাধনায় চাঁদেব হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটল, তিনি মনসার পূজা করলেন।

মনসামঙ্গল-কাহিনীর মূল উদ্দেশ্য, মনসার পূজা প্রচার। দেবতার মধ্যে যে সকল দিব্যগুণের সমাবেশ ঘটলে ভক্তের প্রাণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে ভক্তিতে দেবতার উদ্দেশ্যে লুটিয়ে পড়ে, বলাবাহুল্য, মনসার মধ্যে তাদের একটিও যদি বর্তমান থাকতো, তবে হয়তো কাহিনী-বর্ণনার প্রয়োজনই হ'তো না। সর্প-দেবতা মনসার চরিত্র সর্পের মতই খল, কুটিল, ক্রুর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। ভক্তিতে নয়, ভয় দেখিয়ে তিনি চাঁদসদাগরের পূজা লাভ কবতে চাইলেন। ভযেব সঙ্গে প্রলোভন, কাকুতি-মিনতি, অনুরোধ-উপরোধ মনসার পক্ষ থেকে এদের কোনটিরই অভাব ঘটল না, কিন্তু আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী মূর্তিমান পুরুষকার এবং স্বীয় অভীষ্টদেবতাদের প্রতি একান্তভাবে নির্ভরশীল শৈবসাধু চাঁদসদাগর মনসার প্রতি আকৃষ্ট

মনসাপূজা ও সামাজিক পটভূমি

হ'বার কোন সঙ্গত কারণ পেলেন না। অথচ, বৈশ্যসম্প্রদায়ের কর্ণধাব চাঁদসদাগরের পূজা লাভ করতে না পারলে মর্ত্যলোকে মনসাব পূজা প্রচারিত হ'বে না। অতএব মনসার মনে আর কোন দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, বিচারবুদ্ধি-বহিত হ'য়ে তিনি প্রবলপরাক্রমে চাঁদসদাগরেব বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হ'লেন। সংগ্রামক্ষেত্রে চাঁদসদাগরের অটল, অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী মনসা অদৃশ্যলোকে থেকে চাঁদসদাগরকে আঘাতের পর আঘাত ক'বে চলেছেন। আঘাতে আঘাতে চাঁদের দেহমন ভেঙে গেছে, কিন্তু মাথা তার তিলমাত্র নত হয় নি। মনসা চাঁদের নিযতি চাঁদ সমগ্র পুরুষকার নিযে নিয়তির প্রতিটি আঘাতকে প্রতিহত করতে চেষ্টা করেছেন।

গ্রন্থের সমাপ্তিতে চাঁদ মস্তক নত করেছেন। মনসার প্রবল উন্মত্ততার কাছে এই আত্মসমর্পণ নয়। চাঁদ স্নেহের পারবশ্যই স্বীকার করেছেন। আদর্শবাদী চাঁদ মনসার বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত হয়েছিলেন, এই সংগ্রামে তার প্রতিপক্ষ নিয়তি-স্নেহ-দয়া-মায়া যে সকল দিব্যগুণ নরত্বকে দেবত্বের মহিমায় উন্নীত করে, চাঁদের মধ্যে সেই সকল গুণের সমাবেশ ঘটেছিল বলেই তিনি নিয়তির অত্যাচারকে উপেক্ষা করেও স্নেহের দাবিতেই নিয়তির নিকট পরাজয় স্বীকার করেছেন। নিয়তির হাতে পুরুষকারের এই চরম লাঞ্ছনার মধ্যেও মনুষ্যত্বের জয় ঘোষিত হয়েছে। আবার, চাঁদসদাগরের সমস্ত কিছু ফিরে পাবার মধ্যেও ট্র্যাজেডির মর্মন্তুদ হাহাকার লুক্কায়িত থাকে নি। বস্তুত, মনসামঙ্গল কাব্যে মনসার যে চরিত্র চিত্রিত হয়েছে, সমগ্র মঙ্গলকাব্যে তেমন অপকৃষ্ট দেবচরিত্র যেমন আর একটিও নেই, তেমনি চাঁদসদাগরের মত মহিমোজ্জ্বল, পুরুষকারের জীবন্ত বিগ্রহ অথচ স্নেহ-পরবশ চরিত্রও একটি নেই। সমগ্র মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে চাঁদসদাগর-চরিত্র এই প্রদীপ্ত মহিমায় ভাস্বর। কাহিনীর খাতিরে যদি তাকে শেষ পর্যন্ত নিয়তির কাছে পরাভব স্বীকার করতে না হতো, তবে আমরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারতাম যে, পাঁচশতাব্দী পূর্বেই বাঙলা সাহিত্যে মানবিকতার জয় ঘোষিত হয়েছে।

চাঁদসদাগর

মনসামঙ্গল কাব্যধারার বৈশিষ্ট্য। মনসামঙ্গল কাব্যধারায় 'মনসামঙ্গল'ই সম্ভবতঃ প্রথম রূপ লাভ করে। আদি মধ্যযুগেই এই কাব্যধারার অন্ততঃ তিনজন প্রথম সারির কবির সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছিল, অপর কোন কাব্যধারার কবির উপস্থিতি-বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় না বলেই পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে, তা' নয়, কাব্যের আভ্যন্তর কিছু লক্ষণও এর সমর্থক। লৌকিক অনার্য দেবতাকে এই কাব্যেই প্রথম উপস্থাপিত করা হয়েছে বলে দেবীর অনার্যোচিত, গুণ বা দোষই কাব্যে বর্তমান রয়েছে, তিনি পৌরাণিক দেবীদের তুল্য হয়ে উঠতে পাবেন নি। মনসার চরিত্রে আদিম অনার্যোচিত রূঢ় নিষ্ঠুরতা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতার উপর তখনও পর্যন্ত আর্যসংস্কারের প্রলেপ পড়েনি।

সামগ্রিক বিচারে অপর মঙ্গলকাব্যগুলির তুলনায় মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনী অনেক সংহত, এবং যথার্থই কেন্দ্রাভিগ। কাহিনী যথেষ্ট বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত ঘটনাই চাঁদ-মনসার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হয়েছে। কয়েকটি উপকাহিনী অবশ্য রয়েছে —'হাসান হোসেন পালা', 'শঙ্কর গারুড়ি' কাহিনী প্রভৃতি। গ্রন্থের উপাস্যা দেবী মনসার মাহাত্ম্য কীর্তনে এদের আবশ্যকতা রয়েছে।

'মনসামঙ্গল কাব্যে' মনসা-চরিত্রের মতোই চাঁদসদাগরের চরিত্রেও আদিম যুগের বলদৃপ্ত পৌরুষের পবিচয় বর্তমান। একমাত্র উপাস্য দেবতা শিব ছাড়া শিব-কন্যা মনসার প্রতিও তার কোন সৌজন্যবোধ পর্যন্ত নেই। এখানেও তার ব্যবহার একান্ত রূঢ়, অমার্জিত। কাব্যের ভাষাতেও তেমনি, অমসৃণ কর্কশতা অর্থাৎ যুগলক্ষণ এখানেও বর্তমান।

মনসামঙ্গল কাব্যে সমকালীন যুগ-জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু কাব্য-বর্ণিত কাহিনী কিংবা কাব্যোক্ত চরিত্রগুলি যে যুগচিহ্নলাঞ্ছিত, তেমন কথা বলা যায় না। চাঁদসদাগর ও বেহুলা-লখিন্দর কাহিনীর কোন বাস্তব ভিত্তি থাকা অসম্ভব নয়, কারণ বাঙলা ও তার

সন্নিহিত অনেক অঞ্চলেই এদেব স্মৃতিযুক্ত স্থানেব পবিচয পাওযা যায। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বীকাব কবতে হয যে, কাহিনীটি গড়ে উঠেছিল অনেক পূর্বেই, তাবপব ঐগুলি লৌকিক কাহিনী-রূপে যখন আদি-মধ্যযুগেব কবিদেব হাতে পৌঁছলো, তখন তা' বিস্তব পল্লবিত এবং অলৌকিকত্বও প্রাপ্ত হযেছে। কাব্যোক্ত চবিত্রগুলিও যুগপ্রতিনিধি নয, কাবণ সমকালে চাঁদেব মতো ব্যক্তিত্বপূর্ণ, পৌরুষমণ্ডিত, দৃপ্ত চবিত্র নাযকেব কল্পনাই সেকালেব পক্ষে অকল্পনীয ছিল বলে মনে হয। চাঁদ ছিলেন পৌবাণিক যুগেব মহাকাব্যধাবাব খাঁটি আর্য-প্রতিনিধি, যিনি লৌকিক ধর্মেব সঙ্গে সমন্বযেব সপক্ষে ছিলেন না। সেকালেব কবিব পক্ষেও সমন্বযেব চবিত্র-কল্পনায দুঃসাহিকতাব পবিচয আছে।

দক্ষিণ পাটনে চাঁদসদাগবেব বাণিজ্য গমনেব কাহিনী কবিব যুগেই স্মৃতি-মাত্রে পর্যবসিত। সমকালীন বাঙালী একবাবেই কূপমণ্ডুক। কাজেই বাণিজ্য বৃত্তান্তটি পূর্বস্মৃতিব ভিত্তিতে কল্পিত কাহিনী — ফলতঃ অবাস্তবতায পূর্ণ। মধ্যযুগেব কবিবা এই বাণিজ্যেব একটা প্যাটার্ন কল্পনা কবে নিযেছেন, সকলেব কাব্যেই এই ছাঁচ ব্যবহৃত হযেছে।

তবে কাব্যে সমকালীন সমাজ জীবনেব চিত্র অঙ্কনে অবশ্য কবিগণ কৃপণতা কবেন নি। জন্মাবধি হিন্দুব দশকর্ম-বিধান, বিবাহাদিব বর্ণনা প্রভৃতি গতানুগতিক বর্ণনাব মধ্যে সমকালীন জীবনেব পবিচয পাওযা যায। সাধাবণ মানুষেব অশন-বসন, আচাব-আচবণ, ভাবনা-কামনাব মধ্যে যে অনার্য জীবনেব বহু প্রভাবই স্বাঙ্গীকৃত হযে গেছে, তাব পবিচযও বর্তমান।

চাঁদেব বলদৃপ্ত পৌরুষ মধ্যযুগেব পুরুষেব মধ্যে বর্তমান ছিল না, এ কথা নিশ্চিত, কিন্তু সনকাব মাতৃত্ব অর্থাৎ তাব বাৎসল্য যে সেকালেব মতো একালেব মাতৃহৃদযেব এক স্বাভাবিক অভিব্যক্তি, তা যথার্থভাবেই প্রতিফলিত হযেছে। আবাব বেহুলা চবিত্রেব অভিনব জীবন কামনা এবং এমন একটি প্রতিবোধী চবিত্র সেকালে কল্পনা কবা কঠিন হলেও তাব সতীত্ব এবং সহনশীলতা বাঙালী চবিত্রেব বৈশিষ্ট্যেব সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অবশ্য একালেব কিছু কিছু বাঙালী কন্যাব মধ্যে যে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ দেখা গেছে, তাতে এমন একটি চবিত্রেব আবির্ভাব আকস্মিক ঘটনা নাও হতে পাবে।

সমাজ সমন্বযেব প্রথম যুগে জালো মালোব কাহিনীব মধ্যে তাব যাথার্থ্য অনুভব কবা যায, কিন্তু হাসান-হোসেনেব পালাটি মনে হয পববর্তী কালেব সংযোজনা। কাবণ, বৃহত্তব বাঙালী সমাজে বহিবাগত মুসলিম ধর্ম স্বীকৃতি পেলেও তা' কখনও স্বাঙ্গীকৃত হয নি, কিছুটা প্রতিবোধ বযে গেছে, তেমন মনে হওযা স্বাভাবিক।

যা হোক্, 'মনসামঙ্গল কাব্য'ধাবাব মধ্য দিযেই যে বাঙালীব প্রথম মৌলিক সাহিত্য সাধনা শুরু হযেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং সেই বিচাবে 'মনসামঙ্গল কাব্যে'ই যে বাঙলা সাহিত্যেব বিজয যাত্রা শুরু হযেছিল, সেই মর্যাদা তাকে দান কবতেই হয। সর্বপ্রকাব মঙ্গলকাব্যেব মধ্যে 'মনসামঙ্গল' কাব্যেব ব্যাপ্তি ও পবিচিতি যেমন সমধিক, তেমনি জনপ্রিযতাযও এটি সর্বোপবি। আজো সাবা বাঙলাব বহুস্থানেই শ্রাবণ মাসেব অপবাহ্নে বহু পল্লীবমণী সমবেতভাবে এই কাব্যেব সুব-সহ পাঠ ভক্তি সহকাবে শুনে থাকেন। অপব কোন মঙ্গলকাব্যেব এই বিশিষ্টতা নেই।

'মনসামঙ্গল কাব্যে'র কবিগণ

১. কানা হরিদত্ত। মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কাব্যকার সম্ভবত কানা হরিদত্ত। বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' বা 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যে পাওয়া যায় –

'মুর্খে রচিত গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত।।
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে।।'

বিজয়গুপ্ত ছাড়া পুরুষোত্তম নামক একজন গায়েনের রচনায়ও পাওয়া যায় –

'কানা হরিদত্ত হরির কিঙ্কর
মনসা হউক সহায়।
তার অনুবন্ধ লাচাড়ির ছন্দ
শ্রীপুরুষোত্তম গায়।।'

বিজয়গুপ্তের জীবৎ-কাল-সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ হস্তগত হ'য়েছে তাতে তাঁকে চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি বলেই বিশ্বাস করা যায়। অতএব বিজয়গুপ্তের কালেই যদি হরি দত্তের গীত লুপ্ত হ'য়ে থাকে, তবে তিনি যে বিজয় গুপ্ত অপেক্ষাও অন্তত শতাব্দীকাল পূর্বে বর্তমান ছিলেন, তাতে সন্দেহের কোন কাবণ থাকতে পারে না। অসম্ভব নয়, হরিদত্ত হয়তো আদি-মধ্যযুগেরও পূর্ববর্তী যুগসন্ধিকালে বর্তমান থেকে তাঁর 'গীত রচনা করেছিলেন–কিন্তু এটিও অনুমান মাত্র। বিজয়গুপ্ত যদিও উল্লেখ করেছেন যে হরিদত্তের গীত সমস্ত লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল, তা' সম্ভবত সত্য নয়। কারণ সাম্প্রতিক কালেও 'হরিদত্ত' ভণিতাযুক্ত কিছু কিছু রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। হরিদত্তের রচনার অংশবিশেষ মাত্র পাওয়া যায় বলেই তাঁর কাব্যের পরিচয় দান সম্ভব নয়। তবে প্রাপ্ত অংশ থেকে অন্তত অনুমান করা চলে যে, কানা হরিদত্ত যেমন মূর্খ ছিলেন না, তেমনি তাঁর রচনায় যে যোড়াগাঁথা কিছুই ছিল না, এই অপবাদও মিথ্যা। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে 'দাস হরিদত্ত'-ভণিতাযুক্ত 'কালিকামঙ্গল' পুথির গ্রন্থকার হরিদত্তের পাণ্ডিত্য-সম্বন্ধেও সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত সকল রচনাই ময়মনসিংহ জেলায় পাওয়া গিয়েছে বলে, অন্য কোন প্রবলতর প্রমাণের অভাবে, এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে, হবিদত্ত মযমনসিংহ জেলার অধিবাসী ছিলেন।

২. বিজয়গুপ্ত। সন তাবিখযুক্ত মনসামঙ্গল কাব্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বিজযগুপ্ত-রচিত 'পদ্মাপুরাণ'। বিজয়গুপ্তেব বচনায যে কালবাচক পয়ারটি পাওয়া যায, তার বিচিত্র পাঠান্তর বিজয়গুপ্তেব কালনির্ণযে প্রবল বাধার সৃষ্টি করেছে। উক্ত পয়ারের প্রথম পংক্তিতে এই বিপত্তি –

(১) ঋতু শূন্য বেদ শশী শক পরিমাণ। (১৪০৬ শক = ১৪৮৪ খ্রীঃ)
(২) ঋতু শশী বেদ শশী শক পরিমাণ। (১৪১৬ শক = ১৪৯৪ খ্রীঃ)

(৩) ছায়াশূন্য বেদ শশী শক পরিমাণ।

এরূপ আরও অনেক পাঠান্তর পাওয়া যায়, যাদের অর্থ নির্ধারণ কষ্টকর।

পয়ারের দ্বিতীয় পংক্তিতে আছে, —

'সুলতান হোসেন শাহ নৃপতি তিলক।'

সুলতান হোসেন শাহের সঙ্গে যোগ রাখতে হ'লে দ্বিতীয় পাঠান্তরই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। হোসেন শাহ ১৪৯৩ খ্রীঃ—১৫১৮ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। অতএব বিজয়গুপ্ত ১৪৯৪ খ্রীঃ কাব্য রচনা করেন, — এটি মোটামুটি সিদ্ধান্ত। বিজয়গুপ্তের পুথির কোন প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পাওয়া না যাওয়ায় ডঃ সুকুমার সেন বিজয়গুপ্তের প্রাচীনত্ব বিষয়েও সন্দিহান। তিনি কবি না হ'য়ে গায়েনও হতে পারেন, ডঃ সুকুমার সেনের মনে এই সন্দেহও বর্তমান। বিজয়গুপ্তের রচনায় কালবাচক অংশের প্রামাণিকতাও তাঁর মতে অবিসম্বাদিত নয়।

বিজয়গুপ্তের আত্মপরিচয়

বিজয়গুপ্ত তাঁর কাব্যে আত্মবিবরণ প্রদান করেছেন। তা' থেকে জানা যায় যে কবি বরিশাল জেলার গৈলাফুল্লশ্রী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতা সনাতন, মাতা রুক্মিণী— কবি বৈদ্য-বংশজাত। হরিদত্ত-সম্বন্ধে বিজয়গুপ্তের উক্তিতে অশ্রদ্ধার পরিচয় থাকলেও কাব্যে অলঙ্কারাদি-সম্বন্ধে যে বিজয়গুপ্ত শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, তা উক্ত উক্তিটি থেকেই অনুমান করা যায়। বস্তুত, পাণ্ডিত্যাভিমানী বিজয়গুপ্ত তাঁর কাব্যে অলঙ্কার, মিল ইত্যাদি ব্যাপারে অতি সতর্কতারই পরিচয় দিয়ে গেছেন। বিজয়গুপ্ত ভাবভূয়িষ্ঠ বাগ্‌-বিন্যাসেও যথার্থতা প্রতিপাদন করছে। মধ্যযুগের আদিপর্বের কবিদের মধ্যে শিল্পচেতনায় বিজয়গুপ্ত যে অপর কবিদের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন, এ কথা স্বীকার করতেই হয়। সমসাময়িক যুগ ও জীবন থেকে কবি যে অভিজ্ঞতা আহরণ করেছিলেন, কাব্যে তার পরিচয় বর্তমান। তাঁর অঙ্কিত সামাজিক চিত্রগুলির অংশবিশেষ রুচিবিগর্হিত বলে মনে হ'লেও এদের বাস্তবতা নিঃসংশয়িত। এই প্রসঙ্গে তিনি যে রসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তা' স্থূল হ'লেও যে সমসাময়িক যুগের পক্ষে বেমানান হয় নি তাও অস্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃ তাঁর রচনায় অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই হাস্যরস। বিজয়গুপ্তের দৃষ্টি ছিল বৈচিত্র্যের প্রতি। তাই সমগ্র কাহিনীটি যেন অনেকগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ-প্রায় পালায় পালায় বিভক্ত হ'য়ে আছে। কাহিনী-পরিকল্পনা থেকে আরম্ভ করে তার ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ইত্যাদি প্রায় সর্বত্রই কবির বৈচিত্র্য-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। ছন্দে বৈচিত্র্য-সৃষ্টির জন্যই যেন তিনি প্রচলিত অক্ষরবৃত্তের বন্ধন ছেড়ে লৌকিক ছড়ার ছন্দেরও নিদর্শন রেখেছেন, তেমনি পয়ারের বাঁধা-ধরা রূপকল্পকেও এড়িয়ে গেছেন —

'প্রেতের মনে শ্মশানে থাকে মাথায় ধরে নারী।
সবে বলে পাগল পাগল কত সৈতে পারি।।'

'জগতমোহন শিবের নাচ।
সঙ্গে নাচে শিবের ভূত পিশাচ।'

ছন্দের পরীক্ষা নিরীক্ষায় বিজয়গুপ্ত সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের অপেক্ষা অনেকটা অগ্রগামী—এ বিষয়ে পরবর্তীকালেব ভারতচন্দ্রকে তাঁর সার্থক উত্তরসূরী বলে অভিহিত

করা চলে। বিজয়গুপ্ত মনসার একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন। কারণ রচনায় কবির সহানুভূতি চাঁদ অপেক্ষাও মনসার প্রতিই যে অধিকতর আকৃষ্ট হ'য়েছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিজয়গুপ্ত দেখাতে চেয়েছেন যে, মনসা জন্মাবধি এমন কতকগুলি প্রতিকূল শক্তি-দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন যে পরবর্তীকালে তাঁর নিরুদ্ধ চিত্তবেদনাই তাঁকে এমন প্রতিহিংসাপরায়ণ ও নিষ্ঠুর করে তুলেছে। মনসা-চরিত্রাঙ্কনে বস্তুতঃ তিনি যথেষ্ট সাফল্যেরও পরিচয় দিয়েছেন। জন্মাবধি ঘটনা-পরম্পরায় তার চরিত্র ক্রমবিকশিত হয়ে উঠায়, মনে হয়, যেন প্রকৃত ভক্ত-রূপেই বিজয়গুপ্ত মনসা-চরিত্র-মাহাত্ম্য প্রকাশ করবাব জন্য কাহিনীটি নির্বাচন করেছিলেন। অন্যান্য দেব-চরিত্রাঙ্কনেও বিজয়গুপ্ত অনেকটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। মনে হয় মনসামঙ্গলের প্রধান কবিদের মধ্যে বিজয়গুপ্তই চাঁদসদাগরের প্রতি সর্বাধিক অবিচার করেছেন। তাঁর হাতে চাঁদসদাগর শেষ পর্যন্ত এমনভাবে মনসার ভক্ত বনে গিয়েছেন যে, চাঁদের পূর্ববর্তী চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবে এই সমস্ত সত্ত্বেও স্বীকার করতে হয় যে মনসামঙ্গল কাব্যের কবিদের মধ্যে ব্যাপকতায় ও জনপ্রিয়তার বিজয়গুপ্তই শ্রেষ্ঠ।

কাব্যবিচার

৩. নারায়ণদেব। মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম প্রধান কবি নারায়ণদেব। নারায়ণদেবের গ্রন্থে আত্মপরিচয় অংশে কবি নিজের যে পরিচয় প্রদান করেছেন, তা' থেকে জানা যায় যে, ময়মনসিংহ জেলার বোরগ্রামে কবির বাসস্থান ছিল। তাঁর পূর্বপুরুষগণ রাঢ় দেশে থেকে বোরগ্রামে এসেছিলেন। কবির পিতা নরসিংহদেব, মাতা রুক্মিণী। কবি জাতিতে কায়স্থ। সম্ভবত তাঁর উপাধি ছিল 'সুকবিবল্লভ'। কবির গ্রন্থে কোন কালবাচক ভণিতা না থাকায় তাঁর কালনির্ণয়ে বহিঃপ্রমাণের উপরই একান্তভাবে নির্ভর করতে হয়। ডক্টর ভট্টচার্য কবির বংশধরগণের নিকট থেকে যে বংশতালিকা উদ্ধার করেছেন, তাতে তার তাৎকালিক বংশধর ছিলেন অষ্টাদশ পুরুষ, তা' থেকে অনুমিত হয়, কবি অন্তত সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। তাঁর কাব্যে চৈতন্যদেবের উল্লেখ বা প্রভাবের পরিচয় নেই, এমন কি পূর্ববর্তী কোন মঙ্গলকাব্যেরও উল্লেখ নাই। এ থেকেই বোঝা যায় যে তিনি চৈতন্য-পূর্ববর্তী কালে বর্তমান ছিলেন। সম্ভবত তিনি যখন কাব্যটি রচনা করেন, তখনও পর্যন্ত হরিদত্তের নাম তাঁর কানে পৌছায় নি। এই সমস্ত কারণে কেউ কেউ নারায়ণদেবকে বিজয়গুপ্তেরও পূববর্তী বলে মনে করেন। ডঃ সুকুমার সেন কোনরূপ কাল-বিচার না করেই নারায়ণদেবকে ষোড়শ শতাব্দীতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

অসমীয়া ভাষায় নারায়ণদেবের গ্রন্থ সুলভ বলে আসামবাসীগণ নারায়ণদেবকে অসমীয়া বলেই উল্লেখ করে থাকেন। অথচ নারায়ণদেবের নিজের রচনাতেই উল্লেখ আছে যে তিনি বঙ্গদেশীয়। অবশ্য এই প্রসঙ্গে বলা চলে যে নারায়ণদেব বাঙলাদেশের যে অঞ্চলে বাস করতেন তা' আসামের শ্রীহট্ট জেলার অতি সন্নিহিত; কাজেই তাঁর রচনায় আসামের প্রভাব পড়া বিচিত্র নয়। এবং তৎকালে

আবির্ভাবকাল সমস্যা

ঐ অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে অসমীয়া ভাষার খুব একটা মৌলিক পার্থক্যও ছিল না। তবে তিনি আসামে কোচ-বংশীয় দরঙ্গ সভায় বর্তমান থেকে তাঁর মনসা-পাঁচালী বা পদ্মাপুরাণ অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন বলে যে প্রবাদটি প্রচলিত আছে, তা' যর্থাথ না হওয়াই সম্ভব। কারণ, তা' হলে কবিকে সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। অথচ তিনি যে তৎপূর্বেই বর্তমান ছিলেন, তার প্রমাণ পরবর্তী মনসামঙ্গল কাব্যকারদের রচনাতেই সুলভ। হয়তো, কবির প্রসিদ্ধির জন্যই পরবর্তীকালে কেউ তাঁব কাব্যকে অসমীয়া ভাষায অনুবাদ করে থাকতে পারেন।

নারায়ণদেব একাধিকবার উল্লেখ করেছেন যে তিনি সংস্কৃত পুরাণ থেকেই তাঁর কাব্যের বিষয় গ্রহণ করেছেন । কিন্তু কোন সংস্কৃত পুরাণেই এই কাহিনীর উল্লেখ না থাকায় অনুমিত হয যে, মূলে কাহিনীটি সংস্কৃত ভাষাব কোন উপপুরাণ কিংবা স্থানীয় পুবাণে বিবৃত হয়েছিল। অন্যান্য বহু পুবাণ-উপপুরাণের মত এইটিও বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। নাবাযণদেবের কাহিনী মোটামুটি অন্যান্য মঙ্গলকাব্যেব মত হলেও এতে এমন কতকগুলি অস্পষ্টতা এবং সংক্ষিপ্ততা আছে যে, স্বভাবতই মনে হয, মঙ্গলকাব্যের ধারা সৃষ্টি হ'বার পূর্বেই তিনি কাব্যটি বচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর কাহিনীর জনপ্রিয়তাব জন্য এতে বহু প্রক্ষিপ্ত রচনা প্রবেশাধিকার পেযেছে। আগাগোড়া নারায়ণদেবের ভণিতাযুক্ত কোন পুথিই আব এখন সুলভ নয়। কাব্যক্ষেত্রে ইতঃপূর্বে কোন সুনির্দিষ্ট আদর্শ ৰূপ বর্তমান না থাকায় কবির কাব্যটি যেন অনেকটা শ্লথবদ্ধ। কাহিনী, অলঙ্কাব কিংবা বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের প্রতিও কবির দৃষ্টি যে খুব সচেতন ছিল, তাও মনে হয না। কিন্তু নাবাযণদেবের যে পাণ্ডিত্যের অভাব ছিল, তাও নয়। তাঁর পাণ্ডিত্য কখনও কাব্যেব উপব দুর্ভাব হয়ে বসে নি। নারায়ণদেবের কবিত্ব ছিল সহজ। সহজ কবিত্বের প্রকাশে এবং করুণবস-সৃষ্টিতে নারায়ণদেব সত্যসত্যই অতুলনীয়। নারায়ণদেবের সর্বাধিক কৃতিত্ব চাঁদসদাগরের চরিত্রাঙ্কনে। তাঁর কাব্যের নায়ক চাঁদসদাগর। একমাত্র নারায়ণদেবের কাব্যেই চাঁদ-চরিত্র পবিপূর্ণতা লাভ করেছে। মনসা-বিদ্বেষী চাঁদ স্নেহের নিকট বশ্যতা স্বীকাব করে শেষ পর্যন্ত মনসার পাযে অঞ্জলি দান করেছেন, কিন্তু শ্রদ্ধায় মাথা নত হয় নি। নারায়ণদেবের চাঁদ শিবভক্ত, কোন কারণেই অপরের নিকট শির নত কববেন না। শত বিপদের মধ্যে পড়েও তিনি তার মনের এই দৃঢ় বিশ্বাস কিছুতেই হাবান নি। তাই সর্বস্ব হারিয়েও তিনি বলেন,

কাব্যবিচার

'কি কবির পুত্রে মোর কি কবির ধনে।
না পূজিব পদ্মাবতী দৃঢ় কৈল মনে।।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাঁদ এই মনোভাব নিয়ে থাকলে কাব্য-রচনায় সার্থকতা থাকে না, মনসার মাহাত্ম্যও স্বীকৃত হয় না। তাই শেষ মুহূর্তেই কবিকে গতানুগতিকতার দায়ে চাঁদ চরিত্রে অসঙ্গতি বিধান করতে হয়েছে। বস্তুত পরাজয় স্বীকার করলেও এখানে চাঁদসদাগর আপনার মনুষ্যত্বকে কখনও বিকিয়ে দেন নি। একমাত্র নারায়ণদেবের গ্রন্থেই চাঁদ-চরিত্রের এই পূর্বাপর সঙ্গতি বজায় থেকেছে।

৪. বিপ্রদাস পিপিলাই। চৈতন্য-পূর্ববর্তী কালের আর একজন মনসামঙ্গল-কাব্যকার কবি বিপ্রদাস পিপিলাই। বিপ্রদাসের গ্রন্থে যে আত্মপরিচয়জ্ঞাপক পয়ারটি আছে তা' থেকে জানা যায় যে, কবি হোসেন শাহের রাজত্বকালে ১৪৯৫ খ্রীঃ তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন.ঃ

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হোসেন শাহা গৌড়ের প্রধান।।

কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে প্রক্ষেপ-বাহুল্যের জন্য এবং কালজ্ঞাপক পয়ারটির স্বপক্ষে অপর কোন প্রমাণের অস্তিত্ব নেই বলে ডক্টর ভট্টাচার্য অনুমান করেন যে কাব্যটি একান্তই অর্বাচীন। এতে এমন কতকগুলি স্থানের নাম পাওয়া যায়, যেগুলি নিতান্তই আধুনিক। আবার বিপ্রদাসের রচিত কোন প্রাচীন পুথিরও সন্ধান পাওয়া যায় না। এ থেকে ডঃ ভট্টচার্যের অনুমান, বিপ্রদাসের জীবৎকাল ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু ডঃ সেন বিপ্রদাসের কালজ্ঞাপক পয়ারটির প্রামাণিকতায় এতই আস্থাবান যে তিনি বিপ্রদাসকেই মনসামঙ্গল কাব্যের 'আদি কবি' বলে মনে করেন। এই বিশ্বাসে তিনি বিপ্রদাসের রচনা বিস্তৃতভাবে উদ্ধার করেছেন। বিপ্রদাসের আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় যে কবির নিবাস ছিল চব্বিশপরগণা জেলার বাদুড্যা (নাদুড্যা) বটগ্রামে। কবির পিতার নাম মুকুন্দ পণ্ডিত, জাতিতে ব্রাহ্মণ। স্থানীয় অঞ্চলে এখনো নাগপঞ্চমীর দিন থেকে আরম্ভ করে নয় দিন পর্যন্ত বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল' গীত হয়ে থাকে। কবির রচনায় যে সর্প-সজ্জার বিবরণ পাওয়া যায়, তা মনোজ্ঞ। কবি চাঁদের বাণিজ্য-যাত্রা প্রসঙ্গে যে পথের বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে নোতুনত্ব আছে। এই যাত্রাপথে কলকাতার নামও বর্তমান। সম্ভবত বাঙলা কাব্যে এটিই কলকাতার প্রাচীনতম উল্লেখ। কলকাতার প্রাচীনত্ব কথঞ্চিৎ পরিমাণে স্বীকৃত হলেও এর সঙ্গে বিপ্রদাসের কাব্যে এমন আরও কিছু স্থান-নাম এবং প্রসঙ্গ এসে গেছে, যার ফলে কাব্যের প্রাচীনত্বে আস্থা স্থাপন করা কষ্টকর। এই স্থান-নামগুলির মধ্যে আছে—হুগলী, ভাটপাড়া, কাঁকিনাড়া, পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, চাপদানি, ইছাপুর, রিষড়া, সুখচর, কোন্নগর, কোতরং, কামারহাটি, দিগঙ্গা, ঘুসুড়ি, চিৎপুর, বারুইপুর প্রভৃতি। এদের মধ্যে অধিকাংশই ইংরেজ আমলে প্রসিদ্ধি লাভ করে; অর্থাৎ হুগলী নদীর দুই কূলে বিভিন্ন কলকারখানা গড়ে উঠবার পরই বিশেষ পরিচিতি লাভ করে।

পরিচয়-কাব্যবিচার

গ্রন্থে কবি সপ্তগ্রামের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা' কিন্তু ষোড়শ শতকের পূর্ববর্তী অবস্থার কথাই মনে করিয়ে দেয়। এই পরস্পরবিরোধী অবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান-কল্পে অনুমান করা চলে যে, বিপ্রদাস ১৪৯৫-৯৬ খ্রীঃ মূল কাব্যটি রচনা করেছিলেন সাতটি পালায় ('বিস্তারে কহিব সপ্তনিশি'), কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে গ্রন্থে ১৩টি পালা থাকায় স্বভাবতই মনে ক'রে নিতে হয় যে অবশিষ্ট ৬টি পালা সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। তাই মূল কাহিনীতে প্রাচীনতার চিহ্ন বর্তমান থাকলেও প্রক্ষিপ্ত অংশে আধুনিকতার পরিচয় ধরা পড়ে গেছে। বিপ্রদাসের কবিত্ব-শক্তি অবজ্ঞেয় নয়।

[তিন] চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর পূর্বসূরী-রূপে মাণিকদত্তের নাম উল্লেখ ক'রে গেছেন।

'মানিকদত্তেরে বন্দোঁ করিয়া বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীত পথ পরিচয়।।'

হয়তো বা মাণিকদত্তই 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের আদি কবি। কিন্তু তাঁর গ্রন্থ অপ্রাপ্য হওয়াতেই চৈতন্যোত্তর যুগের কবিদের নিয়েই চণ্ডীমঙ্গল কাব্য শুরু করা হয়। এই কারণেই চণ্ডীমঙ্গল কাব্য-সম্পর্কিত যাবতীয় আলোচ্য বিষয়ই চৈতন্যোত্তর যুগে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি চণ্ডীমঙ্গল-জাতীয় চৈতন্যপূর্ব-যুগের একখানি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হওয়াতে বিষয়টি এখানে সন্নিবিষ্ট হলো। ('চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' -বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরে যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।)

সম্প্রতি বিশিষ্ট গবেষক পঞ্চানন মণ্ডল 'পুঁথিপরিচয়' নামক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে কবিচন্দ্র শঙ্কব কিঙ্কর মিশ্র-চরিত 'গৌরীমঙ্গল' নামক একখানি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। আসলে এটি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যই। গ্রন্থে রচনার তারিখ উল্লেখ করে বলা হয়েছে—

'নব শশী সুর ইন্দ্র শক পরিমিত।
কবিচন্দ্র মিশ্র বলে চণ্ডীর চরিত।।'

এ থেকে পঞ্চাননবাবু তারিখ বার করেছেন ১৪১৯ শক — ১৪৯৭-৯৮ খ্রীঃ। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক সুখময় মুখোপাধ্যায়ও তারিখটি সমর্থন করেন। গ্রন্থেব একটি আভ্যন্তর প্রমাণও এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

'পৃথিবীর সার রাজ্যে পঞ্চগৌড় নাম।
নৃপতি হুসেন শাহা কলিযুগে রাম।।'

বস্তুতঃ এই তারিখে হোসেন শাহ্‌কেও পাওয়া যাচ্ছে। অতএব কবির উক্তিকে প্রামাণিক বলে গ্রহণ ক'রে তাঁকেও চৈতন্য-পূববর্তী তথা আদি-মধ্য যুগেই স্থান দেওয়া সঙ্গত।

কবি আত্মপরিচয়ে উল্লেখ করেছেন যে, সপ্তগ্রাম মধ্যে বালাণ্ডা নামক পুরীর গুণিজনেরা অনুরোধ জানিয়ে তাঁকে বলেছিলেন—

'পাঁচালী প্রবন্ধে রচ গৌরীমঙ্গল।'

গ্রন্থের ভণিতায় কবি বহুবিধ নাম বা উপাধি গ্রহণ করেছেন—'কবিচন্দ্র, কবিচন্দ্র মিশ্র, শ্রীকবি শঙ্কর, শঙ্কর কিঙ্কর' প্রভৃতি। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে 'কবিচন্দ্র শঙ্কর' নামক এক কবি ছিলেন ভূরিস্রষ্টা — সাহিত্যের সর্ববিধ শাখায় তাঁর বিচরণ ছিল স্বচ্ছন্দ। ইনিই তিনি কিনা কে জানে! কবিচন্দ্র-রচিত 'গৌরীমঙ্গল' কাব্যের মাত্র ২১ পৃষ্ঠা পাওয়া গিয়েছে। গ্রন্থের ক্ষুদ্র খণ্ডাংশ থেকে গ্রন্থ বিষয়ে কোনপ্রকার আলোচনাই সম্ভবপর নয়।

পঞ্চাননবাবু বলেন যে রাজশাহীর 'বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি' গ্রন্থাগারে কবিচন্দ্র মিশ্রের (সন ১১৯৬ মাঘ) 'গৌরীমঙ্গল' কাব্যের সমগ্র পুথিই বর্তমান রয়েছে। গ্রন্থটি পরমেশ্বর দাস নামক জনৈক ব্যক্তির আদেশে রচিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

পঞ্চাননবাবুর মতে রাজশাহীব গ্রন্থে মঘি সনের উল্লেখ থাকায় এটি চট্টগ্রামে রচিত হয়েছিল বলেই অনুমিত হয়। তা ছাড়া উক্ত গ্রন্থে 'শঙ্কর কিঙ্কর' ভণিতা নেই। অতএব ইতি পৃথক কবি, তার আবির্ভাব আরও পরবর্তী কালে ঘটেছিল বলেই মনে করা হয়।

অতএব আলোচ্য গ্রন্থটি এবং রাজশাহীর প্রাপ্ত গ্রন্থটির অভিন্নতা বিষয়ে আরো তথ্য আবিষ্কৃত না হওযা পর্যন্ত আলোচ্য গ্রন্থ-বিষয়ে অধিক কোন আলোচনাই সম্ভবপর নয়। তা' ছাড়া রাজশাহীর পুথিতে প্রাপ্ত গ্রন্থের তারিখ যদি ১১৯৬ মঘি হয়ে থাকে, তবে তা অষ্টাদশ শতকেরও শেষপর্বেব (১৭৮৯ খ্রীঃ) রচনা হবার কথা, অতএব এই পর্বে আলোচনাব প্রশ্নই উঠে না।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতক

[এক] গৌড়দরবার ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

বাষ্ট্রবিপর্যযে যেমন দেশের শিল্প-সাহিত্যের সমূহ ক্ষতি সাধিত হয, তেমনি দেশে সুশাসন অব্যাহত থাকলে শিল্প-সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটে থাকে। বস্তুতঃ এই জন্যই দেখা যায় যে, ঘন ঘন বাজনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্তন কিংবা অরাজকতা দেশের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনেক সময়ই সর্বনাশের কাবণ হ'যে থাকে। পক্ষান্তরে রাজনবর্গের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা শিল্পসাহিত্যেব প্রভূত উন্নতি বিধান করে থাকে। বাঙলাদেশের ইতিহাস আলোচনা করলেই দেখা যাবে, রাষ্ট্র-যন্ত্র যতবার হস্তান্তবিত হয়েছে, ততবারই সাহিত্যের ইতিহাসে ও গতিপথের পরিবর্তন ঘটেছে। ত্রযোদশ শতাব্দীর আরম্ভে, হিন্দু রাজত্বের অবসানে বাঙলাদেশে যে

যুগপবিবর্তন ও সাহিত্য

যুগান্তব দেখা দিয়েছিল, দীর্ঘদিনের অরাজকতা ও দুঃশাসনের ফলে সেই যুগে আর কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচিত হলো না। আবার ইলিয়াস-শাহী শাসন প্রবর্তিত হ'বার সঙ্গে সঙ্গে যেমন দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপিত হলো তেমনি প্রায সমসময়েই বাঙলা সাহিত্যেও নবজাগরণ দেখা দিল। ইলিয়াস বংশের অবসানেব পর কিছু বিবতি-সহ যথাক্রমে রাজা গণেশ ও তাঁর বংশধরগণ এবং সুলতান হোসেন শাহ ও তাঁব বংশধরগণ গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। হোসেন শাহের বংশের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলাদেশে কার্যত স্বাধীন সুলতানী আমল তথা পাঠান শাসনকালের সমাপ্তি ঘোষিত হয়। এই সুলতানী শাসনকালে বাঙলাদেশে মোটামুটি সুশাসন চলছিল, এই কালে বচিত বাঙলা সাহিত্যেও তার প্রতিফলন দেখা যায়। রাষ্ট্র-যন্ত্র এর পর মুঘল সম্রাটদের হাতে চলে গেল, বাঙলা সাহিত্যও আবার স্পষ্টত মোড় ঘুরল। পাঠান-শাসনকাল বাঙলা সাহিত্যের 'আদি-মধ্য যুগ' এবং মুঘল শাসনকাল 'অন্ত্য-মধ্য যুগ' নামেই অভিহিত হয়।

পাঠান শাসকদের সাহিত্যে পৃষ্ঠপোষকতা। হিন্দু রাজত্বকালে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মোটামুটি পূর্বতন কাঠামোই বজায় ছিল। কিন্তু সুলতানী আমলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। পূর্বে দেশে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ভাষা ছিল সংস্কৃত। কিন্তু মুসলমান শাসকদের নিকট সংস্কৃত ভাষার তেমন কোন আবেদন ছিল না। অনুমান, দেশের প্রজাসাধারণের নিত্যব্যবহার্য বাঙলা ভাষার প্রতিই তাঁরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আর এই

কারণেই, সমসাময়িক গৌড়াধিপতিদের অনেকেই যে বাঙলা ভাষায় সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন, তার বহু লিখিত প্রমাণ বর্তমান।

মুসলমান শাসকগণ বিধর্মী এবং বিজাতি হলেও বাঙলাদেশ আপনাদের কর্মভূমি ছিল বলে তাঁরা হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে বহু বাঙালীকেই রাজসভায় স্থান দান করেছেন, এবং সাহিত্য-রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। এমনও দেখা গিয়েছে, রাজার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও কোন কোন কবি সশ্রদ্ধভাবেই রাজার নাম উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে অপর একটি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। এই পাঠান-শাসকগণ ধর্মে, ভাষায় এবং জাতীয়তার মূলতঃ বাঙালী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ হলেও এ অঞ্চলে স্থায়ী বসবাসহেতু বস্তুতঃ বাঙালীই হয়ে গিয়েছিলেন, তারা কেউ আর স্বদেশে ফিরে যান নি, পুরুষানুক্রমে এখানেই অবস্থান করতেন। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই বাঙলা ভাষায় প্রতি তাদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাওয়া ছিল একান্ত স্বাভাবিক পরিণতি। হয়তো বা বাঙলা ভাষায় বাগ্-ব্যবহারেও তাঁরা আর অনভ্যস্ত ছিলেন না। কাজেই বাঙলা ভাষার প্রতি তাঁদের প্রীতি অকারণ বা অযৌক্তিক ছিল না।

গৌড়েশ্বরের মাতৃভাষা চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা

ইলিয়াসী শাহী বংশের প্রথমদিকের কোন নরপতি সক্রিয়ভাবে বাঙলার কোন কবিকে কাব্য-রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন জানা যায় না, কিন্তু পরবর্তী নরপতিদের কেউ কেউ যে কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইলিয়াস শাহী বংশের মাঝখ'নেই কিছুকালের জন্য হিন্দু রাজা গণেশ এবং তাঁর মুসলমান বংশধরগণ রাজত্ব করেছিলেন, তা' কৃত্তিবাস স্বয়ং শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করে গিয়েছেন। কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক গৌড়েশ্বর যে কে ছিলেন, তা' এখন আর সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। ডঃ সেন অনুমান করেন, ঐ সময় গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন বাঙলার একমাত্র হিন্দু রাজা গণেশ বা কংস। পরে গণেশের পুত্র যদু পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন; তিনি রাজনৈতিক বা অন্য কোন কারণে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে 'জালালুদ্দিন' নামে পরিচিত হ'লেন। তিনি কোন কবির পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন কিনা তার কোন প্রমাণ নেই। তবে তিনিও যে বিদ্বান পণ্ডিতদের রাজসভায় শ্রদ্ধার আসন দান করতেন, তার প্রমাণ রয়েছে। গণেশ রাজদরবারে পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতার যে নজীর স্থাপন করেছিলেন, তা' দীর্ঘকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল বলেই জানা যায়। রায়মুকুট বৃহস্পতি নামক বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত জালালুদ্দিন (গৌড়াবনী-বাসব)-এর নিকট থেকে যথাক্রমে 'আচার্য, কবি চক্রবর্তী, পণ্ডিত সার্বভৌম, কবি-পণ্ডিতচূড়ামণি, মহাচার্য, রাজপণ্ডিত' এবং সর্বশেষ 'রায়মুকুটমণি' উপাধি লাভ করেছিলেন।

রাজা গণেশ

গণেশের বংশধরদের হাত থেকে গৌড়ের শাসনভার আবার ইলিয়াসী শাহী সুলতানী বংশের হাতে চলে গেল। এই বংশের রুক্নউদ্দিন বারবাক্ শাহ্ অথবা তৎপুত্র য়ুসুফ শাহ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থ-রচয়িতা মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খান' উপাধি দান করেন। মালাধর বসু কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করেছেন 'গৌড়েশ্বর দিল নাম গুণরাজ খান'।

হোসেন শাহ্ বাঙলার মুসলমান সুলতানদের মধ্যে সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে একদিকে যেমন বাঙলা সাহিত্য প্রভূত উন্নতি লাভ করেছিল, তেমনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবও তাঁর রাজত্বকালের একটি বিশিষ্ট ঘটনা। পূর্ববর্তী গৌড়েশ্বরের মত তিনি কোন কবিকে রাজসভায় বিশেষভাবে সম্বর্ধিত করেছিলেন কিনা জানা যায় না; তবে তাঁর রাজসভায় যে সমসাময়িক যুগের অনেক কবি ও পণ্ডিত ব্যক্তি বিশিষ্ট রাজপদ বা সম্মান লাভ করতেন, তা' জানা যায় না। হোসেন শাহের দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেছেন, এমন অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদেরও সন্ধান পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে অনেকেই উৎকৃষ্ট সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য রচনা করেছেন। গৌড়দরবাবের 'দবীর খাস' (Private Secretary) সনাতন গোস্বামী এবং 'সাকর মল্লিক' (Chief Secretary) রূপ গোস্বামী বাঙলার বৈষ্ণব-সমাজে অতি উচ্চ আসন লাভ করে থাকেন। এই দুই ভাই বৃন্দাবনের ষড়্ গোস্বামীদের অন্যতম। কনিষ্ঠ রূপ গোস্বামী কয়েকটি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন—এদের মধ্যে 'উদ্ধবসন্দেশ' ও 'গীতাবলি' প্রধান। এই যুগের আরও কয়েকজন সংস্কৃত ভাষার কবিও গৌড়দরবার অলঙ্কৃত করতেন বলে জানা যায়। সুলতান হোসেন শাহের একজন কর্মচারী ছিলেন শ্রীখণ্ড-নিবাসী যশোরাজ খান। যশোরাজ খান একটি ব্রজবুলির পদে শ্রদ্ধার সঙ্গে হোসেন শাহের কথা স্মরণ করেছেন। বাঙলা মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান দুই কবি বিজয়গুপ্ত এবং বিপ্রদাস পিপিলাই — এঁরাও নিজেদের রচনার কালবাচক পয়ারে শ্রদ্ধার সঙ্গে হোসেন শাহের কথা উল্লেখ করেছেন। হোসেন শাহ সিংহাসনে উপবিষ্ট হবার স্বল্পকাল মধ্যেই যে সমগ্র গৌড়বঙ্গে তাঁর কীর্তি ঘোষিত হয়েছিল, আলোচ্য শ্লোকাংশ দুটি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

হুসেন শাহ

সুলতান হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ-শাহ্-ও যে বাঙলার কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বাঙলার 'ছোট বিদ্যাপতি' কবিরঞ্জনের একটি রচনায়। কবিরঞ্জন নরসৎ শাহের কর্মচারী ছিলেন। নসরৎ শাহের পুত্র ফিরোজ শাহ্ মাত্র অল্প কয়দিন রাজত্ব করলেও তিনি যে কাব্যানুরাগী ছিলেন এবং কবিদের উপযুক্ত সমাদর করতেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় কবি শ্রীধরের রচনায়। তিনি নসির সাহার পুত্র রাজা শ্রীফিরোজ সাহার সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন।

নসরৎ শাহ

হোসেন শাহের লস্কর (সেনাপতি) পরাগল খান চট্টগ্রামের শাসক ছিলেন। তাঁর আদেশে ও পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর যে মহাভারত রচনা করেন, সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি তাকে উল্লেখ করেছেন 'পরাগলী মহাভারত' বলে। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁও পিতার মত বাঙলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর আদেশে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের বিস্তৃত অনুবাদ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটি 'ছুটি খাঁর মহাভারত' নামে প্রসিদ্ধ। হোসেন শাহের জ্যেষ্ঠপুত্র নসরৎ শাহ্ 'ছুটি খাঁ' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর আদেশে এই অনুবাদ কার্য হ'য়ে থাকতে পারে।

১৫৩৩ খ্রীঃ ফিরোজ শাহ্কে হত্যা ক'রে তাঁর পিতৃব্য আব্দুল বদর গিয়াসুদ্দিন মাহ্মুদ

নাম নিয়ে পাঁচ বছর গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ১৫৩৮ খ্রীঃ আফগান বীর শেরশাহ্ গৌড় অধিকার করেন। শেরশাহ্ কিছুকালের জন্য দিল্লীর সিংহাসনেও আসীন ছিলেন। তাঁর বংশ 'শূর বংশ' নামে বিখ্যাত। শেরশাহ্ দিল্লী থেকে গৌড়বঙ্গের শাসন পরিচালনা করতেন। তিনি পাঁচ বছর দিল্লী সিংহাসনে আসীন থাকার পর তাঁর পুত্র ইসলাম শাহ্ পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হন।

দিল্লীর আধিপত্য ও সাহিত্যে পৃষ্ঠপোষকতার অভাব

১৫৫৩ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর এক আত্মীয় মুহম্মদ শাহ্ আদিল কিছুদিনের জন্য দিল্লীর অধিকার হস্তগত করলেও আকবরের হাতে তাঁর পরাজয় ঘটে। এই সঙ্কটকালে ১৫৬৪ খ্রীঃ শেরশাহের এক কর্মচারী তাজ খাঁ করনানি বাঙলার সিংহাসন অধিকার করেন এবং 'করনানি' বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫৬৫ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যুতে অনুজ সুলেমান খাঁ বাংলার সুলতান হন। উড়িষ্যা থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত ভূভাগ তিনি তাঁর শাসনসীমার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। ১৫৭২ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যুর পর অল্পকালের জন্য তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বায়োজিদ এবং পরে কনিষ্ঠ পুত্র দাউদ খাঁ বাঙলার সিংহাসনের অধিকারী হন। দাউদ খাঁ বাঙলার রাজধানী গৌড় থেকে টাঁড়ায় স্থানান্তরিত করেন। ১৫৭৪ খ্রীঃ আকবরের সেনাপতি মুনিম খাঁ রাজধানী টাঁড়া অধিকার করেন। করনানি বংশের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার পাঠান রাজত্বেরও সমাপ্তি সূচিত হয়। এরপরেই গৌড়বঙ্গে মুঘল শাসনের সূত্রপাত।

করনানি বংশ

বাঙলায় মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে অবশ্যই কিছুটা সময় লেগেছিল। বাঙলায় দিল্লীর প্রথম সুবেদার নিযুক্ত হয়েছিলেন হুসেন কুলি বেগ, ইনি 'খান-ই-জাহান' উপাধি নিয়ে মোট তিন বৎসর (১৫৭৫-৭৮ খ্রীঃ) সুবেদারি করেছিলেন। এরপর মুজাফ্ফর খাঁ তুরবতির সুবেদারি কাল থেকে বাঙলার বুকে আবার দুঃশাসন ও অরাজকতার সূত্রপাত। মুঘল রাজকর্মচারীদের বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার ডামাডোলে পাঠান দলপতিরাও বিভিন্ন স্থানে মাথা তুলে দাঁড়ায়। এঁদের দমন করবার জন্য ঘন ঘন সুবেদার পরিবর্তন করা হয়। অবশেষে ১৫৯৪ খ্রীঃ বাদশা আকবর মানসিংহকে গৌড়-বাঙলায় শান্তি-শৃঙ্খলা এবং শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার মানসে সুবেদার ক'রে পাঠান। ১৬০৫ খ্রীঃ-র মধ্যেই মানসিংহ সমগ্র দেশে মোটামুটি শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। এই বৎসরই আকবরের মৃত্যুতে একটা যুগের অবসান ঘটে গেলো।

[দুই] সামাজিক পটভূমি

কালের দিক থেকে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের মধ্যে শতাব্দীর ব্যবধান মাত্র, কিন্তু বাঙলার সামাজিক প্রেক্ষাপটে সেই ব্যবধান গুণগতভাবেও ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পঞ্চদশ শতকের বাঙলার বুকে পাঠান শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত—সুলতান হোসেন শাহ্ এবং তাঁর বংশধরগণ দেশে মোটামুটিভাবে শান্তি, স্বস্তি ও বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছেন। হোসেন শাহী বংশের

অবসানেই আবার বাঙলার সিংহাসনে নিয়ে কাড়াকাড়ি এবং সেই যুগে বাঙলার উপর লোলুপ দৃষ্টি পড়লো দিল্লীর মুঘল বাদশাহদের। ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে পাঠান-আফগানদের যাবতীয় ক্ষমতাকে চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে দিয়ে দিল্লীর বাদ্‌শাহী ফরমান নিয়ে বাঙলাদেশকে শাসন করতে লাগলেন দিল্লীর নিযুক্ত সুবেদারগণ। ফলতঃ বাঙলাদেশ পাঠান শাসনকালে যে একধরনের স্বাধীনতা ভোগ করতো, তা থেকে হলো বঞ্চিত। সম্রাটের অধীনে সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হলো গৌড়বঙ্গে—এর ভালমন্দ দু'রকম ফলেরই ভাগীদার হলো দেশ।

বাঙলায় মুঘল শাসন

পাঠান শাসনকালে দেশ ছিল স্বাধীন—পাঠান সুলতানগণ এদেশকেই নিজেদের দেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন, এঁদের অনেকেই এদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন, অনুমান করা চলে। এঁরা হয়তো অনেকেই বাঙলা ভাষাকে নিজের ভাষারূপে গ্রহণ ক'রেছিলেন বলেই বহু কবিকে বাঙলা ভাষায় কাব্য রচনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং খুশি হ'য়ে অনেককে নানাভাবে পারিতোষিকও দিয়েছেন। ফলে বাঙলা সাহিত্যের নানা ধারা তাদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছিল। কবিরাও কৃতজ্ঞচিত্তে তাদের নাম কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করে ঋণশোধ করেছেন। এঁরা শাসন করতে গিয়ে শোষণ এবং লুণ্ঠন করলেও এদেশের ধনসম্পত্তি কোথাও নিয়ে যান নি। লুণ্ঠিত ধনও এদেশেই রয়ে গেছে, এ দেশের লোকজনই তা' ভোগদখল করেছে।

পক্ষান্তরে, মুঘলদের সঙ্গে এদেশের শাসক-শাসিত ছাড়া অপর কোন সম্পর্ক-সূত্রই স্থাপিত হয়নি। তাঁরা দিল্লীতে থেকে লোকজন দিয়ে দেশ শাসন করেছেন। দেশের কিংবা দেশবাসীর সঙ্গে কখনো কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়নি। এ দেশের ধন লুণ্ঠিত হয়ে অপরের সম্পদসৌভাগ্য বৃদ্ধি করেছে, এ দেশবাসীর তা'তে অমঙ্গলই সাধিত হয়েছে। বাঙলা সাহিত্যের সহায়তায়ও তাদের কোন ভূমিকা নেই। ষোড়শ শতকে বাঙলা সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করেছিল, এমন কি যুগটিকে অনেকেই 'সুবর্ণযুগ' বলেও অভিহিত করে থাকেন, কিন্তু সেই উন্নতি ঘটেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে, তার পশ্চাত রাজশক্তির কোনই দান বা ভূমিকা ছিল না।

তবে মুঘল শাসনকালে একটা সুফল লক্ষ্য করা গেছে। বাঙালী তখন বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ পেয়েছে বিভিন্ন ধর্মসূত্রে কিম্বা কর্মসূত্রে — যেমন বহু সাধু-সন্ন্যাসী কিংবা পীর-ফকির ও ব্যবসায়ী-সৈনিক বা পর্যটক গৌড়বঙ্গে উপনীত হয়েছে, তেমনি প্রভূত পরিমাণ বাঙালীও কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন বা দিল্লী যাত্রা করেছে। এর ফলে বাঙালীর মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা প্রসারিত হবার সুযোগ পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে ষোড়শ শতকের শেষদিকে, মুঘল শাসনের প্রারম্ভকালেই মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রভাব সর্বাধিক বিস্তারলাভ করে। কাজেই বাঙালীর এই মানস-প্রসারের কারণ শুধুই মুঘল শাসনে নিহিত নয়, চৈতন্যদেবের প্রভাবের কথাটাও প্রসঙ্গক্রমে স্মরণযোগ্য।

চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইলিয়াস শাহী শাসন প্রবর্তিত হবার পর থেকে সমগ্র

পঞ্চদশ শতাব্দী ধরে সমস্ত গৌড়বঙ্গে যে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল, তাতে সাধারণ বাঙালী মোটামুটিভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। পঞ্চদশ শতকের একেবারে শেষ দশকে শুরু হয় হোসেন শাহী আমল। তাঁর শাসনকালেই আবির্ভূত হন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব। অতি অল্প বয়সেই চৈতন্যদেব সমগ্র দেশে আপন অস্তিত্ব অনুভব করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এদিকে হোসেন শাহের শাসনব্যবস্থায় দেশে মোটামুটি শান্তি-শৃঙ্খলা ছিল অব্যাহত—এই অনুকূল পরিবেশে চৈতন্যদেবের প্রভাব সমাজে ও সাহিত্যে এত দ্রুত বিস্তারলাভ করে যে, ষোড়শ শতাব্দীকে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'সুবর্ণ যুগ' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

সাহিত্যের দিক থেকে এই প্রভাব ছিল বহু বিস্তৃত। এই শতাব্দীকেই রচিত হয় সব কটি প্রধান 'জীবনী-সাহিত্য', কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, অনিরুদ্ধ, রাম সরস্বতী প্রভৃতির 'মহাভারত কাব্য', মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল', তন্ত্রবিভূতির 'মনসামঙ্গল' এবং বিদ্যাপতি ব্যতীত অপর সব কয়জন প্রধান বৈষ্ণব মহাজন পদকর্তাও আবির্ভূত হয়েছিলেন এই ষোড়শ শতকেই।

গৌড়ের পাল রাজগণ ছিলেন বৌদ্ধ, কাজেই তাদের শাসনকালে বৌদ্ধধর্ম স্বাভাবিকভাবেই যে বিস্তারলাভ করেছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী সেন বংশের রাজত্বকালে তা' অনেকটা স্তিমিত হয়ে আসে। এর পর বাঙলাদেশে তুর্কী আক্রমণের ফলে গোটা হিন্দু সমাজেও একটা প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে। আত্মরক্ষার প্রাথমিক তাগিদে প্রথমে গুটিয়ে গেলেও ক্রমে তারা শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনে অন্ত্যজ সমাজের দিকে হাত বাড়ায়। এই অন্ত্যজ শ্রেণীর কিছু পরিমাণে হিন্দুদের সংখ্যা বৃদ্ধি করলেও ইসলামকে করেছে তারা বহুগুণিত। নির্জিত বৌদ্ধগণও বহুল পরিমাণে মুস্লিম সমাজের সঙ্গে মিশে যায়। ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম প্রবর্তিত হবার পরই অন্ত্যজ শ্রেণী বৌদ্ধদের অনেকেই বৈষ্ণব সমাজের অঙ্গীভূত হবার সুযোগ পায়। পাঠান শাসনকালে ক্রমক্ষীয়মাণ হিন্দুসমাজে হয়তো বা মহতী বিনষ্টির দিকে শনৈঃ শনৈঃ ধাবিত হচ্ছিল, ষোড়শ শতকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আবির্ভাব শুধু সেই ধ্বস নামাকে প্রতিরোধই করলো না, হিন্দুসমাজকে ভবিষ্যতের জন্যও সুরক্ষিত করে রাখলো। এতাবৎকাল যে সকল বৌদ্ধ ও অন্ত্যজ উচ্চবর্ণের হিন্দুদের নির্যাতনে কিংবা ইসলামের সাম্য-মৈত্রীর আদর্শে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, এইবার তারা চৈতন্যদেব-প্রচারিত প্রেমধর্মের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করতে লাগলো।

উচ্চবর্ণের হিন্দুরা স্মার্তসংস্কারের অধীন ছিলেন। বৃন্দাবনদাসের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, — জনসাধারণ ধর্ম-কর্ম বলতে রাত জেগে মঙ্গলচণ্ডীর গান, দম্ভ সহকারে বিষহরীর পূজা, বাশুলী পূজা বা মদ্য মাংস দিয়ে যক্ষপূজা ইত্যাদি নিয়েই ব্যস্ত থাকতো। স্মার্ত রঘুনন্দন নানাপ্রকার বিধিনিষেধ আরোপ করে সমাজব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাতে হয়তো সমাজের ধ্বংস হয়ে উঠতো অনিবার্য, যদি সেই সময় চৈতন্যদেবের 'আবির্ভাব না ঘটতো।

সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কে সম্ভবতঃ কোন অস্বাভাবিকতা ছিল না। মুসলমান

সুলতানদের অনেকেই উচ্চপদে হিন্দুদের নিয়োগ করেছেন, তাদের সাহিত্য রচনায় উৎসাহিত করেছেন, কাউকে কাউকে খেতাবও দিয়েছেন। কিন্তু অনেকেই আবার হিন্দুকে ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত করায় এবং মন্দির ভেঙ্গে মস্‌জিদ-নির্মাণে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করতেন, তারও প্রমাণ দুলর্ভ নয়। হোসেন শাহ্ রূপ, সনাতন-আদি অনেক হিন্দুকে অতিশয় উচ্চপদ দান করেছিলেন, আবার তাঁর সেনাপিত উড়িষ্যার গিয়ে দেবমন্দির ভেঙেছেন, দেবমূর্তি অপবিত্র করেছেন এবং হিন্দুর উপর উৎপীড়ন চালিয়েছেন।

পাঠান-আমলে গৌড়, টাঁড়া প্রভৃতি অল্প কয়টি নগরী গড়ে উঠলেও সার্বিকভাবে নাগরিকতার সৃষ্টি হয়নি। "কেন্দ্রীয় শাসন, সাম্রাজবাদী শক্তি ও বণিকধর্মী সমাজের প্রভাবে না আসিলে সুপরিকল্পিত নাগরিক জীবন ও নাগরিক মনোভাব গড়িয়া ওঠে না।" তাই দেখা যায় মুঘল আমলেই বাঙলায় প্রথম যথার্থ নাগরিক জীবনের সূচনা হয়।

ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে পাঠান আমলেই বাঙলাদেশে বিদেশি বণিক বিশেষভাবে পর্তুগীজদের যাতায়াত শুরু হয়েছিল। তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে কুঠি নির্মাণ কবে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু কবেছিল। দেশ-শাসনে তখনো বাঙালী হিন্দুর কিছুটা অধিকার ছিল। কিন্তু শতাব্দীব শেষার্ধে অর্থাৎ মুঘল আমলে সেই অধিকার অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল।

অধ্যায় ঃ বার

অন্ত্য-মধ্য যুগ
(১৫০০ খ্রীঃ – ১৮০০ খ্রীঃ)

বাঙলা সাহিত্যে অন্ত্য-মধ্য যুগের তথা চৈতন্যোত্তর যুগের ব্যাপ্তিকাল খ্রীঃ ১৫০০—১৮০০ অব্দ পর্যন্ত বিলম্বিত বলা চলে। এই পর্বের ষোড়শ শতক 'সুবর্ণযুগ', সপ্তদশ শতকে তার অনুবর্তন এবং অষ্টাদশ শতকটি মোটামুটিভাবে 'অবক্ষয় যুগ' নামেই চিহ্নিত হয়ে থাকে। ফলতঃ অন্ত্য-মধ্য যুগের প্রথম দুই শতকই সমৃদ্ধির যুগ এবং শেষ শতকে চলছিল আবাব ভাঙা-গড়ার খেলা, আর তাতে গড়ার কাজটি প্রায় অনতিলক্ষ্য।

[এক] সামাজিক পটভূমি

বাঙলায় হিন্দু রাজত্বের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন যুগের অবসান ঘটে এবং তুর্কী শাসনের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় যুগসন্ধিকাল (১২০০ খ্রীঃ - ১৩৫০ খ্রীঃ)। দীর্ঘকাল শাসনক্ষেত্রে অব্যবস্থা চলবার পর ইলিয়াস-শাহী রাজবংশের শাসন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে। এই সঙ্গে যুগসন্ধিকালেরও সমাপ্তি ঘটে এবং আদি-মধ্য যুগের সূত্রপাত হয় (আঃ ১৩৫০ খ্রীঃ থেকে)। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালে বাঙলাদেশে সুলতানী আমল বা পাঠান শাসন অন্তর্হিত হয। সবিস্ময়ে লক্ষ্য কবা যায় – বাঙলা সাহিত্যের অন্ত্য-মধ্য যুগের উদ্ভবও ঐ কালেই সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য শুধুমাত্র শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্যই এই অবস্থাব সৃষ্টি হয়েছিল—এরূপ মনে করলে ভুল করা হবে। পাঠান শাসনের প্রায় শেষদিকে, বাঙলার শ্রেষ্ঠ সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকালে এক অনুকূল পরিবেশে আবির্ভূত হলেন প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বাঙলাদেশের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙলা সাহিত্যতরী গতি লাভ ক'রেছিল, মহাপ্রভু চৈতন্যের আবির্ভাবে তবীর পালে হাওয়া লাগলো। অবশ্য বাঙলাদেশ মুঘল সম্রাটের অধীনে আসবার ফলে যে বাঙালীর জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে যথেষ্ট পবিবর্তন এনেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মুঘল সাম্রাজ্যের রাজনীতিক, আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি বাঙালীর নাগরিক

সামাজিক পটভূমি

জীবনের সম্মুখে এক নবদিগন্ত উদ্‌ঘাটন করে দিল। সমৃদ্ধির এই বৈচিত্র্য যে বাঙালীর সাহিত্য-জীবনেও পরিবর্তন এবং বৈচিত্র্য এনেছিল, তাও অনুমান করা চলে। আবার এই মুঘল-প্রভাব যখন জাতির দৃষ্টিকে অনেকটা বহির্মুখী করে তোলে, তখন বাঙলাদেশে চৈতন্য-প্রভাবই তাকে সংযত ও সংহত রেখেছে। ফলত আমরা দেখি একদিকে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব, অন্যদিকে মুঘল শাসন,—এতদুভয়ের সামগ্রিক প্রভাবেই বাঙলা সাহিত্যের মোড় ঘোরে এবং আদি-মধ্য যুগের অন্তে অন্ত্য-মধ্য যুগ এবং চৈতন্যোত্তর যুগের সৃষ্টি হ'লো। রাজশক্তির আনুকূল্য কখন কখন বাঙলা সাহিত্যের গতি-পথে কিছুটা প্রেরণা অবশ্যই জুগিয়ে থাকতে পারে কিন্তু একে একান্তভাবে কখনও নিয়ন্ত্রিত করতে পারে নি। বরং বলা চলে, বাঙালীর জাতীয় চেতনাব মর্মমূল থেকে উৎসাবিত এক প্রেরণাই পরবর্তী সাহিত্যধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, আর এই প্রেরণার অপর নামই 'শ্রীচৈতন্যদেব'।

মুঘল যুগে উত্তরণ

চৈতন্যদেব যদি কোন একটা বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদাযের গুরু হতেন, তবে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁকে নিযে বিশেষ মাতামাতি কববার প্রয়োজন হতো না। কিন্তু চৈতন্যদেব শুধুমাত্র একজন সাম্প্রদায়িক ধর্মগুরু ছিলেন না, বাঙালীর জীবন-সমুদ্র-মন্থনে এই চৈতন্যরূপী অমৃত-ভাণ্ডের উৎপত্তি। প্রেমেব অবতার চৈতন্যদেব মানবিক সম্পর্কের নবমূল্যায়ন ঘটালেন। ফলে, আদি-মধ্য যুগের সাহিত্যে যে মানবিকতার অঙ্কুরোদ্‌গম হয়েছিল, তাই চৈতন্য-আবির্ভাবের প্রত্যক্ষ ফল — বাঙলা সাহিত্যে জীবনী-কাব্য রচনা। অবশ্য বাঙালীর স্বভাবে আছে, —'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা'—তাই দেখি চৈতন্যদেবের জীবনী-গ্রন্থেও অলৌকিকত্বের অভাব নেই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও নরলীলাই যে সর্বোত্তম, বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠগণও তা' স্বীকার করেছেন। এই ভাবনারই সার্থক প্রকাশ ঘটেছে রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণনায়, তথা বৈষ্ণব সাহিত্যে। চৈতন্যদেবের প্রভাব যে বিভিন্ন অনুবাদ সাহিত্যেও বিস্তারলাভ করেছিল, তার পরিচয় দেখি অনুবাদ গ্রন্থগুলিতে নরোত্তম-এর চরিত্রাঙ্কন-প্রয়াসে। অন্ত্য-মধ্য যুগে যে বহু মুসলমান কবিও বৈষ্ণব পদাবলী-রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তার পশ্চাতেও চৈতন্যের প্রভাব ছিল সক্রিয়। মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেখি, দেবতার স্থানে মানুষের একাধিপত্য। বস্তুত, এই মানবিকতাবোধই অন্ত্য-মধ্য যুগের কাব্যগুলির একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।

চৈতন্যদেবেব ভূমিকা

চৈতন্যদেবই প্রথম বাঙালীর ভাবাবেগকে ধর্মান্দোলনে রূপায়িত করে তোলেন, যা' ফলতঃ একটি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনে পরিণত হয় — পতনোন্মুখ হিন্দু-সমাজের ভাঙন-রোধে এই আন্দোলন যে কতখানি সহায়তা দান করেছিল, তার সম্যক্ অধ্যয়ন অনেক সত্যই উদ্‌ঘাটন করবে। চৈতন্যদেবের এই প্রভাব বাঙলার সাহিত্যে ও সমাজে প্রবলভাবে বর্তমান থেকে মুমূর্ষ বাঙালী জাতির জীবনে এক নোতুন জীবনবোধের সূচনা করেছিল।

[দুই] বিষয় বিভাগ

অন্ত্য-মধ্য যুগের তথা চৈতন্যোত্তর যুগের বাঙলা সাহিত্য পূর্ববর্তী যুগের ধারাবাহিকতা বহন করে এলেও সঠিকভাবে তাকে শুধু পূর্বানুবৃত্তি বলা সঙ্গত হবে না। কারণ, এই পর্বে যেমন পূর্ব যুগের কিছু কিছু অনুবৃত্তি রয়েছে, তেমনি কিছু বর্জিত হয়েছে, কিছুটা নোতুন যুক্ত হয়েছে। যেগুলির অনুবৃত্তি ঘটেছে এবং যা যা নোতুনভাবে যুক্ত হয়েছে, তাদের পরিচয় পরে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যেটি বর্জিত হয়েছে, তার কথা বলে নিই -- এটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। ঠিক এ জাতীয় কাব্য কিংবা এর অনুসরণে কোন কাব্যধারা আর পরে অনুসৃত হয় নি। মোটামুটি ১৫০০ খ্রীঃ থেকে আরম্ভ করে ১৮০০ খ্রীঃ পর্যন্ত বিস্তৃত কালকে যখন 'অন্ত্য-মধ্য যুগ' নামক একটা যুগে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে, তখন আর পরবর্তী সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন শতাব্দী-অনুযায়ী আলোচনার বিশেষ কোন তাৎপর্য থাকে না। অতএব এই যুগের সাহিত্য-কৃতিকে আমরা বিষয়ানুযায়ী বিভক্ত করে পরবর্তী আলোচনার প্রবৃত্ত হচ্ছি।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে অন্ত্য-মধ্য যুগে তথা চৈতন্যোত্তর যুগে বাঙলা সাহিত্য অনেক বেশি প্রসারলাভ করেছিল। বিষয়ে, বৈচিত্র্যে, আঙ্গিকে, সংখ্যায়, সবদিক দিয়েই বাঙলা সাহিত্য শনৈঃ শনৈঃ সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হচ্ছিল। এই যুগে এমন কিছু সাহিত্যও নোতুন রচিত হল, ইতঃপূর্বে যাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না। এর জন্য একদিকে যেমন চৈতন্য-প্রভাব দায়ী, অন্যদিকে তেমনি অপর প্রাদেশিক সাহিত্য এবং যুগধর্মও যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

এই যুগেই সাহিত্যকে বিষয়ানুযায়ী নিম্নোক্ত ক্রমে বিভক্ত করা যায়ঃ (ক) জীবনী সাহিত্য বা চরিত শাখা, (খ) বৈষ্ণব সাহিত্য—(১) পদাবলী, (২) বৈষ্ণবতত্ত্ব, (গ) অনুবাদ সাহিত্য, (ঘ) মঙ্গলকাব্য সাহিত্য, (ঙ) লোকগীতি, (চ) শাক্ত পদাবলী, (ছ) বিবিধ ।

ক. জীবনী সাহিত্য বা চরিত শাখা -- এটি চৈতন্যোত্তর বাঙলা সাহিত্যে একেবারে নোতুন ধারা। পূর্ববর্তী ধারায় এ জাতীয় কোন কাব্য ছিল না। বলা বাহুল্য, যুগপ্রবর্তক মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের মতো মহাপুরুষের আবির্ভাবের ফলেই এ জাতীয় সাহিত্যের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। চৈতন্যদেবের জীবনী-অবলম্বনেই এই শাখার উৎপত্তি। পরবর্তীকালে চৈতন্য-পার্ষদদের জীবনকাহিনী অবলম্বনেও কিছু কিছু চরিত-সাহিত্য রচিত হয়েছে। রচয়িতাদের কেউ কেউ শ্রীচৈতন্যের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন বলে অনুমিত হয়। এই শাখার কবিদের মধ্যে 'চৈতন্য ভাগবত'কার বৃন্দাবনদাস, 'চৈতন্যচরিতামৃত'-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, 'চৈতন্যমঙ্গল' রচয়িতা জয়ানন্দ ও লোচনদাস প্রভৃতি প্রধান। চৈতন্যদেবের ভৃত্য বলে কথিত গোবিন্দদাস-রচিত 'কড়চা'র প্রামাণিকতা সন্দেহজনক হলেও উল্লেখযোগ্য। এইগুলি ছাড়া ঈশান নাগর-রচিত 'অদ্বৈত প্রকাশ' এবং লোকনাথ দাসের 'সীতাচরিত্র' প্রধান।

খ. বৈষ্ণব সাহিত্য বলতে প্রধানত (১) পদাবলী শাখাই বুঝিয়ে থাকে। এই ধারাটি চৈতন্যপূর্বযুগেই প্রচলিত ছিল। মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি এবং বাঙালী কবি চণ্ডীদাস (ইনি 'বড়ু চণ্ডীদাস' নন তদতিরিক্ত অপর একজন। চৈতন্যোত্তর যুগে এই শাখার কবিদের মধ্যে মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, বাসুদেব, রামানন্দ প্রভৃতি অপ্রধান হলেও চৈতন্য-সমসাময়িক বলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই শাখার প্রধান কবি চণ্ডীদাস (দীন ও দ্বিজ), জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস, লোচনদাস প্রভৃতি। (২) বৈষ্ণবতত্ত্ব শাখায় বিবিধ মোহান্তদের জীবন-চরিত, বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ এবং কিছু কিছু মৌলিক তাত্ত্বিক রচনাও দৃষ্টিগোচর হয়। এই শাখার কবিদের মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য কবিত্বশক্তিসম্পন্ন কেউ ছিলেন না।

গ. অনুবাদ শাখার উদ্ভব চৈতন্য-পূর্ব যুগেই ঘটলেও এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে চৈতন্যোত্তর যুগেই। চৈতন্য-পূর্ব যুগে কৃত্তিবাস 'রামায়ণ' অনুবাদ করে যে ধারার প্রবর্তন করেন, শেষ পর্যন্তও তিনি উক্ত ধারায় অনতিক্রমণীয় রয়ে গেলেন; উল্লেখযোগ্য এই যে, পরবর্তী কবিদের অনেকেই মূল বাল্মীকিব রামায়ণ থেকে সরে গিয়ে 'অদ্ভূত রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, যোগাবাশিষ্ঠ রামায়ণ' ইত্যাদির শরণ গ্রহণ করেছিলেন। এই বিভিন্ন রামায়ণ-রচয়িতাদের মধ্যে অদ্ভুতাচার্য, চন্দ্রাবতী, ভবানীদাস প্রভৃতি প্রধান। এই শাখার অন্যতম গ্রন্থ 'মহাভারত'। মহাভারত-রচিয়তাদের মধ্যে কেউ কেউ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন বলে অনুমান করা যায়। কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, সঞ্জয়, কাশীরাম দাস এই শাখার প্রধান কবি; শেষোক্তজন প্রধানতম। মহাভারত-অনুবাদকদের অনেকেই সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ করেন নি। পূর্বযুগে 'ভাগবত'-এর অনুবাদ রচনা করেছিলেন মালাধর বসু। প্রধানত 'ভাগবতপুরাণ' এবং অন্যান্য কৃষ্ণকাহিনীমূলক কাব্যকে অবলম্বন করে যারা অনুবাদ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে 'কৃষ্ণমঙ্গল'-রচয়িতা রঘুনাথ, দ্বিজমাধবাচার্য, 'গোবিন্দমঙ্গল'-রচয়িতা কবিচন্দ্র, 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-রচয়িতা দ্বিজ রমানাথ-আদি প্রধান।

ঘ. মঙ্গলকাব্যশাখাই অন্ত্য-মধ্য যুগের অন্যতম সমৃদ্ধ শাখা। আদি-মধ্য যুগে শুধু 'মনসামঙ্গল' কাব্যই রচিত হয়েছিল, এইবার আরও বহু নোতুন কাব্য যুক্ত হ'লো। মঙ্গল-কাব্য-শাখার শ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী 'চণ্ডীমঙ্গল' রচনা করেন। দ্বিজ মাধবও সম্ভবত তাঁর সমসাময়িক অথবা কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী ছিলেন। মাণিক দত্ত আদি চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা বলে প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাঁর গ্রন্থ অপ্রাপ্য। 'ধর্মমঙ্গলে'র শ্রেষ্ঠ কবি ঘনারাম চক্রবর্তী। কিন্তু খেলারাম, রূপরাম, সহদেব চক্রবর্তীও কাব্য-রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। 'শিবায়ন'-রচয়িতা রামেশ্বর এবং কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ প্রধান। এই প্রধান কয়টি মঙ্গলকাব্য ছাড়াও বহুতর অপ্রধান মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। একমাত্র 'অন্নদামঙ্গল'-রচয়িতা রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র-ব্যতীত অপর কোন কবিই উল্লেখের দাবি রাখেন না।

ঙ. লোকগীতিশাখা—এটি সম্পূর্ণভাবে নোতুন; এর একটি ধারা প্রধানত অনুবাদ-মূলক হলেও তা' ভিন্নজাতীয় এবং এতে প্রধানত মুসলমান কবিদেরই প্রাধান্য। তাঁদের রচিত বহু গ্রন্থই অনুবাদ মাত্র—অবশ্য কিছু কিছু মৌলিক রচনাও পাওয়া যায়। আলাওল, দৌলত

কাজী প্রভৃতি এই শাখার শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁরা প্রধানতঃ হিন্দী, ফারসি এবং ক্বচিৎ আরবী সাহিত্যের ভাবানুবাদ রচনা করেছেন। এঁদের অধিকাংশ রচনাই, 'কিস্‌সা সাহিত্য' নামে পরিচিত। মৌলিক রচনা এবং বাস্তব জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত 'পল্লীগীতিকা'গুলি এই শাখার অন্তর্ভুক্ত হলেও এগুলি একেবারে নিম্নবিত্ত বাঙালীর জীবনের ভিত্তিতে রচিত সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয় রচনা এবং এদের পরিচয় 'লোকসাহিত্য' বা 'পল্লীগীতিকা' বলেই। এই প্রসঙ্গে সঙ্কলিত 'ময়মনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র নাম উল্লেখযোগ্য।

চ. শাক্তপদাবলী —কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত প্রভৃতি অনেকেই বৈষ্ণব গীতিকবিতার অনুসরণে শাক্ত পদাবলী রচনা করেছেন। এটিও অন্ত্য-মধ্য যুগের একেবারে শেষপর্বের অর্থাৎ 'অবক্ষয় পর্বে'র রচনা। এর দুটি ভাগ— একটি বাৎসল্য প্রধান উমাসঙ্গীত, অপরটিও ভক্তি-প্রধান শ্যামাসঙ্গীত।

ছ. বিবিধ শাখায় প্রধানত 'নাথসাহিত্যে'র কথা উল্লেখ করা যায়। এই শাখার অন্তর্ভুক্ত কাব্যগুলির মধ্যে 'গোর্খবিজয়', 'গোপীচন্দ্রের গান' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। এছাড়া ওড়িয়া অক্ষরে লিখিত নানা বিষয়ক বাঙলা কাব্যগুলিব কথাও উল্লেখ করা চলে।

[তিন] চৈতন্যদেব

বাঙলাদেশে আর্য-আগমনে ঘটেছিল অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে। পূর্ববর্তী অধিবাসীরা ছিল অনার্য তথা প্রাগার্য—দ্রাবিড়, অষ্ট্রীক বা নিষাদ ও মঙ্গোল বা কিরাত গোষ্ঠী অথবা আর্য হলেও ব্রাত্য অবৈদিক আর্য। আর্যদের বর্ণাশ্রম প্রথার কঠোরতা, উচ্চমন্যতাবোধ এবং রীতিনীতির স্বাতন্ত্র্যহেতু অনার্যদের সঙ্গে তাদের সংমিশ্রণ সহজসাধ্য হয় নি। বরং পরবর্তী কালের বৌদ্ধধর্মে যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল, তাতেই অনার্যগণ তথা বাঙলার আদিম অধিবাসীরা অনেক বেশি আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল। এককালে বাঙলাদেশে যে বৌদ্ধপ্রাধান্য বিস্তারলাভ করেছিল, তা ঐতিহাসিকগণ নির্দ্ধিধায় স্বীকার করে থাকেন। আরও পরবর্তীকালে একদিকে শঙ্করাচার্যের অভ্যুদয়ে এবং ব্রাহ্মণ্য-মতাবলম্বী সেন রাজবংশের প্রবল প্রভাবে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান, অন্যদিকে বৌদ্ধধর্মের বিকৃতির ফলে সমগ্র ভারতেই বৌদ্ধশক্তি ক্রমবিলুপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছিল। এমন সময় এলো নবসৃষ্ট ইসলাম ধর্ম। ইস্‌লাম ধর্মেও সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের মর্যাদা লক্ষিত হয়। অতএব যে সকল বৌদ্ধ

চৈতন্য আবির্ভাবের পটভূমিকা

এবং অনার্য সন্তান ব্রাহ্মণ্যসমাজের উপেক্ষা অথবা বিদ্বেষবশত হিন্দু সমাজের দিকে ঘেঁষতে পারে নি, তারা সাদরে ইস্‌লাম কবুল করল। অবশ্য ইস্‌লাম ধর্ম প্রচারের পশ্চাতে প্রবল রাজশক্তিও যে যথেষ্ট আনুকূল্য সাধন করেছে, তাও ঐতিহাসিক সত্য। হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত অন্ত্যজশ্রেণীও উচ্চতর সমাজের নিকট কোনদিন বিশেষ কোন সুবিধা লাভ করতে পারে নি, —তারাও কতক পীড়নের ভয়ে, কতক সুবিধার লোভে, কতক বা সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করতে লাগল। এইভাবে মধ্যযুগে যখন হিন্দু সমাজে প্রবল ভাঙ্গন দেখা দিল, তখনই সমাজের ত্রাণকর্তারূপে

আবির্ভূত হলেন প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য। চৈতন্যজীবনীসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে যে শিবাবতার মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্যের হুঙ্কারেই ভগবান স্বয়ং চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অবশ্য সমাজের প্রয়োজনকেই যদি অদ্বৈতাচার্যের হুঙ্কার বলে বর্ণনা করা যায়, তবে আর চৈতন্য অবতারের পশ্চাতে কোন অলৌকিক কারণ স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না। বস্তুত সমসাময়িক যুগের প্রয়োজনই যে চৈতন্য-আবির্ভাবের কারণ তা' অনায়াসে স্বীকার ক'বে নেওয়া চলে।

১৪৮৬ খ্রীঃ ফাল্গুন পূর্ণিমার দিন নবদ্বীপে শ্রীহট্টাগত এক ব্রাহ্মণ পবিবারে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যদেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপ, অল্পবয়সেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন ব'লে বাহুল্যে চৈতন্যের (তাঁর প্রকৃত নাম বিশ্বম্ভর, ডাক নাম —গোরা, গৌরাঙ্গ ও নিমাই) লেখাপড়ার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় নি; যা হোক নিমাই নিজের চেষ্টাতে অল্পদিনেই সর্বশাস্ত্র অধিগত করে নিমাইপন্ডিত নামে পরিচিত হলেন। পিতা জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যুর পরে পিতৃকৃত্যসাধন-উপলক্ষে চৈতন্যদেব গয়াধামে গমন করেন এবং তথায় ঈশ্বরপুরীর সান্নিধ্য লাভ করে সন্ন্যাস-জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে কাটোয়ার কেশব ভারতীর নিকট থেকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা লাভ করে তিনি ২৪ বৎসর বয়সেই চিরকালের জন্য গৃহত্যাগ করে নাম গ্রহণ করলেন 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। পরবর্তী ২৪ বৎসর কাল তিনি প্রধানত পরিব্রাজক-রূপেই ভাবতময় পরিভ্রমণ করে প্রেমধর্ম প্রচার করেন। শেষ জীবনের একটা বিরাট অংশই তিনি পুরীধামে কাটিযে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে লীলা সংবরণ করেন।

জীবন কাহিনী

শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্মের রূপকার ছিলেন। কিন্তু তৎ-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম স্বরূপে পৃথক্—এর প্রকৃত নাম 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম'। এই মতে বৈদিক যাগ-যজ্ঞ-সমন্বিত কর্মবাদ এবং শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত জ্ঞানবাদকে প্রাধান্য দান না ক'রে ভক্তিবাদের আশ্রয় গ্রহণ করা হ'য়েছে। 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর'—এই সত্যই চৈতন্যদেব উচ্চারণ ক'রে গিয়েছেন। চৈতন্য-প্রবর্তিত এই মতবাদের পশ্চাতে নিহিত আছে এক বিরাট যুগসত্য—যুগের প্রয়োজনে এবং জাতির প্রয়োজনেই এই সত্যদৃষ্টির উদ্ভব হয়েছিল, এই সত্যকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। বৈদিক যাগযজ্ঞাদি যে কঠোর রীতিনীতির সঙ্গে পালন করতে হয়, তা' সমাজের মুষ্টিমেয় লোকেরাই সাধ্য। বস্তুত, পরবর্তীকালে একমাত্র ব্রাহ্মণই ছিলেন যজ্ঞাদি কর্মকান্ডের অধিকারী। শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত জ্ঞানবাদও সমাজের উচ্চস্তরে ছিল সীমাবদ্ধ। শিক্ষা-শাস্ত্র-আদির চর্চায় সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের কোনই অধিকার ছিল না, অতএব কর্ম আর জ্ঞানের অংশ থেকে সমাজের বৃহত্তর অংশই ছিল বঞ্চিত। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, চৈতন্যদেব যুগসত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি দেখলেন, সমাজের বৃহত্তর অংশে যে ভাঙন দেখা দিয়েছে, তাকে রোধ করতে হলে এমন মতবাদ প্রচার করতে হবে, যা' সর্বজনের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য এবং আচরণীয় হয়ে উঠতে পারে। অতএব নিছক হৃদয়বৃত্তি থেকে উদ্ভূত এই প্রেমধর্মের প্রচারই চৈতন্য-জীবনের লক্ষ্য হযে দাঁড়ালো। একটা ভাবের আন্দোলনকে

তিনি ধর্মের আন্দোলনে পরিণত করে ধর্মকে সর্বজনের নিকট অধিগম্য করে তুলতে চাইলেন। তাঁর এই ভক্তিবাদের ভিত্তিতে গঠিত এই প্রেমধর্মে সর্বজীব আশ্রয় লাভ করতে পারে। সামাজিক বৈষম্য, ধর্মীয় মতবাদের গোঁড়ামি, মানুষে মানুষে ভেদজ্ঞান-আদি প্রেমধর্মে স্পষ্টত না হলেও বাস্তবতঃ অস্বীকৃত হ'লো। চৈতন্যদেব স্বয়ং যখন 'আচন্ডালে ধরে দেয় কোল', যখন তিনি বলেন, 'যেই জন কৃষ্ণ ভজে, সে মোর ঠাকুর', তখন সমাজের সর্বনাশা ভাঙনের পথ আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে এলো। যখন 'চন্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ' তখন চিরকালের নিপীড়িত লাঞ্ছিত মানুষ মুক্তির আহ্বান শুনতে পেলো। বস্তুত, এর আগে আর বাঙলাদেশে এমনভাবে মানব-মুক্তির উদার আহ্বান কখনও ধ্বনিত হয়নি। এই আহ্বান অনতিবিলম্বেই সাড়া জাগালো সমস্ত ভারতে, সমস্ত জাতির মধ্যে— শুধু চন্ডালই নয়, যবনও পেলো প্রেমধর্মে আপনার অধিকার। ফলে সমগ্র দেশেই দেখা দিল এক অপূর্ব ভাব-বিপ্লব, যার মহানায়ক হলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ঃ চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মমত

[চার] চৈতন্য প্রভাব

(ক) সাহিত্যে। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস-আলোচনা-প্রসঙ্গে চৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য-প্রচারে নাসিকা কুঞ্চন করবার অবকাশ নেই। সত্য বটে, চৈতন্যদেব হয়তো বাঙলা ভাষায় একটি পংক্তিও রচনা করেননি, কিন্তু তিনি বাঙলা সাহিত্যকে যা দান ক'রে গিয়েছেন, তা' স্বর্ণমূল্যে তুলিত হ'তে পারে। চৈতন্যদেবের আন্দোলনকে যদি ধর্মান্দোলন নামেও অভিহিত করা যায়, তবু তা' ছিল একান্তভাবে মানব-মুখী—প্রেমই ছিল এর মূল তত্ত্ব। অতএব মানব-মনের বিচিত্র ভাবপ্রকাশের সহায়ক ভূমিকার জন্যই সমকালীন এবং উত্তরকালের বাঙলা সাহিত্যেও চৈতন্য-প্রভাব ছিল অনতিক্রম্য। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাঙলাদেশে যে নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল, তা'তে বাঙলা সাহিত্যের গতিপথ সুনিশ্চিত ভাবেই একটা পরম পরিণতির দিকে চিহ্নিত হ'য়েছিল। চৈতন্য-পূর্ব যুগের সঙ্গে চৈতন্যোত্তর যুগের বাঙলা সাহিত্যের বিরাট পার্থক্য থেকেই সদ্য-কথিত উক্তিটির যাথার্থ্য প্রমাণিত হ'বে।

চৈতন্য-প্রচারিত মতবাদের ফলে মানবজীবনের মূল্য নোতুনভাবে নির্ণীত হ'য়েছিল—সাহিত্যেও এর প্রভাব ছিল অতিশয় স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। এমন কি চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই যে অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য ও কৃষ্ণকাহিনী রচিত হ'য়েছিল, তাদের সঙ্গে পরবর্তীকালে রচিত তত্ত্বজাতীয় সাহিত্যের মৌলিক পার্থক্যটুকু অনুসন্ধিৎসু পাঠকের দৃষ্টি কখনও এড়িয়ে যেতে পারে না। চৈতন্য-পূর্ব যুগের মঙ্গলকাব্য সাহিত্যে যে ভেদবুদ্ধির প্রাধান্য দেখা যায়, চৈতন্যোত্তর সাহিত্যে তা' অসাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছে। বস্তুত, চৈতন্য-প্রভাবই যে এর প্রধান কারণ তাতে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। ডঃ ভট্টাচার্য বলেন, "....এই দেশে এই সকল সঙ্কীর্ণতামূলক সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের উপর দিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের

কূল-প্লাবী বন্যা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে এই সমাজের প্রায় সমগ্র সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের বৈষম্যের মূল শিথিল হইয়া গিয়াছে।" লেখক যে এখানে চৈতন্য-প্রবর্তিত ভাববন্যার কথাই উল্লেখ করেছেন, তা' অনস্বীকার্য। চৈতন্যোত্তর মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের মধ্যে যে হিংস্রতা, ক্রূরতা, প্রতিহিংসাপরায়ণতার পরিবর্তে মানবহিতকারী কোমলতর মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল, এই পার্থক্যটুকু সহজেই লক্ষণীয়।

মঙ্গলকাব্যে

চৈতন্য-পরবর্তী মঙ্গলকাব্যসমূহে অপর যে সকল পরিবর্তন ঘটে, তাদের সম্বন্ধে ডঃ ভট্টাচার্য আরো বলেছেন ঃ "চৈতন্য-পরবর্তী যুগের মঙ্গলকাব্য মাত্রই নীতির দিক দিয়া উন্নত ; ইহার কারণ, চৈতন্যদেবের চরিত্রের মধ্যে যে উচ্চ নৈতিক গুণ ছিল, তাহা সমসাময়িক বৈষ্ণব সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমগ্রভাবে বাঙলার সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।" পরবর্তী মঙ্গলকাব্য সাহিত্য-রচনায় যে নিম্নশ্রেণীর নায়ক-নায়িকারাও কবিদের সানুকম্প দৃষ্টি-আর্কষণে সক্ষম হ'য়েছিল, তাতেও চৈতন্যপ্রভাব অবশ্যস্বীকার্য। এই প্রসঙ্গে ব্যাধ-সন্তান কালকেতু যে কাব্যের নায়ক পদে উন্নীত হ'য়েছিল, এবং তাতে সমাজের স্বীকৃতি ছিল, এই ইঙ্গিতটুকু লক্ষণীয়।

মঙ্গলকাব্যগুলির মত অনুবাদ সাহিত্যেও চৈতন্যপ্রভাব প্রত্যক্ষগোচর। চৈতন্যদেবের ব্যক্তিজীবনের আদর্শে আকৃষ্ট হ'য়েই পরবর্তী অনুবাদকগণ তাঁদের কাব্যে অনুরূপ মহামানবের চরিত্রাঙ্কনে প্রয়াসী হ'য়েছেন। এমন কি তৎকালীন কবিরা বারবার মূল থেকে ভ্রষ্ট হলেও নায়ক-চরিত্রে চৈতন্যের প্রেমমধুর রূপটির আদল আনতে দ্বিধা বোধ করেন নি। বাঙলা সাহিত্যের কৃষ্ণ-কাহিনীর বাহুল্যও চৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেম থেকে জাত। সংস্কৃতে 'ভাগবতপুরাণ' 'বিষ্ণুপুরাণ' প্রভৃতি পুরাণে কৃষ্ণের বিস্তৃত কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। সেগুলি অবলম্বন করে বাঙলা ভাষাতে যে 'কৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যধারা সৃষ্টি করা হ'য়েছে, তা' কিন্তু স্বরূপতঃ পৃথক। সংস্কৃত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের পরম ঐশ্বর্য-রূপেরই বিকাশ, কিন্তু বাঙলায় তৎপরিবর্তে মাধুর্যরসই প্রধান হ'য়ে উঠেছে এবং শ্রীমতী রাধাও এখানে সমমর্যাদা পেয়েছেন। পক্ষান্তরে সংস্কৃত পুরাণে শ্রীমতী রাধিকার নামগন্ধও ছিল না।

কৃষ্ণ-কাহিনীতে

চৈতন্যদেবের পূর্বেই জয়দেব, বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে উপলক্ষ্য ক'রে কাব্য রচনা করলেও মূলত বাঙলা বৈষ্ণব পদাবলী যে চৈতন্যপ্রভাব-সঞ্জাত তা' সূর্যের মতই স্পষ্ট। গৌড়ীয় দর্শনের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে পরব্রহ্মের সচ্চিদানন্দস্বরূপের পরম প্রকাশ ঘটেছে আনন্দে ও মাধুর্যে। ভগবানের মাধুর্যময় রূপের অভিব্যক্তি কৃষ্ণমূর্তিতে আর শ্রীরাধিকাই কৃষ্ণের হ্লাদিনিশক্তি। পরব্রহ্মের এই মানবীয় লীলারসকেই চৈতন্যদেব স্বয়ং আস্বাদ করেছিলেন স্বদেহে যুগপৎ কৃষ্ণ ও রাধার অস্তিত্ব অনুভবের মধ্য দিয়ে। বৈষ্ণব কবিতাগুলির মধ্যে চৈতন্য-আস্বাদিত রসেরই পরিবেশন ঘটেছে। চৈতন্যোত্তর কবিগণ চৈতন্যদেবের অন্তরালে দাঁড়িয়েই রাধাকৃষ্ণ-লীলা-রস আস্বাদন করেছেন। এই পর্বে বৈষ্ণব পদাবলী পরিমাণগতভাবে যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে,

পদাবলী সাহিত্যে

তেমনি নিঃসন্দেহে উৎকর্ষেরও অধিকারী হয়েছে। বিশেষতঃ এই পর্বেই বৈষ্ণব পদে 'বাৎসল্যরস' এবং 'গৌরচন্দ্রিকা' নামক দুটি নোতুন ধারাও সংযোজিত হ'য়েছে। অতএব চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই যে বাঙলাদেশে বিরাট পদাবলী সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত প্রেমসাধনার সঙ্গে ঐক্য অনুভব করে ইস্‌লামপন্থী সুফী সাধকরাও রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার যে চিত্র রচনা করেছেন, তার প্রভূত নিদর্শন রয়েছে পদাবলী সাহিত্যে।

বাঙলার লোকসাহিত্যেও চৈতন্যপ্রভাব সুস্পষ্ট। চৈতন্য প্রভাবের প্রত্যক্ষ ও সুপরিণত রূপ, — জীবনী সাহিত্যের কথাই সর্বশেষ উল্লেখ করা চলে। বাঙলাদেশে চৈতন্যদেবের জীবনকাহিনীকে অবলম্বন ক'রেই সর্বপ্রথম জীবনী-সাহিত্য রচিত হ'য়েছিল। উক্ত সাহিত্যে চৈতন্যদেবের উপর অলৌকিক দেবমহিমা আরোপ করা হ'লেও ঐ সাহিত্যই যে সর্বপ্রথম মানব-জীবনাভিমুখী রূপ লাভ করেছিল, তার সাক্ষ্য ইতিহাস। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সাধকগণ আরও কিছুটা অগ্রসর হ'য়ে চৈতন্যপার্ষদ্‌দেবও জীবনী রচনা করে গিয়েছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন 'আউল-বাউল' গান বা এজাতীয় বহু লোকসঙ্গীতে 'গোরাচাঁদ'-ই গানের মূল বিষয়রূপে গৃহীত হ'য়েছে।

চৈতন্য চরিত

বস্তুত, মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব যে সর্বতোমুখ রূপ লাভ ক'রে বাঙলা সাহিত্যকে ঐশ্বর্যপুষ্ট করে তুলেছিল, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

(খ) চৈতন্য প্রভাব ঃ সমাজে। একালে চৈতন্যদেবকে আমরা একজন ধর্মপ্রবক্তারূপেই জানি, কিন্তু তাঁব সমকালে একদিকে যখন বিধর্মী রাজশক্তির শাসন, শোষণ ও আগ্রাসনের চাপে হিন্দু সমাজ নিষ্পিষ্ট এবং অন্যদিকে সমাজকে বাঁচিয়ে রাখবার আগ্রহে স্মার্ত রঘুনন্দনগণ 'অষ্টবিংশতি তত্ত্ব'-আদির সাহায্যে তাকে আষ্টে-পিষ্টে বাঁধবার আয়োজন করছিলেন, সেই সময় চৈতন্যদেবের আবির্ভাব সমাজে মুক্তির হাওয়া বয়ে নিয়ে এলো। তিনি সর্বজনের নিকট গ্রহণযোগ্য একটা ভাবের আন্দোলনকে ধর্মান্দোলনে রূপায়িত করে জড় হিন্দুসমাজকে তার বন্ধনদশা থেকেমুক্ত করে দিয়েছিলেন, ফলে বৃহত্তর হিন্দু সমাজ তাতে আশ্রয় লাভ করে যেমন আত্মরক্ষায় সমর্থ হ'য়েছিল, তেমনি সমগ্র জাতিকে একটা মহতী বিনষ্টির হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। সেকালে চৈতন্যদেবের ভূমিকা ছিল সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিত্রাতার ভূমিকা। ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে যে, সমকালে চৈতন্যদেব সমাজ-বিপ্লবীর ভূমিকা গ্রহণ ক'রে সমাজকে আসন্ন পতনদশা এবং সমূহ বিপদের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন। সেই হিশেবে বলতে পারা যায়, একালে রাজা রামমোহন রায় বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমাজ-সংস্কারে যে ভূমিকা গ্রহণ ক'রেছিলেন, চৈতন্যদেবের ভূমিকা ছিল তার চেয়েও দুরূহ, তবে যেহেতু কালটা ছিল মধ্যযুগ, তাই তাঁর একটা ধর্মীয় বাতাবরণের প্রয়োজন ছিল।

সমকালনী সমাজে
চৈতন্য ভূমিকা

সাধারণভাবে বাইরের দিক থেকে দেখলে চৈতন্যদেবকে একজন বৈষ্ণব ধর্মের রূপকার এবং ধর্মীয় সংস্কারক বলেই মনে হতে পারে। কিন্তু চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম ছিল স্বরূপে পৃথক্—একটি পৃথক সত্তা নিয়ে এটি 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম' নামে অভিহিত হয়। এর মানব

মুখী সাধনা একান্তভাবে ভক্তিবাদের সাধনা—বৈদিক যাগযজ্ঞ-সমন্বিত কর্মবাদ এবং শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত মায়াবাদ—উভয়েই এখানে অনুপস্থিত। বৈদিক যাগযজ্ঞের কঠোর নিয়মনিষ্ঠ আচার-আচরণ কিংবা শঙ্করাচার্যের জ্ঞানবাদ একান্তভাবে সমাজের মুষ্টিমেয় দ্বারা ছিল সাধ্য; কর্ম আর জ্ঞানের ধারা থেকে বঞ্চিত সমাজের বৃহত্তর অংশ অর্থাৎ নিম্নস্তরের লোকদের শিক্ষা-শাস্ত্র-আদির চর্চায় যখন কোন অধিকারই ছিল না, সেই সময় চৈতন্যদেব জীবনব্যাপী সাধনা দ্বারা প্রচার করলেন, 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর', ভক্তিতেই যে মুক্তি নিহিত এই সহজসাধ্য পদ্ধতি অতি স্বাভাবিক কারণেই সমাজের অগণিত জনগণকে চৈতন্যদেবের প্রতি আকৃষ্ট ক'রেছিল—যুগের প্রয়োজনে এবং জাতির প্রয়োজনে চৈতন্যদেব এই যুগসত্যটি উদ্ভাবন করেছিলেন।

চৈতন্যদেব উপলব্ধি করেছিলেন যে সমাজের বৃহত্তর অংশে যে ভাঙন ধরেছিল, তাকে রোধ করতে হলে এমনই এক মতবাদ গ্রহণ করতে হ'বে, যা অধিকাংশের পক্ষে আচরণীয় ও গ্রহণযোগ্য হ'য়ে উঠতে পারে। তিনি দেখলেন, ভক্তিবাদের ভিত্তিতে গঠিত এই প্রেমধর্মে সর্বজীব আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। এর ফলে মোটামুটিভাবে মানুষে মানুষে ভেদজ্ঞান ও সামাজিক বৈষম্য অনেকটা লোপ পেলো। চৈতন্যদেবের ব্যক্তিগত আচরণ—'আচন্ডালে ধরে দেই কোল' কিংবা তার উপলব্ধি 'চন্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ' এবং তাঁর অসাধারণ উক্তি—'যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে মোর ঠাকুর'। তাঁর মতবাদকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন ক'রেছিল। ফলে, দেশে দেখা দিল এক অপূর্ব ভাববিপ্লব। সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণী এবং বৃহত্তর বৌদ্ধসমাজ—যারা ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে দলে দলে ধর্মান্তরিত হচ্ছিল, তারা এবার পরম উদার বৈষ্ণব ধর্মে আশ্রয় পেলো। ধর্মের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা উচ্চবর্ণের সমান অধিকার লাভ করলো; ব্রাহ্মণের একাধিপত্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে অস্বীকৃত— অব্রাহ্মণরাও গুরুর পদবী পেলেন, এমন কি ম্লেচ্ছ যবনও বৈষ্ণব ধর্মে মর্যাদার আসন পেলো। সমাজ-জীবনে চৈতন্যদেবের প্রভাব সম্বন্ধে অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই মন্তব্য করেছেন ঃ "...এখন আমরা চৈতন্যের জীবনে নব্য-মানবতা (neo-humanism), সমাজসংস্কার, নীচ জাতিকে উচ্চ শ্রেণীতে গ্রহণ করা, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, পতিত-পতিতাকে পংক্তিতে স্থান দান ইত্যাদি আধুনিক সমাজ-মানসিকতার প্রভাব আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছি।" বস্তুতঃ চৈতন্যদেব মানবিক সম্পর্কের যে নবমূল্যায়ন ঘটালেন তারি ফলে মধ্য যুগের সাহিত্যে দেবতার স্থানে মানুষের আধিপত্য লাভ কতকাংশে সম্ভবপর হয়েছে। অন্ত্য-মধ্যযুগের সাহিত্যে তথা জীবনচর্যায় এই মানবতাবোধ তথা নবমানবতাবাদ স্পষ্টতঃই চৈতন্যপ্রভাবজাত। অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো এই প্রভাব বাঙালীর মনোজীবনের ভিতরে ভিতরে কাজ করে গেছে, তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে তার বহিঃপ্রকাশ ততটা ঘটেনি।

নবভারত গঠন-কল্পে আজকের দিনে যে সকল বিষয়ে আন্দোলন গড়ে উঠেছে, অবাক্ বিস্ময়ে লক্ষ্য করি, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবই তাদের অনেকগুলির পথপ্রদর্শক ছিলেন। 'প্রকাশ্যে কীর্তন নিষেধ'—মুসলমান কাজি এই আদেশ জারি করলে শত শত ভক্তের কীর্তনে মুখরিত

শোভাযাত্রা নিয়ে চৈতন্যদেব কাজি-গৃহে উপস্থিত হ'য়ে বাধ্য হ'লে স্বয়ং সুলতান হোসেন শাহ্ উক্ত আদেশ প্রত্যাহার করে বলেছিলেন ঃ

'সর্বলোকে লই সুখে করুন কীর্তন।
বিরলে থাকুক কিবা যেবা লয় মন।।
কাজি বা কোটাল কিবা হউ কোন জন।
কিছু বলিলেই তার লইব জীবন।।'

তাঁর প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না, হিন্দু মুসলমান অর্থাৎ জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই তাঁর উদার বক্ষে স্থান লাভ ক'রেছিল। জাতপাত বা উচ্চ-নীচের ভেদবুদ্ধিও তাঁর ব্যক্তিজীবনে এবং প্রচারিত ধর্মে ছিল অস্বীকৃত—তাই অব্রাহ্মণও বৈষ্ণব সমাজে গুরুপদে আরোহণ করতে পারতেন।

অস্পৃশ্যতা বর্জন ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের একটি প্রধান স্তম্ভ। তাই ভক্ত চণ্ডালও সেখানে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিক মর্যাদা লাভ করতেন। বৈষ্ণবদের আচরিত 'নাম যজ্ঞ' অর্থাৎ নাম সঙ্কীর্তনে এবং মহোৎসবে সর্বজাতি ও সর্বসম্প্রদায়ের মানুষের ছিল সমান অধিকার। তাদের পংক্তিভোজনে জাতপাতের বিচার ছিল না। এ সমস্ত অনুষ্ঠানে যে সর্বজাতি-সমন্বয়ের চিত্র দেখা যায়, এটিকে জাতীয়-সংহতির তৎকালীন রূপ বলেই অভিহিত করা যায়।

বৌদ্ধদের মতই বৈষ্ণবরাও অহিংসাকে পরম ধর্ম জ্ঞান করেন। এঁরা অহিংসার কারণেই ব্যক্তিগত জীবনে খাদ্যতালিকায় মাছ-মাংস বর্জন করেন। সামাজিকভাবেও চৈতন্যদেব যে জীবনচর্যায় অহিংসাকে অতি উচ্চ স্থান দান করেছিলেন জগাই-মাধাই-উদ্ধার কাহিনীতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু অহিংসা নয়, এ যুগের রাজনৈতিক হাতিয়ার অসহযোগেরও যে প্রথম প্রয়োগকারী ছিলেন চৈতন্যদেব, কাজীর নির্দেশ অমান্য ক'রে সুবৃহৎ দল নিয়ে নগরকীর্তনের মধ্য দিয়েই তার প্রকাশ ঘটেছে। এই ঘটনাকে ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "চৈতন্যদেবের এই আইন অমান্য আন্দোলন নিপীড়িতের মুখে প্রথম ভাষা যোগাল।"

আমাদের বাঙালী জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডীকে অতিক্রম করে চৈতন্য-প্রভাব যে প্রায় সমকালেই বৃহত্তর ভারতেও বিস্তারলাভ করেছিল, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। প্রায় সমগ্র পাঠান শাসনকালেই বাঙলাদেশ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ ছিল, বাইরের সঙ্গে তার যোগাযোগ প্রায় ছিলই না। ঐ যুগে চৈতন্যদেবই সর্বপ্রথম প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ভারত, পশ্চিম ভারত ও উত্তর-মধ্য ভারত পরিক্রমা করে তথাকার সাধকদের সঙ্গে যোগাযোগ সাধন করে ভাবধারার বিনিময় ঘটান। এরি প্রত্যক্ষ ফল, আজও পর্যন্ত পুরী, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে বাঙালীর হৃদয়ের যোগ বর্তমান রয়েছে। চৈতন্যদেবের আগ্রহ এবং প্রবর্তনাতেই মথুরা ও বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থসমূহ উদ্ধার পেয়েছিল। এক সময় বৃন্দাবনই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছিল। ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে চৈতন্যদেবের চেষ্টায় এই যে বাইরের দরজা খুলে গেল, তার ফলেই বহির্জগতের সঙ্গেও আমরা যুক্ত হলাম। এর পরই গৌড়-বঙ্গে মুঘল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে বৃহত্তর সমাজ ও পরিবেশের প্রভাব বাঙালীর জীবনবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গিতেও অনেকটা পরিবর্তন সাধন করেছিল।

জীবনী-সাহিত্য

চৈতন্য-জীবনকে অবলম্বন করে যে কাব্য রচিত হয়েছিল, তাই বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে আদি জীবনী-সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে থাকে। কেউ কেউ মনে করেন যে, চৈতন্য-পূর্ব যুগেই গোর্খনাথ, গোপীচাঁদ বা ময়নামতীকে অবলম্বন করে প্রথম জীবনী-সাহিত্য রচিত হয়েছিল। কারও মতে, এঁরা ঐতিহাসিক পুরুষরূপেই এককালে বর্তমান ছিলেন বলে তাঁদের জীবনীই পথপ্রদর্শকের সম্মান লাভের যোগ্য। গোর্খনাথ-গোপীচাঁদ-আদি ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন কিনা এবং তাঁদের অবলম্বন করে যে সকল কাব্য রচিত হয়েছিল, তা' চৈতন্যপূর্ব-যুগবর্তী কিনা, সেই বিচারে না গিয়েও বলা চলে যে 'গোর্খবিজয়' কিংবা 'গোপীচাঁদের গীত'-আদি কোন গ্রন্থই জীবনী-সাহিত্য নয়। যদি এঁরা প্রাগ্‌বর্তীও হয়ে থাকেন, তবু বড় জোর এঁদের 'মঙ্গলকাব্য শাখা'য় কিংবা 'লৌকিক কাব্য শাখা'য় স্থান দান করা চলে —জীবনী-সাহিত্যে কখনও নয়। এতদ্‌ব্যতীত উক্ত ব্যক্তিদের ঐতিহাসিকত্ব এবং তদবলম্বনে রচিত কাব্যসমূহের প্রাগ্‌বর্তিত্বও নিঃসংশয় নয়। অতএব চৈতন্যজীবনীগুলিই যে বাঙলা সাহিত্যের আদি জীবনী-সাহিত্য-রচনা-প্রচেষ্টা, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পূর্বতন জীবন কাহিনী

শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলার মধ্যে 'সর্বোত্তম নবলীলা' — এই নবলীলাযই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই নরোত্তমকে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা এই মহামানবের জীবনকে সাহিত্যে রূপায়িত কবে তুলবাব লোভ সংবরণ করতে পারেন নি। অতএব, একটি দু'টি নয়, কালক্রমে চৈতন্য-জীবনকে অবলম্বন করে অনেকগুলি কাব্যই রচিত হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য এই যে, পববর্তী কালে চৈতন্য-পার্ষদ্‌দের কেউ কেউ, এমন কি অদ্বৈতাচার্য-পত্নী সীতাদেবীও জীবনী-কাব্যের বিষয়ীভূত হয়েছেন।

চৈতন্য-জীবনী সম্বন্ধে একটি সাধারণ অভিযোগ এই যে, প্রতিটি কাব্যেই চৈতন্যদেবকে দেবত্বের পদে উন্নীত করা হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের লৌকিক মহিমাব উপরে এই অলৌকিকত্বেব আবরণ পড়ায়, তাঁর মানবিকতা কিছুটা যে ক্ষুণ্ণ হয়েছে কথাটা অস্বীকাব কববার উপায় নেই। বস্তুত, মধ্যযুগে যখন ধর্মবিশ্বাসই মূলত মানুষেব ভাবনা কামনাকে নিয়ন্ত্রিত কবত, তখনকার দিনে মহামানব-চরিত্রে দেবত্বের আরোপ অনেকটা যুগবশেও করতে হতো। কিন্তু বাঙালীর স্বভাবেই এই দোষ বা গুণটি নিহিত যে আমরা 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে

দেবতা।' আধুনিক কালেও ব্যক্তি-পূজার এই স্বভাবটি দূরীভূত হয় নি। ভাগবতপুরাণে বর্ণিত কৃষ্ণলীলার কাঠামোয় চৈতন্যলীলা পরিবেশন করতে গিয়ে ভক্তকবি নিছক বাস্তবতার মধ্যে আপনার কল্পনাকে সীমাবদ্ধ করে রাখতে পারেন নি। ভক্তির প্রবলতা এবং উচ্ছলতায় চৈতন্যদেব আপনি দেবতারূপে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু এই ত্রুটি-সত্ত্বেও বৈষ্ণব কবিদের নিষ্ঠায় সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই। চৈতন্য-জীবনীকারদের অনেকেই চৈতন্য-সমসাময়িক কিংবা স্বল্প পরবর্তীকালেই বর্তমান ছিলেন, কাজেই তাঁরা চৈতন্যদেব-সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও লক্ষ্য করবার বিষয়, — তাঁরা বারবারই বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করবার জন্য উৎস নির্দেশ করেছেন। যে সূত্রে যে তথ্যের সন্ধান লাভ করেছেন, তার উল্লেখে কবিদের ঐতিহাসিক মনোবৃত্তি এবং সত্যপ্রচারস্পৃহারই পরিচয় পাওয়া যায়।

দেবভাব ও মানবভাব

একালে অনেকেই প্রশ্ন উত্থাপন করছেন, চৈতন্যচরিতগুলি কি প্রকৃতই জীবনীসাহিত্যরূপে গ্রহণযোগ্য? একালের ঐতিহাসিক এবং যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করলে অবশ্যই প্রশ্নটির প্রাসঙ্গিকতা এবং সমীচীনতা স্বীকার করে নিতে হয়, তৎসত্ত্বেও চৈতন্য-জীবনের ক্ষেত্রে বিষয়টিকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করা সঙ্গত। চৈতন্যদেব যে কালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ঐতিহাসিক বিচারে সেই কালটি ছিল মধ্যযুগ—সাধারণভাবে মানুষের মন তখন অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, যুক্তি-বুদ্ধি-বিচার-বিবেচনা অপেক্ষা ভক্তি-বিশ্বাস দ্বারাই তারা পরিচালিত হন। কাজেই সেকালে চৈতন্য-জীবনী রচনায় জীবনীকারগণ যে দৃষ্টিভঙ্গির সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন, তা থেকে দূরে সরে গিয়ে একালের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তাঁদের কৃতিত্বকে বিচার করলে কি তাঁদের প্রতি সুবিচার দেখানো হবে?

আমরা একালে সমাজমানসিকতার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে চৈতন্যের জীবন থেকে তাঁর নব্যমানবতাবোধ (neo-humanism), সমাজ সংস্কার, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, অসাম্প্রদায়িকতা বা জাতীয় সংহতি-আদির ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধারে সচেষ্ট; কিন্তু মূলতঃ যাদের জন্য চৈতন্য-জীবনী পরিকল্পিত ও লিখিত হয়েছিল তাঁরা চৈতন্যদেবের পারমার্থিক জীবন এবং তাঁর নিত্যলীলা-বিষয়েই ছিলেন আগ্রহী। চৈতন্যদেব ছিলেন স্বয়ং অবতার—কৃষ্ণলীলার সঙ্গে চৈতন্যলীলার সাদৃশ্য তৎকালীন ভক্তদের নিকট ছিল প্রশ্নাতীত ব্যাপার, তাই চৈতন্যজীবনের সাধারণ লৌকিক ঘটনা ভক্ত জীবনীকারের দৃষ্টিতে অলৌকিক রহস্যে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। অতএব সেকালের জীবনীলেখকের পক্ষে এই বিশ্বাসভূমি বর্জন করলে তা কালাতিক্রমণদোষ-দুষ্ট হয়ে পড়বার আশঙ্কা থাকে। 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান'-রচয়িতা ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার যথার্থই মন্তব্য করেছেন, "মধ্যযুগের কোন ঘটনা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে মধ্যযুগের ভাবধারায় অবগাহন করিতে হইবে। সে যুগের লোকের বিশ্বাস, অবিশ্বাস, আলোচনা-প্রণালী এ যুগের মাপকাঠি দিয়া বিচার করিলে সত্যের একদেশ মাত্র দর্শন করা হইবে। ভগবান স্বয়ং সশরীরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এ কথা এ যুগের লোকের পক্ষে

জীবনী সাহিত্য বিচারে তৎকালীন দৃষ্টিভঙ্গি

বিশ্বাস করা খুবই কঠিন; কিন্তু মধ্যযুগের লোকে ইহা সহজেই মানিয়া লইতেন। মধ্যযুগে যে যুক্তি বিচারের প্রয়োগ ছিল না, তাহা নহে, তবে সে যুক্তি-বিচারের ধারা আমাদের ধারা হইতে পৃথক ছিল।"

রক্তমাংসে গড়া দেহ নিয়ে চৈতন্যদেব মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হলেও তিনি আর দশজন সাধারণ মানুষের মতো ছিলেন না। প্রাচীন ও মধ্যযুগে পৃথিবীর সর্বত্র এরূপ কিছু অসাধারণ মানুষের আবির্ভাবে পৃথিবী ধন্য হয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়। এঁরা সাধু বা 'সন্ত' পদবাচ্য। এঁদের জীবনী-কাহিনী সাধারণ মানুষেব জীবনী-কাহিনী (biography) থেকে পৃথক্ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রচিত হয়, এদের আছে পৃথক্ নাম —'সন্তজীবনী' (hagiography)। সন্তজীবনীতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি অপেক্ষা তাঁর ভাবজীবনকে পরিস্ফুট করে তোলবার চেষ্টাই বর্তমান থাকে। চৈতন্যজীবনীগুলিকেও আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 'সন্তজীবনী' বলে অভিহিত করাই সঙ্গত বোধ করি। কারণ এখানেও চৈতন্যদেবের ভাবজীবনের গভীর তাৎপর্যকে যথাযথভাবে প্রকাশ করবার জন্যই বাস্তব ঘটনার পরও অলৌকিকতার মোড়ক পরানো হয়েছে।

সন্তজীবনী

চৈতন্যদেবের জীবনী সর্বপ্রথম রচিত হয় সংস্কৃত ভাষায়। এই বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ চৈতন্যপার্ষদ মুরারিগুপ্ত-লিখিত 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত'—এটি সাধারণত 'মুবারিগুপ্তেব কড়চা' নামেই প্রসিদ্ধ। কেউ কেউ অনুমান কবেন, গ্রন্থটি চৈতন্যের জীবৎকালেই রচিত হয়েছিল। যাহোক, গ্রন্থটি ১৫২০ খ্রীঃ থেকে ১৫৪০ খ্রীঃ-র মধ্যেই যে রচিত হয়েছিল, এই বিষয়ে পণ্ডিতমণ্ডলী প্রায় অভিন্নমত। এরপরই উল্লেখ কবতে হয় কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেন-রচিত তিনখানি গ্রন্থেব কথা। প্রথম গ্রন্থ 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য- ভ্রমণের পরবর্তী কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্যে চৈতন্যদেবের বিস্তৃত জীবন-কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। তৃতীয় গ্রন্থ 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'য় বৈষ্ণব দর্শন-সম্বন্ধে আলোচনাই প্রাধান্য লাভ করেছে। সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলিতেও নানাপ্রকার অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে বাঙলা ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলিতে মুবারিগুপ্ত এবং কবিকর্ণপুরের প্রভাবের পরিচয় সুস্পষ্ট।

সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্য জীবনী

এ ছাড়া বাঙলা ভাষায় যাঁরা 'চৈতন্যজীবনী' রচনা করেছেন, তাঁরা সকলে চৈতন্য-সমসাময়িক না হলেও সমকালবর্তী অবশ্যই ছিলেন। অন্ততঃ যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে চৈতন্যদেবের সান্নিধ্য পেয়েছেন তাঁদের প্রমুখাৎই জীবনীকারগণ চৈতন্য-জীবনের উপাদান গ্রহণ করেছেন। গৌরাঙ্গদেবের কৈশোরলীলার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা বংশীবদন চট্টোপাধ্যায় 'শ্রীগৌরলীলামৃত' নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করেন। এর খণ্ডাংশ মাত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। সম্ভবতঃ বাঙলা ভাষায় এটিই চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনী। অপর চৈতন্যজীবনীকারদের মধ্যে 'চৈতন্যভাগবত'-রচয়িতা বৃন্দাবনদাস, 'চৈতন্যমঙ্গল'-রচয়িতা লোচনদাস, অপর একটি 'চৈতন্যমঙ্গল'-রচয়িতা জয়ানন্দ এবং

বাঙলা ভাষায় চৈতন্য জীবনী

'চৈতন্যচরিতামৃত' রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ — এই চারি জনই প্রায় একই কালে বর্তমান ছিলেন। কাব্যগুণে ও নবদ্বীপ সমাজের পরিচয়-দানে বৃন্দাবনদাস শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক জনপ্রিয়; কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থ তত্ত্বপ্রধান; গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের যাবতীয় তত্ত্বের ব্যাখ্যা রয়েছে তাঁর গ্রন্থে — এই কারণে এটি শাস্ত্রের মর্যাদায় অভিষিক্ত। লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' মঙ্গলকাব্যের ধারাই অনুসরণ করেছে। তাঁর গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ। কবি 'গৌরপারম্যবাদে'র অর্থাৎ 'নদীয়া-নাগরী' ভাবের প্রবর্তক ছিলেন বলে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব সমাজে তা' বিশেষ সমাদর লাভ করে নি। জয়ানন্দের কাব্যে পুরাণ-কাহিনী এবং কল্পিত কাহিনীও অনেক সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বিশেষতঃ চৈতন্যদেবের মহাপ্রয়াণের এক লৌকিক কাহিনী বর্ণনা করায় তিনি বৈষ্ণব সমাজে অপরাধী হয়ে আছেন। এগুলি ছাড়া চৈতন্যদেবের ভৃত্য-রূপে বর্ণিত গোবিন্দদাস নামক ব্যক্তি দ্বারা রচিত একখানি 'কড়চা' একসময় পাঠকসমাজের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও পরবর্তীকালে এটি জাল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

[এক] বৃন্দাবনদাস ঃ চৈতন্যভাগবত

বাঙলা ভাষায় রচিত চৈতন্যজীবনীসমূহের মধ্যে বৃন্দাবনদাস-রচিত 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থই সম্ভবত প্রাচীনতম। আদিতে গ্রন্থটির নাম 'চৈতন্যমঙ্গল' ছিল বলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ-আদি কেউ কেউ উল্লেখ ক'রেছেন। পরে লোচনদাসও 'চৈতন্যমঙ্গল' নামক গ্রন্থ রচনা করায় বৃন্দাবনের মোহান্তরা (কেউ কেউ বলেন, বৃন্দাবনদাসের মাতা নারায়ণী) এর নাম পরিবর্তন করেন। এ বিষয়ে 'প্রেমবিলাস' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে —

'চৈতন্যভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনের মোহান্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল।।"

পরবর্তীকালে বৃন্দাবনদাসকে ব্যাসদেবের অবতার বলে বর্ণনা করবার ফলেও তাঁর গ্রন্থের নাম-পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে থাকতে পারে। কবিকর্ণপূর 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় বলেছেন, 'বেদব্যাসো য এবাসীদ্দাসবৃন্দাবনোঽধুনা।' কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন, 'চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস।' ভাগবতপুরাণে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হয়েছে, অতএব যে গ্রন্থে চৈতন্যলীলা বর্ণিত হয়েছে, তারও নাম 'ভাগবত' হওয়াই সঙ্গত, গ্রন্থের নাম পরিবর্তনে এই যুক্তিটি অহেতুক না-ও হতে পারে।

চৈতন্য-জীবনী-প্রণেতাদের অনেকেই বিস্তৃতভাবে আত্মপরিচয় দান করলেও এ বিষয়ে বৃন্দাবনদাসের কুণ্ঠাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মাতার নাম নারায়ণী, তিনি ছিলেন শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা—এর অধিক কোন পরিচয় তাঁর গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায় না। কেউ কেউ অনুমান করেন, শ্রীবাসের ভ্রাতা শ্রীরামই ছিলেন নারায়ণীর পিতা। বৃন্দাবনদাস বালবিধবা নারায়ণীর সন্তান— তিনি নিজে দারপরিগ্রহ করেন নি। পিতৃপরিচয়ে বৃন্দাবনদাসের ঔদাসীন্য থাকলেও তিনি গুরুর কথায় পঞ্চমুখ। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ছিলেন বৃন্দাবনদাসের গুরু।

বৃন্দাবনদাস তাঁর গ্রন্থের অধিকাংশ উপাদান আহরণ করেছেন নিত্যানন্দের নিকট থেকে ঃ

'অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিল কৌতুকে।
চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে।'

অপরাপর চৈতন্য-পার্ষদ এবং ভক্তদের নিকট থেকে বৃন্দার্বনদাস যে কিছু কিছু উপকরণ পেয়েছেন, তাও তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন ঃ

'তাই লিখি যাহা শুনিয়াছি ভক্তস্থানে।'

এ সমস্ত বিষয় দেখে স্বভাবতঃই মনে হয়, চৈতন্য-জীবন-বিষয়ে বৃন্দাবনদাস যা লিখেছেন, তার প্রামাণিকতায় অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই। কোন বিষয়ে কবি নিজস্ব ব্যাখ্যা দান করলেও কোথাও যে স্বেচ্ছায় ঘটনার বিকৃতি সাধন করেন নি, তাও বিশ্বাস করা চলে। এ বিষয়ে অবশ্যই একটা কথা স্মরণ রাখা সঙ্গত যে, সেকালে বক্তব্যের যাথার্থ্যের জন্য যুক্তি-বিচার অপেক্ষা ভক্তি-বিশ্বাসের উপর নির্ভবশীলতাই ছিল স্বাভাবিক। তাই বৃন্দাবনদাসের বক্তব্য-বিচারে সেকালের দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণযোগ্য।

রচনার প্রামাণিকতা

বৃন্দাবনের জীবৎকাল কিংবা গ্রন্থরচনা-কাল-সম্বন্ধে নানাপ্রকার অভিমত বর্তমান। তবে কবি যে চৈতন্যের জীবিতকালেই বর্তমান ছিলেন , তার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। তিনি নিজেই বলেছেন, —

'হইল পাপিষ্ঠ জন্ম নহিল তখনে।
হইয়াও বঞ্চিত সে সুখ দরশনে।।''

মনে হয়, চৈতন্যেব জীবৎকালেই জন্ম হলেও কবি চৈতন্য-দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন নি বলেই এই খেদোক্তি করেছেন। আবার বৃন্দাবনদাসের অন্য একটি শ্লোকে পাওয়া যায় যে চৈতন্যদেব যখন গয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন চারি বৎসরের নারায়ণী তাঁর প্রসাদ গ্রহণ করে 'হাকৃষ্ণ-হাকৃষ্ণ কান্দে নাহিক সম্বিত।' অতএব বৃন্দাবনদাস চৈতন্যজীবনের শেষদিকে জন্মগ্রহণ করে থাকতে পারেন। আবার বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন, এই কথা বারবার স্বীকার করেছেন। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় বৃন্দাবনদাসের উল্লেখ থেকে মনে হয়, কবি এই তারিখের পূর্বে গ্রন্থ রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। এই সমস্ত বিচার কবে বলা চলে যে বৃন্দাবনদাস সম্ভবত ১৫১০ খ্রীঃ থেকে ১৫২০ খ্রীঃ-র মধ্যবর্তী কোন একসময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই বিষয়ে ডক্টর সুকুমার সেন এবং 'চৈতন্যচরিতের উপাদান'-রচয়িতা ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার প্রায় একমত হলেও 'চৈতন্যভাগবতে'র রচনাকাল সম্বন্ধে তাঁরা ভিন্নমত পোষণ করেন। ডঃ সেন বলেন, ''সম্ভবত শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পূর্বে গ্রন্থের পত্তন হইয়াছিল এবং নিত্যানন্দপুত্র বীরচন্দ্রের জন্মের পূর্বেই গ্রন্থের পত্তন হইয়াছিল।'' ডঃ মজুমদার তারিখটিকে আরও খানিকটা পিছাইয়া ১৫৪৬ খ্রীঃ-১৫৫০ খ্রীঃ বলে নির্দেশ করেছেন। যাহোক, বৃন্দাবনদাস যে মোটামুটিভাবে চৈতন্য-সমকালেই বর্তমান থেকে 'চৈতন্যভাগবত' রচনা করেছেন, তা' প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা চলে।

'চৈতন্যভাগবত' তিনটি খণ্ডে বিভক্ত ঃ — পনেরো অধ্যায়ে বিভক্ত আদিখণ্ড, সাতাশ অধ্যায়ে বিভক্ত মধ্যখণ্ড এবং দশ অধ্যায়ে বিভক্ত অন্ত্যখণ্ড। আদিখণ্ডে চৈতন্যদেবের গয়া থেকে প্রত্যাবর্তন, মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাসগ্রহণ এবং অন্ত্যখণ্ডে চৈতন্যদেবের নীলাচলে গুণ্ডিচাযাত্রা পর্যন্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তীকালে দেনুড়ে যে চৈতন্যভাগবতের শেষ তিনটি যাত্রা অধ্যায় আবিষ্কৃত হয়েছে বলে কথিত হয়, সেই তিনটি অধ্যায় জাল বলে প্রমাণিত হয়েছে। মূল 'চৈতন্যভাগবত' যে খণ্ডিত ও অসামপ্ত ছিল, তা' কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি থেকেও অনুমান কবা চলে। তিনি বলেন, —

'নিত্যানন্দ-লীলাবর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ।।'

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যদেবেব প্রথম জীবনের বৃত্তান্তই সমধিক গুরুত্ব-সহকারে বর্ণনা করেছিলেন। চৈতন্যদেবেব শেষ অধ্যায়-সম্বন্ধে তাঁর নীরব থাকবাব হেতু-সম্বন্ধে সুস্থিবভাবে কিছুই বলা যায না। কেউ মনে করেন, বৃন্দাবনদাস বৃদ্ধবয়সে কাব্য রচনা আরম্ভ কবেছিলেন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে কাব্যটির সমাপ্তিব পূর্বেই পবলোকগমন করেন।

বৃন্দাবনদাসেব কাব্য-বিচাব-প্রসঙ্গে স্মবণ বাখা কর্তব্য, বৃন্দাবনদাস কিংবা অপর কোন ভক্ত সহজ কবিত্বেব প্রেবণায় অথবা চৈতন্যমহাপ্রভুর জীবনতথ্য-উদ্‌ঘাটন-মানসে জীবনী বচনায় প্রবৃত্ত হননি, তাঁদেব মূল উদ্দেশ্য ছিল — বৈষ্ণব ধর্মেব প্রচাব। সেইদিক থেকে বিচাব করতে গেলে, এতে জীবনী-সাহিত্যের সাম্প্রদাযিক রূপটি প্রকট। এতে যে শুধু আভাষে-ইঙ্গিতেই অপর সম্প্রদাযেব প্রতি কটাক্ষপাত করা হয়েছে, তা নয়, স্পষ্ট উচ্চারিত ভাষাতেই কবি তাঁদের সম্বন্ধে কটূক্তি করেছেন অথবা অসিহষ্ণুতা প্রদর্শন কবেছেন। বৃন্দাবনের গ্রন্থের নাম গোড়াতে 'চৈতন্যমঙ্গল' রাখা হলেও লেখক গ্রন্থাবম্ভে মঙ্গলকাব্যের রীতিতে বিভিন্ন দেবদেবী-বন্দনাব উদাবতা প্রদর্শন কবেন নি। অতএব এই সঙ্কীর্ণতাবোধ থেকে জাত সাহিত্যে সার্বজনীনতাব আবেদন যে বিশেষ থাকবে না তাই স্বাভাবিক। বস্তুত অপব সম্প্রদাযেব উপব আপন সম্প্রদাযেব শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন কববার চেষ্টায় কবি সর্বদা ব্যস্ত ছিলেন বলে চৈতন্যভাগবতে কাব্যশ্রীবও কিছু পরিমাণে অভাব ঘটেছে। প্রধানতঃ উদ্দেশ্যমূলক এবং প্রচাবধর্মী বলেই চৈতন্যভাগবত যেমন খাঁটি কাব্য হতে পারেনি, তেমনি খাঁটি জীবনী সাহিত্যও হয়ে উঠবাব অবকাশ পাযনি। গ্রন্থে ঐতিহাসিক উপকবণ অবশ্য যথেষ্টই আছে, কিন্তু চৈতন্য-জীবনেব যে সমস্ত কাহিনী কবিব দৃষ্টিতে ধর্ম-প্রচাবেব পক্ষে অনুকূল বলে মনে হযেছে, কবি সেই সকল কাহিনীই মাত্র গ্রহণ কবেছেন। অথচ চৈতন্য-জীবনে নিশ্চিতই এমন বহু ঘটনা ঘটেছিল, যা অপব যে-কোন জীবনীসাহিত্যেব পক্ষেই অপরিহার্য বলে বিবেচিত হতো। এই সমস্ত ঘটনাব পবিপূর্ণ বিববণ পেলে সমসাময়িক যুগেব ইতিহাস পরিপূর্ণতা লাভ কবতে পাবতো। এছাড়াও তাঁরা চৈতন্য-জীবনেব ধর্মের দিকটাই শুধু দেখেছেন, তাঁব কর্মেব দিকটাকে প্রধানতঃ উপেক্ষা করে গেছেন। এমন কি চৈতন্যদেবেব আবির্ভাবে যে

কবিব সংকীর্ণতাবোধ

সমাজ একটা বিরাট ভাঙ্গনের মুখ থেকে ফিরে এলো বৃন্দাবনদাসের কাব্যে তেমন কোন ইঙ্গিতও নেই। চৈতন্যদেবের কর্মপ্রণালী এবং ভাবধারার মধ্যে যে ভারতব্যাপী একটা সমন্বয়ের আদর্শ স্থাপনের প্রচেষ্টা সক্রিয়ভাবেই বর্তমান ছিল, তদ্বিষয়ে কবির নীরবতাও বিস্ময়কর। বস্তুত বৃন্দাবনদাস চৈতন্যজীবনের ধর্মের দিকটা নিয়েই আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন, কর্মের দিকটা বাদ দিয়েছেন বলেই তা' খাঁটি এবং পরিপূর্ণ চরিত-সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে নি।

চৈতন্যের কর্মজীবনের প্রতি উপেক্ষা

হিন্দুধর্মের অন্যান্য শাখার বিশেষতঃ শাক্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিবাদের ফলেই যে এই বৈষ্ণব জীবনী-সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কবি একটু উদার দৃষ্টি নিয়ে গ্রন্থখানি রচনা করলেই চৈতন্য-মাহাত্ম্য অধিকতর পরিস্ফুট হতো। কিন্তু গ্রন্থকারের অসহিষ্ণুতার জন্য চৈতন্য-ভক্তিও শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-পূজায় পর্যবসিত হয়েছে। কেউ কেউ স্পষ্টতই বলেন যে চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের প্রচারের ফলেই বাঙালী সমাজে ব্যক্তি পূজার প্রবর্তন হয়েছে। শ্রীচৈতন্যকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণরূপে প্রতিষ্ঠার জন্য কবির প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। তিনি ভাগবতের অনুসরণে কৃষ্ণলীলার সাদৃশ্যে শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণনা করতে গিয়েছেন বলেই চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণ অলৌকিক কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে, শ্রীচৈতন্যের মৃত্তিকাভক্ষণ ও তাঁর মুখবিবরে বিশ্বরূপের প্রকাশ, তাঁর বরাহরূপধারণ, চতুর্ভুজ বা ষড়্ভুজ মূর্তির প্রকাশ, সুদর্শনচক্রের ব্যবহার আদি অলৌকিক কাহিনীর আড়ালে চৈতন্যদেবের ব্যক্তিজীবন অনেকটা চাপা পড়ে গিয়েছে।

চৈতন্য কাহিনীতে অলৌকিকত্ব

এই সমস্ত দোষত্রুটি-সত্ত্বেও বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থখানি অমূল্য বলেই বিবেচিত হয়ে থাকে। কবি চৈতন্য-চরিত্র অঙ্কনে সব সময় একটা সসম্ভ্রম ভক্তির ভাব বজায় রাখতেন এবং এরই ফলে প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে তাঁকে স্থাপন করতে চান নি। কিন্তু নিত্যানন্দ চরিত্র বর্ণনে তিনি ঔপন্যাসিকোচিত দক্ষতারই পরিচয় দিয়েছেন। নিজের গুরু নিত্যানন্দের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য হেতু তিনি তাঁকে অধিকতর আপন বলে মনে করতেন। তাই নিত্যানন্দ-চরিত্রের তুচ্ছতাও এতে উপেক্ষিত হয়নি। নিত্যানন্দ চরিত্র অনেকটা বাস্তব, মানবিকতাও এতে অনেকটা সুস্পষ্ট। অবধূত নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈতাচার্যের বাগ্‌যুদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দান করেছেন। শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা-বর্ণনেও কবির বর্ণনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীহট্টিয়াদের সঙ্গে ব্যবহারে চৈতন্যদেবের সরস রসিক ভাব যে চিত্রটি কবি অঙ্কন করেছেন তাও অতিশয় সজীব।

কবির কৃতিত্ব

বৃন্দাবনদাস উচ্চশ্রেণীর কবিপ্রতিভার অধিকারী না হতে পারেন, তবে তাঁর রচনাপ্রবাহ যে সচ্ছন্দগতিতে অগ্রসর হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে 'ড' সেনের অভিমত উল্লেখযোগ্য ঃ ''কাব্যটির মধ্যে কবিত্ব ফলাইবার কিছুমাত্র চেষ্টা দেখা যায় না, তথাপি চৈতন্য চরিত্রের অপরিসীম মাধুর্য এবং কবির অন্তর হইতে স্বতঃউৎসারিত অজস্র ভক্তিরস

চৈতন্যভাগবতকে শ্রেষ্ঠ কাব্যের মর্যাদা দান করিয়াছে। চৈতন্যভাগবতের যে কোন স্থান পড়িলেই ভক্ত কবির আবেগ পাঠকের মনে সঞ্চারিত হইতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না।" চৈতন্যভাগবতের আর একটি দিক-সম্বন্ধে ডঃ সেন পাঠকের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেন ঃ "এইরূপ human interest হিসাবে চৈতন্যভাগবত পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যে একক এবং অদ্বিতীয়। শ্রীচৈতন্যের বাল্য এবং যৌবনলীলা এইরূপ সহজ সরল ভাষার চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণিত হইয়াছে।"

কবি প্রতিভা

চৈতন্যভাগবতের কোন কোন অংশ অতিশয় হৃদয়গ্রাহী। ভক্ত কবির আবেগ এবং উচ্ছ্বাসও কখন কখন খাঁটি কবিত্বেব নির্ঝরিণীর মতো প্রবাহিত হয়েছে।

সমসাময়িক যুগের চিত্র-রচনায় মধ্যযুগে বৃন্দাবনদাস অতুলনীয়। চৈতন্যদেবের কালে সমগ্র দেশের রুচি কোন্‌দিকে প্রবাহিত হচ্ছিল, ধর্ম-কর্মের অবস্থা কেমন ছিল, চৈতন্যভাগবত কাব্যে তার একটি নির্ভরযোগ্য নিদর্শন বর্তমান। সমসাময়িক নবদ্বীপের ঐশ্বর্য, সমৃদ্ধি, শিক্ষা-দীক্ষা-আদি সম্বন্ধেও চৈতন্যভাগবতে বাস্তব অথচ মনোহব চিত্র পবিবেষিত হয়েছে। তাব অংশবিশেষ উদ্ধারযোগ্য ঃ

'নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবাবে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।।
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সবস্বতী প্রসাদে সবেই মহাদক্ষ।।
সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব ধবে।
বালকেও ভট্টাচার্য সনে কক্ষা কবে।
ধর্মকর্ম লোক সব এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত কবে জাগবণে।।
দম্ভ কবি বিষহবী পূজে কোন জন।
পুত্তলি কবয়ে কেহ দিয়া বহুধন।।
অতি বড সুকৃতি যে স্নানেব সময।
গোবিন্দ পুণ্ডবীকাক্ষ নাম উচ্চাবয।।...
বাসলী পূজয়ে কেহ নানা উপহাবে।
মদ্যমাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা কবে।
জগৎ প্রমত্ত ধন পুত্র বিদ্যাবসে।
দেখিলে বৈষ্ণব মাত্র সবে উপহাসে।।
যাহে বলি সুকৃতি যে দোলা ঘোড়া চড়ে।
দশবিশ জন যাব আগে পাছে নড়ে।।'

[দুই] লোচনদাস ঃ চৈতন্যমঙ্গল

বৃন্দাবনদাসের অব্যবহিত পরবর্তী চরিতকার সম্ভবতঃ লোচনদাস। লোচনদাস আপনার কাব্যে বিস্তৃতভাবেই আত্মপরিচয় দান করেছেন। তাঁর পিতার নাম কমলাকর এবং মাতার নাম সদানন্দী। কবি মাতামহ পুরুষোত্তমের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন; তাঁর গুরু ছিলেন নরহরি সরকার ঠাকুর। 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' পড়ে তার অনুসরণেই যে একখানি চৈতন্যজীবনী রচনা প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন, তা গ্রন্থোৎপত্তি-প্রসঙ্গে কবি স্বয়ং স্বীকার করেছেন। আবার লোচনদাসের কাব্যে যে বৃন্দাবনদাসেরও প্রভূত প্রভাব বর্তমান, তার পরিচয়ও রচনার বহুস্থলেই পাওয়া যায়। তিনি যে বৃন্দাবনদাসের পরবর্তী, তাও তাঁর রচনায় পাওয়া যায়, –

কবির পরিচয়

শ্রীবৃন্দাবনদাস বন্দিব এক চিতে।
জগৎ মোহিত যার ভাগবতে গীতে।।

কবির গ্রন্থে 'পাঠমঞ্জরী, কেদার, বড়ায়ি, মারহাটিয়া, ধানশী, শ্রী, ভাটীয়ারী, বিভাস প্রভৃতি কুড়ি একুশ রকম রাগরাগিণীর উল্লেখ দেখে এবং তাঁর নিজস্ব স্বীকৃতি থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, কবি আসরে গান করবার জন্যই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। তিনি হয়তো স্বয়ং পালাকার এবং গায়েনও ছিলেন।

'করুণা ভরল সব হেম গোরা গা।
বন্দিয়া গাইব সে শীতল রাঙা পা।।
সকল ভকত লঞা বৈসহ আসরে।
সে পদ শীতল বা লাগুগ কলেবরে।।'

লোচনদাস বৃন্দাবনের পরবর্তী ছিলেন। কিন্তু তাঁর জন্ম-মৃত্যু সাল কিংবা গ্রন্থরচনাকাল-সম্বন্ধে সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলবার উপায় নেই। ডঃ সেন প্রথম বলেছিলেন যে লোচনদাসের জন্মকাল ১৫২৩ খ্রীঃ এবং মৃত্যুকাল ১৫৮৯ খ্রীঃ। কিন্তু পরে আবার ডঃ সেন এই অভিমত প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ১৫৬০ খ্রীঃ - ১৫৬৬ খ্রীঃকে এবং ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ১৫৭৫ খ্রীঃ লোচনদাসের গ্রন্থ রচনাকাল বলে অনুমান করেছেন।

লোচনদাসের কাব্যের নাম 'চৈতন্যমঙ্গল' – বস্তুতঃ, তিনি প্রাচীনতর মঙ্গলকাব্যগুলির সঙ্গে তাঁর কাব্যের কিছুটা সাধর্ম্যও বজায় রেখেছেন। বৃন্দাবনদাস এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত বৈষ্ণবমাহাত্ম্য-প্রচারই তাঁর কাব্যের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না বলেই হয়তো তাঁর কাব্য অপেক্ষাকৃত অসাম্প্রদায়িক। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা চলে যে লোচনদাসের কাব্যের প্রথমেই মঙ্গলকাব্যের অনুসরণে গণেশ, হরগৌরী, সরস্বতী ও অন্যান্য দেবতাদের বন্দনা করে পরে কবি গুরুজন, বৈষ্ণব ও গুরুর বন্দনা করেছেন।

লোচনদাসের কাব্য চার খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম সূত্রখণ্ডে মঙ্গলকাব্যের মতই বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এই অংশটি মুরারিগুপ্তের অনুসরণে রচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে লোচনদাস কখনও কখনও এই সমস্ত কাহিনীর জন্য

গ্রন্থ ভাগ

মহাভারত, জৈমিনি ভারত, ব্রহ্ম সংহিতা এবং অন্যান্য পুরাণ থেকেও উপাদান গ্রহণ করেছেন। লোচনের কাব্যের প্রথম খণ্ড বা আদিখণ্ডে মহাপ্রভুর জন্ম থেকে গয়া গমন ও প্রত্যাবর্তন-কাহিনী পর্যন্ত বিবৃত হয়েছে। পরবর্তী মধ্যখণ্ডে মহাপ্রভুর পুরীযাত্রা ও সার্বভৌম-উদ্ধার পর্যন্ত কাহিনীর বিবরণ পাওয়া যায়। শেষ বা অন্ত্যখণ্ডটি অসম্পূর্ণ।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, লোচনদাস বৃন্দাবনদাসের মত প্রচারক ছিলেন না, আবার তিনি জয়ানন্দের মত নিছক গায়েন মাত্রও ছিলেন না। মূলত তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান কবি। ফলত, তাঁর চৈতন্যমঙ্গল কাব্য হিশাবে চৈতন্য-ভাগবত অপেক্ষাও উপাদেয় বলে বিবেচিত হয়। আবার তিনি ইতিহাস রচনার ব্যর্থ চেষ্টা না করে কাব্য-রচনার দিকেই মনোযোগ নিবদ্ধ রেখেছিলেন বলে তাঁর কাব্য থেকে ঐতিহাসিক সূত্রের সন্ধান না করাই সঙ্গত। তাঁর রচনাকে সার্থক শিল্পসৃষ্টিতে রূপায়িত করবার আকাঙ্ক্ষায় তিনি প্রয়োজনমত কল্পনাশক্তিরও ব্যবহার করেছেন। এই বিষয়ে ডঃ সেন মন্তব্য করেছেন, "চৈতন্যভাগবতের তুলনায় চৈতন্যমঙ্গল বিষয়বস্তুর বর্ণনায় কিছু ঊন বটে, তবে পল্লবিত কবিত্বাংশে লোচনের কাব্য বৃন্দাবনদাসের কাব্য অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ তাহা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে। বৃন্দাবনদাসের রচনা মুখ্যতঃ

কাব্যবিচার

বর্ণনাত্মক আর লোচনের রচনা প্রধানত রসাত্মক।" লোচনের কাব্যের ইতিহাস বিমুখতা এবং পূর্বাপর সামঞ্জস্য বিহীনতার কথা উল্লেখ করেও অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী সহানুভূতির সঙ্গে তাঁর কাব্যবিচার করে মন্তব্য করেছেন : " কিন্তু খণ্ডবিচ্ছিন্ন এমনি বহু মনোরম চিত্র রচনা করেছেন লোচন, স্বতন্ত্রভাবে যাদের মধ্যে গল্প ও জীবনরস সুনিবিড় হয়ে আছে। জীবনী-কাব্যকার হিসেবে লোচন ব্যর্থ কিন্তু মর্মস্পর্শী গল্পরসিক হিসেবে অবশ্য সমুল্লেখ্য।"

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে লোচনদাস শুধু চৈতন্যজীবনীকার রূপেই খ্যাতিমান নন, তিনি বৈষ্ণব পদ রচনাতেও অনুপম সার্থকতা অর্জন করেছেন। তিনি গতানুগতিক বৈষ্ণব পদ রচনা করেন নি ধামালি নামে এক স্বতন্ত্রধারার বৈষ্ণব পদের রচয়িতা তিনি। এই 'ধামালি ছন্দে'র একটা বৈশিষ্ট্য — একটা বিশিষ্ট ছন্দোরীতি এতে ব্যবহৃত হয়েছে, যে ছন্দকে

ধামালি ছন্দ

আমরা একালে 'ছড়ার ছন্দ' বা 'মেয়েলি ছন্দ' নামে অভিহিত করি, সেই 'স্বরবৃত্ত' বা 'দলবৃত্ত ছন্দ'। এই ছন্দ ব্যবহৃতও হয়েছে নারীর বাগভঙ্গিতে। সমগ্র মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে এমন সচেতনভাবে স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ, একমাত্র ভারতচন্দ্র কর্তৃক একটি ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র দেখা যায় না।

লোচনের কাব্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি শাখায় বিশেষ সমাদর লাভ করে থাকে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, লোচনদাস ছিলেন চৈতন্য-পার্ষদ নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য।

নরহরি সরকার বৈষ্ণব সমাজে 'গৌর-পারম্যবাদ' বা 'নদীয়ানাগর'-বাদের প্রধান প্রবক্তা। লোচনদাসের কাব্যে শ্রীচৈতন্যের এই নদীয়ানাগর ভাবটিই প্রাধান্য লাভ করেছে। গৌর-পারম্যবাদ বা নদীয়ানাগর-বাদের স্বরূপ এবং লোচনের কাব্যে তা কীভাবে পরিস্ফুরিত হয়েছে, তৎসম্বন্ধে জনৈক গ্রন্থকার লিখেছেন, "গৌরপারম্যবাদে বলা হইয়াছে স্বয়ং কৃষ্ণও উপাস্য নহেন, গৌরাঙ্গই একমাত্র উপাস্য, এই গৌরাঙ্গ আবার সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য নহেন, গৃহী গৌরাঙ্গ। গৌরাঙ্গ নদীয়ানাগর এবং ভক্তেরা নদীয়া-নাগরী। ভক্তের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা হইতেছে ব্রজগোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলার অনুরূপ। শ্রীগৌরাঙ্গের রমণীমোহন রূপ, কটাক্ষ, হাস্য, হাবভাব বর্ণনা করিয়া লোচনদাস অপূর্ব কাব্য রচনা করিয়াছেন। লোচনের কাব্যে নদীয়ার কুলবধূগণ গৌরাঙ্গদর্শনে নিজেদের সতীধর্ম পর্যন্ত বিসর্জন দিয়াছেন—'রসাবেশে আবেশে লোলি পড়ে গোরাপাশে গরগর কামে উনমতা।' লোচনের চৈতন্যমঙ্গল আদ্যন্ত দেবলীলা মাত্র, তাহাতে ঐতিহাসিকতার চিহ্ন নাই—তাহা আগা গোড়া চমৎকার রোম্যান্টিক কাব্য।"

গৌড় পারম্যবাদ

[তিন] জয়ানন্দ ঃ চৈতন্যমঙ্গল

জয়ানন্দ তাঁর চৈতন্যমঙ্গল নামক চৈতন্যচরিতগ্রন্থে যে আত্মজীবনী দান করেছেন, তা থেকে জানা যায় যে, কবির পিতার নাম ছিল সুবুদ্ধি মিশ্র এবং মাতা রোদনীদেবী। কবির জন্মভূমি বর্ধমান জেলার আমাইপুর গ্রাম। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব নীলাচল থেকে গৌড়দেশে যাবার কালে আমাইপুর গ্রামে সুবুদ্ধি মিশ্রের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন এবং তখনই সুবুদ্ধি মিশ্রের এক বৎসর বয়স্ক পুত্রের নাম রাখেন জয়ানন্দ। অতএব চৈতন্যদেবের জীবৎকালেই জয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করেন, এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার অনুমান করেন, জয়ানন্দ আঃ ১৫৬০ খ্রীঃ 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেন। লোচনদাস এবং জয়ানন্দের মধ্যে কে আগে গ্রন্থ রচনা করেছেন, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

পরিচয়

জয়ানন্দ লোচনদাসের মত তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যকে মঙ্গলকাব্যের অনুকরণেই গড়ে তোলেন। এতেও গ্রন্থের আদিতে মঙ্গলকাব্যের রীতিতে বিভিন্ন পৌরাণিক দেবদেবীর বন্দনা করা হয়েছে এবং বহু পৌরাণিক কাহিনীও এতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বলা চলে যে, মূল কাহিনীর চেয়েও এতে পৌরাণিক কাহিনীর উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জয়ানন্দ মূলতঃ গায়েন ছিলেন, তাই পালাগানের আকারেই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। লোচনের গ্রন্থের মতই এতেও বিভিন্ন রাগরাগিণীর উল্লেখ রয়েছে। জয়ানন্দ পূর্ববর্তী কবিদের সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ উল্লেখ করে পরে বলেছেন—

কাব্যের পরিচয়

> ইবে শব্দ চামর সঙ্গীত বাদ্য রসে।
> জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল গাএ শেষে ।।

জয়ানন্দ-রচিত চৈতন্যমঙ্গল নয়টি খণ্ডে বিভক্ত ঃ আদিখণ্ড, নদীয়াখণ্ড, বৈরাগ্যখণ্ড, সন্ন্যাসখণ্ড, উৎকলখণ্ড, প্রকাশখণ্ড, তীর্থখণ্ড, বিজয়খণ্ড এবং উত্তরখণ্ড। বিভিন্ন খণ্ডগুলি অবশ্য সুগ্রথিত নয়। এতে চৈতন্যজীবনের যে কাহিনী রচিত হয়েছে, প্রচলিত কাহিনীর সঙ্গে তার সর্বাংশে ঐক্য নেই। কোন কোন বিষয়ে জয়ানন্দ যে স্বাধীন-চিত্ততার পরিচয় দিয়েছেন, তার ফলে এক সময় অনেকেই চৈতন্যমঙ্গলের প্রতি সবিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। জয়ানন্দের স্বাতন্ত্র্যের জন্যই তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে জয়ানন্দ পক্ষপাতহীন দৃষ্টিতে সত্য উদ্ধার করেছেন। কিন্তু পরবর্তী গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, জয়ানন্দ-প্রদত্ত কাহিনীতে অনেক স্ববিরোধিতা রয়েছে, এবং অনেক কাহিনীই কাল্পনিক। উদাহরণচ্ছলে বলা যায় — চৈতন্যদেবের পিতৃপুরুষের জন্মভূমি, শচীমাতার দীক্ষাগুরু, চৈতন্যদেবের ভ্রমণপথ, চৈতন্য-মাধবেন্দ্রপুরী সাক্ষাৎকার কিংবা চৈতন্যদেবের বিবাহকাল-সম্বন্ধে জয়ানন্দ যা বলেছেন, তাতে নোতুনত্ব থাকলেও সত্যপ্রিয়তার কোন পরিচয় নেই। মনে হয়, গায়েন জয়ানন্দ প্রধানত আসর জমাবার জন্য এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করবার জন্যই বহু কাল্পনিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন। এই প্রসঙ্গে জয়ানন্দ-রচিত চৈতন্যদেবের মহাপ্রয়াণের কাহিনীটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

কাহিনীর স্বাতন্ত্র্য

আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে ।
ইটল বাজিল বাম পা'এ আচম্বিতে।।
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষ্য টোটায় শরণ অবশেষে।।
পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্বকথা।
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথা।।

চৈতন্যদেবের লোকান্তরের এক অলৌকিক কাহিনী কোন কোন গ্রন্থে বর্ণিত হলেও এই গ্রন্থের অনুরূপ বাস্তব এবং সম্ভাব্য কাহিনী অপর কোথাও নেই। জয়ানন্দ কিছু কিছু কাল্পনিক কাহিনী রচনা করেছেন বলেই যে তাঁর পরিবেষিত নোতুন কাহিনীমাত্রই অপ্রমাণিক হবে, তেমন কথা বলা যায় না। অতএব অসম্ভব নয়, জয়ানন্দ-রচিত চৈতন্যদেবের এই লোকান্তর-কাহিনীই প্রকৃত সত্য। কিন্তু সত্য হোক, মিথ্যা হোক, জয়ানন্দ চৈতন্যদেবের তিরোধানের এই লৌকিক কাহিনী পরিবেষণ করেছেন বলেই হয়তো বৈষ্ণব সমাজে তিনি কখনও ক্ষমালাভের যোগ্য বিবেচিত হননি। সম্ভবত বৈষ্ণবদের দ্বারা উপেক্ষিত হবার ফলেই জয়ানন্দের পুথি প্রায় লোপ পেতে বসেছিল। তিনি গদাধর-সম্প্রদায়ভুক্ত অভিরাম গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন বলেই হয়তো জয়ানন্দের কাব্য লোপ পেতে পেতেও বেঁচে রইলো।

চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে জয়ানন্দ তাঁর পূর্ববর্তী যে সকল কবি এবং চরিতকারদের নাম ও গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন, তার ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট। এতে কয়েকটি বিলুপ্ত গ্রন্থের নামও পাওয়া যায়। সমসাময়িক সামাজিক জীবন-সম্বন্ধে জয়ানন্দ-প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট মূল্যবান। এ থেকে জানা যায় যে, সেকালের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে মুসলমানী চাল-চালন এবং আদব-কায়দা যথেষ্ট প্রসারলাভ করেছিল।

গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য

কলিকালের সম্বন্ধে কবি বলেছেন, —

ব্রাহ্মণে রাখিব দাড়ি পারস্য পড়িবে।
মোজা পাএ নড়ি হাথে কামান ধরিবে।।
মসনবি আবৃত্তি করিবে দ্বিজবর।
ডাকাচুরি ঘাটি সাধিবেক নিরন্তর।।

বিদগ্ধ-সমাজে জয়ানন্দেব গ্রন্থ বিশেষ কোন মর্যাদা লাভে সক্ষম হয়নি। ডঃ সেনের মতে, "..লোচনেব কাব্য বিদগ্ধের কৃতি, আর জয়ানন্দের কাব্য অবিদগ্ধের লেখনীপ্রসূত। জয়ানন্দের কাব্যে কোনরূপ বাঁধুনি বা পারিপাট্যের প্রয়াস একেবারেই লক্ষিত হয় না, অথচ ইহাতে বৃন্দাবনদাসেব কাব্যের মত ভাবাবেগও দেখা যায় না। এইসব কারণে জয়ানন্দের কাব্যের প্রসাব ও স্থায়ী আদর নাই।" কোন কোন সমালোচক এটিকে কাব্য বলেই স্বীকাব করতে চান না। একজনের মতে, "জয়ানন্দের কাব্যে ছিল গায়েনসুলভ চিত্ত-চমৎকার-সৃষ্টিব চেষ্টা, কবি-চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত অনুমোদনের অভাবে তা অপরিণত পাঁচালীর পর্যায় অতিক্রম কবে কাব্য-পর্যাযে উন্নীত হতে পারেনি। সার্থক জীবনীর মূল্য ত সে কিছুতেই দাবি কবতে পাবে না।"

[চার] কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ঃ চৈতন্যচরিতামৃত

কৃষ্ণদাস কবিবাজ গোস্বামী তাঁর চৈতন্যচবিতামৃত গ্রন্থে যে সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দান কবেছেন, তাতে জানা যায় যে সম্ভবত বর্ধমান জেলার নৈহাটীর নিকটবর্তী ঝামটপুর গ্রাম ছিল কবিব জন্মভূমি। কবি স্বপ্নে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আদেশ লাভ কবে বৃন্দাবনধামে গমন কবেন এবং তথায রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামীর অনুগ্রহ লাভ কবেন, রঘুনাথ গোস্বামীর শিষ্যত্ব লাভ করেন এবং স্বরূপেব আশ্রয় লাভ কবেন।

'জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপসনাতনাশ্রয়।।
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয়।।
সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপকৃপায় পাইনু ভক্তিরস প্রান্ত।।'

'প্রেমবিলাসগ্রন্থ'-মতে জানা যায় যে নিত্যানন্দ প্রভু সশরীরে ঝামটপুব গ্রামে উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণদাসকে নবদ্বীপ যেতে আদেশ করেছিলেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে রচিত 'ভক্তদিগ্‌দর্শনী'-গ্রন্থ-অবলম্বনে জগবন্ধু ভদ্র প্রচার করেছেন যে, কৃষ্ণদাসের পিতার নাম ভগীরথ এবং মাতা সুনন্দা — জাতিতে বৈদ্য। 'প্রেমবিলাসা'দি গ্রন্থে কবিরাজ গোস্বামীর মৃত্যুর কারণ-স্বরূপ বলা হয়েছে যে, জীব গোস্বামী শ্রীনিবাস আচার্যের সহায়তায় গৌড়দেশে যে সকল বৈষ্ণব গ্রন্থ পাঠিয়েছিলেন,

কবি-কাহিনী

দস্যুর দল পথে তা লুটে নেয়। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্যচরিতামৃত'ও ছিল। এই দুঃসংবাদ-শ্রবণেই বৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামী প্রাণত্যাগ করেন। এই বিবরণীর সত্যতা-সম্বন্ধে অবশ্য কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেন।

কবিরাজ গোস্বামী যে বৃন্দাবনদাসাদির পরবর্তী ছিলেন এবং রূপ-সনাতনাদির সাহচর্য লাভ করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রত্যুত, তিনি কোন্ কালে বর্তমান ছিলেন এবং কোন সালেই বা গ্রন্থ রচনা করেছেন, তদ্বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। তাঁর গ্রন্থের পুষ্পিকায় এই শ্লোকটি পাওয়া যায় ঃ

'শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্যেহহ্ন্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ।।'

এই হিসাবে ১৫৩৭ শকাব্দ (১৬১৫ খ্রীঃ) জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমীতে রবিবার দিন বৃন্দাবনধামে গ্রন্থ-রচনা সমাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু তারিখটি গ্রহণযোগ্য নয় বলেই মনে হয়। কারণ প্রৌঢ় কৃষ্ণদাস বৃন্দাবন ধামে এসে সনাতন গোস্বামীব আশ্রয়লাভ করেছিলেন নিশ্চয়ই ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দেব দিকে, কারণ ১৫৫৪ খ্রীঃ সনাতন গোস্বামীর তিরোভাব ঘটে। এবও ষাট বৎসর পব কৃষ্ণদাসের গ্রন্থ সমাপ্ত হয়--এই উক্তি বিশ্বাসযোগ্য নয। আবাব কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থ প্রণয়নকালে বৃন্দাবন দাসও যে জীবিত ছিলেন, তার সাক্ষ্য কবিরাজ গোস্বামী নিজেই দিয়েছেন--'তাঁর আজ্ঞা লয়ে লিখি যাহাতে কল্যাণ।' আব বৃন্দাবন দাসও যে এত দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন না, তদ্বিষয়েও পণ্ডিতমণ্ডলী একমত। অবশ্য কেউ কেউ বলেন যে কৃষ্ণদাস গোস্বামী আপনার বার্ধক্যের কথা বার বার উল্লেখ করেছেন,—

কাল বিচাব

'বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির।।
নানারোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চ রোগেব পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রিদিনে মরি।।'

অতএব গ্রন্থরচনাকালে তিনি যে অতিশয় বৃদ্ধ ছিলেন তা অনুমান কবা যায়। কিন্তু গ্রন্থরচনারম্ভকালে কবি বার্ধক্যের কোন দোহাই না দেওযায় অনুমান হয যে, পরবর্তীকালে পঞ্চরোগের পীড়ায়ই কবি জরাগ্রস্ত হয়েছিলেন । অতএব তাঁর এই বার্ধক্য বয়সের জন্য নয়। কৃষ্ণদাসের পুষ্পিকার অপর একটি পাঠান্তরে 'শাকেহগ্নি বিন্দুবাণেন্দৌ' উল্লেখ পাওযা যায়। এতে ১৫০৩ শকাব্দ বা ১৫৮১ খ্রীঃ পাওয়া যায়। কিন্তু এই বৎসর কৃষ্ণদাস-নির্দেশিত বার-তিথির ঐক্য হয় না — অতএব তারিখটি প্রামাণিক নয়। সবদিক বিবেচনা করে ডঃ সেন অনুমান করেন যে ১৫৬০ খ্রীঃ থেকে ১৫৮০খ্রীঃ-র মধ্যবর্তী কোন সময়েই গ্রন্থটি বিরচিত হয়েছিল। কিন্তু ডঃ মজুমদার-আদি পণ্ডিতমণ্ডলী মনে করেন যে পুষ্পিকা-ধৃত তারিখেই (১৬১৫ খ্রীঃ) গ্রন্থটি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল।

বৃন্দাবনদাস-কৃত চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে চৈতন্য-জীবনের শেষদিকের কাহিনীর বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হয় নি বলে বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণদাসকে গ্রন্থরচনা করতে আদেশ করেন —

'মোরে আজ্ঞা করিলা সভে করুণা করিয়া।
তা সভার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া।।'

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা তিনখণ্ডে বিভক্ত। প্রতিটি লীলা আবার কতকগুলি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। আদিলীলার সতেরোটি পরিচ্ছেদের প্রথম বারোটি পরিচ্ছেদ প্রকৃতপক্ষে মুখবন্ধ মাত্র, এতে বৈষ্ণবতত্ত্বের বিভিন্ন দিক-সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী পাঁচটি পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর বাল্যলীলা থেকে আরম্ভ করে নবদ্বীপলীলা পর্যন্ত স্থানলাভ করেছে। মধ্যলীলার পঁচিশটি পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর পরিব্রাজক-জীবনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। অন্ত্যলীলার কুড়িটি পরিচ্ছেদে চৈতন্য-জীবনের শেষ কয় বৎসরের ভাবোন্মাদ অবস্থার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য করবার বিষয়, কবি এত বিস্তৃত গ্রন্থেও চৈতন্যের তিরোধান-কাহিনী বর্ণনা করেন নি। এর কারণ-স্বরূপ কেউ কেউ অনুমান করেন যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যদেবের লীলাসংবরণের কাহিনীকে একান্ত প্রাকৃত ঘটনা বলেই হয়তো এড়িয়ে গেছেন। আবার কেউ কেউ অনুমান করেন যে, বৃদ্ধ জরাতুর কবি হয়তো শেষ পর্যন্ত লিখবার বা বলবার শক্তিই হারিয়ে ফেলেছিলেন অথবা গ্রন্থ-সমাপ্তির পূর্বেই কাল-কবলিত হয়েছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, তিনি চৈতন্যলীলার প্রথমাংশ অতিশয় সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করেছেন। অবশ্য তিনি নিজেই এর কারণ উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

গ্রন্থ-ভাগ

'বাল্যলীলাসূত্র এই কৈল অনুক্রম।
ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।।
অতএব এই লীলা সংক্ষেপে সূত্র কৈল।
পুনরুক্তি হয় বিস্তারিয়া না কহিল।।'

পূর্বসূরী বৃন্দাবনদাসের প্রতি কবির এই ভক্তি ও বিনয়বোধ লক্ষ্য করবার মত। চৈতন্য-জীবনের সর্বাধিক প্রামাণিক গ্রন্থ কবিরাজ গোস্বামী-কৃত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'। গ্রন্থটি বৈষ্ণবসমাজে একটি শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা লাভ করে থাকে। ডঃ সুকুমার সেন বলেন,

প্রামাণিক বৈষ্ণবধর্ম গ্রন্থ

"'চৈতন্যচরিতামৃত' চৈতন্যচরিত কাব্য নহে। জীবনী বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ইহাতে চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম ও তত্ত্বের স্থূল, সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম বিবরণ, বিচার ও বিশ্লেষণ আছে। তত্ত্ববিচার গ্রন্থটির বাহ্যাংশ নহে; চৈতন্যলীলা, বৈষ্ণবনীতি, দর্শন ও রসতত্ত্ব ইহার মধ্যে অঙ্গাঙ্গিরূপে অচ্ছেদ্যভাবে বিবৃত ও বিচারিত হইয়াছে। বৈষ্ণব দর্শন ও রসতত্ত্ব কৃষ্ণলীলা কাহিনীর সহিত ওতপ্রোত; সুতরাং ইহাতে কৃষ্ণলীলা যে অনেক পরিমাণে মুখ্যভাবে বিচারিত হইয়াছে তাহাতে অনেকে বিস্ময়বোধ করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাতে বিস্ময়ের হেতু নাই।"

চৈতন্যদেবের শেষ জীবনের কাহিনী বিস্তৃতভাবে পরিবেষণ করবার দায়িত্ব নিয়েই কবি গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হলেও তিনি যে বৈষ্ণব তত্ত্ব ও দর্শন-প্রচারের প্রতিই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। বস্তুত এই কারণেই, বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের এক খনিরূপেই গ্রন্থটি বৈষ্ণবসমাজে এত আদৃত হয়ে থাকে। বৈষ্ণব ধর্মের তাত্ত্বিক, নৈতিক, দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই আলোচ্য গ্রন্থে সরল ভাষায় পরিবেশিত হয়েছে। অবশ্য অনেকেই 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থকে যে দুর্বোধ্য বলে অভিহিত করেন, তার কারণ ভাষার কঠোরতা নয়, বিষয়ের কঠোরতা। কবিরাজ গোস্বামী তত্ত্ববিচার করতে গিয়ে যথেষ্ট বিচারশক্তির পরিচয়ও দান করেছেন। যখনই তিনি কোন তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন, তখনই তার সমর্থনে শাস্ত্রীয় বাক্যও উদ্ধার করেছেন। তাঁর কাব্যে এইরূপ শ্লোকের সংখ্যা সাড়ে সাত শতেরও অধিক। অবশ্য এদের মধ্যে শত শ্লোক কবির স্বরচিত। অন্য শ্লোকগুলি ভিন্ন সূত্র থেকে আহরণ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মহাপ্রভুর নিত্যসঙ্গী এবং চৈতন্যদেবের ভাবগ্রাহক স্বরূপ দামোদর যে কড়চা রচনা করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল তত্ত্ব প্রতিপাদন করেছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে সেই গ্রন্থটি কাল-কবলিত হলেও কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থে তাঁর কিছু কিছু শ্লোক বিধৃত থাকায় স্বরূপ দামোদরের বক্তব্য অন্ততঃ অংশত বেঁচে রয়েছে।*

বৈষ্ণবতত্ত্ব ও দর্শন

বাঙলা ভাষায় বস্তুনিষ্ঠ মননশীল সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত স্বল্পতা এ যুগেও বর্তমান। সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগে এ ধরনের রচনা প্রায় দুর্লভ ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না। এইদিক থেকে বিচার করলে, শুধু প্রাচীন ও মধ্যযুগের নয়, সমগ্র সাহিত্যের ইতিহাসেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র স্থান অতি উচ্চে। বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন-সম্বন্ধীয় যাবতীয় আলোচনাই অপেক্ষাকৃত সরল ভাষায় এতে বর্ণিত হয়েছে—সমসাময়িক যুগে সাহিত্যে গদ্যভাষার প্রয়োগ ছিল না বলেই হয়তো কবিরাজ গোস্বামী পদ্যের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, নতুবা হয়তো গদ্যই হতো তাঁর ভাবের বাহন। দৃঢ়বদ্ধভাব, ভাবোচ্ছ্বাসের স্বল্পতা এবং সরল প্রকাশভঙ্গি তাঁর রচনাকে গদ্যধর্মী করেই তুলেছে। গ্রন্থে পল্লবিত কবিত্বের অবকাশ কম, কবিত্বের বিকাশও কম। কবি যুক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে গদ্যাত্মক রচনায় আপনার প্রয়োজন সাধন করেছেন। ডঃ সুশীলকুমার দে তাঁর *Vaisnava Faith and Movement in Bengal* গ্রন্থে বলেছেন, **"The literary merit of the work, with its epic length, prolixity and prosiness is much inferior to its prototype. The style is terse, but not very elegant or attractive and the versification poor and faulty."**

বস্তুনিষ্ঠ গদ্যধর্মী রচনা

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের আরও কিছু ত্রুটি আছে, প্রসঙ্গক্রমে তাদেরও উল্লেখ প্রয়োজন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মূলত কাব্যকীর্তি স্থাপন করবার জন্য গ্রন্থরচনায় আত্মনিয়োগ করেননি, তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার। তাই তাঁর সাধের কাব্য প্রচারধর্মী হয়ে উঠেছে,

---

* সম্প্রতি গ্রন্থটি আবিষ্কৃত হয়েছে বলে দাবি করা হয়। দ্রষ্টব্য : 'বৈষ্ণব তত্ত্ব-সাহিত্য'।

কাব্যগুণ নেই বললেই চলে। দৃশ্যত তাঁব কাব্যে অসাধাবণ বিনয প্রকাশ পেলেও তিনি প্রতিপক্ষ-সম্বন্ধে সহিষ্ণুতাব পবিচয দান কবেননি। কৃষ্ণদাস কবিবাজেব যে পদটি বসসাহিত্যেব উৎকৃষ্ট-নিদর্শন হিশেবে গৃহীত হযে থাকে, সেই 'বংশীগানামৃতধামা লাবণ্যামৃতজন্মস্থান' পদটিতেই অ-বৈষ্ণবেব বসনাকে 'ভেকজিহ্বা', নাসাকে 'ভস্ত্রা' এবং দেহকে 'লৌহসম' বলে বর্ণনা কবা হযেছে।

একটা সাম্প্রদাযিক তথা ধর্মীয মতবাদ প্রচাবেব জন্যই কবিবাজ গোস্বামী 'চৈতন্যচবিতামৃত' (এবং বৃন্দাবনদাসেব 'চৈতন্যভাগবত'ও) বচিত হ'যেছিল বলেই এগুলি বসসাহিত্যেব মর্যাদা লাভ কবতে পাবেনি। তৎকালীন সাহিত্যবীতি-অনুযাযী তাঁবা তাঁদেব গ্রন্থকে ছন্দোবদ্ধ কবেছেন, কিন্তু কাব্যশ্রীমন্ডিত কবতে পাবেন নি। ভাবাবেগেব পবিবর্তে কবিবাজ গোস্বামী প্রায সর্বত্র যুক্তি ও বুদ্ধি দ্বাবা চালিত হ'যেছেন। প্রচাবেব ক্ষেত্রে বৈষ্ণবীয দীনতাব আশ্রয নিলে যে তাঁদেব উদ্দেশ্য ব্যর্থতায পর্যবসিত হ'তো তা' বুঝতে পেবেই তিনি জ্ঞানযোগী সন্ন্যাসী এবং বিরুদ্ধবাদীদেব বিরুদ্ধে তীব্র কটূক্তিবাণ নিক্ষেপ কবেছিলেন।

ধর্মীয মতবাদ

শ্রীচৈতন্যদেবকে অবলম্বন ক'বেই কৃষ্ণদাস গোস্বামী এবং বৃন্দাবনদাস সাহিত্যে প্রথম ব্যক্তিপূজাব পথ প্রদর্শন কবলেও দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁবা কেউই ব্যক্তিচৈতন্যেব জীবনচেতনাবোধ এবং কর্মজীবনকে প্রস্ফুটিত ক'বে তোলবাব কোন চেষ্টা কবেন নি। এই কাবণেই চৈতন্যজীবনীগুলি খাঁটি জীবনী হ'যে উঠতে পাবেনি। শ্রীচৈতন্যজীবনেব যে সকল কাহিনী গৌডীয বৈষ্ণব ধর্ম প্রচাবেব অনুকূল, কবিবাজ গোস্বামী শুধু ততটুকুই গ্রহণ কবেছেন, তদতিবিক্ত অংশ বর্জন কবেছেন। চৈতন্যদেব এত বড একজন সমাজ বিপ্লবী ছিলেন, অতএব তাঁব মনে বহু জিজ্ঞাসাব সৃষ্টি হ'যেছিল নিশ্চযই —কিন্তু তাদেব কোন পবিচয কিংবা বিভিন্ন ঘটনায চৈতন্যদেবেব মনে যে প্রতিক্রিযাব সৃষ্টি হ'যেছিল, তাবও কোনও পবিচয চৈতন্যজীবনীতে পাওযা যায না। ডঃ তাবাপদ ভট্টাচার্য এ বিষযে যথার্থই মন্তব্য কবেছেন, "শ্রীচৈতন্যেব ক্ষুবধাব বুদ্ধি ও কর্মকৌশল, তাঁহাব জাতীযতাবোধ, তাঁহাব সংগঠনী শক্তি, উদ্ভাবনী প্রতিভা, সংঘ পবিচালনা দক্ষতা, এমন কি দূবদর্শিতা, বৈপ্লবিক চিন্তা প্রভৃতি ব্যবহাবিক গুণপনায বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাসেব চিত্ত আকৃষ্ট হয নাই। চৈতন্যচবিতকাবগণ শ্রীচৈতন্যেব কর্মজীবনই উপেক্ষা কবিযাছেন, সেইজন্যই শ্রীচৈতন্যদেব ভাবোন্মত্ত সন্ন্যাসীরূপেই পবিচিত হইযা আছেন, তাঁহাব কর্মময জীবন অন্ধকাবেই থাকিযা গিযাছে। ইহা বাংলাব ও বাঙলীব দুর্ভাগ্য।"

কর্মজীবনেব প্রতি উপেক্ষা

এ সমস্ত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও কবিবাজ গোস্বামী -বচিত 'চৈতন্যচবিতামৃত' গ্রন্থটি শুধু বৈষ্ণব সাহিত্যেব নয প্রাচীন ও মধ্যযুগেব বাঙলা সাহিত্যেব শ্রেষ্ঠ দার্শনিক গ্রন্থ, এ কথা অস্বীকাব কববাব উপায নেই। বাঙলা ভাষায বচিত যাবতীয গ্রন্থেব মধ্যে সম্ভবতঃ এটিই প্রথম গ্রন্থ, যা গীত হ'বাব জন্য বচিত হযনি—এটি শুধুই পাঠ্যগ্রন্থ। বৈষ্ণব সমাজে গ্রন্থটি এমন মর্যাদায অধিষ্ঠিত ছিল যে গ্রন্থটি বচিত হ'বাব কিছুকাল পবই বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সংস্কৃত

ভাষায় এর টীকা রচনা করেছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী নিজেও বৈষ্ণব দর্শন এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সুস্নাত ছিলেন। তিনি চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে যখনই কোন বক্তব্য বা মতবাদ উপস্থাপিত করেছেন, তখনই তার সমর্থনে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করেছেন। অনুমান, অন্ততঃ ৭৫টি সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে তিনি শ্লোক চয়ন করেছেন এবং প্রয়োজনবোধে নিজেও বহু শ্লোক রচনা করেছেন। এ ছাড়া তিনি সংস্কৃত ভাষায়ও দু'খানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। একটি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা-অবলম্বনে তেইশ সর্গে রচিত 'গোবিন্দলীলামৃত', অপরটি লীলাশুক বিল্বমঙ্গল-রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থের 'সারাঙ্গরঙ্গদা' নামক টীকা।

দার্শনিকতা ও পাণ্ডিত্য

কবিরাজ গোস্বামী যে প্রতিপাদ্য বিষয়কে অবলম্বন ক'রে তাঁর এই মহাকাব্যোপম গ্রন্থ রচনা ক'রেছেন, তার ভাববহন করবার ক্ষমতা রয়েছে একমাত্র গদ্য ভাষার। অথচ দর্শনের দুরূহ তত্ত্বকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে রূপদান করতে গিয়ে কৃষ্ণদাস নিঃসন্দেহে যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। উক্ত বক্তব্যের সমর্থনে একটি দৃষ্টান্ত ঃ

চৈতন্য-জীবনের নিত্যসঙ্গী স্বরূপদামোদরের 'কড়চা'য় 'শ্রীচৈতন্য অবতারের মূল প্রয়োজন'-বিষয়ে সংস্কৃত ভাষায় যে শ্লোকটি রয়েছে, তার কেমন সচ্ছন্দ বাঙলা অনুবাদ করেছেন কবিরাজ গোস্বামী ঃ

'রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি।।
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই।।...
রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার।।
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণের আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ।।
সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ।।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি।।'

বলা প্রয়োজন, কবিরাজ গোস্বামী তত্ত্বাংশের স্পষ্টতার জন্য এর শেষাংশে 'বিষ্ণুপুরাণ' থেকে খানিকটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কবিরাজ গোস্বামীর সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রকাশিত হয়েছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের তত্ত্ব ব্যাখ্যায়। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের নিকট যে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বকে আভাষে ইঙ্গিতে ব্যক্ত করেছিলেন, সেই দুরূহ এবং বিতর্কিত তত্ত্বকে কবিরাজ গোস্বামীই সর্বপ্রথম বাঙলা ভাষায় বৈষ্ণব সমাজে উপস্থাপিত করেন। এই বিশেষ কারণেই তাঁর রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটি বৈষ্ণব সমাজে শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ এবং সর্বশাস্ত্রসার সংগ্রহরূপে বিবেচিত হ'য়ে থাকে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজই সর্বপ্রথম চৈতন্যদেবের মধ্যে মাধুর্যপূর্ণ সাধকভাব দর্শন করেন—বৃন্দাবনদাসও কিন্তু এই ক্ষেত্রে ঐশ্বর্যভাব উপলব্ধি করেছিলেন। কৃষ্ণদাসই গুরুত্ব সহকারে প্রচার করেছেন যে বৈধী ভক্তি অপেক্ষাও অহৈতুকী রাগানুগা ভক্তি শ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ চৈতন্যবাণী ব্যাখ্যায় এবং চৈতন্যধর্ম-প্রচারে কৃষ্ণদাসের দানই সর্বাধিক বিবেচিত হ'য়ে থাকে।

কবিরাজ গোস্বামী তত্ত্ববিচারে অতিশয় যুক্তি এবং নিষ্ঠার পরিচয় দান করলেও চৈতন্য-মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনিও বৃন্দাবনদাসের মতই অলৌকিকতাব সহায়তা গ্রহণ করেছেন। ফলে তাঁর গ্রন্থে যে ঐতিহাসিকতার সম্ভাবনা বর্তমান ছিল, কৃষ্ণদাস তাঁর সুযোগ পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। এই কারণেই বলা চলে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনা তত্ত্ব, ধর্ম এবং দর্শনের বিচারে অসাধারণ বলে বিবেচিত হ'লেও জীবনীসাহিত্য কিংবা ঐতিহাসিকতার বিচারে একান্তই সাধারণ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর কাব্যের দোষ গুণ সমস্ত বিচার ক'রে অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই মন্তব্য করেছেন, "...সম্প্রদায়গত প্রভাব ছাড়িয়া দিলেও মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে এ গ্রন্থ অবিস্মরণীয় কীর্তি বলিযাই গণ্য হইবে; বাঙালীর মনন, দর্শন, তত্ত্বজ্ঞান ও বসবোধের এরূপ বিপুল পরিচয় আধুনিক যুগের গ্রন্থেও খুব সুলভ নহে।"

[পাঁচ] গোবিন্দদাসের কড়চা

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' উল্লেখ করা হয়েছে—

মুকুন্দদত্ত বৈদ্য গোবিন্দ কর্মকার।
মোর সঙ্গে আইসহ কাটোআ গঙ্গাপার।।

এটা ছাড়া সমগ্র চৈতন্য-সাহিত্যের কোথাও গোবিন্দ কর্মকার নামক কোন ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায় না। চৈতন্যজীবনী-রচয়িতাদের প্রত্যেকেই পূর্বসূরীদের সম্বন্ধে উল্লেখ ক'রে গিয়েছেন, কিন্তু কেউই চৈতন্য-সমসাময়িক গোবিন্দদাস কর্মকারের কাব্যের কথা উল্লেখ করেননি। অতএব ১৮৯৫ খ্রীঃ শান্তিপুরের জয়গোপাল গোস্বামী 'গোবিন্দদাসের কড়চা' নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন, এবং ১৯২৬ খ্রীঃ ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন উক্ত গ্রন্থেব যে নব সংস্করণ প্রকাশ করেন, তা' ভক্ত এবং ঐতিহাসিকদের মনে এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করল। মূল গ্রন্থটি যেমন একটি সমস্যাস্থল হয়ে দাঁড়াল, তদপেক্ষা অধিক সমস্যার সৃষ্টি করল গ্রন্থ-বর্ণিত বিষয়সমূহ। এই গ্রন্থটিকে অবলম্বন কবে পণ্ডিতসমাজে যে পরিমাণ বাদ-বিতণ্ডাব সৃষ্টি হয়েছে, তেমনটি আর কখনো বড় হয়নি।

গোবিন্দদাস গ্রন্থে যে আত্মপরিচয় দান করেছেন তাতে বলেছেন যে তিনি জাতিতে কামার—'অস্ত্রহাতা বেড়ি'-গড়া তাঁর পেশা। তাঁর পিতা বর্ধমান জেলার কাঞ্চনপুরবাসী শ্যামাদাস এবং মাতা মাধবী। কবি 'নির্গুণে মুরখ' বলে পত্নী শশিমুখীর দ্বারা অপমানিত হন এবং 'চৌদ্দশ ত্রিশ শকে' একদিন গৃহত্যাগ করেন। তিনি কাটোয়ায় পৌঁছে প্রেমের ঠাকুর চৈতন্যদেবের নাম শুনতে পেলেন

কবির পরিচয়

এবং নবদ্বীপে গিয়ে তাঁর ভৃত্যের পদ গ্রহণ করলেন। অতঃপর মহাপ্রভুর সঙ্গে গোবিন্দদাস নীলাচল আসেন। মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সময় গোবিন্দদাস বরাবর তাঁর সঙ্গে ছিলেন। দাক্ষিণাত্য থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মহাপ্রভু তাঁকে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। গ্রন্থটি এইখানেই খণ্ডিত হয়ে গিয়েছে।

গ্রন্থকার যেভাবে গ্রন্থটি সাজিয়েছেন, তা'তে মনে হয়, মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের একটা দলিল বা record রাখাই কবির অভিপ্রায়। 'কড়চা করিয়া রাখি শক্তি অনুসারে'। তাই তিনি এই 'কড়চা' বা note বা diary রেখেছিলেন। গ্রন্থটিতে কিন্তু দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকাহিনী ব্যতীত অপর কোন বিষয়ে কবির প্রতিশ্রুতি-মত নিখুঁত 'কড়চা' রাখবার প্রমাণ পাওয়া যায় না। যা' হোক, গ্রন্থটি যদি মহাপ্রভু-সঙ্গী গোবিন্দদাস কর্মকারেরই রচিত হত, তবে এটিই হতো চৈতন্য-বিষয়ে প্রাচীনতম এবং প্রামাণিকতম পুস্তক। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, গ্রন্থটিই গোবিন্দদাসের শত্রুতা সাধন করেছে। এর ভাব, ভাষা এবং কিছু আভ্যন্তর প্রমাণ বর্তমান, যাতে একে চৈতন্যের সমকালীন কিংবা গোবিন্দদাস কর্মকার-রচিত বলে বিশ্বাস করে ওঠা যায় না। গ্রন্থের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে, তা সংক্ষেপে প্রদত্ত হ'লো।

প্রামাণিক?

গ্রন্থটির ভাষা প্রায় আগাগোড়াই আধুনিক, মাঝে মাঝে যেন জবরদস্তি করে কিছু প্রাচীন শব্দ প্রবেশ করানো হয়েছে। এ বিষয়ে অবশ্য গ্রন্থটির অন্যতম সমর্থক ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মনে করেন যে, গ্রন্থের স্থান-বিশেষের পাঠোদ্ধার কষ্টকর হওয়ায় এবং স্থানে স্থানে পুথি কীটদষ্ট হওয়াতে সম্পাদক গোস্বামী মহাশয় নিজে কিছু কিছু শব্দ যোজনা করে থাকতে পারেন। কিন্তু দীনেশবাবু যে শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চেষ্টা করেছেন. তা স্পষ্টতই বোঝা যায়. যখন দেখি, গ্রন্থের মধ্যেই আবার কীটদষ্ট বলে কোন কোন অংশ ছাড় দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থের মধ্যে 'জানালা, রসালখন্ড, পূর্ণনগরের' উল্লেখও গ্রন্থটির আধুনিকতার নিঃসংশয় প্রমাণ। পর্তুগীজ শব্দ থেকে আগত 'জানালা' বাঙলা ভাষায় অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে; 'রসালখন্ড' স্থানটি ১৮৩৬ খ্রীঃর পর রাসেল সাহেবের নাম-অনুসারে নামাঙ্কিত হয়; ব্রিটিশ-অভ্যুদয়ের পূর্বে পুণা তথা 'পূর্ণনগর' ছিল অজ্ঞাত অখ্যাত স্থান। গ্রন্থকার এত বার বার সন-তারিখের কথা এবং কড়চা করবার কথা উল্লেখ করেছেন যে, মনে হয়, পরবর্তীকালে গ্রন্থখানি নিয়ে বিভ্রাটে পড়তে হ'তে পারে, এই আশঙ্কায়ই কবি আট-ঘাট বেঁধে অগ্রসর হয়েছেন। এতটা সচেতন ইতিহাস-বোধ তৎকালের পক্ষে অস্বাভাবিক। গ্রন্থকার নিজেকে 'নির্গুণে মুরখ' বলে পরিচয় দিয়েও যেভাবে কাব্যটি রচনা করেছেন, তাতে তাঁকে 'সহজাত কবিত্ব প্রতিভার অধিকারী' বললেও মনে প্রশ্ন থেকে যায়,— গোবিন্দদাস 'প্রমেয়, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ,অবয়বী' ইত্যাদি বেদান্তাদির তত্ত্বকথা কোথা থেকে জানলেন? এছাড়া গ্রন্থে নানাপ্রকার ভ্রান্তি এবং অসঙ্গতির পরিচয় সুস্পষ্ট। এই সমস্ত দেখে শুনে ডঃ সুকুমার সেন অভিমত প্রকাশ করেছেন : " (১) ভাষা ধরিয়া বিচার করিলে গোবিন্দদাসের কড়চায় রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর উর্ধ্বে যাইতে

জালগ্রন্থ : কড়চা

পারে না। (২) বস্তু ধরিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাই যে, গ্রন্থটি শ্রীচৈতন্যের কোন অনুচরের রচনা হইতে পারে না।" বস্তুত, ডঃ সেনের অনেক পূর্বেই মৃণালকান্তি ঘোষ 'গোবিন্দদাসের কড়চা-রহস্য' গ্রন্থে এবং বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত 'Govinda Das's Kadcha—a Black Forgery' নামক গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে কড়চাখানি আগাগোড়া জাল। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মধ্যপথ অবলম্বন করে বলেছেন, "গোস্বামী মহাশয় হয়ত কোন কীটদষ্ট প্রাচীন পুঁথি সংক্ষিপ্তভাবে যাহা পাইয়াছিলেন, তাহাই পল্লবিত করিয়া নিজের ভাষায় লিখিয়া 'গোবিন্দদাসের কড়চা' নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।" এই সমস্ত আপত্তি ছাড়াও গ্রন্থমধ্যে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে, তাও ভক্ত বৈষ্ণবদের নিকট গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি।

গ্রন্থটি যখন এবং যাহার দ্বারাই রচিত হয়ে থাকে, গ্রন্থটিতে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের যে ঘটনাটি বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী। গ্রন্থটির স্থানে স্থানে উত্তম কবিত্বশক্তিরও নিদর্শন পাওয়া যায়।

[ছয়] চূড়ামণিদাস : গৌরাঙ্গবিজয়

চৈতন্যদেবের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে লিখিত আর একখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রন্থটি চূড়ামণিদাস-রচিত। পূর্বে এটিকে 'ভুবনমঙ্গল' নামে পরিচায়িত করা হ'লেও প্রকাশ কালে ডঃ সেন এর নাম দান করেন 'গৌরাঙ্গ-বিজয়'। ডঃ সেন মনে করেন গ্রন্থটি ১৫৪২খ্রীঃ থেকে ১৫৮০ খ্রীঃ-র মধ্যবর্তী কোন সময়ে রচিত হয়েছিল। গ্রন্থটি পাওয়া যায় খণ্ডিত অবস্থায়। চূড়ামণিদাস ছিলেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর অনুচর ধনঞ্জয় পন্ডিতের শিষ্য। তাঁর গ্রন্থে পরিচ্ছেদ বিভাগ নেই। আলোচ্য গ্রন্থটিতে কবি চূড়ামণিদাস চৈতন্যদেব এবং তাঁর পার্ষদ্দের সম্বন্ধে কিছু কিছু নোতুন তথ্য পরিবেষণ করেছেন। কবি চৈতন্যদেবকে ভগবানের অবতার বলে বিশ্বাস করেছেন; কিন্তু তত্ত্বকথার প্রচার করে কিংবা অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা করে তিনি এই অবতারত্ব প্রতিপাদন করতে চেষ্টা করেননি। গ্রন্থের কোন কোন চরিত্র-চিত্রণে এবং বর্ণনায় কবি বেশ বাস্তবতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

[সাত] লুপ্ত জীবনী-কাব্য

পূর্বে চৈতন্য-জীবনী-বিষয়ক গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা হ'য়েছে, তার বাইরেও কিছু কিছু গ্রন্থ রচিত হ'য়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থগুলির অথবা গ্রন্থকর্তার নামমাত্র সার—গ্রন্থের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। পরবর্তী কোন গ্রন্থের কোন উল্লেখ থেকেই শুধু গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের নাম মাত্র পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের জীবৎকালেই জনৈক 'বঙ্গদেশীয় বিপ্র' চৈতন্যদেবের জীবনকাহিনী অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় একখানি নাটক লিখে তা' চৈতন্যদেবকে

শোনানোর জন্য নীলাচলে উপস্থিত হয়েছিলেন। গ্রন্থখানি চৈতন্যদেবকে শোনানো না হলেও স্বরূপদামোদর গ্রন্থটি পাঠ করে গ্রন্থকারকে চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থখানি লোপ পেয়েছে। জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যের প্রারম্ভে তাঁর পূর্বসূরীদের নাম উল্লেখ ক'রে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এঁদের মধ্যে বৃন্দাবনদাসের নাম উল্লেখ করে কবি পরে লিখেছেন ঃ

'গৌরীদাস পন্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী।
চামর-প্রবন্ধে তার পদে পদে ধ্বনি।।
সংক্ষিপ্তে কহিলেন পরমানন্দ গুপ্ত।
গৌরাঙ্গ-বিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত।।
গোপাল বসু কহিলেন সঙ্গীত প্রবন্ধে।
চৈতন্যমঙ্গল তাঁর চামর বিছন্দে।।'

অর্থাৎ, এখানে গৌরীদাস পন্ডিত, পরমানন্দকৃত 'গৌরাঙ্গবিজয়' এবং গোপাল বসু-রচিত 'চৈতন্যমঙ্গলে'র নাম পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু প্রবন্ধেরই সন্ধান পাওয়া যায় নি।

চৈতন্যদেবের জীবন-কাহিনী-অবলম্বনে যে চরিতশাখার একটি ধারার সৃষ্টি হয়েছিল, চৈতন্যচরিত্র-চিত্রণেই তা সমাপ্ত হয নি, পববর্তীকালে চৈতন্য-পার্ষদ্‌দের অনেকের জীবন কাহিনী-অবলম্বনেই আরও কিছু কিছু চবিত-সাহিত্য রচিত হয়েছিল। এদের মধ্যে ঈশান নাগর-বচিত 'অদ্বৈতপ্রকাশ', হরিচরণের 'অদ্বৈতমঙ্গল', নরহবিদাসের 'অদ্বৈতবিলাস', লোকনাথদাসেব 'সীতাচরিত্র' ও বিষ্ণুদাস আচার্যের 'সীতাগুণকদম্ব' প্রভৃতি প্রধান। এইগুলি ছাড়াও 'ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস, গৌরচরিতচিন্তামণি, প্রেমবিলাস' ইত্যাদি আরও গ্রন্থ কালে কালে রচিত হয়েছে, — এদের মধ্যে চৈতন্যপরিকরদের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, চৈতন্য-পার্ষদ্ এবং পরিকরদের অনেকবই জীবনী-অবলম্বনে অনেক গ্রন্থ বচিত হয়েছে, কিন্তু বলরামের অবতাব-রূপে পরিচিত নিত্যানন্দ প্রভুব জীবন কাহিনী-অবলম্বনে কোন গ্রন্থ রচিত হয় নি। এর একটি সম্ভাব্য উত্তর এই হতে পারে যে অধিকাংশ চৈতন্য-জীবনীতেই চৈতন্য-চরিতের সঙ্গে নিত্যানন্দ-চরিতও প্রায় সমভাবেই বর্ণিত হয়েছে, অতএব পৃথগ্‌ভাবে নিত্যানন্দজীবনী রচনার বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা হয়তো কেউ বোধ কবেন নি।

[আট] অদ্বৈতজীবনী

ক।। শান্তিপুরের বৃদ্ধ আচার্য অদ্বৈত্য মহাপ্রভুকে মহাদেবের অবতার-রূপে বিশ্বাস কবা হয়। বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন যে অদ্বৈতাচার্যের হুঙ্কারেই ভগবান্ চৈতন্যরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। অদ্বৈতাচার্য চৈতন্যজননী শচীদেবীর দীক্ষাগুরু ছিলেন বলেও বৈষ্ণব সমাজে তাঁর স্থান অতি উচ্চে। অদ্বৈতাচার্যের একাধিক জীবন কাহিনী রচিত হয়েছিল, এদের

মধ্যে ঈশান নাগব-বচিত 'অদ্বৈতপ্রকাশ' অন্যতম। গ্রন্থে কবি আত্মজীবনী প্রসঙ্গে বলেছেন যে তিনি পাঁচ বৎসব বযসে অদ্বৈতাচার্যেব গৃহে আশ্রয লাভ কবেন এবং প্রায সত্তব বৎসব বযসে অদ্বৈতাচার্যেব অভিপ্রাযে এবং অদ্বৈতপত্নী সীতাদেবীব আদেশে আচার্যদেবেব জন্মভূমি শ্রীহট্টেব লাউড গ্রামে চলে আসেন। এখানেই—

'চৌদ্দশত নবতি শকাব্দ পবিমাণে।
লীলাগ্রন্থ সাঙ্গ কৈনু শীলাউড ধামে।।'

অর্থাৎ গ্রন্থটি বচিত হ'যেছিল ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে।

কবি ঈশান নাগব প্রত্যক্ষভাবে গৌবাঙ্গ মহাপ্রভুব সান্নিধ্য-লাভেব সুযোগ পেযেছিলেন। এ ছাড়া চৈতন্যপার্ষদ্‌দেব প্রত্যেকেব সঙ্গেই তাঁব ব্যক্তিগত পবিচয ছিল বলে বিশ্বাস কবা চলে। এই গ্রন্থে চৈতন্য-জীবন সম্বন্ধেও এমন সমস্ত তথ্য পাওযা যায, যে সকল অপব কোন গ্রন্থেই দুর্লভ অথচ এদেব প্রামাণিকতাযও কোন সন্দেহ নেই। ডঃ সেন বলেন, " গ্রন্থ বৃহৎ না হইলেও প্রামাণিকতায ইহা চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলিব অপেক্ষা কোন অংশে খাট তো নহেই, পবন্তু লোচন-জযানন্দাদিব গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট। তাবৎ চৈতন্য ও চৈতন্যপাবিষদ জীবনীগ্রন্থেব মধ্যে অদ্বৈতপ্রকাশেব একাধিক অনন্যসাধাবণ বিশেষত্ব আছে, তাহাতে এই গ্রন্থেব মূল্য বাডিযা গিযাছে। অদ্বৈতপ্রকাশকে চৈতন্যজীবনীগুলিব অন্যতম বলা যায।" ঈশান নাগবেব দৃষ্টি খুব সজাগ ছিল। যখনই যে বিষযে কিছু বচনা কবেছেন, তখনই তাব উৎস নির্দেশ কবেছেন। স্বযং চৈতন্য মহাপ্রভু মুখে তাঁকে যে উপদেশ দান কবেছিলেন, তা কৌতূহলোদ্দীপক বিবেচনায নীচে উদ্ধৃত হলো ঃ

কাব্য বিচাব

সহাস্যে মধুবভাষে গৌবাঙ্গ কহিলা।
শুনহ ঈশান শাস্ত্র যাহা প্রকাশিলা।।
সাধুস্থানে কবিবে সদ্ধর্মেব শিক্ষণ।
সর্ব ধর্ম শ্রেষ্ঠ হবিনাম সঙ্কীর্তন।।
তপজপ হৈতে নামেব মহিমা প্রচুব।
নাম লৈলে সর্ব অপবাধ যায দূব।।
প্রকৃতি সম্ভাষ উদাসীনেব ধর্মনাশ।
নানা দেব দেবীব কৃষ্ণে না হয বিশ্বাস।।

"অদ্বৈতপ্রকাশেব মধ্যে পাণ্ডিত্যপ্রযাস অথবা কবিত্বপ্রচেষ্টা বা কবিসুলভ আডম্বব কিছুই নাই। ভাষাও অলঙ্কাব বর্জিত, সবল। ঈশান ক্ষমতাশালী লেখক ছিলেন, কি তত্ত্বকথায কি সাধাবণ বর্ণনায সর্বত্রই লিখন ভঙ্গীব বিশিষ্টতা ও মাধুর্য বর্তমান।"(ডঃ সুকুমাব সেন)

খ।। অদ্বৈতাচার্যেব জীবন কাহিনী অবলম্বনে বচিত অপব একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হবিচবণ দাস-বচিত 'অদ্বৈতমঙ্গল'। হবিচবণ দাস অদ্বৈত প্রভু অথবা তাঁব জ্যেষ্ঠপুত্র অচ্যুতানন্দেব এক শিষ্য ছিলেন। তিনি অদ্বৈতাচার্যেব শেষ জীবনেব লীলা প্রত্যক্ষ কবেছেন আব প্রথম

জীবনের লীলাকাহিনী শুনেছেন প্রভুর মাতুল-তুল্য বিজয়পুরীর মুখে। কবির কাব্য পাঁচ 'অবস্থা'য় এবং তেইশ সংখ্যায় বিভক্ত। এতে চৈতন্যলীলা-সম্বন্ধে নোতুন কিছু কিছু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। চৈতন্যদেব যে শান্তিপুরেও অদ্বৈতাচার্য এবং নিত্যানন্দের সঙ্গে দানলীলার অভিনয় করেছিলেন তার উল্লেখ আর অন্যত্র পাওয়া যায় না। আবার অদ্বৈতাচার্যের জ্যেষ্ঠ চারি ভ্রাতাই যে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, তাও এই গ্রন্থ থেকেই জানা যায়। গ্রন্থকার নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পরিচয় দান করেন নি।

অদ্বৈতমঙ্গল

গ।। নরহরিদাস 'অদ্বৈতবিলাস' নামক অপর একটি অদ্বৈত-জীবনী রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটি সম্ভবত সম্পূর্ণ আকারে এখনও উদ্ধার করা যায় নি। সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত পুঁথিটি খণ্ডিত, এতে শুধু বাল্যলীলার কাহিনী বর্তমান। ডঃ সেন অনুমান করেন যে গ্রন্থটি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে রচিত হয়েছিল।

অদ্বৈতবিলাস

[নয়] সীতাজীবনী

সীতাদেবী মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্যের পত্নী। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবও বিবাহিত ছিলেন; কিন্তু চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহসম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছিলেন বলেই, মনে হয়, চৈতন্য পরিবারের সঙ্গে চৈতন্য-পার্ষদদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠবার বিশেষ অবকাশ ঘটে নি। পক্ষান্তরে অদ্বৈতাচার্য ছিলেন গৃহী সন্ন্যাসী, চৈতন্যদেব এবং পার্ষদদের অনেকেই অদ্বৈত-গৃহে গমনাগমন করতেন। ফলত, অদ্বৈত-পরিবারের সঙ্গেই চৈতন্যভক্তদের সম্পর্ক সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ ছিল বলে অনুমান করা চলে। সম্ভবত এই কারণেই শ্রেষ্ঠ নারীচরিত্রের আদর্শ-রূপে তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজে সীতাদেবীকেই গ্রহণ করা হয়েছিল। অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে যে, চৈতন্যদেবের মত সীতাদেবীব চরিত্রেও অনেক অসাধারণত্ব, অনেক অলৌকিকত্ব আরোপ করা হয়েছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর মানবিক রূপটি কখনও চাপা পড়ে নি। সীতাদেবীর প্রসঙ্গে হরিচরণ দাস বলেছেন ঃ

সীতাদেবীর প্রভাব

শিষ্য প্রসাদ পাত্র গুরুসঙ্গে বসি।
কেশ খসিল প্রভুর অন্ন পরিবেশি।।
দুইহস্তে পরিবেশি আনি হাতে ধরি।
আব দুই হস্তে চুল বান্ধিল প্রসারি।।

সীতাচরিত্র-সম্বন্ধে দুইখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে, একখানি লোকনাথদাস-রচিত 'সীতাচরিত্র' অপবখানি বিষ্ণুদাস আচার্য রচিত 'সীতাগুণকদম্ব'। গ্রন্থ দুইখানি সম্বন্ধে ডঃ সেন বলেন, দুইখানি বইয়েরই প্রাচীনত্ব কৃত্রিম। এদের মধ্যে লোকনাথদাস-রচিত 'সীতাচরিত্র' প্রধান। এই লোকনাথদাসকেই অদ্বৈত-শিষ্য লোকনাথ চক্রবর্তী বলে কেউ কেউ মনে করেন। তা

না হলেও ইনি যে অদ্বৈত-শিষ্যসম্প্রদায়ভুক্ত কেহ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই গ্রন্থে বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ-আদির উল্লেখ বর্তমান। গ্রন্থটি ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সমাপ্ত বলে গ্রন্থকার উল্লেখ করলেও এতে কোন অধ্যায়ের উল্লেখ নেই, পরন্তু গ্রন্থটিকে খণ্ডিত বলেই মনে হয়। গ্রন্থে উল্লেখযোগ্য কোন তথ্য নেই। গ্রন্থকার

সীতাচরিত্র

প্রধানত সীতাদেবীর দুই শিষ্য নন্দিনী ও জঙ্গলী দেবীর মাহাত্ম্য এবং ইতিহাস রচনা করেছেন। এঁরা উভয়েই পুরুষ ছিলেন, -সাধনার জোরে নারীত্ব লাভ করেছিলেন অথবা নারীবেশেই এঁরা সাধনা করতেন।

মাধবেন্দ্র আচার্যের পুত্র বিষ্ণুদাস আচার্য 'সীতাগুণকদম্ব' নামে অপর গ্রন্থখানি রচনা করেন। বিষ্ণুদাস সীতাদেবীর শিষ্য ছিলেন। এতে নন্দিনী এবং জঙ্গলী দেবীর মাহাত্ম্য থাকলেও অদ্বৈত আচার্য এবং সীতাদেবী-সম্বন্ধেও নূতন কিছু কিছু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। ১৪৪৩ শকাব্দে গ্রন্থটির রচনারম্ভ হয়েছিল, উল্লেখ করা হলেও এতে সন্দেহের অবকাশ বর্তমান।

[দশ] বৈষ্ণবমোহান্ত-চরিত

সপ্তদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে পরবর্তীকাল পর্যন্ত বিভিন্ন বৈষ্ণব মহাজনদের জীবনকাহিনী অবলম্বনে প্রচুর চরিত-সাহিত্য রচিত হয়েছে। অবশ্য এদের মধ্যে চৈতন্যজীবন-বিষয়েও কিছু কিছু গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব মহাজনদের মধ্যে প্রধান ছিলেন শ্রীনিবাস, নরোত্তমদাস, শ্যামানন্দ প্রভৃতি — নরোত্তমদাসের ব্রাহ্মণ শিষ্য নরহরি চক্রবর্তী বৈষ্ণব মোহোন্তদের সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থই রচনা করে গেছেন, এদের মধ্যে শ্রীনিবাস আচার্যের জীবন-কাহিনী-অবলম্বনে রচিত 'শ্রীনিবাসচরিত', নরোত্তমদাসের জীবনী 'নরোত্তমবিলাস' এবং বিভিন্ন বৈষ্ণবমোহান্তদের কাহিনী-অবলম্বনে লিখিত 'ভক্তিরত্নাকর' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের কাহিনী, বীর হাম্বীর-কর্তৃক 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থাদি-লুণ্ঠন কাহিনী, খেতুরীর মহোৎসবাদিব বর্ণনা স্থান লাভ করেছে। শ্রীখণ্ডের নিত্যানন্দদাস-রচিত 'প্রেমবিলাস'ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। নিত্যানন্দদাস ছিলেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর কনিষ্ঠা পত্নী জাহ্নবী দেবীর মন্ত্রশিষ্য। গ্রন্থটি ১৫২২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬০০ খ্রীঃ রচিত হয়েছিল বলে পুষ্পিকায় উক্ত হয়েছে। শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর, শ্যামানন্দ, জাহ্নবী ঠাকুরাণী এবং বীরচন্দ্র গোস্বামী—এই পাঁচজনের চেষ্টায় চৈতন্যোত্তর বঙ্গদেশে যে বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তিত হ'লো তার ইতিহাস এই গ্রন্থে প্রদত্ত হয়েছে। গ্রন্থটিতে চৈতন্যমহাপ্রভু ছাড়াও নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য, নরোত্তম, শ্রীবাস, শ্যামানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণব প্রধানাচার্য, বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামী এবং নবদ্বীপের মোহান্তদেবও পরিচয় দান করা হয়েছে। ডঃ সেনের মতে "'প্রেমবিলাস' এক হিসাবে বাঙ্গলা সাহিত্যেব প্রথম ইতিহাস-গ্রন্থ। সেইহেতু গ্রন্থটিব মুল্য এবং মর্যাদা যথেষ্ট আছে।" যদুনন্দনদাস-রচিত 'কর্ণানন্দ'

'প্রেমবিলাসে'র উপসংহার-রূপেই গৃহীত হয়ে থাকে । এতে বৈষ্ণবমোহান্তদের প্রধান প্রধান শাখার এবং উপশাখার বর্ণনা করা হয়েছে। 'প্রেমবিলাসে' বর্ণিত কাহিনী এই গ্রন্থে অতি সংক্ষিপ্ত আকারে পরিবেষিত হয়েছে। রাজবল্লভ-রচিত 'বংশীবিলাস' বা 'মুরলীবিলাস' গ্রন্থে চৈতন্যানুচর এবং শ্রীকৃষ্ণের বংশীর অবতার-রূপে কথিত বংশীবদন চট্টের জীবনী বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থটি ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব ইতিহাসে একটি অতিশয় মূল্যবান সংযোজন। এতে অলৌকিক ঘটনার আধিক্য থাকলেও কোন কোন তত্ত্বের উপর নোতুন আলোকপাত করা হয়েছে। গোপীজনবল্লভদাস শ্যামানন্দ-শিষ্য রসিকানন্দ বা রসিক—মুরারির জীবনী-অবলম্বনে 'রসিকমঙ্গল' রচনা করেন। এতেও অলৌকিক কাহিনীর প্রাচুর্য থাকা-সত্ত্বেও সমসাময়িক কালে বাঙলাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে বিষয়ে অতিশয় মূল্যবান উপকরণ পাওয়া যায়। বৈষ্ণব মোহান্তদের বিষয়ে অনুরূপ আরও বহু গ্রন্থই রচিত হয়েছিল। সাহিত্য-কীর্তি হিশেবে এদের বিশেষ কোন মূল্য নেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্বানুবৃত্তি মাত্র।

[এক] বিষয়, তত্ত্ব ও রস-পরিচয়

সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে যদি এমন কোন শাখার নাম উল্লেখ করতে হয়, যা বিশ্বাসাহিত্যে স্থান লাভের যোগ্য, তবে নিশ্চিতই বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের কথাই বলতে হয়। ধর্মেব সঙ্গে এর কিছু সম্বন্ধ বর্তমান থাকলেও এই সাহিত্য যে রসের বিচারে দেশ-কালের সীমাকে অতিক্রম করে গিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কোণ্ গুণে বৈষ্ণব স'হিত্য কালকে জয় কববার শক্তি অর্জন করেছিল, তৎ-সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতার প্রেমের দিকটাই বিশেষভাবে দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "এই প্রেমের শক্তিতে বলীয়সী হইয়া আনন্দ ও ভাবের এক অপূর্ব স্বাধীনতা প্রবলবেগে বাঙলা সাহিত্যকে এমন এক জায়গায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে যাহা পূর্বাপরের তুলনা করিয়া দেখিলে হঠাৎ খাপছাড়া বলিয়া বোধ হয়। তাহার ভাষা, ছন্দ, ভাব, তুলনা, উপমা ও আবেগের প্রবলতা সমস্তই বিচিত্র ও নূতন। তাহার পূর্ববর্তী বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের সমস্ত দীনতা কেমন করিয়া এক মুহূর্তে দূর হইল, অলঙ্কার শাস্ত্রের পাষাণবন্ধন-সকল কেমন করিয়া এক মুহূর্তে বিদীর্ণ হইল, ভাষা এত শক্তি পাইল কোথায়, ছন্দ এত সঙ্গীত কোথা হইতে আহরণ করিল? বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে নহে, প্রাচীন সমালোচকের অনুশাসনে নহে, দেশ আপনার বীণায় আপনি সুর বাঁধিয়া আপনার গান ধরিল। প্রকাশ করিবার আনন্দ এত, আবেগ এত যে, তখনকার উন্নত মার্জিত কালোযাতি সঙ্গীত থই পাইল না। দেখিতে দেখিতে দশে মিলিয়া এক অপূর্ব সঙ্গীত প্রণালী তৈরি করিল, আর কোন সঙ্গীতের সহিত তাহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য পাওয়া শক্ত।" মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ সাহিত্যেব যুগে এইভাবে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য আপনার পথ করে নিয়েছিল।

কালজয়ী বৈষ্ণব সাহিত্য

আমাদের দেশে একটা বহু-প্রচলিত অভিমত এই যে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুদয় ঘটেছিল, তারই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অবস্থায় বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি। সৃষ্টি-সম্বন্ধে কিছুটা সংশয় থাকলেও বৈষ্ণব পদাবলীর পুষ্টি-ব্যাপারে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মই যে প্রধান সহায়কের ভূমিকা নিয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। চৈতন্য-পূর্ব যুগেই বড়ু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণ-বিষয়-অবলম্বনে পদ রচনা করেছিলেন। বড়ু

চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' অনেকটা কাহিনী-কাব্য-জাতীয় হোলেও এর শেষদিকে কয়েকটি আস্বাদন-যোগ্য পদের সন্ধান পাওয়া যায়। কেউ কেউ অনুমান করেন, চৈতন্যদেবের পূর্বেই অপর একজন পদকর্তা চণ্ডীদাসও (দ্বিজ?) আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাছাড়া পদ-জাতীয় রচনা জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থে এবং চর্যাপদেও পাওয়া যায়। বিশেষত, চৈতন্যদেব নিজেও বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বর্ণিত রাধাপ্রেমের প্রভাবে পড়ে রাধা-ভাবের সাধনায় আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন—কেউ কেউ এরূপ উক্তিও করে থাকেন। অতএব পদাবলী সাহিত্যের সৃষ্টি যে চৈতন্য-প্রভাবজাত নয় তা প্রায় বিনাদ্বিধায়ই স্বীকার করা চলে। কিন্তু চৈতন্যলীলা যে পদাবলী সাহিত্যের পুষ্টিতে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছে, তাও নিঃসন্দেহে বলা চলে।

বৈষ্ণব সাহিত্যে চৈতন্য প্রভাব

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে একমাত্র ভক্তিমার্গকেই ঈশ্বর-আরাধনার শ্রেষ্ঠ উপায়রূপে স্বীকৃতি দান করা হয়েছে। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' এই প্রসঙ্গে 'শুদ্ধা ভক্তি'র কথা বলা হয়েছে। 'আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন', শুদ্ধা ভক্তি এবং এই 'শুদ্ধ ভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয়'। অতএব জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয়াদি সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়কে কৃষ্ণাভিমুখী রেখে যে ভক্তি-সাধনার পথে অগ্রসর হওয়া যায়, তার সিদ্ধিই প্রেম। আবার

বৈষ্ণব ধর্মে ভক্তিবাদের প্রাধান্য

প্রেম পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী।।

বস্তুত, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে রাধাভারের সাধনাকেই শ্রেষ্ঠ সাধনা বলে অভিহিত করা হয়। উক্ত দর্শনের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা কবিরাজ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গ-রূপে অবতীর্ণ হবার কারণ সম্বন্ধে স্বরূপদামোদরের উক্তি উল্লেখ করেছেন-

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কিদৃশং বেতি লোভাৎ,
তদ্ভাবাঢ্য সমজনি শচী-গর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।

অন্যত্র কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

রাধাভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হয় অবতীর্ণ।।

রাধাপ্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করবাব জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্যলোকে নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য প্রধানত রাধাপ্রেমের স্বরূপ-চিত্রণেই নিযুক্ত।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই বাঙলাদেশে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে উপজীব্য করে পদাবলী সাহিত্যের রচনা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। বিদ্যাপতির অসংখ্য পদ ছাড়াও সম্ভবতঃ কোন এক চণ্ডীদাসও এ জাতীয় কবি ছিলেন। ইনি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র কবি

বড়ু চণ্ডীদাসও হ'তে পারেন, এ ছাড়া অন্য কোন চণ্ডীদাসও হ'তে পারেন। এই প্রসঙ্গে একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়ের কথা উল্লেখ করতে হয়। ভাগবতপুরাণে কৃষ্ণকাহিনী বিস্তৃতভাবেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, এই কারণে পুরাণখানি ভক্ত বৈষ্ণবের নিকট শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা লাভ করে থাকে। 'হরিবংশে' এবং 'বিষ্ণুপুরাণে'ও কৃষ্ণ-কাহিনী বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, রাধার নামটি পর্যন্ত কোথাও উল্লেখ করা হয় নি। সম্ভবত পরবর্তী পুরাণ-সমূহে, বিশেষত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কাহিনী বিস্তৃতভাবে পরিবেষিত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'ই সম্ভবত সর্বপ্রথম এই বিষয়ে রচিত গীতধর্মী পদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সমস্ত পদসাহিত্যে প্রেম-রচনার মধ্যে কবিদের ব্যক্তিগত অনুভূতির উচ্ছ্বাসই প্রাধান্য লাভ করেছিল। এখানেও রাধাভাবের সাধনা—কবি স্বয়ং যেন রাধারূপে কৃষ্ণপ্রেমের স্বাদ উপলব্ধিতে তৎপর। কিন্তু চৈতন্যোত্তর কবিগণ চৈতন্যদেবের অন্তরালে দাঁড়িয়ে যেন রাধাকৃষ্ণের লীলারস আস্বাদন করেছেন। এ বিষয়ে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন, "বাঙলার বৈষ্ণব কবিগণ সকলেই একটু দূর হইতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা আস্বাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন — রাধার ভাব কেহই অবলম্বন করিতে চাহেন নাই। ... সখী বা মঞ্জরীর অনুগভাবে সাধন করিয়া নিত্য যুগল-লীলা আস্বাদন করাই ছিল বাঙলার বৈষ্ণব কবিগণের সাধ্যসার।" চৈতন্য-পূর্ব বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রেমকে অনেকটা প্রাকৃত বা পার্থিব অর্থাৎ লৌকিক প্রেম বলেই বর্ণনা করা চলে। কিন্তু পরবর্তী বৈষ্ণব কবিগণ ভক্তির দ্বারা সেই পার্থিব প্রেমকে কিছুটা মেজে ঘষে মালিন্যমুক্ত করে তবে প্রকাশ করেছেন। ডঃ দাশগুপ্তের মতে, "পরবর্তীকালে গৌড়ীয় গোস্বামিগণ-কর্তৃক যখন রাধাতত্ত্ব দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইল, তখনও সাহিত্যের ভিতরে রাধা তাহার ছায়াসহচরী মানবী নারীকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।"

কৃষ্ণলীলা-কাহিনীর উদ্ভব

বাঙলা সাহিত্যের জনৈক ঐতিহাসিক বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ণিত প্রেমের পার্থিবতা প্রমাণ করবার জন্য একটু উগ্র অভিমতই প্রকাশ করেছেন। "সহজিয়া-কবি-জীবনে পরকীয়া-প্রেমের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়াই তাঁহাদের রচিত বৈষ্ণব পদাবলীতে তাহা স্বাভাবিক, সজীব ও রসোচ্ছল হইয়া প্রকাশিত হইতে পারিয়াছিল এবং সেইজন্য জনপ্রিয়তা ও প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইয়াছিল। ইহাই বৈষ্ণব পদাবলীর প্রকৃত ইতিহাস।" ইনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধার করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, কবির মনেও অনুরূপ ধারণারই সৃষ্টি হয়েছিল।—

'সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি
কোথা তুমি পেয়েছিল এই প্রেমচ্ছবি . . .'

কিন্তু তৎসত্ত্বেও উক্ত সমালোচক বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যকে রিয়ালিস্টিক কবিতা বলে অভিহিত করেন নি। তাঁর মতে, "বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেমের মূল বাস্তব জীবনের মৃত্তিকায় বটে, কিন্তু তাহার ফুল ফুটিয়াছে কবি-কল্পনার উন্মুক্ত আকাশে। এইখানেই পদাবলীর কবিদিগের কবি-প্রতিভা।" এ বিষয়ে অপর একজন মধ্যপথাবলম্বী ঐতিহাসিকের অভিমত উদ্ধার করা যায়।

বৈষ্ণব সাহিত্যে পার্থিব প্রেম ও অধ্যাত্মপ্রেম

ইনি পার্থিব প্রেম ও ভক্তির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করে বৈষ্ণব পদাবলীর একটা যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা করেছেন। "বৈষ্ণব পদাবলীকে পুরাপুরি মর্ত্যপ্রেমের নিরিখে বুঝা যাইবে না, আবার শান্তরসাস্পদ ভক্তির নিরাকাঙ্ক্ষ আত্মনিবেদনও ইহার একমাত্র পরিচয় নহে—উভয়ের সংমিশ্রণে, প্রেমের বিষামৃতের তীব্রতায় ইহা অনন্যসাধারণ।"

বৈষ্ণব পদাবলীতে রোম্যান্টিকতা

বৈষ্ণব পদাবলী রোম্যান্টিক গীতিকবিতার লক্ষণযুক্ত। মর্ত্যচেতনাকে প্রধান 'আলম্বন' রূপে গ্রহণ করে কবি তাঁর দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছেন অনেক ঊর্ধ্বে,—যেখানে কামনা আর প্রাপ্তির মধ্যে আছে দুস্তর ব্যবধান; এই প্রাপ্তি-কামনার ব্যাকুলতাই কবিকে রোম্যান্টিক করে তুলছে। ভাগবতচেতনা এবং ধর্মানুভূতিও এই বিষয়ে কবিকে সহায়তা করেছে। এ বিষয়ে প্রাচীন সংস্কৃত এবং প্রাকৃত কবিদের মর্ত্যজীবনাশ্রয়ী রোম্যান্টিক কবিতার এবং জয়দেব বিদ্যাপতির সৌন্দর্য্য-পিপাসু রোম্যান্টিক মনের প্রভাবের কথাও স্বীকার করতে হয়। রাধাকৃষ্ণের প্রেমানুভূতি এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কবিচিত্তে যে রোম্যান্টিকতার জন্ম দান করেছে তা কবির কাব্য-ব্যঞ্জনা ও সৌন্দর্য-সৃষ্টিতেই অবসানপ্রাপ্ত হয় নি, কাব্যদেহ নির্মাণেও স্বধর্মের পরিচয় দান করেছে। অর্থাৎ কাব্যের ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কারাদি বিচারেও এ রোম্যান্টিকতা সুস্পষ্ট।

পদাবলী : বিভাগ

রাধাপ্রেম বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান উপজীব্য হলেও চৈতন্য-জীবনীও ভক্ত বৈষ্ণবের নিকট সমানভাবে আদরণীয় ছিল। তাই চৈতন্যোত্তর-সাহিত্যে গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদাবলীর সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। ডঃ সুকুমার সেন এই জাতীয় পদগুলিকেও বৈষ্ণবমহাজন পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত করে বৈষ্ণব পদাবলীর স্থূল চারটি বিভাগ করেছেন : ১. গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদাবলী, ২. ভজন পদাবলী, ৩. রাগাত্মিক পদাবলী, ৪. রাধাকৃষ্ণ পদাবলী।

১. গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী

রাধাভাব অঙ্গীকার করেই শ্রীকৃষ্ণ নরলোকে গৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এই স্থির বিশ্বাসেই বৈষ্ণবপদকর্তাগণ রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহের প্রমূর্ত প্রকাশ-রূপে গৌরাঙ্গ-দেবের ভজনা করেছেন। বৃন্দাবনের ষড়্গোস্বামীগণও রাধাকৃষ্ণতত্ত্বে চৈতন্যদেবের অন্তর্জীবনেরই পরিচয় পেয়েছেন। অন্যান্য বৈষ্ণব ভক্তগণও গৌরাঙ্গদেবের মধ্যে রাধাভাবের উদ্দীপনা লক্ষ্য করেছেন। এস্থলে কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা এই—চৈতন্যদেবের পরবর্তী জীবন-সাধনা অপেক্ষাও তাঁর পূর্বজীবনের তথা গৌরাঙ্গ-জীবনের যৌবন-সাধনাই কবিদের অধিকতর আকর্ষণ করেছিল। তাই গৌরাঙ্গ-বিষয়ক যে পদগুলিতে রাধাকৃষ্ণ-লীলার সাধর্ম্য লক্ষ্য করা যায়, সেই পদগুলিকে সাধারণভাবে গৌরচন্দ্রিকা নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। পদাবলী কীর্তনের প্রারম্ভে 'গৌরচন্দ্রিকা' কীর্তনকে বৈষ্ণবগণ অবশ্য-করণীয় বলে মনে করেন। রাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্তনে যে ধরনের রস বা কাহিনী পরিবেষণ করা হবে, 'গৌরচন্দ্রিকা' থেকেও তদনুরূপ পদ বেছে নিয়েই পালাকীর্তন সুরু হয়। রাধাকৃষ্ণের যুগল লীলায় যতপ্রকার ভাববৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়, রাধাভাবে ভাবিত গৌরাঙ্গের জীবনেও ততপ্রকার ভাববৈচিত্র্য লক্ষ্য করে পদকর্তাগণ পদ রচনা করেছেন। বস্তুত রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনীর ছকে ফেলেই

গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদগুলি রচিত হয়েছে বলেই গৌরচন্দ্রিকাতেও পূর্বরাগ, বিরহ, অভিসার-আদি পদের সন্ধান পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের জীবনের বহু ঘটনাকে অবলম্বন করেও বহু কবি পদ রচনা করে গেছেন, তবে উৎকর্ষে এগুলি পূর্ববর্তী পদগুলির সঙ্গে তুলনীয় নয়। বাসুদেব ঘোষ ও তদ্‌ভ্রাতা গোবিন্দ ঘোষ, বংশীবদন, শিবানন্দ, নরহরি সরকার, লোচনদাস, রাধামোহন, মুরারি গুপ্ত, রামানন্দ বসু-আদি অনেকেই গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ রচনা করেছেন। বৃন্দাবন দাসের উক্তি থেকে জানা যায় যে, মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্যই সর্বপ্রথম গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ রচনা করে গৌরাঙ্গ-কীর্তনের সূচনা করেন ঃ

'আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি।
বলিয়া নাচেন প্রভু জগত নিস্তারি।।'

চৈতন্যদেবের প্রাচীনতম জীবন কাহিনী, সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'মুরারি গুপ্তের কড়চা'র লেখক মুরারি গুপ্ত বয়সে চৈতন্যদেবের চেয়ে বড় হলেও তাঁর সহপাঠী ছিলেন। মুরারি গুপ্ত-রচিত একখানি 'গৌরচন্দ্রিকা'র পদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—সখি হে, ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।' বিখ্যাত পদকর্তা গোবিন্দদাসের 'নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে' পদটিও 'গৌরচন্দ্রিকা'র মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ পদ বলে পরিচিত। পূর্বকথিত বাসুদেব ঘোষ যতগুলি পদ রচনা করেছেন, তাদের সবগুলিই গৌরাঙ্গ-বিষয়ক।

২ ভজন পদাবলী

ভজন পদাবলীতে ঈশ্বর-বন্দনা, চৈতন্যের ভক্ত বৈষ্ণবদের বন্দনা কিংবা গুরুবন্দনার পদগুলিই স্থানলাভ করেছে। বিদ্যাপতির প্রার্থনা-বিষয়ক পদগুলি অপূর্ব। তাঁর রচিত 'মাধব, বহুত মিনতি কবি তোয়', 'তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম সুতমিত রমণী-সমাজে' পদ দুটি ব্যঞ্জনায় এবং কবি-কৃতি হিশেবে অনবদ্য। নরোত্তমদাস, চন্দ্রশেখর দাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস প্রভৃতি অল্প কয়েকজন কবিও কিছু কিছু ভজন পদাবলী রচনা করে গেছেন।

৩ রাগাত্মিক পদাবলী

রাগাত্মিক পদাবলীতে সহজিয়া সাধন পদ্ধতিরই আভাস পাওয়া যায়। এই হিশেবে এগুলিকে খাঁটি বৈষ্ণব পদাবলী বলে অভিহিত না করাই সঙ্গত। এই ধরনের রাগাত্মিক পদ বাঙলা সাহিত্যে পূর্বেও বর্তমান ছিল, পরেও রচিত হয়েছে। সিদ্ধাচার্যদের দ্বারা রচিত চর্যাপদ থেকে আরম্ভ করে বাউল গান পর্যন্ত বহু রচনাতেই এরূপ রাগাত্মিক পদের সন্ধান পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, লোচনদাস, নরোত্তম, নরহরি দাস প্রভৃতি অনেকেই রাগাত্মিক পদ রচনা করে গেছেন।

৪. রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলী

রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদগুলিই প্রকৃত বৈষ্ণব পদাবলী, এবং সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে এরূপ পদেরই প্রাচুর্য দেখা যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে, বৈষ্ণব পদাবলীর মূল উপজীব্য বিষয় প্রেম। শ্রীকৃষ্ণ রাধাপ্রেমের স্বাদ গ্রহণ করবার জন্যই গৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। প্রেমের বিচিত্র গতি, বিচিত্র ভাব,—বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রেমের বৈচিত্র্যই দেখানো হয়েছে। রসশাস্ত্রের অনুসরণে বৈষ্ণবপদকর্তারা প্রেম-ছাড়াও অপর সকল প্রকার রসের পদই রচনা করেছেন।

এদের মধ্যে বাৎসল্য, সখ্য, মধুর, শান্ত এবং দাস্যই প্রধান। অবশ্য এই প্রসঙ্গে স্বীকার করা প্রয়োজন যে মধুর রসের বা প্রেম-বিষয়ক পদগুলির তুলনায় অপরাপর রসাশ্রিত পদ অনেকটা কৃত্রিম এবং অপরিণত বলে মনে হয়।

চৈতন্যদেবের তিরোধানের অব্যহিত পরবর্তীকালেই সম্ভবত নরোত্তমদাসঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। ষড়্-বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে তিনি এক মহোৎসবের আয়োজন করেন—এটি খেতরীর মহোৎসব নামে বিখ্যাত। এই খেতরীর মহোৎসবেই রসকীর্তনের উদ্ভব হয়। আর এই রসকীর্তনকে অবলম্বন করেই অসংখ্য পদের, বিশেষত পালাকীর্তনের সৃষ্টি হয়। এই পালাকীর্তনই বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের প্রাণ। বৈষ্ণব মহাজন-পদগুলি যতখানি কবিতা, তার অধিক গান। রাধাকৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্র্য পালাকীর্তনের মধ্য দিয়েই যথার্থরূপে প্রকটিত হয়েছিল। অতএব কীর্তনে রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী যে ভাবে পরিবেষিত হয়, তাহার বিশ্লেষণেই বিভিন্ন রসাশ্রিত পদের পরিচয় পাওয়া যায়।

খেতরী মহোৎসব
ও কীর্তন

কীর্তনের পূর্বেই যে রসের কীর্তন হবে, সেই রসাশ্রিত গৌরচন্দ্রিকা গেয়ে পালাগানের উদ্বোধন করা হয়। এই রীতিটি সম্ভবত নরোত্তমদাস-প্রবর্তিত। কীর্তন গায়ক বা সঙ্কলয়িতাগণ নানা কবির একই রসাশ্রিত পদ একত্র সঙ্কলন করে এক একটি পালারূপে সাজিয়ে রেখেছেন। রাধা কৃষ্ণের নিত্যলীলার এইপ্রকার রূপভেদ অসংখ্য। বস্তুত বিভিন্ন পালাগানের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণজন্ম থেকে আরম্ভ করে তাঁর মথুরাগমন-কাহিনী পর্যন্ত পাওয়া যাবে—জন্মলীলা, নন্দোৎসব, বাল্যলীলা, গোষ্ঠলীলা, দানলীলা, রাসলীলা, হোলি, ঝুলন, পূর্বরাগ, অভিসার, মান—ইত্যাদি বহুবিধ লীলাই পালাগানের অন্তর্ভুক্ত।

পালাগান

আবার রাধিকাব মনোভাব ও আচরণকে অবলম্বন করে পদগুলিকে আটটি বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এই আট পর্যায়ে নায়িকা নিম্নোক্তরূপে প্রকাশিত হয়ে থাকেন ঃ

১. অভিসারিকা ঃ প্রিয়মিলনের উদ্দেশ্যে নায়িকা সঙ্কেত-কুঞ্জাভিমুখে যাত্রা করেন।
২. বাসকসজ্জা ঃ প্রিয়মিলনের উদ্দেশ্যে নায়িকা স্বদেহ এবং কুঞ্জসজ্জায় নিযুক্তা থাকেন।
৩. উৎকণ্ঠিতা ঃ নায়কের জন্য নায়িকা উৎসুকভাবে সঙ্কেতকুঞ্জে প্রতীক্ষা করেন।
৪. বিপ্রলব্ধা ঃ নায়িকা নায়ক দ্বারা বঞ্চিতা অথবা প্রতারিতা হন।
৫. খণ্ডিতা ঃ নায়ককে প্রতিনায়িকার নিকট থেকে প্রত্যাবৃত্ত দেখে নায়িকা রুষ্ট হন।
৬. কলহান্তরিতা ঃ নায়কের সঙ্গে মান করে নায়িকা পরে অনুতাপ করেন।
৭. প্রোষিতভর্তৃকা ঃ নায়কের মথুরাগমনে নায়িকা বিরহজীবন যাপন করেন।
৮. স্বাধীনভর্তৃকা ঃ এতে নায়কের সঙ্গে নায়িকার খণ্ডমিলনের ব্যঞ্জনা আছে।

রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' বৈষ্ণবরসশাস্ত্র-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। পদাবলী সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য প্রেমভাবের উজ্জীবন ঘটেছে যে শৃঙ্গার বা মধুর রসে আলোচ্য গ্রন্থে তার বিস্তৃত পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে। রূপ গোস্বামীর মতে শৃঙ্গার রসের দুটি ভেদ ঃ বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভ আবার চারশ্রেণীতে

রসশাস্ত্রানুযায়ী
পদাবলী-বিভাগ

বিভক্ত—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস।

"মিলনের পূর্বে পরস্পরের দর্শনাদির দ্বারা নায়ক-নায়িকার চিত্তে উদ্বুদ্ধ রতি যখন বিভাবাদির সংযোগে আস্বাদনীয় অবস্থা লাভ করে, তখন তাহার নাম হয় **পূর্বরাগ**।...'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি', 'যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি' যথাক্রমে রাধার ও কৃষ্ণের রূপদর্শনজাত পূর্বরাগ; 'কেবা শুনাইল শ্যামনাম' রাধার কৃষ্ণনামশ্রবণজাত পূর্বরাগ।

'প্রতিনায়িকাকে নায়ক যদি উৎকর্ষ দেন, তাহা হইলে নায়িকার মনে যে ঈর্ষ্যাজনিত রোষের উদ্ভব হয়, তাহারই আস্বাদযোগ্য অবস্থার নাম **মান**। আমাদের 'ধনি ভেলি মানিনী' প্রভৃতি পদ এই সূত্রে পাঠনীয়।

প্রেমের গভীরতার ফলে প্রিয়সন্নিকটে থাকিয়াও বিরহবোধজনিত যে বেদনা, তাহারই আস্বাদযোগ্য অবস্থার নাম **প্রেমবৈচিত্ত্য**। . . .'নাগর সঙ্গে রঙ্গে সব বিলসই' ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

দেশান্তরগমনাদি কারণে বিচ্ছিন্ন নায়ক-নায়িকাহৃদয়ে যে বিরহ বেদনার সৃষ্টি করে, সেই বেদনাব আস্বাদ্য অবস্থা **প্রবাস**। ... মাথুর অংশের পদ ইহার উদাহরণ।

ইহাদের প্রত্যেকটি বিপ্রলম্ভ নামক শৃঙ্গার-রস।ইহারা মাত্র ভালোবাসা, রোষ, বেদনা- বোধ নহে, পরন্তু উপযুক্ত বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারী ভাবের সংযোগে তাহাদের আনন্দময সংবিদ্-রূপ। আমাদের বর্তমান লক্ষ্য পদাবলী কাব্য, বস্তুজগতের সাধারণ ঘটনা নহে।

সম্ভোগ নায়ক-নায়িকার মিলনজাত উল্লাসময় ভাব। ইহাও বাস্তব নহে, কাব্যগত। বৈষ্ণবশাস্ত্রে বহুপ্রকার সম্ভোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ'। ইহার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, নায়িকা এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন। রাধা পরকীয়া বলিয়া পূর্ণ স্বতন্ত্রতা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। এই কারণে বৃন্দাবনলীলায় সমৃদ্ধিমান সম্ভোগকল্পনা করা কঠিন।" (শ্যামাপদ চক্রবর্তী)

বাঙলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর স্থান অনন্য।সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগে তো এদের তুলনাই মিলে না, এমন কি আধুনিক যুগেও রবীন্দ্রনাথের কবিতা ব্যতীত অল্প কবিতাই এর সমকক্ষতা দাবি করতে পারে। ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, অলঙ্কারে এবং ব্যঞ্জনায় বৈষ্ণব পদগুলি অপূর্ব সার্থকতা অর্জন করেছে। বৈষ্ণব কবিতা একেবারে খাঁটি বাঙলার কবিতা, বাঙালীর হৃদয়ের কথা। "...ইহারা সম্পূর্ণ বঙ্গীয়—বাংলাদেশের বঙ্গপ্রকৃতির ও বাঙালী চরিত্রের সঙ্গে সুসমঞ্জস। বাঙালী হৃদয়ের ভাবুকতা, সৌন্দর্যবোধ ও সুকোমল মাধুর্য নিঃশেষে প্রকাশিত হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলীতে। আরও কয়েকটি গুণে বৈষ্ণব কবিতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত বঙ্গীয় কবিতা হইতে স্বতন্ত্র; সেগুলি হইতেছে কবিচিত্তের বিশাল বিস্তৃতি, উন্মুক্ততা ও গভীরতা। বৈষ্ণব পদাবলী অধ্যাত্মসাধনার উপযোগী অথচ পূর্ণভাবে মানবীয়, সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীসাহিত্য অথচ অদ্ভুতভাবে সার্বজনীন, জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলেরই আস্বাদ্য। অতিরিক্ত ধর্মীয় সংকীর্ণতা বা যুগচেতনা ইহাকে দেশ ও কালে আবদ্ধ করে নাই। ইহারা চির স্বাধীন ও চির নবীন। ইহারা বাঙ্গালীর কবিকৃতির চূড়ান্ত নিদর্শন।"

পদাবলীর মূল্যবিচার

বাঙলাদেশে পদাবলী সাহিত্য যে কী পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং জনপ্রিয়তা লাভ

করেছিল, তার পরিচয় পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত তথ্য থেকে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ১৪৫ জন মহাজনপদকর্তার নাম উল্লেখ করেছেন, এদের মধ্যে তিনজন মহিলা কবি এবং এগারোজন মুসলমান কবি আছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমেই 'ক্ষণদাচিন্তামণি' গ্রন্থে ৪৫ জন কবির তিনশত পদ সঙ্কলিত হয়েছিল। 'পদামৃতসমুদ্র' গ্রন্থে ৭৪৬টি পদ সংগৃহীত হয়েছে। 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে ১৩০ জন কবির তিন হাজারের অধিক পদ সঙ্কলিত হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন বলেন "আজ অবধি প্রকাশিত বৈষ্ণব গীতিকবিতার সংখ্যা সাত-আট হাজারের কাছাকাছি হইবে, ভবিষ্যতে আরও দুই-চারি হাজার কবিতা আবিষ্কৃত হইতে পারে। গবেষক অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ১০৩ জন শুধু মুসলমান বৈষ্ণবপদ-রচয়িতারই সন্ধান পেয়েছেন—এ থেকেই বৈষ্ণবপদ রচয়িতা এবং এদের সার্বজনীনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

[দুই] পদকর্তা-পরিচয়

(ক) চৈতন্য-পূর্ব যুগ

চৈতন্য যুগেই বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করলেও এর উদ্ভব হয়েছিল চৈতন্য-পূর্ব যুগেই। এই যুগের কবিদের মধ্যে প্রথমেই নাম উল্লেখ করতে হয় বড়ু চণ্ডীদাসের। বড়ু চণ্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে যে কাব্য রচনা করেছিলেন, তা রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক হলেও কাব্যটি পদাবলী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে এতে, বিশেষত এর শেষদিকে রাধাবিরহের কোন কোন অংশে পদাবলী সাহিত্যের লক্ষণযুক্ত কিছু কিছু রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেব যে চণ্ডীদাসের রচনার স্বাদ গ্রহণ করতেন, তিনি যদি এই বড়ু চণ্ডীদাস হয়ে থাকেন, তবে সম্ভবত চৈতন্যদেব এই রাধা-বিরহ অংশই পছন্দ করতেন। কারণ, সমগ্র কাব্যের মধ্যে এই অংশেই রাধার অন্তরের ভক্তি ও আত্মনিবেদনের পরিচয় পাওয়া যায়। পদাবলী সাহিত্যের কিছুটা সমধর্মিতা এই অংশেই বর্তমান। তবে চৈতন্যোত্তর যুগের রাধা এবং চৈতন্য-পূর্ব যুগের রাধাভাবের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। বড়ু চণ্ডীদাসের রাধিকা একান্তভাবে মানবী—তাঁর আর্তি ও বেদনার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার কোন স্পর্শ নেই। অতএব, চৈতন্য-পূর্ব যুগেই দ্বিতীয় একজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্বও অসম্ভব নয়, চৈতন্যদেব যার পদ-স্বাদ প্রীতিমুগ্ধ অন্তরে গ্রহণ করতেন।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

চৈতন্য-পূর্ব যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতি। (তাঁর সম্বন্ধে পূর্বেই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।) বিদ্যাপতির রাধার সঙ্গেও চৈতন্যোত্তর যুগের রাধিকার পার্থক্য সুস্পষ্ট। বিদ্যাপতি মানবী রাধার বহিরঙ্গের প্রতিই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তবে বিদ্যাপতির প্রার্থনার পদগুলি চৈতন্যোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ রচনারই সমকক্ষতা দাবি করতে পারে।

বিদ্যাপতি

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-রচয়িতা মালাধর বসু কোন পৃথক পদ রচনা করেছেন বলে জানা না গেলেও তাঁর মধ্যে যে গীতিপ্রবণতার ভাব বর্তমান ছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র স্থানে স্থানে এরূপ পদাবলীর সমধর্মী রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। লক্ষ্য

করবার বিষয়, রচনার এই সমস্ত অংশে রাধাচিত্তের বেদনা এবং আর্তিই প্রকাশিত হয়েছে।

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'

বড়ু চণ্ডীদাস কিংবা মালাধর বসু কেউই বিচ্ছিন্ন কোন পদ রচনা করেন নি। এরূপ বিচ্ছিন্ন প্রাচীনতম পদের সন্ধান পাওয়া যায় হোসেন শাহের রাজত্বকালে। পদটি ব্রজবুলি ভাষায় রচিত। ভণিতায় কবি যশোরাজ খান আত্মপরিচয়দান-প্রসঙ্গে বলেছেন —

শ্রীযুত হুসন জগতভূষণ
সোই ইহ রস জান।
পঞ্চগৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর
ভনে যশোরাজ খান।।

অনুমান করা হয়, যশোরাজ খান সুলতান হোসেন শাহের কর্মচারী ছিলেন এবং তাঁর রাজত্বকালের মধ্যেই (১৪৯৩ খ্রীঃ-১৫১৯ খ্রীঃ) পদটি রচনা করেছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন যে, এই যশোরাজ খান একখানি 'কৃষ্ণচরিত'ও রচনা করেছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা চলে যে, সমসাময়িক যুগে প্রায় সমগ্র পূর্ব ভারতেই ব্রজবুলি ভাষায় বৈষ্ণব পদ-রচনার প্রয়াস চলছিল। চৈতন্যদেবের প্রায় সমসাময়িক শঙ্করদেব আসামে যেমন একজন প্রধান ধর্মগুরুর আসন অধিকার করেন, তেমনি অসমীয়া সাহিত্যের উৎকর্ষ-সাধনেও

চৈতন্য-সমসময়ে পূর্বভারতে ব্রজবুলি

একজন পথিকৃৎ-এর সম্মান লাভ করেছিলেন। তিনি আসামে ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেছিলেন। উড়িষ্যায় রায় রামানন্দও ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত 'পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল' পদটি চৈতন্যদেব আস্বাদ করেছিলেন—'চৈতন্যচরিতামৃতে' এইরূপ উল্লেখ আছে। মিথিলায় বিদ্যাপতি-ব্যতীত অন্তত আরও একজন কবি যে হোসেন শাহের রাজত্বকালেই ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। কবির নাম যশোধর। ইনি এবং পূর্ববর্ণিত যশোরাজ খান একই ব্যক্তি কিনা বলা কঠিন। ত্রিপুরার রাজা ধনমাণিক্যের একজন রাজপণ্ডিত ব্রজবুলি ভাষায় যে অন্তত একটি পদ রচনা করেছিলেন তার সন্ধানও পাওয়া গিয়েছে।

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার এবং অপর কেউ কেউ অনুমান করেন যে, চৈতন্য-পূর্ব যুগেই পদাবলী রচয়িতা একজন চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেন। ডঃ মজুমদার অবশ্য বড়ু চণ্ডীদাসকে চৈতন্যোত্তর যুগে স্থাপন করতে চান, কিন্তু তাঁর এই অভিমত প্রায় কেউ স্বীকার করেন না। যা

চৈতন্য-পূর্ব চণ্ডীদাস

হোক তাঁদের বক্তব্য এই যে, পদাবলী-রচয়িতা এই চণ্ডীদাস এবং পালাকীর্তন রচয়িতা (দীন) চণ্ডীদাস পৃথক্‌ব্যক্তি। চণ্ডীদাস বা দ্বিজ চণ্ডীদাস পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ এবং ভাবসম্মেলনের পদ রচনায় অপূর্ব সার্থকতার পরিচয় দান করেছেন এবং শ্রীচৈতন্যদেব এঁরই রচনার স্বাদ গ্রহণ করে পুলকিত হতেন। যাহোক, এই সম্বন্ধে এখনও মতবিরোধ বর্তমান বলেই চৈতন্যোত্তর যুগের পরিচয় দান প্রসঙ্গে পদাবলীর চণ্ডীদাস-সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হবে।

(খ) চৈতন্য-সমসাময়িক যুগ

চৈতন্যদেবের সমসময়ে চৈতন্য-ভক্ত এবং পার্ষদের মধ্যে অনেকেই পদরচনায় যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দান করে গেছেন। এঁদের অনেকেই চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করেও পদরচনা করেছেন।

চৈতন্য-পরিকর

চৈতন্যের বয়োজ্যেষ্ঠ অথচ সহপাঠী এবং ভক্ত মুরারি গুপ্ত সংস্কৃত ভাষায় যে চৈতন্যজীবনী রচনা করেছেন, তাই আদি চৈতন্যজীবনী। কিন্তু এই মুরারি গুপ্ত যে বৈষ্ণব পদও রচনা করে গেছেন তা অনেকেরই অজ্ঞাত। মুরারি ভণিতাযুক্ত অসংখ্য পদ থেকে অল্পকটি পদমাত্র মুরারি গুপ্তের রচনা বলে নির্বাচিত হয়েছে। এদের মধ্যে 'সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও' এবং 'কি ছার পীরিতি কৈলা' পদ দুটি অর্থ-গৌরবে উৎকৃষ্ট। চৈতন্যদেবের বাল্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী মুরারি গুপ্তের চৈতন্য-বিষয়ক পদগুলিতে আন্তরিকতা এবং বাৎসল্য ভাব প্রকট। বাঙলা ছাড়া ব্রজবুলি ভাষাতেও মুরারি গুপ্ত কয়েকটি পদ রচনা করেছিলেন। 'তপত কিরণ যদি অঙ্গ না দগধল' —এরূপ একটি পদ।

১. মুরারি গুপ্ত

নরহরি সরকার চৈতন্য-সমসাময়িক এবং একজন প্রধান চৈতন্যভক্ত হওয়া সত্ত্বেও চৈতন্য-জীবনী-কাব্যে তাঁর সম্বন্ধে বড় একটা উল্লেখ পাওয়া যায় না, এটি বিস্ময়ের বিষয়। দাস-ঠাকুর-উপাধিধারী নরহরি সরকার বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে শ্রীখণ্ডদল সুপরিচিত এবং স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। যে বৈদ্যবংশে নরহরি জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশে আরও কয়েকজন কৃতী বৈষ্ণব কবিও জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নরহরিদাস 'গৌরাঙ্গাষ্টমালিকা' এবং 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত' নামে দুখানি সংস্কৃত গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। অনুমিত হয় যে, এই নরহরিদাস ঠাকুরই বাঙলাদেশে সর্বপ্রথম গৌরাঙ্গ-পূজার প্রবর্তন করেন। তিনিই প্রথম গৌরলীলা-বিষয়ক পদ রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন, এরূপ মনে করবারও সঙ্গত কারণ আছে। পাপিয়াশেখরের ভণিতাযুক্ত একটি পদে নরহরিদাস-সম্বন্ধে পাওয়া যায় যে,

২. নরহরি সরকার

'গৌরাঙ্গের জন্মের আগে বিবিধ রাগিণী রাগে
ব্রজরসে করিলেন গান।'

লোকশ্রুতি-অনুসারে নরহরিদাস চৈতন্য অপেক্ষা মাত্র চারি বৎসরের বড় ছিলেন, অতএব এই পদটি বিভ্রান্তিজনক বলে বোধ হয়। হতে পারে, গৌরলীলাবিষয়ক পদ রচনার পূর্বে তিনি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ রচনা করেছিলেন। কয়েকটি রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদে তাঁর ভণিতাও পাওয়া যায়। নরহরিদাসের সমস্ত পদ বাঙলা ভাষায় রচিত হলেও অন্তত একটি পদের ভাষা ব্রজবুলি। নরহরিদাস গৌর-নাগরী ভাবের প্রবর্তক। কৃষ্ণাবতার গৌরচন্দ্রই একমাত্র পুরুষ এবং গৌরাঙ্গ-ভক্তগণ গোপীভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে গৌরলীলা আস্বাদন করতেন—এটিই গৌরনাগরীভাব। নরোত্তম দাস এই সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ

'প্রেমের নাগরী ভেল দাস নরহরি।
গৌরাঙ্গের হাটে ফেরে লইয়া গাগরী।'

শ্রীখণ্ডদলে কেউ কেউ গৌরাঙ্গকে নাগর ভাবে এবং নিজেদের নাগরী ভাবে কল্পনা করে অতিশয় হাল্কা আদিরসের পদও রচনা করে গিয়েছেন। হয়তো, এই কারণে অন্যান্য বৈষ্ণবগণ তাঁদের উপর কিছুটা বিরক্ত হয়ে থাকতে পারেন এবং চৈতন্য-জীবনী থেকে নরহরিদাসের নির্বাসনের এটিও একটি অন্যতম কারণ হয়ে থাকতে পারে। এই গৌরনাগরী ভাবের প্রবর্তনা যে প্রকৃতই আপত্তিজনক ছিল এবং এই পথেই যে বৈষ্ণবধর্মে ধ্বস নেমেছিল, তৎসম্বন্ধে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ "পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সহজিয়াগণ বৈষ্ণব সমাজে প্রাধান্য লাভ করিলে চৈতন্যের নীতিমার্গীর প্রেমধর্ম রহস্যবাদী আদিরসাত্মক কাল্ট-এর কবলগ্রস্ত হইয়া পড়িল, এবং ধীরে ধীরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম অবক্ষয়ের পথ ধরিল। নবহবি প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও এই ব্যাপারের জন্য গৌণত দায়ী, কারণ তিনিই এই জাতীয় নাগর ভাবের আদর্শ প্রচার ও পদরচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। ঘনশ্যামদাস উপাধিধারী নরহরি চক্রবর্তী নামক অপর এক পরবর্তীকালের কবির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যাওয়ায় নরহরিদাসের কবিতাগুলিকে পৃথক্ করে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। তবে যে সকল গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদে গৌরনাগর ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, অন্তত সেগুলি যে নরহরিদাস-রচিত তাতে নিশ্চিত হওয়া চলে। সাধারণভাবে নরহরিদাসের কবিতায় উৎকৃষ্ট কবিকর্মের বিশেষ পরিচয় পাওয়া না গেলেও তাঁর রচিত কয়েকটি পদ যে উত্তম কাব্যস্বাদযুক্ত, তাতে সন্দেহ নেই। 'কিনা হৈল সই মোর কানুর পীরিতি।' 'সই কত না সহিব হিয়া /আমার বন্ধুয়া আন বাড়ি যায় আমারি আঙ্গিনা দিয়া।' 'গৌরাঙ্গ নহিত কিমেনে হইত কেমনে ধরিত দে।'— প্রভৃতি পদগুলির মধ্যে যে প্রকৃত ভক্তহৃদয়ের পরিচয় পাওযা যায়, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

গৌড়নাগরী ভাব

মুর্শিদাবাদের অধিবাসী তিন ভ্রাতা—গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ শ্রীগৌবাঙ্গেব নাম শুনে নবদ্বীপে চলে এলেন এবং চৈতন্য-গোষ্ঠীতে যোগদান করলেন। চৈতন্যদেবের সঙ্গে এঁরা সকলেই নীলাচল গমন করেছিলেন। পরে চৈতন্যদেবেব নির্দেশে গোবিন্দ ঘোষ তথায় থেকে গেলেন, অপর দুই ভ্রাতা বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করবাব জন্য গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করলেন। এই তিন ভ্রাতাই কীর্তনে পাবদর্শী ছিলেন, তন্মধ্যে মধ্যম ছিলেন শ্রেষ্ঠ। আবার তিন ভ্রাতাই কিছু কিছু পদও রচনা করে গিয়েছেন। জ্যেষ্ঠ গোবিন্দ ঘোষ যে কয়টি পদ রচনা করেছেন সব কয়টি গৌরাঙ্গ-বিষয়ক। তাঁর

৩ ঘোষভ্রাতৃত্রয়

'হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদেরে ফিরাও ।।'

পদটিতে ভক্তের আকৃতি বাণীমূর্তি ধারণ করেছে। চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী বলে তাঁর রচনায় স্বাভাবিকতা এবং আন্তবিকতা বর্তমান। মাধব ঘোষ বাঙলা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করেছেন,—তবে পদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। তাঁর রচিত বাঙলা পদগুলি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক। তাঁর নিমাই-সন্ন্যাসের পদগুলির বাস্তবতা ও আন্তরিকতা প্রশংসনীয়। মাধব ঘোষ কীর্তনীয়ারূপেই অধিকতর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, পদ-রচনার দিক থেকে তাঁর স্থান তত উচ্চে নয়। ঘোষ ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে পদ-রচনায় সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেছেন কনিষ্ঠ বাসুদেব

ঘোষ। তিনি কৃষ্ণলীলার অনুসরণে গৌরাঙ্গলীলা-বিষয়ে বহু পদ রচনা করেছেন,—তবে অনুকরণজাত বলে এগুলি অনেকটা কৃত্রিম বলে মনে হয়। চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী বাসুদেব ঘোষের রচনায় চৈতন্যদেবের ব্যক্তি ও মানসজীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা অনেকের মতে চৈতন্যজীবনী অপেক্ষা অধিকতর প্রামাণিক। কবিরাজ গোস্বামী বাসুদেব ঘোষের রচনা সম্বন্ধে বলেছেন—

'বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠপাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে।।'

চৈতন্যের বাল্যলীলার পদ-রচনায় বাসুদেব যে বাৎসল্য রসের পরিচয় দান করেছেন, তা উল্লেখযোগ্য। 'শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়'—পদটি বাৎসল্য রসের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বাসুদেবের পরবর্তী পদগুলিতে গৌরনাগর ভাবেব পরিচয় অস্পষ্ট নয়।

'রুনু ঝুনু ঝুনু ঝুনু নূপুর পায়।
পেখলু গৌরাঙ্গ বর নটরায়।।'

কিংবা 'সবসুখ তেয়াগলুঁ কুলে তিলাঞ্জলি দিলুঁ
গোবা বিনা আন নাহি ভায়।'

—ইত্যাদি পদে স্পষ্টতই কবি রাধাভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে গৌরাঙ্গকে ভজনা করেছেন। তবে পরবর্তী কবিদের গৌরনাগর ভাবের রচনায় আদিরসের যে বাড়াবাড়ি দেখা যায়, বাসুদেবের রচনা তা থেকে মুক্ত। বরং এব রচনায় বিরহিণী রাধার বেদনাই সংযতভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। পদকল্পতরুর সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় বাসুদেব ঘোষকে নদীয়ানাগরী ভাবেব একজন উদ্ভাবক বলে মনে করলেও তাঁকে রুচিহীনতার দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। ". বর্তমান সময়ে একশ্রেণীর গৌরভক্তদের মধ্যে নাগরী ভাবেব উপাসনাব উপলক্ষে যে নানা উচ্ছৃঙ্খলতাব কথা শুনা যায়, উহার জন্য লোচন-নবঘনশ্যাম-নবহরিব উদ্দাম পবিকল্পনা আংশিকভাবে দায়ী কিনা তাহা আধুনিক বৈষ্ণব লেখকেব চিন্তনীয় হইয়াছে। .আনন্দের বিষয যে, নরহবি সবকাব ও বাসুদেব ঘোষের ইতিহাস সম্বন্ধে এরূপ কোনও অভিযোগ করা চলে না।"

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-রচয়িতা কুলীনগ্রামবাসী মালাধব বসুব পুত্র অথবা পৌত্র রামানন্দ বসু চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। তিনি প্রতি বৎসর স্বগ্রামবাসীদেব সঙ্গে নিয়ে নীলাচলে বর্ষাব চারমাস কাল চৈতন্যদেবের সান্নিধ্যে কাটাতেন। রামানন্দ ভণিতাযুক্ত ১১টি এবং রামানন্দ বসু ভণিতাযুক্ত ৭টি পদ পাওয়া গেছে। পরবর্তী ৭টি পদই আলোচ্য রামানন্দের রচিত। এদের মধ্যে একটি নিত্যানন্দ-সম্বন্ধীয়, দুটি চৈতন্য-বিষয়ক এবং অপর চারটি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদগুলিব একটি ব্রজবুলি ভাষায় রচিত। রামানন্দ বসুব কোন কোন পদ সার্থক সৃষ্টি বলেই কীর্তিত হয়ে থাকে।

৪. বামানন্দ বসু

কাঁচড়াপাড়ার (কুলীন গ্রামের) শিবানন্দ সেন মহাপ্রভুর একজন পবম ভক্ত ছিলেন। তাঁব একটি পদে পাওয়া যায় যে, তিনি প্রতি বৎসর আত্মীয়বন্ধুবা গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে নীলাচলে মহাপ্রভুর দর্শনে যেতেন।

'গৌড়ীয় যাত্রিক সনে বৎসরান্তে দরশনে
কহিলা যাইতে নীলাচলে।

'শিবানন্দ'-ভণিতা ব্যতীতও শিবাই, শিবাই দাস, শিবানন্দ চক্রবর্তী এবং শিবরাম-ভণিতাযুক্ত অনেকগুলি পদের সন্ধান পাওয়া যায়। এইসব পদই যে শিবানন্দ সেন রচিত নয়, তা অনুমান করা চলে। কবিত্বের দিক থেকে শিবানন্দের কাব্য খুব উৎকৃষ্ট না হলেও এতে প্রত্যক্ষদর্শীর আন্তরিকতা বর্তমান। শিবানন্দ সেনের পুত্রই 'কবিকর্ণপুর' উপাধিধারী বিখ্যাত পরমানন্দ দাস।

৫. শিবানন্দ সেন

মহাপ্রভুর প্রতিবেশী বংশীবদন চট্ট চৈতন্য-পরিবারের অভিভাবক-স্বরূপ ছিলেন। সম্প্রতি তাঁর রচিত একখানি ক্ষুদ্র 'চৈতন্যজীবনী' খণ্ডিত অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়েছে। ইনি একজন উৎকৃষ্ট পদকর্তাও ছিলেন। বংশীবদন-ভণিতাযুক্ত ২৫টি এবং বংশীভণিতাযুক্ত ৯টি পদ পাওয়া গেছে। এগুলি বংশীবদন চট্টর রচিত। বংশীদাস নামক অপর এক কবির রচনার সঙ্গে তাঁর কিছু কিছু রচনা মিশে গিয়ে থাকতে পারে। বংশীবদনের বাঙলা পদগুলির ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল। তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষদর্শীর অন্তরঙ্গতার পরিচয় বর্তমান। 'আর না হেরিব প্রসর কপাল, অলকা তিলকা কাচ', 'রাই জাগ রাই জাগ শারীশূক বলে' প্রভৃতি পদগুলি তাঁরই রচিত। বংশীবদনের 'হেদে লো বিনোদিনী' / এ পথে কেমতে যাবে তুমি ' পদটি সম্বন্ধে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "...অতি চমৎকার; চিত্রধর্মে ও প্রতীক নির্বাচনে এই পদটির pastoral (রাখালী) সুর অতি প্রশংসনীয়।"

৬. বংশীবদন

(গ) চৈতন্যোত্তর যুগ

[তিন] চণ্ডীদাস

বাঙলাদেশের সর্বকালের বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাসের পবিচয় নিয়ে বিরাট সমস্যা বর্তমান রয়েছে। বস্তুত বাঙলাদেশে যে কয়জন চণ্ডীদাস ছিলেন, তাই এখনও পর্যন্ত নির্ণীত হয় নি। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাসকে এই চণ্ডীদাস চক্র থেকে বাইরে আনা হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও চণ্ডীদাসের পরিচয় নিয়ে মতান্তরের সীমা নেই। দীন চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, সহজিয়া চণ্ডীদাস, তরণীরমণ চণ্ডীদাস ইত্যাদি নানা-অভিধাযুক্ত চণ্ডীদাসদেরই বর্তমানতা রয়েছে। এছাড়া নিরুপাধিক চণ্ডীদাস তো আছেনই।

পদাবলীকার চণ্ডীদাস-সমস্যা

গোড়ায় পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ, ভাবোল্লাস-আদি বিচিত্র-রসযুক্ত বিচ্ছিন্ন পদের রচয়িতা বলেই চণ্ডীদাস পরিচিত ছিলেন, পরে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদেই আবিষ্কৃত হয় বড়ু চণ্ডীদাস-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এবং চণ্ডীদাস-বচিত অনেকগুলি পালাগান। ইতঃপূর্বে কিন্তু চণ্ডীদাসের কোন পালাগান পাওয়া যায় নি। যখন পাওয়া গেল, তখন পর পর অনেকগুলি পালাই পাওয়া গেল—রাসলীলা, চণ্ডীদাসের চতুর্দশ পদাবলী, জন্মলীলা, রাধার কলঙ্কভঞ্জন প্রভৃতি। চণ্ডীদাসেব বিচ্ছিন্ন পদাবলীব সঙ্গে এই পালাগানগুলিব সর্বাঙ্গীণ পার্থক্য সুস্পষ্ট। এমন কি, বিভিন্ন

পালাগানের রচয়িতাও যে একই ব্যক্তি হতে পারেন না, সে বিষয়েও অনেকেই সুস্পষ্ট অভিমত পোষণ করে থাকেন। শ্রদ্ধাস্পদ ব্যোমকেশ মুস্তাফী চণ্ডীদাসের জন্মলীলা নামক পালাগানটি প্রকাশ করেছিলেন। অথচ তিনিই মন্তব্য করেছেন, "চণ্ডীদাসের সুবিখ্যাত পদাবলী-ব্যতীত চণ্ডীদাসের নামে ইতিপূর্বে আরও দুইখানি কাব্যের কথা সাধারণ্যে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য প্রমাণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত পদাবলীর চণ্ডীদাস, কলঙ্ক-ভঞ্জনের চণ্ডীদাস ও জন্মলীলার চণ্ডীদাসকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়াই ধরিয়া রাখা উচিত। বাঙলা সাহিত্যে একদিন চণ্ডীদাস নামের কবির জোড়া ছিল না, এই কয় বৎসরের মধ্যে একেবারে দেড় জোড়া অর্থাৎ তিনজন অথবা দুইজোড়া অর্থাৎ চারিজন চণ্ডীদাস পাওয়া গেল।" এর উপর আবার বড়ু চণ্ডীদাসকে যোগ করলে চণ্ডীদাসের সংখ্যা পাঁচজনে এসে দাঁড়ায়।

চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত গ্রন্থাবলী

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি মনীষী অনুমান করেন যে, রচনার বহু বৈচিত্র্য-সত্ত্বেও চণ্ডীদাস একজনই ছিলেন। মণীন্দ্রমোহন বসু বড়ু চণ্ডীদাস-ব্যতীত শুধু দীন চণ্ডীদাসকে স্বীকার করেছেন, ইনিই নাকি দু হাজারের অধিক পদের সাহায্যে এক বিরাট পালাগান রচনা করেছিলেন। এর বিচ্ছিন্ন পদই পদাবলী-রূপে বিভিন্ন সঙ্কলন গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, আবার এ থেকেই খণ্ড খণ্ড পালাগানও এখানে সেখানে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার পদাবলীর উৎকৃষ্ট পদগুলির রচয়িতা চণ্ডীদাসকে চৈতন্যদেবের পূর্বে স্থাপন করেছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পদাবলীরই দুজন চণ্ডীদাসের কথা বলেছেন, একজন চৈতন্য-পূর্ব পদাবলীর চণ্ডীদাস, অপরজন চৈতন্যোত্তর পালাগানের চণ্ডীদাস। এর উপর চণ্ডীদাস-চক্রকে আরও জটিল করে তুলেছে রাগাত্মিক পদের সহজিয়া চণ্ডীদাস। পীরিতি তন্ত্রের সাধক, রামীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত চণ্ডীদাসের পদে সহজিয়া ভাবের প্রকাশ ঘটেছে। যে কয়জন সুধী ব্যক্তি চণ্ডীদাস-সম্পর্কে আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁরা একমত হতে না পারায় সমস্যার জটিলতাই বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করা হ'লো।

চণ্ডীদাসের সংখ্যা বিষয়ে মতভেদ

চণ্ডীদাস-সমস্যা। বাঙলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ইতিহাস-রচয়িতা ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তো স্পষ্টই বলেছেন, "আমার নিকট চণ্ডীদাস এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই।" তিনি চণ্ডীদাসের সুরটা চিনবার দাবি নিয়েই কথা বলেছেন, কোন যুক্তির পথ অবলম্বন করেন নি। ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালীর প্রখর ইতিহাসবোধ থাকা সত্ত্বেও স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন, "চণ্ডীদাস একাধিক ছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই, কেহ এ পর্যন্ত এমন কোন প্রমাণ দিতে পারেন নাই।" তবে অবশ্য তিনি স্বীকার করেছেন যে, চণ্ডীদাসের রচনায় কিছু ভেজাল চলে থাকতে পারে। বসন্তরঞ্জন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুঁথি আবিষ্কার করা সত্ত্বেও বড়ু চণ্ডীদাসের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে পদাবলীর চণ্ডীদাসই প্রথম বয়সে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচনা করেছেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় দুজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁর মতে পদাবলী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পদগুলির রচয়িতা এক চণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্ব যুগে বর্তমান ছিলেন, আবার তিনিই

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'ও রচনা করেছিলেন। পক্ষান্তরে, যে অসংখ্য পদ চণ্ডীদাস-চিহ্ন বহন করছে, সে সকল পদের রচয়িতা চণ্ডীদাস 'দীন' উপাধিধারী এবং তিনি ছিলেন নরোত্তম দাসের শিষ্য। হরেকৃষ্ণ বাবুর সর্বশেষ অভিমত এই যে, এই দীন চণ্ডীদাসই সহজিয়া-মতাবলম্বী রাগাত্মিক পদগুলি রচনা করেছেন। রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্রও দুজন চণ্ডীদাসে বিশ্বাসী। তিনি চৈতন্যপূর্ববর্তী একজন চণ্ডীদাসকে স্বীকার করেছেন, যিনি পদাবলীর শ্রেষ্ঠ পদগুলি রচনা করেছেন। নিকৃষ্টতর কবিত্ব-প্রতিভার অধিকারী দীন চণ্ডীদাস ছিলেন চৈতন্যোত্তর কালের। রায়বাহাদুর মিত্র বড়ু চণ্ডীদাসের প্রামাণিকতায় বিশ্বাস করেন না। সতীশচন্দ্র রায় তিনজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তাঁর মতে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র বড়ু চণ্ডীদাস ছাড়াও দুজন চণ্ডীদাস ছিলেন। "আমাদের বিবেচনায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র প্রবল শক্তিশালী কিন্তু উন্নত আধ্যাত্মিকতার লেশশূন্য কবি চণ্ডীদাস বরং কোন অচিন্ত্যনীয় সাধনার বলে পদাবলীর শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক কবি চণ্ডীদাসে পরিণত হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু দীন চণ্ডীদাসের পক্ষে উহা সম্পূর্ণ অসম্ভব বটে।" পদাবলীর উৎকৃষ্ট পদগুলির রচয়িতা চণ্ডীদাস যে চৈতন্য-পূর্ব যুগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তিনিই যে আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ রাগাত্মিক পদগুলি রচনা করেছিলেন, এ বিষয়ে তিনি প্রায় নিশ্চিত। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার চণ্ডীদাসের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি মনে করেন যে একজন চণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্ব যুগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর পদগুলিই কাব্যাংশে এবং ভাবের দিক থেকে উৎকৃষ্ট এবং চৈতন্যদেব এঁরই পদ আস্বাদন করেছিলেন। বড়ু চণ্ডীদাস ছিলেন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং তিনি কতকাংশে চৈতন্যদেবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিমানবাবু চৈতন্য-পরবর্তী আরও দুজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন; এঁদের একজন দ্বিজ ও অপরজন দীন চণ্ডীদাস। তিনি সহজিয়া পদগুলির রচয়িতা কোন চণ্ডীদাসকে স্বীকার করেন না। তাঁর মতে "চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত সহজিয়া পদগুলি কোন একজন কবির লেখা নহে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি এই পদগুলি রচনা করিয়াছেন।"

উপরে বিভিন্ন পণ্ডিতজনের যে সকল অভিমত উদ্ধৃত হলো সেই মতারণ্য থেকে প্রকৃত উদ্ধার সত্যের আপাতত অসম্ভব বলেই মনে হলেও আমরা মনে করি যে বিভিন্ন কালে অন্ততঃ চারজন চণ্ডীদাস নামক কবি বর্তমান ছিলেন ঃ ১. একজন চৈতন্য-পূর্বকালে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। ২. দ্বিতীয় জন 'দ্বিজ চণ্ডীদাস'—চৈতন্য-সমকালে কিংবা কিঞ্চিৎ পূর্বকালে বর্তমান ছিলেন। ৩. তৃতীয় জন অসংখ্য পালাগান-লেখক চৈতন্যোত্তর কালের 'দীন চণ্ডীদাস'। ৪. চতুর্থ জন 'সহজিয়া চণ্ডীদাস'। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য 'বড়ু চণ্ডীদাস ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' শীর্ষক আলোচনায় 'চণ্ডীদাস-সমস্যা' দ্রষ্টব্য। যাহোক চণ্ডীদাসদের সংখ্যা কত, সেই বিচারে না গিয়ে ববং চণ্ডীদাসের পদ ধরে আলোচনাই অধিকতর সার্থক হবে বলে মনে হয়।

চণ্ডীদাসের পদ-বিভাগ

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে বাদ দিলে চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত অপর সকল পদগুলিকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে ঃ ১. বৈষ্ণবমহাজনপদ ২. পালাকীর্তন ৩. রাগাত্মিক পদ।

১. বৈষ্ণবমহাজনপদ ঃ চণ্ডীদাসের কাব্য প্রতিভা। প্রধানত চণ্ডীদাস-সমস্যা সৃষ্টির পূর্বে চণ্ডীদাসের যে পদাবলী সাহিত্য চিরকালের বাঙালীর মন কেড়ে নিয়েছিল, সেই পরম-স্বাদু পদগুলিকেই 'বৈষ্ণবমহাজনপদ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই পদগুলিকে বা কারা রচনা করেছিলেন, সেই আলোচনা আজ বৃথা। কারণ পদের ভণিতায় যেমন 'দ্বিজ' উপাধি পাওয়া যায়, তেমনি 'দীন' উপাধিরও অভাব নেই, আবার নিরুপাধিক চণ্ডীদাসের পদের সংখ্যাও কম নয়। অনুমান হয়, গায়েনরাও অনেক সময় হয়তো ভণিতার নাম-উপাধির উপর হস্তক্ষেপ করে থাকতে পারেন। যাহোক, এই বিচ্ছিন্ন পদগুলিই চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত শ্রেষ্ঠ রচনার নিদর্শন।

চৈতন্য-পূর্ব যুগে রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ে যাঁরা পদ রচনা করেছিলেন, তাঁরা নিজেরাই যেন সেই লীলারস-আস্বাদনের জন্য রাধার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েছিলেন। চৈতন্যোত্তর কালে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে; পদকর্তারা তখন চৈতন্যের অন্তরালে দাঁড়িয়ে সেই লীলার স্বাদ গ্রহণ করেছেন। এইদিক থেকে বিচার করলে মনে হয়, চণ্ডীদাস-রচিত বৈষ্ণব মহাজনপদগুলির অধিকাংশই চৈতন্য-পূর্বকালে রচিত।

মহাজনপদাবলীব শ্রেষ্ঠত্ব

চণ্ডীদাসের এই ভাবতন্ময়তাই যে তাঁর কাব্যের শ্রেষ্ঠ গুণ, এবং বহিরঙ্গে অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও যে কেন চণ্ডীদাস বাঙালীর এত প্রিয়জন বলে গণ্য হতেন, 'চণ্ডীদাস পদাবলী'ব সম্পাদক নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের উক্তি থেকে তা বোঝা যাবে। তিনি লিখেছেন, ''চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের প্রেমে একেবারে মজিয়া গিয়াছিলেন। যোগীর ন্যায় মানসক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণের লীলা প্রত্যক্ষ করতেন। যাহা দেখিতেন, তাহাই গাইতেন। কল্পনার কথা নয় যে, সাজাইয়া গুছাইয়া তোমার মনে চমক লাগাইতে হইবে। চণ্ডীদাস কৃত্রিমতা জানিতেন না। খাঁটি জিনিষ যেমন পাইলেন, আনিলেন, লোকে লউক আর না লউক, সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তাই তাঁহার কবিতা সরল ও অলঙ্কারবিহীন। বর্ণনীয় বিষয় হইতে মনকে দূরে না আনিলে ত আর উপায় খোঁজা হয় না। সুতরাং বিষয়ে তন্ময়তা জন্মিলে উপমা প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য থাকে না। বস্তুত এটি শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ। কাব্যের অলঙ্কৃত সৌন্দর্য সরাসরি পাঠকমনকে স্পর্শ করবে এবং কবিতে ও পাঠকে একটা সাহিত্যবোধের সৃষ্টি করবে। তাই রাধাভাবে তন্ময় চণ্ডীদাস যখন আকুল কণ্ঠে বলে উঠেন, 'সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম' তখন সঙ্গে সঙ্গে পাঠকমনও সাড়া দিয়ে উঠে। এই শ্যাম নাম বিরহ-ব্যাকুল পাঠকেরও কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে।''

কৃষ্ণের সঙ্গে তখনও রাধার সাক্ষাৎকার হয় নি, শুধু তিনি শ্যাম নামটি মাত্র শুনেছেন, এতেই তাঁর চিত্তে পূর্বরাগের সৃষ্টি হয়েছে। এই পূর্বরাগে রাধার আপন স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচয় নেই। তিনি শুধু নাম জপতে জপতেই অবশ হয়ে পড়েছেন, —এই কৃষ্ণতন্ময়তাই রাধা-জীবন। তাই, মনে হয়, বৃথাই তিনি ভাবছেন,

'নামপরতাপে যার ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।'

এই দেহ-সচেতনতা রাধিকার একান্তই সাময়িক, কারণ তাঁর প্রেম দেহের অনেক

ঊর্ধ্বেই অবস্থান করতো। যাহোক, শ্যাম-নাম শ্রবণের পর রাধা চিত্রপটে শ্যামমূর্তি দর্শন করলেন এবং তারও পরে—'যমুনাকূলে' রাধা 'ত্রিভঙ্গ দাঁড়ায়ে তরুমূলে' মুরলী-ধারী শ্যামসুন্দরের সাক্ষাৎ পেলেন। এইবার রাধার অন্তরের বাঁধ ভেঙ্গে গেল, তিনি আর কিছুতেই আপনাকে সামলে রাখতে পারছেন না। 'ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার' তিনি আসা-যাওয়া কবছেন, যদি আবার শ্যামের দর্শন পাওয়া যায়। এই দর্শনের জন্য এমন কিছু নেই যা তিনি করতে পারেন না, 'গুরু দুরুজন ভয় নাহি মন'—রাতের অন্ধকারে ঘর থেকে বার হয়ে পড়লে গুরুজন বা দুর্জনের হাতে নিপীড়িত হতে পারেন, কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমে সেই ভয়ও তাঁর অন্তর্হিত। অন্তর-ধনে ধনী রাধিকা কৃষ্ণসমর্পিতপ্রাণা, তিনি তো সমস্তই কৃষ্ণে উৎসর্গ করে বসে আছেন, অতএব দেহসৌন্দর্যে কৃষ্ণকে মুগ্ধ করবার কথা তিনি ভাবতেও পাবেন না। তাই আপনার সর্বস্ব উৎসর্গ করে তিনি যোগিনী সেজেছেন, শুধুই যে 'বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে' তা নয়, রাধা 'সদই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে'—শ্যাম-সদৃশ মেঘের মধ্যেই তিনি শ্যামেব সন্ধান করেন। তাঁর অন্তর-ব্যথা প্রকাশ করবার ভাষা নেই। বস্তুত রাধাব পূর্ববাগ-বর্ণনায় চণ্ডীদাস এক নোতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। বিদ্যাপতি-আদি কবিগণ পূর্বরাগের কবিতায় রাধার লীলাচপল রূপটিই প্রকাশ করেছেন, কিন্তু চণ্ডীদাস রাধাময় হয়ে বিরহিণী নারীর মতই বিবশা হয়ে পড়েছেন। পূর্বরাগের চিত্র-অঙ্কনে চণ্ডীদাস যে পারদর্শিতার পরিচয় দান করেছেন, তৎপ্রসঙ্গে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, "চণ্ডীদাসের বাণী সহজ সরল ও সুন্দর। পূর্ববাগেব অবস্থা চিত্রিত করিয়া চণ্ডীদাস যে ধ্যানপরায়ণা রাধিকার মূর্তিটি দেখাইয়াছেন, তাহার সাশ্রুনেত্র আমাদিগকে স্বর্গীয় প্রেমের স্বপ্ন দেখাইয়া অনুসরণ করে এবং চৈতন্যপ্রভুর দুটি সজল চক্ষুর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সেই মূর্তি ভাষার পুষ্পপল্লবের বহু ঊর্ধ্বে নির্মল অধ্যাত্মরাজ্য স্পর্শ করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছে। সেইস্থানে সাহিত্যিক সৌন্দর্যের আড়ম্বর নাই।"

পূর্বরাগ

চণ্ডীদাস পূর্বরাগ অপেক্ষাও অধিকতর কৃতিত্বের পরিচয় দান করেছেন আক্ষেপানুরাগের পদ রচনায়। এখানে কবির তথা রাধার ভাবতন্ময়তা আরও গাঢ়, আরও স্পষ্ট। আক্ষেপানুরাগের আরও কয়েকজন বড় বড় কবি আছেন, কিন্তু তাঁদের রাধিকা অহংকে ত্যাগ করতে পারেন নি, তাই আক্ষেপের সঙ্গে অনুযোগও বর্তমান। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধিকার মনে কোন অনুযোগ নেই, অভিযোগ নেই, তিনি যে আপনার সর্বস্ব বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। তিনি 'রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি' —আর কীই বা করবেন। কিন্তু এর পরও যখন রাধা দেখতে পান, 'আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমার আঙ্গিনা দিয়া'—তখন তিনি জ্ঞানদাসের রাধিকার মত 'কেশ ছিঁড়ে ফেলি বেশ দূর করি' আপন মাথা ভাঙ্গবার কথা ভাবেন না, শুধু নীরবে অভিশাপ দেন, 'আমার পরাণ যেমতি করিছে, তেমতি হউক সে'।

আক্ষেপানুরাগ

চণ্ডীদাসের 'ভাবসম্মিলনে'র পদগুলিতে যেন আরও আন্তরিকতা, আরও সুস্পষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়। জীবন-ভোর রাধিকা কৃষ্ণ-সন্ধানেই কাটিয়েছেন, কৃষ্ণ তো তাঁর জীবনের জ্বালাই শুধু বাড়িয়েছেন, তৎসত্ত্বেও যখন রাধিকা বলেন, 'জীবনে মরণে জনমে

জনমে প্রানণাথ হৈও তুমি' তখন আর বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। রাধাপ্রেম কামনাবাসনাশ্রিত মর্ত্যলোক থেকে বহু ঊর্ধ্বে এক অধ্যাত্মলোকে বিচরণ করে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'শতেক বরষ পরে বঁধুয়া মিলাল ঘরে' এই শতবর্ষের ব্যবধানও যাঁর চিত্তে একটুখানি মালিন্য স্পর্শ করাতে পারে নি, সেই রাধাচিত্ত যে যুগ যুগ ধরে বিরহিণী-প্রাণে অমৃতবারি সিঞ্চন করবে, তাতেই বা বিস্ময়ের কী আছে। বস্তুত, এই কারণে বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে চণ্ডীদাস-কৃত রাধার আত্মসমর্পণের পদগুলি অমূল্য সম্পদ বলেই বিবেচিত হয়ে থাকে। ব্যাকুলতা ও বেদনা যত সহজে মানুষের মনে সাড়া জাগাতে পারে অপর কোন অনুভূতিই তা পারে না। সম্ভবত এই কারণেই চণ্ডীদাসের পদগুলি পাঠকমনকে এত সহজেই আকর্ষণ করে। তাঁর পদে চমক নেই, ঠমক নেই, অলঙ্কার নেই,—অতি সহজ সরল ভাষায় প্রাণের কথা বলেছেন, কিন্তু পাঠক তাতেই মুগ্ধ। অতএব রচনার বহিরঙ্গ নয়, এর ভাব এবং রসই অধিকতর আস্বাদনযোগ্য। চণ্ডীদাসের এই বেদনা-বোধ প্রকৃতপক্ষে তাঁর কাব্যের শ্রেষ্ঠ গুণ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "বিদ্যাপতি সুখেব কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন। চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি। চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ এবং দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয়—দুঃখের প্রতি অনুরাগ।"

ভাবসম্মিলন

পূর্বোক্ত কাব্য-বিশ্লেষণে ভাবের যে গভীরতা, অনুভূতির যে প্রত্যক্ষতা এবং আন্তরিকতার যে সহজ প্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে, তা থেকে একটিমাত্র সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা চলে যে কবি কৃষ্ণপ্রেম-মুগ্ধ ও কৃষ্ণ-সমর্পিত-প্রাণা শ্রীমতী রাধিকার সঙ্গে সম্পূর্ণতা একাত্মতা-বোধ করেছিলেন, তা ছাড়া অনুভূতির এমন অকৃত্রিম প্রকাশ সম্ভবপর হতো না। আর এই একাত্মতাবোধ একমাত্র চৈতন্য পূর্ব যুগেই সম্ভব ছিল, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের অনুগামী ছিল না। এই কারণেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, এই বৈষ্ণবমহাজন পদকর্তা চণ্ডীদাসের অপূর্ব মধুর পদেরই রসাস্বাদন করতেন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব।

চণ্ডীদাসেব উৎকর্ষ

চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত বহু কবিতাই অপর কোন কবি-কর্তৃক রচিত বলে কেউ কেউ মনে করেন। এদের মধ্যে বিশেষভাবে, 'ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার', 'আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়', 'সজনি ও ধনি কে কহ বটে', 'কাহারে কহিব মনের বেদনা' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তবে এগুলি এখনও মতান্তর বলে গৃহীত হয়ে থাকে, স্থির সিদ্ধান্ত নয়।

২. পালাকীর্তন ঃ বৈষ্ণব মহাজন পদগুলির বাইরেও চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত অসংখ্য পদ পাওয়া যায়, এদের সংখ্যা অন্যূন দুই হাজার। পদগুলি বিচ্ছিন্ন নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পালাকীর্তনের আকারে সজ্জিত। যদি এই পদগুলি একই ব্যক্তির রচনা হয়ে থাকে, তবে তা কৃষ্ণ-বিষয়ক কোন পুরাণের অনুসরণে রচিত হয়েছে বলে মনে করা যায়। মণীন্দ্রনাথ বসুর

মতে দীন চণ্ডীদাসই এই পালাকীর্তনের রচয়িতা। দীন চণ্ডীদাস চৈতন্যোত্তর কালে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, মণীন্দ্রবাবু দীন চণ্ডীদাসের যে পালাকীর্তন প্রকাশ করেছেন, তাতে গৌরচন্দ্রিকার অভাব, অথচ চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিদের প্রায় সকলেই গৌর-বিষয়ক পদ রচনা করে গিয়েছেন। আরও লক্ষণীয় বিষয়, দীন চণ্ডীদাসের রচনায় বাশুলীরও কোন উল্লেখ নেই।

রচয়িতা দীন চণ্ডীদাস (?)

দীন চণ্ডীদাস তথা পালাকীর্তন-রচয়িতা চণ্ডীদাসের ভূরি-রচনার ক্ষমতা ছিল, কিন্তু উৎকর্ষ তাঁর গণনাতেই, গুণে নয়। কাহিনী-রচনায় তিনি চাতুর্যের পরিচয় দান করলেও পদাবলীর সঙ্গে তাঁর রচনা কোনক্রমেই তুলনীয় নয়। ভাবের ঐশ্বর্যে কিংবা গভীরতায় পালাকীর্তনের পদগুলি একান্তই সাধারণ। যে-চণ্ডীদাসের পদ শ্যাম-নামের মতই কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে, আলোচ্য পালার একটি পদও প্রায় তত্তুল্য নয়। দুই হাজার পদের মধ্যে শতকরা একটি পদও পদাবলীর সমকক্ষতা দাবি করতে পারে কি না সন্দেহ। বরং এদিক থেকে বড়ু চণ্ডীদাসের বচনাও উৎকৃষ্টতর বলে বোধ হয়। বড়ু চণ্ডীদাসের রচনায় গ্রাম্যতা আছে, ভাববিহ্বলতারও অভাব আছে, কিন্তু তাঁর চাতুর্য শুধু কাহিনীবয়নে নয়, ছন্দ-অলঙ্কারাদির ব্যবহারেও বড়ু চণ্ডীদাস পটুত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কবিত্বশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং রচনাচাতুর্যে তিনি পদাবলীর চণ্ডীদাসের সমকক্ষতা দাবি করতে না পারলেও অন্তত পালাকীর্তন-রচয়িতার চেয়ে যে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। যে আবেগ ও কল্পনাকুশলতা কবিকে কাব্যরচনায় প্রেরণা দান করে, দীন চণ্ডীদাসের রচনায় তারই একান্ত অভাব দেখা যায় — "তাঁহার পালাগানের পদাবলী অতিশয় নীরস—শুষ্ক ঘটনাবিবৃতি মাত্র। দীন চণ্ডীদাস উপাদান-কঙ্কালে লাবণ্য সঞ্চার করিতে পারেন নাই। যাহোকে ইংরাজীতে uninspired লেখা বলে, দীন চণ্ডীদাসের অধিকাংশ পদই সেই প্রকার uninspired, আবেগ-উত্তাপহীন, প্রথাপালনের পদাবলী হইয়াছে।" (ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।

অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্টতা

৩. রাগাত্মিক পদ ঃ বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের রচিত চর্যাপদগুলিতে যেমন কতকগুলি সঙ্কেতের সাহায্যে তাঁদের আচরিত ধর্মরহস্য প্রকাশিত হয়েছে, চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত কতকগুলি বৈষ্ণব পদেও এরূপ সাঙ্কেতিকতার আভাস পাওয়া যায়। এই ধরনের পদগুলিকে রাগাত্মিক পদ বলে অভিহিত করা হয়। সহজিয়া সাধন-পদ্ধতিতে কিছুটা তান্ত্রিকতার প্রভাব পড়েছে, চণ্ডীদাস-রামীর কাহিনী প্রশ্রয় লাভ করেছে। বৈষ্ণব মহাজনপদ এবং দীন চণ্ডীদাসের পালাকীর্তনে রামীর নাম কোথাও পাওয়া যায় না, পক্ষান্তরে চণ্ডীদাস ও রামীকে অবলম্বন করে পরবর্তীকালে যে সকল মুখরোচক কাহিনী জন্মলাভ করেছিল, আলোচ্য রাগাত্মিক পদগুলিতে এই কাহিনীই পরিপোষকতা লাভ করেছে। অসম্ভব নয়, হয়তো নোতুনতর কোন চণ্ডীদাস এই কাহিনীর নায়ক হয়ে থাকতে পারেন। অথবা এমনও হতে পারে, সহজিয়াপন্থী কোন এক বা একাধিক কবি পদরচনা করে তা চণ্ডীদাসের নামে চালিয়ে দিয়ে থাকবেন। যা হোক, রাগাত্মিক পদগুলির রচয়িতা যিনিই

সহজিয়া পদ্ধতি

হোন, মনে হয়, তিনি পালাকীর্তন-রচয়িতার চেয়ে উৎকৃষ্টতর কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। যদিও কবির রাগাত্মিক পদগুলির সঙ্গে কিছু কিছু প্রহেলিকারও মিশ্রণ ঘটেছে, তৎসত্ত্বেও কবিতাগুলির শিল্পকৃতি প্রশংসনীয়। রাগাত্মিক পদগুলিতে গূঢ় ধর্মপ্রণালী ব্যাখ্যা করতে হয়েছে বলে কবি অনেক রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার করেছেন। প্রতীকের বহিরাবরণ ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করতে পারলে যে রসের সন্ধান পাওয়া যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ সহজিয়া চণ্ডীদাস যত বড় সাধক ছিলেন, তার চেয়েও বেশি ছিলেন কবি।

পালাকীর্তন অপেক্ষা উৎকর্ষ

[চার] জ্ঞানদাস

বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে জ্ঞানদাস শ্রেষ্ঠ না হলেও প্রধানদের মধ্যে একজন। একদিকের বিচারে অবশ্য জ্ঞানদাসকে শ্রেষ্ঠত্বও দান করা চলে ঃ কারণ বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে একমাত্র তাঁর রচনাতেই যেন আধুনিক মনের প্রতিফলন দেখা যায়। জ্ঞানদাস মধ্যযুগের কবি হয়েও কীভাবে যুগাতিশায়ী ভাবধারার অধিকারী হয়েছিলেন, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এ দিক থেকে তিনি কবিকঙ্কণ মুকুন্দ এবং রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রেরই সমধর্মী।

জ্ঞানদাসের চৈতন্য-দর্শন না ঘটলেও যে তিনি চৈতন্যের জীবৎকালেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তা মোটামুটি স্বীকৃত হয়ে থাকে। অন্ততঃ তিনি যে চৈতন্য - পরিমণ্ডলেই লালিত-পালিত হয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। জ্ঞানদাসের ব্যক্তিগত পরিচয় জানবার সুযোগ বিশেষ নেই। তাঁর সর্বজনস্বীকৃত পরিচয় সামান্যই—সম্ভবত বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামে তিনি ১৫৩০ খ্রীঃ এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য এই সন তারিখ একেবারেই আনুমানিক। তবে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে নরোত্তমদাসের আহ্বানে খাতরায় যে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল জ্ঞানদাস তাতে যোগদান করেছিলেন, এ বিষয়ে লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবীদেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং নিত্যানন্দশাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। নিত্যানন্দ-বিষয়ে রচিত "জ্ঞানদাসের পদে প্রত্যক্ষদর্শীর পরিচয় পাওয়া যায়" — এই অনুমানে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মনে করেন যে জ্ঞানদাস হয়তো নিত্যানন্দ প্রভুর মহাপ্রয়াণের কিছু পূর্বেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, "জ্ঞানদাসের নিত্যানন্দের ভাববর্ণনার পদগুলি দেখিয়া মনে হয়, কবি যেন নিজ চোখে দেখিয়া এগুলি লিখিতেছেন।"

চণ্ডীদাসকে অবলম্বন করে যে বিরাট চণ্ডীদাস-সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, জ্ঞানদাসকে অবলম্বন করে তেমন কোন জটিল সমস্যার উদ্ভব না ঘটলেও যে যথাকালে ঐরূপ সমস্যা দাঁড়িয়ে যেতে পারে, তেমন আশঙ্কার কারণ রয়েছে। কারণ, প্রাচীন সঙ্কলনে (পদকল্পতরুতে) জ্ঞানদাসের নামাঙ্কিত পদের সংখ্যা ছিল ১৮৬টি, এর মধ্যে ১০৫টিই ব্রজবুলিতে রচিত। আধুনিক সঙ্কলনে এই সংখ্যা অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে; ইতোমধ্যে আবার জ্ঞানদাস-রচিত একটি পালাগানেরও (যশোদার বাৎসল্যরস) সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। শ্রদ্ধেয় হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অনুমান করেন যে জ্ঞানদাস-রচিত পদের সংখ্যা সাকুল্যে চার শ-র কম হবে না। অথচ

জ্ঞানদাস-রচিত প্রাচীন ও প্রামাণিক পদগুলি বিচারে, পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত অনেকগুলি পদের কর্তৃত্বই জ্ঞানদাসে আরোপ করতে শঙ্কা ও সঙ্কোচ বোধ হয়। পালাগানে যে ধরনের ভণিতা ব্যবহৃত হয়েছে, সেই ভণিতার ধরনই আলাদা। জ্ঞানদাসের প্রামাণিক পদগুলির ভণিতায় কবি যেমন বর্ণিত লীলার সঙ্গে একীভূত হয়ে তাতে অংশগ্রহণ করেন ('জ্ঞানদাস কহে সখি স্থির হৈয়া থাক দেখি'), পালাগানের ভণিতায় তার একান্ত অভাব। 'জ্ঞানদাস কন'—এরূপ ভণিতায় সম্মানবাচক ক্রিয়া-পদের ব্যবহারে স্বভাবতই মনে সংশয়ের সৃষ্টি হয়। শ্রদ্ধেয় মুখোপাধ্যায় এই পালাগানের পদগুলিকে স্ব-সম্পাদিত গ্রন্থে গ্রহণ করলেও তাঁর সংশয় অপ্রকাশ থাকে নি। "এই পালাপুঁথিটি পদাবলী সাহিত্যের জ্ঞানদাসের রচিত কিনা, তাহা আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সাহায্যে নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।" জ্ঞানদাসেব নামে প্রচলিত পদগুলির প্রামাণিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করে ডঃ সুকুমাব সেন মন্তব্য করেছেন, "জ্ঞানদাস নাম তখন এবং পবেও অনেকের নিশ্চয়ই ছিল। এবং তাদের মধ্যে কেহ পদ বচনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু এ নামে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে ধরা যাইতেছে না এবং পদগুলির মধ্যে দ্বিতীয় লেখনীর নিশ্চিত পবিচযও পাওযা যাইতেছে না। সুতরাং আপাতত জ্ঞানদাস-নামিত সমস্ত পদই একজনের উপর চাপাইতে হয়।"

জ্ঞানদাস বাঙলা, ব্রজবুলি এবং বাঙলা-মিশ্রিত ব্রজবুলি ভাষায় পদ-রচনা ক'রেছেন। সমসাময়িক যুগে কীর্তন গানের বহুল প্রচারের জন্যই হয়তো জ্ঞানদাস ব্রজবুলি ভাষায় এত পদ বচনা কবেছিলেন। তাঁব ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদের সংখ্যা বাঙলা পদ থেকে অনেক বেশি হ'লেও উৎকর্ষে বাঙলা পদগুলিই শ্রেষ্ঠ। অবশ্য ডঃ সেন জ্ঞানদাসের ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদগুলির উৎকর্ষ-সম্বন্ধে প্রশংসোক্তিই করেছেন। তিনি বলেন, "Jnana Das was the most careful writer of Brajabuli; though there are a few poems where Brajabuli is greatly mixed up with Bengali." কিন্তু গোবিন্দদাসের ব্রজবুলি পদের সঙ্গে অথবা জ্ঞানদাসেব স্বরচিত বাঙলা পদের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় একথা নিঃসন্দেহেই প্রতিপন্ন হয় যে জ্ঞানদাসের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে বাঙলা ভাষাতেই। কাব্যধর্মের দিক থেকেও যেমন জ্ঞানদাসের ব্রজবুলি পদগুলি হীনপ্রভ, তেমনি ছন্দ ও অলঙ্কারের ব্যবহারেও তিনি গোবিন্দদাসের সমকক্ষ হ'য়ে উঠতে পারেন নি। কোন কোন পদে কবির অন্তর স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হ'লেও অধিকাংশ পদেই যেন কৃত্রিমতা-জনিত কিছুটা আড়ষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বিদ্যাপতির অনুকরণই করেছেন, তার অতিরিক্ত কিছু ক'রে উঠতে পারেন নি। পক্ষান্তরে জ্ঞানদাসের বাঙলা পদগুলি শুধুই যে চন্ডীদাসের অনুকরণ, তা' নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি চন্ডীদাসকেও ছাড়িয়ে গেছেন বলে সন্দেহ হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা চলে, 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিলু' নামে যে অপূর্ব-সুন্দর পদটি সাধারণত চন্ডীদাসের রচিত বলে উল্লেখ করা হয়, এই পদটির প্রকৃত রচয়িতা জ্ঞানদাস।

ব্রজবুলি পদ

বাঙলা ভাষার পদ

কাব্যপ্রতিভা বিশ্লেষণ ঃ মধ্যযুগের কবিকুলের মধ্যে আধুনিকতার বিচারে কবি জ্ঞানদাসকেই শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপায় ভূষিত করা চলে। সত্য বটে, 'চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য' বলেই আমরা তাঁকে সম্মানিত করে থাকি, কিন্তু মনোভঙ্গি ও তার প্রকাশ রীতির বিচারে শুধু স্বীয় গুরুকেই তিনি অতিক্রম করেন নি, একালের বহু রোম্যান্টিক কবিকেও লজ্জিত করতে পারেন,—তাঁর কবিতাগুলির বিশ্লেষণে তা' যে কোন সনিষ্ঠ পাঠকের নিকটই ধরে পড়ে যায়। বস্তুতঃ সেকালে এই আধুনিক রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি তিনি কোথায় পেলেন এবং কী অনুপম ভাষাচিত্রে তা' প্রকাশ করলেন, এ কথা ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। নিম্নে তাঁর কাব্য-প্রতিভা বিশ্লেষণে প্রতিভার এই স্বরূপটি ধরা পড়বে। জ্ঞানদাস সম্ভবত সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন 'আক্ষেপানুবাগে'র পদগুলিতেই। 'সুখের লাগিয়া' পদটি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া 'তোমার গরবে গরবিনী হাম, রূপসী তোমার রূপে' পদটিও জ্ঞানদাসের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। ভাবসম্মেলনের পদগুলিতে ভক্ত কবিগণ যে কল্পনার স্বর্গ রচনা করে মিলন সুখ অনুভব ক'রে থাকেন, জ্ঞানদাস হয়তো তাতে সান্ত্বনা পেতেন না বলেই এ ধরনের পদ রচনায় খুব আগ্রহ বোধ করেন নি। কিন্তু পূর্বরাগ ও রূপানুরাগের কয়েকটি পদে জ্ঞানদাস যেন আপনাকে আপনি অতিক্রম করেছেন। কৃষ্ণের দর্শন লাভ করবার পব রাধিকা আর নিজেকে সামলাতে পারছেন না। তাই সখেদে বলেন—

প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব-বিচার

পদাবলী বিশ্লেষণ ও কৃতিত্ব-বিচার

'আলো মুঞি জানে না—
জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে।
চিত মোর হরিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে।'

এর পরই কারণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে রাধিকা বলেন,

'রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।।'

'যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল'—জাতীয় পদ রচনা করতে পারলে কোন অত্যাধুনিক কবিও পুলকিত হয়ে ওঠতে পারতেন। জ্ঞানদাসের এরূপ আর একটি উল্লেখযোগ্য পদ—

'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।।'

শুধু বৈষ্ণব কবিতার উচ্চ ভাবকল্পনার প্রকাশ বলেই বলেই নয়, জ্ঞানদাস-রচিত এ ধরনের পদগুলিতে ভাষারীতিও লক্ষ্য করবার মত। বিদ্যাপতি বা গোবিন্দদাসের মত জ্ঞানদাস ভাষাশিল্প-সম্বন্ধে এত সচেতনতার পরিচয় না দিলেও আলোচ্য পদটিতে এবং অন্য কোন কোন পদে ভাষা ও ভাবের হর-পার্বতী-মিলন সাধিত হয়েছে। নিম্নোক্ত পদটিতেও অনুরূপ শিল্পকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় —

ভাষারীতি

'দেখ্যা আইলাম তারে সই দেখ্যা আইলা তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়ানে না ধরে।।'

পূর্বোক্ত পদগুলিতে রোম্যান্টিক মনোভাবের অতি সহজ সরল, এমন কি প্রায় গ্রাম্য বাঙলায় যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন, ইতঃপূর্বে বাঙলা ভাষায় এর নিদর্শন পাওয়া যায় না, প্রাগাধুনিক বাঙলায়ও তা' দুর্লভ। ব্রজবুলি ভাষায় সমকালে গোবিন্দদাস কাব্যে যে ধ্বনি-ঝঙ্কার সৃষ্টি করেছেন, তা' ছিল একান্তই শব্দধ্বনি বা বাচ্যধ্বনি, কিন্তু কবি জ্ঞানদাসও অপূর্ব ধ্বনি সৃষ্টি করেছেন, যার কোন বাহ্য প্রকাশ নেই, শুধু ব্যঞ্জনধ্বনি, আলঙ্কারিকের 'শব্দালঙ্কার', নয় 'রসধ্বনি'। একালের আধুনিক রোম্যান্টিক অনুভূতিসম্পন্ন প্রকৃত কাব্য-পাঠকের কানেই এর অপূর্ব ব্যঞ্জনা ধ্বনিত হয়।

রোম্যান্টিকতা

পূর্বোদ্ধৃত জ্ঞানদাসের পদগুলিতে যে রোমান্টিক কবিমানসের পরিচয় পাওয়া যায়, সমগ্র বৈষ্ণব গীতি-কাব্য সাহিত্যে তার তুলনা মেলা ভার। এ দিক থেকে বিচার করলে সম্ভবত জ্ঞানদাসের পদগুলিকেই খাঁটি লিরিক কবিতার মর্যাদা দান করা চলে। রোমান্টিক মনোভাব সাধারণত একটু বিষণ্ণতার ধার ঘেঁষে চলে বলেই জ্ঞানদাসের বিরহের পদগুলিও খাঁটি মানবিক আকৃতিতে সমৃদ্ধ।

'রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে'—

পদটি পড়বার পর মুগ্ধচিত্ত রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে একটা বিরাট্ পটভূমিকায় একটি উজ্জ্বল চিত্র ফুটে উঠেছিল। 'বংশীধ্বনি'-বিষয়ক পদ-রচনায় জ্ঞানদাস প্রায় দ্বিতীয়-রহিত। "চন্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের মুরলী যেন সদাই সজীব। ইহার প্রতি রন্ধ্রে সুর যেন বিশ্বপ্রকৃতির মর্মের এক একটি ধ্বনিরূপ। ইহার প্রতাপ ও ক্ষমতা অপরিসীম।" দানখন্ড এবং নৌকাবিলাসের কোন কোন পদেও জ্ঞানদাস অনুরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। আলোচ্য কবিতায় কবি জ্ঞানদাস অত্যুৎকৃষ্ট চিত্র-প্রতীকেরও সার্থকতম ব্যবহার দেখিয়েছেন।

জ্ঞানদাসকে সাধারণভাবে চন্ডীদসের ভাবশিষ্য বলে অভিহিত করা হয়। এই প্রসঙ্গে চন্ডীদাসের সঙ্গে জ্ঞানদাসের রচনার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য-সম্বন্ধে আলোচনা করলেই পূর্বোক্ত অভিমতটির যাথার্থ্য বিচারিত হ'তে পারে। চন্ডীদাস প্রধানত ভাবের কবি, জ্ঞানদাসও তাই। অবশ্য বৈষ্ণব কবিদের সকলেই অল্পবিস্তর ভাবরসেরই কবি, কিন্তু তাদের মধ্যেও গভীরতায় চন্ডীদাস শ্রেষ্ঠ এবং তারই পরে জ্ঞানদাসের স্থান। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা-আস্বাদনে চন্ডীদাস এবং জ্ঞানদাস উভয়েই সমপর্যায়ভুক্ত, কিন্তু চন্ডীদাস সেই লীলার সঙ্গে যেমন একাত্মতাবোধ করেছেন, জ্ঞানদাসের সেই তন্ময়তাবোধ নেই। অবশ্য কোন কোন স্থলে জ্ঞানদাসও গুরুর মতোই রাধাভাবে ভাবিত হ'য়েছেন, তার দৃষ্টান্তও একান্ত দুর্লভ নয়। তবে মনে হয়, তিনি যেন একটু দূর থেকে লীলারস আস্বাদন করেই পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেছেন, চন্ডীদাসের মতো ভিতরে ঢুকে এক হ'য়ে যেতে পারেন নি। চন্ডীদাস যেমন যথাসর্বস্ব সমর্পণ করে আপনহারা হয়ে বসেছেন, জ্ঞানদাস

চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস

তেমনভাবে আত্মবিসর্জন দিতে পারেন নি। বরং বলা চলে, জ্ঞানদাস স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই রাধাকৃষ্ণের লীলাকে আপন অন্তরে অনুভব করেছিলেন, আর চন্ডীদাস আপন সত্তা বিসর্জন দিয়ে রাধাকৃষ্ণের লীলার মধ্যে মিশে গিয়েছেন। লীলা-আস্বাদনে চন্ডীদাস চেতনা হারিয়েছিলেন বলেই তাঁর বচনায় বহিরঙ্গের প্রতি পরিপূর্ণ ঔদাসীন্য প্রকাশ পেয়েছে; পক্ষান্তরে জ্ঞানদাসের রচনায় মন্ডনৈপুণ্য একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। তিনি কারুকৃতি-সম্বন্ধে সজাগ থেকে তুলিতে রঙ লাগিয়ে চিত্র অঙ্কন করেছেন। এই চিত্র বিদ্যাপতি বা গোবিন্দদাসের মত বর্ণাঢ্য না হ'লেও চন্ডীদাসের মত এত নিরাভরণও নয়। জ্ঞানদাস সচেতনভাবে শিল্প-সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন বলেই বহিরঙ্গের বিচারে তিনি চন্ডীদাসকে অতিক্রম করেই গিয়েছেন। "চন্ডীদাসের রসহিল্লোল জ্ঞানদাসে নাই, গোবিন্দদাসের হীরক-কাঠিন্যও তাহাতে পরিদৃষ্ট হয় না, কিন্তু লাবণ্যকে অনায়াস-বন্ধনে বাঁধিয়া অতি চমৎকার মণিহার রচনার গৌরব তাঁহার প্রাপ্য।" একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী প্রতিটি বৈষ্ণব কবির হৃদয়েই প্রাণবেদনার সৃষ্টি করেছে, কিন্তু তা' প্রকাশের ভাষা এক একজন এক এক ভাবে গ্রহণ করেছেন। ভাবের দিক থেকে চন্ডীদাসের সঙ্গে জ্ঞানদাসের সাধর্ম্য থাকলেও রূপের দিক থেকে জ্ঞানদাস বরং গোবিন্দদাস-বিদ্যাপতির সগোত্র। "চন্ডীদাস গভীরতম প্রাণবেদনার গীতকার, আর বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ঐ একই প্রাণবেদনার সার্থক চিত্রকর।" ভাবের দিক থেকে চন্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের মধ্যে ঐক্যবোধ বর্তমান রয়েছে বলেই জ্ঞানদাস যে চন্ডীদাসের ভাবশিষ্য এটি তার অখন্ডনীয় প্রমাণ।

ভাষাশিল্প

[পাঁচ] গোবিন্দদাস কবিরাজ

প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে যে একটি প্রশ্নে পাঠক-সমালোচককে বারবারই বিব্রত বোধ করতে হয়, তা' কবিদের নাম-সাদৃশ্য। চন্ডীদাসের ক্ষেত্রে সমস্যা বিপুল আকার ধারণ করেছে; বিদ্যাপতি এবং জ্ঞানদাস নামের আড়ালেও একাধিক কবির অস্তিত্ব অনুমিত হ'য়ে থাকে; গোবিন্দদাসকে নিয়েও একই সমস্যা। এক ষোড়শ শতাব্দীতেই অন্ততপক্ষে চারজন গোবিন্দের সন্ধান পাওয়া যায়। গোবিন্দ ঘোষ এবং গোবিন্দ আচার্য ছিলেন শ্রীচৈতন্যের পারিষদগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এঁরা দুইজনই পদকর্তা ছিলেন। গোবিন্দদাস চক্রবর্তী নামক কবি বহু পদই রচনা করেছিলেন। চতুর্থ কিন্তু শ্রেষ্ঠ ছিলেন গোবিন্দদাস কবিরাজ। প্রস্তুত পরিচ্ছেদে আমরা এই গোবিন্দদাস কবিরাজের প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা করবো। কিন্তু এখানেও আশঙ্কা, গোবিন্দদাস-নামাঙ্কিত পদগুলিতে মিশ্রণ ঘটে থাকতে পারে। 'গোবিন্দদাস'-ভণিতাযুক্ত পদ ব্রজবুলি এবং বাঙলা উভয় ভাষাতেই রচিত হয়েছে। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদগুলিই গোবিন্দদাস কবিরাজের। গোবিন্দদাস কবিরাজ বাঙলা ভাষায়ও পদ রচনা ক'রেছিলেন কিনা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। 'গোবিন্দদাস'-ভণিতায় রচিত বাঙলা উৎকৃষ্ট পদগুলি গোবিন্দদাস চক্রবর্তী-রচিত বলেই মনে হয়।

গোবিন্দ চতুষ্টয়

গোবিন্দদাস কবিরাজ সম্ভবত ১৫৩৭ খ্রীঃ মাতুলালয়ে (বর্ধমানে শ্রীখন্ড গ্রাম) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা চিরঞ্জীব, মাতা সুনন্দা এবং মাতামহ প্রসিদ্ধ 'সঙ্গীতদামোদর' গ্রন্থ-প্রণেতা দামোদর। কবির জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজও একজন ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। গোবিন্দদাস প্রথম জীবনে মাতামহের প্রভাবে শাক্তমতাবলম্বী ছিলেন বলেই জানা যায়। শেষযৌবনে দেবীর স্বপ্নাদেশে তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের নিকট বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এর পূর্ব থেকেই তিনি পদ রচনা করতেন। এরূপ একটি পদে গোবিন্দদাস হরপার্বতীর অর্ধনারীশ্বর রূপ চিত্রণ করে ভণিতায় বলেছেন ঃ

'গৌরীশঙ্কর চরণকিঙ্কর
কহই গোবিন্দদাস।'

খেতরীর মহোৎসবে জ্ঞানদাসের সঙ্গে গোবিন্দদাসও উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়। বৃন্দাবনের শ্রীজীব গোস্বামী গোবিন্দদাসের কবিত্বশক্তিতে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকে 'কবিরাজ' বা 'কবীন্দ্র' উপাধি দিয়েছিলেন বলে অনুমিত হয়। অনুমান ১৬১৩ খ্রীঃ কবি দেহত্যাগ করেন।

জ্ঞানদাসকে যেমন চন্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলে প্রচার করা হয়, তেমনি গোবিন্দদাসকেও বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য বলে পরিচায়িত করবার প্রথা বহুকাল প্রচলিত আছে। দীর্ঘকাল পূর্বেই কবি বল্লভদাস এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন ঃ

'ব্রজের মধুর লীলা যা শুনি দরবে শিলা
গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হৈতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্বগুণ
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি।।'

উনি বিদ্যাপতি-পদের সঙ্গে গোবিন্দদাসের পদের ভাব-সাদৃশ্য এবং রূপ-সাদৃশ্য লক্ষ্য করেই গোবিন্দদাসকে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' আখ্যায় ভূষিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে বাঙলাদেশে আর একজন 'বিদ্যাপতি' উপাধিকারী কবিও বর্তমান ছিলেন, তিনি শ্রীখন্ডের কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি, কখনও কখনও এঁকে 'ছোট বিদ্যাপতি' বলেও অভিহিত করা হয়। যা হোক গোবিন্দদাসকে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' বলে অভিহিত করবার আরও কিছু সঙ্গত কারণ বর্তমান। গোবিন্দদাস যে সজ্ঞানেই বিদ্যাপতির পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন, তার কয়েকটি সুস্পষ্ট প্রমাণও পাওয়া যায়। গোবিন্দদাস-রচিত অন্তত নয়টি পদের ভণিতায়

দ্বিতীয় বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতির নাম পাওয়া যাচ্ছে। 'পদামৃতসমুদ্রে'র (খ্রীঃ ১৭২১) সঙ্কলয়িতা রাধামোহন ঠাকুর অনুমান করেছিলেন যে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির অসম্পূর্ণ পদগুলিকে সম্পূর্ণ করে তাতে যুগ্মভণিতা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন এই অনুমানের যুক্তিযুক্ততায় সন্তুষ্ট না হয়ে বরং অনুমান করেন "গোবিন্দদাস কতকগুলি পদ বিদ্যাপতির পদের প্রত্যুত্তর-স্বরূপ করিয়াছিলেন এবং সেইগুলিতে তিনি বিদ্যাপতির নাম করিয়া গিয়াছেন।" অপর কেউ কেউ, অনুমান করেন যে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির ত্রিচরণ পদের চতুর্থ পদ পূরণ করেছেন—

'বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব,
গোবিন্দদাস রসপূর।'

গোবিন্দদাসের কাব্যপ্রতিভা-বিশ্লেষণ ঃ গোবিন্দদাসের ভণিতাযুক্ত বহু ব্রজবুলি এবং বাঙলা পদের সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদগুলিকেই গোবিন্দদাস কবিরাজের রচনা বলে গ্রহণ করা হয়। বাঙলা ভাষায় রচিত পদগুলি গোবিন্দদাস চক্রবর্তী রচনা। এরূপ অনুমান বিজ্ঞানভিত্তিক না হ'লেও এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই অনুমানের ভিত্তিতেই গোবিন্দদাসের পদগুলি বিচার করে সাহিত্য-সমালোচকগণ গোবিন্দদাস কবিরাজকে চৈত্যন্যোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা দান করে থাকেন। গোবিন্দদাস ব্রজবুলি ভাষায় যে সকল পদ রচনা করেছেন, তাদের ভাষা অবিমিশ্র ব্রজবুলি; অন্য অনেকের মত তিনি এতে বাঙলা ভাষার মিশ্রণ ঘটান নি। তদ্ভব তিনি কম ব্যবহার করেছেন, অধিকাংশ শব্দই তৎসম অথবা অর্ধতৎসম। কবিতার আঙ্গিক তথা বহিরঙ্গের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, সমালোচকগণ কবিকে বৃথাই শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা দান করেন নি। ভাষায়, ছন্দে, অলঙ্কারে গোবিন্দদাস অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ভাষার স্থাপত্যশিল্পে গোবিন্দদাসের ক্ষমতা অনুপম। পদের লালিত্য, ছন্দের ঝঙ্কার ও অলঙ্কারের সুষ্ঠু প্রয়োগে বিদ্যাপতি-শিষ্য গোবিন্দদাস স্বীয় গুরুরই সার্থক উত্তরসূরী। তাঁর রচনার প্রধান গুণ যে এর শ্রতিমাধুর্য, তা' কবি নিজেও স্বীকার ক'রে নিয়েছেন ঃ

'রসনারোচন শ্রবণবিলাস।
রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস।।'

গোবিন্দদাসের পদ বিচার করে ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, "ইঁহার লেখায় ছন্দের বৈচিত্র্য যথেষ্ট আছে। অনুপ্রাসের ও উপমা-রূপকাদি অর্থালঙ্কারের প্রয়োগ কবিরাজের মত আর কোন পদকর্তাই করিতে পারেন নাই। শব্দের ঝঙ্কারে এবং পদের লালিত্যে গোবিন্দদাস কবিরাজের গীতিকবিতাগুলি বাঙলা সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।" গোবিন্দদাস ছিলেন সৌন্দর্যরসিক রূপদক্ষ কবি। যে ধরনের পদ বিলাস-বিভ্রম-সৃষ্টির অনুকূল, কবি সাধারণত ঐ ধরনের পদরচনায়ই বিশেষ আগ্রহ অধিকার-বোধের পরিচয় দিয়েছেন। এ বিষয়ে একজন বিশিষ্ট সমালোচকের অভিমত উদ্ধার করি ঃ "সংযমবুদ্ধির ফলে গোবিন্দদাসের কাব্যে যে বিশেষ বস্তুটির আবির্ভাব ঘটেছে, তাকে কাব্যের স্থাপত্যবিদ্যা বলা চলে। তাঁর অধিকাংশ পদ কুঁদে তৈরী—'কুন্দে যেন নিরমাণ'। প্রতিভার আলোড়ন-ক্ষণে অর্ধবাহ্যদশায় আত্মচরিতের বিলয় মুহূর্তে প্রেরণার হাত ধরে কবি তাঁর কাব্য সৃষ্টি করেন নি। তাঁর কবিভাবনা কাব্যে সব কটি প্রয়োজনীয় বস্তুর সমাবেশ করে অপরিসীম রসবোধ ও তীক্ষ্ণ শিল্পদৃষ্টির সহায়ে একটি পদ রচনা করে গিয়েছে। ফলে কাব্যের রূপ-সম্পূর্ণতা যাকে বলে, সেই finish-এর অসৌকর্য কোথাও ঘটেনি।" (শঙ্করীপ্রসাদ বসু)

রূপদক্ষ গোবিন্দদাস

গোবিন্দদাস নানা ধরনের পদই রচনা করে গিয়েছেন, তন্মধ্যে গৌরচন্দ্রিকা, রূপানুরাগ ও অভিসারের পদগুলিতেই তাঁর উৎকর্ষ সমধিক। মান-বিরহের পদও তিনি রচনা করেছেন, তবে তাতে গোবিন্দদাসের প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যের স্পর্শ নেই।

গৌরচন্দ্রিকা

গোবিন্দদাস মহাপ্রভুর দর্শনলাভ থেকে বঞ্চিত ছিলেন বলে ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে বলেছেন, 'গোবিন্দদাস রহুঁ দূর।' সম্ভবত এই ক্ষোভ দূর করবার জন্যই তিনি সমগ্র অন্তর দিয়ে গৌরাঙ্গ-স্বরূপকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং তারই ফলশ্রুতি তাঁর 'গৌরচন্দ্রিকা'। গৌরচন্দ্রিকা-পদ-রচনায় গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিততনু' মহাপ্রভুর এমন জীবন্ত বিগ্রহ অপব কোন পদকর্তার রচনাতেই চোখে পড়ে না।

'অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী-তীর উজোর।।'

মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণের পর বাঙলাদেশে যে চৈতন্য-চেতনা বিলুপ্ত হ'তে বসেছিল, বৃন্দাবনের ষড়্গোস্বামীর প্রেরণায শ্রীনিবাস আচার্যই তাঁকে বাঁচিযে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন, আচার্যদেবের সুযোগ্য শিষ্য গোবিন্দদাস কবিরাজ ভক্তচিত্তে চৈতন্যেদেবের মূর্তিকে অধিষ্ঠিত করে দিলেন।

রূপানুরাগ

গোবিন্দদাসের রূপানুরাগের পদগুলিতে যে শিল্পচাতুর্য এবং কবির আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাও অতুলনীয়। কবি তাঁর উপাস্য দেবতাকে অন্তরে ঠাঁই দিয়েছেন, তাঁতে আত্মলীন হ'যেছেন, কিন্তু কখনও আত্মহারা হন নি, — এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। গোবিন্দদাস ধীর এবং প্রশান্ত। চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের মতো আবেগোচ্ছল হয়ে তিনি আত্মবিস্মৃতি লাভ করেন নি; কারণ তিনি সচেতন শিল্পী। এইদিক থেকে বিচার করেই ডঃ সেন মন্তব্য করেছেন, "তবে বলরামদাস এবং জ্ঞানদাসের পদে যেরূপ আন্তরিকতা আছে, কবিরাজের অধিকাংশ পদের মধ্যে সেরূপ আন্তরিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।" শিল্পীর সচেতনতার জন্যই কবিতাগুলি অতি বেশি অলঙ্কৃত হয়ে পড়েছে।

'ভালো বনি আওয়ে মদন মোহনিয়া।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গিম
রঙ্গিম ভঙ্গিম নয়ন নাচনিয়া।।'

অভিসার

গোবিন্দদাস সর্বাধিক কৃতিত্বের পরিচয় দান করেছেন অভিসারের পদগুলিতে। এখানে তিনি শুধু শ্রেষ্ঠই নন, নগাধিরাজের উন্নত মহিমায় বিরাজ করছেন, অপর সকলে তা থেকে শত যোজন দূরে। অলঙ্কার শাস্ত্রে যে অষ্টপ্রকার অভিসারের কথা উল্লেখ করা হয়, কবি স্বকৃত রচনায় তার প্রতিটির পরিচয় দান করেছেন। এই পদগুলি ভিতরে বাইরে সর্বদিকের বিচারেই শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় আসীন।

'কন্টক গাড়ি কমলসমপদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।

গাগরি-বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।।'

কবিতাটিতে রাধিকার কৃচ্ছ্রসাধনা-প্রচেষ্টার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা যেন অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরিত হচ্ছে।

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।।'

পদটিতে রাধিকার অভিসারের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তা' থেকেই সাযুজ্যলাভে আগ্রহী ভক্তদয়ের আকৃতি রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিব ভাবশিষ্য ছিলেন, তা প্রায় সকল সমালোচকই স্বীকার করে নিয়েছেন। একে ত তিনি 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' নামে পরিচিত ছিলেন, তার উপর আবার বিদ্যাপতির সঙ্গে যুগ্মভণিতায়ও তাঁর নাম বহুবার উচ্চারিত হ'য়েছে। অতএব বিদ্যাপতির ভাবশিষ্যরূপে পরিচিত হ'বার দাবি এখানেই প্রতিষ্ঠিত। এগুলি অবশ্যই বাইরের কারণ; কিন্তু যাঁরা বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের কাব্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পবিচিত, তাঁরাও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। গোবিন্দদাস যখন প্রথম পদ-রচনায় প্রবৃত্ত হলেন, তখন তিনি বৈষ্ণব ছিলেন না। সম্ভবত পঞ্চোপাসক বিদ্যাপতির ব্রজবুলি পদের আকর্ষণেই গোবিন্দদাস প্রথম পদ-রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন। তিনি যে সজ্ঞানে বিদ্যাপতির অনুসরণ করেছিলেন, তাতেও সন্দেহ নেই। বিদ্যাপতির মতই তিনিও কাব্যের বহিরঙ্গের উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। অবিমিশ্র ব্রজবুলি ভাষা, ছন্দের বৈচিত্র্য, অলঙ্কারের বহুল ব্যবহার ইত্যাদিতে বিদ্যাপতির অনুসরণপ্রিয়তাই লক্ষ্য করা যায়। এমন কি তিনিও বিদ্যাপতির মতই কৃষ্ণলীলা-কাহিনীর বিলাস-কলা-কুতূহলের দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন। মান-মাথুর-বিরহের পদে গোবিন্দদাস বিশেষ কোন কৃতিত্বের পরিচয় দান করতে পারেন নি। বিদ্যাপতি আপন অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির পরিপ্রেক্ষিতেই লীলামাধুর্যের স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু গোবিন্দদাস ছিলেন এই বিষয়ে অধিকতর সৌভাগ্যবান। কারণ তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেছেন, তখন মহাপ্রভু আপন জীবনের ভিতর দিয়ে রাধাকৃষ্ণের লীলা-কাহিনীকে প্রকাশ করে গিয়েছেন। অতএব বলা চলে, গোবিন্দদাস লীলামাধুর্যের প্রত্যক্ষ স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন। কাজেই কৃষ্ণ-লীলাকে একান্তভাবে বাইরে থেকে দেখেন নি। তিনিও সমসাময়িক যুগমানসের অংশভাগী ছিলেন, কাজেই যুগের ভাবুকতায়ও তিনি আপন উপলব্ধিকে সমৃদ্ধ করে তুলবার অবকাশ পেয়েছিলেন। এই কারণেই কেউ কেউ অনুরূপ ক্ষেত্রে গোবিন্দদাসকে বিদ্যাপতির চেয়েও সার্থকতর কবি বলে মানেন। "...গোবিন্দদাস সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা, গোষ্ঠিগত ঐতিহ্য-সমৃদ্ধি, ব্যক্তিগত প্রতিভা-চমৎকৃতি ও অনুভূতি-নিবিড়তার প্রভাবে তিনি বৈষ্ণবপদ-সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে গুরুর সিদ্ধিকেও হয়ত অতিক্রম করে যেতে পেরেছিলেন।" (ভূদেব চৌধুরী)। আরও একটি ক্ষেত্রে বিদ্যাপতির চেয়েও গোবিন্দদাসের কৃতিত্বকে উচ্চস্থান দিতে

বহিবঙ্গের প্রসাধন

বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস

হয়। গোবিন্দদাসের কাব্যে যে একটি অপূর্ব গীতি-মূর্ছনা লক্ষ্য করা যায়, তেমনটি বিদ্যাপতির ছন্দ-সুষমাযুক্ত পদেও পাওয়া যায় না। অতএব গোবিন্দদাসের এই সুরচেতনা বিদ্যাপতি থেকে লব্ধ নয়। তিনি এই গুণটি আয়ত্ত করেছিলেন সম্ভবতঃ জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' পাঠ করে। "বিদ্যাপতির নিকট গোবিন্দদাসের ঋণ ছন্দের জন্য, সুরের জন্য নয়। বিদ্যাপতির অনেক পদ বাহ্যরূপে অপেক্ষাকৃত ছন্দ-পরুষ—অথচ তাহাদের ভাবগৌরবের তুলনা নাই। সেখানে গোবিন্দদাস অনেক পিছনে। তথাপি গোবিন্দদাসের চূড়ান্ত প্রতিভা—অর্থাৎ সুর-প্রতিভার প্রশ্নে বিদ্যাপতির স্থান নিম্নেই।"

গীতি মূর্ছনা

[ছয়] অপরাপর কবিগণ

চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস বৈষ্ণব মহাজনদের মধ্যমণি। এঁদের বাইবে যাঁরা বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেছেন, তাঁদের সংখ্যা অগণিত। এঁদের মধ্যে অল্প কয়েকজনেব বচনায়ই কিছু কিছু উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়, অপর সকলের রচনা একান্তভাবেই গতানুগতিক। যে স্বল্প কয়েকজন কবির রচনায় বৈশিষ্ট্য বা উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়, পববর্তী আলোচনা তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

১. বলরামদাস ঃ যে কোন প্রধান বৈষ্ণবপদকর্তার আলোচনা-প্রসঙ্গে ইতঃপূর্বে আমরা একটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, তা পদকর্তার পরিচয়-সমস্যা। তাঁদের প্রত্যেকের নামেই একাধিক পদকর্তার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, আমাদের দুর্ভাগ্য যে প্রধানচতুষ্টয়ের বাইরেও আমবা এই সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পাই নি। প্রসঙ্গক্রমে বলরামদাসের কথাই উল্লেখ করা চলে। ডঃ সুকুমার সেনের ভাষায়, "বাঙ্গালা বৈষ্ণব গীতিকবিদের মধ্যে বলরামদাস অতি উচ্চস্থান অধিকার করেন। কিন্তু ইনি যে কোন বলরাম, কে তার সন্ধান দিবে।" 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী'র সম্পাদক মন্তব্য করেছেন, "বলরামদাস লইয়া সাহিত্যজগতে বিষম গোল। আমরা উনিশ জন বলরামের সন্ধান পাইয়াছি।" ডঃ সেন উনিশ জনকে কমিয়ে পাঁচজনে দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু তাতেও সমস্যা-সমাধানের কোন সূত্র পাওয়া যায় না। এঁদের মধ্যে কেউ ব্রজবুলিতে, কেউ আবার বাঙলা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করে গেছেন। তবে অনুমান হয়, এঁদের মধ্যে দোগাছিয়া গ্রামবাসী ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব বলরামদাসই সর্বপ্রাচীন এবং প্রধান। ইনি মহাপ্রভু নিত্যানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। অতএব, চৈতন্যলীলা-দর্শনে বঞ্চিত ছিলেন বলে আক্ষেপ করলেও, মনে হয়, ইনি চৈতন্যের জীবৎকালেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাঙলা বা ব্রজবুলি ভাষায় রচিত 'বলরামদাস'-ভণিতাযুক্ত অধিকাংশ পদ ইনিই রচনা করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। গোবিন্দদাস কবিরাজের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য এক বলরামদাস ব্রজবুলি ভাষায় উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেন। ইনি ছিলেন বুধরী গ্রামের অধিবাসী। বলরামদাস ভণিতাযুক্ত যে সকল ব্রজবুলি পদে ছন্দোবৈচিত্র্য ও অলঙ্কার-বাহুল্য লক্ষ্য করা যায়, হয়তো ইনিই ঐ পদগুলির রচয়িতা। নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবীদেবীর শিষ্য

পরিচয় সমস্যা

অপর কয়জন বলরাম

'প্রেমবিলাস' গ্রন্থের রচয়িতা বলরামদাস অবশ্য 'নিত্যানন্দদাস' ভণিতায় পদ রচনা করেছেন। বসু বলরাম এবং দীন বলরাম ভণিতাযুক্ত পদগুলি পৃথক ব্যক্তিদের দ্বারা রচিত হবার সম্ভাবনাই অধিক।

বলরামদাস-ভণিতাযুক্ত ব্রজবুলির পদগুলি ছন্দের ঝঙ্কারে এবং অলঙ্কার-বাহুল্যে শ্রুতিসুখকর বলে মনে হলেও কাব্যাংশে বাঙলা পদগুলিই উৎকৃষ্ট। এদের ভাষা সরল, ভাবও আন্তরিক। এই গুণে বলরামদাসের বাৎসল্যরসের পদগুলিকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করা চলে। অপর কবিগণ প্রধানত মধুর রসের উপাসক, প্রসঙ্গক্রমেই হয়তো তাঁদের কেউ কেউ বাৎসল্যরসের কয়েকটি পদ রচনা করে থাকবেন। কিন্তু বালগোপালের উপাসক বলরামদাস বাৎসল্যরসকেই আপন প্রতিভা-প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্রে বলে গ্রহণ করেছিলেন।

'শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে।'

পদটি কিংবা 'বলরাম, তুমি মোর গোপাল লৈয়া যাইছ'—

পদটিতে কৃষ্ণজননীর উদ্বেগ পরবর্তী কালের শাক্ত কবিদের পদে বর্ণিত উমা-জননীর উদ্বেগের সঙ্গেই মাত্র তুলিত হতে পারে। বলরামদাসের এই মানবিক আবেদন এবং সহজ জীবন-রস-প্রীতির জন্য পাঠকসাধারণ তাঁর রচনার সঙ্গে আপন হৃদয়টিকে সম্পর্ক-যুক্ত করতে পারে।

বলরামদাসের রূপানুরাগ এবং রসোদ্‌গারের পদগুলিতে মৌলিকতা না থাকলেও এদের অকৃত্রিম সরলতা এবং শুচিশুভ্র পরিবেশের জন্যই এগুলি বৈশিষ্ট্য দাবি করতে পারে।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে বলরামদাসের স্থান-সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কেউ কেউ তাঁকে প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করতে চান, কেউ বা তাঁর স্থান দান করেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে। কেউ বা এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অংশেই বলরামদাসের স্থান নির্দেশ করে থাকেন। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলরামের কাব্যের দোষগুণ বিচার করে বলেছেন, "ছন্দ অলঙ্কার, ভাষাভঙ্গিমা, কল্পনার অভিনবত্ব, চিত্রকল্পের সুবিহিত প্রয়োগ প্রভৃতি আলোচনা করলে তাঁহার এই পদগুলিতে বিশেষ কোন কবিত্ব ও নিপুণতা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তাহার কারণ তাঁহার পদে চমকপ্রদ শিল্পগুণের একান্ত অভাব আছে। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার পদে প্রত্যক্ষ শিল্পায়ন অপেক্ষা ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত একটু বেশি। এইজন্য যাঁহারা বৈষ্ণব পদে ছন্দ ও অলঙ্কারের কারুকর্ম দেখিতে অভ্যস্ত, তাঁহারা বলরামের এই সমস্ত জলবৎ তরল পদগুলিতে উক্ত স্বাদ পাইবেন না।"

বলরামের কবিতায় বৈষ্ণব অলঙ্কার শাস্ত্রে রাধাভাবের যত বৈচিত্র্যের কথা বলা হয়েছে, তাদের সব কটির নিদর্শন খুঁজে পাওয়া গেলেও তাঁর প্রকৃত কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার চিত্র-অঙ্কনেই। বস্তুতঃ বাৎসল্যরসের রূপায়ণে তার তুল্য কৃতিত্বের পরিচয় খুব অল্প বৈষ্ণব কবিই দিতে পেরেছেন—বালক কৃষ্ণের সেই নৃত্যপর রূপটি—

বাৎসল্যরস

'খাইতে খাইতে নাচে কটিতে কিঙ্কিণী বাজে
হেরি হরষিত ভেল মায়।'

— বহু বাঙালী প্রাঙ্গণে এখনো বিদ্যমান।

২. রায়শেখর ঃ মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে কবিদের ব্যক্তিগত পরিচয় নিয়ে আমাদের বারবার নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষতঃ বৈষ্ণব কবিদের অনেকেই পৈতৃক নামের পরিবর্তে কখনো দীক্ষিত জীবনের নাম কখনো বা ছদ্মনাম গ্রহণ করে থাকেন। আবার একই কবি বহু বিভিন্ন নাম বা উপনাম বা পদবী ব্যবহার করেন। ফলে কাব্যবিচারে পাঠক-সমালোচককে অনেক সময়ই সংশয়ের মুখে দাঁড়াতে হয়। বৈষ্ণব কাব্যালোচনার ক্ষেত্রে এরূপ একটি নাম 'রায়শেখর'। অথচ 'শেখর' এবং 'কবিশেখর' ভণিতারও অন্ত নেই। এখন প্রথম প্রশ্ন—এই তিনটি নামই কি একই ব্যক্তির ? যদি এক ব্যক্তির হয়ে থাকে, তবে দ্বিতীয় প্রশ্ন কবির নাম কি 'শেখর' এবং 'কবি' তাঁর পরিচয়ও 'রায়' পদবী? এ প্রশ্নের জবাব পাবার কোন উপায় নেই। তবে 'কবিশেখর' তাঁর আত্মপরিচয় দান প্রসঙ্গে বলেছেন—

সিংহ বংশে জন্ম নাম দৈবকীনন্দন।
শ্রীকবিশেখর নাম দিল সর্বজন।।
বাপ শ্রীচতুর্ভুজ মা হীরাবতী।
কৃষ্ণ যার প্রাণধন কুলশীল জাতি।।

এ থেকে জানা যায় যে কবিশেখরের প্রকৃত নাম ছিল দৈবকীনন্দন, কিন্তু এতে মূল সমস্যার সমাধান হলো না—ইনিই 'শেখর' এবং 'রায়শেখর' নামে পদরচনা করেছেন কিনা, তা জানা গেল না। কবিশেখরের বিবৃতি থেকে জানা যায় যে তিনি লৌকিক ভাষা অর্থাৎ বাঙলায় 'গোপালের কীর্তনামৃত' নামে দু'খানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ সংস্কৃত ভাষায় 'গোপালবিজয়' এবং 'গোপীনাথবিজয়' নামে দু'খানা গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। শেখর-সমস্যা-বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "ভাব ও রচনারীতির দিক দিয়া বিচার করিলে কবিশেখর শেখর ভণিতার পদগুলিকে অন্ততঃ তিনজন পৃথক কবির রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতেই হয়। একজন কবিশেখর, ষোড়শ শতাব্দের শেষার্ধের কবি এবং ভালো পদাবলী-রচয়িতা। আর একজন ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দের সন্ধিকালের কবি। ইহাকেই আমরা গোপাল-বিজয়ের কবি বলিয়া আপাতত গ্রহণ করিব। আর একজন, কবিশেখর রায় (রায়শেখর), সপ্তদশ শতাব্দের মধ্যভাগের কবি। ইনি শ্রীখণ্ডের শিষ্য হইতে পারেন। তবে শেষ দুইজন এক ব্যক্তি হওয়াও সম্ভব।" বস্তুতঃ এই সম্ভাবনার ক্ষেত্র থেকে প্রকৃত সত্য উদ্ধার প্রায় অসম্ভব। বৈষ্ণবকুলতিলক হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' গ্রন্থে কবিশেখর, রায়শেখর ও শেখর ভণিতাযুক্ত সকল পদই একই সঙ্গে মুদ্রিত হয়েছে—অতএব এখানে এঁদের পৃথক্ অস্তিত্ব অস্বীকৃত। এ বিষয়ে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও দ্বিধায় পড়েছেন। তিনি একবার বলেছেন, তিনি বৈচিত্র্য-প্রয়াসী হয়ে নিজ নামকে নানাভাবে ব্যবহার করতেন। যেমন—রায়শেখর, কবিশেখর রায়, কবিশেখর, শেখর কবি, শেখর রায় ইত্যাদি। শেখর ভণিতাযুক্ত আরও কবি ছিলেন। এরপরই আবার তিনি স্বীকার করেছেন— "আবার ওদিকে স্বয়ং বিদ্যাপতির ভণিতাতেও 'কবিশেখর' ভণিতা আছে। সুতরাং শেখর, রায়শেখর, কবিশেখর এই তিনজন পৃথক কবি হবেন অনুমান।"

যাহোক নানাবিধ ভণিতাযুক্ত শেখরের পদগুলি বিশ্লেষণ করলে তাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট এবং সাধারণ ধরনের অনেক পদই পাওয়া যায়। এই পদগুলির মধ্যে যেমন বাঙলা এবং ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদ পাওয়া যায়, তেমনি চটুল ধামালি ছন্দে রচিত কিছু পদও রয়েছে। ব্রজবুলি ভাষায় রচিত শেখরের কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদ বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত রয়েছে—এ থেকেই শেখরের পদাবলীর উৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায়—

'এ সখি হামারি দুখক নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ্ ভাদর
শূন মন্দির মোর ॥'

—পদটি বিদ্যাপতির রচনারূপেই বহুল প্রচারিত হলেও প্রাচীন ও প্রামাণিক পুথিতে এটিকে শেখরের পদ বলেই উল্লেখ করা হয়েছে।

'গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী চমকই।
কুলিশ-পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই।'

—শ্রীরাধার অভিসারের এই অপূর্ব সুন্দর পদটিও রায়শেখর-বিরচিত এবং তাঁর কবিপ্রতিভার যথার্থ পরিচায়ক। বিভিন্ন প্রকৃতি-পরিচয়ে বিশেষতঃ বর্ষাপ্রকৃতির চিত্রাঙ্কনে কবির কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ। ডঃ সুকুমার সেনও রায়শেখরের কবিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছেন, "ব্রজবুলি কবিতা-রচনার দক্ষতায় গোবিন্দদাসের পরই কবিরঞ্জন এবং রায়শেখরের নাম করিতে হয়।"

শেখর বহু বিভিন্ন বিষয়ের পদ রচনাতেই কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তাঁর রচনার মধ্যে আছে—গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ, পূর্বরাগ, অভিসার, রসোদ্গার, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, মান, আক্ষেপানুরাগ, সম্ভোগ, বিরহ প্রভৃতি। আবার এ ছাড়াও আছে—গোষ্ঠলীলা, দানলীলা, নৌকাবিলাস, বাল্যলীলা ও বাৎসল্যরসের পদ। জনৈক সমালোচকের মতে "বৈষ্ণব জগতে তিনি 'সাহসিক কবি', তাঁহার বিদ্যা এবং বৈদগ্ধ্য যেমন প্রচলিত কাব্যরীতির রসসৌন্দর্য যথাসম্ভব নিষ্কাশন করিতে উৎসাহিত করিয়াছে, তেমনি এমন একটি স্বাধীনচিত্ততা দিয়াছে, যাহা প্রথানুগত্যের মত প্রথা পরিহারেও বিশ্বাস করে। শেখরে উভয় অবস্থাই দৃষ্ট হয়।"

৩. লোচনদাস ঃ 'চৈতন্যমঙ্গল'-নামক চৈতন্যজীবনী গ্রন্থের রচয়িতা লোচনদাস কিছু কিছু পদও রচনা করে গিয়েছেন। লোচনদাস নরহরিদাসের শিষ্য। নরহরিদাস 'গৌরনাগরী' ভাবের প্রবর্তক ছিলেন। শিষ্যও গুরুর অনুসরণ করেছেন। 'চৈতন্যমঙ্গল'-আলোচনা-প্রসঙ্গে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। লোচনদাসের পদাবলীতেও এই গৌরনাগরী ভাবের পরিচয় বর্তমান। তিনি এই বিশেষ ভাবকে প্রকাশ করবার জন্য পদাবলী রচনার ক্ষেত্রে একটা বিশেষ রীতিরও অনুসরণ করেছিলেন —এই রীতিটিকে 'ধামালী' সংগীত বলা

হয়। আচার্য সুকুমার সেন বলেন, "স্পষ্ট শ্বাসাঘাতযুক্ত ছড়ার ধরনের নাচনি ত্রিপদী ছন্দে লেখা পদ 'ঢামালী' বা 'ধামালী' নামে পরিচিত । বস্তুতঃ সমগ্র প্রাগাধুনিক বাঙলা সাহিত্যে তাঁর পূর্বে আর কেউ এমন সচেতনভাবে ছন্দোবৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াস পান নি। তার পরেও মাত্র রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র একটি মাত্র পদে এ জাতীয় ছন্দ (এ কালের পরিভাষায় স্বরবৃত্ত দলবৃত্ত) ব্যবহার করেছেন। লক্ষণীয় এই, উভয়েই নারীর মুখেই এই ভাষা ব্যবহার করেছেন। এব ছন্দে যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাই পরবর্তী কালের বাঙলা কবিতায় ছড়ার ছন্দে পরিণত হয়েছে। যা হোক, এই ধামালী ছন্দে লোচনদাসের গৌরনাগরী-ভাবের প্রকাশ সুস্পষ্টই হয়েছে ঃ

'আমার প্রাণ ছম ছম করে সখি মন ছম ছম করে।
আধ কপাইলা মাথার বিষে রইতে নারি ঘরে।।
লোচন বলে কান্‌চিস্ কেনে ঢোক আপনার ঘর।
হিয়ার মাঝে প্রাণ ডুবাইয়া গোরাচান্দে ধর।।'

অবশ্য লোচনদাসেব সবগুলি পদই এইরূপ ধামালী ছন্দে রচিত, তা নয়; তিনি গতানুগতিক পয়াব-ত্রিপদী ছন্দেও আপনার মনোভাব-প্রকাশে সার্থকতা লাভ করেছেন।

'অমিয়া মথিয়া কেবা নবনী তুলিল গো,
তাহাতে গড়িল গোরাদেহ।
জগৎ ছানিয়া কেবা রস নিঙ্গাড়িল গো
এক কৈল সুধার সুলেহ।।'

এই গৌরচন্দ্রিকার পদটিতে লোচনের কবিত্বশক্তির সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। লোচনদাস যে উৎকৃষ্ট কবিপ্রতিভার অধিকাবী ছিলেন, তার একটি বিশেষ প্রমাণ এই যে তাঁর রচিত কয়েকটি পদ চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত রয়েছে। এদের মধ্যে নিম্নোক্ত পদটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

'চলে নীল সাড়ি নিঙারি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর।
সেই হৈতে মোর হিয়া নহে থির মনমথ জ্বরে ভোর।।'

৪. **অনন্তদাস ঃ** অনন্ত নামে দু'জনই ছিলেন অদ্বৈতাচার্যের শিষ্য—একজন অনন্তদাস, অপরজন অনন্ত আচার্য। অনন্তদাস রচিত অন্তত একুশটি ব্রজবুলি পদের সন্ধান পাওয়া যায়। মনে হয়, ইনি শুধু ব্রজবুলিতেই পদ রচনা করেছিলেন। এঁর রচিত রূপানুরাগ এবং অভিসারের পদগুলি উৎকৃষ্ট।

'বিকচ সরোজ ভান মুখমণ্ডল,
দিঠি ভঙ্গিম নট-খঞ্জন জোর।
কিয়ে মৃদু মাধুরি হাস উগারই
পীপী আনন্দে আঁখি পড়লহি ভোর।।'

এই পদটি এবং

'ধনি ধনি বনি অভিসারে।
সঙ্গিনী রঙ্গিনী প্রেম-তরঙ্গিনী
সাজলি শ্যাম-বিহারে।।'

—পদটি অনন্তদাসের উল্লেখযোগ্য রচনা।

৫. নরোত্তমদাস ঠাকুর ঃ বাঙলাদেশে যে কয়জন ভক্ত বৈষ্ণব সাধক ও কবির প্রচেষ্টায় বৈষ্ণব ধর্মের তথা ভক্তিভাবের প্রবাহ দেখা দিয়েছিল, তাঁদের মধ্যে নরোত্তমদাস অন্যতম। নরোত্তমদাস রাজশাহী জেলার খেতরীর রাজবংশের সন্তান। ১৫৪০ খ্রীঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক সম্পত্তি জ্ঞাতিভ্রাতার হস্তে সমর্পণ করে ইনি বৃন্দাবনধামে গমন করেন; তথায় শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করে শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্যামানন্দ সেনের সহযোগিতায় বাঙলাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। ইনি খেতরীতে ষড়বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষ্যে যে মহোৎসবের ব্যবস্থা করেন তা থেকেই বাঙলাদেশে প্রথম কীর্তনের সূত্রপাত। আর এই কীর্তন-প্রসঙ্গেই পদাবলী-সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও প্রসার। নরোত্তমদাস ঠাকুর একদিকে যেমন পদকর্তা ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি বৈষ্ণব ধর্ম ও সাধনভজন-সম্বন্ধীয় তত্ত্বেরও ব্যাখ্যাতা ছিলেন। তাঁর রচিত 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'য় বৈষ্ণব সাধন-পদ্ধতি-সম্বন্ধে কতকগুলি মূল তত্ত্বকথা অতি সহজ সরল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। রচনায় কবির দুর্লভ কবিত্বশক্তির প্রকাশ ঘটেছে। এই গ্রন্থটিতে একশত উনিশটি ত্রিপদী শ্লোক স্থান পেয়েছে। নরোত্তমদাসের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে প্রার্থনাসূচক পদগুলিতে। এই প্রার্থনার পদগুলি কেবল যে বৈষ্ণব সাধকদেরই অন্তর স্পর্শ করে থাকে তা নয়, এগুলির এমন একটি সার্বজনীন আবেদন আছে, যার ফলে সাধারণ পাঠকও বিমুগ্ধ চিত্তে পদগুলি আবৃত্তি করে থাকে।

'গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর।।
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে।।'

নরোত্তমদাসের এই ধরনের পদগুলিতে ভক্ত হৃদয়ের আর্তি এবং আন্তরিকতা সুস্পষ্টরূপেই ধরা পড়ে।

৬. গোবিন্দদাস চক্রবর্তী ঃ গোবিন্দদাস কবিরাজের মত গোবিন্দদাস চক্রবর্তীও ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। ইনি বোরাকুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গোবিন্দদাস চক্রবর্তী বাঙলা পদ-রচনাতেই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তবে মনে হয়, তিনি কিছু কিছু ব্রজবুলি পদও রচনা করে থাকতে পারেন। ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন যে, "'গোবিন্দদাস' এবং 'গোবিন্দদাসিয়া' ভণিতাযুক্ত বাঙ্গালা পদগুলি প্রায় সবই চক্রবর্তীর লেখা বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। তবে এরূপ কতকগুলি পদ গোবিন্দ আচার্যের রচনা হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।"

'শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজবিহারী।
যদি মন্দিরে রাখি তোমারে হেরি।।'

এই পদটিতে কবির যে দীন আর্তি ফুটে উঠেছে, তাতে এটিকে একটি উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব কবিতা বলে অভিহিত করতে হয়।

৭. কবিরঞ্জন ঃ শ্রীখণ্ডের অধিবাসী কবিরঞ্জন বাঙলা এবং ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করে গেছেন। কবিরঞ্জন 'বিদ্যাপতি' উপাধিধারী ছিলেন এবং 'বিদ্যাপতি' ভণিতায় পদ রচনা করেছেন। ফলত, তাঁর অনেক রচনাই বিদ্যাপতির রচনার সঙ্গে মিশে গেছে। যে সকল বাঙলা পদে 'বিদ্যাপতি' ভণিতা পাওয়া যায়, তা নিঃসংশয়ে কবিরঞ্জনের রচনা। কবিরঞ্জন 'ছোট বিদ্যাপতি' নামেও প্রসিদ্ধ। কথিত হয় যে, তাঁর সঙ্গে চণ্ডীদাসের মিলন ঘটেছিল। হয়তো বা এই 'বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস' - মিলনকাহিনী ভ্রমক্রমে আদি বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের মিলনের প্রবাদ সৃষ্টি করে থাকতে পারে। ব্রজবুলি পদ-রচনায় বাঙলা সাহিত্যে গোবিন্দদাসের পরই এঁর স্থান। কবিরঞ্জনের একটি পদে হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের উল্লেখ পাওয়া যায়।

'বিদ্যাপতি ভানি
অশেষ অনুমানি
সুলতান শাহ্ নসির মধুপ ভুলে কমলা বাণী।।'

ব্রজবুলি ভাষায় রচিত তাঁর পদগুলি উৎকর্ষ-গুণে পরবর্তী কালে এমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে, বিদ্যপতি-নামে পরিচিত অনেক শ্রেষ্ঠ পদের রচয়িতা রূপে যদি একসময় কবিরঞ্জনকেই চিহ্নিত করা হয়, তাহলেও বিস্মিত হবার কারণ থাকবে না।

[সাত] পরবর্তী কবি ও কাব্য সংকলন

পরবর্তীকালে অর্থাৎ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহু কবিই কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ রচনা করে গেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এঁদের কেউই উৎকৃষ্ট কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না। অতএব এঁদের মধ্যে যাঁরা অন্তত যুগের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন, তেমন দুই একজনের কথা-মাত্র উল্লেখ করা হ'লো। অপর, এ যুগে কয়েকটি পদসঙ্কলন গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, এগুলিই বরং আমাদের কালে অতিশয় উপযোগী বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। আলোচ্য অধ্যায়ে এদেরও কিছুটা পরিচয় দান করা হচ্ছে।

১. জগদানন্দ ঃ শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের বংশধর জগদানন্দ সপ্তদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। জগদানন্দ বাঙলা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করে গিয়েছেন। তাঁর বাঙলা ভাষায় রচিত পদে সুন্দর চিত্রগীতের সন্ধান পাওয়া যায়। অবশ্য এই গীতগুলি অপর কোন জগদানন্দের হওয়া বিচিত্র নয়—

'শুনগো মরম সই মর্মকথা তোরে কই
সাঁঝের বেলা গিয়াছিলাম জলে;
নন্দের নন্দন কানু করে লইয়া মোহন বেণু
দাঁড়াইয়াছিল কদমতলে ।।'

জগদানন্দ-রচিত ব্রজবুলির পদগুলি ধ্বনিমাধুর্যে ও শব্দচিত্র-রচনায় শ্রেষ্ঠ কবিদের কীর্তির সমকক্ষতা দাবী করতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অর্থগৌরবে এগুলি সাধারণের উপর উঠতে পারে নি। জগদানন্দ ছিলেন শব্দপণ্ডিত, তিনি 'ভাষাশব্দার্ণব' নামে একখানি শব্দকোষও রচনা করতে আরম্ভ করেছিলেন। জগদানন্দ-রচিত নিম্নোক্ত ব্রজবুলি পদটি অনুপ্রাস-বাহুল্যের জন্য বাঙলা সাহিত্যে বিশিষ্টতা লাভ করেছে।

'মঞ্জু বিকচ কুসুম-পুঞ্জ মধুপ-শবদ গুঞ্জ গুঞ্জ
কুঞ্জরগতি গঞ্জি গমন মঞ্জুল কুলনারী।
ঘন গঞ্জন চিকুরপুঞ্জ মালতী ফুলমালে রঞ্জ
অঞ্জনযুত কঞ্জনয়নী খঞ্জন গতি হারি।।'

২. নরহরি চক্রবর্তী-ঘনশ্যাম দাস : নরহরি চক্রবর্তী সপ্তদশ শতকের শেষপাদে অথবা পরবর্তী শতকের প্রথম পাদে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমিত হয়। তিনি আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে তাঁর পিতা জগন্নাথ ছিলেন বিখ্যাত বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য। নরহরি চক্রবর্তী দুই নামেই পদ রচনা করেছেন, নবহরি দাস এবং ঘনশ্যাম দাস। তিনি নিজেই বলেছেন—

'না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম।
নরহরি দাস আর দাস ঘনশ্যাম।।'

নরহরি চক্রবর্তী বিস্তর পদ রচনা ছাড়াও দুখানি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, একখানা 'ভক্তিরত্নাকর'—এটি বৈষ্ণব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, অপরখানা 'নরোত্তমবিলাস'। নরহরি চক্রবর্তীর ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদগুলি ছন্দের ঝঙ্কারে যেমন বিশিষ্টতা লাভ করেছে, কবিত্বের দিক থেকেও তেমনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে।

'দেবরমণী-বৃন্দ বিরচি বেশ বিবিধ-ভাঁতি।
রাজত থল-মাহি অতুল ঝলকে কনককাঁতি।।
ভ্রমত গগন পথ অগণন যূথ হিয় উৎসাহ।
মানত দিঠি সফল নিরখি গৌরবর-বিবাহ।।'

৩. মুসলমান কবিগণ : বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণলীলা অথবা চৈতন্যলীলাই বর্ণিতব্য বিষয়; অতএব একে ধর্মীয় তথা সাম্প্রদায়িক সাহিত্য বললে অত্যুক্তি হয় না। অথচ বিস্ময়ের বিষয়, সম্ভবতঃ শতাধিক মুসলমান কবিও এ জাতীয় পদ রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। সুফী মতের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের সাদৃশ্য-দর্শনে কবিগণ যেমন পদ রচনায় আগ্রহবোধ করে থাকতে পারেন, তেমনি আবার সম্পূর্ণ নিরাসক্তভাবেই তাঁরা গতানুগতিক

রীতির অনুসরণ করেছেন মাত্র, এও হ'তে পারে। এঁদের মধ্যে কেউ যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন নি, তাও আবার বলা চলে না। সৈয়দ মর্তুজার একটি পদে—

'মোরে করহ দয়া দেহ পদছায়া
শুন শুন পরাণ কানু।
কুলশীল সব ভাসাইনু জলে
না জীয়ত তুয়া বিনু।।'

এই যে আকৃতি, তা রাধার হলেও যে কবির মনকে একেবারেই স্পর্শ করেনি, তেমন কথা বলতে পারি নে। কবিদের মধ্যে কেউ কেউ ব্রজবুলিতেও পদ রচনা করেছেন। নসির মামুদের একটি ব্রজবুলি পদের ভণিতা এরূপ ঃ

'আগম নিগম বেদসার
লীলায় করত গোঠবিহার
নসির মামুদ করত আশা
চরণে শরণ-দান রি।।'

এই পদটি একান্তভাবে বৈষ্ণবভাবাপন্ন। এতে একদিকে যেমন শব্দঝংকার এবং অলঙ্কারনৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি ধ্যানতন্ময় কবির আন্তরিকতার সুরটিও অগোচর থাকে নি। 'পদ্মাবতী' কাব্যের কবি আলাওলও কিছু কিছু পদ রচনা করেছিলেন। তাঁর অঙ্কিত চিত্রে রাধিকা এক পল্লীবালিকার রূপ ধারণ করেছেন—

প্রত্যুষ বিহানে কমল দেখিয়া পুষ্প তুলিবারে গেলুম।
বেলা উদানে কমল মুদনে ভ্রমর দংশনে মৈলুম।।
কমল কণ্টকে বিষম সঙ্কটে করের কঙ্কণ গেল।
কঙ্কণ হেরিতে ডুব দিতে দিতে দিন অবশেষ ভেল।।'

আলীরাজাও একজন বিখ্যাত পদকর্তা ছিলেন। এঁরা ছাড়া সেখলাল, চাঁদকাজী, লালমামুদ, কবীর প্রভৃতি বহু মুসলমান কবিই পদরচনা করে গিয়েছেন।

"বাংলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি" গ্রন্থে যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ১০২ জন মুসলমান পদকর্তার সন্ধান দান করেছেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্ব এবং রাধাকৃষ্ণের শাশ্বত লীলার মানবিক ভাবটিই মুসলমান কবিদের পদ রচনায় আকৃষ্ট করেছে, এ ছাড়া মুসলমান কবিদের পদরচনার পশ্চাতে অপর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে শ্রীভট্টাচার্য বলেন ঃ "এই শ্রেণীর মুসলমানরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী, গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীকে প্রয়শঃ স্বীকার করেন নাই। স্বীকার করিয়াছেন—প্রেমিক-প্রেমিকার মূর্ত প্রতীক রাধাকৃষ্ণকে। ইঁহারা কৃষ্ণ বলিতে গীতার কৃষ্ণকে জানেন না, জানেন রাধারবন্ধু কৃষ্ণকে। এই রাধাকৃষ্ণ আবার অধিকাংশ মুসলমান কবিদের নিকট অপৌরুষেয়। ইঁহারা বৃষভানুনন্দিনী বা যশোদানন্দন নহেন। 'কানু ছাড়া গীত নাই, কানু ছাড়া উপমা নাই'—প্রভৃতি প্রবাদের দ্বারা যে প্রেমিক কানুর কথা বলা হইয়াছে, প্রেমের কথা বলিতে যাইয়া সেই কানুর নাম মুসলমান কবিরাও গ্রহণ করিয়াছেন।"

৪. ক্ষণদাগীতচিন্তামণি ঃ 'গীতচিন্তামণি' বা 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' নামক সঙ্কলনগ্রন্থটিই প্রাচীনতম পদসংগ্রহ। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সম্ভবত ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছকাছি কোন সময়ে গ্রন্থটির সঙ্কলন কার্য আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা শেষ করে যেতে পারেন নি। এতে ৪৫ জন কবির রচিত তিনশতাধিক পদ সঙ্কলিত হয়েছে। কবি গ্রন্থটিকে কয়েকটি ক্ষণদায় বিভক্ত করে এক একটিতে এক এক বিষয়ের কবিতার স্থান দান করেছেন। এতে হরিবল্লভ ভণিতায় কবি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী নিজেও কিছু পদ রচনা করে গিয়েছেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, গ্রন্থটির অসম্পূর্ণ খণ্ডে চণ্ডীদাসের কোন পদ বিধৃত হয় নি।

৫. গীতচন্দ্রোদয় ঃ পদকর্তা এবং গ্রন্থকার নরহরি চক্রবর্তী 'গীতচন্দ্রোদয়' নামে যে সঙ্কলন গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তা খণ্ডিত আকারে পাওয়া গিয়েছে। গ্রন্থটি আটটি অংশে বিভক্ত। এতে ১৮৮৬টি পদ পাওয়া যায়।

৬. পদকল্পতরু ঃ বৈষ্ণব পদসংগ্রহের ইতিহাসে 'পদকল্পতরু'র স্থান অতিশয় ঊর্ধ্বে। গ্রন্থটির মূল নাম 'গীতকল্পতরু'—গায়কদের মুখে মুখে এটি 'পদকল্পতরু'তে রূপান্তরিত হয়েছে। গ্রন্থকার গোকুলানন্দ সেন, কিন্তু ইনি বৈষ্ণব দাস নামেই অধিকতর পরিচিত। এঁর বাসস্থান টেঞা-বৈদ্যপুর গ্রাম। 'পদকল্পতরু' চারি শাখায় বিভক্ত। প্রতি শাখা আবার কতকগুলি পল্লবে বিভক্ত। এতে একশত ত্রিশজন কবির তিন সহস্রেরও অধিক পদ সঙ্কলিত হয়েছে। পদগুলিকে রস-অনুযায়ী সাজাতে গিয়ে বৈষ্ণবদাস রসসাহিত্য-সম্বন্ধে অতিশয় মনোজ্ঞ অথচ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করেছেন। গ্রন্থটির গুরুত্ব অনুধাবন করে ডঃ সেন একে বৈষ্ণব পদাবলীর ঋগ্বেদ সংহিতার গৌরব দান করেছেন।

অধ্যায় ঃ পনেরো

বৈষ্ণব তত্ত্ব সাহিত্য

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই বাঙলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মের বহুল প্রচলন থাকলেও চৈতন্যদেবের প্রভাবে তা' একটা বিশেষ রূপ লাভ করে। চৈতন্য-প্রবর্তিত এই বিশেষ ধর্মমতটিকে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম' বলে অভিহিত করা হয়। চৈতন্যদেব নিজে প্রধানত নামধর্ম প্রচার করেছিলেন; তিনি বৈষ্ণব ধর্ম বা দর্শন-সম্বন্ধে কিছু লিখে গিয়েছেন বল জানা যায় না — অবশ্য এই প্রসঙ্গে তাঁর রচিত 'উপদেশাষ্টক'-এর কথা আসে না। কিন্তু চৈতন্যদেব যে বিরাট ভক্তগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছিলেন, আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁদের নিকট অনেক তত্ত্বকথা বলে থাকতে পারেন। সে যা' হউক, চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর বাঙলাদেশে অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-আদি-প্রচারিত যে বৈষ্ণব ধর্মের প্লাবন বয়ে গিয়েছিল, তাকে একটা আন্দোলন-মাত্র বলা চলে; তার পেছনে কোন দর্শন বা তত্ত্ব তাঁরা দাঁড় করাতে পারেন নি। পক্ষান্তরে চৈতন্যদেব বৃন্দাবনধামের উজ্জীবন ঘটিয়ে তথায় যে ভক্তগোষ্ঠীকে স্থাপন করেছিলেন, তাঁর কোন আন্দোলনে মত্ত না হয়ে বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শনের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক দিকটা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। বৃন্দাবনে ষড়্‌গোস্বামীদের দান বাঙলার বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে তাই অসাধারণ। রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, জীব গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও গোপাল ভট্ট—এই ষড়্‌গোস্বামীদের কেউ কেউ সাধন-ভজনে মত্ত থাকলেও অন্তত প্রথম তিনজন যে বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনকে একটা বিশিষ্ট তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এঁরা ছাড়া আর একজনের তাত্ত্বিকের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য—ইনি স্বরূপ দামোদর। রূপ গোস্বামী বৈষ্ণব সাহিত্যরসতত্ত্ব, সনাতন গোস্বামী ভাগবতের ব্যাখ্যা এবং জীব গোস্বামী দর্শনের আলোচনা দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছিলেন। গোপাল ভট্টের পরিচয়-সম্বন্ধে মতান্তরের অবকাশ থাকলেও তিনি বৈষ্ণব-স্মৃতি রচনা করে উপযুক্ত সম্প্রদায়ের আচারানুষ্ঠানাদির মধ্যে একটা সংহতি স্থাপন করেছিলেন। বস্তুত, সমসাময়িক কালে বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামীরা বাঙলাদেশের প্রবল আন্দোলন থেকে দূরে থেকে সুস্থচিত্তে সদ্যকথিত মহৎকর্মে প্রবৃত্ত না হলে বাঙলার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম সহজ-সাধন-পদ্ধতির মধ্য দিয়ে ন্যাড়া-নেড়ীর কাণ্ডে পরিণত হ'ত কিনা কে জানে?

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম

১. বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামী ঃ প্রাচীনতর চৈতন্যজীবনগুলিতে শুধু রূপ গোস্বামী এবং সনাতম গোস্বামীর উল্লেখ পাওয়া গেলেও কবিরাজ কৃষ্ণদাসের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে এবং তারও পূর্বে শ্রীনিবাসের রচনায় স্পষ্টতঃ ষড়্‌গোস্বামীর নাম এবং এই শব্দটিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

'শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ।।
এই ছয়গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।
ইহা সবার পদ আগে করি নমস্কার।।'

এই ষড়্‌গোস্বামীর মধ্যে একমাত্র শ্রীজীব গোস্বামীই সম্ভবতঃ প্রত্যক্ষভাবে চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পান নি। এ ছাড়া প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে চৈতন্যদেবের অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয়েছিলেন এবং মহাপ্রভুর নির্দেশেই তাঁরা বৃন্দাবনে উপনীত হয়েছিলেন এবং মহাপ্রভুর নির্দেশেই তাঁরা বৃন্দাবনে উপনীত হ'য়েছিলেন। এঁদের মধ্যে রূপ এবং সনাতন এক পরিবারভুক্ত দুই ভাই—শ্রীজীব এঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র; রূপ-সনাতনের প্রপিতমহ কর্ণাট থেকে এদেশে এসে বসবাস করেন। গোপাল ভট্ট ছিলেন দক্ষিণ ভারতীয়; রঘুনাথ ভট্ট কাশীপ্রবাসী বাঙালী এবং রঘুনাথ দাস সর্বার্থেই বাঙালী ছিলেন। রঘুনাথ দাস ব্যতীত অপর সকলেই ব্রাহ্মণ—রঘুনাথ দাস কায়স্থ বংশীয় হ'য়েও স্বীয় কৃতিত্বের বলে বৈষ্ণব সমাজে আচার্যভাবে বৃত হ'য়েছিলেন।

ক. রূপ গোস্বামী ঃ রূপ গোস্বামী ছিলেন সুলতান হোসেন শাহের একজন উচপদস্থ কর্মচারী 'দবিরখাস'। তিনি চৈতন্যদেবের ভক্তিধর্মে আকৃষ্ট হ'য়ে রাজকার্য ত্যাগ করে চৈতন্যদেবের শরণ গ্রহণ করেন এবং চৈতন্যদেবের নির্দেশে বৃন্দাবনে বসবাস করতে থাকেন। গুরুর আদেশেই তিনি তীর্থ উদ্ধার এবং বৈষ্ণব গ্রন্থ উদ্ধার ও রচনায় ব্যাপৃত থেকে নানা বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে— ধর্মতত্ত্ববিষয়ে 'সংক্ষিপ্ত ভাগবতামৃত', কাব্য 'হংসদূত', 'উদ্ধবসন্দেশ', 'স্তবমালা', নাটক 'বিদগ্ধমাধব', 'ললিতমাধব', 'দানকেলিকৌমুদী', কাব্যমালা 'পদাবলী', অলঙ্কারশাস্ত্র ও রসতত্ত্ব 'উজ্জ্বলনীলমণি' ও 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' এবং নাট্যতত্ত্ব বিষয়ে 'নাটকচন্দ্রিকা'।

রূপ গোস্বামীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'উজ্জ্বলনীলমণি' এবং 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' নামক রসশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ দু'খানি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা, মধুর রসে শ্রীকৃষ্ণের নায়ক-শ্রেষ্ঠত্ব, রাধিকার নায়িকা-শ্রেষ্ঠত্ব এবং রাধাকৃষ্ণ উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। 'সখীসাধনা' তথা 'মঞ্জরীভাবে'র সাধনার রীতিও তিনিই প্রবর্তন করেন। রূপ গোস্বামীর কৃতিত্ব-বিষয়ে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''রূপ গোস্বামীর মনীষা, ভূয়োদর্শন, মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রখর জ্ঞান, রসতত্ত্ব, ভক্তিশাস্ত্র ও কাব্যপ্রকরণে যে কিরূপ

অধিকার ছিল তাহা এই দুইখানি গ্রন্থ হইতেই জানা যাইবে। ... 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র ভক্তিরস এবং 'উজ্জ্বলনীলমণি'র বৈষ্ণব মতানুবর্তী অলঙ্কারতত্ত্ব ও কাব্যাদর্শ শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের নহে, ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রেও একটি সার্থক সংযোজন।'

খ. সনাতন গোস্বামী ঃ সনাতন ছিলেন রূপ গোস্বামীর অগ্রজ এবং সুলতান হোসেন শাহের 'সাকর মল্লিক'। ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগ্রহ লাভের জন্য সুলতানের কর্মত্যাগ করেন; এর জন্য অবশ্য তাঁকে কারাবরণও করতে হয়েছিল। যা হোক, তিনিও রূপের মতোই অনুরূপ উদ্দেশ্যে বৃন্দাবনে প্রেরিত হয়েছিলেন। সনাতন যে চৈতন্যমহাপ্রভুর নিকটই বৈষ্ণবতত্ত্বের শিক্ষা, আদর্শ ও প্রেরণা লাভ করেছিলেন সে কথা তিনি 'বৃহদ্‌ভাগবতামৃত' গ্রন্থে এবং 'দিগ্‌দর্শনী' টীকায় উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়াও 'বৈষ্ণবতোষণী' নামক ভাগবতের দশমস্কন্ধের টীকা তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা।

গ. শ্রীজীব গোস্বামী ঃ শ্রীজীব ছিলেন রূপ-সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপম বা বল্লভের পুত্র। ইনি নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর নির্দেশে বিভিন্ন শাস্ত্র পাঠ গ্রহণ করে অবশেষে বৃন্দাবনধামে জ্যেষ্ঠতাতদের সকাশে উপনীত হন এবং রূপ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীজীব বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এদের মধ্যে হচ্ছে — 'গোপালচম্পু, সঙ্কল্প কল্পদ্রুম, মাধবমহোৎসব ও গোপালবিরুদাবলী' নামক কাব্যগ্রন্থ, 'লোচন রোচনী, দুর্গমসঙ্গমনি, রসামৃতশেষ, হরিনামামৃত ব্যাকরণ' ও 'সূত্রমালিকা' নামক ব্যাকরণ রসশাস্ত্র, 'ব্রহ্মসংহিতা, গোপালতাপনী, লঘুতোষণী, কৃষ্ণার্ঘদীপিকা ও ক্রমসন্দর্ভ' নামক বৈষ্ণবস্মৃতি ও ধর্মতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থ, 'ভাগবতসন্দর্ভ বা ষটসন্দর্ভ' ও 'সর্বসংবাদিনী' নামক বৈষ্ণব দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ। শ্রীজীব 'ষট্‌সন্দর্ভ' নামক ছয়টি সন্দর্ভ গ্রন্থেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে একটা দৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব' বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট দর্শনকে দাঁড় করিয়ে দেন।

ঘ. গোপাল ভট্ট ঃ গোপাল ভট্ট দক্ষিণদেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, এঁর সম্বন্ধে এর চেয়ে সুনিশ্চিত আর কিছু জানা যায় না। চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালেই এঁর সঙ্গে চৈতন্যদেবের পরিচয় হয়ে থাকতে পারে। 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থের টীকা 'কৃষ্ণবল্লভা'র রচয়িতা গোপালভট্ট এবং এই গোপাল ভট্ট একই ব্যক্তি কিনা, এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়,'হরিভক্তিবিলাস' নামক গ্রন্থের কর্তৃত্ব গোপাল ভট্টের উপর অর্পিত হলেও অনেকের ধারণা, এর প্রকৃত রচয়িতা সনাতন।

ঙ. রঘুনাথ ভট্ট ঃ পূর্ববঙ্গ ভ্রমণকালে চৈতন্যদেবের প্রথম ভক্ত হয়েছিলেন তপর মিশ্র। এই তপন মিশ্রের পুত্রই রঘুনাথ ভট্ট। নীলাচলে ইনি মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ লাভ করলে মহাপ্রভু তাঁকে বৃন্দাবনে রূপ সনাতনের সঙ্গে থাকতে আদেশ করেন। তদবধি তিনি সারাজীবন সাধন ভজনের মধ্য দিয়ে বৃন্দাবনেই অতিবাহিত করেন। তিনি কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি।

চ. রঘুনাথ দাস ঃ ইনি সপ্তগ্রামের জনৈক কায়স্থ ভূম্যধিকারীর সন্তান। ইনি গৃহত্যাগ করে নীলাচলে মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে কাল অতিবাহিত করেন। মহাপ্রভুর লীলাসংবরণের পর

তিনি বৃন্দাবনধামে চলে আসেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে আছে—'বিলাপকুসুমাঞ্জলি, স্তবমালা, মুক্তা চরিত্র ও দানকেলিচিন্তামণি'। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী থেকে চৈতন্যদেব-বিষয়ে বহু তথ্য জ্ঞাত হ'বার সুযোগ পেয়েছিলেন।

২. **স্বরূপ দামোদর** ঃ মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টাদের অন্যতম স্বরূপ দামোদর ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ মর্মজ্ঞ পার্ষদ। বস্তুতঃ 'চৈতন্যতত্ত্ব' তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ও বৈষ্ণব তত্ত্বের প্রকৃত ভাণ্ডারী ছিলেন তিনিই। স্বরূপ দামোদর ময়মনসিংহ জেলার ভিটাদিয়া গ্রামের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পদ্মনাভ আচার্যের (লাহিড়ী) পুত্র, তবে জন্ম হয়েছিল নবদ্বীপে মাতামহ জয়রাম চক্রবর্ত্তীর গৃহে। স্বরূপ দামোদরের বাল্যনাম ছিল পুরুষোত্তম আচার্য, তিনি বাল্যকালেই গৌরাঙ্গদেবের সঙ্গে শুধু পরিচিত ছিলেন না, সম্ভবত সখ্যসূত্রেই আবদ্ধ ছিলেন। অনুমান করা যায় যে, সেই আকর্ষণেই গৌরাঙ্গদেব পূর্ববঙ্গ ভ্রমণকালে ভিটাদিয়া গ্রামেও উপনীত হয়েছিলেন। আবার জীবনের শেষভাগে চৈতন্যদেব যখন নীলাচলে অবস্থান করেন, তখনও 'দণ্ডী' সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীরূপে 'স্বরূপ দামোদর'-নামধারী পুরুষোত্তম চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ নিত্যসহচর-রূপে নীলাচলেই অবস্থান করতেন। অতএব অনুমান করা চলে যে, চৈতন্যজীবনের আদি থেকে অন্ত্য পর্যন্ত প্রায় সর্বস্তরেই স্বরূপ দামোদর শুধু চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টাই নন, নিত্যসহচররূপে তাঁর তত্ত্ব-দর্শনাদির প্রকৃত মর্মজ্ঞও ছিলেন।

উৎকলে নীলাচলে বসবাসকালে চৈতন্যদেবের যে সাড়ে তিনজন মর্মীভক্ত বা পাত্র ছিলেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন স্বরূপ দামোদর। তিনিই মহাপ্রভুর নিকট জয়দেব-চণ্ডীদাসাদির কাব্যাদি গীত-রূপে পরিবেষণ করতেন এবং নাটকাদির স্বাদ গ্রহণ করাতেন। বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথ দাস নীলাচলে অবস্থান কালে মহাপ্রভুর নির্দেশে স্বরূপ দামোদরের নিকটই শিক্ষালাভ করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের 'পঞ্চতত্ত্বে'র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বয়ং স্বরূপ দামোদর — কবিকর্ণপূর তাঁর 'গৌরাঙ্গগণোদ্দেশ দীপিকা'য় এই উক্তি করেছেন।

মহাপ্রভুর নিত্যসহচর স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর লীলাবসানের পর বৃন্দাবনধামে বাস করতেন। তিনি সূত্রাকারে মহাপ্রভুর জীবনী ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের তত্ত্বসমূহ 'কড়চা'র (note) আকারে রাখতেন, ঐটি 'স্বরূপ দামোদরের কড়চা' নামে পরিচিত। গ্রন্থটি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল বলে ধারণা করা হলেও সম্প্রতি ওটিকে উদ্ধার করে জনৈক গবেষক প্রকাশ করেছেন। এর প্রামাণিকতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি। তবে পরবর্তীকালে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে 'কড়চা'র বিভিন্ন সূত্র অর্থাৎ শ্লোক উদ্ধার করে বৈষ্ণব দর্শনকে ব্যাখ্যা করেছেন। ('চরিতামৃত' গ্রন্থে উল্লেখিত যে দুটি শ্লোকে রাধা-কৃষ্ণের যুগল অবতার-রূপে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে, কড়চা থেকে আহৃত ঐ শ্লোক দুটিতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত। অতএব বর্তমানে প্রচলিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা যে প্রকৃতপক্ষে স্বরূপ দামোদর, এ সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই।

৩. **বৈষ্ণব সাহিত্যের শাখাবিভাগ ঃ** চৈতন্যদেবের জীবৎকাল এবং তাঁর অন্তর্ধানের অব্যবহিত পরেই বাঙলাদেশে বৈষ্ণব সাহিত্য দু'টি প্রধান ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল। এদের একটি চরিতশাখা—চৈতন্যদেব, তাঁর পার্ষদবর্গ এবং বৈষ্ণব-মোহান্তদের জীবনী রচনায় অনেকেই অগ্রসর হয়েছিলেন; দ্বিতীয়টি পদাবলী সাহিত্য শাখা – এই ধারাতেও অনেক খ্যাত-অখ্যাত কবিবর্গ আপনাদের কবিত্ব-শক্তি প্রকাশে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিছুকাল পর যখন প্রথমদিকে আন্দোলনের প্রবণতা কিছুটা মন্দীভূত হ'লো, তখনই চিন্তাশীল বৈষ্ণব মনীষীরা বৈষ্ণব ধর্মকে একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করবার কথা ভাবছিলেন। ইতঃপূর্বে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা বৈষ্ণব ধর্ম, দর্শন ও তত্ত্ব-সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তাদের সবগুলিই ছিল সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এইবার বাঙলা ভাষায় এদের অনুবাদ অথবা এই সমস্ত বিষয় অবলম্বনে মৌলিক গ্রন্থ রচনার প্রচেষ্টা দেখা দিল। বৈষ্ণব তত্ত্ব সাহিত্যের এই পরবর্তী বিশেষ ধারাটিকেই 'বৈষ্ণব তত্ত্ব সাহিত্য' নামে আখ্যায়িত করা হয়। সংখ্যায় এদের পরিমাণ যথেষ্ট হলেও দুর্ভাগ্যক্রমে এদের কোনটিই সাহিত্য-হিশাবে উৎকর্ষ লাভ করতে পারে নি। কোন শক্তিমান কবি এই তত্ত্ব সাহিত্য-রচনায় অগ্রসর না হওয়ায় এই শাখার সাহিত্য চিরকাল সর্বসাধারণের উপেক্ষাই লাভ করে আসছে। একমাত্র গবেষক এবং তত্ত্বানুসন্ধিৎসুরাই সাগ্রহে এই ধারার পরিচয়-গ্রহণে সচেষ্ট হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের একটি দুর্ভাগ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ইচ্ছা হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে, তত্ত্বসাহিত্যগুলির সাহিত্যমূল্য বা কাব্যমূল্য বলতে প্রায় কিছুই নেই। বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনাই এদের উপজীব্য। বিষয়টি একান্তভাবেই গদ্যধর্মী—এতে আবেগের বা ভাবপ্রবণতার কোন স্থান নেই; যুক্তি এবং বুদ্ধির চর্চাতেই সিদ্ধিলাভ করা যেতে পারতো। বস্তুতঃ বিষয়ের দিক থেকে এ সাহিত্য ছিল যেমন গদ্যাত্মক, রচনাভঙ্গির দিক থেকেও এগুলিতে তেমনি এক অপুষ্ট গদ্যরীতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কোন কোন গ্রন্থে ভাঙ্গা গদ্য বা ভাঙ্গা পয়ারে যে গদ্যের পূর্বাভাষ লক্ষিত হয়, যথোপযুক্ত চর্চার ফলে তাই পূর্ণ প্রস্ফুটিত গদ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারতো। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্যই হয়তো সম-সময়ে কোন উৎসাহী ব্যক্তিই এদিকে অগ্রসর হলেন না। ফলত, বাঙলা গদ্যের জন্য আমাদের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

বৈষ্ণব সাহিত্যের দুই শাখা

তত্ত্বসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ঃ গদ্যাত্মক রচনা

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বাঙলা সাহিত্যের আরও একটি শাখা বিশেষ পুষ্টিলাভ করেছিল, তা, ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণের অনুসরণে রচিত 'কৃষ্ণায়ন কাব্য'। এই বিষয়ে পরে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হ'বে। প্রস্তুত অধ্যায়ে বৈষ্ণব তত্ত্ব সাহিত্যের দুটি ধারাতেই আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে — (১) তত্ত্বশাখা (২) অনুবাদ শাখা।

[এক] তত্ত্বশাখা

বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের নানা তত্ত্ব নানাদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। কবিদের মধ্যে কেউ বা তাদের কোন একটিকে গ্রহণ করেছেন, কেউ বা একাধিক বিষয়কে অবলম্বন করে গ্রন্থ রচনা করেছেন। বৈষ্ণব তত্ত্ব-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ। এতে একদিকে যেমন চৈতন্যদেবের জীবন কাহিনী বিবৃত, অপরদিকে তেমনি বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের বিভিন্ন তাত্ত্বিক দিকের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কবিরাজ যে একটা পরিকল্পনা নিয়ে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ-রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, তা' সুস্পষ্ট।

চৈতন্যচরিতামৃতের তত্ত্ব

শ্রীচৈতন্যদেবের বিস্তৃত জীবন-কাহিনী-রচনার সাধ তাঁর ছিল না, তিনি 'চৈতন্য-জীবনের তাৎপর্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের মূলতত্ত্ব, চৈতন্যশাখা নির্ণয় এবং মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা-সম্বন্ধেই' অধিকতর আগ্রহ বোধ করেছিলেন। তাই দেখা যায়, তাঁর গ্রন্থের প্রতিটি লীলাতেই তিনি তত্ত্ববিশ্লেষণে যথেষ্ট সময় নিয়েছেন। আদিলীলাতে তিনি 'চৈতন্যাবতারের তাৎপর্য, শাস্ত্রমার্গীয় স্মার্ত বৈষ্ণব ধর্ম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য, রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব, চৈতন্য ও কৃষ্ণের সম্পর্ক, চৈতন্যাবতারের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তা এবং প্রেমধর্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব-বিশ্লেষণে অধিকতর প্রবণতা ও নিপুণতা'ব পবিচয় দান কবেছেন। মধ্যলীলাতেও "কৃষ্ণদাস বিস্তারিত আকারে গৌড়ীয় ভক্তিবাদ, বাগানুগা ভক্তিব ক্রম ও নীতি-আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই পর্বের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বাসুদেব সার্বভৌমেব সঙ্গে মহাপ্রভুর বেদান্তবিচার ও তাঁহাকে বৈষ্ণব ভক্তিবাদে আনযন, অষ্টম পবিচ্ছেদে গোদাবরীর তীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্যদেবেব বৈষ্ণব বসতত্ত্ব ও বসপর্যায-ব্যাখ্যা, বিংশ-চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে, সনাতনকে উপদেশের ছলে মহপ্রভু-কর্তৃক জীবতত্ত্ব, ঈশ্ববতত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব, প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত পরিচয় রহিয়াছে।" চৈতন্য-চবিতামৃতেব অন্ত্যলীলাযও "কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর সেই অপার্থিব ও ভাগবত জীবনকথাব গূঢ় বহস্য ব্যাখ্যা ও আস্বাদন করিতে চাহিয়াছেন।" অতএব দেখা যাবে, চৈতন্য-চরিতামৃত বৈষ্ণবতত্ত্ব-সাহিত্য-হিশেবে শুধু আদি গ্রন্থই নহে, শ্রেষ্ঠ গ্রন্থও বটে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায যথার্থই বলেছেন, "ইহাতে সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি ও অধ্যাত্ম আদর্শ, গভীর মনীষা ভক্তিপরায়তা ও অতুলনীয় শাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাণ্ডিত্য, যুক্তি ও কাব্যকুশলতার এরূপ সমন্বয় জগতের যে-কোনও ধর্মগ্রন্থে বিরল।"

ক. অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব : কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে 'অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব' নামে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন প্রতিপাদিত হয়েছে, তার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীজীব গোস্বামী। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, প্রকাশানন্দ সরস্বতী, রায় রামানন্দ, বাসুদেব সার্বভৌম, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি মনীষীদের সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল মতবাদ প্রকাশ

করেছিলেন, শ্রীজীব গোস্বামী সেই সমস্ত বিষয় তাঁর 'ষট্‌সন্দর্ভ' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেন এবং এব 'সর্বসম্বাদিনী' নামক অনুব্যাখ্যায় এই 'অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব'কে প্রতিষ্ঠিত কবেন। কবিরাজ গোস্বামী সর্বপ্রথম এই তত্ত্বকে বাঙলা ভাষায় প্রকাশ করেন।

আচার্য শঙ্কর উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র এবং গীতার ব্যাখ্যায় অদ্বৈতবাদ প্রচাব করেন। তিনি দেখিয়েছেন—ব্রহ্ম গুণাতীত জ্ঞানস্বরূপ। ব্রহ্মের নিকট জীবও নেই, জগৎও নেই--তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর মতে ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব প্রকাশানন্দ সরস্বতীব সঙ্গে আলোচন-প্রসঙ্গে এই অদ্বৈতবাদকে খণ্ডন কবে দ্বৈতবাদী 'অচিন্ত্যাভেদাভেদতত্ত্ব' প্রতিষ্ঠা কবেন। তিনি দেখিয়েছেন যে শঙ্করাচার্য গৌণার্থে 'ব্রহ্ম' শব্দটি ব্যাখ্যা কবেছেন বলেই মূল সত্যটি অপ্রকট রয়ে গেছে। চৈতন্যদেব মুখ্যার্থে 'ব্রহ্ম' শব্দের ব্যাখ্যা কবে দেখালেন 'ব্রহ্ম'ই বৃহত্তম সত্তা—যিনি নিজে বড় এবং অপবকেও বড় কবতে পাবেন তিনি ব্রহ্ম (বৃংহতি বৃংহয়তি চ ইতি 'ব্রহ্ম')। ইনি ষড়ৈশ্বর্যময়, শ্রীভগবান পরতত্ত্বধাম (সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাশ্রযতত্ত্ব)। এঁব স্বরূপ ও ঐশ্বর্য চিন্ময়, মায়াগন্ধহীন। সর্ববেদেই ভগবানকে সম্বন্ধতত্ত্ব অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বা আলোচ্য বিষয় বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। শঙ্করাচার্য ভগবানের সেই চিৎশক্তিকে না মেনে তাঁকে নির্বিশেষ বলে মনে করেছেন। (স্বরূপ ও শক্তির পূর্ণতায় ব্রহ্মের পূর্ণতা, অতএব) অর্ধেক তত্ত্ব অর্থাৎ স্বরূপ মেনে শক্তিকে না মানলে পূর্ণতার হানি হয়।

চৈতন্যদেব দেখিয়েছেন, জীবজগৎ-আদি সমস্ত কিছুই পরব্রহ্মের শক্তি। জীব পবব্রহ্মেব জীবশক্তির অংশ এবং জগৎ পরব্রহ্মের মাযাশক্তির পবিণাম। শাস্ত্রোক্ত ভগবদ্‌ধামসমূহ পরব্রহ্মের চিৎ-শক্তির বিলাস; শক্তিমানের সঙ্গে শক্তির যে সম্পর্ক, পবব্রহ্মেব সঙ্গে জীবজগতের সেই সম্পর্ক—এই সম্পর্কই দেখা যায অগ্নির সঙ্গে তার দাহিকাশক্তির। নিত্য ও অবিচ্ছেদ্য এই শক্তির নাম শক্তি। অগ্নি থেকে দাহিকাশক্তিকে পৃথক করা যায না, তেমনি পবব্রহ্মের শক্তিরূপ জীবজগৎকে পরব্রহ্ম থেকে পৃথক করা যায় না। শক্তিকে বাদ দিয়ে শক্তিমান্‌কে, কিংবা শক্তিমান্‌কে বাদ দিয়ে শক্তিকে বস্তু বলা যায় না, বস্তুতঃ উভযের মিলিত স্বরূপই বস্তুর রূপ। বস্তুকে বলা হয় বিশেষ্য, শক্তি তার বিশেষণ। আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মই বিশেষ্য এবং তাব স্বরূপশক্তি, মায়াশক্তি ও তটস্থা বা জীবশক্তিই বিশেষণ। আব একটি অনুরূপ দৃষ্টান্ত — চন্দ্র এবং তার জ্যোৎস্না। চন্দ্র শক্তিমান্, জ্যোৎস্না তার শক্তি — এই উভয়ের মধ্যে যে ঐক্য ও ভেদ, শক্তিমান্ ও শক্তিতেও সেই ভেদ। উভযেই অভেদ অথচ উভয়ের মধ্যে ভেদও রয়েছে — তা' কীভাবে হয়, তা' আমাদেব অচিন্ত্য। তেমনি পূর্ণশক্তিমান্ কৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি হলো হ্লাদিনী, তিনিই মূর্তিময়ী রাধা। তাঁদেরও সম্পর্ক অভেদ অথচ তাঁদের মধ্যে ভেদও রয়েছে। এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্বকেই জীব গোস্বামী তাঁব তত্ত্ব-রূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, উভয়ের সম্পর্ক যখন এমনি অবিচ্ছেদ্য তবে তো শক্তিমানের উল্লেখই যথেষ্ট, শক্তির পৃথক্ উল্লেখের প্রয়োজন কি? তাব উত্তরে জীব গোস্বামী বলেন, সাময়িকভাবে কোন কারণে অগ্নির দাহিকাশক্তি স্তম্ভিত হ'তে পারে, কিন্তু শক্তিমান অগ্নি বর্তমানই থাকে। তাই শক্তিকে শক্তিমান্ থেকে পৃথক নামে অভিহিত করতে হয়। শক্তি

এবং শক্তিমানের বাইরেও শক্তির প্রভাব অনুভূত হতে পারে, অতএব উভয়ের ভেদকেও স্বীকার করতে হয় — কিন্তু এই ভেদ কেবল ভেদ নয়। ভেদ ও অভেদ যুগপৎ, এদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ পরব্রজের ও তাঁর বিভিন্ন শক্তির যুগপৎ ভেদ ও অভেদ স্বীকার করে থাকেন। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যবর্তী যুগপৎ ভেদাভেদ-সম্পর্ক অচিন্ত্য জ্ঞানগোচর—বুদ্ধি দ্বারা এর ব্যাখ্যা চলে না। অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবেই ঈশ্বরে এই বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ ঘটেছে। জীব গোস্বামী 'ভেদ, অভেদ ও অচিন্ত্য' শব্দের সমাহারেই এই 'অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব' প্রতিষ্ঠা করেছেন। জীব ও জগতের তাবৎ বস্তুর সঙ্গেই পরব্রহ্মের তথা কৃষ্ণের সম্বন্ধ অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ—গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই মতেই বিশ্বাস স্থাপন করেন।

এই অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব-অনুযায়ী বিশ্বজগতে শ্রীকৃষ্ণের স্থানই সর্বোচ্চে—গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই বিশ্বাসে দৃঢ়মূল। তাঁরা মনে করেন, "শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের মধ্যেই পরব্রহ্মের শক্তি, শক্তিকার্য, গুণ, সৌন্দর্য ও মাধুর্যের পূর্ণতম বিকাশ। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান এবং পরতত্ত্ব। নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যবর্তী যে সকল স্বরূপ আছেন তাঁদের প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণের মত সাকার এবং সবিশেষ। সবিশেষ স্বরূপসমূহে মধ্যে যে স্বরূপটিতে সর্বাপেক্ষা ন্যূন শক্তির বিকাশ সেই স্বরূপটির নাম পরমাত্মা। এই স্বরূপটি সাকার হইলেও ইহাতে লীলাবিলাসোপযোগিনী শক্তির অভিব্যক্তি নাই। যে সকল স্বরূপের মধ্যে পরমাত্মা অপেক্ষা অধিক এবং শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা অল্প শক্তির বিকাশ বিদ্যমান তাঁহদের প্রত্যেকেরই ভগবত্তা স্বীকার্য। রাম, নারায়ন, নৃসিংহ, সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি স্বরূপ ভগবান্ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে ভগবত্তার পূর্ণতম অভিব্যক্তি নাই। শ্রীকৃষ্ণে ভগবত্তার পূর্ণতম বিকাশ আছে বলিয়া তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলা হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ অবতার নহেন, অবতারী। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অনাদি, তিনি সকলের আদি এবং সমস্ত কারণ। নারায়ণ-রাম-নৃসিংহ-মৎস্যকূর্ম-বরাহাদি ভগবৎস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্ন হইলেও তাঁহারা স্বয়ং ভগবান নহেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের শক্তির আংশিক প্রকাশ থাকায় তাঁহাদিগকে স্বাংশস্বরূপ বলা হয়।" (সুধীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী ঃ 'ভারতকোষ')।

খ. অপরাপর তত্ত্বগ্রন্থ ঃ বৈষ্ণব রস-তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় প্রাচীনতম গ্রন্থ সম্ভবত কবিবল্লভ-রচিত 'রসকদম্ব'। কবি তাঁর গ্রন্থে আত্মপরিচয় দান করেছেন। তাঁর পিতার নাম ব্রজবল্লভ, মাতার নাম বৈষ্ণবী, কবির জন্মস্থান করতোয়া তীরবর্তী আরোড়া গ্রাম। কবি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য উদ্ধবদাসের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। কবি গ্রন্থ-সমাপ্তিকালের তারিখ সুস্পষ্টভাবেই তাঁর

রসকদম্ব

গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন,—১৫২০ শকাব্দে (১৫৯৯ খ্রীঃ) ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি বৃহস্পতিবারে তাঁর গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয়। কবি গ্রন্থের বিষয়বস্তু গ্রহণ করেন বিভিন্ন পুরাণ, অপরাপর গ্রন্থ এবং রূপ-সনাতনের শিষ্য-প্রশিষ্যদিগের নিকট থেকে। কবির গ্রন্থ বৃহৎ — এতে দু'হাজার পয়ার শ্লোক বর্তমান। গ্রন্থের

বাইশটি অধ্যাযেব প্রতিটিতেই কবি এক এক প্রকাব 'বস' বর্ণনা কবেছেন। শাস্ত্রোক্ত বসেব বাইবে কবি বিভিন্ন বসেব কল্পনা কবেছেন, —সূত্রবস, শিক্ষাবস, স্তুতিবস, আশ্রবস, দীক্ষাবস ইত্যাদি। অধিকাংশ বসেব প্রাবম্ভেই বিভিন্ন বাগবাগিণীও সন্নিবিষ্ট হযেছে। গ্রন্থে কিছু কিছু কাহিনী বর্ণিত হলেও প্রধানত বস-তত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনাব উদ্দেশ্যেই গ্রন্থটি বচিত হযেছে। গ্রন্থ ও গ্রন্থকাব সম্বন্ধে ডঃ সুকুমাব সেন বলেন ঃ "প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে শুদ্ধ তত্ত্বকথাসম্বলিত অল্প যে কযখান মৌলিক গ্রন্থ বচিত হইযাছিল 'বসকদম্ব' তাহাব মধ্যে অন্যতম। 'শ্রীচৈতন্যচবিতামৃতে'ব কথা ছাডিযা দিলে এ বিষযে 'বসকদম্ব' দ্বিতীযবহিত। কবি যে শুধু পণ্ডিত ও তত্ত্ববেত্তা ছিলেন তাহা নহে, ভাষাব উপব তাঁহাব অসাধাবণ অধিকাব ছিল। কোথাও কবিত্বেব আডম্বব না কবিযা যতদূব সম্ভব স্বল্পক্ষাবে অথচ স্পষ্ট ও পবিষ্কাব কবিযা বৈষ্ণবসিদ্ধান্তেব সাবমর্ম বুঝাইযাছেন। কবি যে পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তাহা লেখক, পাঠক, শ্রোতা ও গাযকেব প্রতি উক্তি হইতে বোঝা যায। উপমাদিব প্রযোগে যথেষ্ট বৈচিত্র্য ও দক্ষতা দেখাইযাছেন। সর্বধর্মে সমদৃষ্টি এবং আত্মদৈন্য হইতে কবিব উচ্চহৃদযেব পবিচয পাই।"

নন্দকিশোব দাস-বচিত 'বসকলিকা' অথবা 'বসপুষ্পকলিকা' বৈষ্ণব বসশাস্ত্রবিষযে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। নন্দকিশোব নিত্যানন্দ প্রভুব শিষ্য অভিবামদাসেব নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ কবেছিলেন। অনুমান তিনি ষোডশ শতাব্দীব শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। নন্দকিশোব তাঁব গ্রন্থবচনায 'ভক্তিবসামৃতসিন্ধু' এবং 'উজ্জ্বলনীলমণি' থেকে সাহায্য গ্রহণ কবেছেন। তাঁব গ্রন্থটি ষোলটি 'দল' বা অধ্যাযে বিভক্ত। বিভিন্ন দলে বিভিন্ন ভাব, বস বা অন্যবিধ লক্ষণ বর্ণনা কবা হযেছে। নন্দকিশোব দাস বসবিচাব কবতে গিযে দৃষ্টান্ত আহবণ কবেছেন চৈতন্যদেবেব জীবনী থেকে। এই হিশেবে গ্রন্থটিব বিশিষ্টতা স্মবণযোগ্য। বসকলিকায কযেকটি বাঙলা এবং ব্রজবুলিব পদ পাওযা যায। তাদেব কোন কোনটি কবিব স্ববচিত, আবাব গোবিন্দদাসাদিব পদও এতে বর্তমান। গ্রন্থটিতে চৈতন্যচবিতামৃতেব প্রভাব সুস্পষ্ট।

বসকালিকা

বৃন্দাবনেব ষডগোস্বামীদেব অন্যতম শ্রীরূপ গোস্বামী বৈষ্ণব বসসাহিত্য সম্বন্ধে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ বচনা কবে গিযেছেন, তাকে অবলম্বন কবে পববর্তীকালে বস শাস্ত্র সম্বন্ধে বহু বাঙলা গ্রন্থ বচিত হযেছিল। এরূপ একটি গ্রন্থ বৈদ্যবংশীয বামগোপাল দাস বা গোপাল দাস বচিত 'বাধাকৃষ্ণবসকল্পবল্লী'। গ্রন্থকাবেব পিতাব নাম শ্যাম বায। গোপালদাস ছিলেন শ্রীখণ্ডেব বতিকান্ত ঠাকুবেব শিষ্য। গুরুব আদেশেই গোপাল দাস আলোচ্য গ্রন্থ বচনায ব্রতী হযেছিলেন। গ্রন্থকাব গ্রন্থ বচনাব তাবিখ সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে বলে গিযেছেন যে তিনি ১৫৯৫ শকাব্দে (১৬৭৩ ৭৪ খ্রী) বৈশাখ মাসে গ্রন্থ আবম্ভ কবেন এবং কার্তিক মাসেব দীপান্বিতায গ্রন্থ সমাপ্ত কবেন। গ্রন্থটি বাবোটি কোবকে বিভক্ত। এতে মঙ্গলাচবণ, নাযক বর্ণন, নাযিকা পবিবাব, ভাব-বিচাব প্রভৃতি বিষয সম্বন্ধে বলা হযেছে।

বাধাকৃষ্ণবসকল্পবল্লী

উক্ত রামগোপাল দাসের পুত্র পীতাম্বর দাস পিতার আজ্ঞায় পিতৃ-গ্রন্থের একটি কোরক অবলম্বন করে 'রসমঞ্জরী' নামে একটি নিবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে আটটি অধ্যায় বর্তমান। এর প্রধান আলোচ্য বিষয় 'নায়িকা বিভাগ'। নায়িকা বিভাগকে অবলম্বন করেই এতে বিভিন্ন নায়িকার লক্ষণ ও প্রকারভেদ-সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে কয়েকজন পদকর্তার পদ উদ্ধৃত হয়েছে,—এতে গ্রন্থেব মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। পীতাম্বর দাসের আর একখানি নিবন্ধ গ্রন্থ 'অষ্টরস ব্যাখ্যা'। এতেও কয়েকজন পদকর্তার পদ উদ্ধৃত হয়েছে।

বসমঞ্জবী

বৈষ্ণবতত্ত্বশাখা-সম্বন্ধীয় একটি প্রসিদ্ধ পুস্তক 'দিনমণিচন্দ্রোদয়'— গ্রন্থকার মনোহর রায়। গ্রন্থকাব তাঁব গ্রন্থে বিস্তৃতভাবেই আত্মপরিচয় দান করেছেন। তিনি রামানন্দ রায়ের ভ্রাতার বংশধব। এর পিতার নাম গোবিন্দানন্দ রায়। উড়িয়ারাজা তাঁব ভূসম্পত্তি অধিকার করলে কবি ভাগ্যান্বেষণে বর্ধমানে চলে আসেন। পরে অনেক ঘুরে ফিরে আবার দেশে ফিরে যান। কবির কাব্য একুশটি 'সূত্রে' বিভক্ত। 'দিনমণিচন্দ্রোদয়'কে এক হিশেবে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ব্যাখ্যা বলা যেতে পারে। রচনা বেশ জোরাল। তবে কাব্য হিশাবে একান্তভাবে মূল্যহীন।

দিনমণি চন্দ্রোদয়

পববর্তীকালে বৈষ্ণবতত্ত্ব-অবলম্বনে বহুতর ক্ষুদ্র বৃহৎ 'নিবন্ধ' রচিত হযেছিল। এদের অধিকাংশ অখ্যাত কবিদের রচনা হলেও তাঁরা গ্রন্থকাররূপে বিশিষ্ট বৈষ্ণব মোহান্ত বা পদকর্তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীজীব গোস্বামী, নরোত্তমদাস, বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি বিশিষ্ট মনীষীদের ভণিতাযুক্ত হয়ে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে—বলাই বাহুল্য, গ্রন্থকারগণ নিজেরা অখ্যাত ছিলেন বলেই বিখ্যাত নাম যোজনা করে গ্রন্থের মূল্যবৃদ্ধির চেষ্টা করেছিলেন।

নিবন্ধ

[দুই] অনুবাদ শাখা

বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামীগণ সংস্কৃত ভাষায বৈষ্ণবতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় যে সকল গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য তাদের অনুবাদের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এ বিষয়ে শ্রীনিবাস আচার্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁর প্রেরণা এবং প্রবর্তনায় অনেকেই অনুবাদ কার্যে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। এইরূপ অনুবাদকের মধ্যে অন্যতম ছিলেন যদুনন্দন। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতার নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করলেও প্রধানত শ্রীনিবাসেরই অনুচর ছিলেন। যদুনন্দন অন্ততঃ চারখানা কাব্যের অনুবাদ করেছিলেন বলে জানা যায় ঃ (ক) শ্রীরূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' অবলম্বনে 'শ্রীশ্রীবাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব' বা 'রসকদম্ব' নামক কাব্য, (খ) উক্ত গোস্বামীর 'দানকেলিকৌমুদী ভানিকা'-অবলম্বনে 'দানলীলাচন্দ্রামৃত' কাব্য; (গ) কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'গোবিন্দলীলামৃত'-অবলম্বনে 'গোবিন্দলীলামৃত' কাব্য এবং (ঘ) 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'সারঙ্গ

যদুনন্দন

বন্দদা' টীকা-অবলম্বনে 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' কাব্য। যদুনন্দন প্রতিভাধব কবি ছিলেন। তিনি মৌলিক বচনাব মতই সাবলীল ভঙ্গিতে অনুবাদ বচনা কবেছিলেন। এই অনুবাদকে আক্ষবিক অনুবাদ না বলে ছাযানুবাদ বলাই সঙ্গত।

শ্রীরূপ গোস্বামী বচিত 'উদ্ধবদূত' এবং 'হংসদূত' কাব্য দুটিব একাধিক অনুবাদ বচিত হযেছিল দেখা যায। দ্বিজ নবসিংহ তাঁব 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যেব ভিতবেই উদ্ধবদূতেব অনুবাদকে স্থান দান কবেছিলেন। মাধব গুণাকবেব 'উদ্ধবদূত' বৃহৎ গ্রন্থ। বিষ্ণুবাম নন্দীও একটি 'উদ্ধবগীতা' বচনা কবেছিলেন। একটি 'হংসদূত' কাব্যেব ভণিতায নবসিংহ, যদুনাথ ও পুঁটীবামেব নাম পাওযা যায। অপব একজন নবসিংহ দাস যে 'হংসদূত' বচনা কবেন তা' কুড়িটি অধ্যাযে বিভক্ত।

'উদ্ধবদূত' ও হংসদূতেব অনুবাদ

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী অনেক গ্রন্থ বচনা কবেছেন। তিনি শ্রীরূপ গোস্বামী-বচিত 'ভক্তিবসামৃতসিন্ধু' 'লঘুভাগবতামৃত' এবং 'উজ্জ্বলনীলমণি'ব সাব সঙ্কলন নিম্নোক্তরূপে বচনা কবেন : 'ভক্তিবসামৃতসিন্ধু বিন্দু, ভাগবতামৃতকণা ও উজ্জ্বলনীলমণি-কিবণ'।

অপ্রসিদ্ধ অনুবাদ গ্রন্থ যে কত বচিত হযেছিল, তাব সংখ্যা নেই। কিন্তু উৎকর্ষেব বিচাবে এদেব বিশেষ কোন মূল্য না থাকায এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রযোজন।

অধ্যায় ঃ ষোল

অনুবাদ সাহিত্য

[এক] বাঙলা সাহিত্যে অনুবাদের ভূমিকা

চৈতন্য-পূর্বযুগেব সাহিত্য-বিষযে আলোচনা প্রসঙ্গে অনুবাদ সাহিত্যেব উৎপত্তি সম্বন্ধে যে আলোচনাব অবতারণা করা হয়েছিল, যুগ-বিভাগের দিকে লক্ষ্য রেখে তাকে প্রয়োজনের খাতিরেই সীমাবদ্ধ বাখা হয়েছিল। অনুবাদ সাহিত্যের তিনটি প্রধান ধারার মধ্যে দুটির উদ্ভব ও প্রাথমিক বিকাশেই তাৎকালিক আলোচনা সমাপ্ত হয়েছিল। প্রস্তুত অধ্যায়ে উক্ত তিন শাখাবই সামগ্রিক পবিচয় দান কবা হবে।

কোন একটা জাতিব জীবনে যখন জাগরণ দেখা দেয, তখন তার চিত্তবৃত্তিসমূহ শতধারায় ফুটে উঠতে চায। বলা বাহুল্য, এই বহুমুখী ধাবায সাহিত্য-সংস্কৃতির ভূমিকাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীব বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে যখন নবজাগবণের তথা বেনেসাঁসেব লক্ষণ দেখা দেয, তখন সাধাবণতঃ তা' সর্বপ্রথম আভাসিত হয সাহিত্যেই। সাহিত্যের মাধ্যমে জাতি আত্মপ্রকাশ কবতে চায, অথচ ভাব তখনো অর্ধস্ফুট, ভাষা তখন সদ্য গঠনোন্মুখ। এই অবস্থায স্বভাবতঃই দৃষ্টি ফেরে পেছনদিকে। ঐতিহ্যগত পূর্বপুরুষের জ্ঞানের ভাণ্ডাব তার দ্বাব খুলে ধরে নবজাগবিত উত্তর পুরুষের চোখের সামনে। তাই প্রাচীন সাহিত্যচর্চায একটা তাৎকালিক প্রবণতা দেখা যায জাতিব মধ্যে। যুবোপীয বেনেসাঁসেব পটভূমিকা-বিশ্লেষণেও আমবা দেখতে পাই—ইতালীতে নোতুনভাবে শুরু হযেছে গ্রীক সাহিত্যেব চর্চা, গ্রীক সাহিত্য থেকে অনুবাদের ধাবা। এই প্রেক্ষাপটে মধ্যযুগের বাঙলাদেশ ও বাঙালী জাতিব মানস জীবনেব পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পাবে।

খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতকেব একেবাবে গোড়ার দিকে (১১৯৯ খ্রীঃ-১২০৫ খ্রীঃ) কোন এক সময বিদেশি বিভাষী এবং বিধর্মী তুর্কীরা প্রথম বাঙলা আক্রমণ করে এবং তারপব প্রায দেড়শ বছব চলে বাঙলাব বুকে তাদেব যথেচ্ছাচার—বাঙলাব অধিকার নিযে নিজেদের মধ্যে খেয়োখেযি এবং তাব তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিযায বাঙালী-সমাজে নেমে আসে অন্ধকাবেব যবনিকা। খ্রীঃ চতুর্দশ শতকেব মাঝামাঝি সময ইলিযাস শাহ বাঙলাব সিংহাসন অধিকাব করার পরই দেশে আপাতত শান্তি স্বস্তি ফিবে আসে—বাঙালী জীবন থেকে সেই অন্ধকাব যবনিকা ক্রমশঃ অপসৃত হতে থাকে। এই অবস্থাকে 'বেনেসাঁস' বলে অভিহিত কবা সম্ভবপব না হলেও জাতিব জীবনে যে জাগরণ-লক্ষণ দেখা দিয়েছিল, তা' কোনক্রমেই অস্বীকাব কবা চলে না।

খ্রীঃ দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বাঙলা ভাষায় প্রথম সাহিত্য রচিত হয়েছিল 'চর্যাপদ'। কিন্তু এর সঙ্গে বৃহত্তর জাতীয় জীবনের কোন সম্পর্ক ছিল না বলেই মনে হয়। সহজিয়াপন্থী বৌদ্ধগণ তাঁদের সাধন ভজন-সংক্রান্ত কিছু পদ রচনা করেছিলেন 'সন্ধ্যাভাষায়', যার সম্যক্ অর্থ উক্ত গোষ্ঠীর বাইরে ছিল দুর্বোধ্য। সুতরাং এই একান্তভাবে সাম্প্রদায়িক সাহিত্য কোনক্রমেই জাতীয় জীবনের ভাব-বাহক হতে পারে না।

চর্যাপদ বচনার পরেও দেড়শ বছর পর্যন্ত বাঙালীর ভাবজীবনের কোন পরিচয় আমরা পাইনি। ইলিযাস শাহী রাজত্বকাল থেকেই বস্তুতঃ আমরা বাঙালীকে সাহিত্য মাধ্যমে আত্মপ্রকাশবত দেখতে পাই। সেই সাহিত্যের বিষয়বস্তু একদিকে যেমন আহৃত হয়েছে সমসাময়িক সমাজজীবনে নবাগত সমন্বয়জাত ভাবধারা ও আচার-আচরণ থেকে, তেমনি অপরদিকে আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যাগত সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন মহাকাব্য ও পুরাণ থেকে।

তুর্কী আক্রমণেব ফলে ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজ আত্মরক্ষার তাগিদে উদারতা নিয়ে সমাজের অন্ত্যজশ্রেণীর সঙ্গে খানিকটা রফা করে তাদের অনেক ভাবধারা এবং দেবতা, ধর্মবোধ ও আচার-আচরণকে স্বীকৃতি দান করেছিল। তার ফলে নিম্নসমাজের অনেক দেবদেবীও সমাজে স্থাযী আসন লাভ করেন—তাঁদের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য সৃষ্ট হয়েছিল সাহিত্যের একটি ধাবা—মঙ্গলকাব্য।

মঙ্গলকাব্যেব চণ্ডী, মনসা, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি দেবদেবীর মধ্যে আমাদের প্রাচীন আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এ সকল দেবতা ছিলেন পূজালিপ্সু এবং সমাজে তাঁদের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য হেন অপকর্ম ছিল না, যা তাঁরা করতে পাবতেন না। তাঁদের ক্রুরতা, নিষ্ঠুরতা, হিংসাপরায়ণতা, ছলনা ও মিথ্যাচার সমাজের মানুষের মনে ভয়েব উদ্রেক করতো — ভক্তির কোন স্থান ছিল না সেখানে। অথচ জাতিব সম্মুখে যদি কোন উচ্চ আর্দশ না থাকে, তবে তার জীবনের ধ্যানধারণায় এর প্রতিফলন ঘটবে কীভাবে?

তাই, সমাজে তখন দেখা দিলেন এমন কিছু লেখক, যাঁরা লোভী দেবতার কৃপাদৃষ্টির চেয়ে প্রকৃত দেবগুণই সমাজের সামনে তুলে ধবতে চাইলেন। অথবা, আরো স্পষ্ট কবেই বলা চলে যে তাঁরা কিছু দেবোপম আর্দশ চরিত্র মানবসন্তানেব কার্যাবলী এবং চবিত্রকে নবজাগরিত বাঙালীর সামনে উপস্থাপিত করবাব উপযোগিতা বোধ কবে সংস্কৃত মহাকাব্য এবং কিছু কিছু পুরাণ বাঙলা ভাষায অনুবাদ করতে আরম্ভ করলেন। আমাদের অর্ধস্ফুট ভাব এবং গঠনোন্মুখ ভাষা অনুবাদ সাহিত্যেব মাধ্যমেই পরিপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ লাভ করলো মধ্যযুগের আদিভাগেই।

রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতপুরাণের দশম ও একাদশ স্কন্ধই শুধু বিভিন্ন জনের হাতে বাঙলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় রচিত অসংখ্য বৈদিক সাহিত্য, পুরাণ শাস্ত্রগ্রন্থ এবং বহু লোকায়ত (Secular) বসসাহিত্য থাকা সত্ত্বেও এই তিনটি মাত্র গ্রন্থই শুধু অনুবাদের যোগ্য বিবেচিত হলো কেন— এ প্রশ্ন ওঠা একান্তই স্বাভাবিক। এর উত্তর আমরা পাবো, যদি যর্থাথভাবে সমসাময়িক যুগের প্রেক্ষাপটকে বিশ্লেষণ করতে পারি।

বিধর্মী তুর্কীদের শাসন-শোষণ ও অত্যাচারে বিধ্বস্ত হিন্দু সমাজের বেঁচে উঠবার জন্য শক্তি সঞ্চয় প্রয়োজনীয় বলে অনুভূত হয়েছিল। এবং এরই জন্য প্রয়োজন ছিল এমন কিছু আদর্শ চরিত্র ও মহৎ কাহিনীর —যা জাতীয় জীবনকে উদ্দীপ্ত করতে পারে এবং ঘোরতর নৈরাশ্যের মধ্যেও জাতীয় জীবনে আশার সঞ্চার করতে পারে। আর এই উদ্দেশেও সমগ্র ভারতীয় প্রেক্ষাপটেও রামকাহিনী এবং কৃষ্ণকাহিনী-অপেক্ষা যোগ্যতর কোন কাহিনীর কথা চিন্তায়ও আসে না। তাই, বাস্তবেও দেখা যায় আদি-মধ্য যুগেই কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণ-অনুসরণে বাঙলা রামায়ণ এবং মালাধর বসু ভাগবত-অবলম্বনে কৃষ্ণকাহিনী সম্বলিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য রচনা করে বাঙলা ভাষায় অনুবাদ কাহিনীর সূত্রপাত করেন।

রামায়ণ কাহিনীতে গার্হস্থ্যধর্মের তথা পারিবারিক সম্পর্কের যে সকল চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তাঁর প্রতি গ্রামীণ জীবনে অভ্যস্ত সরল বাঙালীর আকর্ষণ থাকাই স্বাভাবিক। আর সবার উপর আদর্শরূপে রয়েছেন স্বয়ং রামচন্দ্র—যার সম্বন্ধে বাল্মীকিও বলেছিলেন, 'দেবম্বপি ন পশ্যামি কশ্চিদেভির্গুণৈর্যুতম্' —অর্থাৎ দেবতাদের মধ্যেও এত গুণসম্পন্ন কাউকে দেখতে পাচ্ছিনে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণ মানবতার আদর্শরূপেই যুগে যুগে ভারতে পূজিত হয়ে আসছেন। ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণজীবনীই বিস্তৃতভাবে পরিবেশিত হয়েছে। হরিবংশ এবং বিষ্ণুপুরাণেও শ্রীকৃষ্ণজীবন বর্ণিত হয়েছে। কবি মালাধর বসু প্রধানতঃ ভাগবতের উপর নির্ভর করলেও প্রয়োজনে ভিন্ন সূত্র থেকেও উপাদান আহরণ করেছেন। পূর্বোক্ত তিন গ্রন্থে রাধার উল্লেখ নেই — মালাধর সম্ভবতঃ জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' অথবা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ থেকে রাধা-প্রসঙ্গ এতে যোগ করেছেন।

মহাভারতে রামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণের মতো একক আদর্শ পুরুষের কাহিনী না থাকায় এবং রাজনীতি ও যুদ্ধবিগ্রহই এতে প্রধান স্থান অধিকার করায় স্বভাবতঃই গৃহসুখমগ্ন বাঙালী এতে গভীর আকর্ষণ বোধ করেনি— সম্ভবতঃ এই কারণেই মহাভারতের অনুবাদ কিছুটা বিলম্বিত হয়েছিল। পক্ষান্তরে উচ্চপদস্থ অথচ ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত রাজপুরুষগণ মহাভারত-কাহিনী শ্রবণে যে বিশেষ আগ্রহ বোধ করতেন এবং তাঁদের প্রবর্তনাতেই যে মহাভারতের প্রাচীনতর অনুবাদগুলি রচিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণটি পূর্বেই বিবৃত হয়েছে। মহাভারতে যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াও কূটনীতি, রাজনীতি, ভারতময় বিভিন্ন রাজশক্তির বিন্যাস ও তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, অন্তর্দ্বন্দ্ব, গৃহযুদ্ধ প্রভৃতির প্রতিই বিদেশি রাজশক্তি অত্যন্ত আকর্ষণ অনুভব করতেন, কারণ তাঁরাও এ জাতীয় অবস্থার সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন।

পূর্বোক্ত তিনটি অনুবাদের ক্ষেত্রেই একটি প্রধান লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই — অনুবাদকদের প্রায় কেউই কোন গ্রন্থ আক্ষরিকভাবে অনুবাদ করেন নি। তাঁদের অনুবাদ স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন— প্রয়োজনমতো তাঁরা মূলের কাহিনী বহুস্থলে বর্জন করেছেন। আবার ভিন্নসূত্র থেকে গৃহীত

বহু কাহিনী তাঁরা গ্রন্থে সংযোজনও করেছেন। এই গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে তাঁরা যা রচনা করলেন, তা' অনুবাদ রইলো না—মৌলিকস্বাদযুক্ত নতুন গ্রন্থ হয়ে উঠলো। লেখকগণ কেন এই বিশেষ নীতি অবলম্বন করলেন—তার বিশ্লেষণে দেখা যায়—সমসাময়িক যুগের দাবি এবং বাঙালীয়ানার প্রয়োজনেই তাঁরা এই স্বাধীনচিন্ততার পরিচয় দিয়েছিলেন। ফলে, অনুবাদরূপে পরিচিত হলেও বাঙলা রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতে (কৃষ্ণমঙ্গল বা কৃষ্ণায়ণ কাব্যে) সমকালীন বাঙালী জীবনেরই ছায়াপাত ঘটেছে। মূল কাব্যে যে কালের সমাজ জীবন-চিত্র ও জীবনবোধের চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল, তা' একালের পাঠকের মনে যথার্থ আগ্রহের সৃষ্টি করতে পারতো না, পরন্তু রসগ্রহণেও বাধার সৃষ্টি হতে পারতো।

বাল্মীকি রামায়ণ এবং ব্যাস মহাভারতই সংস্কৃতে মূল গ্রন্থরূপে বিবেচিত হলেও সমকালীন বাঙালী কবিরা সম্ভবতঃ বৈচিত্র্য সৃষ্টি এবং উপভোগ্যতার জন্য এ জাতীয় ভিন্ন গ্রন্থেরও সহায়তা গ্রহণ করেছেন। বাল্মীকি রামায়ণ ছাড়াও 'অদ্ভুত রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ এবং যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ' নামক অপব তিনটি রামায়ণের অনুবাদও অনেকেই রচনা করেছেন। অদ্ভুত রামায়ণের কাহিনী-বৈচিত্র্য ও অপর দুটির তাত্ত্বিকতাই সম্ভবতঃ গ্রন্থকারদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। মহাভারতের ক্ষেত্রে ব্যাস-মহাভারতের বাইরে 'জৈমিনিকৃত মহাভারতের' 'অশ্বমেধ'পর্বের অনুবাদ অনেকেই কবেছেন। বস্তুত এই সমস্ত অনুবাদের ক্ষেত্রে লেখকগণ স্বাধীনচিন্ততারই পরিচয় দিয়েছেন।

রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্য এবং পুরাণ গ্রন্থ লৌকিক ভাষায় অনূদিত হবার ফলে সম্ভবত সমাজের উঁচু মহলে সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ গ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ছিল বলে এতকাল সমাজের উচ্চকোটির শিক্ষিত ব্যক্তিগণই এর স্বাদ গ্রহণ করবার সুযোগ পেতেন এবং ফলতঃ সমাজে বিশেষ সুবিধাভোগী বলে বিবেচিত হতেন, কিন্তু গ্রন্থগুলি লৌকিক ভাষায় অনূদিত হবার ফলে আপামর জনসাধারণ এর ফলভোগী হওয়াতে ওঁদের একাধিপত্য বিনষ্ট হ'লো। তাই সম্ভবতঃ এঁদের স্বার্থরক্ষার্থে শাস্ত্রবাণী তৈরি হলো—

'অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।'

অর্থাৎ 'অষ্টাদশ পুরাণ এবং রামচরিতাদি গ্রন্থ যদি কেউ ভাষায় (মাতৃভাষায়) শোনে, তবে তাকে রৌরব নরক ভোগ করতে হবে।'

আমাদের সৌভাগ্য যে শাস্ত্রের অনুশাসন সাধারণ মানুষের আগ্রহকে দমিয়ে দিতে পারেনি—তাই কৃত্তিবাস-আদি মহাকবিগণ ভগীরথের ভূমিকা গ্রহণ করে মহাকাব্য এবং পুরাণের পুণ্যোদকে বঙ্গবাসীদের অভিসিঞ্চিত করেছিলেন।

বাঙলা সাহিত্যের প্রস্তুতি-পর্বেই যে অনুবাদের প্রতি মনীষীদেব দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল, তা' ইতঃপূর্বেই দেখা গিয়েছে। 'কৃত্তিবেসে, কাশীদেশে আর বামুন ঘেষে—এই তিন সর্বনেশে' অ্যাখ্যা দিলেও যে তাঁরা যুগধর্মের অনুসরণে যুগমানসেরই পোষকতা করেছিলেন তাতে

কোন সন্দেহ নেই। চৈতন্যোত্তর কালেও কোন কোন কবি সখেদে স্বীকার করেছেন যে দেশীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা করলে নিন্দিত হতে হয়। কিন্তু সমসাময়িক যুগের নিন্দাস্তুতি অনেক সময়ই অযথার্থ বলে প্রমাণিত হয়। যা হোক, চৈতন্য-পূর্ব যুগে যে অনুবাদের ধারা শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিহত হয়ে উপলখণ্ডের মধ্য দিয়ে পথ করে ক্ষীণস্রোতে কোনক্রমে সমভূমিতে নামবার উদ্যোগ করছিল, চৈতন্যোত্তর যুগে তা'ই সমভূমির স্পর্শ লাভ করে শতধারায় প্রবাহিত হতে আরম্ভ করলো। বস্তুত রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত,--প্রধানত এই তিনটি মহাকাব্য-পুরাণের কত অনুবাদ যে এই যুগে রচিত হয়েছিল, তার যথাযথ সংবাদ-সংগ্রহ কঠিন ব্যাপার। রামায়ণ এবং ভাগবত-অনুবাদ চৈতন্য-পূর্ব যুগেই শুরু হয়েছিল, মহাভারতের সৃষ্টি এবং পুষ্টি প্রধানতঃ চৈতন্যোত্তর যুগে।

সমগ্র মধ্যযুগ ধরেই বহু কবিমনীষী রামায়ণ মহাভারত এবং ভাগবতপুরাণকে মাতৃভাষায় অনুবাদ করে আমাদের সাহিত্য-পিপাসার নিবৃত্তিতে সহায়তা করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, – সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানের এবং ভাবের বিষয় নিয়ে এতো সাহিত্য রচিত হয়েছে, তাদের অনুবাদে কেউ অগ্রসর হলেন না কেন? আঙ্গিকের দিক দিয়ে সংস্কৃত ভাষায় মহাকাব্য ছাড়াও অজস্র খণ্ডকাব্য, গীতিকাব্য, শতক কাব্য, নাটক-প্রহসন-আদি দশবিধ রূপক, গদ্যকাব্য, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ-আদি কাহিনী ইত্যাদি বিচিত্র সাহিত্যধারার কোনটিই বাঙলা ভাষায় অনূদিত হয়নি। অমরকবি কালিদাস, ভবভূতি, ভর্তৃহরি বা বাণভট্ট, দণ্ডী প্রভৃতি যে অনুপম রসসৃষ্টি করে গেছেন তাদের কোনটি যদি মধ্যযুগে হতো, তবে বাঙলা সাহিত্য বোধ হয় বহু পূর্বেই যৌবনে উপনীত হতো। মধ্যযুগের বাঙালী মানসের অপরিণতি ও দুর্বলতাই আমাদের প্রকৃত জাগরণকে অনেকখানি দূরে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল—এটি আমাদের চরম দুর্ভাগ্য। ভারতের অপর কোন কোন ভাষায় সংস্কৃত ভাষার অপর কিছু বিশেষ গ্রন্থ অনূদিত হলেও অবশ্য তাদের জীবনেও যে জাগরণ বিলম্বিত হয়েছিল, এটি অবশ্যই হতাশাজনক।

যাহোক পূর্বোল্লিখিত অনুবাদসমূহ যে বাঙলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধনে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, এ বিষয়ে অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমতটি উদ্ধারযোগ্য। তিনি এই অনুবাদগুলি সম্বন্ধে বলেছেন, "এইভাবে বাঙলায় আর্যসংস্কারের প্রভাব না পড়লে বাঙলা সাহিত্যে কোনদিনই লোকসাহিত্যের সীমা ছাড়তে পারত না। বাঙলা সাহিত্য যে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক কালের মধ্যে একটি সুগঠিত সাহিত্য কর্মরূপে সম্মানিত হয়েছে, তথাকথিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের ছাপ না পড়লে এ সাহিত্যের এ ধরনের বিকাশ হতে পারত না অনুমান করি। তাই বাঙালী সমাজের পুনর্গঠনের জন্য, বাঙালী ঐতিহ্যের সর্বভারতীয় প্রাণধারার সঙ্গে যোগ স্থাপনের জন্য রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদাশ্রয়ী প্রভাবের এত প্রয়োজন ছিল।"

[দুই] রামায়ণ

সাধাবণত 'রামায়ণ' বলতে আমরা আদিকবি বাল্মীকি-কৃত বামাযণকে বুঝালেও পরবর্তীকালে এরই অনুসরণে অন্তত আরও তিনটি রামায়ণ রচিত হযেছিল ঃ –'অদ্ভুত বামাযণ, যোগবাশিষ্ঠ রামাযণ এবং অধ্যাত্ম রামায়ণ'। কৃত্তিবাস মূলত বাল্মীকি-রামাযণ অনুসবণ করলেও পববর্তী কবিগণ অন্যান্য বামাযণ থেকেও যদৃচ্ছ উপাদান আহরণ কবে স্ব স্ব গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি কবেছেন। কেউ কেউ বা সম্পূর্ণভাবেই ভিন্ন রামায়ণ-অবলম্বনে কাব্য বচনা কবেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ কবা প্রয়োজন যে কৃত্তিবাসও কিছু কিছু কাহিনী অধ্যাত্ম-রামায়ণ এবং অন্য সূত্র থেকে আহবণ করেছিলেন। অবশ্য এগুলি প্রক্ষিপ্ত অংশও হতে পাবে।

বামাযণের বৈচিত্র্য

কৃত্তিবাসোত্তর কালে যাঁবা রামাযণ অনুবাদ কবছেন, তাঁদেব বেশির ভাগই বাল্মীকি বামায়ণকে গ্রহণ করেনি নি। কাজেই বাঙলা রামায়ণ যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাল্মীকিব অনুসরণ নয়, এ বিষয়ে অবহিত থাকা প্রয়োজন।

'অদ্ভুতরামায়ণ' বাল্মীকির রচিত বলে প্রচারিত হলেও এটি প্রকৃতপক্ষে বহু পববর্তী কালের রচনা। ২৭ সর্গে সম্পূর্ণ এই রামায়ণটিতে ১৩৬০টি মাত্র শ্লোক বয়েছে। সীতা রাবণের কন্যা এবং সীতার হস্তেই সহস্রস্কন্ধ রাবণের মৃত্যু ঘটেছিল,—এই মৌলিক কাহিনীটিই আলোচ্য গ্রন্থটির প্রধান উপজীব্য। অধিকন্তু এতে সাংখ্যযোগ, ভক্তিবাদ ও শক্তিতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় বিবিধ আলোচনাও স্থানলাভ কবেছে। মনে হয়, পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ধর্ম এবং শাক্তধর্মের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধানেব চেষ্টা থেকেই আলোচ্য গ্রন্থটির উদ্ভব হয়েছিল। এতে রামচন্দ্রকে ব্রহ্ম-রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হযেছে।

অদ্ভুত রামায়ণ

'অধ্যাত্মবামায়ণ' কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের রচিত বলে প্রচারিত। বলাবাহুল্য এই গ্রন্থখানিও অনেক পরবর্তীকালেব বচনা। এতে মূল রামায়ণেব কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। গ্রন্থের নামকবণ থেকেই বোঝা যায এতে তত্ত্বেব দিকটাই অধিকতর প্রাধান্য লাভ কবেছে। প্রতিটি সর্গেই দেখা যায যে মহাদেব পার্বতীর নিকট রামকাহিনী এবং রামতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। শাক্তধর্মেব প্রভাববশতই যে গ্রন্থখানি রচিত হয়েছিল, এ থেকেই তা' বোঝা যায। এই গ্রন্থেও বামচন্দ্রেব ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করা হযেছে।

অধ্যাত্ম রামাযণ

'যোগবাশিষ্ঠ বামাযণ'ও বাল্মীকির নামে প্রচাবিত। কিন্তু এটি যে পববর্তীকালেব রচনা তা না বললেও চলতে পারে। গ্রন্থে বলা হযেছে, বাল্মীকি-কৃত ২৪০০০ শ্লোক-বিশিষ্ট সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পূর্বখণ্ড মাত্র। 'যোগবাশিষ্ঠ বামাযণ'ই এব অপব খণ্ড। রামচন্দ্রেব বৈরাগ্যোদয় হলে বশিষ্ঠ যেভাবে তত্ত্বোপদেশ দ্বারা তাঁকে আবার সংসারধর্মে আগ্রহী কবলেন, তাই আলোচ্য গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য। কিন্তু বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও দার্শনিক আলোচনাই গ্রন্থটিব বিশেষ সম্পদ। এই গ্রন্থেও রামচন্দ্রের ব্রহ্মত্ব প্রতিষ্ঠা কবা হযেছে।

যোগবাশিষ্ঠ রামাযণ

পূর্বোক্ত তিনখানি গ্রন্থের ঐক্যবদ্ধ আলোচনায় এই কথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে পরবর্তীকালে ধর্ম ও দর্শনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই রামকাহিনীকে পরিবর্তিত করবার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল এবং এইভাবেই বিভিন্ন রামায়ণ সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। বাঙলাদেশে কোনকালে রামমন্দির স্থাপিত হয় নি, রামবিগ্রহ পূজিত হয় নি, রামায়েৎ সম্প্রদায়ও গড়ে উঠে নি, কিন্তু রামায়ণ-কাহিনী বাঙলার চির আদরের বস্তু বলেই তার অনুবাদকেরও কখন অভাব ঘটেনি।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে চৈতন্যোত্তর যুগে অনুবাদ সাহিত্যের প্লাবন বয়ে গিয়েছিল। বস্তুতঃ, কথাটিকে আক্ষরিকভাবে সত্য বলেই মনে করা চলে। কারণ, একমাত্র রামায়ণের অনুবাদকের নামই পাওয়া যায় পঞ্চাশাধিক; অনুমান করা চলে, এখনও পর্যন্ত অনেক কবিই হয়তো অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছেন। তবে লক্ষ্য করা চলে, যশঃপ্রার্থী কবিরা অনেকেই রামায়ণ থেকে নির্বাচিত কাহিনীর বা বিশেষ কোন কাণ্ডেরই অনুবাদ করেছেন মাত্র। রামায়ণের কয়েকটি বিশেষ অংশই যে কবিদের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, আলোচনাকালে তাও প্রমাণিত হয়।

১. অদ্ভুতাচার্য ঃ চৈতন্যোত্তর যুগের রামায়ণ-রচয়িতাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন অদ্ভুতাচার্য। অবশ্য এই অদ্ভুতাচার্য নামটির আড়ালে যিনি আত্মগোপন করেছেন, তাঁর প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ আচার্য। নিত্যানন্দ আচার্য 'অদ্ভুত রামায়ণে'র অনুবাদ করেছিলেন, এই কারণেই তাঁর নাম অদ্ভুতাচার্য হতে পারে। কেউ কেউ অনুমান করেন যে 'তিনি 'অদ্ভুত-আশ্চর্য' রামায়ণের রচয়িতা বলেই, ''অদ্ভুতাশ্চর্য অদ্ভুতাচার্য' নাম পেয়েছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন বলেন, ''অদ্ভুতাচার্য কবির নামও নহে, উপাধিও নহে। ইহা রামায়ণ-গায়কদের উদ্ভাবিত।'' কিন্তু তাই যদি হবে তবে গ্রন্থের ভণিতায় 'অদ্ভুত-আচার্য' এবং 'অদ্ভুত' নামই বা থাকবে কেন? আমাদের মনে হয় 'আচার্য'-কৌলিক উপাধিধারী কবি 'অদ্ভুত' রামায়ণ রচনা করেছিলেন বলেই স্বেচ্ছায় এই উপনামটি গ্রহণ করেছিলেন, — সহজবুদ্ধির এই সিদ্ধান্তটিই সমীচীন।

নাম-বৈশিষ্ট্য

অদ্ভুতাচার্য নিত্যানন্দ তাঁর গ্রন্থে বিস্তৃত আত্মপরিচয়-কাহিনী লিখে গেছেন। তা' থেকে জানা যায় যে কবির পিতা ছিলেন শ্রীনিবাস (অথবা কাশী) আচার্য, মাতা মেনকা। কবি উত্তরবঙ্গে আত্রেয়ী ও করতোয়ার অন্তর্বর্তী বড়বাড়ি বা অমৃতকুণ্ডা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবি যখন 'সপ্ত বৎসরের শিশু' তখন একদিন 'স্বপ্নাদেশে সাক্ষাৎ হইল রঘুপতি।' তারপর রঘুপতি

'টোনা (তূণ) হইতে অস্ত্র খসাইয়া লৈল হাতে।
এক মহামন্ত্র তার লিখিল জিহ্বাতে।।'

আত্মপরিচয়ের একটি পাঠান্তরে কবি তাঁর অদ্ভুত-আচার্য নামের কারণ বর্ণনা করেছেন ঃ

'রাম আজ্ঞা করিল রচিতে রামায়ণ।
অদ্ভুত আচার্য নাম তাহার কারণ।'

অদ্ভুতাচার্যের জীবৎকাল-সম্বন্ধে মতান্তরের অবসান হয় নি। কবির খুব প্রাচীন পুথি সুলভ না হওয়ায় ডঃ সুকুমার সেন তাঁকে সপ্তদশ শতকের শেষভাগের কবি বলে মনে করেন। পক্ষান্তরে ডঃ ভট্টশালী এবং মণীন্দ্র বসু অনুমান করেন যে নিত্যানন্দ ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু কবি যেকালেই বর্তমান থাকুন, তাঁর কাব্য যে কালের নিকষে উত্তীর্ণ হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য ডঃ সুকুমার সেন কবি-সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্যই করেছেন। তিনি বলেন যে, কাব্যটিতে কবিত্বের কোন বালাই নেই। কিন্তু যদি এটি প্রকৃত অকাব্য হতো তবে প্রচলিত কৃত্তিবাসের কাব্যে তাঁর প্রভাব পড়ত না কিংবা তাঁর 'অদ্ভুত রামায়ণ' থেকে প্রচুর অংশ তাতে অন্তর্ভুক্ত হতো না।

কবির কাল

অদ্ভুতাচার্য শুধু যে সমগ্র রামায়ণই অনুবাদ করেছিলেন তা' নয়, তিনি অধ্যাত্ম রামায়ণ এবং অপর কোন সূত্র থেকেও কাহিনী আহরণ করে তাঁর কাব্যের কলেবর বৃদ্ধি করেছিলেন। ডঃ সেন অনুমান করেন যে অপরাপর কবিদের রচনাও এতে অঙ্গীভূত হয়েছে। ফলত এর আকার কৃত্তিবাসী রামায়ণকেও ছাড়িয়ে গেছে। নিত্যানন্দ নোতুন সূত্র থেকে উপাদান আহরণ করেছেন বলে তাঁর মৌলিকত্ব অনাস্বাদিতপূর্ব। দৃষ্টান্তস্বরূপ কৌশল্যা-চরিত্রকে যশোদার আদর্শে গঠন করেছিলেন। ফলত কৌশল্যা একেবারে বাঙালী মা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। শুধু এই একটিমাত্র চরিত্রেই নয়, গ্রন্থের নানা কাহিনী ও চরিত্রের বুননে কবি বাঙালীয়ানা দ্বারাই ফাঁক বোঝাই করেছেন। এইদিক থেকে কাব্যটি বাঙালীর শাশ্বত রস-পিপাসা-বোধকে তৃপ্ত করতে পারবে আশা করা যায়। সুধী ঐতিহাসিক যথার্থই বলেছেন ঃ "এমনি ছিলেন বাঙালির কবি অদ্ভুতাচার্য। বাঙালীচেতনার সর্বিক আদর্শ মহিমাঙ্কনে বাঙালি জীবনের চাপল্য-তরল সাধারণ মুহূর্তের চিত্রণে সমপরিমাণে তাঁর লেখনী ছিল মুক্ত-পক্ষ সিদ্ধহস্ত।"

কাব্য বিচার

২. জগদ্রাম ও রামপ্রসাদ রায় ঃ পিতা-পুত্র একসঙ্গে কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়ে কাব্য সমাপ্ত করছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত দুর্লভ। আলোচ্যক্ষেত্রে আমরা সেই দুর্লভ দৃষ্টান্তের সন্ধান পেয়েছি। রাণীগঞ্জের নিকটবর্তী দামোদর-তীরবাসী ভুলুই গ্রামের বন্দ্যবংশীয় জগদ্রাম রায় এবং তৎপুত্র রামপ্রসাদ রায় একত্রে রামায়ণ রচনা করেন। জগদ্রামের পিতা রঘুনাথ রায় এবং মাতা শোভাবতী। কবি জ্যেষ্ঠভ্রাতার আদেশে কাব্যরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন বলেই আত্মপরিচয়-শীর্ষক অংশে উল্লেখ করেছেন। তাঁর কাব্যের নামও 'অদ্ভুত আশ্চর্য রামায়ণ'।

পিতাপুত্র-রচিত এই রামায়ণখানি আকারে সুবৃহৎ। এতে সপ্তকাণ্ড রামায়ণের সঙ্গে 'পুষ্করকাণ্ড' নামে একটি কাণ্ড ও 'রামরাস' নামে অতিরিক্ত একটি খণ্ড যুক্ত হয়েছে। এব 'লঙ্কাকাণ্ড' এবং 'উত্তরাকাণ্ড' রচনা করেছিলেন পুত্র রামপ্রসাদ রায়। অবশিষ্ট অংশ জগদ্রামই রচনা করেছেন। রামপ্রসাদ রায় ভণিতায় জানিয়েছেন, কিভাবে তিনি পিতাকর্তৃক আদিষ্ট হয়ে গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

পিতা-পুত্র

কবিদ্বয় গ্রন্থ-রচনায় শুধু যে অদ্ভুত রামায়ণেরই সহায়তা গ্রহণ করেন, তা' নয়। পুত্র রামপ্রসাদ রায় বলেছেন ঃ

'সীতারামলীলা নব্য রচিলা সুন্দর কাব্য শ্রীঅদ্ভুত-রামায়ণ নাম।
অদ্ভুত-অধ্যাত্ম মত একত্র করিয়া যুত রচনা বিবিধ রসধাম।।'

অদ্ভুত রামায়ণের সঙ্গে অধ্যাত্ম রামায়ণ থেকেও তাঁরা উপকরণ আহরণ করেছিলেন। রামপ্রসাদ রায় গ্রন্থটি ১৭১২ শকাব্দে (১৭৯১ খ্রীঃ) সমাপ্ত করেছিলেন। এর পূর্বেই পিতাপুত্র সম্মিলিতভাবে 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি' নামেও অপর একখানি কাব্য রচনা করেছিলেন। অকালে রামচন্দ্র-কর্তৃক দুর্গাপূজাই এর বিষয়বস্তু।

পিতাপুত্রের কৃতিত্ব-বিচারে একসঙ্গেই বলা চলে যে উভয় কবিই কাব্য-রচনায় সার্থকতা লাভ করেছেন। যদিও পুত্র পিতার কৃতিত্বের কাছে আপনাকে অতিশয় ক্ষুদ্র বলে অভিহিত করেছেন, তৎসত্ত্বেও তাঁর উক্তিকে নিতান্ত বিনয় বলেই মনে হয়।

'পিতার রচিত কাব্য তাতে অতিশয় ভব্য
প্রত্যক্ষরে সুধা ক্ষরে যাথে।
কেবল রসের সিন্ধু প্রকাশেতে পূর্ণ ইন্দু
মোর কাব্য খদ্যোত লিখিতে।।'

কবিত্বশক্তিতে কেউই কম নহে এবং ছন্দেও উভয়ের পারদর্শিতা ছিল।

৩. চন্দ্রাবতী ঃ বাঙলার প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতী ছিলেন 'মনসামঙ্গল কাব্যে'র কবি দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা। দ্বিজ বংশীদাস তাঁর কাব্যের ভণিতায় বলেছেন যে ১৪৯৭ শকাব্দে (১৫৭৫-৭৬ খ্রীঃ) তিনি কাব্যটি সমাপ্ত করেন। অনুমান, কবি চন্দ্রাবতী ঐ কালেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অতএব, তাঁর কাব্যরচনাকালে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হবে এরূপ অনুমান করা যায়। কবি চন্দ্রাবতী প্রধানত গীতকাব্যকাহিনী রচয়িতা-রূপেই প্রসিদ্ধ। তাঁর রচিত 'দস্যু কেনারাম-কাহিনী' ময়মনসিংহ-গীতিকবিতার অন্তর্ভুক্ত এক বাস্তব কাহিনী—উপন্যাসের মতই মনোরম। প্রসিদ্ধ গীতিকাব্য 'মলুয়াসুন্দরী'ও চন্দ্রাবতীর রচিত বলে কেউ কেউ অনুমান করেন। চন্দ্রাবতী যেমন অপরের কাহিনী রচনা করে গিয়েছেন, তেমনি তাঁর উপন্যাসোপম জীবন-কাহিনীও অপর কবির কাব্যের উপজীব্য হয়েছে। চন্দ্রাবতী স্বরচিত কাব্যে বিস্তৃত পিতৃ-পরিচয় দিয়েছেন, আর কবি নয়নচাঁদ ঘোষ চন্দ্রাবতী-জীবন-কাহিনীকে অবলম্বন করে যে কাব্য রচনা করেছেন তাতে আমরা এই মহিলা কবির ব্যক্তিগত জীবনের এক রোম্যান্টিক ট্র্যাজেডির পরিচয় পাই। তিনি জয়চন্দ্র নামক এক বাল্যসহচরের প্রণয়াসক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু জয়চন্দ্র অপর এক মুসলমান-কন্যার প্রতি আসক্তিবশত মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে সেই কন্যাকে বিবাহ করেন। চন্দ্রাবতী কুমারীই থেকে গেলেন। পরবর্তীকালে জয়চন্দ্র আপনার ভুল বুঝতে পেরে আবার চন্দ্রাবতীর কাছে ফিরে এলে চন্দ্রাবতী তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। জয়চন্দ্র নদীর জলে আত্মবিসর্জন করেন।

কবি কাহিনী

চন্দ্রাবতী যে বামাযণ বচনা কবেছিলেন তাব কোন পুথি পাওযা যায না। 'মযমনসিংহ গীতিকা'ব সংগ্রাহক চন্দ্রকুমাব দে লোকমুখে যা' শুনেছেন, তাই সংগ্রহ কবেছেন এবং অসম্পূর্ণ অংশটিই বিশ্ববিদ্যালয-কর্তৃক 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা'য সঙ্কলিত হযেছে। চন্দ্রাবতীব বামাযণ তিনখণ্ডে বিভক্ত। এতে বিভিন্ন বামাযণেব প্রভাব সুস্পষ্ট। এখানে সীতা বাবণেব কন্যা। প্রথম খণ্ডে বাম ও সীতাব জন্মকাহিনী বর্ণনা। এই অংশেব বর্ণনায মধুসূদনেব প্রভাব তো সুস্পষ্ট। প্রথম খণ্ডে বাম ও সীতাব জন্মকাহিনী পর্যন্ত বর্ণিত হযেছে। দ্বিতীয খণ্ডে সীতা-কর্তৃক বনবাস-কাহিনী বর্ণনা। এই অংশেব বর্ণনায মধুসূদনেব প্রভাব এত সুস্পষ্ট যে এতে সংস্কর্তাব অদৃশ্য হাত স্পষ্টতই দৃশ্য হযে উঠেছে। তৃতীয খণ্ডেব কাহিনীতে কবি যথেষ্ট নোতুনত্ব পবিবেষণ কবেছেন। এতে ভবত-ভগিনী ককুযাব ভূমিকা নগণ্য নয। চন্দ্রাবতীব কোন পুথি পাওযা না যাওযা পর্যন্ত কাব্যেব সমালোচনা বৃথা। কাবণ সংগ্রাহক শ্রুতিলিপিতে যা' গ্রহণ কবেছেন তাব প্রামাণিকতা সন্দেহজনক। চন্দ্রাবতী বামাযণে বিস্তৃত আত্মপবিচয দান কবেছেন। এই অংশে মহিলাকবিব বাস্তব চিত্রাঙ্কন-ক্ষমতাব অতি সুন্দব পবিচয বর্তমান। পিতাব দাবিদ্র্য বর্ণনা কবতে গিযে চন্দ্রাবতী লিখেছেন ঃ

বৈশিষ্ট্য

'ঘবে নাই ধান চাল চালে নাই ছানি।
আকব ভেদিযা পড়ে উচ্ছিলাব পানি।।'

দুর্ভাগ্যক্রমে কবিব মূল বচনাব সঙ্গে আমাদেব পবিচয না ঘটলেও তাঁব কবিত্বশক্তিব পবিচয অন্যত্র পেযেছি, এটিই আমাদেব ভাগ্য।

৪ বঘুনন্দন গোস্বামী ঃ বঘুনন্দন গোস্বামী কৃত 'বামবসাযন' অনেক পববর্তী কালেব (আঃ১৮৩১ খ্রীঃ) বচনা হলেও উৎকর্ষে এটি অনেক প্রাচীনতব কাব্যেবও গৌবব লাঘব কবে। কবি বঘুনন্দন গোস্বামী বর্ধমানেব নিকটবর্তী মাড গ্রামেব অধিবাসী ছিলেন। ইনি মহাপ্রভু নিত্যানন্দেব বংশধব। কবি গ্রন্থশেষে আত্মপবিচযে নিত্যানন্দ প্রভু থেকে বংশধাবা টেনে এবং বিস্তৃতভাবে আত্মীয পবিজনদেব পবিচয দান কবেছেন। কবি জ্যেষ্ঠতাত বংশীমোহনেব নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ কবেছিলেন এবং প্রতি পবিচ্ছেদেব শেষে তাঁব নাম উল্লেখ কবেছেন। কবিব পিতাব নাম কিশোবীমোহন।

কবিব কাব্য অতি বৃহৎ। 'বামবসাযন' সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত হলেও এব পবিচ্ছেদ সংখ্যা অসংখ্য। মূল বামাযণেব অনুসবণে তিনি 'উত্তবকাণ্ড' বচনা কবেছিলেন, কিন্তু বিষযবস্তুব অভিনবত্বে একে সম্পূর্ণ নোতুনই আখ্যা দিতে হয। এতে সীতাব পাতাল প্রবেশও বর্ণিত হয নি। বস্তুত এই খণ্ডে কবিব মৌলিক প্রতিভাব পবিচয পাওযা যায। ডঃ সুকুমাব সেন কাব্যটি সম্বন্ধে বলেন ঃ "বামবসাযন সুবৃহৎ কাব্য। কিন্তু একটি বৃহৎ কাব্যেব মধ্যে কবিব অক্ষমতাব চিহ্ন এতটুকু নাই। ভাষা এবং ছন্দে বঘুনন্দনেব সমান ক্ষমতা ছিল।" বামবসাযন ব্যতীতও কবি 'বাধামাধবোদয' এবং 'গীতমালা' নামে আবও দু'টি কাব্য বচনা কবেছিলেন। এ ছাড়াও তিনি কযেকটি সংস্কৃত কাব্য বচনা কবেছিলেন।

গ্রন্থ পবিচয

৫. কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী ঃ বহু গ্রন্থ-প্রণেতা শঙ্কর চক্রবর্তী সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ অবধি বর্তমান ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন কাব্যের ভণিতায় যে সকল ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাতে জানা যায় যে, এঁর পিতার নাম মুনিচন্দ্র, বাসস্থান, মল্লভূমির অন্তর্গত পানুয়া গ্রামে। কবির উপাধি ছিল 'কবিচন্দ্র'। কখন কখন ইনি কবিচন্দ্র চক্রবর্তী নামেও ভণিতা দিয়েছেন। অনুমান হয়, কবি স্বাধীন মল্লরাজদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। কবির কাব্যে কয়েকজন মল্লরাজেরই নাম পাওয়া যাচ্ছে; তা' থেকে এবং কবি যে পরিমাণ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তা' থেকে অনুমিত হয় যে তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন। কবি প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের প্রায় সর্বদিকেই হাত দিয়েছিলেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'শিবায়ন, ভাগবতামৃত, রামায়ণ, মহাভারত, মনসামঙ্গল' এবং 'অভয়া-মঙ্গলে'র সন্ধান পাওয়া যায়। এছাড়াও তিনি ক্ষুদ্রকায় কয়েকটি পাঁচালীও হয়তো রচনা করেছিলেন।

কবি-পরিচয়

কবিচন্দ্র-কৃত রামায়ণটি সাধারণত 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' নামেই প্রসিদ্ধ। এটি পশ্চিমবঙ্গে বিশেষত মল্লভূমি ও রাঢ়দেশে বহুল প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। কবিচন্দ্রের রচনার উৎকর্ষ-বোধের একটি পরোক্ষ প্রমাণ এই, তাঁর রচনার বহু অংশই কৃত্তিবাসী রামায়ণে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যথাযথ মর্যাদা লাভ করেছে। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন যে 'তরণীসেন বধ, অঙ্গদের রায়বার' ইত্যাদি অংশ মূলত কবিচন্দ্রেরই রচনা। লিপিকরদের হস্তক্ষেপেই এগুলি কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। কবিচন্দ্রের রচনাও যে উৎকৃষ্ট, এটিই তার প্রমাণ।

৬. অপ্রধান কবিবৃন্দ ঃ রামায়ণের প্রধান কবিদের সম্বন্ধে বলা হ'লো। এঁরা ছাড়াও আরো কয়েকজন কবি সম্পূর্ণ অথবা অধিকাংশ রামায়ণের অনুবাদ করেছিলেন; অপরাপর কবিরা রামায়ণের বিশেষ কোন কাহিনী অথবা কাণ্ডেরই অনুবাদ করেছেন।

কৈলাস বসু সম্ভবত সমগ্র রামায়ণেরই অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর কাব্যটি 'অদ্ভুত রামায়ণে'র অনুসরণে রচিত বললেই যথেষ্ট হবে না, প্রকৃতপক্ষে এরূপ মূলানুগ অনুবাদ প্রচেষ্টা খুবই কম দেখা যায়। কবির কাব্য-রচনা-কাল জানা না গেলেও অনুমান করা হয় যে গ্রন্থকার ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগেই রচনা করেছিলেন। কবি 'মহাভাগবত' নামে অপর যে গ্রন্থখানি রচনা করেন, তাহার রচনাকাল ১৫৬৮ খ্রীঃ বলে জানা যায়।

রামশঙ্কর সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমেই বর্তমান ছিলেন। তিনি ছিলেন বৈদ্য ('ভিষক') জাতীয় কিন্তু 'দত্তরায়' উপাধিধারী। ঢাকার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত খোলাপাড়া ও বয়রা ছিল তাঁর বাসস্থান। তিনি ১৬৬৫ খ্রীঃ নবাব শায়েস্তা খাঁর সঙ্গে এইস্থানে এসেছিলেন বলে জানা যায়। কবি 'অদ্ভুত আচার্য' উপাধি ধারণ করলেও যে অদ্ভুত রামায়ণেরই অনুবাদ করেছিলেন, এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। তিনি স্পষ্টই বলেছেনঃ

'বাল্মীকি বশিষ্ঠ আর অদ্ভুত গ্রন্থকার।
মহাভারত আদি পুরাণ প্রচার।।
এইসব গ্রন্থ শুনি শ্লোক অনুসারে।
পদবন্ধ করি কহে ভিষক শঙ্করে।।'

অতএব তাঁর রচনায় বাল্মীকি রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ এবং অদ্ভুত রামায়ণই শুধু নয় মহাভারত এবং পুরাণের কাহিনীও গৃহীত হয়েছে।

দ্বিজ লক্ষ্মণ কখন এবং বাঙলাদেশের কোন অঞ্চলে বর্তমান ছিলেন, তা' বলবার কোন উপায় নেই। কারণ তাঁর রচিত পুথির বেশ পুরানো অনুলিপিই পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ উভয় স্থান থেকেই উদ্ধার করা হয়েছে। ডঃ সেন বলেন, "কবি পূর্ববঙ্গের অথবা পশ্চিমবঙ্গের যে স্থানেরই হউন, তাঁহার যশ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যটি বঙ্গদেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে প্রসারলাভ করিতে নিশ্চয়ই কিছু সময় লাগিয়াছে। সুতরাং কবির জন্ম-সময় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পরে নহে, পূর্বে।" ডঃ সেন আরও অনুমান করেন যে কবি সম্ভবত অধ্যাত্ম রামায়ণের সমগ্র অংশই অনুবাদ করেছিলেন। বন্দ্যঘটীয় লক্ষ্মণ, যিনি মহাভারতের কোন কোন পর্ব অনুবাদ করেছিলেন, তিনি এবং দ্বিজ লক্ষ্মণ একই ব্যক্তি কিনা বলা মুস্কিল।

'বুদ্ধাবতার' রামানন্দ ঘোষ সমগ্র রামায়ণের অনুবাদ করেছিলেন কিনা জানা যায় নি, তাঁর রচিত পুথিতে লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। কবির ব্যক্তিগত পরিচয় এবং রচনাকাল-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানবার উপায় নেই। গ্রন্থটির কাব্যোৎকর্ষও কিছু উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে এটি দৃষ্টি-আকর্ষণের যোগ্যতা অর্জন করেছে, তার কারণ, একদিকে ভণিতা-অংশে প্রদত্ত কবির ধর্মমত ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের কথা, অপরদিকে কবিব আপনাকে 'বুদ্ধাবতার' বলে প্রচাব করবার প্রচেষ্টা। দেশকে ম্লেচ্ছের অত্যাচার থেকে রক্ষা কববার জন্যই কালী বুদ্ধদেবকে শাপ দিয়ে আবার নরলোকে পাঠালেন এবং তিনিই 'রামানন্দ'-রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন—কবির কাব্যেই এই কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে কখনও আপনাকে 'ব্রাহ্মণ', কখনও 'শূদ্র' বলে পরিচিত করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নড়াইলের 'গঙ্গারাম দত্ত' একখানি সুবৃহৎ রামায়ণ পাঁচালী বচনা কবেন। এটি ছাড়া তিনি আবও তিনখানি কাব্য রচনা কবেছিলেন বলে জানা যায়। 'দ্বিজ ভবানীনাথ' অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে আপনার কাব্য রচনা করেছিলেন। তিনি প্রতিদিন গ্রন্থবচনার জন্য পৃষ্ঠপোষক রাজার নিকট থেকে দশ মুদ্রা করে দক্ষিণা লাভ করতেন বলে জানা যায়। কুচবিহাবের রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ যে রামায়ণখনি রচনা করেছিলেন, তা অনেকখানি মূলানুগ ছিল। তিনি এটি ছাড়া আরও কোন কোন অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে অনেক কবি রামায়ণের অংশবিশেষ অনুবাদ রচনা করেছিলেন। এরূপ খণ্ডাংশের মধ্যে 'রায়বার'-জাতীয় কাহিনীর উপরই অধিকাংশ লেখকের পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, 'রায়বার'-জাতীয় রচনাগুলিকে অনুবাদ বলবার কোন সার্থকতা নেই, কারণ এই ধরনের রচনা মূলে নেই, অপর কোন মূল থেকে ধরনটি গৃহীত হবার পর কবিগণ স্ব স্ব প্রতিভা অথবা কল্পনা-সংযোগে এগুলিকে রূপদান করেছেন। 'বায়বার' শব্দটির উৎপত্তি 'রাজদ্বার' থেকে। অঙ্গদ, বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ, কালনেমি এমনকি শূর্পণখাকেও কবিরা রাজদ্বারে উপস্থিত করেছেন। এদের মধ্যে 'অঙ্গদের রায়বার'টিই

সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়েছিল বলে মনে হয়। কারণ অধিকাংশ কবিই শুধু অঙ্গদের রায়বার রচনা করবার দিকেই ঝুঁকেছিলেন। রায়বারের মধ্যে উক্তি-প্রত্যুক্তি বা বাদ-বিতণ্ডার মাধ্যমে অতি লঘু কৌতুক ও স্থূল হাস্যরস পরিবেষিত হতো বলেই সম্ভবত সাধারণ পাঠক বা শ্রোতারা এই বিষয়ের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হতেন, কবিরাও উৎসাহ বোধ করতেন। কোন কোন কবি হাস্যরসকে আরও ফেনিল করে তুলবার উদ্দেশ্যে রায়বারে হিন্দী ভাষার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। রায়বার অংশের ছন্দও সবিশেষ লক্ষণীয়—কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই অংশগুলি লঘুচপল ঢামালী বা ধামালী (আধুনিক কালের চর্তুমাত্রক স্বরবৃত্ত জাতীয় বা ছড়ার ছন্দে) ছন্দে রচিত। নিম্নে এরূপ রচনার দু একটি উদাহবণ দেওয়া হলো ঃ

রায়বাব

'যেদিকে অঙ্গদ চাহে সেদিকে বাবণ।
দশমুণ্ড কুড়ি বাহু বিংশতি লোচন।'

একমাত্র ইন্দ্রজিৎই ছিলেন স্বমূর্তিতে। অঙ্গদ তাই ইন্দ্রজিতেব কাছেই জানতে চাইল, -- এই অসংখ্য বাবণেব মধ্যে কোনটি তাঁর পিতা ?

'কোন্ বাপ দিগ্বিজয় কৈল তিনলোকে।
কোন্ বাপ কোথা গেল সংবাদ দে মোকে।।
কোন্ বাপ চেড়ী-অন্ন খাইল পাতালে।
কোন্ বাপ বদ্ধ অর্জুনেব অশ্বশালে।।' -ইত্যাদি

উপর্যুক্ত পদগুলি কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে আহৃত হলেও এগুলি মূলত কৃত্তিবাসের রচনা নয় বলে বিশ্বাস কবা হয। কবিরাজ ফকিরভূষণের লঙ্কাকাণ্ড অথবা অঙ্গদ বায়বারের ভাষা হিন্দীমিশ্রিত। খোশাল শর্মা, রামানারায়ণ, মতিরাম প্রভৃতির বচনাও হিন্দীমিশ্রিত।

'লঙ্কামোঙ্কা দেক্কে অঙ্গদ পালট্ ফিরকে আয়ে।
মগন হোকে নাচে অঙ্গদ রামকা দরশন পাযে।।
-- খোশাল শর্মা

কাশীনাথের 'কালনেমির রায়বার' লঘু ছন্দে হলেও বিশুদ্ধ বাঙলায় লেখা।

'(যায় দেখ) ঘবপোড়াটা মরুক বেটা মায়া পাত গা তুমি।
সরোবরে স্নান করতে যাবে কুম্ভিরিণী।।
(ছলা করে) পাঠায়ে দেব হুঁশার হবে (কি) কইব তোমার কাছে।
দেখছি ভালে তোর কপালে রাজ পাট্টা আছে।।'

এতদ্ব্যতীত দ্বিজ তুলসীব 'অঙ্গদ রায়বার', দ্বিজরামের 'বিভীষণ রাযবার' এবং মহানন্দ চক্রবর্তী, দ্বিজদুলাল, হটু শর্মা, দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ, দ্বিজ পঞ্চানন প্রভৃতি বহু লেখকেরই বিভিন্ন পালা-পুথির সন্ধান পাওয়া যায়।

'তরণীসেন বধ, লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয, শত্রুঘ্ন-দিগ্বিজয়, রামের স্বর্গারোহণ' প্রভৃতি বিষয অবলম্বনেও বহু পালা-পুথি রচিত হযেছিল। কোন কোন কবি একাই হয়তো এইরূপ

খণ্ড খণ্ড অনেক পুথি রচনা করে গিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে ভবানীদাসের নাম উল্লেখ করা চলে। উনি 'লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়, শত্রুঘ্ন দিগ্বিজয়, রামের স্বর্গারোহণ' ইত্যাদি এবং রামায়ণের বিষয় ছাড়াও 'রাধাবিলাস', 'গজেন্দ্রমোক্ষণ'-আদি পালাও রচনা করে গেছেন। ইনি সম্ভবত শতাব্দীর প্রথমদিকেই আবির্ভূত হয়েছিলেন।

[তিন] মহাভারত

মহাভাবতের পশ্চাদ্‌বর্তিতা

জাতির মানস-মুক্তি ঘটলে পর কী প্রবল বেগে তা' আপনাকে প্রকাশ করবার জন্য চাবদিকে ছড়িয়ে পড়ে, ইতঃপূর্বে আমরা তা' দেখেছি। এমনি এক অবস্থায় বাঙলাদেশে অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য-সাহিত্য-আদি ভিন্নধর্মী রচনার যুগপৎ আবির্ভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কিন্তু ঐ বিশেষ যুগটিতে (চৈতন্য-পূর্ব যুগে) আমরা অনুবাদ শাখার দুটি ধারা-সম্বন্ধেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম, কারণ রামায়ণ-অনুবাদক কৃত্তিবাস এবং ভাগবত-অনুবাদক মালাধর বসু চৈতন্য-পূর্বকালে বর্তমান ছিলেন। পক্ষান্তরে অপর ধারা মহাভারত শাখার অনুবাদ অতি বাস্তব এবং সঙ্গত কারণেই সম্ভবতঃ কিছুটা বিলম্বিত হয়েছিল। রামায়ণ এবং মহাভারত উভযই মহাকাব্য এবং জাতির জীবনে উভয় কাব্যই সমান শ্রদ্ধাব আসন লাভ করেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পরিবেশ তথা দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে বস্তু-মাত্রেরই মূল্যমানের পরিবর্তন ঘটতে পাবে। মনোভূমি উভয় কাব্যকে একই কালে গ্রহণ করবার পক্ষে উপযোগী অথবা প্রস্তুত ছিল না বলেই রামায়ণ-বচনার অন্তত শতাধিক বৎসর পর মহাভারতের অনুবাদ-প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। বলা বাহুল্য, বামায়ণ এবং মহাভারতের মৌলিক পার্থক্যের জন্যই এদের মূল্যমানের পার্থক্য অনুভূত হয়েছিল।

রামাযণে রামচন্দ্রের বনবাস এবং রাম-রাবণের যুদ্ধ বর্ণিত হলেও রামায়ণ প্রকৃতপক্ষে গার্হস্থ্য-জীবনের কাব্য। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে ঃ "রামায়ণের মহিমা রাম-রাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নাই, সে যুদ্ধ ঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য-প্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষ্য মাত্র।...আমাদের দেশে গার্হস্থ্য আশ্রমের যে অত্যন্ত উচ্চ স্থান ছিল, এই কাব্য তাহাই সপ্রমাণ করিতেছে।..গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আর্য সমাজের ভিত্তি। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য।" মৌসুমী আবহাওয়ার দেশ, পলিমাটির দেশ বাঙলা তাই এত সহজে রামায়ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। 'ইহাতে যে সৌভ্রাত্র, যে সত্যপরতা, যে পাতিব্রত্য, যে প্রভুভক্তি বর্ণিত হইয়াছে" তাই বাঙালী-মনের নিকট সহজে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। এই কারণেই বাঙালীর মানসজাগৃতির ঊষালগ্নেই বাঙলাদেশে রামায়ণ-চর্চা শুরু হয়েছিল; মহাভারতকে স্বহৃদয়ে গ্রহণ করবার জন্য তখনও পর্যন্ত আরও কিছুটা প্রস্তুতির অবকাশ ছিল।

বামায়ণের আকর্ষণ ঃ গার্হস্থ্য ধর্ম

মহাভারতের প্রধান রস বীররস, এতেও গৃহধর্মের চিত্র আছে বটে, কিন্তু তা' কখনও প্রাধান্য লাভ করে উঠতে পারে নি, তা' একান্তভাবেই অনুষঙ্গ হয়ে রইল। ক্ষাত্রধর্ম বীরধর্মকে বাদ দিয়ে মহাভারতকে কখনও কল্পনা করা যায় না। এমন কি প্রধান নারীচরিত্রগুলিও বরাবর ক্ষাত্রধর্মের মর্যাদা রক্ষা করে চলেছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দ্রৌপদীর কথা উল্লেখ করা চলে। পঞ্চপাণ্ডবের এক পত্নী দ্রৌপদী—দ্রৌপদীকে নিয়ে পঞ্চ ভ্রাতার মধ্যে বিচিত্র সম্পর্কের টানা-পোড়েনে কী এক অদ্ভুত রোমান্টিক কাব্য নির্মিত হতে পারত। অথচ মহাভারতকার সেইদিকেই গেলেন না, তিনি দ্রৌপদীকে যেন ষষ্ঠ পাণ্ডব করে গড়ে তুলেছেন। বস্তুত ক্ষাত্রধর্মের বিচারে দ্রৌপদী কোন কোন পাণ্ডব অপেক্ষাও অনেক উগ্রপন্থী। আসলে, গোটা মহাভারতের কেন্দ্রীয় ঘটনা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ; অপর সকল কাহিনী তার পোষকতা করেছে মাত্র। অতএব মহাভারতের মূল রসের আস্বাদন বাঙালীর পক্ষে সহজসাধ্য হয় নি। এই প্রসঙ্গে আবও একটি কথা উল্লেখ করা চলে। পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকগণ প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন যে প্রধানত রাজ-দরবাবের আওতায়ই মহাভারতের অনুবাদ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছিল। আলোচ্য সূত্রের সহায়তায এই ঘটনাটির তাৎপর্য সহজেই বিশ্লেষণ করা চলে। সমসাময়িক কালের রাজন্যবর্গ—হিন্দু অথবা মুসলমান—স্বভাবতই যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্ভাবনার মধ্য দিয়েই কাল কাটাতেন। মহাভারতেব বীররস তাদেব মনে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করতো, তার জন্যই তাদের পক্ষে মহাভারত-অনুবাদের প্রতি লুব্ধ হবার অবকাশ ছিল। রামায়ণে যুদ্ধের বর্ণনা আছে,—কিন্তু সেই যুদ্ধ অনেকটা বর্বর যুগেব—গাছ পাথরের লড়াই। পক্ষান্তরে মহাভারতের যুদ্ধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত, অধিকন্তু তাতে রাজনীতি-কূটনীতির সম্পর্কও বিজড়িত। এই 'ভারতযুদ্ধে' ভারতবর্ষেব বিভিন্ন অঞ্চলের রাজন্যবর্গও কোন-না-কোনও পক্ষে যোগ দেওয়াতে তাতে যে রাজনীতির নানা স্তর-বিন্যাস ও কূট-কৌশলের পশ্চাদ্‌ভূমিকা ছিল, এ জাতীয় অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল পরবর্তী সময়ে আবার মুসলিম শাসন-কালে। কাজেই বাঙলাদেশেও অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টি হবার পরই দেশীয়-বিদেশীয় রাজশক্তিও মহাভারত-কাহিনীর প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। সমসাময়িক রাজন্যবর্গ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মধ্যেই স্ব-কালের চিত্র দেখতে পেতেন। এই সমস্ত কারণে বাঙলাদেশে মহাভারত-অনুবাদ-প্রচেষ্টা অনুকূল পরিবেশ-সৃষ্টির অপেক্ষায় কিছুটা বিলম্বিত হয়েছিল।

মহাভাবতের বীরধর্ম

মহাভারতের সঙ্গে রামায়ণেব যে মৌলিক পার্থক্যের কথা ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে, তা' মূল সংস্কৃত গ্রন্থ-সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। পরবর্তীকালে যখন এগুলি ভাষান্তরিত হ'লো, তখন অবশ্যই দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের রূপান্তর ঘটেছে। আলোচ্য মহাভারত-প্রসঙ্গটি বিশ্লেষণ করলেই উক্তিটির যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যাবে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে মহাভারত মূলত বীররসের কাব্য, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধই এব প্রধান লক্ষ্য, অন্য সকল ধারাই এই সমুদ্রের অভিমুখী হয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ভক্তিবাদের দেশ বাঙলায় বীররস অধিকাংশে ভক্তিরসে পরিণত

বাঙলা মহাভারতে নোতুন দৃষ্টিভঙ্গি

হয়েছে। মূল মহাভারতে কৃষ্ণের ভূমিকা নগণ্য না হলেও খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু বাঙলা মহাভারতে যেন কৃষ্ণের মাহাত্ম্য-বর্ণনাই প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানেই কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটেছে, সেখানেই বাঙালী কবি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। মূল মহাভারতে কৃষ্ণ আত্মহারা হয়ে ভীষ্ম-বধার্থে উদ্যোগী হলে ভীষ্ম চার চরণের মিতভাষণে কৃষ্ণকে বন্দনা করেছেন, আর মহাভারতের অনুবাদক এই উপলক্ষে দীর্ঘ কৃষ্ণ-প্রশস্তির অবতারণা করেছেন। আবার মূলে যেখানে কবি কুরুক্ষেত্রের বর্ণনার ভয়ঙ্কর রস পরিবেষণের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ বিবৃতি দিয়েছেন, বাঙালী কবি সেখানে সংক্ষিপ্ত ভাষণে তাঁর কর্তব্য সেরেছেন। মহাভারতে নেই, এরূপ বহু ঘটনাই বাঙালীর কাব্যে স্থান লাভ করেছে। উদ্দেশ্য—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রদর্শন। 'শ্রীকৃষ্ণকে বিদুরের খুদ প্রদান, রাজসূয় যজ্ঞে বিভীষণের অপমান, পারিজাত হরণ বা অর্জুনকে দুর্যোধনের মুকুট দান'-আদির পশ্চাতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনই কবির উদ্দেশ্য। 'সত্যভামার তুলাব্রতের কাহিনী'তে চৈতন্য-পরবর্তী যুগের ভক্তিবাদের প্রভাবের পরিচয় তো সুস্পষ্ট। দ্রৌপদীর চরিত্র-অঙ্কনে বাঙালী কবি যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীকে যে রূপে দাঁড় করিয়েছেন, তাতে তাঁকে আমরা বাঙালী বধূর মূর্তিতে দেখে পুলকিত হলেও তাঁর আসল পরিচয়টি একেবারেই চাপা পড়ে গিয়েছে। দ্রৌপদীর যে তেজোদ্দীপ্ত বজ্রগর্ভ কাদম্বিনীতুল্য রূপ-দর্শনে অতি বড় বীরপুরুষের মনেও বিভীষিকার সৃষ্টি হতে পারত, সেই দ্রৌপদীকে বঙ্গবালায় রূপান্তরিত করবার পশ্চাতে সমসাময়িক কবির বাঙালী মনটিই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ এবং তজ্জাত কূটনৈতিক বাদ-বিতণ্ডাও বাঙালী কবির নিকট হৃদয়গ্রাহী বলে বিবেচিত না হওয়ায় বাঙলা মহাভারতে 'রাজধর্মানুশাসন পর্ব, আপদ্ধর্ম পর্ব ও অনুশাসন পর্ব' বর্জিত হয়েছে। অতএব দেখা যাচ্ছে, প্রথমদিকে হৃদয়ধর্মী বাঙালীর নিকট মহাভারত উপেক্ষিত হলেও, পরে প্রয়োজনের অনুরোধে বাঙালী কবি যখন মহাভারত-অনুবাদে নিরত হলেন, তখন আপনার রুচিমাফিক একে ঢেলে সাজিয়ে নিলেন। মূলের অনেকখানি বর্জিত হয়েছে, নোতুন কাহিনী সংযোজিত হয়েছে, অধিকন্তু চরিত্রের পরিকল্পনায়ও কবি আপন স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচয় দান করেছেন। ফলত বাঙলা মহাভারতকে অনুবাদ-কাব্য বলবার বিশেষ কোন সার্থকতা নেই—বস্তুত এটি মৌলিক কাব্যই বটে।

মহাভারত কি অনুবাদ?

মহাভারতে মূল-কাহিনীর অতিরিক্ত পার্শ্বকাহিনী রয়েছে অগণিত। এদের সঙ্গে মূল কাহিনীর কোন সম্পর্কই নেই। প্রসঙ্গক্রমে যে সমস্ত কাহিনীর নামোল্লেখই যথেষ্ট হতো, কবি সবিস্তারে সেই সমস্ত কাহিনীও বর্ণনা করেছেন। আসলে গল্প-রসের প্রতি আগ্রহই সম্ভবতঃ কবিকে এ বিষয়ে উৎসাহী ক'রে তুলেছে। পাঠকও এক মহাভারত-পাঠে বহু কাব্য-কাহিনী পাঠের সুযোগ পেয়ে ধন্য হন। কাজেই ধর্মীয় বিষয়ে আগ্রহ-হীন ব্যক্তিও শুধুমাত্র গল্পরসের প্রতি আগ্রহ-বশতঃ মহাভারতের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন। এ বিষয়ে দেশীয়-বিদেশীয় সকলেই সম রস প্রাপ্ত হবেন।

বাঙলা ভাষায় রচিত মহাভারতের সংখ্যা অপরিমিত। ডঃ সুকুমার সেন প্রায় ৭৬ জন কবির কথা উল্লেখ করেছেন। বলা বাহুল্য, এঁরা সকলেই যে গোটা মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন তা' নয়। এঁদের অনেকেই পর্ব বা পর্বাংশের মাত্র অনুবাদ করেছেন। লিপিকরদের কারও কারও নামও এরূপ অনুবাদকের তালিকায় ঢুকে পড়া বিচিত্র নয়। তা' ছাড়া বিভিন্ন লেখকের রচনা একই গ্রন্থের অঙ্গীভূত হয়েছে, তেমন ঘটনাও বিরল নয়। বস্তুত, যাঁরা সম্পূর্ণ বা আংশিক মহাভারত রচনা করে গিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অল্প কয়জন কবির রচনাই আলোচিত হবার দাবি রাখে, অপর সকলের রচনা গতানুগতিক, অকাব্য অথবা চর্বিতচর্বণ মাত্র।

অনুবাদের প্রাচুর্য

১. কবীন্দ্র পরমেশ্বর ঃ পরাগলী মহাভারত ঃ বাঙলা মহাভারতের আদি কবি কে ছিলেন, এই প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক মীমাংসা আজও হয় নি। তবে অন্তত চৈতন্য-সমসাময়িক কালেই কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামে এক কবি যে সমগ্র মহাভারত কাব্যের সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ রচনা করেছিলেন, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সম্ভবতঃ ইনিই বাঙলা ভাষায় প্রথম মহাভারতকার। সুলতান হোসেন শাহের লস্কর (সেনাপতি) পরাগল খান যুদ্ধার্থে চাটিগ্রাম (চট্টগ্রাম) ও ত্রিপুরায় প্রেরিত হয়েছিলেন। যুদ্ধ জয় করে অতঃপর তিনি এইস্থানেই স্থায়িভাবে বসতি স্থাপন করেন। এই পরাগল খান (ইনি জাতিতে হিন্দু ছিলেন কি মুসলমান ছিলেন, তা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভবপর নহে) দিনেকের মধ্যে মহাভারত শুনবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে কবীন্দ্র সংক্ষিপ্ত মহাভারত রচনা করেন ঃ

'এহি সব কথা কহ সংক্ষেপিয়া।
দিনেকে শুনিতে পারি পাঁচালী রচিয়া।।
তাঁহার আদেশমাল্য মস্তকে ধরিয়া।
কবীন্দ্র পরম যত্নে পাঁচালী রচিয়া।।'

কবীন্দ্র সংক্ষেপে পাঁচালী রচনা করেছিলেন বটে, তবে তাহা 'দিনেকে' শুনবার মত এত সংক্ষিপ্ত হয় নি। প্রকৃতপক্ষে অতিশয় সীমিত আয়তনের মধ্যেই কবীন্দ্র মহাভারতের যাবতীয় প্রধান কাহিনী সন্নিবিষ্ট করে অসাধারণ কৃতিত্বেরই পরিচয় দান করেছেন। ফলত, গ্রন্থটি অবশ্য বর্ণনামূলক কাহিনীতেই পর্যবসিত হয়েছে।

কবির ব্যক্তিগত পরিচয়-সম্বন্ধেও খুব নিশ্চিতভাবে কিছু বলবার উপায় নেই। কেউ কেউ মনে করেন যে কবির নাম 'পরমেশ্বর', উপাধি 'কবীন্দ্র'। কিন্তু ডঃ সেন মনে করেন যে কবির নাম 'কবীন্দ্র'; 'পরমযত্নে' কথাটি লিপিকর-প্রমাদে 'পবমেশ্বরে' পরিণত হয়েছে। ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রীর মতে কবীন্দ্র ছিলেন কোচবিহার-রাজ নরনারায়ণ দেবের মন্ত্রী। এঁর নাম ছিল 'বাণীনাথ', রাজমন্ত্রী হয়ে ইনি 'কবীন্দ্র পাত্র' উপাধি লাভ করেছিলেন। আসাম গৌরীপুবের রাজবংশ দাবী করেন যে তাঁরা উক্ত কবীন্দ্র পাত্রেরই অধস্তন পুরুষ। যাই হউক, কবীন্দ্র যে, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্তমান থেকে কাব্যখানি বচনা করেছিলেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

কবি-পরিচয়

কবীন্দ্র-রচিত কাব্যের নাম 'বিজয় পাণ্ডবকথা' বা 'পাণ্ডববিজয় কথা' অথবা 'ভারতপাঁচালী'। কাব্যখানি সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ। কেউ কেউ অনুমান করেন যে কবীন্দ্র মহাভারত সম্পূর্ণ হবার পূর্বেই পরাগল খানের মৃত্যু হওয়ায় কবির প্রচেষ্টাও খণ্ডিত হয়। অতঃপর পরাগল-পুত্র ছুটি খানের আদেশে গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। কিন্তু এই অনুমান ভ্রান্ত। বস্তুত পরাগল খান জীবিত থাকতেই কবীন্দ্র অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত সম্পূর্ণ করেছিলেন।

পরাগলী মহাভারত

এইহেতু গ্রন্থের অপর প্রচলিত নাম 'পরাগলী মহাভারত'। গ্রন্থটি অতি সংক্ষিপ্ততা-হেতু মহাভারতীয় জটিলতা-বর্জিত। ভাষায়ও কবি বিশুদ্ধি বজায় রাখায় তৎপর ছিলেন। মনে হয়, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁকে গ্রন্থ-রচনার কাজ সমাপ্ত করতে হয়েছিল। তাই কবিত্ব-প্রকাশের সুযোগও গ্রহণ করতে পারেন নি।

পরাগলী মহাভারতে আঠারোটি পর্ব বর্তমান থাকলেও এর 'অশ্বমেধ পর্ব'টি শ্রীকর নন্দীর ভণিতা-যুক্ত। এ থেকেই অনেকে অনুমান করেছিলেন যে কবীন্দ্র সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ করেন নি, শ্রীকর নন্দী গ্রন্থটি সমাপ্ত করেছিলেন। এই সূত্র ধরেই আবার কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে কবীন্দ্র-উপাধিধারী কবির প্রকৃত নাম শ্রীকর নন্দী। নিম্নে শ্রীকর নন্দী-সম্বন্ধীয় আলোচনায় এই সমস্যাটির উপর আলোকপাত করা হচ্ছে।

২. শ্রীকর নন্দী ঃ একই পুথির ভণিতায় 'কবীন্দ্র' এবং 'শ্রীকর (শ্রীকরণ) নন্দী'র নাম ব্যবহৃত হওয়ায় এক সময় কোন কোন ঐতিহাসিকের ধারণা হয়েছিল যে, শ্রীকরণ নন্দী নামক ব্যক্তিই 'কবীন্দ্র' ছদ্মনামে বা উপাধিতে মহাভারতের কোন কোন পর্ব অনুবাদ করেছেন। কিন্তু একই বিষয়ের উপর পৃথক ভণিতাযুক্ত পদ-প্রাপ্তির ফলেই বোঝা যায় যে প্রাগুক্ত অনুমান ভিত্তিহীন। বস্তুত কবীন্দ্রের মতই শ্রীকর নন্দীর ভণিতাযুক্ত অনেকগুলি পর্বেরই সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। অধিকন্তু শ্রীকর নন্দীর পুথিতেই এমন কাহিনীর উল্লেখ বর্তমান, যা থেকে উভয়ের ভিন্নত্বে কোনো সংশয়ের অবকাশ থাকে না।

পরাগল খানের মৃত্যুর পর তৎপুত্র 'ছুটি খান' (ছোট খান, নসরৎ খান) ব্যাস মহাভারতের (সম্ভবত কবীন্দ্র-কৃত অনুবাদ) অশ্বমেধ পর্ব-কাহিনী শুনে শ্রীকর নন্দীকে 'জৈমিনি ভারতে'র উক্ত পর্বের অনুবাদ করতে আদেশ করলেন। কারণ, তিনি শুনেছেন, যে জৈমিনি-কৃত রচনা আরও মধুর। পিতা পরাগল খান যেমন দেশীয় ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করিয়ে সুকীর্তি অর্জন করেছেন, পুত্রও সেই পদাঙ্কই অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন।

'দেশী ভাষা কহি কথা রচিয়া পয়ার।
সঞ্চরউ কীর্তি মোর সকল সংসার।।'

শ্রীকর নন্দী তাঁর গ্রন্থে যে ভাবে বার বার হোসেন শাহের উল্লেখ করেছেন, তাতে অনুমিত হয়, তিনিও হোসেন শাহ-র রাজত্বকাল মধ্যেই (খ্রীঃ ১৫১৯) গ্রন্থ সমাপ্ত করেছিলেন। অর্থাৎ কবীন্দ্রের গ্রন্থ-সমাপ্তিকাল এবং শ্রীকর নন্দীর গ্রন্থ সমাপ্তিকালের মধ্যে কালগত ব্যবধান খুব বেশি না হওয়াই সম্ভব।

ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন যে শ্রীকর নন্দী সম্ভবত সমগ্র মহাভারতেরই অনুবাদ করেছিলেন। কবীন্দ্রের গ্রন্থ ছিল ব্যাস মহাভারতের অনুসরণে রচিত কিন্তু সংক্ষিপ্ত; পক্ষান্তরে শ্রীকর নন্দীর গ্রন্থ ছিল জৈমিনি ভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ এবং বিস্তৃততর। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, জৈমিনি মহাভারতের 'অশ্বমেধ পর্ব' ব্যতীত অপর কোন পর্বের সন্ধান সারা ভারতেই আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। অতএব জৈমিনি শুধু 'অশ্বমেধ পর্বই' রচনা করেছিলেন, অনুমান করা চলে। ছুটি খানের আগ্রহে শ্রীকর নন্দীর গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল বলে একে 'ছুটি খাঁর মহাভারত' নামে অভিহিত করা হয়। শ্রীকর নন্দীর মহাভারতে 'অনুশাল্ব', চন্দ্রহাস, নীলধ্বজ-জনা, প্রমীলা, যৌবনাশ্ব, বভ্রুবাহন, হংসধ্বজ' প্রভৃতির কাহিনী সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

৩. **বিজয় পণ্ডিত** ঃ এক সময় মহাভারতের আদি অনুবাদকদিগের মধ্যে বিজয় পন্ডিতকেও একজন বলে গ্রহণ করা হ'তো। নগেন্দ্রনাথ বসু সাহিত্য পরিষদ থেকে 'বিজয় পন্ডিতের মহাভারত' নামে একখানা গ্রন্থও সম্পাদনা করেছিলেন। তাঁর মতে পশ্চিমবঙ্গবাসী 'বিজয় পণ্ডিত'ই মহাভারতের আদি অনুবাদক এবং পূর্ববঙ্গে এই গ্রন্থই 'পবাগলী মহাভারত'-রূপে পরিচিত হয়েছে। ডঃ মণীন্দ্রমোহন বসু এর বিপরীত কথা বলেছেন। তাঁর মতে, "কবীন্দ্রের বচনা প্রয়োজনমত গ্রহণ ও বর্জন করিয়া ব্যাস-ভারতেব আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় বিজয় পন্ডিতের গ্রন্থের উৎপত্তি হইযাছে।" পক্ষান্তরে ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "কবীন্দ্রের 'বিজয়-পান্ডব কথা' অজ্ঞ লিপিকরদের হস্তে পড়িয়া 'বিজয় পন্ডিত কথা' হইয়াছে এবং তাহা হইতেই বিজয় পন্ডিতের মহাভারতের উৎপত্তি।" বস্তুত কবীন্দ্রের মহাভারতের প্রায সর্বত্রই এইরূপ পুষ্পিকা পাওয়া যায় —

'বিজয়পান্ডব কথা অমৃতলহরী।
শুনিলে অধর্ম খন্ডে পরলোকে তরি।"

অতএব এ থেকে লিপিবিভ্রাটে গ্রন্থের প্রায় সর্বত্রই 'বিজয় পন্ডিতে'র ভণিতা পাওযা যেতে পাবে। কবীন্দ্রের মহাভারতই যে বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতে পরিণত হয়েছে, গ্রন্থের পাঠ মিলালেও তা' উপলব্ধ হ'বে। অতএব বিজয়-পণ্ডিতের অস্তিত্বই অস্বীকৃত হ'লো।

৪. **সঞ্জয়** ঃ বাঙলা মহাভারতের ইতিহাসে 'সঞ্জয' এক সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন সঞ্জয়কেই আদি মহাভারত-কার বলে উল্লেখ করেছেন। ডঃ মণীন্দ্রমোহন বসুও সঞ্জযের অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং মনে করেন যে, কবীন্দ্রেব রচনাযই সঞ্জয়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। কারণ পরাগল খান যে কবীন্দ্রের মহাভাবত শুনবাব পূর্বেই অপর মহাভারত শুনেছিলেন, কবীন্দ্রের রচনায় এরূপ উল্লেখ বর্তমান। অবশ্য বিরোধী পক্ষ অনুমান করেন যে পরাগল খান মহাভারতের পাঠ শোনেন নি, মহাভারত কাহিনী হযতো কারও মুখে শুনেছেন। অতএব কবীন্দ্রের উক্তিতে পূর্বীকৃত অনূদিত মহাভাবতের অস্তিত্বেব কথা অলীক। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ই প্রথম সিদ্ধান্ত কবেন যে সঞ্জয নামে বা ভণিতায়

কোন বাঙালী কবি ছিলেন না। বস্তুত মহাভাবতেব পৌবাণিক সঞ্জয, যিনি ব্যাসদেবেব প্রসাদে দিব্যদৃষ্টি লাভ কবে ধৃতবাষ্ট্রেব নিকট কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেব কাহিনী বর্ণনা কবেছিলেন, তাঁব নামই ভণিতায ব্যবহৃত হযেছে। কিন্তু এই অভিমতেব বিরুদ্ধে দু'টি যুক্তি প্রবল ঃ ১ কোন কোন ভণিতায পাওযা যায 'সঞ্জয কহিল কথা বাখানে সঞ্জয'—এখানে স্পষ্টতই পৌবাণিক সঞ্জয ছাডাও অপব এক সঞ্জয (গ্রন্থকাব)-এব উল্লেখ পাওযা যাচ্ছে। ২ সঞ্জয ভণিতায যে আত্মপবিচয দান কবেছেন 'দেব-অংশে উৎপত্তি ব্রাহ্মণ কুমাব' অথবা 'ভবদ্বাজ উত্তম বংশ জন্ম সাধুকুলে।' এই সঞ্জয কি মহাভাবতেব পৌবাণিক সঞ্জয হতে পাবেন? এই প্রসঙ্গে আব একটি সূত্রেব উল্লেখ প্রযোজন। একটি মহাভাবতেব পুথিব ভণিতায পাওযা যায —

সমস্যা

'হবিনাবাযণদেব দীন হীন মতি ।
সঞ্জযাভিমানে কৈলা অপূর্ব ভাবতী।।'

হবিনাবাযণদেব 'সঞ্জয' উপনামে গ্রন্থ বচনা কবেছেন। এই সমস্ত প্রমাণ-সত্ত্বেও সঞ্জযকে উডিযে দেবাব কোন যুক্তিসঙ্গত কাবণ খুঁজে পাওযা যায না। ডঃ সুকুমাব সেন মনে কবেন যে "সঞ্জয কোন বাঙালী কবিব নাম মনে কবিবাব কাবণ নাই।" কাবণ তাঁব মতে একজন সংগ্রাহকই বিভিন্ন বচনায জোডাতাডা দিযে এই গ্রন্থখানি সঙ্কলন কবেছেন। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে সঞ্জয বচিত বলে কথিত মহাভাবতে বহু লেখকেবই ভণিতা পাওযা যায। কিন্তু প্রশ্ন এই—প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যেব কোন গ্রন্থই বা প্রক্ষেপ থেকে মুক্ত? অতএব শুধু প্রক্ষেপ বাহুল্যেব জন্যই কোন কবিব অস্তিত্বকে একেবাবে অস্বীকাব কবায চবমপন্থাই গ্রহণ কবা হয। ফলত সঞ্জয-সমস্যাব উপব নোতুন কোন সূত্র থেকে আলোকপাত না হওযা পর্যন্ত এই সম্বন্ধে শেষ কথা বলা সম্ভবপব নয।

সঞ্জয মহাভাবত যিনিই বচনা কবে থাকুন, সঞ্জয মহাভাবতে বহু নুতন আখ্যান এবং বহু আখ্যানেব বিস্তৃততব বিববণ প্রদত্ত হযেছে। ডঃ মণীন্দ্রমোহন বসু অনুমান কবেন যে সঞ্জয মহাভাবতস্থ এই সকল নোতুন কাহিনী জৈমিনি মহাভাবত থেকে গৃহীত। কিন্তু জৈমিনীয মহাভাবতেব অশ্বমেধ পর্ব-ব্যতীত অপব পর্বগুলি অপ্রাপ্য বিধায ডঃ বসুব অনুমানেব যাথার্থ্য নির্ধাবণ সম্ভবপব নয। 'পবীক্ষিতকে দংশনকাবী তক্ষক পবীক্ষিতেবই শ্বশুব, মহী-নামক বানবেব শান্তনু-রূপে জন্মগ্রহণ গান্ধাবীব দ্বাদশবর্ষ গর্ভধাবণ, খান্ডবদাহনকালে নাগিনী এবং তাব পুত্রেব সঙ্গে অর্জুনেব যুদ্ধ' ইত্যাদি অভিনব কাহিনী সঞ্জয-ভাবতেই পাওযা যায।

বৈশিষ্ট্য

৫. রামচন্দ্র খান ঃ ষোডশ শতাব্দীব মাঝামাঝি সমযেই মহাভাবত বচনায প্রবৃত্ত হযেছিলেন, এরূপ একজন কবি বামচন্দ্র খান। বামচন্দ্র খান জৈমিনীয মহাভাবতেব অশ্বমেধ পর্ব অনুবাদ কবেছিলেন। তাঁব যে দু'খানি পুথি পাওযা যায, তাব আত্মপবিচয শীর্ষক অংশে বীতিমত গোলযোগ দেখা যায। একখানি পুথিতে পাওযা যায যে কবি বাঢদেশেব দণ্ডসিমুলিযা গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন, তিনি জাতিতে কাযস্থ, পিতাব নাম কাশীনাথ এবং

অপর গ্রন্থমতে কবি ভাগীরথী তীরবর্তী জঙ্গিপুর শহরবাসী। তাঁর জন্ম ব্রাহ্মণ কুলে, পিতার নাম মধুসূদন, মাতা পুণ্যবতী। গ্রন্থের রচনাকাল 'শাকেন্দু বেদামুনিষে যুগান্তে পুরাণ' — এর নানারকম অর্থ হতে পারে। যাই হোক ঐ তারিখ ১৫৩০ খ্রীঃ—১৫৪৪ খ্রীঃ-র মধ্যেই পড়ে। অতএব কবি এই কালের মধ্যেই কাব্য রচনা করেছিলেন। সমসময়েই নিত্যানন্দের অপমানকারী রামচন্দ্র খান এবং নীলাচলগামী চৈতন্যদেবের সহায়ক রামচন্দ্র খান নামক ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। এঁরা অভিন্ন ব্যক্তি কিনা বলা সম্ভব নয়; আবার এঁদের সঙ্গে মহাভারত-রচয়িতা রামচন্দ্র খানের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, তাও জানবার উপায় নেই। রচনার দিকে থেকে রামচন্দ্র খানের মহাভারতের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নেই। রচনার ভাষায় কোন কোন স্থলে প্রাচীনত্বের চিহ্ন পাওয়া যায়। অংশ-বিশেষের বাস্তব সরসতাও উপভোগ্য।

৬. অনিরুদ্ধ রামসরস্বতী ঃ কোচবিহার কামতা রাজসভায় কয়েক-শতাব্দী যাবৎ মহাভারত-রচনা প্রচেষ্টা চলেছিল বলে জানা যায়। রাজা বিশ্বসিংহ বা বিশু কোঁচ-এর পৃষ্ঠপোষকতাব কবি পীতাম্বর ১৫৪৫ খ্রীঃ 'নলদময়ন্তী' রচনা করেছিলেন বলে অনুমিত হয়। তারপর তাঁর পুত্র শুক্লধ্বজ বা প্রসিদ্ধ চিলারায়ের প্রবর্তনায় বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত অনিরুদ্ধ রামসরস্বতী মহাভারতের কযেকটি পর্বের অনুবাদ করেন। এদের মধ্যে 'বনপর্ব, উদ্যোগপর্ব ও ভীষ্মপর্ব' প্রধান। অতঃপর তৎপুত্র গোপীনাথ পাঠক দ্রোণপর্ব পর্যন্ত অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ-কার্য পরবর্তী পুরুষ যাবৎই চলেছিল মনে হয়।

৭. দ্বিজ রঘুনাথ ঃ দ্বিজ রঘুনাথ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমিত হয়। তিনি অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর খন্ডিত আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় যে উড়িষ্যাব রাজা মুকুন্দদেবের রাজসভায় উপস্থিত হয়ে তাঁকে কবি স্বপ্রণীত কাব্য শুনিয়েছিলেন। ১৫৬৭ বা ১৫৬৮ খ্রীঃ মুকুন্দদেব শত্রুহস্তে নিহত হযেছিলেন, অতএব কবি এর পূর্বেই কাব্যটি সমাপ্ত করেছিলেন অনুমান করা চলে। প্রচলিত কাশীবাম দাসেব মহাভারতেব সঙ্গে রঘুনাথ দাসেব বিস্ময়কর সাদৃশ্যদর্শনে অনুমিত হয় যে পরবর্তীকালে একের রচনা অপরের গ্রন্থে প্রবিষ্ট হযে থাকতে পাবে। তবে রঘুনাথ জৈমিনির আদর্শে কাব্যটি রচনা কবেছিলেন বলে বঘুনাথের রচনা কোন কোন বিষযে অতি বিস্তৃত। রচনায কবির সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞতার পরিচয় পাওযা যায়।

৮. কাশীরাম দাস ঃ কাশীরাম দাস মহাভারতের আদি অনুবাদক না হলেও শ্রেষ্ঠ অনুবাদক। বস্তুত বহুতর মহাভাবত অনূদিত এবং প্রকাশিত হলেও সমগ্র বাঙলাদেশে একমাত্র কাশীবাম দাসের কাব্যই সুপ্রচারিত রয়েছে। গবেষক এবং অনুসন্ধিৎসু-ব্যতীত সাধারণ পাঠকের সঙ্গে অপর কোন মহাভারতের পরিচয় থাকার সুযোগ নেই। কাশীরাম দাস ষোড়শ শতাব্দীব শেষদিকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকেই তাঁর কাব্য বচিত হযেছিল। কাশীরাম দাস তাঁর কাব্যে যে আত্মপরিচয দান করে গেছেন, তাতে

জানা যায যে, কবি বর্ধমান জেলাব ইন্দ্রাণী পবগণাব সিঙ্গিগ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন। তাঁব পিতা কমলাকান্ত, পিতামহ সুধাকব। কবিবা তিন ভাই—কৃষ্ণদাস বা কৃষ্ণকিঙ্কব জ্যেষ্ঠ, মধ্যম কাশীদাস স্বযং এবং কনিষ্ঠ গদাধব। তিন ভ্রাতাই ছিলেন কবি। কনিষ্ঠ ভ্রাতাব কাব্যে যে আত্মপবিচয প্রদত্ত হযেছে, তাতে কাশীদাসেব উক্তি সমর্থিত হযেছে। কাশীবাম পববর্তীকালে নীলাচলে গিযে বসবাস কবেছিলেন, এবূপ অনুমান কবা হয।

কালীপ্রসন্ন সিংহেব মহাভাবতে একটি প্রবাদ বাক্য উদ্ধৃত হযেছে,—

'আদি সভা বন বিবাটেব কতদূব।
ইহা বচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুব।।
ধন্য হইল কাযস্থকুলেতে কাশীদাস।
তিন পর্বে ভাবত যে কবিল প্রকাশ।।'

প্রবাদটি সত্য হলে স্বীকাব কবতে হয যে কাশীবাম দাস আদিপর্ব, সভাপর্ব, বনপর্ব এবং বিবাট পর্বেব অংশ বিশেষ বচনা কববাব পব পবলোকগমন কবেন। তাঁব এই স্বর্গপুব গমনকে নীলাচল গমন বলে অভিহিত কবে কেউ কেউ এই প্রবাদটিব যথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ কবেন। কিন্তু বিভিন্ন পুথিতে প্রাপ্ত সূত্র থেকে জানা যায যে কাশীবামেব ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দবাম দাস জ্যেষ্ঠতাতেব আদেশে অসমাপ্ত মহাভাবত সম্পূর্ণ কববাব দাযিত্ব গহণ কবেছিলেন।

'নন্দবাম দাসে বলে শুন শ্যাম বায।
আমাবে অভয প্রভু দেহ যমদায।।
জ্যেষ্ঠতাত কাশীদাস পবলোক-কালে।
আমাবে ডাকিযা বলিলেন কবি কোলে।।
শুন বাপু নন্দবাম আমাব বচন।
ভাবত অমৃত তুমি কবহ বচন।।'

কোন কোন পুথিতে আবাব নন্দবাম দাস আপনাকে কাশীবামেব পুত্র বলে পবিচয দিযেছেন।

'দ্বিজ পদবজ লইযা কাশীব নন্দন।
জনকেব আজ্ঞামত কবিল বচন।।'

যা হোক, এই নন্দবাম সমগ্র মহাভাবত অনুবাদ কবেছিলেন কিনা সন্দেহ। হযতো ইনি উদ্যোগপর্ব এবং দ্রোণপর্ব পর্যন্তই অনুবাদ কবেছিলেন। কাশীবাম দাসেব গ্রন্থেব শান্তিপর্ব কৃষ্ণানন্দ বসু-কর্তৃক, স্বর্গাবোহণ পর্ব জযন্তদাস-কর্তৃক এবং স্ত্রীপর্ব সম্ভবত নিত্যানন্দ ঘোষ-কর্তৃক বচিত হযেছিল। দ্বৈপাযন দাস বচিত বনপর্ব, গদাপর্ব এবং সভাপর্বেব পুথিব সঙ্গে কাশীবাম দাসেব গ্রন্থেব যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান। অসম্ভব নয, কাশীবাম দাসেব মহাভাবতেব এই পর্বগুলি দ্বৈপাযন দাস বচনা কবেছিলেন। এই 'দ্বৈপাযন দাস কোন কবিব নাম ভণিতা বলিযা বোধ হয না ডঃ সেন এইবূপ অনুমান কবেন। কিন্তু একাধিক ক্ষেত্রে দ্বৈপাযন দাস আপনাকে কাশীবাম দাসেব পুত্র বলে অভিহিত কবেছেন।

'দ্বৈপায়ন দাসে বলে কাশীর নন্দন।
এতদূরে পান্ডবের স্বর্গ আরোহণ।।'

অতএব দ্বৈপায়ন দাসের অস্তিত্বকে উড়িয়ে না দিয়ে প্রবলতর কোন প্রমাণের অভাবে তাঁকে আপাতত আমরা কাশীরামের পুত্র বলেই অভিহিত করতে পারি।

প্রাগুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, কাশীরাম দাসের নামে প্রচারিত মহাভারত বহুজনের সমবেত প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। অতএব সমগ্র গ্রন্থের কৃতিত্বের বা অকৃতিত্বের দায়ভাগী কাশীরাম নন। তথাপি আলোচনার সুবিধা জন্য আমরা গ্রন্থকর্তারূপে কাশীরাম দাসের কথাই উল্লেখ করবো।

কাশীরাম দাসের কৃতিত্ব-বিচার ঃ বাঙলা ভাষায় রচিত মহাভারতগুলির মধ্যে কাশীরাম দাসের মহাভারতই সম্পূর্ণতা এবং সার্থকতা লাভ করেছে। সাধারণভাবে কাশীরাম দাসী মহাভারত ব্যাস-মহাভারতের অনুসরণে রচিত হ'লেও এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্যও বড় কম নয়। উভয়ের পর্ব-সংখ্যা সমান হ'লেও পর্বের নাম-পার্থক্য বর্তমান। কাশীরাম দাসে 'গদাপর্ব' যা ব্যাসভারতে নেই, আবাব ব্যাসভারতের 'অনুশাসন পর্ব' কাশীরামে অনুপস্থিত। ব্যাস-ভারতের 'মহাপ্রস্থান' ও 'স্বর্গারোহণ পর্ব' একত্রে কাশীদাসী ভারতে স্বর্গারোহণ পর্ব রূপে রচিত হয়েছে। এ ছাড়া পর্বগুলির মধ্যেও কিছু ইতরবিশেষ হয়েছে। কাহিনীর দিক থেকে বলা চলে, কাশীদাসী মহাভারত মোটামুটিভাবে ব্যাস-ভারতের অনুসরণ করলেও কোন কোন স্থলে গ্রহণ ও বর্জনের নীতি গ্রহণ কবেছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করা চলে যে কাশীদাসী মহাভারতে ব্যাস-ভারতের 'বিদুলার তেজস্বিতার কাহিনী, রুরু-প্রমদ্বরার উপাখ্যান এবং উঞ্ছপরায়ণ ব্রাহ্মণের শক্তুযজ্ঞ' আদি কতগুলি মনোহর কাহিনী একেবারে বর্জিত হয়েছে। আবার এতে 'শ্রীবৎস চিন্তার কাহিনী, অকালে আম্রোৎপত্তির বিবরণ, জনা-প্রবীরের কাহিনী, ভানুমতী ও লক্ষ্মণাব স্বয়ংবর'-আদি কাহিনী নোতুনভাবে সংযুক্ত হয়েছে, ব্যাস-ভাবতে এদের অস্তিত্ব নেই। ব্যাস-ভারতের যে সকল অংশ তত্ত্বালোচনা-পূর্ণ, কাশীদাসী ভারতে সেগুলি পরিবর্জিত অথবা সংক্ষেপিত হয়েছে। গীতা ব্যাস-ভারতের একটি অমূল্য সম্পদ, কিন্তু কাশীদাসী মহাভারতে নেহাৎ কাহিনীর সংযোগ রক্ষা করবার জন্য এর উল্লেখমাত্র করা হয়েছে। অনুগীতাও এতে বর্জিত হয়েছে । 'রাজধর্মানুশাসন, আপদ্ধর্ম ও অনুশাসন-পর্ব' বাঙলা মহাভারতে প্রায় অনুক্ত বললেই চলে। আবার কাশীদাস কখন কখন মূল কাহিনীবও রূপান্তর ঘটিয়েছেন। 'যক্ষ-যুধিষ্ঠির সংবাদে' কাশীদাসী ভারতে মাত্র চারটি প্রশ্নের উল্লেখ আছে কিন্তু মূলে প্রশ্ন ছিল শতাধিক। কাশীদাসী ভারতে অশ্বমেধ যজ্ঞেব ঘোড়া যে সমস্ত দেশে গিয়েছিল, তার উল্লেখ ব্যাসের গ্রন্থে নেই। আবার ব্যাসের গ্রন্থে যে সকল দেশেব কথা আছে, তা' বাঙলা মহাভারতে নেই। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় যে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের লক্ষ্যভেদ্‌-চেষ্টা বর্ণিত হয়েছে, তা' ব্যাস-ভারতে নেই। কাশীদাসী মহাভারতে যে 'পারিজাতহরণ, রাজসূয় যজ্ঞে বিভীষণের অপমান কিংবা সত্যভামার তুলাব্রত-আদি কাহিনী' বর্ণিত হয়েছে,

ব্যাস-ভারতে এই সমস্ত কাহিনী অনুপস্থিত। বস্তুত, কাশীদাসী ভারত প্রধানত ভক্তিবাদের প্রবলতার মধ্যে নিপতিত হয়েছিল বলেই এর প্রভাবে বহু কাহিনী বর্জিত, গৃহীত ও পরিবর্তিত হয়েছিল। ইতঃপূর্বে বাঙলাদেশে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটে গিয়েছে, ফলে প্রায় সমগ্র দেশই কৃষ্ণভক্তিতে মেতে উঠেছে। এহেন সময় কাশীরাম দাস, যিনি একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব ছিলেন এবং সম্ভবত সেই কারণেই নীলাচলধামে বাসের ব্যবস্থা করেছিলেন, তিনি যে আপন গ্রন্থকে সুবিধাজনকভাবে কৃষ্ণভক্তি-প্রকাশের অনুকূল কবে গড়ে তুলবেন, তা' আব বিচিত্র কি ? বাঙালীয়ানার ছাঁচে বাঙলা মহাভারত সৃষ্টি করে কাশীবাম দাস যে অসাধ্যসাধন ক'রেছেন, তা'ই তাঁকে যুগযুগান্তরকাল বাঙালীমানসে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত বেখেছে, কাশীরাম দাসের এটিই শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি।

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে অসংখ্য কবি অনুবাদ-ক্রিয়ায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁদেব মধ্যে যাঁবা বিশেষ শক্তিমান্, সেই সমস্ত কবির মনোভাবে একটা বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য কবা যায়। তাঁবা কাহিনীব জন্য মূল সংস্কৃত গ্রন্থের দ্বারস্থ হ'যেছিলেন ঠিকই কিন্তু অন্ধভাবে অপবেব অনুকবণ ক'বে যান নি। রামায়ণ অনুবাদের ক্ষেত্রে কৃত্তিবাস এবং ভাগবত অনুবাদ ক্ষেত্রে মালাধর বসু যে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিযেছেন, মহাভারত অনুবাদের ক্ষেত্রে কাশীরাম দাসেব কৃতিত্বও তারই অনুরূপ। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কাহিনীকে একালেব পটভূমিকায পরিবেশন কবতে গিয়ে কবি সমকালেব দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণ কবেছিলেন। তাই মূল মহাভাবতেব ক্ষাত্রবীর্য অনুবূপভাবে বাঙলা মহাভারতে ফুটে উঠবার অবকাশ পাযনি। অবশ্য এ কথা সত্য, কৃত্তিবাসী রামাযণে বাঙালীযানা যতটা পরিস্ফুট, কাশীদাসী মহাভারতে তেমনভাবে বাঙালীযানা ফুটে ওঠা সম্ভব নয। কাবণ, বামাযণ গার্হস্থ্য-জীবনেব কাব্য, এতে পাবিবাবিক জীবনের সম্পর্ককে বাঙালীর ছাঁচে ঢেলে সাজা সম্ভবপব, কিন্তু সমগ্র দেশেব বাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন মহাভাবতকে বাঙালী জীবনেব আদলে গড়ে তোলা অসম্ভব ব্যাপাব। তৎসত্ত্বেও কাশীবাম দাস মূল কাব্যের কাহিনী ও রসকে যতখানি সম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখেও যতটা সম্ভব স্বতন্ত্র বুদ্ধিব পবিচয দিয়েছেন। এই কাবণেই অসংখ্য মহাভারতেব অনুবাদেব মধ্যে কাশীবামের মহাভাবতই বাঙালীব ঘবে সুদীর্ঘকাল এত সমাদবের সঙ্গে গৃহীত হ'য়ে আসছে। এ বিষযে ডঃ অসিতকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায বলেন, "কৃত্তিবাসী বামাযণে বাঙালীব জীবন ও সমাজের এত বেশী ছাপ পড়েছে যে, রামকাহিনী বাঙালীব ঘবেব সামগ্রী হ'যে গেছে। কাশীদাসী মহাভাবতে ঠিক ততটা বাঙালীয়ানা দেখা যায না। তবে কাশীবামেব বিনযাবনত বৈষ্ণব মনটি রচনাব মধ্যে অকৃত্রিমভাবেই ধবা পড়েছে—ভক্তবংশে যে তাঁব জন্ম হয়েছিল, তা তাঁব বচনা থেকেই বুঝতে পারা যায। এদিক থেকে উত্তব-চৈতন্য যুগেব ভক্তিব ধাবা তাঁব হৃদয়কে গভীরভাবে প্লাবিত কবেছিল।"

৯ **নিত্যানন্দ ঘোষ ঃ** মহাভাবতের অনুবাদক নিত্যানন্দ ঘোষ সম্ভবত বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর অঞ্চলেব লোক ছিলেন, কাবণ তাঁব কাব্যেব সমস্ত পুথিই এই অঞ্চল থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে। নিত্যানন্দ ঘোষেব গ্রন্থেব কোন প্রাচীনতব পুথি পাওযা না যাওযায ডঃ সুকুমার

সেন অনুমান করেন যে সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু 'গৌরীমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা পাঁকুড়রাজ পৃথ্বীরাজ অন্যরকম সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন,

'অষ্টাদশ পর্ব-ভাষা কৈল কাশীদাস।
নিত্যানন্দ কৈল পূর্বে ভারত প্রকাশ।'

কাশীদাসের কাব্য যদি ১৬০৪-৫ খ্রীঃ-র দিকে রচিত হয়ে থাকে, তবে নিত্যানন্দ ঘোষ অন্তত ষোড়শ শতাব্দের শেষদিকে বর্তমান ছিলেন, অনুমান করা চলে। নিত্যানন্দ ঘোষের বিভিন্ন পর্বের পুথি পাওয়া গেলেও সম্ভবত তিনি সমগ্র গ্রন্থের অনুবাদ করেন নি। কেউ কেউ ধারণা করেন যে কবি সাতটি মাত্র পর্বের অনুবাদ রচনা করেছেন।

১০. **কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী ঃ** 'কবিচন্দ্র' উপাধিধারী শঙ্কর চক্রবর্তী সম্ভবত সপ্তদশ শতকের শেষ এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে বর্তমান ছিলেন। তিনি একাধিক মল্লরাজার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর কাব্যের ভণিতায় পাওয়া যায় ঃ

দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় ভাবি রমাপতি।
লেগোর দক্ষিণে ঘর পানুয়ায় বসতি।।
ব্যাসের আদেশ পায়   দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায়
কুঞ্জলালে রক্ষ নারায়ণ।।

মল্লভূমির অন্তর্গত পানুয়াব অধিবাসী কবিচন্দ্রের পিতা ছিলেন মুনিরাম চক্রবর্তী। কুঞ্জলাল সম্ভবত কবির পুত্রের নাম। কবি ছিলেন ভূরি-রচয়িতা। নিম্নোক্ত কাব্যগুলিতে তাঁব ভণিতা পাওয়া যায় ঃ 'মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবত, শিবায়ন, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল এবং লক্ষ্মীচরিত্র ও শীতলামঙ্গল' নামক পাঁচালী। মল্লরাজ প্রথম গোপাল সিংহদেবের দ্বারা সম্বর্ধিত এবং আদেশপ্রাপ্ত হয়েই কবি মহাভারত রচনা করেছিলেন। গোপাল সিংহদেবের রাজত্বকাল ১৭১২ খ্রীঃ-১৭৪৮ খ্রীঃ। অতএব কবিও এই কালেব মধ্যেই কাব্য রচনা করেছিলেন। কবিচন্দ্র সমগ্র মহাভারতেরই অনুবাদ রচনা করেছিলেন।

১১. **ষষ্ঠীবর সেন ঃ** ষষ্ঠীবর সেন ঢাকা জেলার জিনাবদি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। সম্ভবত ইনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। এর পুত্র ছিলেন গঙ্গাদাস সেন। গঙ্গাদাসও পিতার মত মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন।

গঙ্গাদাস সেন কবি রচিলেক সর্ব।
শ্লোক ভাঙ্গি রচিলেক অষ্টাদশ পর্ব।।

এ থেকেই অনুমিত হয় গঙ্গাদাস সেন সমগ্র মহাভারতেরই অনুবাদ কবেছিলেন। ষষ্ঠীবব মহাভারতের পর্ব-বিশেষ অথবা সমগ্র গ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন—জানা যায় না। এমন কি পিতাপুত্র সম্মিলিতভাবে মহাভারত রচনা করেছিলেন, তাও জানবাব উপায় নেই। ষষ্ঠীবর ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস যে মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন, তাঁরাই মহাভারতকাব্যকার কিনা, প্রশ্নটি এখনও মীমাংসিত হয় নি।

বিভিন্ন শতাব্দীতে আরও বহু কবি মহাভারতের বিশেষ বিশেষ পর্ব বিশেষত 'অশ্বমেধ-পর্ব' রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউই উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। এঁদের মধ্যে দ্বিজ হরিদাসের 'অশ্বমেধ পর্ব', কৃষ্ণানন্দ বসুর 'শান্তিপর্ব', অনন্তমিশ্রের 'অশ্বমেধ পর্ব', ঘনশ্যাম দাসের কাব্য, রামেশ্বর কাব্য, লক্ষ্মণের কাব্য, কৈলাস বসুর মহাভারত, গোপীনাথ দত্তের মহাভারত, গোপীনাথ পাঠকের 'সভাপর্ব', ঘনশ্যামের 'অশ্বমেধ পর্ব', কৃষ্ণরামের 'অশ্বমেধ পর্ব' প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা চলতে পারে।

[চার] ভাগবত ও কৃষ্ণায়ণ কাব্য

বাঙলা ভাষায় ভাগবতপুরাণের প্রথম অনুবাদ রচনা করেন মালাধর বসু। পরবর্তী কালে বহু কবি (অন্তত ২৪ জন কবির নাম পাওয়া গিয়েছে) ভাগবত-অনুবাদে প্রবৃত্ত হলেও লক্ষ্য করবার বিষয়, এই অনুবাদগুলি কখনও রামায়ণ-মহাভারতের মত সার্বজনীনতা লাভ করতে পারে নি। এর প্রধান দুটি কারণ এই হতে পারে : প্রথমত রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্য হিশেবে সংস্কৃত সাহিত্যেও ছিল অতুলনীয়, কাজেই অনুবাদেও তাদের এই বিশিষ্টতা ও জনপ্রিয়তা ছিল অক্ষুণ্ণ, পক্ষান্তরে ভাগবতপুরাণ অষ্টাদশ পুরাণের (আসলে সংখ্যা আরও অনেক বেশি) একটি মাত্র—অতএব সাহিত্য-হিশেবে এটি কখনও রামায়ণ মহাভারতের সমকক্ষতা দাবি করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, ভাগবত-পুরাণের যে সকল অনুবাদ বাঙলা ভাষায় প্রচারিত হয়েছে, তাদের প্রায় সবগুলিই কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক। এই কৃষ্ণ 'ভগবান' নন, ইনি যশোদানন্দন ব্রজগোপবালক মানব কৃষ্ণ—যাঁকে অবলম্বন করে বাঙলাদেশে তথা সমগ্র ভারতেই একটি ধর্মগত গোষ্ঠী (বৈষ্ণব গোষ্ঠী) গড়ে উঠেছিল, অতএব বাঙলা ভাগবতকাব্যগুলি প্রায় সর্বক্ষেত্রে গোষ্ঠীসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হ'য়ে পড়াতেই এদের কোন সার্বজনীন আবেদন ছিল না। মনে হয়, প্রধানত এই দু'টি কারণেই ভাগবতের প্রচার অপেক্ষাকৃত স্বল্প। এছাড়া, রাধাকৃষ্ণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত উৎকৃষ্ট মানের পদাবলী সাহিত্যের জনপ্রিয়তা ভাগবতের আকর্ষণকে স্তিমিত করে থাকতে পারে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তের নিকট ভাগবতের কৃষ্ণ অপেক্ষা পদাবলীর কৃষ্ণ অধিকতর আদরণীয় বিবেচিত হ'তে পারেন, কারণ পদাবলীর রাধাকৃষ্ণের যুগল লীলার মধ্যে তাঁরা চৈতন্যলীলার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন। অবশ্য ভাগবত অনুবাদে কৃত্তিবাস-কাশীদাসের সমকক্ষ কবি প্রতিভার অভাবও এর অন্যতম কারণ হ'তে পারে।

ভাগবতের প্রচার স্বল্পতা

রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ সম্বন্ধীয় আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি যে প্রায় কোন কবিই আক্ষরিকভাবে রামায়ণ বা মহাভারতের অনুবাদ করেন নি। তাঁরা দেশ-কাল ও রুচির প্রতি লক্ষ্য রেখে গ্রহণ বর্জনের ভিত্তিতে যুগোপযোগী করে রামায়ণ-মহাভারতকে ঢেলে সাজিয়েছেন। এমন কি বাঙালী স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে কেউ কেউ

সূত্রান্তর থেকে অথবা কল্পনার সহায়তায়ও নোতুন নোতুন কাহিনী গ্রন্থ-দ্বয়ে যোজনা করেছেন। এ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি, কাব্যরচনা-প্রসঙ্গে কবিরা যুগধর্মকে বিস্মৃত হন নি। ভাগবতের অনুবাদ সম্বন্ধেও আমরা একই সত্যে উপনীত হয়ে থাকি। সমসাময়িক বাঙালী জীবনের সঙ্গে ভাগবতের যোগ কতখানি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, তৎসম্বন্ধেও বিশেষজ্ঞের অভিমত উদ্ধার করছি। ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "প্রাচীন হোক আর অর্বাচীন হোক পুরাণগুলি মধ্যকালের বাংলা সাহিত্যে প্রচুর বিষয় যোগাইয়াছিল। তাহা ছাড়া পুরাণগুলির মধ্য দিয়াই মুসলমান অধিকারকালে হিন্দুধর্মের রূপ ও প্রকৃতি অনেক পরিমাণে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ভাগবতের প্রভাব তাহার মধ্যে সবচেয়ে বেশি। পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দে যে ভক্তিধর্ম বাঙলাদেশ হইতে উৎসারিত হইয়া ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়াছিল তাহার প্রধান শাস্ত্রভিত্তি গীতা আর ভাগবত। চৈতন্যের ধর্ম, তাঁহার গুরুদের ও তাঁহার অনুচরদের ধর্ম, ভাগবতের উপর নিষ্ঠিত হইয়া দেশীয় সাহিত্যে জীবনসেক করিয়াছিল। কৃষ্ণকথা, যাহা হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে পাওয়া গিয়াছিল, তাহা স্থানে স্থানে পরিবর্ধিত ও করিত্বাভিষিক্ত হইয়া ভাগবতে যেভাব উপস্থাপিত হইল তাহাই বৈষ্ণবতা ও ভক্তিধর্মের মধ্য দিয়া ভারতীয় ভাবনায় ও সাহিত্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে।" বাঙালী কবি যুগধর্মের কথা স্মরণে রেখেই ভাগবত অনুবাদ করেছেন অনেক ভেবে চিন্তে। অর্থাৎ প্রায় কোন কবিই ভাগবতের অনুবাদ করেন নি—সমসাময়িক বাঙালী চেতনায় যে সমস্ত অংশ প্রভাব বিস্তার করতে পারে, কবিরা সেই অংশগুলিই বেছে নিয়েছেন। মূল ভাগবতপুরাণ বারোটি স্কন্ধে বিভক্ত, দশম স্কন্ধে কৃষ্ণলীলা এবং একাদশ স্কন্ধে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণ কাহিনীর পক্ষে এই দু'টি মাত্র স্কন্ধই প্রয়োজনীয় এবং অধিকাংশ বাঙালী কবিই (মালাধর বসু সহ) ভাগবতের এই দু'টি মাত্র স্কন্ধের অনুবাদ করেছেন। অতএব বোঝা যায় পুরাণ হিশেবে তাঁরা ভাগবতকে গ্রহণ করেন নি, কৃষ্ণকাহিনীর উৎস হিশেবেই ভাগবতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এই কারণেই অনেকের মতে, ভাগবত অবলম্বনে রচিত সাহিত্যের নাম 'কৃষ্ণায়ণ' হওয়াই সঙ্গত।

অনুবাদের বৈশিষ্ট্য

মূল ভাগবত পুরাণের দু'টি স্কন্ধে কৃষ্ণলীলা কাহিনী বর্ণিত হ'লেও, লক্ষ্য করবার বিষয় যে তাতে রাধার নাম মাত্রও উল্লেখ করা হয় নি। ভাগবত-কাহিনী শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব প্রকাশক। আর মধ্যযুগে বাঙালী শ্রীকৃষ্ণের মধুর ভাবেরই সাধনা করেছে এবং এই প্রসঙ্গে রাধিকাও অপরিহার্য। স্বয়ং চৈতন্যদেব ছিলেন রাধাভাবের উপাসক। রাধিকা বর্জিত কৃষ্ণকাহিনীর কথা ভক্ত বৈষ্ণব কল্পনাও করতে পারেন না। অতএব একমাত্র ভাগবতের কৃষ্ণকাহিনীতে তাঁদের রস পিপাসা কখনও চরিতার্থতা লাভ করতে পারে না। তাই তাঁরা ভাগবত থেকে প্রাপ্ত কাহিনীতে দানলীলা নৌকালীলাদির অনুসরণে রাধা কাহিনী যোগ করে কৃষ্ণলীলা কাহিনীকে পূর্ণতা দান করেছেন। পূর্বেই যে কথাটার উল্লেখ করা হয়েছিল, তাই পুনর্বার উচ্চারণ করি। রামায়ণ মহাভারত বাঙলা কবি যেমন বাঙালীর স্বভাবধর্মের অনুরূপ করে ঢেলে সাজিয়েছেন, ভাগবতের

চৈতন্য ও ভাগবত

অনুবাদকরাও তেমনিভাবেই কৃষ্ণকাহিনী রচনা করেছেন। এতে হয়তো শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব ক্ষুণ্ণ হয়েছে, হয়তো কাহিনীও রূপান্তরিত হয়েছে, কিন্তু বাঙালী যা' হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারবে না, কবিরা সে বিষয় রচনায় নিরস্ত হয়েছেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, "ভাগবতের তত্ত্ব ও কাহিনী বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করিতে গিয়া এই লেখক-গোষ্ঠী..... কাহিনীর সূক্ষ্ম ও বাঙালী-রুচিসম্মত-রূপান্তরের দ্বারা বাঙলা ভাষার শক্তিবৃদ্ধি ও বাঙালী রসানুভূতির দৃঢ়ীকরণও সাধন করিয়াছিল।"

মূল ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও কৈশোরে মথুরা-বৃন্দাবনের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। বৃন্দাবন-লীলায় গোপীপ্রেমের প্রসঙ্গও এসেছে, কিন্তু তাদের মধ্যে 'রাধা' নামের বিশেষ কোন গোপীর উল্লেখ নেই। ঐ পর্বে কৃষ্ণের দাম, সুদাম, শ্রীদাম, বসুদাম প্রভৃতি বাল্যসখাদের বড় ভূমিকা রয়েছে। তবে এই পর্বে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কাহিনী—গিরিগোবর্ধনধারণ, পূতনাবধ, অঘাসুর বধ, বকাসুর বধ, কালীয়দমন প্রভৃতি কর্ম যার ভিতর দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভগবৎ-সত্তার প্রতিষ্ঠাই ছিল ভাগবত-পুরাণের লক্ষ্য। কিন্তু সাধারণ বাঙালী এই বীরত্বের প্রতি তত আকৃষ্ট নয়, সে ভক্তিমার্গের পথিক। বিশেষতঃ বাঙালী বৈষ্ণব সম্প্রদায় তো রাধা বিরহিত কৃষ্ণের কথা চিন্তাই করতে পারেন না। তারা কৃষ্ণের ঐশ্বর্য নয়, মধুর রূপেরই উপাসক। অতএব বাঙালী কবিরা ভাগবত কাহিনীর অনুবাদ নয়, ভাগবত কাহিনীতে রাধা কাহিনী যুক্ত করে যখন মাধুর্যরসাশ্রিত কাব্য রচনা করলেন, সেই বৈষ্ণবপাদসাহিত্যের প্রতিই ছিল বাঙালী পাঠকের সীমাহীন আগ্রহ। এই কারণেই মূল ভাগবত-কাহিনীর অনুবাদ কখনো রামায়ণ-মহাভারতের মতো বাঙালীর ঘরের জিনিস হ'যে উঠতে পারে নি, পাঠকসমাজে যথোচিত সমাদর লাভ করেনি, কিন্তু একই বৃন্দাবন-লীলাশ্রিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী বাঙালীর হৃদয়ের ধন হ'য়ে আছে।

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'ই ভাগবতের আদি অনুবাদ। অতঃপর চৈতন্যদেবের প্রায় সমসাময়িক কালেই আরও কয়েকখানা কৃষ্ণায়ণ কাব্য রচিত হয়েছিল বলে জানা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এদের কয়েকটি গ্রন্থের আর কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। হোসেন শাহের কর্মচারী যশোরাজ খান একটি 'কৃষ্ণমঙ্গল' কাব্য রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। আবার চৈতন্য-পরিকর গোবিন্দ আচার্য এবং পরমানন্দ-রচিত কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাব্যের কথাও বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নি।

১. **ভাগবতাচার্য রঘুনাথ পণ্ডিত ঃ** ভাগবত-অনুবাদ-সাহিত্যে সম্ভবত একমাত্র রঘুনাথ পণ্ডিত সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ-রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং কৃষ্ণলীলা বিষয়ক স্কন্ধগুলির আক্ষরিক অনুবাদ রচনা করেছিলেন। ভাগবতের আলোচনা-প্রসঙ্গে ইতঃপূর্বে আমরা যে সব মন্তব্য করেছি, অন্তত এই ক্ষেত্রেই ঐ সকল মন্তব্য প্রযোজ্য নয়। কারণ অপরাপর কবিগণ অনেকটা স্বানুভাবাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাগবত কাব্য রচনা করেছিলেন, নিজেদের প্রয়োজনের উপযোগী করেই ভাগবত গড়েছিলেন, পক্ষান্তরে একমাত্র রঘুনাথই পূর্বাপর

বৈশিষ্ট্য ঃ সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ

বস্তুনিষ্ঠভাবে ভাগবতের অনুবাদ করেছেন। তাঁর পণ ছিল—'মহাভাগবতে না কহিব অন্য কথা।'....অথচ আশ্চর্যের বিষয় রঘুনাথ পন্ডিত ছিলেন চৈতন্যের সমসাময়িক এবং চৈতন্য-ভক্তগোষ্ঠীরই অন্যতম। যে রাধা-লীলার স্বাদ স্বয়ং চৈতন্যদেবও গ্রহণ করেছিলেন, রঘুনাথ সেই রাধালীলা-বর্জিত ভাগবতই রচনা করেছেন।

মহাপ্রভু যখন গৌড় থেকে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তখন পথে বরাহনগরে তিনি রঘুনাথ পন্ডিতের গৃহে রাত্রিবাস করেন। মহাপ্রভু রঘুনাথ পন্ডিতের ভাগবতপাঠ শুনে তাঁকে 'ভাগবতাচার্য' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। ১৫৭৬ খ্রীঃ রচিত 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় রঘুনাথ পন্ডিতের 'কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী'র উল্লেখ পাওয়া যায়। অতএব সিদ্ধান্ত করা চলে, রঘুনাথ পন্ডিত ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালের মধ্যেই তাঁর গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেছিলেন। এ ছাড়া রঘুনাথ পন্ডিত-সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানবার উপায় নেই।

কবি পরিচয়

আগেই বলা হয়েছে, রঘুনাথ পন্ডিত সমগ্র ভাগবতপুরাণেরই অনুবাদ করেছিলেন। তন্মধ্যে প্রথম নয়টি সর্গ তিনি সংক্ষেপে রচনা করেছেন। মূল অপেক্ষা অধ্যায় সংখ্যা অনেক কমিয়ে কবি কেবল সারসংগ্রহ কবেছেন। শেষ তিনটি স্কন্ধ অর্থাৎ দশম থেকে দ্বাদশ স্কন্ধ পর্যন্ত কবি বিশ্বস্ততার সঙ্গে আক্ষরিক অনুবাদ রচনা করেছেন। অনুবাদের ভাষা গম্ভীর ও ওজস্বী, এতে কবি লঘুতাব কোন অবকাশ বাখেন নি। বচনাব অংশবিশেষ গীত হতো বলে মনে হয। তৎসত্ত্বেও কবি এব গাম্ভীর্য সর্বত্র অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। কবি স্বেচ্ছায অন্তত কোন প্রক্ষিপ্ত বচনা এব অঙ্গীভূত করেননি। ডঃ সেন বলেন, ''সাধাবণ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যেব মত 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী' লঘু কাব্য নহে। ইহাতে সাধারণ শ্রোতাব চিত্ত আকৃষ্ট হইবাব মত বিশেষ কিছুই নাই। শ্রীমদ্ভাগবত শুধু ভক্তিকে জাগরিত কবে না, বুদ্ধিকেও উদ্বুদ্ধ কবে। ইহা তাহাবই অনুবাদ।'' কবির ভাষাজ্ঞান এবং ছন্দজ্ঞানও অতিশয় প্রশংসনীয়।

কাব্য বিচার

'ভুরু-ভঙ্গ বিলসিত মুনি মনোহরা।
বিলোল-অলকাবলী কুঞ্চিত কুন্তলা।।
অলসবিলসগতি কমল ঢুলায়।
চকিত চপলদিঠী নন্দঘরে যায়।।'

মূল ভাগবতে 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম্' শ্লোকটিতে যে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এ কথা রঘুনাথ পণ্ডিতই প্রথম প্রকাশ করেন, অতঃপব জীব গোস্বামী চৈতন্যেব অবতাবত্ব প্রতিষ্ঠা কবেছেন। বঘুনাথ পণ্ডিতেব কালে চৈতন্য-মাহাত্ম্য পরিপূর্ণ রূপ লাভ করেনি বলেই কবি হয়তো তাঁর ভাগবতের অনুবাদে দানলীলা-নৌকালীলাদি-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি।

২. দ্বিজমাধব, মাধবাচার্য ঃ 'দ্বিজ মাধব এবং মাধবাচার্য' এদেব যে কোন এক নামে অথবা দুই নামে যে অন্তত দুজন কৃষ্ণমঙ্গল-কাব্যকাব ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিভিন্ন সূত্রে মাধব কবি সম্বন্ধে এত পবস্পব-বিবোধী সংবাদ পাওয়া যায় যে তা থেকে সত্য উদ্ধাব অসম্ভব ব্যাপাব। বস্তুত একই নামে যদি দুজন কিংবা ততোধিক কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য-বচযিতা থেকে থাকেন, তবে তাঁদেব বচনাব ভণিতায এবং পবিচযে এত জট পাকিযে গিযেছে যে তাঁদেব সম্বন্ধে পৃথক্ আলোচনাব অবতাবণায আবও বিভ্রান্তিব সৃষ্টি হতে পাবে।

একজন মাধব যে চৈতন্য-সমসামযিক ছিলেন, তাতে সন্দেহেব অবকাশ নেই। কাবণ তাঁব কাব্যে কোথাও আত্মপবিচয দেওযা না থাকলেও কবি বাববাব উল্লেখ কবেছেন—

'কহে দ্বিজ মাধব তাব দাসেব দাস',

অর্থাৎ তিনি চৈতন্যেব কোন পাবিষদেব শিষ্য ছিলেন। কবি দেবকীনন্দন তাঁব বৈষ্ণব-বন্দনাযও উল্লেখ কবেছেন যে মাধবাচার্য নামে মহাপ্রভুব এক ভক্ত 'কৃষ্ণমঙ্গল' বচনা কবেছেন। 'গৌবগণোদ্দেশদীপিকা' এবং 'চৈতন্যচবিতামৃতে'ব মতে এক মাধবাচার্য ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুব জামাতা। 'প্রেমবিলাস' মতে কালিদাস মিশ্রেব পুত্র এবং দেবী বিষ্ণুপ্রিযাব ভ্রাতুষ্পুত্র তথা অদ্বৈতাচার্যেব শিষ্য মাধব আচার্য বা মাধব মিশ্র 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্য বচনা কবেছিলেন। অনুমান চৈতন্যেব সমকালবর্তী এই মাধবই আদি বা প্রথম মাধব। ইনি যে ভাগবত অনুবাদ কবেছিলেন, তা অনেকটা মালাধব বসুব অনুসবণে। কবি ভাগবতেব মাত্র শেষ তিনটি স্কন্ধেবই ভাবানুবাদ কবেছিলেন, অধিকন্তু অ-ভাগবতীয কিছু কিছু কাহিনীও অন্যসূত্র থেকেআহবণ কবে তাঁব গ্রন্থেব অন্তর্ভুক্ত কবেছিলেন। তিনি যে বিষ্ণুপুবাণ বা হবিবংশ আদি সূত্র থেকে কিছু কিছু উপকবণ আহবণ কবেছেন, তা স্বীয গ্রন্থেই উল্লেখ কবে গিযেছেন।

সমস্যা

'বাজবাজ অভিষেক নাহি ভাগবতে।
বিস্তাবি কহিব তাহা হবিবংশমতে।।'

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য এই যে, বাঙালীব অতিপ্রিয বাধাকৃষ্ণেব যুগল-লীলাকাহিনী 'দানলীলা ও নৌকালীলা'ব কোন উল্লেখ পুবাণাদিতে না থাকলেও কবি আলোচ্য গ্রন্থে তাকেও সন্নিবিষ্ট কবেছেন। এতে বাধা, বড়াই এবং চন্দ্রাবলীব উল্লেখ থাকলেও ললিতা বিশাখা অনুপস্থিত।

অপব যে মাধবেব 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' পাওযা যায, তিনি চণ্ডীমঙ্গল-বচযিতা মাধব হতে পাবেন কিংবা 'গঙ্গামঙ্গল'-বচযিতা মাধবও হতে পাবেন। 'গঙ্গামঙ্গল'-এব পুষ্পিকায মাধব যে ধবনেব ভণিতা ব্যবহাব কবেছেন, 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে'ও ঠিক অনুরূপ ধবনেব ভণিতা লক্ষ্য কবা যায—

'চিন্তিযা চৈতন্যচন্দ্র চবণ কমল।
দ্বিজ মাধব কহে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।।
চিন্তিযা চৈতন্যচন্দ্র চবণ কমল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল।।'

'গঙ্গামঙ্গলে'র কোথাও কবি আপনাকে চৈতন্যের দাসের দাস বলে উল্লেখ করেননি। অতএব অনুমিত হয়, এই 'গঙ্গামঙ্গল'-রচয়িতাই হয়তো 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে'র দ্বিতীয় মাধব। কোন কোন গ্রন্থে উভয় মাধবের রচনা মিশে গিয়েছে। কিন্তু তাতেও দ্বিতীয় মাধবের রচনার অর্বাচীনতা সহজেই নজরে পড়ে। দ্বিতীয় মাধব যে নৌকালীলাদি কাহিনী বর্ণনা করেছেন তাতে রাধিকার সখী হিশেবে ললিতা-বিশাখার উল্লেখও বর্তমান। দ্বিজ মাধবের রচিত 'ভাগবতসার' নামে যে গ্রন্থটি পাওয়া যায়, তা মূলত প্রথম মাধবের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' থেকে অভিন্ন। অবশ্য এর ভিতর দ্বিতীয় মাধবের কিছু কিছু রচনাও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে।

এই দুজন মাধব ছাড়াও তৃতীয় কোন মাধবও যদি 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' রচনা করে থাকেন তবে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কারণ, মাধবের পরিচয়জ্ঞাপক আরও কিছু কিছু পদ উদ্ধার করা সম্ভব। কিন্তু জটিলতা বৃদ্ধির ভয়ে তা পরিহার করা হ'লো। বস্তুত, নিশ্চিততর কোন প্রমাণ হস্তগত না হওয়ায় দুজন মাধবেই থামতে হলো, নতুবা শুধু পরিচয়সূত্র-অনুযায়ী সন্ধান করলে তাদেব সংখ্যা চারজন বা পাঁচজন হওয়াও বিচিত্র নয়।

৩. **কৃষ্ণদাস ঃ** 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-রচয়িতা মাধব আচার্যের এক শিষ্য ছিলেন কৃষ্ণদাস। এই কৃষ্ণদাসও একখানি 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' অথবা 'মাধব-চরিত' নামক কাব্য রচনা করেন।কবি তাঁর গ্রন্থে আত্মপরিচয়সূত্রে বলেছেন, তাঁর পিতার নাম যাদবানন্দ, মাতা পদ্মাবতী। জাহ্নবীর পশ্চিমকূলে কবিব বসতি। তিনি আচার্য গোসাঞি (মাধব আচার্য) স্থানে ভৃত্যকার্য করে তাঁর দযা আকর্ষণ করেন এবং গুরু-কৃপায় নাম পেলেন কৃষ্ণদাস । তাঁর গুরু মাধবাচার্যও যে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' বচনা করেছিলেন, তাব উল্লেখ কৃষ্ণদাসের কাব্যে পাওয়া যায় ঃ

'মাধব আচার্য বন্দো কবিত্ব শীতল।
যাহার বচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।।'

কবির কাব্যরচনাকালে বৃন্দাবনে যে ষড়্গোস্বামীর পরিপূর্ণ প্রতিপত্তি বর্তমান ছিল তার পরিচয় গ্রন্থে পাওয়া যায় । অতএব অনুমান,—ষোড়শ শতাব্দীব শেষদিকেই হয়তো কবির কাব্য বচিত হয়েছিল। কবি তাঁব কাব্যে বৈষ্ণব মোহান্তদের নাম উল্লেখ করলেও কবি হিশেবে গুরু মাধবাচার্য এবং বৃন্দাবন দাসেব নাম মাত্র পাওয়া যায়।

অন্য অধিকাংশ কবির মতই কৃষ্ণদাসও মূলত ভাগবতকে অনুসরণ করলেও দানলীলা-নৌকালীলা-আদি অপৌবাণিক কাহিনীকেই বিশেষ প্রাধান্য দান করেছেন। তিনি যদিও বলেছেন,—

'দানখণ্ড নৌকাখণ্ড নাহি ভাগবতে।
অজ্ঞ নহি কিছু কহি হরিবংশ মতে।।'

কিন্তু মনে হয়, কবি আপনার অজ্ঞতার জন্যই হয়তো জানেন না যে, এ সব কাহিনী হবিবংশেও অনুপস্থিত। যা হোক, শুধু কৃষ্ণলীলা নয়, রাধাকৃষ্ণেব যুগল-লীলার বর্ণনাই ছিল কবিব উদ্দেশ্য। এমন কি কৃষ্ণকাহিনীকে পরিপূর্ণতা দানের জন্য কবি মহাভারত থেকে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ-আদি কাহিনীও গ্রহণ করেছেন। এতে কিছু কিছু রাগ-রাগিণীরও উল্লেখ আছে।

কাব্য হিশেবে কৃষ্ণদাসের রচনা সার্থক। কবি চলিত ভাষার ইডিয়ম বা বিশিষ্টার্থক পদগুচ্ছকে সার্থকভাবে তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন। আবার ছন্দ-বৈচিত্র্য সৃষ্টিতেও কবির দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। কবিত্বের দিক থেকেও কৃষ্ণদাসের কাব্যের উচ্চ প্রশংসাই করতে হয়।

৪. **কবিশেখর দেবকীনন্দন :** ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন যে বৈষ্ণব পদাবলী-রচয়িতা কবিশেখর বা রায়শেখর বা শেখর এবং 'গোপাল বিজয়'-রচয়িতা কবিশেখর দৈবকীনন্দন অভিন্ন ব্যক্তি। ডঃ মণীন্দ্রমোহন বসু এতে আপত্তি উত্থাপন করলেও তিনি আপনার অভিমতকেও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। যা হোক, কবি তাঁর গ্রন্থে আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে বলেছেন যে তাঁর পিতার নাম চতুর্ভুজ, মা হরাবতী, সিংহবংশে কবির জন্ম এবং প্রকৃত নাম দৈবকীনন্দন, কিন্তু 'শ্রী কবিশেখর নাম বলে সর্বজন'। কবি একে একে 'গোপালচরিত' নামে মহাকাব্য, 'গোপালের কীর্তনামৃত' এবং 'গোপীনাথ বিজয়' নাটক রচনা করেন। কিন্তু—

'তবু গোপবেশে মন না পুরে আমার।
তবেই পাঁচালী করি গোপাল বিজয়ে।।'

কবি-রচিত মহাকাব্য এবং নাটকটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। সম্ভবত পদাবলীগুলিকেই তিনি কীর্তনামৃত বলেছেন। চতুর্থ এই 'গোপাল-বিজয়' নামক কৃষ্ণায়ণ কাব্য।

কবিশেখরের 'গোপালবিজয়' রামায়ণ-মহাভারতাদির মত বর্ণনাত্মক কাব্য। অপর 'কৃষ্ণমঙ্গলে'র মত গীতাত্মক নয়। তবে এই কাব্যটিও অন্যান্য 'কৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যের মতই ভাগবতের কাহিনীতে পূর্ণ। দানলীলা, নৌকালীলা-আদি কাহিনী এতে বিস্তৃততর ভাবে পরিবেষিত হয়েছে। এদিক থেকে বড়ু চণ্ডীদাস-কৃত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে এর সাদৃশ্য বর্তমান। কবিশেখরের কবিত্বশক্তি প্রশংসনীয়। ভাষায় জটিলতা নেই, ছন্দও সর্বপ্রকার দোষমুক্ত। উপমাদি অলঙ্কারেও কাব্যটি সমৃদ্ধ অথচ পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর নেই। গ্রন্থের খুব প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পাওয়া না গেলেও এর ভাষায় প্রাচীন রূপটি অনেকটা অব্যাহত আছে। মনে হয়, কবি সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই কাব্যটি রচনা করেছিলেন।

৫. **কৃষ্ণকিঙ্কর কৃষ্ণদাস :** মহাভারত-আলোচনা-প্রসঙ্গে কাশীরাম দাসের জ্যেষ্ঠভ্রাতার কবিত্বশক্তির সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছিল। কাশীরাম দাসের এই জ্যেষ্ঠভ্রাতাই 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' নামক গ্রন্থের রচয়িতা কৃষ্ণদাস। কবির অপর ভ্রাতাদের কাব্যে আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে কোন কোন সংবাদ পাওয়া গেলেও কৃষ্ণদাস এ বিষয়ে অনেকটা উদাসীন ছিলেন। তিনি শুধু বলেছেন যে গুরুর প্রসাদেই তিনি 'শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর' নাম পেয়েছেন। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল কৃষ্ণদাস। কবি কৃষ্ণদাস মূল ভাগবতের অনুসরণেই তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। এতে অভাগবতীয় বা অপৌরাণিক কাহিনীর বিশেষ উল্লেখ নেই। এদিক থেকে এই ধারার অন্যান্য কবিদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য সুচিহ্নিত। তিনি দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদির কোন উল্লেখ করেননি। কবি সম্ভবত কাশীরাম দাসের মহাভারত রচনার অল্প পূর্বেই তাঁর গ্রন্থ রচনা

করেছিলেন। অতএব সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে অথবা ষোড়শ শতাব্দীর শেষমুহূর্তে কাব্যখানি রচিত হয়ে থাকতে পরে। কবি নেহাৎ বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে কাব্যখানি রচনা করেছেন বলে এতে পল্লবিত কবিত্বের অবকাশ কম।

৬. শ্যামদাস ঃ দুঃখী শ্যামদাস কিছু কিছু 'পদ' রচনা ছাড়াও 'গোবিন্দমঙ্গল' নামে একখানা কৃষ্ণায়ণ কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর কাব্য থেকে জানা যায় যে কবিব পিতাব নাম শ্রীমুখ এবং মাতার নাম ভবানী। তবে তাঁর কাব্যের সম্পাদক লিখেছেন, "মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কেদারকুণ্ড পরগণাব মধ্যে হরিহরপুর নামে এক গ্রাম আছে। এই গ্রাম মেদিনীপুর নগর হইতে পায় ৮ ক্রোশ পূর্ববর্তী। এই গ্রামে দুঃখী শ্যামদাসের বাস ছিল। ইনি ভরদ্বাজ গোত্রীয় দে-বংশীয় কায়স্থ।" ডঃ সেন অনুমান করেন যে এই শ্যামদাস হয়তো কাশীরাম দাসের জ্ঞাতি হতে পারেন এবং ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁর বর্তমান থাকাই সম্ভব। কিন্তু ডঃ মণীন্দ্রমোহন বসুর মতে কবি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। শ্যামদাসের কাব্য প্রধানত ভাগবতের অনুসরণে রচিত হলেও এতে 'দানখণ্ড' 'নৌকাখণ্ডা'-দি কাহিনী সন্নিবিষ্ট হযেছে। এই কাহিনীর সঙ্গে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-কাহিনীর সাদৃশ্য বিস্ময়কর। কবি তাঁব গ্রন্থে পাণ্ডিত্য-প্রকাশের চেষ্টা না করলেও এতে সহজ-কবিত্বের স্পর্শ অনুভব করা যায়। এতে কয়েকটি ব্রজবুলির পদও বর্তমান।

৭. ভবানন্দ ঃ 'হবিবংশ' কাব্যের রচয়িতা ভবানন্দ আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে শুধু পিতা শিবানন্দেব নামই উল্লেখ কবেছেন। এতদতিবিক্ত কোন সংবাদ তাঁব কাব্য থেকে পাওয়া যায না। তবে তাঁর কাব্যের অধিকাংশ পুথিই উত্তর ও উত্তর-পূর্ববঙ্গ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং পুথির ভাষাও এই অঞ্চলেরই—অতএব সঙ্গত কারণেই অনুমান করা চলে যে কবির জন্মস্থানও ছিল উত্তববঙ্গে অথবা উত্তব-পূর্ববঙ্গে। কবি অন্ততঃপক্ষে সপ্তদশ শতকের শেষপাদের পূর্বেই বর্তমান ছিলেন, এটি প্রমাণসিদ্ধ। কবির কাব্যের নাম 'হরিবংশ' হলেও প্রকৃতপক্ষে এর সহিত সংস্কৃত 'হবিবংশে'র কোনই সম্পর্ক নেই। অবশ্য কবি অন্য কথা বলেন ঃ

'সত্যবতীসূত ব্যাস নারায়ণ-অংশ।
সংক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ।।
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদবন্ধে।
লোকে বুঝিবার বোলে দীন ভবানন্দে।।'

কবি কিছুটা ভাগবত, কিছুটা দানখণ্ডাদি-অনুসরণে তাঁর কাব্য রচনা করলেও বিষয়ের দিক থেকে এতে বেশ কিছুটা বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে রাধা তাঁর সখী এবং মাতার যে সমস্ত নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তা অন্যত্র দেখা যায় না। কবি কোন্ সূত্র থেকে এগুলি পেয়েছেন, তা জানা যায় না। ভবানন্দের কাব্যে সহজ কবিত্বশক্তির স্ফূরণ ঘটলেও এর মধ্যে গ্রাম্যতার ভাব অত্যধিক। এই কাব্যে যে প্রভূত পরিমাণ বাঙলা ও ব্রজবুলি ভাষায় বচিত পদ রয়েছে, তাদের কোন কোনটির মধ্যে পূর্ববর্তী কবিদের প্রভাব সুস্পষ্ট; এমন কি ভাষার দিক থেকেও বহুস্থলে ঐক্যবোধ লক্ষ্য করা যায়।

৮. অভিরাম দাস ঃ 'গোবিন্দবিজয়' কাব্যের রচয়িতা অভিরাম দাসের কোন পবিচয়ই পাওয়া যায় না। তবে ইনি যে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম দাস নন, তার পরিচয় তাঁর কাব্যেই নিহিত। কবিচন্দ্রের 'ভাগবতামৃত' গ্রন্থে গোবিন্দবিজয়ের 'রসপঞ্চাধ্যায়' থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃতি হওয়ায় অন্তত এটুকু অনুমান করা চলে যে, কবি 'অভিরামদাস' কবিচন্দ্রের পূর্ববর্তী ছিলেন। অতএব সপ্তদশ শতাব্দীরই কোন সময়ে তাঁর পক্ষে বর্তমান থাকা সম্ভব হতে পারে। কবি অভিরাম দাসের কাব্যের মধ্যে বিশেষ বৈচিত্র্য নেই। গতানুগতিকভাবে তিনিও ভাগবত এবং অনান্য অপৌরাণিক কাহিনীর সহায়তায় 'গোবিন্দবিজয়' কাব্য রচনা করেন। মনে হয়, মণিহরণ পালাতেই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়েছিল।

৯. পরশুরাম ঃ দ্বিজ পরশুরাম একখানি 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর কাব্যে মহাপ্রভু এবং তাঁর পারিষদ্বর্গ ও অন্যান্য মোহান্তদের প্রশস্তি বন্দনা আছে। অপরাপর অংশে এতজ্জাতীয় অন্যান্য কাব্যের সঙ্গে এর কোন পার্থক্য নেই। এতেও দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি কাহিনী যথেষ্ট আদর লাভ করেছে। কবির পরিচয় সম্বন্ধে জানা যায়, ''বিপ্র পরশুরামের 'কৃষ্ণমঙ্গল' ও 'মাধব-সঙ্গীত' প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। কবিব নিবাস ছিল 'চম্পকনগরী', ইনি দ্বাদশকলা গ্রামে কুমার শ্যামশিখরের আশ্রয়ে থাকিয়া মাধবসঙ্গীত গ্রন্থ রচনা করেন। কবির পিতার নাম মধুসূদন রায়, কবি মনোহর দাসেব শিষ্যত্ব স্বীকারে ভেকাশ্রয় গ্রহণ কবিযাছিলেন।'' কিন্তু ডঃ সেনের মতে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে'র রচয়িতা পরশুরাম 'চক্রবর্তী' উপাধিধাবী, পক্ষান্তবে মাধবসঙ্গীত রচয়িতা কবি 'বায়' উপাধিধারী, অতএব এঁরা পৃথক্ ব্যক্তি।

১০. বলরাম দাস ঃ 'কৃষ্ণলীলামৃত' নামক কৃষ্ণমঙ্গল-কাহিনীব রচয়িতা বলবামদাস পদকর্তা বলরামদাস থেকে পৃথক। তিনি তাঁর গ্রন্থে আত্মপরিচয় সূত্রে যে রূপকাশ্রিত কাহিনী বচনা কবেছেন, তাতে জানা যায় যে কবি ১৬২৪ শকাব্দে (১৭০২ খ্রীঃ) তাঁর কাব্য বচনা কবেন। কবি সম্ভবত শূদ্রবংশীয় কোন রাজকুমার ছিলেন, পরে সংসাব বৈরাগ্য-বশত দশ বৎসর বৃন্দাবন ধামে বাস করেন। অতঃপর নানাদেশ ঘুবতে ঘুবতে এক সময় পঞ্চালদেশীয় তাবা নাম্নী এক বিধবাকে সাধন-সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ কবেন। এ থেকে মনে হয, কবি ছিলেন সহজিয়াপন্থী। বলরাম সম্ভবত গদাধরের শিষ্য ছিলেন। বলরামদাসেব পুঁথি বাবোটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। কবি তাঁর কাব্যের বিষয়সমূহ গ্রহণ কবেছেন ভাগবত এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ থেকে ঃ

> 'ব্রহ্মবৈবর্তেব মতে যে কহিল ভাগবতে
> তাহা আমি কবি বিবেচন।'

১১. কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী ঃ ইতঃপূর্বে একাধিকবাব কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর জীবন-কাহিনী বিবৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কবি ছিলেন ভূরিস্রষ্টা। ওই দেখি, প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের প্রায় সর্বদিকেই ছিল তার অবারিত গতি। 'রামায়ণ' এবং 'মহাভারতে'র

আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পেয়েছি। তিনি অনুরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন 'ভাগবতামৃত' বা 'গোবিন্দমঙ্গল' গ্রন্থে। কবি বিভিন্ন মল্লরাজার আশ্রয়ে থেকে তাঁর অধিকাংশ কাব্য রচনা করেছেন, এরূপ উল্লেখ তাঁর গ্রন্থেই বর্তমান। কিন্তু 'ভাগবতামৃতে' এরূপ কোন মল্লরাজার উল্লেখ না থাকায় অনুমিত হয় যে, কবি রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করবার পূর্বেই হয়তো এই কাব্যখানা রচনা করেছিলেন। আভ্যন্তর প্রমাণ থেকে অনুমান করা যায় যে কবি ১৬৯৪ খ্রীঃর পরবর্তী কোন সময় কাব্যটি রচনা করেন। কবি সামগ্রিকভাবে ভাগবতের অনুবাদ করেছিলেন বলা যায়, অবশ্য তিনি কৃষ্ণলীলা কাহিনী যতখানি বিস্তৃতভাবে পরিবেষণ করেছেন, অপরাপর অংশ তত বিস্তৃত নয়। অধিকন্তু তিনি হরিবংশ এবং ভবিষ্যপুরাণ থেকেও কিছু কিছু কাহিনী গ্রহণ করেছেন। তবে উল্লেখযোগ্য এই যে, এতে নৌকাখণ্ড, দানখণ্ডাদি বর্জিত হলেও অনেক নোতুন এবং অর্বাচীন কাহিনী এতে স্থান পেয়েছে। কবি পূর্বকৃত মহাজনদের বহু কাব্য থেকেই পয়ার এবং শ্লোকাদি উদ্ধার করেছেন।

১২. **জয়নারায়ণ ঘোষাল** ঃ ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল ১৮১৩-১৪ খ্রীঃ 'শ্রীকরুণানিধান বিলাস' নামে একখানা কৃষ্ণায়ণ কাব্য রচনা করেন। কাব্যখানা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে রচিত হলেও এতে প্রাচীন ধারাটি অব্যাহত আছে। রচনার তারিখ উল্লেখ-প্রসঙ্গে কবি বলেছেন 'রচিতে কৃষ্ণের লীলা কৈলা আয়োজন।' প্রধানত কৃষ্ণলীলা-কাহিনী বর্ণনা করলেও কবি এতে বহুতর দেবলীলার কাহিনীও বর্ণনা করেছেন ঃ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া লীলা, কোজাগরী লীলা, মনসা-পূজা লীলা, কার্তিকপূজা লীলা ইত্যাদি। বস্তুত বিষয়বস্তুর এই নোতুনত্ব ও বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য। ডঃ সেন বলেন ঃ "কৃষ্ণলীলার প্রসঙ্গে কবি তখনকার বাঙালী সংসার ও সমাজের একখানি নিখুঁত চিত্র আঁকিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস-রচনায় এই কাব্যটি মূল্যবান উপকরণ যোগাইবে। কৃষ্ণ গোপীদিগের নিকট যে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন তাহাতে ভূগোল জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ে কবির মনোভাব বেশ কৌতুকাবহ ঠেকিবে।" কবি জয়নারায়ণ এই কাব্য-রচনার অনেক পূর্বে কাশীখণ্ড-অবলম্বনে অপর একটি কাব্য রচনা করেছিলেন।

মালাধর বসু ভাগবতের অনুবাদরূপে যে ধারার সৃষ্টি করেছিলেন, তা সুদীর্ঘকাল বাঙলা সাহিত্যে প্রবাহ সঞ্চার করেছে। প্রাগাধুনিক যুগের দাশুরায়, রামনিধি গুপ্ত-আদি পাঁচালীকার, কবিয়াল, তর্জা গায়করাও কৃষ্ণলীলা-অবলম্বনে বহু গান রচনা করেছেন। নৌকাখণ্ড-দানখণ্ড-যুক্ত কৃষ্ণলীলা কাহিনী থেকেই পরবর্তীকালে কৃষ্ণযাত্রারও প্রচলন হয়েছে। বস্তুতঃ পরবর্তী বাঙলা সাহিত্যের বহু কাব্য-কাহিনীই কৃষ্ণলীলা-কাহিনীকে উপজীব্যরূপে গ্রহণ করেছে।

মঙ্গলকাব্য-সাহিত্য

আদি-মধ্য যুগের সাহিত্য হিশেবে মঙ্গলকাব্য সাহিত্য-সম্বন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। তথায় মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব, কাব্যোদ্ভবের পটভূমিকা, 'মঙ্গল' শব্দ ও কাব্যের অর্থ—ইত্যাদি-সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অতএব আলোচ্য অধ্যায়ে এদের সম্বন্ধে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। আদি-মধ্য যুগেব মঙ্গলকাব্য ও অন্ত্য-মধ্য যুগেব মঙ্গলকাব্যেব পার্থক্য-সম্বন্ধে অবশ্য অবহিত হওযা আবশ্যক। আদি-মধ্য যুগেই বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ঘটলেও বাস্তবে আমবা তৎকালে শুধু 'মনসামঙ্গল' কাব্যেরই সাক্ষাৎ পেয়েছি। অন্ত্য-মধ্য যুগ বা চৈতন্যোত্তর যুগেই মঙ্গলকাব্যের বৃদ্ধি ঘটেছে পরিসরে এবং পরিমাণে।

অন্ত্য-মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যেব বৈশিষ্ট্য

এই কালে মনসামঙ্গল কাব্য তো আছেই, অধিকন্তু আছে চণ্ডীমঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল, শিবমঙ্গল-আদি বহুতর প্রধান ও অপ্রধান মঙ্গলকাব্য। বিষয়ের দিক্ থেকে যেমন উভয়-যুগে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায, তেমনি দেখা যায় দৃষ্টিভঙ্গির দিক্ থেকেও। চৈতন্যোত্তব যুগে রচিত বলে আমরা স্বভাবতঃই আশা কবতে পারি যে এদের উপরও ন্যূনাধিক চৈতন্য-প্রভাব পড়বেই। বস্তুতঃ, তাই ঘটেছে। মঙ্গলকাব্য গুলি পুরাণের অনুকরণে লৌকিক কাহিনী আশ্রয় কবে রচিত হলেও এগুলি চৈতন্য-প্রভাব-মুক্ত নয। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবেব ফলে যখন গোটা সমাজব্যবস্থায়ই একটা সামগ্রিক পরিবর্তনেব সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তখন সেই পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল কবিদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিতেও। সমাজব্যবস্থায় আর পূর্বতন গোঁড়ামি অক্ষুণ্ণ ছিল না, বর্ণাশ্রম প্রথার মূলও অনেকটা শিথিল হযে গিযেছিল, আর সেই অবসরে ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীও মঙ্গলকাব্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। বৈষ্ণব ধর্মের মানবিকতাবোধের স্পর্শে মঙ্গলকাব্যগুলিও যে কথঞ্চিৎ মহিমা লাভ করেছিল, তাতে সন্দেহেব অবকাশ কোথায় ? অধিকন্তু আদি-মধ্যযুগেই আর্য-অনার্য সমীকরণের যে প্রক্রিয়াটি সক্রিয়তা লাভ করেছিল, চৈতন্যোত্তর যুগে তা যে শুধু ত্বরান্বিত হযেছে তা নয়, তার বিস্তারও ঘটেছে অনেকখানি। এই সমস্ত দিক থেকে অন্ত্য-মধ্য যুগের মঙ্গলকাব্য-সাহিত্য একটা বিশিষ্টতা লাভ করেছিল। অতঃপব এই যুগের সাহিত্যকে আমরা আর শতাব্দীতে ভাগ না করে বিষয়ানুযায়ী আলোচনা কবে যাব — ক. মনসামঙ্গল, খ. চণ্ডীমঙ্গল, গ ধর্ম্মমঙ্গল, ঘ. শিবাযন বা শিবমঙ্গল, ঙ অন্নদামঙ্গল, চ বিবিধ। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, ভাগবতের

চৈতন্য-প্রভাব

অনুবাদগুলি সাধারণত 'কৃষ্ণমঙ্গল' তথা 'কৃষ্ণায়ণ কাব্য' নামে পরিচিত হলেও আসলে তা অনুবাদ-সাহিত্য বলেই এই অধ্যায় থেকে বর্জিত হয়েছে।

[এক] মনসামঙ্গল

'মনসামঙ্গল' কাব্যের চরম সমৃদ্ধি ঘটেছিল চৈতন্য-পূর্ব যুগেই। মনসামঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ তিনজন গ্রন্থকারই আবির্ভূত হয়েছিলেন সমৃদ্ধির যুগে। বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব এবং বিপ্রদাস পিপিলাই — এই তিনজন কবিই চৈতন্য-পূর্ব যুগের। এঁদের সম্বন্ধে এবং মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি হরিদত্ত-সম্বন্ধে আদি-মধ্য যুগেই আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য অধ্যায়ে এই ধারার অন্যান্য কবি এবং তাঁদের কাব্য-সম্বন্ধে আলোচনার অবতারণা করা হবে।

মঙ্গলকাব্যগুলিব মধ্যে অন্ততঃ জনপ্রিয়তায় মনসামঙ্গল শ্রেষ্ঠ। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন যে ৬২ জন মনসামঙ্গল কাব্য-কারের নাম উল্লেখ করেছেন, এঁদের মধ্যে কয়েকজন গায়ক থাকলেও মোট কাব্যকারের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। অবশ্য এঁদের মধ্যে যে স্বল্প কয়জন বিশিষ্টতা লাভ কবেছেন, আলোচনা তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

১. দ্বিজ বংশীদাস ঃ চৈতন্যোত্তর যুগের মনসামঙ্গল-রচয়িতাদেব মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ না হলেও দ্বিজ বংশীদাস যে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন. তাতে কোন সন্দেহ নেই। বংশীদাস তাঁর কাব্যে যে কালজ্ঞাপক পয়ারটি সন্নিবিষ্ট করেছেন, তাতে বংশীদাসকে ষোড়শ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত বলে গ্রহণ করতে হয়।—

'জলধির বামেত ভুবন-মাঝে দ্বার।
শকে রচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পদ্মার।।'

অর্থাৎ ১৪৯৭ শকাব্দে (১৫৭৫-৭৬ খ্রীঃ) বংশীদাস কাব্যটি রচনা কবেন। কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন পয়ারটির প্রামাণিকতা-সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে মন্তব্য করেছেন ঃ "....দ্বিজ বংশীকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থাপন করাই সমীচীন বোধ হয়।" কিন্তু কেন এই সন্দেহ, তার কোন কারণ দেখাননি। অতএব কবির উক্তির সত্যতা মেনে নিতে আমাদের আপত্তির কারণ নেই।

কবি তাঁর কাব্যে আত্মপরিচয়ে জানিয়েছেন যে, ফুলেশ্বরী নদীতটে পাটোয়ারী গ্রামে (ময়মনসিংহ) কবির বাসস্থান ছিল। কবির পিতার নাম যাদবানন্দ, পিতামহ হৃদয়ানন্দ। আবার কবির কন্যা বাঙালার আদি মহিলা কবি চন্দ্রাবতী ('রামায়ণ' আলোচনা দ্রষ্টব্য) পিতৃ-পরিচয় দান-প্রসঙ্গে আরও অনেক তথ্য জানিয়েছেন। চন্দ্রাবতী তাঁর 'দস্যু কেনারামেব' কাহিনী'তে বলেছেন যে, দ্বিজ বংশীদাস 'মনসার ভাসান' গেয়ে বেড়াতেন। একবার তিনি

কেনারাম দস্যুর হাতে পড়লেন। দস্যু কেনারাম দ্বিজ বংশীদাসের গান শুনে দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করে বংশীদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। কন্যার রচিত এই কাহিনী থেকে পিতা বংশীদাস-রচিত কাহিনীর আবেদন যে কত গভীর ছিল তা অনুমান করা যায়।

দ্বিজ বংশী যে মনসামঙ্গল বা 'মনসার ভাসান' কাব্য রচনা করেছেন, তাতে বিষয়বস্তুর দিক থেকে খুব অভিনবত্ব না থাকলেও পূর্ববর্তী কবিদের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যটুকু সুস্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে। চৈতন্য-পূর্ব যুগে যেখানে নিতান্ত ধর্মীয় কারণেই মঙ্গলকাব্য রচিত হতো চৈতন্যোত্তর যুগে তার পটভূমিকা কিছুটা পরিবর্তিত হলো। কবিদের দৃষ্টি ঊর্ধ্বলোক থেকে সরে এসেছে মর্ত্যলোকের দিকে, বাহির থেকে ভিতরের দিকে, দৈবী ঘটনা থেকে মানবিক ঘটনার দিকে। তাই দ্বিজ বংশীর কাব্যে যে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে, তা দেবতা আর মানবে নয়, সেই সংঘাত একেবারেই যেন পারিবারিক। অন্যান্য কাব্যসমূহে যেমন গোড়া থেকেই চাঁদ আর মনসার বিবাদ দেখা যায়, এখানে তা নয়; বিদেশ থেকে প্রত্যাগত চাঁদ সনকার মন্দিরে মনসা পূজা দেখে মনসাকে প্রণাম করলেন এবং স্তুতি প্রসঙ্গে বললেন ঃ

কাব্যের বৈশিষ্ট্য

'যেই দুর্গা সেই তুমি জগতের মাতা।
অভেদ চণ্ডিকা তুমি নাহিক অন্যথা।।'

কিন্তু বাদ সাধলেন সাক্ষাৎ চণ্ডী। চণ্ডী মনসার বিমাতা,—বাঙালীর ঘরে সতীন কন্যা আর বিমাতার দ্বন্দ্ব যেমন বহু পারিবারিক অনর্থের সৃষ্টি করে থাকে, এখানেও সেই আভাষই পাওয়া যাচ্ছে। চণ্ডীর ভক্ত চাঁদ মনসার পূজায় সম্মত হয়েছেন দেখে চণ্ডী প্রমাদ গণলেন। তিনি স্বপ্নে চাঁদকে দেখা দিয়ে মনসার বিরুদ্ধে উস্‌কে দিলেন। এইবার চাঁদ মনসার বিরোধী শক্তিতে পরিণত হলেন। অতঃপর চাঁদের পৌরুষদীপ্ত চরিত্র আর কোন কারণেই মনসাকে স্বীকার করতে সম্মত নয়। এমন কি তাঁর বংশের শেষ সম্বল, সপ্তম-পুত্র লখীন্দরও যখন সর্পদংশনে নিহত হলো, তখনও চাঁদ আপন পৌরুষে অবিচল—

'শতেক লখাই যদি যায় এই মতে।
তেও না পূজিব কানী পরাণ থাকিতে ।।
কানীর উচ্ছিষ্ট পুত্র গাঙ্গে ভাসাও নিয়া।
ঢোল, মৃদঙ্গ কাড়া আন ডাক দিয়া।।'

দ্বিজ বংশীদাস একদিকে যেমন বজ্রের মত কঠোর চাঁদ-চরিত্র অঙ্কনে সিদ্ধিলাভ করেছেন, তেমনি সিদ্ধিলাভ করেছেন পুষ্পকোমল বেহুলা-চরিত্র-অঙ্কনেও। রচনার মাঝে মাঝে অতিশয় হৃদয়গ্রাহী করুণরসযুক্ত কিছু কিছু পদ পাওয়া যায়। ডঃ সেন অনুমান করেন যে এই পদগুলি কবি-কন্যা চন্দ্রাবতীর রচিত হওয়া অসম্ভব নয়। কবি বংশীদাস পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু অকারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের কোন চেষ্টা তাঁর কাব্যে দেখা যায় না। অতিশয় জটিল তত্ত্বকথাও তিনি বেশ সহজ এবং অনাড়ম্বর ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। বস্তুত ভাষার সারল্য এবং অনাড়ম্বর বর্ণনাভঙ্গিই বংশীদাসের রচনার প্রধান বিশেষত্ব।

২. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ঃ ক্ষেমানন্দ পশ্চিমবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি কেতকা বা মনসার দাস বলে গ্রন্থের বহুস্থলেই কেতকাদাস ভণিতা দিয়েছেন। গোড়ার দিকে তাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়ায় 'কেতকাদাস' এবং 'ক্ষেমানন্দ'কে দুজন কবি বলে গণ্য করা হতো। কিন্তু গ্রন্থখানি মনোযোগ দিয়ে পড়লেই দেখা যাবে, কবি স্পষ্টভাবেই মনসাকে কেতকা বলে উল্লেখ করেছেন ঃ 'কিয়াপাতে জন্ম হৈল কেতকাসুন্দরী'—অতএব ক্ষেমানন্দ আপন নামের বিশেষণরূপেই যে কেতকাদাস উপনাম যোগ করেছেন, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কবি আপন কাব্যে বিস্তৃতভাবেই আত্মপরিচয় দান করেছেন। কবি দামোদর-তীরবর্তী কাঁদড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থানে নানাপ্রকার গোলযোগ দেখা দেওয়ায় কবি কিভাবে রাজা বিষ্ণুদাসের ভ্রাতা ভারামল্ল খানের নিকট আশ্রয় লাভ করলেন, কবি গ্রন্থারম্ভেই তার মনোজ্ঞ বিবরণ দান করেছেন। কবি-রচনার এই অংশ কবিকঙ্কণের রচনার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। অতঃপর এক সন্ধ্যায় স্বয়ং দেবী মনসা মুচিনীব বেশ ধারণ করে কবির সাক্ষাতে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে আদেশ করলেন ঃ

'ওরে পুত্র ক্ষেমানন্দ কবিত্বে কর প্রবন্ধ
আমাব মঙ্গল গাইয়া বুল।'

কবির আত্মপরিচয় অংশে যে বারাখাঁর উল্লেখ আছে তিনি ১৬৪০ খ্রীঃ-র দিকে উক্ত অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। অতএব কবিও মোটামুটি এই কালে বর্তমান ছিলেন, অনুমান কবা যায়। কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ যে একজন শক্তিমান কবি ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। চরিত্র-চিত্রণে বিশেযত 'নাচনী বেহুলা'র চিত্র-রচনায় কবি অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কাহিনীর নাটকীয়তা অথবা বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেয়েও তিনি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন চবিত্র-সৃষ্টিতে। কেতকাদাসের কবি-দৃষ্টি সম্পর্কে জনৈক অধ্যাপক অভিমত প্রকাশ করেছেন.''ইনি সম্পূর্ণ রোমান্স-পাগল কবি। কেতকাদাস প্রজাপতির মতই সৌন্দর্যলোভী। চাঁদ ও মনসার দ্বন্দ্ব-বর্ণনা তাঁহাব স্বভাবের অনুকূল নহে, তাঁহার সৌন্দর্যসন্ধানী সমগ্র দৃষ্টি পড়িয়াছে বেহুলা-চরিত্রে। তাঁহার বেহুলা শুধু 'বেহুলা' নহে, বেহুলা-নাচনী—একটি অপূর্ব লাস্যময়ী প্রাণচঞ্চলা কিশোরী। তাহাকে দেখিলে বসন্তবায়ু হিল্লোলিত পুষ্পলতিকাকে মনে পড়ে। মনসামঙ্গলের ন্যায় ভয়ঙ্কর কাহিনীর রুক্ষতাকে এই বেহুলা নিজের কিশোরী-জীবনের প্রাণচাঞ্চল্য ও মাধুর্য দিয়া মসৃণ-কোমল করিয়া তুলিয়াছে।''

কবি তাঁর কাব্যে বেহুলার যাত্রাপথে যে সমস্ত স্থানের বিবরণ দান করেছেন তাতে কবির সমসাময়িক যুগের ভৌগোলিক জ্ঞানের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। এ ছাড়া দক্ষিণ রাঢ়ের লোকাচারের যে পরিচয় এতে নিবদ্ধ আছে, তার ঐতিহাসিক মূল্যও যথেষ্ট। দেবসভায় বেহুলার নৃত্যবর্ণনায় কবি সেকালের নটীনৃত্যের একটি সুন্দর চিত্র উপস্থাপন করেছেন।

মনসামঙ্গলের কবিগণ বেহুলা-লখীন্দরকে শাপভ্রষ্ট উষা-অনিরুদ্ধ বলে কল্পনা করেছেন। ক্ষেমানন্দ এই উষা-অনিরুদ্ধের প্রেমকাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন, গ্রন্থের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এই কাহিনীতেই পূর্ণ। ''রোমান্সপ্রিয় কেতকাদাস উষারূপিণী বেহুলার গোপন প্রেমকে বিস্তৃতভাবে রসাইয়া বর্ণনা করিয়া মনসামঙ্গলের অন্তর্গত উষাহরণ পালাকে একেবারে বিদ্যাসুন্দর কাব্যে পর্যবসিত করিয়াছেন।''

৩. দ্বিতীয় ক্ষেমানন্দ ঃ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ-ব্যতীত আরও একজন ক্ষেমানন্দ নাম বা ছদ্মনাম-ধারী কবি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করে গিয়েছেন। গ্রন্থের সম্পাদক এটিকেই ক্ষেমানন্দের মূল কাব্য বলে মনে করলেও প্রকৃত ঘটনা তা নয়। কারণ, এই গ্রন্থের ক্ষেমানন্দ মানভূম অঞ্চলের লোক। তা ছাড়া তাঁর গ্রন্থের ভণিতায় কোথাও 'কেতকাদাস' বিশেষণটি ব্যবহৃত হয়নি। অতএব তিনি প্রসিদ্ধ ক্ষেমানন্দ নহেন। দ্বিতীয় ক্ষেমানন্দের রচনা কেতকাদাসের রচনার সঙ্গে কোনদিক দিয়েই সাদৃশ্যযুক্তও নয়। এঁর গ্রন্থ অতিশয় সংক্ষিপ্ত—নয়টি দীর্ঘ পদের সমষ্টি মাত্র। রচনাটি কোন কোন দিক থেকে বিশেষত্বযুক্ত। ডঃ সেন বলেন, "এই ক্ষুদ্র কাব্যটির স্বল্পপরিসর বেষ্টনীর মধ্যে চরিত্র কয়টি স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে, বিশেষ করিয়া চাঁদ সদাগরের চরিত্র। চাঁদেব নির্ভীক অদম্য পুরুষত্বের নিকট দেবীর মাহাত্ম্য নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়াছে। কাব্যটি কোন সময়ে রচিত বলিতে পারি না, তবে চাঁদের চরিত্র হইতে মনে হয়, যে ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা হওয়া অসম্ভব নহে। এই ক্ষুদ্র পাঁচালীটি বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রাখিবে।"

৪. ষষ্ঠীবর ঃ প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'ষষ্ঠীবর' নামটি কিছুটা বিভ্রাটের সৃষ্টি করেছে। মহাভারত-অনুবাদক ষষ্ঠীবর সেন ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন একত্রে মহাভারত রচনা করেছিলেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মত-অনুযায়ী এঁরা ঢাকা জেলার জিনারদি গ্রামে এক বণিককুলে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ববর্তী মতে এই ষষ্ঠীবরই পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল কাব্যেরও রচয়িতা। কিন্তু শ্রীহট্ট থেকে ষষ্ঠীবরের যে পদ্মাপুরাণ প্রকাশিত হয়েছে, তার সম্পাদক ষষ্ঠীবরের পরিচয় দিয়েছেন নিম্নোক্তরূপে ঃ কবি ষষ্ঠীবর খাঁটি শ্রীহট্টের লোক। বিদেশাগত শাণ্ডিল্য দত্ত-বংশীয় মেদিনীধর দত্ত মৌলবীবাজার মহকুমার ইটা পরগণায় গয়ঘর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহারই বংশে এই কবি জন্মগ্রহণ করেন।" পরবর্তীকালে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যও সম্পাদকের এই উক্তি সমর্থন করেছেন। এই ষষ্ঠীবরের উপাধি ছিল দত্ত এবং ইনি ছিলেন অপুত্রক। অতএব মহাভারতকার ষষ্ঠীবর সেন থেকে ইনি সর্বাংশে পৃথক। এই ষষ্ঠীবরকে উপাধি ছিল 'গুণরাজ খান'। কবির রচনার ভাষায় আধুনিকতা লক্ষ্য করে কেউ কেউ কবিকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আনতে চান। ডঃ সেন ষষ্ঠীবরের গ্রন্থে ভারতচন্দ্রের প্রভাবও লক্ষ্য করেছেন। যদি তাই হয় তবে যে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের লোক হবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পুথিতে অন্যান্য কবিরও ভণিতা পাওয়া যায়। ষষ্ঠীবরের পদ্মাপুরাণে কিছু কিছু অভিনবত্ব লক্ষ্য করা গেলেও এতে উৎকৃষ্ট কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে মাঝে মাঝে সরস পাণ্ডিত্যের চিহ্ন বর্তমান। তাঁর রচনা বর্ণনাত্মক, গল্প জমিয়ে তোলার দিকেই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

৫. জীবন মৈত্র ঃ করতোয়া তীরে লাহিড়ীপাড়া গ্রামের অধিবাসী জীবন মৈত্র ১১৫১ সনে (১৭৪৪ খ্রীঃ) মনসার পাঁচালী রচনা করেন। গ্রন্থকার একাধিকবার যেমন সন-তারিখের উল্লেখ করেছেন, তেমনি সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয়ও প্রদান করেছেন কয়েকবার। কবি মহারাজ

রামকান্তের জামাতা রাজা রঘুনাথের রাজ্যে বাস করতেন। কবির পিতার নাম অনন্তরাম, মাতা স্বর্ণমালা। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ ছিলেন জীবনকৃষ্ণ। কবি তাঁর কৃতিত্বের জন্য 'কবিভূষণ' উপাধি পেয়েছিলেন। কবির কাব্য দুই খণ্ডে বিভক্ত ঃ দেবখণ্ড ও বণিকখণ্ড। দেবখণ্ডে পৌরাণিক ও মহাভারতীয় কাহিনীর সাহায্যে মনসা দেবীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং বণিক্‌খণ্ডে চন্দ্রধর সদাগরের কাহিনী তথা লখীন্দর-বেহুলার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই কাব্যে কিছু কিছু নোতুন বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায় এবং বিহারী কাহিনীর সঙ্গে এর নিকট-সম্বন্ধ অনুমান করা চলে। জীবন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, তাই রচনায় সহজ সরল ভাবের চেয়ে পাণ্ডিত্যের ভারই অধিক। তবে তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে লব্ধ নিখুঁত চিত্র রচনায় কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

৬. বাইশা ঃ মনসামঙ্গল কাব্যের প্রসঙ্গে 'বাইশা' কথাটি খুবই প্রচলিত। বাইশা শব্দের অর্থ বাইশজন কবি-কৃত মনসামঙ্গল। আসলে কবির সংখ্যা যে ঠিক বাইশ জনই হতো, তা নয়, কম-বেশিও হতে পারত। অনেক কবিই সম্পূর্ণ মঙ্গলকাব্য রচনা করলেও অনেক সময় গায়েনরা কাহিনীর ক্রমপর্যায় অক্ষুণ্ণ রেখে বিভিন্ন কাব্য থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করে পালা বাঁধতেন। কোন একসময় হয়তো কোন পালায় বাইশ কবির লেখা সঙ্কলিত হয়েছিল এবং তা থেকে বাইশা নামের সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। পরবর্তীকালে সাধারণতঃ অঞ্চল-বিশেষের কবিদের রচনা সংগ্রহ করে একরূপ অনেক বাইশা কাব্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে সাধারণত প্রত্যেক বাইশাতেই একজন বিশিষ্ট কবির রচনাকেই ভিত্তি করা হয়ে থাকে। এতে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বও বজায় থাকে।

[দুই] চণ্ডীমঙ্গল

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা বহুবারই নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। বস্তুত এই সমস্যার যেন আর শেষ নেই। উপস্থিত বিষয়ে সমস্যা যেন আরও জটিলতর রূপ ধারণ করেছে। মধ্যযুগের অন্যতম প্রধান সম্পদ চণ্ডীমঙ্গল। কিন্তু এই চণ্ডীকে নিয়ে যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে তাতে কোন সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একপ্রকার অসম্ভব বলেই মনে হয়।

আমাদের প্রাচীনতম সাহিত্য এবং ধর্মগ্রন্থ বেদ ও আনুষঙ্গিক সাহিত্য। এই বৈদিক সাহিত্যে স্ত্রী-দেবতার সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও তাঁরা কেউই চণ্ডী নন। এমন কি দুর্গার সঙ্গেও পরিচয় ঘটতে পারে, কিন্তু তিনিও আমাদের পরিচিত 'দুর্গা' নন। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, পিতৃতান্ত্রিক আর্যসমাজে 'শক্তি'-জাতীয়া স্ত্রী-দেবতার উদ্ভব ঘটেছিল অনেক পরবর্তীকালে, সম্ভবত অনার্য প্রভাবের ফলেই। মহাভারত এবং পৌরাণিক যুগে শক্তি তথা প্রধানা স্ত্রীদেবতার আবির্ভাব ঘটলেও তাঁরা কেউ চণ্ডী নন। কোন কোন বৈদিক, পৌরাণিক এবং

প্রাচীনতর সাহিত্যে স্ত্রী দেবতা

এমন কি বৌদ্ধদেবীর সঙ্গে চণ্ডীর কোন এক ধরনের সাদৃশ্য যদিবা খুঁজে পাওয়া যায়, তবু চণ্ডী যে প্রত্যক্ষভাবে এঁদের কারও উত্তরসূরী নন, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। বেদে বাক্, রাত্রি, ভুবনেশ্বরী, উপনিষদে উমাহৈমন্তী, বিভিন্ন গৃহ্যসূত্রে ভদ্রকালী, ভবানীদেবী কিংবা অপরাপর বৈদিক সাহিত্যে অম্বিকা, রুদ্রপত্নী, কাত্যায়নী-আদি বিভিন্ন দেবীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে 'মৃগাণাং মাতরম্' অরণ্যানীকে পাচ্ছি। বৌদ্ধদেবীর সংখ্যা অজস্র। জাপানে আছেন প্রাচীনা বৌদ্ধদেবী চনষ্টী (চণ্ডী?) , 'মহাবস্তু অবদানে' দেবী অভয়ার (তুলনীয়—কবিকঙ্কণের 'অভয়ামঙ্গল') পরিচয় পাওয়া যায়। জৈনদের আছেন দেবী সরস্বতী। বৌদ্ধদেবী বজ্রধাত্রেশ্বরী থেকে শক্তি দেবতা বাসুলীর উদ্ভবও কল্পিত হতে পারে। কিন্তু প্রাচীনতর কোন সাহিত্যেই আমরা দেবী চণ্ডীর সাক্ষাৎকার লাভ করি নে। পরবর্তী যে সকল পুরাণে অথবা অন্যত্র চণ্ডীর সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে, সেই সমস্ত গ্রন্থের প্রাচীনত্ব অবিসংবাদিত নয়। অতএব প্রাচীন আর্যধর্ম, শাস্ত্র বা সাহিত্য থেকে আমরা প্রত্যক্ষভাবে চণ্ডীর উদ্ভব কল্পনা করতে পারি নে। স্বভাবতই, আমরা ধারণা করে নেবো, অপর কোন বহিঃপ্রভাব থেকেই চণ্ডীর আবির্ভাব ঘটা সম্ভব।

আমরা আদি মধ্য যুগের বিশেষত যুগসন্ধি কালের আলোচনায় লক্ষ্য করেছি কীভাবে আর্য-অনার্য সভ্যতার ক্রমিক সমীকরণে হিন্দুধর্ম ও সভ্যতার সৃষ্টি ঘটেছে। প্রাচীন ভারতের অধিবাসী বিভিন্ন অনার্য জাতির প্রভাবে আমরা ধীরে ধীরে আর্য সভ্যতার রূপান্তর ঘটিয়েছি।

আর্যসমাজের প্রভাব

আমরা দিয়েছি, নিয়েছি, মিলিয়েছি এবং এইভাবেই আধুনিক ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তুলেছি। এই সমীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তাদের বহু দেব দেবীকে আপনার করে নিয়েছি। চণ্ডীর ক্ষেত্রেও এটিই আমাদের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি বর্তমান, সংক্ষেপে তাদের পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে।

(চণ্ডী' শব্দটি মূলত সংস্কৃত নয়, মনে হয় দ্রবিড় অথবা নিষাদ অর্থাৎ অষ্ট্রীক ভাষা থেকে অর্বাচীন সংস্কৃতে এটি প্রবেশ লাভ করেছে। ছোটনাগপুরের দ্রবিড়ভাষাভাষী ওঁরাও জাতির মধ্যে 'চাণ্ডী' নামক এক দেবীর পরিচয় পাওয়া যায়।) এই দেবীর সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডীর

ওঁরাও জাতির 'চাণ্ডী

কয়েক দিক থেকেই সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ওঁরাও দের মতে এই 'চাণ্ডী' বহুরূপধারিণী এবং মৃগয়ার দেবতা। অধিকন্তু ইনি ব্যাধকুলের দৃষ্টি থেকে পশুদের দূরে রাখেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যোক্ত চণ্ডী 'গোধিকারূপ', 'দশভুজা'-রূপ ও 'কমলে কামিনী' রূপ ধারণ করেছিলেন এবং পশুদের কালকেতুর দৃষ্টির অন্তরালে রেখে আশ্রয় দান করেছিলেন। কাজেই চণ্ডী যে পশুদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং ব্যাধকুলের পূজনীয়া, তার সুস্পষ্ট স্বীকৃতি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেই বর্তমান।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে যে চণ্ডীর পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে, তিনিও তো চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চণ্ডী হতে পারেন। আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখাতে চেষ্টা করব যে, পৌরাণিক চণ্ডীর সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গলোক্ত চণ্ডীর সম্পর্ক একান্তই গৌণ। অতএব ডঃ আশুতোষ

ভট্টাচার্য সবদিক বিবেচনা করে অতি সঙ্গত কারণেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে "ওঁরাও সমাজের উপরিবর্ণিত চণ্ডী ও চণ্ডীমঙ্গলের ব্যাধ-কাহিনী-বর্ণিত চণ্ডীদেবীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই,—উভয়েই অভিন্ন।"

'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' সম্পাদক সুধীভূষণ ভট্টাচার্য অবশ্য অনার্য-সূত্র থেকে চণ্ডীর উদ্ভবের কথা অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে তন্ত্রের মধ্যে সন্ধান করলে চণ্ডীর উদ্ভবসূত্র আবিষ্কৃত হতে পারে। অগত্যা তিনি 'কিরাত মহাজাতি'র অর্থাৎ মোঙ্গলীয় অনার্যদের ধর্মজগতে চণ্ডীর সন্ধান করতে বলেছেন। পণ্ডিতপ্রবর চিন্তাহরণ চক্রবর্তী স্পষ্টতই স্বীকার করেছেন যে হিন্দুদের তন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে সম্ভবত 'দ্রাবিড়াদি বিভিন্ন অনার্যজাতির মধ্যে তান্ত্রিক আচারের অনুরূপ আচার' থেকেই। অতএব এই ক্ষেত্রেও আমাদের চণ্ডীর উদ্ভবের জন্য অনার্যদের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। অতএব ডঃ ভট্টাচার্যের সিদ্ধান্ত এতেও বিশেষ খণ্ডিত হলো না, পরিশোধনের সম্ভাবনা রইল মাত্র।

তন্ত্রে চণ্ডী

অতএব এ বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে, দ্রবিড়, নিষাদ অথবা কিরাত-আদি কোন অনার্য সূত্র থেকেই সর্বপ্রথম চণ্ডীর উদ্ভব হয়, পরবর্তীকালে এতে আমাদের প্রাচীনতর শাস্ত্রোক্ত কোন কোন দেবীর কিছু কিছু প্রভাবও পড়ে থাকবে। এবং আরও পরবর্তী কালে অর্বাচীন পুরাণসমূহে এবং মঙ্গলকাব্যে এই চণ্ডীর কাহিনী বিবৃত হয়েছে। অসম্ভব নয়, এর সঙ্গে কোন লৌকিক কাহিনীরও যোগ থাকতে পারে।

পৌরাণিক চণ্ডীর আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রথমেই একটি সম্ভাব্য ভ্রান্তি-সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। (আমাদের প্রধান পুরাণ আঠারোটি, উপপুরাণও অনেকগুলি।) এদের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী কাহিনীরও অপ্রতুলতা নেই। বিশেষত স্ত্রী-দেবতাদের নাম এবং সম্পর্ক-সম্বন্ধে পুরাণকর্তারা প্রভূত পরিমাণে অস্থিরমতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ভিন্ন সূত্র থেকে তাঁরা যে সকল স্ত্রীদেবতাকে আহরণ করেছেন, তাঁদের অনেকেই শেষ পর্যন্ত শিবশক্তি-রূপে প্রতিষ্ঠিতা হয়েছেন। গোড়ার দিকে তাঁরা নামত ভিন্ন হলেও শেষ পর্যন্ত শিবের সঙ্গে সম্পর্কের খাতিরে তাঁরা এক ও অভিন্ন হয়ে দাঁড়ালেন। এইভাবেই আমরা দেখতে পাই যে দক্ষকন্যা সতী, পার্বতী, উমা, কালী, দুর্গা, চণ্ডী প্রভৃতি সকল দেবীই শেষ পর্যন্ত এক। কাজেই পৌরাণিক চণ্ডীর আলোচনা-প্রসঙ্গে বলতে চাই যে, এঁরা সকলেই নিঃসন্দেহে পৌরাণিক দেবী, কিন্তু একজন ব্যতীত অপর কেউই পৌরাণিক চণ্ডী নন।

পৌরাণিক চণ্ডী কে?

মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত এয়োদশ অধ্যায়টির নাম দেবীমাহাত্ম্য এবং নামান্তর 'সপ্তশতী চণ্ডী'। এই অংশে যে চণ্ডীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তাকেই পুরাণোক্ত চণ্ডীর কাহিনী বলা হয়। এখানে চণ্ডী বিষ্ণুমায়া। এঁরই স্তবস্তুতি করে ব্রহ্মা যোগনিদ্রামগ্ন বিষ্ণুর উদ্বোধন ঘটিয়েছিলেন; এই চণ্ডীর হস্তেই শুম্ভ নিশুম্ভ নিহত হয়েছিল, ইনিই মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। এই তিনটিই চণ্ডীর প্রধান কাজ। এই চণ্ডী মঙ্গলময়ী অর্থে শিবা কিন্তু শিবগৃহিণী নন। ইনি পর্বত-বাসিনী বলে পার্বতী, কিন্তু পর্বত-কন্যা শিবজায়া উমা নন। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে নারায়ণের সঙ্গে এঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর ইনি

মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডী

বিষ্ণুমায়া, ইনি নারায়ণী (তুলনীয়—শক্তিপ্রণাম মন্ত্র ঃ 'সর্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে।)। 'চণ্ডী' গ্রন্থের নানাস্থলেই দেবীকে নানাপ্রকার নামে ভূষিত করা হয়েছে। 'দেবী ভগবতী, পরমেশ্বরী, অম্বিকা, দুর্গা, গৌরী, কাত্যায়নী, শিবদূতী, শাকম্ভরী, ভীমা, ভ্রামরী' ইত্যাদি। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয়, দেবীর নাম কোথাও উমা নয়, কিংবা পর্বতকন্যা পার্বতীরূপেও তাঁর কোন পবিচয় নেই। অথচ চণ্ডীমঙ্গল-কাহিনীর দেবখণ্ডে আমরা যে চণ্ডীর দেখা পাই, তিনি প্রধানত পার্বতী-উমা।

চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীব চণ্ডী

'চণ্ডীমঙ্গল' কাহিনীতে যে চণ্ডীর কথা বলা হয়েছে, তাতে সুস্পষ্টভাবেই দুটি ধারার মিলন দেখতে পাই। প্রথম দেবখণ্ডে যে দেবীর সাক্ষাৎ পাই, তিনি প্রথমাংশে দক্ষকন্যা সতী, অপরাংশে গিরিদুহিতা পার্বতী উমা। সতী এবং উমার কাহিনী প্রাচীন বহু পুবাণে এবং সাহিত্যে বারবার বলা হয়েছে। মূলত দু'টি পৃথক্ কাহিনী হলেও অতি প্রাচীনকালেই এঁদের সমীকরণ হয়েছিল বলে অনুমিত হয। উমা-কাহিনীর শেষদিকটায় কবি অবশ্যই কল্পনার সহায়তায় দেবীকে লৌকিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। অপর এক কাহিনীর সাহায্যে কবি এঁকে নরখণ্ডেব দেবী চণ্ডীরূপে প্রতিষ্ঠিতা করেছেন। এই ক্ষেত্রে, আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয এই, দেবখণ্ডে যে দেবীব কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে 'চণ্ডী' বলে তাঁর উল্লেখ ক্বচিৎ-ই পাওয়া যায়। আবার পুবাণে চণ্ডীর যে যুযুৎসু রূপ দেখা যায, আলোচ্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তাঁর বিন্দুমাত্র আভাসও পাওয়া যায় না। যাহোক, কাব্যের নরখণ্ডে আবার যে চণ্ডীর সাক্ষাৎ পাচ্ছি, তাঁর সঙ্গে পূর্বোক্ত কোন দেবীরই কোন সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। এই চণ্ডী পুরাণোক্ত চণ্ডী নন, এমন কি চণ্ডীমঙ্গলোক্ত সতী বা উমাও নন, ইনি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক দেবী, যাঁর নিকট উৎপীড়িত পশুকুল আশ্রয়ের জন্য আকুল কণ্ঠে আবেদন জানায়, যিনি স্বেচ্ছায় গোধিকারূপ ধারণ করেন এবং ব্যাধজাতির নিকট থেকে পূজা গ্রহণ করেন। বস্তুত, ইনিই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আসল দেবী—দেবী মঙ্গলচণ্ডী, এঁরই মাহাত্ম্য-প্রচারের জন্য 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' রচিত হয়েছে। এই দেবীর সাক্ষাৎ লাভের জন্যই আমাদের অনার্যদের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। অনার্যকুল থেকে আগতা এই দেবীর সঙ্গে মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডীর নাম-সাদৃশ্য ছাড়া অপর কোনই সম্পর্ক নেই। কিন্তু এই দেবীকে জাতে তুলবার জন্যই দেবখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত পৌরাণিক দেবীদের সঙ্গে এঁকে অভিন্ন দেখাবার একটা জোড়াতালি-দেওয়া প্রচেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু সেই চেষ্টাও যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে তা যে কোন সতর্ক পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে না। দেবখণ্ডের শেষ অংশে দেখা যায় যে, সাংসারিক অস্বচ্ছলতা এবং অর্থকৃচ্ছ্র তার জন্য হর-গৌরীর মধ্যে প্রবল দাম্পত্য কলহের সৃষ্টি হয়েছে। দেবী তখন কিছুটা স্বচ্ছলতার জন্য মর্ত্যলোকে পূজা-প্রচারে আগ্রহী হলেন। অথচ এর পরই তিনি কালকেতুকে 'সাতঘড়া ধন' পাইয়ে দিলেন। জোড়াতালি দিয়ে দুটি দেবতাকে এক করবার প্রচেষ্টাই তাঁর চরিত্রের এই অসঙ্গতির একমাত্র কারণ। কেউ কেউ অনুমান করেন যে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নরখণ্ডে যে চণ্ডীর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, তা মূলত কোন লৌকিক কাহিনী থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। কোন অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্না মানবীতে দেবীত্ব আরোপ করেই তাঁকে কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অতএব দেখা যাচ্ছে, একমাত্র নাম ছাড়া

পৌরাণিক চণ্ডীর সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যোক্ত কোন চণ্ডীরই কোন সাদৃশ্য নেই। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'মঙ্গলচণ্ডী' সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দেবী।

বৃহদ্ধর্ম-পুরাণে একটি শ্লোক আছে—

'ত্বং কালকেতুবরদা চ্ছলগোধিকাসি যা ত্বাং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা।

শ্রী শালবাহন নৃপাদ্ বণিজঃ স্বসূনাঃ রক্ষেহম্বুজ করিদ্বয়ং গ্রসতী বমন্তী।।'

—'আপনি সুবর্ণগোধিকা মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া কালকেতুকে বর দিয়াছেন, আপনি শুভা মঙ্গলচণ্ডিকা, আপনি মাতঙ্গ ভোজন ও উদগীরণ করতঃ কমলে-কামিনীরূপে শ্রীমন্ত সদাগর ও তৎপিতাকে শ্রীশালবাহন-রাজার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন।' স্পষ্টতই এখানে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কালকেতু-কাহিনী এবং ধনপতি সদাগর-কাহিনীর উল্লেখ বর্তমান। যেহেতু, পুরাণে আছে, সেইহেতু এর প্রাচীনত্বের উপর গুরুত্ব আরোপের কোন কারণ নেই; কারণ 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' অতিশয় অর্বাচীন কালে রচিত হয়েছে। বাঙলাদেশে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য প্রচারিত হবার পরই সম্ভবত পুরাণের এই শ্লোকটি রচিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত চণ্ডীপূজার ইতিহাসের জন্য অন্যত্র সন্ধান চালাতে হবে।

পুরাণের অর্বাচীনতা

যে সকল চণ্ডীমঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়েছে, তাদেব কোনটিই ষোড়শ শতাব্দীব পূর্ববর্তীকালে রচিত নয়। তবে বৃন্দাবনদাস-কৃত চৈতন্যভাগবত-পাঠে জানা যায় যে, চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই বাঙলাদেশে সাড়ম্বরে চণ্ডীর পূজা হতো। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন ঃ

'ধর্মকর্ম লোকে সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।।'

তখনকার দিনে সারারাত্রি জেগে মঙ্গলচণ্ডীব গীত গাওয়া হতো; এ থেকে অনুমিত হয় যে অন্তত চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতেই বাঙলাদেশে মঙ্গলচণ্ডী পাঁচালীর আকারে রচিত হয়েছিল। এই লিখিত প্রমাণগুলি ছাড়া প্রাচীন বাঙলায় চণ্ডীপূজার যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তা একান্তই পাথুরে প্রমাণ। দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত একটি দেবীমূর্তির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে উত্তরবঙ্গে—দেবীর বামদিকে একটি গোধিকামূর্তিও বর্তমান। অতএব এই মূর্তিটি নিঃসন্দেহেই চণ্ডীমূর্তি এবং অন্তত দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বেই যে বাঙলাদেশে চণ্ডীপূজার প্রচলন শুরু হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পৌরাণিক চণ্ডীর সন্ধান অবশ্য আরও অনেক পূর্বেই পাওয়া যায়। দেবীপুরাণ, কালিকাপুরাণ, বামনপুরাণ, বারাহীতন্ত্র আদি বহু গ্রন্থেই চণ্ডীর উল্লেখ এবং কাহিনী পাওয়া যায়। নাগার্জুন গুহার এক শিলালিপিতে মহিষাসুরমর্দিনী দেবীর উল্লেখ বর্তমান। কিন্তু পুরাণোক্ত চণ্ডীর সঙ্গে মঙ্গলচণ্ডীর কোন সম্পর্ক নেই বলে আলোচ্য প্রসঙ্গে এদের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করবার প্রয়োজন নেই। একমাত্র গোধাসনা দেবীকেই 'মঙ্গলচণ্ডী' বলে গ্রহণ করা সঙ্গত। পুরাণগুলির মধ্যে সুস্পষ্টভাবে মঙ্গলচণ্ডিকার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে, সেখানে বলা হয়েছে—'মঙ্গলেষু চ যা দক্ষা সা চ মঙ্গলচণ্ডিকা'। যিনি ভক্তের মঙ্গলসাধনে

মঙ্গলচণ্ডী

সক্ষম, তিনিই মঙ্গলচণ্ডিকা। ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণে চণ্ডীব সঙ্গে 'মঙ্গল' শব্দটি যুক্ত হবাব কারণ-স্বরূপ এক বিবাট তালিকা প্রদত্ত হয়েছে। যেখানে যত 'মঙ্গল' শব্দ আছে, পুবাণকাব তাদেব সবগুলিব সঙ্গে চণ্ডীকে যুক্ত কবতে প্রয়াস পেয়েছেন। প্রথমত দেবী সর্বমঙ্গলা শিবেব দ্বাবা পূজিতা হয়েছিলেন; অতঃপব মঙ্গলগ্রহ দ্বাবা পূজিতা হলেন, এব পব মঙ্গল নামক নবপতি দেবীকে পূজা কবলেন. মঙ্গলবাবে সুন্দবীদেব হাতেও দেবী পূজা পেয়ে থাকেন, সর্বশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নবনাবী কর্তৃক দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা পূজিতা হয়ে থাকেন। অন্যত্র আবও একটি কাহিনী এদেব সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, দেবী মঙ্গল নামক অসুবকে বধ কবে মঙ্গলচণ্ডী আখ্যা পেয়েছেন। কোন এক চণ্ডীমঙ্গলে এই কাহিনীটিও বিবৃত হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণে কোন কালে বচিত হয়েছিল, তা সুস্থিবভাবে বলা সম্ভবপব নয। তবে অনুমান হয, পুবাণটি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন হলেও সম্ভবত হিন্দুযুগেই বচিত হয়েছিল। অতএব বাঙলাদেশে অন্তত সেনা-বাজবংশেব আমলে যে মঙ্গলচণ্ডীব পূজা প্রচলিত হয়েছিল, তা প্রায নিশ্চিন্তভাবেই বলা চলে।

'চণ্ডীমঙ্গল'—কাহিনী ঃ

অপব সকল মঙ্গলকাব্যে একটি কাহিনীই প্রধান, কিন্তু চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রধান কাহিনী দুটি, এবং এই দুটি কাহিনীই পবস্পব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। শুধু তাই নয, কাহিনী দুটিব উৎপত্তিও ভিন্ন ভিন্ন কালে এবং উভয কাব্যে চণ্ডীব কাহিনী বর্ণিত হলেও তাঁবা যে মূলত কিংবা কুলতঃ এক নন, তা বুঝতে কষ্ট হয না।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেব কালকেতু ফুল্লবা কাহিনীব তিনটি খণ্ড—প্রথম খণ্ড দেবখণ্ড। বিভিন্ন দেবতাব বন্দনাব পব সৃষ্টিতত্ত্ব আদি বর্ণনা কবেই কবি দক্ষযজ্ঞ, সতীব দেহত্যাগ, পার্বতীরূপে পুনর্জন্মলাভ এবং মহাদেবকে স্বামীরূপে প্রাপ্তিব কাহিনী পুবাণ-অনুযাযী বচনা কবে গিয়েছেন। অতঃপব হবগৌবীব জীবনযাত্রা-বর্ণনাতেই কবি কল্পনাশক্তিব পবিচয দিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী পবিবাবেব অভাব-অনটনেব ফলে যে দাম্পত্যকলহেব সৃষ্টি হয়ে থাকে, তেমনি এক কলহেব ফলেই দেবী বুঝলেন, নিজেকে সমাজে-সংসাবে প্রতিষ্ঠিত কবতে না পাবলে চিবদিন লাঞ্ছনা-গঞ্জনাই ভোগ কবতে হবে। অতএব দেবী স্থিব কবলেন, মর্ত্যলোকে আপন পূজা প্রচাব কবতে হবে। মহাদেবেব সহাযতায দেবী ইন্দ্রপুত্র নীলাম্ববকে শাপগ্রস্ত কবে মর্ত্যলোকে পাঠালেন। এখানেই দেবখণ্ডেব সমাপ্তি। কিন্তু নামে দেবখণ্ড হলেও চণ্ডীমঙ্গলেব কবিবা সাধাবণত বাস্তব মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই হবগৌবীব জীবনযাত্রাব চিত্র অঙ্কন কবেছেন। গ্রন্থেব দ্বিতীয খণ্ড, আখেটিক খণ্ড বা কালকেতু-ফুল্লবাব কাহিনী। ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বব ব্যাধসন্তান কালকেতুরূপে জন্মগ্রহণ কবেছেন। দেবী চণ্ডী এই ব্যাধকে সহায কবেই মর্ত্যলোকে পূজা প্রচাব কববেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বনেব পশুকুলেব পূজা গ্রহণ কবেছেন, তাদেব অভয দান কবেছেন, স্বযং গোধিকাব ছদ্মবেশ ধাবণ কবেছেন, কালকেতুকে মাণিক্যেব অঙ্গুবী এবং সাত ঘড়া ধন পাইয়ে দিয়েছেন। ওদিকে আবাব কলিঙ্গবাজ্যকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে

চণ্ডীপূজা করতে বলেছেন। কালকেতু ঐ ধনের সাহায্যে অরণ্য কেটে গুজরাট নগর পত্তন করেছে, কিন্তু প্রজা না আসায় চণ্ডী কলিঙ্গরাজ্যে ঝড়-বন্যার উপদ্রব সৃষ্টি করলে উৎপীড়িত প্রজাকুল নবসৃষ্ট গুজরাট রাজ্যে এসে আশ্রয় গ্রহণ করলো। অতঃপর কালকেতুর সঙ্গে কলিঙ্গ রাজের যুদ্ধ বাধল। সেই যুদ্ধে কালকেতু পরাজিত ও বন্দী হলো। অতঃপর চণ্ডীর স্তবস্তুতি পাঠ করলে চণ্ডীর কৃপায় কালকেতু মুক্তি লাভ করে স্বরাজ্যে ফিরে এলো। এই কালকেতুর কাহিনীতে কোন লৌকিক কাব্যের প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়। এখানে যে চণ্ডীর বর্ণনা করা হয়েছে, ইনিই ওঁরাও জাতির পূজিতা চণ্ডী,—যিনি পশুকুলের অধিষ্ঠাত্রী এবং ব্যাধকুলের দ্বারা পূজিতা। লক্ষ্য করবার বিষয়, চণ্ডী পূজা লাভ করবার জন্য অতিশয় উৎসুক, কিন্তু তাঁর মধ্যে কোন নীচতার পরিচয় নেই। কিছুটা ছলনার পরিচয় দিয়েছেন বটে, কিন্তু তা এত কৌতুকরস-মিশ্রিত যে দেবীর ছলনার কথা ভুলে যেতে হয়। সাধারণত দস্যুদের দ্বারা পূজিতা চণ্ডীর সম্বন্ধে সাধারণের মনে একটা ভীতির ভাব বর্তমান থাকলেও এই চণ্ডীর মধ্যে কোন হিংস্রতার পরিচয় পাওয়া যায় না।

কালকেতুর কাহিনী

গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড বণিকখণ্ড অথবা ধনপতি সদাগরের কাহিনী। বনের রাখালদের নিকট থেকে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা শিখে খুল্লনা স্বগৃহে তার প্রচলন করলে স্বামী ধনপতি তাঁর অপরা পত্নী লহনার প্ররোচনায় মঙ্গলচণ্ডীর ঘট ভেঙ্গে দেন। অতঃপব তিনি সিংহল যাত্রা করেন। দেবী এবার সুযোগ পেয়ে অপমানের প্রতিশোধ নিলেন। ধনপতি কালীদহে কমলে-কামিনী মূর্তি দেখে সেই অলৌকিক কাহিনীর কথা সিংহলরাজকে জানালেন। কিন্তু সিংহলরাজকে এই দৃশ্য দেখাতে না পারায় ধনপতি কারারুদ্ধ হলেন। অতঃপর পিতা ধনপতির সন্ধানে এলো পুত্র শ্রীমন্ত সদাগর। সেও স্বয়ং কমলে-কামিনী মূর্তি দেখল, কিন্তু রাজাকে দেখাতে না পারায় কারারুদ্ধ হলো। অতঃপর মশানে নীত হ'য়ে শ্রীমন্ত চণ্ডীর স্তবস্তুতি প্রাঠ করে শুধু যে মুক্তি পেল, তা নয় পিতার সঙ্গে তার মিলন ঘটল এবং রাজকন্যাকেও বিবাহ করে পিতাকে সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরে এলো।

ধনপতি সদাগরের কাহিনী

গ্রন্থের এই খণ্ডে যে চণ্ডীব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, এই চণ্ডীই প্রকৃত মঙ্গলচণ্ডী। এই চণ্ডীর পরিকল্পনায় অনেকেই বৌদ্ধ-প্রভাবের কথা বলে থাকেন। চণ্ডীমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্বেও এই বৌদ্ধপ্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধ বা ধর্মকে বলা হয় আদিদেব,—আর চণ্ডীকে বলা হয়েছে আদ্যাশক্তি। মানিক দত্ত-রচিত 'চণ্ডীমঙ্গলে'র সৃষ্টি-প্রকরণে বৌদ্ধ শূন্যবাদ এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতেব প্রভাবের পরিচয় সুস্পষ্ট। 'শূন্যপুরাণে'র ভূমিকায় চারু বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্টতই স্বীকার করেছেন যে "বৌদ্ধ আদ্যা ক্রমশঃ হিন্দুর চণ্ডী হইয়া শিবের ভার্যা হইলেন।" মুকুন্দকবির চণ্ডীমঙ্গলেও পাওয়া যায় যে খুল্লনা মঙ্গলচণ্ডীর পূজা শিখেছিলেন বৌদ্ধতান্ত্রিক পঞ্চকন্যার নিকট থেকেই। হিন্দুদের দশমহাবিদ্যার দেবীরা সকলেই মূলত ছিলেন বৌদ্ধদেবী। কমলে কামিনীর কমলামূর্তির উদ্ভবও তেমনি বৌদ্ধসূত্র থেকেই। এই সমস্ত বিবেচনা করে ডঃ ভট্টাচার্য বলেছেন ঃ 'মনে হয়, মঙ্গলচণ্ডী নামক স্বতন্ত্র কোন লৌকিক দেবতার পরিকল্পনার সঙ্গে এই আদ্যার কাহিনী

কাহিনীতে বৌদ্ধপ্রভাব

পববর্তীকালে আসিযা সংযুক্ত হইযাছে। বৌদ্ধধর্ম যখন হিন্দুধর্মেব মধ্যে আত্মগোপন কবিতেছিল তখনই হযতো বৌদ্ধ আদ্যাকে এইভাবে চণ্ডীরূপে ব্যাখ্যা কবিবাব প্রযাস দেখা দিযাছিল।''

চণ্ডীমঙ্গল কাহিনী সুগ্রথিত নয, এতে যে দুটি গল্প আছে, তাদেব কোনক্রমেই একসূত্রে যুক্ত কবা যায না, এমনকি দেবখণ্ডে যে দেবতাব মাহাত্ম্য-প্রচাবই অভীপ্সিত ছিল, তাঁব সঙ্গে ও পববর্তী কাহিনী প্রোক্ত দেবীব যোগসাধন কষ্টকব,—কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বীকাব কবতে হবে, মঙ্গলকাব্যগুলি মধ্যে চণ্ডীমঙ্গলই শ্রেষ্ঠ। ''বালকোচিত কথাসাহিত্যেব যুগে চণ্ডীমঙ্গলই প্রথম পবিণত যুবমনেব পবিচয দিযেছে—উত্তেজনাময প্রাণধর্মেব উর্ধ্বে প্রশান্ত মনোধর্ম প্রতিষ্ঠাব চেষ্টা কবিযাছে। দেবদানবেব যুদ্ধ নহে, দেব মানবেব প্রতিযোগিতা নহে, অতি সাধাবণ বর্ণহীন ও তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনায সম্প্রসাবিত মানবজীবনই ইহাতে প্রধানভাবে বর্ণনীয। বাঙ্গালীব সুখদুঃখ, সামাজিক দলাদলি, কুসংস্কাব, বাবমাস্যা, বন্ধন প্রণালী, ভোজনতালিকা, বেশভূষা, বিবাহ বিধি, পবনিন্দা প্রভৃতি অতি সাধাবণ ব্যাপাবকেও চণ্ডীমঙ্গলে আস্বাদ্য কবিযা তোলা হইযাছে।' মনসামঙ্গলেব কবি যেমন প্রত্যক্ষভাবে দেবতা ও মানবেব দ্বন্দ্বেব অবতাবণা কবে অলৌকিক কাহিনী জমিযে তুলেছেন, চণ্ডীমঙ্গলেব কাহিনী তদ্রূপ নয। এখানেও চণ্ডী পূজালোলুপা, কিন্তু কখনও উগ্র হযে আত্মপ্রকাশ কবেন নি, বস্তুত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চণ্ডী অন্তবালেই অবস্থান কবেছেন। এমন কি, কাহিনীব গঠনেও তাঁব ভূমিকা অতি নগণ্য। গল্প চলেছে আপন স্বভাবে। তাই চণ্ডীমঙ্গলেব গল্প এত স্বাভাবিক, এত বাস্তব ও এত মানবিক। কী হবগৌবীব জীবনযাত্রায, কী পশুদেব ক্রন্দনে, কী কালকেতুব নগবপত্তনে, সর্বত্রই কবিদেব বাস্তব, মানবমুখী এবং সমাজ-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গিব পবিচয পাওযা যায। চবিত্র-চিত্রণেও চণ্ডীমঙ্গলেব কবিবা সর্বাধিক কৃতিত্বেব পবিচয দান কবেছেন। এমন কি চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীব দেবী চণ্ডী অলৌকিক শক্তিব অধিকাবিণী হলেও দেব-দেবীব মধ্যে তিনিই সর্বাধিক লৌকিক। মানুষেব সুখদুঃখেব সঙ্গে তিনিও জডিত। কালকেতু বাঁকে কবে ঘডা বোঝাই ধন বযে নিযে যাচ্ছে, পিছনে পিছনে চণ্ডীও চলেছেন, তাঁব কাঁখেও একঘবা ধন। কে বলবে ইনি দেবী?

কাব্যবিচাব

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন যে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে, বিশেষত কালকেতুব কাহিনীতে সমসাময়িক যুগেব সমাজ-বিবর্তনেব ইতিহাস অতি সুন্দবভাবে বিধৃত হযে আছে। প্রাচীন বর্ণগত কৌলীন্য-প্রথা কীভাবে ক্রমশ কাঞ্চন-কৌলীন্যকেই স্বীকাব কবে নিল, তাব এক অতি উপাদেয কাহিনী এই চণ্ডীমঙ্গল। বিত্তবান অনার্য ব্যাধসন্তানকে দমিযে বাখবাব জন্য ব্রাহ্মণ্য-সমাজাশ্রিত কলিঙ্গবাজ বিধিমত চেষ্টা কবেছিলেন। প্রজাসাধাবণও প্রথামত অনার্য বাজাব বাজ্যে বসবাসে অনিচ্ছুকই ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাঞ্চনকৌলীন্যেবই জয হলো, কলিঙ্গবাজ অনার্য ব্যাধ-সন্তান কালকেতুব সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হলেন। কালকেতুব কাহিনীব পশ্চাতে এমন একটা সামাজিক পটভূমিব অস্তিত্ব সম্ভবপব বলেই মনে হয। কাহিনীব মীমাংসাসূত্রেব পেছনে চৈতন্যদেবেব আবির্ভাব যে পবোক্ষ প্রভাব বিস্তাব কবেনি,

এমন কথাও অস্বীকার করা যায় না। বাঙলার বুকে অনার্য-অভ্যুত্থানের কাহিনী 'ইতিহাসসম্মত'। কৈবর্ত ভীম এবং দিব্বোক এইভাবেই সমাজের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছিলেন। কাজেই বাঙলার সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে অনার্য ব্যাধসন্তান কালকেতুর অভ্যুদয়কে ইতিহাসের ইঙ্গিত বলে মেনে নিতে আপত্তির কোন কারণ নেই। চৈতন্য-পূর্বযুগের 'মনসামঙ্গল' কাব্যের দেবী মনসার তুলনায় দেবী চণ্ডী কত বেশি মমতাময়ী রূপে দেখা দিয়েছেন, মনসার ক্রুরতা, স্বার্থপরায়ণতার তুলনায় চণ্ডী প্রকৃতই দেবী-তুল্যা, সর্বত্রই তিনি মানুষের হিতসাধন করে থাকেন, তাঁর চরিত্রের এই যে মানবপ্রীতি—এর পশ্চাতে কি চৈতন্য-প্রেমের প্রভাব না থেকে পারে!

চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর বিশ্লেষণ থেকে অতঃপর আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, এই কাব্যটিতেই উপন্যাসের ধর্ম অনেকটা পরিমাণ বর্তমান, ফলত এইদিক থেকে চণ্ডীমঙ্গলকেই সর্বাধিক আধুনিক ও প্রাগ্রসর কাব্য বলে অভিহিত করা চলে। তাই একালের সুধী সমালোচকদের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করে থাকেন যে, এ কালে রচিত হলে এ কাব্য উৎকৃষ্ট উপন্যাস-রূপে পরিগণিত হতো—তা' অতি যথার্থ। কারণ এই কাব্যের গঠনে এবং উপস্থাপনায় রয়েছে উপন্যাসেরই গুণ।

কাব্যের উপন্যাসধর্মিতা

চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ অন্যান্য মঙ্গলকাব্য রচয়িতার সংখ্যা যেমন সীমাহীন, চণ্ডীমঙ্গলের ক্ষেত্রে কিন্তু তা নয়। ডঃ সেন ১৯ জন চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতার কথা বললেও উল্লেখযোগ্য কবির সংখ্যা একান্তই মুষ্টিমেয়। কাহিনীর দিক থেকে কবিরা বিশেষ কোন স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিতে পারেন নি। মোটামুটি গতানুগতিকভাবেই সকলে কাব্য রচনা করে গিয়েছেন। এঁদের মধ্যে দু'জনের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য—একজন দ্বিজ মাধব, অপরজন কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী।

চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ

১. মাণিক দত্ত ঃ চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর কাব্যের একাধিক স্থলে তাঁর পূর্ববর্তী মাণিক দত্তের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

'মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীত পথপরিচয়।।'

অনেকেই অনুমান করেন যে এই মাণিক দত্তই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি গ্রন্থকার। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মাণিক দত্তকে ত্রয়োদশ শতকের লোক বলে মনে করেন। অসম্ভব নয়, এই যুগসন্ধি কালেই মাণিক দত্ত প্রথম চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করে থাকতে পারেন। কিন্তু মাণিক দত্তের রচিত বলে যে গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, তাতে এক সমস্যা দাঁড়িয়ে গিয়েছে। মাণিক দত্তের গ্রন্থে চৈতন্যদেব এবং তাঁর অনুচর-পরিকরদের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এতে ফিরিঙ্গী শব্দের প্রয়োগও লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ এতে কবিকঙ্কণের প্রভাবও দেখতে

পেয়েছেন। এর ভাষায়ও প্রাচীনত্বের লক্ষণ বিশেষ নেই। অতএব এই গ্রন্থের রচয়িতা মাণিক দত্তকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কেন, ষোড়শ শতাব্দীতে স্থাপন করাও কষ্টকর। ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "প্রাপ্ত পুঁথির মাণিক দত্ত অষ্টাদশ শতাব্দের আগেকার লোক না হওয়াই সম্ভব। তিনি খানিকটা পুরাণো মাল-মশলা ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু সে মাল-মশলা পূর্বতন কোন মাণিক দত্ত-এর কাছে নেওয়া কিনা এবং নেওয়া হইলে কতটা নেওয়া তাহা বলিবার উপায় নাই।" ডঃ সেনের উক্তি থেকে একটি সংশয়ের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। মাণিক দত্ত কি দু'জন ছিলেন? যদি তাই হয়ে থাকে, তবে একজনকে চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগে স্থাপন করা চলতে পাবে। অপর জন হয়তো পূর্বতন মাণিক দত্তের নিকট থেকে প্রাপ্ত কিছু কিছু মালমশলা ব্যবহাব করেছিলেন। আর মাণিক দত্ত যদি একজনই হযে থাকেন, তবে সুনিশ্চিতভাবেই তাঁব কাব্যে প্রক্ষেপেব প্রাচুর্য অসাধাবণ।

পরিচয় ও কাল

কবির ব্যক্তিগত পরিচয়-সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থের সম্পাদক বলেন যে কবি মাণিক দত্ত সম্ভবত মালদহ জেলার ফুলুয়া নগবে (ফুলবাড়ী গ্রাম) জন্মগ্রহণ কবেছিলেন। কবির কাব্যে যে সমস্ত স্থানের পবিচয় দেওয়া হয়েছে, তা থেকেও অনুমিত হয় যে তিনি মালদহ অঞ্চলের লোক হতে পারেন। কবির কাব্যপাঠে জানা যায় যে তিনি খঞ্জ ও বধির ছিলেন, দেবীর ববেই স্বাভাবিক দেহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

কবির কাব্যেব সৃষ্টি পত্তন অংশে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বর্তমান। সপ্তদশ শতাব্দীব ধর্মমঙ্গল কাব্যসমূহে যে ধবনের সৃষ্টি-তত্ত্ব বর্ণিত হযেছে, মাণিক দত্তের কাব্যেও তারই অনুরূপ কাহিনী দেখা যায়। . চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীতে এই বৌদ্ধপ্রভাব বিস্ময়কর। অবশ্য মুকুন্দেব কাব্যেও 'আদিদেব ঠাকুর নিরঞ্জন' এবং 'বৌদ্ধরূপ' ঠাকুর জগন্নাথের কথা উল্লেখ করা হযেছে, কিন্তু বৌদ্ধমতের এত সুস্পষ্ট প্রভাব ধর্মমঙ্গল-ব্যতীত অপর কোন কাব্যেই পাওয়া যায না। মাণিক দত্তের কাব্যেই কালকেতু-ফুল্লবার কাহিনী এবং ধনপতি সদাগবের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। কাহিনীব দিক থেকে বৈশিষ্ট্য না থাকলেও কোন কোন চরিত্র-সৃষ্টিতে মাণিক দত্ত কিছু কিছু নোতুনত্বেব পরিচয় দিয়েছেন ঃ শিবঘর্ম হইতে উদ্ভূত সবলকেতু ও ধবলকেতু নামে দুই ক্ষত্রিয় বীর শাপগ্রস্ত হয়ে ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করে এবং তাদের বংশেই কালকেতু জন্মগ্রহণ কবে। মাণিক দত্তের ভাঁড় দত্ত নিছক 'ভিলেন' (villain) চরিত্র নয়; ভাঁড় শিবের উপাসক বলেই চণ্ডীর কোপে পড়ে সর্বস্বান্ত হযেছিল। এবং পরে দুর্গার শরণাপন্ন হযে বক্ষা পায়। এই ভাঁড়ু গ্রন্থনায়ক কালকেতুর প্রতিদ্বন্দ্বী—ভাঁড় মাত্র নয়।

কাহিনী বিচাব

মাণিক দত্তের কাব্যে হেয়ালী-জাতীয় কিছু কিছু ছড়ার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এগুলিকে প্রাচীনত্বের নিদর্শন বলেই গ্রহণ করা চলে। কবি তাঁর কাব্যের নাম বলেছেন 'ভবানীমঙ্গল' বা 'দুর্গামঙ্গল'।

২. **দ্বিজ মাধব :** চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্যতম প্রধান কবি দ্বিজ মাধব বা মাধবাচার্য স্বীয় গ্রন্থে আত্মপরিচয়-দান এবং গ্রন্থ-রচনাকালের উল্লেখ করলেও তা মেনে নেবার পক্ষে অসুবিধার কারণ রয়েছে। তিনি আত্মপরিচয়-জ্ঞাপক শ্লোকে বলেছেন :

'পরাশর পুত্রজাত মাধব যে নাম।
কলিকালে হইত জগত অনুপাম।।'

জন্মস্থান হিশেবে কবি নবদ্বীপের কথা উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ এ প্রসঙ্গে সপ্তগ্রামের কথাও উল্লেখ করে থাকেন। আবার 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যের কবি মাধব আচার্যও আত্মপরিচয়-সূত্রে বলেছেন :

'পরাশর নামে দ্বিজকুলে অবতার।
মাধব তাহার পুত্র বিদিত সংসার ।।'

এই মাধব আচার্যও ষোড়শ শতাব্দীতে নবদ্বীপ-ধামে জন্মগ্রহণ করেন। আবার ময়মনসিংহ জেলার যশোদল গ্রামের গোস্বামীদের নিকট তাঁদের পূর্বপুরুষ বলে কথিত 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-রচয়িতা মাধব আচার্যের নামে 'মাধব-বংশতত্ত্ব' নামে যে কুলপঞ্জিকা আছে তাতে জানা যায় যে গঙ্গাতীরবাসী পরাশর-পুত্র মাধব পরবর্তীকালে ময়মনসিংহ জেলার মেঘনা-তীরে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। অতএব মনে হয়, 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' রচয়িতা মাধব আচার্যের আত্মপরিচয় শীর্ষক অংশ অনুলিপিকারদের কল্যাণে দ্বিজ মাধবের গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই

সমস্যা

অনুমানের স্বপক্ষে আরও একটি প্রবল যুক্তি এই যে, দ্বিজ মাধব-রচিত চণ্ডীমঙ্গল গ্রন্থ প্রধানত চট্টগ্রাম ও কিছু কিছু নোয়াখালি এবং রংপুর অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে। মাধবের জন্মস্থানরূপে পরিচিত নবদ্বীপ, সপ্তগ্রাম কিংবা ময়মনসিংহ অঞ্চলে একখানি গ্রন্থও পাওয়া যায় নি। আবার গ্রন্থে যে সমস্ত ভৌগোলিক তথ্য পাওয়া যায়, তা নবদ্বীপ-সন্নিহিত অঞ্চলেরই অনুরূপ। অতএব, মাধবের জন্মস্থান নির্ণয় করা একপ্রকার অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিজ মাধব নবদ্বীপে কাব্য রচনা করে যদি তা নিয়ে চট্টগ্রামে চলে এসে থাকেন, তবেই সমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্তু এ নেহাৎই কষ্ট-কল্পনা মাত্র। অতএব চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রোক্ত শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত মনে করাই সঙ্গত।

দ্বিজ মাধব তাঁর কাব্যে কাল-পরিচয়-জ্ঞাপক শ্লোকে বলেছেন :

'ইন্দুবিন্দু বাণধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধব গায়ে সারদাচরিত।।'

অর্থাৎ কবি ১৫০১ শকাব্দে (১৫৭৯ খ্রীঃ) কাব্য রচনা করেন। তিনি আবার অন্যত্র বলেছেন :

'পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।
একাব্বর নামে রাজা অর্জুন অবতার।।'

কিন্তু ১৫৭৯ খ্রীঃ যদিও আকবর সিংহাসনে আসীন ছিলেন, তবু সমগ্র বঙ্গে বিশেষত পূর্ববঙ্গে তাঁর প্রতাপ বিস্তৃত হয় নি। কবির প্রদত্ত শকের হিশেব এবং আকবরের উল্লেখের মধ্যে

সঙ্গতি বিধান কষ্টকর। ডঃ সুকুমার সেন তারিখ-সম্বন্ধীয় পদটির যে পাঠান্তর আবিষ্কার করেছেন—'ইন্দুবিন্দুবাণ-দাতা সব নিয়োজিত'—তাতে কবির গ্রন্থ ১৬৪৪ খ্রীঃ মধ্যে রচিত হয়েছিল বলে বোঝা যায়। কিন্তু এতেও আকবরের সঙ্গে কালের সঙ্গতি বজায় থাকে না। ডঃ সেন সম্ভবতঃ দ্বিজ মাধবেব প্রাচীনত্ব খর্ব করবার ইচ্ছা নিয়েই পাঠান্তরে মনোযোগী হয়েছেন। তিনি তারিখের ব্যাপারে ধাতা শব্দের প্রয়োগ পান নি বলেছেন, কিন্তু ভবানীশঙ্করেব রচনায় 'ধাতা' শব্দের প্রয়োগ আছে (ধাতা বিন্দু সাগরেন্দু)। এ ছাড়া তিনি প্রশ্ন তুলেছেন —'অঙ্কের বামাগতি' এখানে স্বীকাব করবেন কেন? সর্বত্রই যখন এই রীতি মেনে নেওয়া হয়েছে তখন এখানে না মানবাব কোন হেতু নেই। কাজেই তাঁর যুক্তি অগ্রহণীয। অতএব গ্রন্থধৃত পাঠ অবলম্বনে দ্বিজ মাধবের কাব্য রচনা কাল ১৫৭৯ খ্রীঃ বলেই মানবো।

দ্বিজ মাধব স্বীয় কাব্যকে 'সাবদাচরিত' এবং কোথাও 'সারদামঙ্গল' বলে অভিহিত করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থে এর নাম প্রদত্ত হয়েছে 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত'। কিন্তু মনে হয়, সেকালে মঙ্গলচণ্ডীব গীত বলতে বোধ হয় মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালীকেই বুঝাতো। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থটি পাঁচালী মাত্র নয়,—এই বিবেচনায় এব মঙ্গলচণ্ডীব গীত' নামকরণ সঙ্গত হয নি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা চলে যে চট্টগ্রাম অঞ্চলে 'সুকবি মাধবাচার্য-বিবচিত জাগরণ' নামক ব্রতকথা বা পাঁচালী জাতীয গ্রন্থের বিস্তৃতি ও প্রচার যথেষ্ট।

মাধবের কাব্য তিনখণ্ডে বিভক্ত : দেবখণ্ড, আখেটিক খণ্ড এবং বণিক খণ্ড। অন্যান্য কাব্যের সঙ্গে কাহিনীব দিক থেকে এর কোন পার্থক্য নেই, তবে এতে একটি পুবাণকথিত কাহিনী যুক্ত রয়েছে, যা অপব কোন মঙ্গলকাব্যেই পাওযা যায় নি। কাহিনীটি দেবী কর্তৃক মঙ্গলদৈত্য বধ। মূল কাহিনী আরম্ভ হ'বার পূর্বেই কবি দেবীকে দিযে মঙ্গলদৈত্য বধ কবিযে নিযেছেন। এর দ্বারা হযতো কবি 'মঙ্গলচণ্ডী' এবং 'চণ্ডীমঙ্গল' উভযত্র 'মঙ্গল' শব্দেব সার্থকতা প্রতিপাদন কবতে চেযেছেন। এর পর গতানুগতিকভাবেই কাহিনী অগ্রসর হয়েছে।

দ্বিজ মাধব গভীব তথ্যানুসন্ধানী দৃষ্টিব সাহায্যে জীবনকে দেখেছেন এবং সেই দৃষ্টিব আলোকে কাব্যখানি বচনা করেছেন; এই কারণেই তাঁর কাব্যে বাস্তবতা এমন স্পষ্ট। বস্তুত, বাঙলা সাহিত্যে এর পূর্ববর্তী কোন কাব্যে এমন সার্থকভাবে বাস্তববস-সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষিত হয় নি। ভাঁড়ু দত্তেব চরিত্র-সৃষ্টিতেও কবি অপরিসীম দক্ষতাব পবিচয দিযেছেন। ভাঁড়ুর কূটবুদ্ধি, চাতুবী ও বঞ্চনার চিত্রটি যেমন উজ্জ্বল হয়ে চিত্রিত হয়েছে, তেমনি স্পষ্টভাবে অঙ্কিত হয়েছে ভাঁড়ুর অপবাধ এবং শাস্তিবিধানের কাহিনী। কিন্তু কবির দৃষ্টি ছিল সমবেদনাপূর্ণ, তাই ভাঁড়ু চরিত্রের পাবিবাবিক অস্বচ্ছলতার চিত্র-অঙ্কনেও তাঁর সহানুভূতির পরিচয় দিয়েছেন—গৃহিণী বলেন, 'উদরে না চিনে অনু তাম্বুল পান মুখে'। তখন ভাঁড়ু—

কাব্যবিচার

'ভাঙ্গা কড়ি ছয বুড়ি গামছা বান্ধিযা।
ছাওয়ালের মাথায় বোঝা দিলেক তুলিয়া।।
কড়ি বুড়ি নাই ভাঁড়ুব বাক্য মাত্র সাব।
ত্বরায় পাইল গিযা নগর বাজার।।'

অন্যত্র 'আনুপূর্বিক সঙ্গতি রক্ষা করিয়া পূর্ণাঙ্গ চরিত্র সৃষ্টির এমন মৌলিক প্রয়াস' লক্ষ্য করা গেলেও কবিকঙ্কণের তুলনায় মাধবের অঙ্কিত চিত্রগুলি অনেকটা ধূসর বলেই মনে হতে পারে। কাহিনীর দিক থেকেও দ্বিজ মাধবের কাব্য অনেকটা অপরিসর, কবি তেমন আঁট-সাট করে গল্প জমিয়ে তুলতে পারেন নি। তাঁর কাব্যেও 'কালকেতু-কাহিনী' এবং 'ধনপতি সদাগরের কাহিনী' দুটিই রয়েছে—দুটিই সংক্ষিপ্ত বটে, তবে সংহত নয় অনেকটা শিথিলভাবেই গ্রথিত। অপ্রয়োজনীয় বিস্তার যেমন রয়েছে, তেমনি যেখানে রসাবেদনকে বিস্তৃত করবার প্রয়োজন ছিল, সেখানে তিনি সংক্ষেপে সেরেছেন, এগুলি অবশ্য তাঁর প্রাগ্‌বর্তিতারই লক্ষণ। তাঁর কাব্যে অনেকগুলি গীতাত্মক 'বিষ্ণুপদ' পাওয়া যায়। তাতে কিন্তু তাঁকে চৈতন্য-প্রভাবিত বলেই মানতে হয়। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর পাশে দ্বিজ মাধবকে তত উজ্জ্বল বলে মনে না হলেও অপরাপর মঙ্গলকাব্যে তাঁর তুল্য কবি যে কমই ছিলেন, তা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা চলে। কিন্তু মাধবাচার্যের একটি কৃতিত্বকে অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হয়—সেটি তাঁর কাব্যে 'সঙ্গতি'। চরিত্র এবং কাহিনী উভয়ত্র তিনি মোটামুটি সঙ্গতি বজায় রাখতে পেরেছেন, কোথাও উচ্চস্তরের কবি-কল্পনার পবিচয় দিতে না পারলেও স্বাভাবিক বুদ্ধি ও কল্পনার সাহায্যেই আগাগোড়া কাহিনী রচনায় ও চরিত্র-সৃষ্টিতে সেই সঙ্গতি রক্ষার চেষ্টা করে গেছেন। কবিকঙ্কণ অনেকস্থলেই এরূপ সঙ্গতি বিধানে ব্যর্থ হয়েছেন। একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। কবিকঙ্কণের কাব্যে আছে, কালকেতু -ফুল্লরার বিবাদের পর কালকেতু তার বৃদ্ধ পিতামাতাকে কাশীবাসে পাঠালো এবং মাসে মাসে খরচ পাঠাতে লাগলো, এটি একেবারে সম্পূর্ণ অবাস্তব কল্পনা। 'দিন আনে দিন খায়' এমন ব্যাধসন্তানের জীবনের সঙ্গে এব কোন সঙ্গতি নেই। পক্ষান্তবে মাধবের কাব্যে অনুরূপ ক্ষেত্রে সংসার-বৃদ্ধিতে অর্থে টান পড়ায় বৃদ্ধ ধর্মকেতু স্বয়ং শিকারে গিয়ে সিংহ-হস্তে প্রাণ হারালো। ব্যাধ-জীবনের একান্ত স্বাভাবিক পরিণতি। মুকুন্দ চক্রবর্তী যদি শিল্পীকবি হয়ে থাকেন, তবে দ্বিজ মাধব ছিলেন স্বভাবকবি।

৩. **কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী**ঃ মঙ্গলকাব্যের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে যে আত্মপরিচয় দান করেছেন, তাতে জানা যায়, কবির পৈতৃক বাসভূমি ছিল বর্ধমান জেলার দামুন্যা (দামিন্যা) গ্রাম। 'গৌড়বঙ্গ-উৎকল-অধিপ' রাজা মানসিংহের রাজত্বকালে (১৫৯৪-১৬০৫ খ্রীঃ) প্রজার পাপের ফলে মামুদ শরীফ হলেন ডিহিদার। তার অত্যাচারে কবিকে দেশত্যাগ করতে হলো। কবি পথে কোথাও আনুকূল্য লাভ করলেন, কোথাও প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হলেন। যা হোক কুচট্যা নগরে উপনীত হয়ে কবি তথায়,—

'তৈল বিনা কৈলু স্নান করিনু উদক পান,
শিশু কাঁদে ওদনের তরে।'

এই স্থানে ক্ষুধায় ভয়ে পরিশ্রমে কবি নিদ্রা গেলেন, তখন 'চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে'। চণ্ডী তাঁকে কাব্য-রচনার নির্দেশ দান করলে কবি ব্রাহ্মণ-ভূমি আড়রা নগরে রাজা বাঁকুড়া

রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কবির পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে রাজা কবিকে পুত্র রঘুনাথের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত কবলেন। কালক্রমে রাজা বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যু ঘটলে রাজগুণে অবদাত রঘুনাথ রাজা হলেন। তাঁরই সভার সভাসদ্‌রূপে কবি তাঁর কাব্য রচনা কবেন। কাব্যের নামরূপে তিনি 'অভয়ামঙ্গল'ই বারবার ব্যবহার করেছেন, কদাচিৎ বলেছেন 'নৌতুনমঙ্গল'। কবির অন্যান্য পরিচয়ে জানা যায়—কবির পিতা হৃদয় মিশ্র, পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবিচন্দ্র। সম্ভবত কবির পুত্র শিববাম, পুত্রবধু চিত্রলেখা, কন্যা যশোদা এবং জামাতা ছিলেন মহেশ। এই আত্মপরিচয়ে কোন তাবিখের উল্লেখ না থাকলেও হিশেবে কিছু অসঙ্গতি দেখা দেয। কাবণ মানসিংহের রাজত্বকালে ডিহিদার মামুদ শরীফের অত্যাচাবে অতিষ্ঠ হযেই যদি কবিকে গৃহত্যাগ করতে হয়, তা ১৫৯৪ খ্রীঃ-র পববর্তী কোন সময হওযাই স্বাভাবিক। কারণ মানসিংহ এ সনেই সুবেদার নিযুক্ত হন। কিন্তু তখনই রাজা রঘুনাথ আবাব বাজারূপে অধিষ্ঠিত। রঘুনাথেব বাজত্বকাল ১৫৭৩ খ্রীঃ-১৬০৩ খ্রীঃ। বাঁকুড়া বায়কে যে শুধু তখন পাওয়া যাচ্ছে না, তা নয়, কবিব বর্ণনা-অনুযায়ী তখন রঘুনাথ সম্ভবত শিশুই ছিলেন। আবাব কবি যে কালে ডিহিদারেব কথা উল্লেখ কবেছেন, ঐতিহাসিক মতে ঐ কালে নাকি ডিহিদাব-পদেরই উদ্ভব হয় নি। অতএব মুকুন্দ কবিব বর্ণনায় কোথাও ত্রুটি বযে গেছে অথবা প্রক্ষেপ ঢুকেছে বলে আশঙ্কা হয়। এই অসঙ্গতিব উপব যুক্ত হয়েছে আরও একটি তথ্যঘটিত অসঙ্গতি। কবিকঙ্কণেব কোন পুথিতে একটি তাবিখ-জ্ঞাপক পদ পাওয়া যায় :

কবির আত্মকাহিনী

> 'শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
> কত দিনে দিলা গীত হরেব বণিতা।।'

এ থেকে দু'টি তারিখ পাওয়া যায়—১৪৬৬ শক (১৫৪৪ খ্রীঃ) অথবা ১৪৯৯ শক (১৫৭৭ খ্রীঃ)। পূর্বোদ্ধৃত আত্মপরিচয়ের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য-বিধান কষ্টকব। মুকুন্দ কবিব কাল-সম্বন্ধে যাঁবা গবেষণা কবেছেন, তাঁবা প্রায সকলেই ধবে নিয়েছেন যে মানসিংহেব কালে তিনি গৃহত্যাগ করেছেন। অতএব কবিব উক্তিকে প্রামাণিক বলে গ্রহণ করলে মনে হয, কবি সপ্তদশ শতকেব গোড়াব দিকে হয়তো কাব্য রচনা করেছেন। যা হোক, আরও নোতুন কোন তথ্য আবিষ্কৃত না হওযা পর্যন্ত কবিকঙ্কণের কাল-সমস্যার সমাধান হবে না বলেই মনে হয। বাসুলী-মঙ্গল-বচযিতা কবিচন্দ্র মুকুন্দের পুথিতেও কালজ্ঞাপক এই পয়ারটি পাওযা যায়। নাম সাদৃশ্যে ঐ শ্লোকটি কবিকঙ্কণের গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হয়ে থাকতে পাবে।

কবিব কাল

মুকুন্দ চক্রবর্তী প্রাচীন ও মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। যে একমাত্র কবি তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সমর্থ, তিনি বায়গুণাকব ভাবতচন্দ্র। ভাবতচন্দ্র কাব্যের রূপকাব হিশেবে উৎকৃষ্টতর হলেও কবিকঙ্কণ জীবনশিল্পী-হিশেবে মহত্তর। কবিকঙ্কণের কাব্যে যে বাস্তবানুভূতি, চরিত্রসৃষ্টি-প্রচেষ্টা কিংবা বৃহত্তর মানবতাবোধের পরিচয পাওয়া যায়, ভারতচন্দ্রেব কাব্যে তা একান্তভাবে অনুপস্থিত। অতএব সামগ্রিক বিচারে মুকুন্দকেই শ্রেষ্ঠতার আসন দান করা হয। 'মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্য' বিশ্লেষণ কবলেই তাঁর কাব্যরচনা-শক্তির যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাবে।

কাব্যবিচার

গ্রন্থারম্ভেই কবি গ্রন্থোৎপত্তি-বর্ণনায় যে আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করেছেন, তেমন বাস্তব, সরস ও মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ সাহিত্যিক রচনা সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের কোন গ্রন্থেই সুলভ নয়। অতঃপর কবি যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন তা তাঁর উদ্ভাবিত নয় বলেই এতে মৌলিকতার অবকাশ কম। কিন্তু যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি কাহিনী পরিবেষণ করেছেন, কবির মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায় সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে। কবি হরগৌরীর জীবনযাত্রার যে চিত্র অঙ্কন করেছেন, তাতে আদিদেব ও জগন্মাতার দেবত্ব হয়তো ক্ষুণ্ন হয়েছে, কিন্তু সমসাময়িক যুগের বাঙালী নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, কোন ঐতিহাসিকের পক্ষেও এর চেয়ে বাস্তব ও নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করা সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ। মেনকা ও গৌরীর কলহ, শিবের ভিক্ষা, শিব ও গৌরীর কলহ—এদের মধ্যে যে জীবন-রস-রসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, তা'ই কবির কাব্যের বস্তু-সঞ্চয়কে বাস্তবরসে পরিণত করেছে। বস্তুত এই বাস্তবতাই কবিকঙ্কণের কাব্যের প্রাণ। পশুদের কাতর ক্রন্দনে, কালকেতুর জীবনযাত্রায়, ফুল্লরায় প্রার্থনায়, কালকেতুর রাজ্যপত্তনে—সর্বত্র মুকুন্দ বাস্তবচিত্রাঙ্কন-ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। ধনপতি সদাগর কাহিনীতেও জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এর পরিচয় বর্তমান। বাস্তবতার পরিচয় দ্বিজ মাধবের কাব্যেও বর্তমান। কিন্তু মাধবের কাব্যে তা তেমন রসাত্মক হয়ে উঠতে পারেনি। মুকুন্দ একই উপাদানকে জীবনরসে নিষিক্ত করে বাস্তবরসে পরিণত করেছেন।

মানবিকতা ও বাস্তবতা

কবিকঙ্কণের অপর বিশিষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে চরিত্র-চিত্রণে। এ বিষয়েও মধ্যযুগের অপর কোন কবি তাঁর সমকক্ষতা দাবি করতে পারেন না। দেব-দেবীর চরিত্রে তিনি মানবিকতা আরোপ করে সজীব ও স্বাভাবিক কবে তুলেছেন। মানব চরিত্রগুলি ততোধিক সমৃদ্ধ। গ্রন্থের নায়ক কালকেতুর সম্বন্ধে কবি বলেছেন ঃ

'শযন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকাল।
ছোট গ্রাস গেলে যেন তে-আঁটিয়া তাল।।'

আমাদের ভাগ্য যে কবি কালকেতুকে ভদ্রবীর করে তোলেন নি। ফুল্লরা সখী বিমলার বাড়িতে গেলে বিমালা তাকে বলে,

'আস্য গো প্রাণের সই বস্য গো বুহিনী।
মোর মাথায় গোটাকত দেখহ উকুনী।।'

কবি যেন এক একটা চরিত্রকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। একমাত্র ভদ্র চরিত্রগুলিতেই কবি যেন কিছুটা অসহায় হয়ে পড়েছেন, নতুবা ব্যাধ-চরিত্র কিংবা খল কুটিল চরিত্র-অঙ্কনে মুকুন্দ অতুলনীয়। মুকুন্দের মুরারি শীল এবং তৎপত্নী 'বান্যানী' চরিত্র এককথায় অনবদ্য। এত স্বল্পপরিসরে এমন জীবন্ত চরিত্রসৃষ্টির নিদর্শন যে কোন কালের সাহিত্যেই দুর্লভ। মুকুন্দের ভাঁড় দত্ত এবং দুর্বলাদাসীও নানা কারণেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। মুরারি শীল, ভাঁড় দত্ত, দুর্বলাদাসী প্রত্যেকটি খল চরিত্র, কিন্তু কোন চরিত্রই অপরটির প্রতিরূপ নয়, স্বতন্ত্র। একজন চেষ্টা করলেও আর একজন হতে পারতো

না। আবাব ফুল্লরা, লহনা, খুল্লনা—তিনটি নাবীচবিত্রই মোটামুটি একপর্যাযভুক্ত হলেও কবি প্রত্যেকটি চবিত্রেব স্বাতন্ত্র্য সর্বত্র বজায বেখেছেন। বস্তুতঃ, সুদীর্ঘ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেব দুটি কাহিনীতে যেন চবিত্রেব মিছিল চলেছে কিন্তু প্রতিটি চবিত্রকেই পৃথক্‌ভাবেই চিহ্নিত কবা যায, সব মিলিয়ে একটি জনতায পবিণত হয নি। কবিকঙ্কণেব চবিত্র-সৃষ্টিব এই বৈশিষ্ট্য সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগেব অপব কোন কাব্যে আব লক্ষ্য কবা যায না। "মুকুন্দবাম খুব বৃহৎ মহৎ বিস্ময়কব বিশাল চবিত্র সৃষ্টি কবিতে না পাবিলেও সাধাবণ, প্রত্যক্ষ, পবিচিত ও পাঁচাপাঁচি বাস্তব চবিত্রাঙ্কনে সাধাবণ কুশলতা দেখাইযাছেন।" (ডঃ অসিতকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায)

চবিত্রসৃষ্টিতে দক্ষতা ও বৈচিত্র্য

কবিকঙ্কণ তাঁব কাব্যে শুধু মানব-চবিত্রই অঙ্কন কবেন নি, বেশ কিছু দেব-চবিত্র, ভূত প্রেত এবং পশুচবিত্রও অঙ্কন কবেছেন, কিন্তু কবিব সৃষ্টি সর্বত্রই মানবিক। পর্বত-বাজ হিমালয এবং তাঁব বাণী মেনকাব চিত্রাঙ্কনে কবি তাঁব একান্ত পবিচিত নিম্নবিত্ত গৃহস্থ পবিবাবেব শবণ নিয়েছেন, তেমনি হব-গৌবীব চবিত্র সৃষ্টিতেও তিনি একটি ভিক্ষাজীবী দম্পতিকেই একান্ত বাস্তবরূপে উপস্থাপিত কবেছেন। এঁদেব চবিত্রে দোষ-গুণে মিশ্রিত খাঁটি মানবধর্মই উপস্থিত—দেবতা বলে এঁদেব কল্পনা কবা যায না। বস্তুতঃ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেব অপব কোন মানবচবিত্রও হবগৌবীব মতো এতখানি মানবিক হযে উঠতে পাবেনি। ভূতপ্রেতবাও হাটে গিযে মানুষেব মতই সওদা কবে 'মাংস পিঠা বসপানা, কৌতুকে কিনযে দানা, ঘটে বক্ত মদ্যেব পশাব। আব পশুদেব চবিত্র সৃষ্টি কবতে গিযে তো কবি একেবাবেই মানব-সংসাবকে টেনে এনেছেন। হস্তী, ববাহ, হবিণ প্রভৃতিব কাতব ক্রন্দনেব মধ্য দিযে ডিহিদাব মামুদ শবীফেব অত্যাচাবে জর্জবিত মুকুন্দ ও তাঁব প্রতিবেশীদেব আর্তনাদই ধ্বনিত হচ্ছে।

কবিব এই বাস্তবতাবোধ এবং সার্থক চবিত্র সৃষ্টি-ক্ষমতাব পেছনে বযেছে তাঁব সমাজ সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি। দেবজীবন হোক বা পশুজীবন হোক—কবি কখনও সমাজ নিবপেক্ষ ব্যক্তিজীবন নিযে ব্যস্ত থাকেন নি সমাজ জীবনেব প্রেক্ষাপটেই সেই সব জীবনকে নিবীক্ষণ কবে তাদেব মূল্যাযন কবেছেন। প্রত্যেকটি নবনাবীই সামাজিক জীব এবং সমাজ দ্বাবা তাদেব জীবনযাত্রা নিযন্ত্রিত হয এই বোধ কবিমনে সর্বক্ষণ সক্রিয ছিল বলেই কোন চবিত্র কৃত্রিম হযে উঠবাব অবকাশ পাযনি। খুল্লনাকে যে সতীত্বেব পবীক্ষা দিতে হযেছিল তা স্বামীব অবিশ্বাসেব জন্য নয, সমাজেব তাড়নাতেই। শ্রীমন্ত পিতৃসন্ধানে বেবিযেছিল নিজেব অন্তবেব তাগিদে নয, সমাজনিন্দাব ভযে। কবি চণ্ডীব সহাযতায পশুদেব মধ্যেও সমাজ গড়ে তুলতে চেষ্টা কবেছেন, কালকেতুকে দিযে একটি আদর্শ সমাজও গড়ে তুলেছেন। কবিকঙ্কণ সর্বদা চেষ্টা কবেছেন, যাতে একটা উপযুক্ত সমাজ পবিবেশে তিনি তাব কাহিনীকে উপস্থাপিত কবতে পাবেন। এই পশুদেব মধ্যেও একটা সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলবাব জন্য তিনি চণ্ডীব দ্বাবস্থ হযেছেন। আবাব কালকেতু যখন নোতুন বাজা হযে বসলো তখন তাব জন্যও কবি একটা আদর্শ সমাজ গড়ে তুলতে চেষ্টা কবেছেন। কবিকঙ্কণেব এই সমাজ সচেতনতাই তাঁব কাব্যকে উপন্যাসধর্মী কবে তোলবাব পক্ষে সহাযক হযেছে।

সমাজ সচেতনতা

বস্তুত, বাস্তবতা, চরিত্রসৃষ্টিক্ষমতা এবং উদার মানবিকতাবোধের জন্য কবিকঙ্কণের কাব্য খ্যাতির উত্তুঙ্গ চূড়ায় আরোহণ করতে সমর্থ হয়েছে। এই সমস্ত লক্ষণ বিচার করেই আধুনিক সমালোচকগণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলকে উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত বলে অভিহিত করে থাকেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ 'দক্ষ ঔপন্যাসিকের অধিকাংশ গুণই তাঁহার মধ্যে বর্তমান ছিল। এ যুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন তাহাতে সংশয় মাত্র নাই।" ডঃ সুকুমার সেনের মতে, "নিপুণ পর্যবেক্ষণ, জীবনে আস্থা, ব্যাপক অভিজ্ঞতা ইত্যাদি যে সব গুণ ভালো উপন্যাস-লেখকের রচনায় আমরা প্রত্যাশা করি, সে সব গুণ, সেকালের পক্ষে যথোচিত পরিমাণে মুকুন্দরামের কাব্যে পাই।" সুদীর্ঘকাল পূর্বে মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত কবিকঙ্কণের কাব্য পাঠ করে লিখেছিলেন ঃ "The thought and feelings and sayings of his men and women are perfectly natural, recorded with fidelity which has no parallel in the whole range of Bengali Literature." প্রাচ্য সাহিত্যরসিক ই. বি. কাওয়েল (E. B. Cowell) মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল-পাঠে সন্তোষ লাভ করে তাঁর অংশবিশেষ ইংরেজী ভাষায়ও অনুবাদ করেছিলেন। উক্ত কাব্য-সম্বন্ধে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত ঃ "It is this vivid realism which gives such a permanent value to the description."

কাব্যে উপন্যাসের লক্ষণ

সমগ্র মধ্যযুগের কাব্য-সাহিত্যে একমাত্র চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিই যে তাঁর কাব্যকে যুগলক্ষণাতিক্রমী বিবিধ গুণে মণ্ডিত করে প্রায় একালের উপন্যাসের সমপর্যায়ে নিয়ে আসতে পেরেছেন, সে-বিষয়ে অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্য বলেন, "..চণ্ডীমঙ্গল কাহিনী কিন্তু বিবিধ সাহিত্যগুণে সকল মঙ্গল কাহিনীকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। বালকোচিত কথাসাহিত্যের যুগে চণ্ডীমঙ্গলই প্রথম পরিণত যুবমনের পরিচয় দিয়াছে—উত্তেজনাময় প্রাণধর্মের ঊর্ধ্বে প্রশান্ত মনোধর্মের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছে। দেব-দানবের যুদ্ধ নহে, দেব-মানবের প্রতিযোগিতা নহে, অতি সাধারণ বর্ণহীন ও তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনায় সম্প্রসারিত মানবজীবনই ইহাদের প্রধানভাবে বর্ণনীয়। বাঙ্গালীর সুখদুঃখ, সামাজিক দলাদলি, কুসংস্কার, বারমাস্যা, রন্ধন-প্রণালী, ভোজ্যতালিকা, বেশভূষা, বিবাহবিধি, পরনিন্দা প্রভৃতি অতি সাধারণ ব্যাপারকেও চণ্ডীমঙ্গলে আস্বাদ্য করিয়া তোলা হইয়াছে।"

কাব্যে উপন্যাসের উপকরণ

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজসচেতনতা, মনস্তত্ত্ববোধ এবং অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তির যে পরিচয় দিয়েছেন, সেকালের বিচারে তা তুলনাহীন। তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উচ্চশ্রেণীভুক্ত কিন্তু নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন, তা'ও অতিশয় প্রশংসনীয়। কিন্তু সমাজের যে স্তরে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনুপ্রবেশ করতে পারেনি, যেখানে রয়েছে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাব, সেখানেই তাঁর মধ্যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। ফলতঃ সেখানে তাঁর রচনা বিশ্বসযোগ্য হতে পারেনি, অথবা বলা চলে, সেখানে তিনি যথার্থ সার্থকতা লাভ করতে পারেন নি। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে অনেকগুলি বিবাহের বিবরণ প্রদত্ত

হয়েছে—খুঁটিনাটি বিচারে এগুলি ত্রুটিহীন। ধনপতির বিবাহের ক্ষেত্রে এটি বিশ্বাসযোগ্য হলেও একই বর্ণনা যখন হরগৌরীর বিবাহে কিংবা কালকেতুর বিবাহে দেখা যায়, তখন একে মেনে নেওয়া কষ্টকর। হরগৌরীর বিবাহ দেবতা বিবাহ—ব্যাপারটা আমাদের জানা না থাকলেও মূল উৎস কালিদাসের কুমারসম্ভবে বিভিন্ন দেবতাদের উপস্থিতির কথা আছে, কিন্তু এখানে শুধু ভূতপ্রেত? এ ছাড়া হরগৌরীর বিবাহের শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান কালকেতুর বিয়েতে কেন আচরিত হবে? আসলে গ্রামপ্রান্তবাসী ব্যাধজীবনের সঙ্গে কবির প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকাতেই তিনি ব্যাধজীবনের উপর উচ্চশ্রেণীর আর্যজীবন আরোপ করেছেন।

কবির দুর্বলতা

তাই যে কালকেতুর নুন আনতে পান্তা ফুবোয়, তার বৃদ্ধ পিতামাতাকে কাশী পাঠানো হয় এবং মাসে মাসে মাসোহারা পাঠানো হয়। এই চিত্র একেবারেই অবিশ্বাস্য। কালকেতু দৈবধন লাভ কবে মহামূল্য প্রাসাদ নির্মাণ আবম্ভ কবলো 'ইন্দ্রনীল পাষাণে রচিত কৈল পোতা', কিন্তু কবি শেষ সামাল দিতে পাবলেন না, তাই সে প্রসাদের চাল হলো খড়ের—'চারিহালা খড়েতে ছাইল চারিপাট।' কালকেতুর নবনির্মিত গুজরাট রাজ্যে এত জাতি ও বৃত্তিধারী লোকের আগমন ঘটলো, যাদের বসবাসেব জন্য বিস্তৃত রাজ্যেব প্রয়োজন। কিন্তু কলিঙ্গরাজ্যেব অন্তর্ভুক্ত গুজরাট বনেব একপাশে তিনি একটি নগর মাত্র নির্মাণ করেছিলেন, তা নইলে কলিঙ্গরাজ অবশ্যই জানতে পারতেন—ভাঁড়ু দত্তের মুখে এ খবব শুনতে হতো না। আসলে, যেখানেই অপরিচয়ের ব্যবধান, যাকে পর্যবেক্ষণ করবার সুযোগ পাননি, সেখানেই কল্পনা তাঁকে বিপথগামী করেছে।· কবিকঙ্কণের কাব্যে যে দুর্বলতাব পরিচয়, অসঙ্গতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তাব মূলে আছে অপবিচয়ের ব্যবধান। যে জগৎ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাব সীমায নেই, অর্থাৎ যাব সঙ্গে তাব পবিচযেব সুযোগ ঘটে নি, সেখানেই তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে কোন কবির পক্ষেই প্রতিটি বস্তুব সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় স্থাপন সম্ভবপর নয়, সেখানেই তাঁবা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ কবেন। আসলে কবিকল্পনায মুকুন্দ তাদৃশ পাবদর্শী ছিলেন না, তাঁব কল্পনা দূব-বিস্তারী ছিল না, এই মূল কারণই তাঁব কাব্যে নানা দোষ সৃষ্টি কবেছে।

কেহ কেহ মুকুন্দকে দুঃখবাদী কবি বলে মনে কবে থাকেন। এই সিদ্ধান্তের পশ্চাতে সম্ভবত নিম্নোক্ত যুক্তিগুলিই প্রধান : মুকুন্দ কবি যে আত্মপরিচয দান করেছেন, তাতে স্বীয জীবনের অপরিসীম দুঃখ-দুর্গতির কাহিনী বর্তমান; পশুগণেব কাতর ক্রন্দনে কবির ব্যথাতুব জীবনের পবিচয় পাওয়া যায়। ফুল্লরার বারমাস্যায় দুঃখের অতি বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে; পবিশেষে গরীব দুঃখীদের জীবন-চিত্রেই কবি-প্রতিভাব সমধিক স্ফূর্তি লক্ষ্য করা যায়। তথ্য হিশাবে উপযুক্ত উদাহরণগুলি সত্য বলে প্রমাণিত হলেও সিদ্ধান্তটি সমীচীন বলে মনে হয় না।

কবি কি দুঃখবাদী?

কাবণ মুকুন্দেব যে প্রখব বাস্তবানুভূতি ছিল তাতে বস্তুত দুঃখের চিত্রাঙ্কনে তাঁব সার্থকতা ঘটাই স্বাভাবিক। কবি যদি সহৃদয় হন (অবশ্য, কবিমাত্রই সহৃদয় হয়ে থাকেন), তবে অপরের দুঃখবেদনাকে আপন অন্তব দিয়ে অনুভব কবে অনুরূপভাবে আবার তাকে প্রকাশ করতে পারেন। অতএব

দুঃখের বাস্তবচিত্রণে কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে বলেই যে কবি দুঃখবাদী হবেন, তেমন সিদ্ধান্ত অসঙ্গত। বস্তুত, মুকুন্দরাম যেমন দুঃখের চিত্র অঙ্কন করেছেন, তেমনি প্রতিটি দুঃখের শেষেই আশার আলোও দেখিয়েছেন। তাঁর কোন কাহিনীরই পরিণাম দুঃখময় নয়। পক্ষান্তরে কবি যে রঙ্গ-রসিক ছিলেন, তার পরিচয়ও গোপন রাখেন নি। বহু চরিত্রেই অসঙ্গতি দেখিয়ে কবি যে রগড় করেছেন, তা ও তাঁর দুঃখবাদী মনের পরিচায়ক নয়। অতএব কবি দুঃখবাদী ছিলেন—এই অভিমত ভ্রান্ত।

মুকুন্দ কবির ধর্মমত-সম্বন্ধে বহু বাদ বিতর্ক হয়ে গেছে। কবির পিতামহ গোপালমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন, কবি চৈতন্যবন্দনা করেছেন, গ্রন্থের বহুস্থলেই কবির বিষ্ণুভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়—এই সকল লক্ষণ থেকেই কেউ কেউ কবিকে বৈষ্ণব বলে অভিহিত করে থাকেন। পক্ষান্তরে কবি শাক্তকাব্য রচনা করেছেন, কৌলিক ধর্মে চক্রাদিত্য-শিবের সেবক ছিলেন, শিবের কৃপায় কবিত্বশক্তি লাভ করেছেন, গ্রন্থে সর্বদেবতারই বন্দনা করেছেন,—এই সমস্ত লক্ষণ দেখে কি তবে কবিকে শাক্ত, শৈব সবই বলব? বস্তুত যে কোন স্মার্ত ব্রাহ্মণের মতই কবি ছিলেন পঞ্চোপাসক। যে কোন শৈব অথবা শাক্ত আনুষ্ঠানিকভাবে বিষ্ণুপূজা করে থাকেন, কিন্তু কোন বৈষ্ণব দায়ে না পড়লে শিব বা শক্তির ধার ঘেঁষেন না—তাঁদের এই অনুদারতা সর্বজনবিদিত; অতএব মুকুন্দ কবি যে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সর্বশেষ, মুকুন্দের কাব্যের অপর একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমরা বিভিন্ন অনুবাদ সাহিত্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে দেখেছি, শ্রেষ্ঠ কবিদের সকলেই তত্তৎ কাব্যকে বাঙালী জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নোতুনভাবে রচনা করেছেন। কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, মালাধর বসু প্রভৃতি প্রধান কবিদের সকলের সম্বন্ধেই উক্তিটি প্রযোজ্য। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ এ বিষয়ে পদপ্রদর্শকের গৌরব লাভ থেকে বঞ্চিত হলেও তিনি যে বাঙালী জীবনের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে হরগৌরীর জীবনযাত্রার কাহিনী উল্লেখ করা চলে। বস্তুত, বলে না দিলে বুঝবার উপায় নেই,—এই কাহিনী কোন দেবতার লীলাকাহিনী। এই কাহিনীকে গদ্যভাষায় রূপান্তরিত করে অনায়াসে আধুনিক বাঙালীর জীবনচিত্র বলে চালিয়ে নেওয়া চলে। মুকুন্দ তাঁর কাব্যে এই যে শাশ্বত বাঙালী জীবনের কাহিনী রচনা করেছেন, এটিকেই তাঁর কবি-কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে মনে করি। আবার ধনপতি কাব্যের প্রথম পর্বে লহনা খুল্লনা দুই সতীনকে নিয়ে ধনপতির সংসার-যাত্রা নির্বাহের যে কাহিনী মুকুন্দ কবির কাব্যে বর্ণিত হয়েছে, তেমন একটি কাহিনী একেবারে সামগ্রিক উপস্থাপনা-সহ (শুধু অলৌকিক অংশটুকু বাদ দিয়ে) কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তী বাঙালা সাহিত্যের একটি উপন্যাস হয়ে উঠতে পারতো না?

বাঙালীর জীবনশিল্পী

৪. অপ্রধান কবিগণ ঃ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রধান কবিব সংখ্যা একেবাবেই মুষ্টিমেয। যে সকল কবিব কাব্য-সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা কবা হযেছে, তাব বাইবে স্বল্পসংখ্যক কবি স্বল্পতব প্রতিভা নিযে আবির্ভূত হযেছেন। নিম্নে তাঁদেব পবিচয প্রদত্ত হলো।

দ্বিজ জনার্দনেব নামে প্রচাবিত পুস্তিকাটিকে পাঁচালী বলাই সঙ্গত। গ্রন্থটি আযতনে অতিশয ক্ষুদ্র হলো এতে কালকেতু এবং ধনপতি— উভয গল্পই বর্তমান। তবে মূল কাহিনী ধনপতিব ও কালকেতুব কাহিনী এব অঙ্গীভূত হযেছে মাত্র। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এটি পাঁচালী মঙ্গলকাব্য এবং এব ক্ষেত্র পৃথক্। অতএব ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন এব উপব যে-কাবণে গুরুত্ব আবোপ কবেন, তা এই ঃ "এইরূপ কোন চণ্ডীব গীতকে অবলম্বন কবিযা মাধবাচার্য তাঁহাব কাব্য গঠন ও চবিত্রগুলিব বেখাপাত কবিযাছিলেন, সন্দেহ নাই।" দীনেশবাবু গ্রন্থেব প্রাচীনত্ব বুঝাবাব জন্য যে সকল সন-তাবিখ উল্লেখ কবেছেন, তা নির্ভবযোগ্য বলে বিবেচিত হয না।

মুকুন্দ চক্রবর্তীব কাব্যেব একস্থলে একটি শ্লোক পাওযা যায--

'বন্দিলুঁ গীতেব গুরু শ্রীকবিকঙ্কণ।
প্রণাম কবিযা পিতামাতাব চবণ।।'

এই কবিকঙ্কণ-সম্বন্ধে অনেকেই অনুমান কবেন যে, উক্ত-উপাধিক ব্যক্তি হযতো মুকুন্দেব সঙ্গীতবিদ্যাব গুরু ছিলেন। আবাব কেউ কেউ বলেন যে, মেদিনীপুব-বাসী বলবাম কবিকঙ্কণ মুকুন্দ কবিব পূর্বেই কাব্য বচনা কবেছিলেন। মুকুন্দ প্রাগ্‌বর্তী মাণিক দত্তেব সঙ্গে তাঁব নামও উল্লেখ কবেছেন। কিন্তু উক্ত বলবাম কবিকঙ্কণ নামেই শুধু বর্তমান। তাঁব কাব্যেব কোন সন্ধান পাওযা যায নি। বহুকষ্টে তাঁব পুথিব নকলেব যে নকল আবিষ্কাব কবা হয তাও কোন গ্রন্থ নহে, কযেকটি খণ্ডিত পত্র মাত্র। অতএব, তাঁব পুথি আবিষ্কৃত না হাওযা পর্যন্ত এই বিষযে আলোচনা নিবর্থক।

সম্প্রতি **দ্বিজ রামদেব**-বচিত 'অভযামঙ্গল' নামক একখানি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হযেছে। গ্রন্থে বচনাব তাবিখ দেওযা হযেছে ঃ 'ইন্দুবাণ বিসিবাণ বেদসহ জিত' অর্থাৎ ১৫৭১ শকাব্দ বা ১৬৪৯ খ্রীঃ। কবি বামদেব দ্বিজ মাধব এবং মুকুন্দব পববর্তী ছিলেন। কবি সম্ভবত চট্টগ্রাম বা ত্রিপুবা অঞ্চলেব লোক ছিলেন। ডঃ ক্ষুদিবাম দাস গ্রন্থখানি পাঠ কবে অভিমত প্রকাশ কবেছেন যে দ্বিজ বামদেবেব কাব্য মাধবেব কাব্য থেকেও উৎকৃষ্ট। তিনি আবও বলেছেন, "বামদেবেব গ্রন্থে শতাধিক উৎকৃষ্ট পদেব সংস্পর্শে আসিতে হয। ইহাব অধিকাংশ বাধাকৃষ্ণ-সম্পর্কে বচিত। ঘটনাবিশেষেব প্রাবম্ভে তদুচিত পদ-সন্নিবেশেব এই কৌশলটি বামদেব তৎকাল-প্রচলিত চৈতন্যমঙ্গল গান হইতে পাইযা থাকিবেন।" যা হোক, এখনও গ্রন্থটিব সামগ্রিক পবিচয পাওযা যায নি।

কবি **মুক্তারাম সেন** তাঁর 'সাবদামঙ্গল' গ্রন্থটি সম্ভবত ১৬৬৯ শকাব্দে (১৭৪৭ খ্রীঃ) বচনা কবেছিলেন। কবি তাঁর গ্রন্থে বিস্তৃত আত্মপবিচয দান কবেছেন। তাতে জানা যায যে কবিব পিতাব নাম মধুরাম, জাতিতে বৈদ্য, কবি চট্টগ্রামেব অন্তর্গত দেবগ্রামে বাস করতেন।

তাঁর জনৈক পূর্বপুরুষ যশোহর জেলার কালিয়া গ্রাম থেকে চট্টগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। গ্রন্থে যে হরিলাল-নামে ভণিতাটি পাওয়া যায়, তা কবিরই নামান্তর বলে মনে হয়। কবির কাব্যটি ক্ষুদ্রকায়, রচনাভঙ্গিও অনেকটা পাঁচালী-জাতীয় । লক্ষণীয় বিষয় এই কবি চট্টগ্রামের অধিবাসী হলেও তাঁর কাব্যে দ্বিজ মাধবের কোন প্রভাব নেই। মুক্তারামের কাব্যের ভাষা সরল, পাণ্ডিত্য-প্রকাশের কোন প্রচেষ্টা দেখা যায় না।

দ্বিজ হরিরাম একখানা বৃহৎ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করলেও তাঁর সম্বন্ধে খুব বেশি সংবাদ জানা যায় না। তবে তিনি বিদ্রোহী শোভা সিংহের আশ্রয়ে থেকে কাব্যখানি রচনা করেছেন, এই অনুমানে তাঁকে সপ্তদশ শতকের শেষ ও অষ্টাদশ শতকের কবি বলে মনে করা হয়। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন হরিরামকে কবিকঙ্কণের পূর্ববর্তী বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তা যথার্থ নয়। মুকুন্দ-কবির কাব্যের সঙ্গে তাঁর কাব্যের বিস্ময়কর সাদৃশ্য থেকে বরং প্রমাণিত হয় যে কবি হরিরাম মুকুন্দ দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। কবির রচনায় পাণ্ডিত্য এবং কবিত্বের পরিচয় পাওয়া গেলেও চরিত্র-চিত্রণে তিনি প্রধান কবিদের কাছেও দাঁড়াতে পারেন না।

ভবানীশঙ্কর দাস 'মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা' নামে যে গ্রন্থখানি রচনা করেন, আকারে তা নাতিবৃহৎ। কবি তাঁর কাব্যের যে আত্মপরিচয় দান করেছেন, তা থেকে জানা যায় যে তাঁর পিতার নাম ছিল নয়ন রায়, নিবাস চট্টগ্রাম জেলার চক্রশালাপুরী, কবি জাতিতে কায়স্থ । ১৭০১ শকাব্দে (১৭৭৯ খ্রীঃ) কবি কাব্য রচনা করেছেন বলে গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কবি শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। গ্রন্থে প্রচুর সংস্কৃত শব্দ ও ক্রিয়াপদের ব্যবহার দ্বারা পাঠকের বিপত্তি ঘটিয়েছেন। স্থলবিশেষে তিনি এমন সন্ধিযুক্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন, যাতে তাঁর পণ্ডিতী ভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়, রসবোধের নয়।—

'যা হোন্তে হইলোৎপত্তি ভবাচ্যুতধাতা।'
'শৃনুধ্বং সাধব সব কর অবধান।'

গ্রন্থে অনেকগুলি রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক পদ উদ্ধৃত হয়েছে, কবি এগুলিকে 'ঘোষা' বলে উল্লেখ করেছেন। এই পদগুলিতেই প্রকৃতপক্ষে তাঁর কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

[তিন] ধর্মমঙ্গল

প্রধান তিনটি মঙ্গলকাব্যের মধ্যে ধর্মমঙ্গল একটি হলেও এর উদ্ভব ঘটেছিল অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে। যদি বা চৈতন্য-পূর্ব যুগেই কাব্যটির উৎপত্তি হয়ে থাকে, তবে সেই যুগে তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাচীন আর্যসাহিত্যে 'ধর্ম' শব্দটির অভাব নেই, এমন কি একজন ধর্মঠাকুরকেও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। মৃত্যুদেবতা যমের অপর নামই তো ধর্মরাজ। কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাব্যে যে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছে, তার সঙ্গে ধর্মরাজ যমদেবতার দূরতম সম্পর্কও খুঁজে পাওয়া যায়

না। মনসা এবং চণ্ডীর উদ্ভবের জন্য যেমন আমাদের প্রধানত অনার্য সমাজের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল, ধর্মঠাকুরের জন্যও আমাদের সেই পথই অবলম্বন করতে হচ্ছে। বস্তুত, মনসা এবং চণ্ডীর উপর যদিও বা আর্য দেব-দেবীদের কিছুটা প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, ধর্মঠাকুরের ক্ষেত্রে সেই প্রভাবও প্রায় দুর্লক্ষ্য বলেই অনুভূত হয়। মনসাদেবী ও দেবী চণ্ডী কালক্রমে সংস্কৃত পুরাণেও ঠাঁই পেয়েছিলেন এবং এঁদের আর্যীকরণও সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু ধর্মঠাকুরকে কখনও বিষ্ণু, কখনো শিব, কখনো বা বুদ্ধ-রূপে প্রচার করা হলেও তার আর্যীকরণ সম্পূর্ণ হয়নি তিনি অনার্য দেবতা হয়ে অনার্য ডোমদের দ্বারাই পূজিত হতে থাকলেন। ধর্মঠাকুরের পুজা বাঙলাদেশের একটা বিশেষ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ , বস্তুত উত্তর রাঢ়ভূমির বাইরে ধর্মঠাকুর প্রায় অপরিচিত বললেই হয়। ধর্মঠাকুর শুধু যে স্থানীয় দেবতা তাই নয়, তিনি ঐ স্থানের আদিম অধিবাসীদেরই দেবতা। আর্য আগমনের পূর্বে এই অঞ্চলটি প্রধানত নিষাদ বা অষ্ট্রীক জাতীয় আদিম অধিবাসীদের দ্বারাই অধ্যুষিত ছিল। অবশ্য একসময় প্রায় গোটা বাঙলাদেশেরই ছিল এই অবস্থা। তারপর কালক্রমে বাঙলার বিভিন্ন

ধর্মঠাকুরের উদ্ভব

অঞ্চল আর্য সভ্যতার কবলিত হয়, সম্ভবত এই উত্তররাঢ় অঞ্চলই শেষ পর্যন্ত আপন স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছিল। অতঃপর সেনরাজবংশের কালে, অথবা খুব আগে হলে পাল রাজবংশের কালেই বাঙলাদেশের এই অঞ্চলটিতে আর্য সভ্যতা বিস্তারলাভ করে। এর পরবর্তী কাহিনী প্রায় সর্বত্রই এক। প্রথমে আর্য ও অনার্যের বিরোধিতা এবং পরে কিছুটা নিজেদের প্রয়োজনে, কিছুটা বহিঃশক্তির আক্রমণে বাধ্য হয়ে উভয় শক্তির মধ্যে একটা সমীকরণের প্রক্রিয়া চলতে আরম্ভ করে। এইভাবেই অনার্য সমাজ থেকে মনসা এবং চণ্ডী কিছুটা আর্যভাব ধারায় সংস্কৃত হয়ে আর্য সমাজে প্রবেশাধিকার লাভ করেছিলেন। ধর্মঠাকুরও এই উপায়েই আর্যসমাজে গৃহীত হলেন, কিন্তু সংস্কারের ফলে প্রাগুক্ত দেবীরা ক্রমে যে শ্রদ্ধা ও মর্যাদার আসন লাভ করেছিলেন, ধর্মঠাকুরের কপালে ততটা জুটল না। রাঢ় অঞ্চলে আর্য সভ্যতা বিস্তারে অনেকটা বিলম্ব হয়েছিল বলেই ধর্মঠাকুরের প্রভাব এবং তৎসম্বন্ধীয় সংস্কার অনার্যদের মনে এত দৃঢ়মূল হয়ে গিয়েছিল যে পরবর্তীকালে ধর্মঠাকুরের উপর কোনপ্রকার সংস্কারই বোধ হয় তাদের পক্ষে সহনীয় ছিল না। তাই, ধর্মঠাকুর অপেক্ষাকৃত আদিমরূপেই আর্যসমাজে গৃহীত হলেন। ধর্মঠাকুরের উপর মাজাঘষার কাজটা খুব কম হয়েছিল বলেই উচ্চবর্ণের আর্যসমাজ

অনার্য সমাজ মধ্যেই সীমাবদ্ধ

ধর্মঠাকুরকে প্রায় কোন কালেই স্বীকার করে নিতে পারেন নি। ব্যাধদের দেবতা চণ্ডী পরবর্তী কালে উচ্চবর্ণের হিন্দুর গৃহে স্থান লাভ করেছেন, মেয়েদের হাতেই মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত ন্যস্ত থাকলেও চণ্ডীপূজায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সহায়তা ও আবশ্যক হয়। কিন্তু ধর্মঠাকুরের পূজার অধিকার পূর্বাপরই পঞ্চমবর্ণের হাতে রয়ে গেছে। ধর্মপূজায় ডোমজাতীয় পুরোহিতদেরই অগ্রাধিকার স্বীকৃত হয়, অবশ্য নিম্নবর্ণের আরও কোন কোন শ্রেণীর লোকও ধর্মপূজা করে থাকেন। পরবর্তীকালে উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই অবশ্য ধর্মমঙ্গল কাহিনী রচনা করেছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে

এই কথাও স্বীকার করেছেন, 'জাতি যায় তবে প্রভু যদি করি গান'—ধর্মমঙ্গলকাব্য-রচয়িতার জাতি যাবার আশঙ্কা ছিল। আবার ধর্মঠাকুর যখন ব্রাহ্মণদের হাতে পড়লেন, তখন অবশ্য তাঁকে কিছুটা মাজা-ঘষা করে একেবারে—

শঙ্খচক্রগদাপদ্ম চতুর্ভুজধারী।
আঁখির নিমেষে হলো সেই ব্রহ্মচারী।।'

ধর্মঠাকুরকে চতুর্ভুজ নারায়ণে পরিণত করে ফেলা হয়েছে। ধর্মঠাকুরের পূজার যে সমস্ত উপকরণ এখনও প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়, তা থেকেও তাঁর অনার্যত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে। শূকর, ছাগ, শাদা মোরগ, পায়রা, মদ ইত্যাদি উপকরণ এখনও পর্যন্ত ধর্মঠাকুরের পূজায় প্রয়োজনীয় বলেই বোঝা যায় যে অন্যান্য গ্রাম্য দেব-দেবীর মতো ধর্মঠাকুরের আর্যীকরণ কখনও সম্পূর্ণ হয় নি; আদিমকালের ধর্মঠাকুর প্রায় অপরিবর্তিতই রয়েছেন, শুধু উপরে এক আর্য-আবরণ পড়েছে মাত্র।

ধর্মঠাকুর বলে কোনও প্রকার মূর্তি নেই। সাধারণত কূর্মাকৃতি একখণ্ড শিলাকেই ধর্মঠাকুর বলে অভিহিত করা হয়। এই শিলাখণ্ডের উপরিভাগ অনেকটা বৌদ্ধস্তূপের আকৃতিবিশিষ্ট; পরন্তু বৌদ্ধ ত্রিশরণের অন্যতম 'ধর্ম' বুদ্ধদেবের নামান্তরও ধর্ম। এই সাদৃশ্য থেকেই মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি মনে করেন যে ধর্মঠাকুর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদেবতা মাত্র। কিন্তু এই স্থূল সাদৃশ্যটুকুর বাইরে যে বিপুলতর বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়, তাতে ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধদেবতা বলে মেনে নেওয়া সহজ নয়।

বৌদ্ধপ্রভাব

অবশ্য ধর্মমঙ্গলে যে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা করা হয়েছে, তার 'শূন্যতাবাদে' এবং 'আদিদেব নিরঞ্জনে'র পরিকল্পনায় কিছুটা বৌদ্ধ-প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়। হয়তো হিন্দুদের আগেই স্থানীয় অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করেছিল এবং বৌদ্ধগণ আদিম গ্রাম্যদেবতা ধর্মঠাকুরকে একটু মেজে ঘষে নিয়েছিলেন। নতুবা বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি অহিংসাবাদের কোন সমর্থনই এতে নেই। পূজায় বলিদান তো আবশ্যিক বটেই, এমন কি, ধর্মঠাকুরের ভক্তগণ যে ভাবে আত্মনির্যাতন করে থাকেন, তদনুরূপ কৃচ্ছ্রতা বৌদ্ধধর্মে নিন্দিতই হয়ে থাকে।

কেউ কেউ আবার কূর্মাকৃতি শিলাখণ্ডকে বিষ্ণুর কূর্মাবতার মনে করে ধর্মের উপর হিন্দুপ্রভাব আরোপের কথা বলে থাকেন। এই প্রসঙ্গে শিব, সূর্য এবং যমের কথাও অপরেরা উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু এই সকল ভাবনায় আমরা বড় জোর আত্মতুষ্টি লাভ করতে পারি, কিন্তু বস্তুতই কি ধর্মঠাকুরের পূজাপ্রকরণ-পদ্ধতি-আদির মধ্যে হিন্দুপ্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়? অন্তত সহস্রাধিক বৎসর হিন্দু সংস্পর্শে আসবার পরও যেখানে ধর্মের পূজায় শূকর বা মুরগী বলি দেওয়া হয়, এবং ডোম পুরোহিতই পূজার কার্য সমাধান করে থাকেন, তখন প্রভাবের কথাটা বড় বেশি শোনায়। প্রাচীন অনার্য জাতির আদিম সংস্কারই যে দেশকালপাত্রভেদে সামান্য মাত্র রূপ পাল্টে বর্তমান ধর্মদেবতায় পরিণত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। ডঃ সুকুমার সেনের সিদ্ধান্ত—"বিভিন্ন

ধর্মঠাকুর কি কূর্মাবতার?

যুগের বিভিন্ন স্তরের অনেক ঐতিহ্য ও কল্পনা ধর্মঠাকুরে পরিণতি লাভ করিয়াছে।" এই অভিমতে কোন বিশিষ্টতা আরোপ না করে সাধারণভাবে গ্রহণ করলে বোধ হয় একে মেনে নেওয়া চলে।

'ধর্ম' নামটি যে যমরাজের নাম নয় কিংবা বৌদ্ধ ত্রিশরণের 'ধর্ম'ও নয়, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তা সুনিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেন যে অস্ট্রীক ভাষায় কূর্মের প্রতিশব্দ 'দড়ম্' থেকেই 'ধর্মে'র উৎপত্তি হয়েছে। যে শিলাখণ্ডকে (সাধারণত অধিকাংশ শিলাই প্রায় কূর্মাকৃতি হয়ে থাকে) আদিম নিষাদ জাতি দেবতা ভেবে পূজা করত, তাই দড়ম যা আর্য-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে 'ধর্মে' রূপান্তরিত হয়েছে। বস্তুত, ধর্মঠাকুরের এই উদ্ভব কাহিনীই সর্বাধিক সম্ভাব্য বলে মনে হয়। আর এ কথাও নিশ্চিতভাবেই বলা চলে যে, যে সকল অনার্য দেবতা আর্যস্তরে উন্নীত হয়েছেন, তাদের মধ্যে ধর্মঠাকুরের মধ্যেই এখনো আদিম রূপটি সর্বাধিক প্রকট।

ধর্ম নামের উৎপত্তি

'ধর্মমঙ্গল' কাব্য' 'ধর্মঠাকুরে'র উৎপত্তি এবং তার প্রধান পূজক ডোম জাতি সম্বন্ধে বিভিন্ন দিক্ বিচার করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেও পূর্বাপর সমস্ত দিক দিয়ে সঙ্গতি থাকে। 'ডোম' জাতিকে হিন্দু সমাজের অধঃস্তর বলে বর্ণনা করা হলেও তারা নৃতাত্ত্বিক বিচারে যে আদিবাসী তথা অনার্য সমাজ থেকে উদ্ভূত নয়, এমন কথা জানা গেছে। খ্রীষ্টীয় যুগের আরম্ভকাল থেকেই কিংবা তার পূর্বেই উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে 'সিথিয়ান গোষ্ঠী' রূপে পরিচিত 'শক, কুষাণ, হূণ'দের বার বার ভারত আগমন ও ভারতের জনসমুদ্রের সঙ্গে মিশে যাবার কথাটা ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি। পারস্য থেকে আগত 'মগী ব্রাহ্মণ'দের কথাও জানি। এই সূত্রে তাদের উপাস্য 'সূর্যদেবতা'র আগমন ও তার পূজা প্রচলন এক স্বাভাবিক পরিণতি বলেই মনে হয় ।

সাম্প্রতিকতম

পারস্যে প্রাপ্ত সূর্যদেবতার মূর্তিতে মোজা ও বুট জুতা-পরিহিত দেখা যায় — আমাদের ধর্মঠাকুরের বিবরণেও এই বুটজুতা-পরিহিত রূপ পাওয়া যায়। অতএব সূর্য তথা মিহির-উপাসক পারসিক বা সিথিয়ানদের কোন একটি ধারা অথবা গবেষক রমাপ্রসাদ চন্দ-প্রবর্তিত এবং ড. হাটন ও ড. গুহ-সমর্থিত পামীর-তাকলামাকান থেকে আগত গোলমুণ্ড আর্যভাষী আল্পীয় নরগোষ্ঠী যদি ডোম জাতির পূর্বপুরুষ রূপে বাঙলাদেশে 'মিহিরকে'ই স্থানীয় আদিবাসীদের প্রভাবে ধর্ম ('দড়ম্') নামে প্রচলন করে থাকে, তবে ব্যাপারটার একটা স্বাভাবিক নিষ্পত্তি হতে পারে। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন ঃ "অতিপ্রাচীন কাল হইতেই পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় বলিয়া পরিচিত অঞ্চলে ডোম নামক জাতি সুসংহত সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিত — তাহারা এক অতি প্রাচীন পদ্ধতিতে সূর্যদেবতার উপাসনা করিত, তাহাদের মতে সূর্যদেবতা শ্বেতবর্ণ বলিয়া পরিকল্পিত হইত এবং তাহাদিগকে শ্বেতবর্ণের পশু বলি দিয়া তুষ্ট করিত। ইনি তাদের সর্বোত্তম দেবতা (Supreme God) ছিলেন । ক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দুগণ সেই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়া সেই

সূর্যোপাসনার রূপান্তর

দেবতার মধ্যে নিজেদের ধর্মের কিছু কিছু মিশ্রিত করিয়া দিয়া তাহাদের নিজেদের বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের পরিকল্পনায় এই দেবতার মৌলিক আদিম উপাদানগুলি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইল না। এইভাবে ডোমজাতির সর্বোত্তম দেবতা সূর্য বৌদ্ধ নিরঞ্জন ও হিন্দু বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পিত হইলেন। ...ধর্মপূজার মধ্যে সূর্যোপাসনার তিনটি ধারা, যথা একটি আদিম (primitive), একটি বৈদিক ও একটি পারসিক একত্রে মিশিয়া গিয়াছে।"

ধর্মঠাকুর একখণ্ড শিলামাত্র; অধিকাংশ স্থলেই কোন গাছের নীচে কখনও বা খোলা মাঠের মধ্যেই তাঁর আস্তানা। ধর্মঠাকুরের মন্দিরের সন্ধান কদাচিৎই পাওয়া যায়। ধর্মঠাকুর গ্রামদেবতা, স্থানভেদে তাঁর নামেরও বৈচিত্র্য আছে—বাঁকুড়া রায়, যাত্রাসিদ্ধি রায়, কালু রায়, বুড়া রায়, দলু রায় প্রভৃতি । ধর্মঠাকুর প্রধানত দাতা, নিঃসন্তানা নারীকে সন্তান দান করেন, অনাবৃষ্টি হ'লে ফসল দান করেন। কুষ্ঠরোগীকে রোগ থেকে মুক্তিদান করেন। নানাপ্রকার মানত করেই ধর্মঠাকুরের পূজা দেওয়া হয়। অনেকেই ধর্মঠাকুরকে মাটিব ঘোড়া দান করেন। ধর্মঠাকুরের পূজারীদের সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে যে তারা 'পণ্ডিত' উপাধিধারী হলেও জাতিতে অব্রাহ্মণ। প্রধানত ডোমজাতির পুরোহিতরাই ধর্মপূজায় বিশেষ অধিকারী। ব্রাহ্মণদের উপবীত-ধারণের মত ধর্মঠাকুরের পূজারীরা তাম্রধারণ করেন। অবশ্য ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের তাম্র-ধারণের কোন প্রয়োজন হয় না।

ধর্মঠাকুর

ধর্মঠাকুরের পূজা দুই প্রকার ঃ নিত্য এবং মানত পূজা। নিত্য পূজা নেহাৎই আনুষ্ঠানিকভবে সম্পন্ন হয়, আর মানত পূজা দীর্ঘকালব্যাপী বহুজনের চেষ্টায় সম্পন্ন হয়, এই বিশেষ আড়ম্বরপূর্ণ পূজাব নাম 'গৃহভরণ' বা 'ঘরভরা'। এই উপলক্ষ্যে বারটি শিলা একত্র করা হয় এবং বাবদিন ধরে অনুষ্ঠান চলে। অনুষ্ঠানের শেষ দিনে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই গাজন অনুষ্ঠানে আত্মনিপীড়নের চরম দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কোন কোন 'পাটভক্ত্যা' লৌহ শলাকায় শয়ন করে 'শালে ভর' দেন, কেউ বা দেহের কোন না কোন অঙ্গে 'বাণ' ফোড়েন। গাজনে বাবজন পুরুষ 'ভক্ত্যা' ও চারিজন 'আমিনী বা নারী ভক্ত্যা'র প্রয়োজন হয়। ধর্মঠাকুরের পূজার এমন অনেকগুলি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হয়, সাধারণভাবে যাদের অর্থ উদ্ধার করা কষ্টকর। নিরাকার ব্রহ্মের স্ত্রীরূপে কল্পিত শিলাখণ্ডকে বলা হয় 'কামিন্যা', ধর্মের সেবায়েতের নাম দেয়াসী (দেবদাসী), দেয়াসীর প্রধান সহায়ক 'ধামাৎকর্নী', বলির পশুর নাম 'লুয়ে', আর বারদিন গাইবার উপযোগী পালাগানকে বলা হয় 'বারমতি' ।

পূজা পদ্ধতি

ধর্মঠাকুরের পূজার উপকরণ সম্বন্ধে আগেও বলা হয়েছে। মূলত ধর্মঠাকুরের নিকট নরবলি দেওয়া হতো বলেই বিশ্বাস করা হয়। এখনও শূকর, ছাগ, মোরগ বা পায়রা বলি দেওয়া হয়। বলিতে হাঁড়িকাঠের প্রয়োজন হয় না। ভোজনরত পশুকে আকস্মিক আঘাতে হত্যা করা হয়। মাংস ছাড়া চূণ, মদ্য এবং পিষ্টকও ধর্মঠাকুরের পূজার অন্যতম উপকরণ। চাঁপা ফুল এবং চাঁপা কলা ধর্মঠাকুরের প্রিয় ফুল ও ফল।

ধর্মঠাকুর নিরঞ্জন হলেও তিনি স্বয়ং ধবল বর্ণ। অপর সকল ধবল বস্তুও এর প্রিয় ; এমন কি ধবল কুষ্ঠের দেবতা বলেও তিনি প্রসিদ্ধ। ধর্মঠাকুর ক্রুদ্ধ হলে কুষ্ঠ হয় এবং তিনি তুষ্ট হলে আক্রান্ত ব্যক্তি কুষ্ঠ থেকে মুক্তি পেয়ে থাকে। ধর্মঠাকুর নিরাকার হলেও কখন কখন তিনি সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ বা ফকিরের বেশ ধারণ করেন। এমন কি জুতা-মোজা পায়ে দিয়ে তিনি অশ্বারোহী সৈনিক-মূর্তিও ধাবণ করে থাকেন। এ সকল থেকে অনুমান করা চলে যে, মুসলমান শাসনকালে ও সমসাময়িক যুগের প্রভাবে ধর্মঠাকুরের পোষাক পবিচ্ছদেও কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে।

ধর্মের মূর্তি

ধর্মমঙ্গল কাব্যটি নানাদিক থেকে বিশিষ্ট। যে 'ধর্মঠাকুরে'র মাহাত্ম্য প্রচার উপলক্ষ্যে কাব্যটি রচিত, সেই ধর্মঠাকুর যেমন সর্ববঙ্গে পরিচিতও নন, তেমনি তার উদ্দেশ্যে রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যের উদ্ভব এবং প্রচার একান্তভাবেই পশ্চিম বাঙলাব একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে নির্দিষ্ট সমাজের মধ্যেই প্রচলিত। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের অনেকেই অনার্য সমাজ থেকে উদ্ভূত হলেও তাদেব আত্মীকরণ সম্পূর্ণ হযে গেছে এবং আর্যসমাজে গৃহীতও হয়েছেন। আবার অনেক মঙ্গল কাব্যের দেবতা মূলতই পৌবাণিক— কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাব্যের দেবতা ধর্মঠাকুর অনার্য সমাজ থেকে উদ্ভূত হলেও তাঁব আত্মীকবণ সম্পূর্ণ হয়নি, তিনি অনার্য স্তরেই রযে গেছেন। আবার ভিন্ন সূত্র থেকে অনুমান করা হয়, তাঁব নামটির সঙ্গে অনার্য শব্দ ('দড়ম্') এবং আকৃতিতে 'কূর্ম / কচ্ছপ' ও প্রস্তব-পূজাব অনুষঙ্গ জড়িত থাকলেও মূলত তিনি আর্য বংশীয় পারসিক তথা ইবানীদেবই 'সূর্য' তথা 'মিহির' - এরই (মিত্র = মিথ্র > মিথির > মিহির) রূপভেদ মাত্র। এদিক থেকেই তিনি বিশিষ্ট। মনসামঙ্গল কাব্যে একটিই কাহিনী, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কাহিনী দুটি হ'লেও একই রকম মাহাত্ম্যসূচক, কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাব্যের স্পষ্টতঃই দুটি ধাবা — একটি ধর্মপদ্ধতি বা পূজা বিষযক এবং অপরটি প্রচলিত কাহিনী — এটি উল্লেখযোগ্য। ধর্মমঙ্গল কাব্যেব কাহিনীতে যথেষ্ট জটিলতা ও বৈচিত্র্য। অনেক যুদ্ধ, বাজনীতি, অনেক মাবপ্যাচ। কাহিনীব বিশ্লেষণে কাব্যের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটিত হতে পারে।

কাব্যেব বৈশিষ্ট্য

ধর্ম-সাহিত্য বলতে যা বোঝায়, তাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে ; (ক) ধর্মপূজা-পদ্ধতি বা ধর্মপুবাণ ও (খ) ধর্মমঙ্গল কাব্য। প্রাচীন যুগের সাহিত্য-আলোচনা প্রসঙ্গে যে শূন্যপুরাণেব কথা বলা হয়ে থাকে, তাই ধর্মপূজা পদ্ধতি বা ধর্মপুবাণ জাতীয় সাহিত্য। শূন্যপুরাণ আসলে কোন পুরাণ বা সাহিত্যই নয়, প্রকৃতপক্ষে এটি ধর্মপূজা-পদ্ধতি মাত্র। গ্রন্থেব সম্পাদক এতে বৌদ্ধধর্মের শূন্যবাদের পবিচয় পেয়ে এব 'শূন্যপুবাণ' নামকরণ করেছেন। বস্তুত এই নামটির জন্যই অনেক ভ্রান্ত ধাবণার সৃষ্টি হযে থাকে। রামাই পণ্ডিত নামক কোন ব্যক্তিব ভণিতায় গ্রন্থটি রচিত। কোথাও কোথাও গোসাঞি পণ্ডিতের কথাও আছে। মনে হয়, রামাই পণ্ডিত এবং গোঁসাই পণ্ডিত অভিন্ন হতে পাবেন। রামাই পণ্ডিত ঐতিহাসিক ব্যক্তি—এই ধারণায অনেকেই তাঁর সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেছেন। এর ফলে রামাই পণ্ডিতের কাল নবম শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে ষোড়শ

ধর্মসাহিত্যের দুটি রূপ

শতাব্দীর মধ্যে যে কোন সময়ই হতে পারে। আবার কেউ কেউ আদৌ রামাই পণ্ডিতের অস্তিত্বেই বিশ্বাসী নন। ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "রামাই পণ্ডিতের কাহিনীর যদি কিছু ঐতিহাসিকত্ব থাকে, তবে তাহা উচ্চগ্রামের হোমিওপ্যাথিক মাত্রায়, তাহা হইতে ইতিহাস গঠন করা যায় না, উপন্যাসের পরিকল্পনা হইতে পারে।" রামাই পণ্ডিতের জীবনকাল ধরে একদল ঐতিহাসিক 'শূন্যপুরাণ'কে প্রাচীন যুগের অন্তর্ভুক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিষয়গত এবং ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ শূন্যপুরাণের ঐ দাবীকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। শূন্যপুরাণের মধ্যে বিভিন্ন কালে রচিত অংশের সংমিশ্রণ ঘটেছে। এদের প্রাচীনতম অংশ ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীরও হবে কিনা সন্দেহ, আর অর্বাচীন অংশ অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা বলে স্থিরীকৃত হয়েছে। শূন্যপুরাণে 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামক যে অংশটি সংযুক্ত হয়েছে (এর নামান্তর 'কলিমা জালাল'), তা ১৭৩৫ খ্রীঃ রচিত সহদেব চক্রবর্তীর 'অনিল পুরাণে' পাওয়া যাচ্ছে। অনুমান, 'অনিলপুরাণ' থেকেই এটি শূন্যপুরাণে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। এই শূন্যপুরাণের একান্নটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম পাঁচটি অধ্যায়ে সৃষ্টিতত্ত্ব এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিভিন্নপ্রকার পূজা পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

রামাইপণ্ডিত ও 'শূন্যপুবাণ'

শূন্যপুরাণের এই সৃষ্টিতত্ত্বে মহাযান বৌদ্ধধর্মের এবং নাথপন্থীদের মতবাদের প্রভাব খুব সুস্পষ্ট। ধর্মমঙ্গল কাব্যের সৃষ্টিতত্ত্বও এর অনুরূপ। অপর কোন কোন মঙ্গলকাব্যেও ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্বের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের প্রচারকাহিনী বিশেষভাবে জড়িত, বিশেষতঃ এর কাহিনীতে যে বৈচিত্র্য আছে, তাও অভিনব। নিরঞ্জন নিরাকার প্রভুর সৃষ্টি ইচ্ছা হলে নিজের কায়া থেকে নিরঞ্জন ধর্মের সৃষ্টি হয়। ধর্মের হাই থেকে উল্লুকের জন্ম হয়। অতঃপর ধর্মের ঘাম থেকে আদ্যাশক্তির সৃষ্টি হয়। আদ্যাশক্তির মন থেকে কামদেবের জন্ম হয়। আদ্যা যৌবনের ভার সহ্য করতে না পেরে বিষ পান করলে তিনি গর্ভবতী হলেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের জন্ম দান করলেন। জন্মগ্রহণ করেই তাঁরা তপস্যা করতে চলে গেলেন। তখন নিরঞ্জন ধর্ম তাঁদের পরীক্ষা করতে গেলেন। পরীক্ষায় একমাত্র মহাদেবই উত্তীর্ণ হলেন। তখন ধর্মের আদেশে শিব আদ্যাশক্তিকে বিবাহ করলেন।

সৃষ্টিতত্ত্ব

ধর্মের পূজার জন্যই আদিত্য রামাই-পণ্ডিতরূপে নরলোকে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যের সদাড়োম আর হরিশ্চন্দ্রের পালায় রামাই পণ্ডিতের কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

ধর্মসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ধর্মমঙ্গল কাব্য। ধর্মমঙ্গল কাহিনীতে ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণিত হলেও এর প্রধান আকর্ষণ এর কাহিনী। কাহিনীতে বৈচিত্র্য যেমন আছে, তেমনি আছে বিস্তৃতি। সোমঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ পার্বতীর অনুগ্রহে গৌড়েশ্বরের সামন্তরাজ ত্রিষষ্ঠিগড়ের কর্ণসেনকে পরাজিত করে নিজে সিংহাসনারোহণ করেন। এই যুদ্ধে কর্ণসেনের ছয়পুত্রই নিহত হয়েছিলেন, সেই শোকে কর্ণসেনপত্নীও দেহত্যাগ করেন। গৌড়েশ্বর কর্ণসেনের প্রতি সহানুভূতিবশতঃ তাঁর সঙ্গে আপন শ্যালিকা রঞ্জাবতীর বিবাহ দিলেন। কিন্তু

এতে রাজ-শ্যালক এবং রাজার পাত্র মহামদ অতিশয় রুষ্ট হলেন। গৌড়েশ্বর কর্ণসেন-রঞ্জাবতীকে ময়নাপুরে পাঠিয়ে দিলেন। রঞ্জাবতী 'শালেভব' দিয়ে ধর্মঠাকুরের অনুগ্রহে এক পুত্র লাভ করেন, পুত্রের নাম হলো লাউসেন। তার খেলার সাথীরূপে ধর্ম রঞ্জাবতীকে কর্পূরসেন নামে আর একটি পুত্র দান করেন। হনুমান এদের দু'জনকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দান করেন। এদিকে মহামদ কর্ণসেন বা রঞ্জাবতীর কিছু করতে না পেবে লাউসেনের অনিষ্ট কববার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। কর্পূরসেনকে সঙ্গে নিয়ে লাউসেন গৌড়যাত্রা কবেছেন, এবং চরিত্রবলে পার্বতীকে সন্তুষ্ট করে জয়খড়্গ লাভ কবলেন। পথে কামদল বাঘ এবং কুম্ভীরকে হত্যা করে এবং গণিকার ছলনাকে ব্যর্থ কবে লাউসেন গৌড়ে পৌঁছলেন। কিন্তু মহামদের চক্রান্তে তিনি সেখানে বন্দী হলেও ধর্মের অনুগ্রহে আবার মুক্তিলাভ করলেন। এব পর মহামদের প্ররোচনায় গৌড়েশ্বর লাউসেনকে কামরূপবিজয় অভিযানে পাঠালেন।

ধর্মমঙ্গলের কাহিনী

লাউসেন কালুডোমের সহায়তায় কামরূপ-যুদ্ধে জয়লাভ করলেন এবং রাজকন্যা কলিঙ্গাকে বিবাহ করলেন। এর পর লৌহগণ্ডারের শিরচ্ছেদ করে লাউসেন সিমুলের রাজকন্যা কানাড়াকেও বিবাহ করেন। এইবার মহামদ লাউসেনকে পাঠালেন পিতৃশত্রু ইছাই ঘোষকে দমন করবাব জন্য। ইছাই ঘোষ ছিলেন দেবীর কৃপাপুষ্ট। কিন্তু ধর্মঠাকুরের কৃপায় লাউসেন ইছাই ঘোষকেও পরাজিত এবং নিহত করলেন। এই সময় গৌড়েশ্ববের রাজ্যে পাপ দেখা দিলে পাপ দূরীকরণেব জন্য মহামদের পরামর্শে রাজা লাউসেনকে আদেশ করলেন। লাউসেন ভখন পশ্চিমে সূর্যোদয় ঘটাবার জন্য হাকন্দ গমন কবেন এবং দুশ্চর তপস্যায়ও ধর্মকে সন্তুষ্ট করতে না পেরে অবশেষে নিজ দেহ নবখণ্ডে বিভক্ত কবে আহুতি প্রদান করলে ধর্মঠাকুর সন্তুষ্ট হয়ে পশ্চিমে সূর্যোদয় ঘটালেন। এদিকে লাউসেনের অনুপস্থিতির সুযোগে মহামদ লাউসেনের রাজ্য বিনষ্ট করলেন। কিন্তু লাউসেন ধর্মের কৃপায় আবার সকলকে বাঁচিয়ে তুললেন এবং বাজ্যও ফিরে পেলেন। মহামদ পাপেব ফলে কুষ্ঠবোগাক্রান্ত হযেও ধর্মের কৃপায় রক্ষা পেলেন, শুধু চিহ্ন বয়ে গেল। লাউসেনও কিছুদিন রাজত্ব করবার পব পুত্র চিত্রসেনেব হাতে রাজ্যভার দিয়ে স্বর্গে গমন করলেন।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে এই লাউসেন-রঞ্জাবতীব কাহিনীই প্রধান হলেও এতে আর একটি গল্প আছে,—সদাডোমের গল্প। সদাডোমের নিকট ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচার এবং সদাডোমের ভক্তিপ্রদর্শনের কাহিনীই এর উপজীব্য। এই কাহিনীর প্রসঙ্গেই আবার হরিশচন্দ্র-বোহিতাশ্বের (লুইধর) কাহিনীও সংযুক্ত হয়েছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্তর্গত গৌড়েশ্বর, কর্ণসেন, সোমঘোষ, ইছাই ঘোষ, লাউসেন প্রভৃতির ঐতিহাসিকতা নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে, এখনও চলছে। কিন্তু আশঙ্কা হয, শেষ পর্যন্ত না পর্বতের মূষিক প্রসব হয়! কারণ, প্রাগুক্ত নায়কদের কারো অথবা সকলের পক্ষেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি হতে কোন বাধা নেই, কিন্তু এদের উপকরণ-স্বরূপ গ্রহণ করে যেভাবে কাহিনী গঠন করা হয়েছে, তাতে যে ইতিহাসের সামান্যতম মর্যাদাও রক্ষিত হয় নি, তাতে

কোন সন্দেহ নেই। ডঃ সুকুমার সেন গৌড়েশ্বরের রাজসভার ঐতিহাসিকতা কিছুটা স্বীকার করলেও বলেছেন ঃ "লাউসেনের ঐতিহাসিকত্ব লইয়া অনেকেই মাথা ঘামাইয়াছেন। রামাই পণ্ডিতের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি লাউসেনের সম্বন্ধেও তাহাই খাটে। লাউসেন বলিয়া কোনকালে কেহ ছিলেন বলিয়া মনে করিবার কোন হেতু নাই। ধর্মমঙ্গল কাহিনীকে ইংরাজীতে Adventure অথবা Exploits of Lausena বলা যাইতে পারে। লাউসেনের কাহিনীগুলি প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগের বাঙ্গালার Folk-tale বা উপকথা মাত্র ; ইহার মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য খুঁজিতে গেলে ঠকিব। Adventure বা কেরামতি-কাহিনী বলিয়া ধর্মমঙ্গল কাব্য মনসামঙ্গল কাব্যের অপেক্ষা অনেক অংশে সুখপাঠ্য।" পূর্ববর্তী গবেষকগণ ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন চরিত্রের ঐতিহাসিকতা নিয়ে যেভাবে আলোচনা করেছেন, তাতে গৌড়েশ্বরকে কেউ দেবপাল, কেউবা লক্ষ্মণসেন বলে অনুমান করেছেন। ঢেক্করীর ঈশ্বর ঘোষের যে তাম্রশাসনখানি আবিষ্কৃত হয়েছে, কেউ কেউ এই ঈশ্বর ঘোষকেই গ্রন্থোক্ত ইছাই ঘোষ বলে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাম্রশাসনে এবং গ্রন্থে ঈশ্বর ঘোষের পিতৃ-পরিচয়ে অনৈক্য দেখতে পাওয়া যায়। লামা তারানাথ লবসেন নামে একজন গৌড়ের রাজার কথা উল্লেখ কবেছেন। কেউ কেউ এঁকেই লাউসেন বলে মনে করেন। আবাব অনেকেই অনুমান করেন যে ইনি গৌড়েশ্বর দেবপালের খুল্লতাত ভ্রাতা জয়পাল। হরিশ্চন্দ্র রাজাকে বৈদিক হরিশচন্দ্র ও রামাযণেব হরিশ্চন্দ্র থেকে আরম্ভ করে সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্র পর্যন্ত অনেক জল্পনা-কল্পনাই করা হয়েছে। বস্তুত, ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন চরিত্রের সাদৃশ্যযুক্ত নাম ইতিহাসে পাওয়া গেলেও ঐ বিচ্ছিন্ন নামগুলিকে একত্র জড়িয়ে ইতিহাস-রচনার অপচেষ্টা পরিত্যাগ কবাই সঙ্গত।

ধর্মমঙ্গলের ঐতিহাসিকতা বিচার

ধর্মমঙ্গল কাহিনীর পশ্চাতে অবশ্য কোন ঐতিহাসিক কাহিনীর ইঙ্গিত থাকা বিচিত্র নয়, তবে অধিকতর সম্ভাব্য ব্যাপার এই হতে পারে যে—কোন লৌকিক কাহিনীর সঙ্গে বিভিন্ন পৌরাণিক এবং কোন কোন ঐতিহাসিক কাহিনীর বিভিন্ন অংশ যোজনা করেই এর মূল কাহিনীকে গড়ে তোলা হয়েছে। এতে দুর্বৃত্ত মহামদ এবং তদীয় ভাগিনেয় অসাধ্য-সাধন-পটু লাউসেনের কাহিনীতে কংস-কৃষ্ণ কাহিনীর, এর বিভিন্ন যুদ্ধে এবং ইছাই ঘোষের কাটামুণ্ড জোড়া লাগানোর ঘটনায় রামায়ণের যুদ্ধ এবং মায়ামুণ্ডের কাহিনীর প্রভাব সুস্পষ্টভাবেই বর্তমান। এগুলি ছাড়াও কর্পূরসেনের চরিত্রে রাম-ভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং লব-ভ্রাতা কুশের, কালুডোমের পত্নী লখাই-র চরিত্রে মহাভারতের বিদুলা-চরিত্রের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোন স্থলে নাথসাহিত্যের প্রভাব পড়েছে। এইভাবে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন কাহিনীকে জোড়া-তাড়া দিয়া গঠন করবার ফলে যা দাঁড়িয়েছে, তার সম্বন্ধে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন পর্যন্ত বলেন, "ধর্মমঙ্গলের সমস্ত যিনি পড়িয়া উঠিতে পারিবেন তাঁহার ধৈর্যের বিশেষ প্রশংসা করা উচিত হইবে।"

ধর্মমঙ্গলের বিভিন্ন কাহিনী

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাব্য-ধর্ম-সম্বন্ধে যত পরস্পরবিরোধী অভিমত প্রচারিত হয়েছে, প্রাচীন অপর কোন সাহিত্য-সম্বন্ধেই এতটা হয় নি বলেই মনে হয়। ডঃ সুকুমার সেন একদিকে

যেমন ধর্মমঙ্গল কাব্যকে 'উপকথা' বা 'কেবামতি কাহিনী' বলে উল্লেখ কবেছেন, তেমনি আবাব এ কথাও বলেছেন ঃ "প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে মহাকাব্য বলিয়া যদি কিছু থাকে তবে তাহা ধর্মমঙ্গল।" ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ধর্মমঙ্গল কাব্যকে পশ্চিমবঙ্গেব 'জাতীয় মহাকাব্য' বলে অভিহিত কবেছেন, কিন্তু যে কাব্যেব প্রচাব সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেও নয, এবং এব একটা অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ এবং যে ধর্মঠাকুব শুধু একটা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ অঞ্চলে নিম্নতব শ্রেণীতেই শুধু প্রচলিত, তাব মাহাত্ম্য-প্রচাবে বচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যকে বাঙলাব কোন একটা অংশেবও 'জাতীয মহাকাব্যে'ব স্বীকৃতিদান কি কবে সম্ভব হতে পাবে, তা ভেবে ওঠা যায না। আবাব কোন কোন ইতিহাসকাব সোজাসুজি একে 'প্রাচীন বঙ্গেব কিশোবধর্মী সাহিত্য' বলে অভিহিত কবেছেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যেব কাহিনীতে ঐক্যবোধেব একান্ত অভাব। পূর্বাপব কাহিনীব প্রায সর্বত্র অলৌকিকত্বেব এত সমাবেশ যে এতে রূপকথা ও পৌবাণিক কাহিনীবই আমেজ পাওযা যায। এতে যে সমস্ত উপকাহিনী যোজনা কবা হযেছে, তাদেব মধ্যে একমাত্র 'কানাড়া' কাহিনীতেই কিছুটা কাব্যধর্ম অক্ষুন্ন আছে, নতুবা গল্পেব কোথাও কাব্যবস জমে উঠে নি। কাব্যেব আঙ্গিকেব দিক থেকেও কাব্যে বিশেষ কোন উৎকর্ষেব পবিচয পাওযা যায নি। ধর্মঠাকুবেব মাহাত্ম্য-প্রচাবই ধর্মমঙ্গল কাব্যেব প্রধান লক্ষ্য। কবিবা ধর্মঠাকুবেব প্রাধান্য দেবাব উদ্দেশ্য তাঁব পাশাপাশি চণ্ডীকেও স্থাপন কবেছেন। কিন্তু ফল হযেছে বিপবীত। ধর্মঠাকুবেব চেযেও চণ্ডীব মধ্যেই অধিকতব মানবিকতাব এবং সহানুভূতি ব পবিচয পাওযা যায। ফলে ধর্ম-ভক্ত ব্যতীত সাধাবণ পাঠকেব দৃষ্টিতে চণ্ডীব মাহাত্ম্যই অধিকতব প্রকট হযে উঠেছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে অনেক যুদ্ধ, অনেক অসমসাহসিকতাব কাহিনী বর্ণিত হযেছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এটি বীববসাত্মক কাব্য হযে উঠবাব অবকাশ পায নি। সর্বোপবি, ধর্মমঙ্গলে আত্মপ্রতিষ্ঠাব জন্য দেব দেবীদেব লড়াই এত উগ্র হযে উঠেছে যে, এতে মানবিকতাব আবেদন তুচ্ছ হযে গিযেছে।

কাব্যবিচাব

ধর্মমঙ্গল কাব্যেব কবিগণ

১ মযূবভট্ট ঃ ধর্মমঙ্গল কাব্যেব পববর্তী কবিদেব অনেকেই আদিকবি মযূবভট্টেব নাম উল্লেখ কবেছেন। ঘনবাম বলেছেন ঃ

'হাকন্দপুবাণ মতে মযূবভট্টেব পথে
জ্ঞানগম্য শ্রীধর্ম সভায।'

এ থেকে বোঝা যায, ধর্মমঙ্গল কাব্যেব আদি কবি মযূবভট্ট 'হাকন্দপুবাণ' নামক গ্রন্থ বচনা কবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কবি মযূবভট্ট কিংবা তাঁব কাব্য হাকন্দপুবাণেব কোন সন্ধান পাওযা যায নি। অনেকেই অনুমান কবেন যে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যেব আদি কবিদেব মতই মযূবভট্টও চৈতন্য-পূর্ব যুগসন্ধি কালে জন্মগ্রহণ কবেছিলেন, কিন্তু এটিও নিছক অনুমান মাত্র। তবে এত বিভিন্ন কবি তাঁদেব গ্রন্থে মযূবভট্টেব নাম উল্লেখ কবেছেন যে তাঁব অস্তিত্বকে কখনও উপেক্ষা কবা যায না। মহামহোপাধ্যায হবপ্রসাদ শাস্ত্রী মযূবভট্টেব একখানি পুথি দেখেছিলেন বলে

'বৌদ্ধগান ও দোহা'র ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন ; কিন্তু গ্রন্থখানির আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ময়ূরভট্ট-রচিত বলে কথিত যে 'শ্রীধর্মপুরাণ'খানি সম্পাদনা করেছেন, তার প্রামাণিকতা অস্বীকৃত হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন এটিকে অষ্টাদশ শতকের কবি রামচন্দ্র বাড়ুজ্জের রচিত বলে উল্লেখ করেছেন। আচার্য যোগেশচন্দ্র ততদূর যেতেও রাজি নন, তিনি মনে করেন যে গ্রন্থের উদ্ধার-কর্তা ডোমপণ্ডিত এবং ছাত্রবৃত্তি-পাশ আশুতোষ পণ্ডিতই হাল আমলে গ্রন্থখানি রচনা করেছেন। গ্রন্থটির ভাব ও ভাষা উৎকট রকমে আধুনিক, অতএব এর সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় অনুমান করেন যে, এই ময়ূরভট্ট 'সূর্যশতক' রচয়িতা এবং বাণের সমসাময়িক হতে পারেন। শোনা যায়, ময়ূরভট্ট তাঁর এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ার (কন্যা অথবা ভগ্নী এবং বাণ-পত্নী) শাপে কুষ্ঠারোগগ্রস্ত হয়েছিলেন এবং 'সূর্যশতক' রচনা করে কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্তিলাভ করেছিলেন।

২. **খেলারাম ঃ** খেলারাম ধর্মমঙ্গল কাব্যের 'গৌড়কাব্য' নামে একখানা পুথি রচনা করেছিলেন; কিন্তু সেই পুথির সামান্য অংশমাত্রই নাকি পাওযা গিয়েছে। এতে নিম্নোক্তভাবে গ্রন্থ-রচনা কালের উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

'ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন।
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন।।
হে ধর্ম এ দাসের পূরাও মনস্কাম।
গৌড়কাব্য প্রকাশিতে বাঞ্ছে খেলারাম।।'

এ থেকে ১৪৪৯ শকাব্দে (১৫২৭ খ্রীঃ) খেলারাম গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেছিলেন, অনুমান করা যেতে পারে । কিন্তু নগেন্দ্রনাথ বসু খেলারামের যে গ্রন্থ দেখেছেন, তাতে কালবাচক কোন পয়ার দেখতে পান নি বলেই আলোচ্য পয়ারটির প্রামাণিকতা সংশযাতীত নয। গ্রন্থে কবি এ কথাও বলেছেন ঃ

'তোমার কৃপায যদি গ্রন্থ সাঙ্গ হয।
অষ্ট মঙ্গলায দিব আত্মপরিচয।।'

কিন্তু গ্রন্থটি সমাপ্ত হয়েছিল কিনা, তা জানা যায নি। কবির পরিচযও এতাবৎ অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। কবি তাঁর গ্রন্থের নাম 'গৌড়কাব্য' বলে উল্লেখ করেছেন।

৩. রূপরাম চক্রবর্তী ঃ ডঃ সুকুমার সেনের মতে রূপরাম চক্রবর্তীর কাব্যই সন-তারিখযুক্ত প্রাচীনতম ধর্মমঙ্গল কাব্য। কিন্তু এতে কবি হেঁযালী-ছন্দে যে তারিখ প্রদান করেছেন, এর অর্থ-বোধে কোন দু জনই প্রায একমত হতে পারেন নি।

'শাকে সীমে জড় হৈলে যত শক হয।
চারি বাণ তিনযুগে ভেদে যত রয।।
রসের উপরে রস তাহে রস দেহ।
এই শাকে গীত হৈল লেখা কর‍্যা লহ।।'

এর আবার একটি পাঠান্তরও আছে। যা হোক এর পাঠ-উদ্ধাব করে বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি রূপরামের যে কাল নিরূপণ করেছেন, তাতে তিনি যেমন ১৫৯০ খ্রীঃ-র হতে পারেন, তেমনি ১৬৪৯ খ্রীঃ- ও তাঁর কাল হতে পারে; এমন কি ১৭২৬ খ্রীঃ হওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু রূপরামের কাব্যে শাহজাদা সুজার উল্লেখ ('রাজমহলেব মধ্যে যবে ছিল সুজা।') থেকে মনে হয় যে কবি ১৬৪৯ খ্রীঃ-র দিকেই কাব্য রচনা করেছিলেন। কবির কাব্যে যে আত্মপরিচয় দান করেছেন, তা থেকে জানা যায় যে কবির পিতার নাম শ্রীরাম চক্রবর্তী, মাতা দৈবকী বা দময়ন্তী। বর্ধমান জেলার শ্রীরামপুর গ্রামে ছিল কবির নিবাস। রূপবাম তাঁর কাব্যে বিস্তৃতভাবে আত্মকাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। কবির জ্যেষ্ঠভ্রাতা রত্নেশ্বর ছিলেন বড় 'নিদারুণ'। তাঁর অত্যাচার কবির জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এই আত্মকাহিনীতেই কবি জানিয়েছেন যে একদিন ধর্মঠাকুর তাঁকে দেখা দিয়ে বলেছেন ঃ

'আমি ধর্মঠাকুর বাঁকুড়া রায নাম।
বার দিনের গীত গাও শোন রূপবাম।।'

রূপবাম নানা জায়গা ঘুরতে ঘুবতে অবশেষে গোযালা ভূমিব রাজা গণেশেব আশ্রয লাভ করলেন এবং তথায় কাব্য রচনা করে গীত গাইতে শুরু কবেন। শোনা যায ধর্মঠাকুবেব পূজার অপরাধে (অথবা হাঁড়ি-জাতীয়া কন্যাব প্রতি আসক্তি-বশতঃ ?) রূপবাম সমাজে পতিত হয়েছিলেন। রূপরামের আত্মকাহিনীমূলক অংশটুকু-সম্বন্ধে ডঃ সুকুমাব সেন বলেছেন, "পুবানো বাঙ্গলা সাহিত্যে যদি আধুনিক ছোটগল্পেব মত কোন জীবন বস-নিটোল বচনা থাকে, তবে তাহা রূপরামের এই আত্মকাহিনী।" কবিকৃতি-হিশেবে রূপবামেব কাব্য খুব উচ্চাঙ্গের না হলেও তাঁর রচনার সাবলীলতা এবং সবলতা প্রশংসনীয।

৪. শ্যামপণ্ডিত ঃ শ্যামপণ্ডিত যে ধর্মমঙ্গল কাব্য বচনা কবেছিলেন, তাব একখানি পুথিব লিপিকাল ১৭০৩ খ্রীঃ। অতএব ইনি অন্তত সপ্তদশ শতকে জীবিত ছিলেন, আশা কবা যায। শ্যামপণ্ডিতের বাসস্থান ছিল শ্রীবামনগর গ্রাম। তাঁব গ্রন্থে যে 'ধর্মদাস' ভণিতা পাওযা যায, তা যেমন তাঁর বিশেষণ হতে পারে, তেমনি অন্য কোন কবিব নামও হতে পাবে। শ্যামপণ্ডিত যে ধর্মের সেবক ছিলেন তা তাঁর উপাধি থেকেও অনুমান কবা চলে। কবিব গ্রন্থে কিছু কিছু নোতুনত্বের পবিচয় পাওয়া যায—তিনি ইছাই ঘোষকে ঈশ্বব ঘোষ এবং তাহাব কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিজয ঘোষ বলে অভিহিত করেছেন। গ্রন্থে ঢেকুবেব পবিচয দেওযা হযেছে 'ত্রিহট্টগড়' বলে। শ্যাম পণ্ডিতের গ্রন্থে কতকগুলি স্থানীয় বিশেষত্ব দেখে অনুমান করা চলে যে, কবি বীরভূম অঞ্চলের লোক ছিলেন।

৫. সীতারাম দাস ঃ সীতাবাম দাস তাঁব কাব্যে যে আত্মপবিচয দান কবেছেন, তা থেকে জানা যায, কবিব পিতার নাম ছিল দেবীদাস। কবি তাঁব মাতামহ প্রসিদ্ধ অম্বগোষ্ঠীয় শ্যামদাসেব গৃহে ইন্দাসে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পৈতৃক নিবাস ছিল সম্ভবত বর্ধমান জেলার

সুখসায়র গ্রামে। কবি গ্রন্থ-রচনার তারিখ বলেছেন ঃ

'সীতারাম দাস গায় ধর্মপদতলে।
এই পুথি হইল হাজার চারি সালে।।'

ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন যে কবি ১০০৪ মল্লাব্দে (১৬৯৮ খ্রীঃ) গ্রন্থ রচনা করেন। এটি ১০০৪ বাঙলা সাল না হওয়াই সম্ভব, কারণ বাঙলা সাল সম্ভবত তখনো প্রচলিত হয়নি। যা হোক, কবি যেকালে গ্রন্থ রচনা করেন, তৎকালে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের পক্ষে ধর্মঠাকুরের পাঁচালী রচনাও যে অপরাধজনক বিবেচিত হতো, তার পরিচয় সীতারাম দাসের কাব্যেও বর্তমান। তিনি যে নেহাৎ দায়ে পড়েই কাব্য-রচনায় বাধ্য হয়েছেন, তা তাঁর উক্তি থেকেই পাওয়া যায়।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকেব রাঢ় অঞ্চলের কবিদের বিশেষত ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবিদেব রচনায় একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ঃ গ্রন্থোৎপত্তির কারণ-বর্ণনা প্রসঙ্গে সুদীর্ঘ আত্মবিবরণ দান। আত্মবিবরণী পাঠ করলে দেখা যায়—এই বিবরণগুলির কাহিনী প্রায় একই প্রকার। প্রায় সদৃশ পবিস্থিতিতে পড়েই কবিরা কাব্য রচনা করে থাকেন। কাজেই সন্দেহ হয়—এগুলি কবিব প্রকৃতই আত্মকথা কী? গতানুগতিকতার প্রশ্ন বাদ দিয়েও যদি এদের সত্য বলে অভিহিত করা হয়, তবে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, এই রচনাগুলিই বাঙলা সাহিত্যে আত্মজীবনীমূলক রচনার পথিকৃৎ। কোন কোন কাহিনী উপন্যাসের মত মনোরম। এ জাতীয় কোন কোন কাহিনীতে যেন নিটোল ছোটগল্পেব স্বাদ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ ধর্মমঙ্গল কাব্যের বৈশিষ্ট্যই আত্মপবিচযে। মঙ্গলকাব্যরূপে অধিকাংশ লেখকের রচনায় বিশেষ কোন পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া না গেলেও আত্মপবিচয অংশগুলি যথার্থই মূল্যবান। এতে সমসাময়িক যুগেব অঞ্চল-বিশেষেব যে চিত্রাত্মক রূপ বিবৃত হয়েছে, ঐতিহাসিকের নিকটও তা আদবণীয় বলে বিবেচিত হবে। সীতাবাম দাসের রচনায়ও এরূপ সুন্দর একটি চিত্র পাওয়া যায়।

সীতাবাম দাস তাঁদেব গৃহদেবতা গজলক্ষ্মীর কৃপায় বনমধ্যে ধর্মঠাকুরেব সাক্ষাৎ পেযেছিলেন এবং ধর্মঠাকুবেব আদেশেই কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ফৌজের উপদ্রবে বাড়িঘব বিনষ্ট হলে খুল্লতাতের আদেশে সীতারাম বনে গিয়েছিলেন কাঠ আনতে। সেখানে একজনের নিকট শুনলেন, সিপাহী বেগাব ধরতে আসছে। এ কথা শুনেই তিনি দিশেহারা হয়ে ছুটতে ছুটতে এক সন্ন্যাসীর দর্শন পেলেন। পথে সন্ন্যাসী আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন ঃ

'প্রভু বলে নিরঞ্জন নৈরাকার আমি।
আমার মঙ্গলগীত কর গিয়া তুমি।।'

ধর্মঠাকুর নারায়ণ পণ্ডিতের গৃহে বাস করেন। নারায়ণ পণ্ডিতও ধর্মঠাকুরের স্বপ্ন পেয়ে সীতারাম দাসকে ধর্মমঙ্গল রচনা করতে অনুরোধ করেন। কবি চল্লিশ দিনে বারমতি পালা শেষ করেন।

সমসাময়িক কালে সীতারাম দাস নামে যে ব্যক্তি 'মনসামঙ্গল কাব্য' রচনা করেছেন, তিনি এবং এই কবি অভিন্ন হতে পারেন।

৬. রামদাস আদক ঃ রামদাস আদক তাঁর গ্রন্থেব নাম বলেছেন 'অনাদি মঙ্গল, অনাদ্য মঙ্গল বা ধর্মপুরাণ'। কবির পিতার নাম রঘু, জাতিতে কৈবর্ত। কবির বাসস্থান ছিল ভুরশুট পরগণার হায়াৎপুর গ্রাম। গ্রামের মণ্ডল অতিশয় অত্যাচারী চৈতন্য সামন্ত অনাদায়ী খাজনার জন্য কবিপিতার অনুপস্থিতিতে কবিকে কারারুদ্ধ কবেন। সেখান থেকে কবি কোনপ্রকারে মুক্তি পেয়ে মাতুলালয় গোরটি যাবার পথে এক সিপাহীর সাক্ষাৎ পেলেন। সিপাহী তাঁকে বেগার খাটাবার জন্য তাঁর মাথায় মোট চাপিযে দিলেন। তারপর কবির কাতব ক্রন্দনে অকস্মাৎ সিপাহী অদৃশ্য হলেন এবং তৎস্থলে ব্রাহ্মণবেশধাবী ধর্মঠাকুব আবির্ভূত হলেন। ধর্মঠাকুর তাঁকে বললেন ঃ

আজি হৈতে রামদাস কবিবর তুমি।
জাড়গ্রামে কালু রায় ধর্ম হই আমি।।'

ধর্মঠাকুর তাঁকে কাব্য রচনা কবতে আদেশ দিলেন। কবি ১৬৬২ খ্রীঃ গ্রন্থ রচনা করেন। আধুনিক গায়কের পুথি-অবলম্বনে পুস্তকটি মুদ্রিত হওয়ায় এতে প্রক্ষেপের আব অন্ত নেই। ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "ইহার বারো আনাই রূপরামেব রচনা, ভণিতা শুধু রামদাসের।" অতএব গ্রন্থের আলোচনায় রামদাসেব কবিত্বশক্তির সত্যকার কোন পরিচয় পাওযা যাবে না।

৭. ঘনরাম চক্রবর্তী ঃ ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবিদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ঘনরাম চক্রবর্তী। ধর্মমঙ্গল কাব্যসমূহের মধ্যে তাঁর গ্রন্থই সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়েছিল বলেই যে তিনি সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ কবেছেন, তা নয়, উৎকর্ষেও তাঁব কাব্যই সর্বাগ্রগণ্য।

ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থে যে সমস্ত ভণিতা দান করেছেন তাতেই আপন পরিচয় পর্যাপ্তরূপে প্রদত্ত হয়েছে। তাঁব পিতার নাম গৌরীকান্ত, মাতা সীতা, কবির বাসস্থান ছিল বর্ধমান জেলার কৃষ্ণপুর গ্রাম। কবি বর্ধমানের মহাবাজা কীর্তিচন্দ্রেব গুণগান করেছেন, অতএব, হয়তো তিনি কোন কারণে মহাবাজের কৃপাভাজন হয়ে থাকতে পারেন, অথবা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কবে থাকতে পারেন। কোন কোন পুথিতে ঘনরাম চক্রবর্তীর গ্রন্থোৎপত্তিব বিবরণ-সূত্রে আত্মপরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু রচনার এই অংশেব প্রামাণিকতা সন্দেহাতীত নয়।

ঘনরাম তাঁর অধ্যাপকের পূজার জন্য যখন ফুল তুলছিলেন, তখন তাঁর পায়ে কাঁটা ফোটে; কিন্তু ফুল অপবিত্র হয়ে যাবে ভয়ে কবি আর পায়ে হাত দিয়ে কাঁটা খুললেন না, ঐভাবেই বাড়ি গেলেন। অধ্যাপক পূজায় বসে দেখলেন, তাঁর ইষ্টদেবতার পায়ে বেগুন-পাতাসমেত কাঁটা বিঁধে রয়েছে। অভিমানে অধ্যাপক ঘর ছেড়ে পুরীর দিকে যাত্রা করলেন। কিন্তু ফিরে এসে হনুমানের আদেশ মতো রামচন্দ্রের পূজা করতে লাগলেন। অতঃপর গুরুর আদেশে ঘনরাম রামায়ণ রচনা করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু পরদিন পুথি খুলে দেখেন যে বামচন্দ্রের ধ্যান ও বন্দনাস্থলে ধর্মঠাকুরের ধ্যান ও বন্দনা লিখিত রয়েছে। তখন ঘনরাম ধর্মমঙ্গল রচনায়ই প্রবৃত্ত হলেন।

কাহিনীটি প্রামাণিক হউক বা না হউক, অন্তত একটি কথা সত্য যে কবি ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। সম্ভবত কবি রামায়ণ-গায়কও ছিলেন। কবি কাব্যে গ্রন্থ রচনাকাল-সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ

'শক লিখি রামগুণ রস সুধাকর।
মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর।।
সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি।
যামসংখ্য দিনে (দণ্ডে?) সাঙ্গ সঙ্গীতের পুঁথি।।'

কবি ১৬৩৩ শকাব্দে (১৭১১ খ্রীঃ) গ্রন্থটি সমাপ্ত করেছিলেন।

কবির কাব্য অন্যান্য ধর্মমঙ্গলের মতই বারোদিন গাইবার উপযোগী ২৪ পালায় বিভক্ত। বিষয়ের দিক থেকে নোতুনত্ব বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু পরিবেষণের দিক থেকে তিনি যথেষ্ট অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। 'কবি-রত্ন' উপাধিধারী ঘনরাম পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর রচনায় পাণ্ডিত্য যথেষ্ট। একদিকে তিনি যেমন বিভিন্ন পুরাণ থেকে প্রভূত পরিমাণ উপকরণ আহরণ করেছিলেন, তেমনি অলঙ্কারও ব্যবহার করেছেন যথেষ্ট, বিশেষত অনুপ্রাসেই কবির সমধিক প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। ঘনরামের রচনায় যথেষ্ট সাবলীলতা থাকলেও কদাচিৎ উৎকট পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টায় রচনার গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। যেমন 'উত্তর দিক' অর্থে তিনি ব্যবহার করেছেন 'বিরাট-তনয় মুখ' অথবা 'ঊষা' অর্থে 'গোবিন্দ-তনয়সূত-জায়া'। আবার যখনই কবি সার্থকভাবে অলঙ্কারকে ব্যবহার করতে পেরেছেন, তখনই তা কাব্যের সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে ঃ

'রাহুত মাহুত হানে যূথে যূথ
কোটাল যম খণ্ডাতি।
ছাড়ি সিংহনাদ গণি পরমাদ
হুতাশে হটায়ে হাতী ।।'

ধর্মমঙ্গল কাব্যের পূর্ববর্তী কবিগণ শুধু কাহিনীই রচনা করে গিয়েছেন,আপন কবি স্বভাব দ্বারা তাতে রস সঞ্চার করা কিংবা মার্জিত বুদ্ধি দ্বারা তার সংস্কার সাধন করা সম্ভবপর হয় নি। ঘনরামই সর্বপ্রথম ধর্মমঙ্গল কাব্যে রস সঞ্চার করে এবং কাব্যের সংস্কার সাধন করে একে সর্বসাধারণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিলেন। ঘনরামের হাতেই ধর্মমঙ্গল কাব্য প্রথম গ্রাম্যতামুক্ত হয় এবং আপন সম্প্রদায়ের বাইরেও শ্রদ্ধার আসন লাভ করে। পুরাণাদি প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র এবং কাব্যাদিতে বিখ্যাত পণ্ডিত ঘনরাম ধর্মমঙ্গলকে এর নিজস্ব অন্ত্যজ পরিমণ্ডল থেকে উদ্ধার করে হিন্দু-মহিমা দান করেছিলেন। সম্ভবত ঘনরামের কাব্য হাতে পাবার ফলেই হিন্দু সাধারণ একেও মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মতই আপন বলে গ্রহণ করেছিল। অন্যথায় ধর্মমঙ্গল কাব্য একান্তভাবেই একটা বিশেষ স্থানে এবং একটা বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যেই চিরকাল সীমাবদ্ধ থাকত। এই বিশেষ দিকটি ছাড়াও ঘনরাম কবিপ্রতিভার বলে ধর্মমঙ্গলকে যে কাব্যরূপ দান করেছিলেন, তার সার্থক স্বীকৃতি মিলেছে রায়গুণাকর

ভারতচন্দ্রের কাব্যে। ভারতচন্দ্র দক্ষযজ্ঞ পণ্ড কবতে গিয়ে যে অপূর্ব ভাষার ধ্বনিচিত্র অঙ্কন করেছেন, তার পূর্বেই ঘনরাম লিখেছেন ঃ

'টন টান্ ঠন্ ঠান্ চাল চালে চন্‌চান্
ঝন্‌ঝান্ ঘন রণ-পাদ।
দাদালিয়া দাবড়ে চাটি চট চাপড়ে
কামড়ে হাতী পাড়ে দানা ।।'

ভারতচন্দ্র যে ঘনরামের কাব্য থেকে প্রচুব ঋণ গ্রহণ কবেছেন, তাতেই ঘনরামেব উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়। ঘনরাম কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোকেব সুন্দর ও সুষ্ঠু অনুবাদ বচনা কবে গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেছেন। ঘনরাম যে কেমন ভাব-ভূয়িষ্ঠ পদ রচনা কবতে পাবতেন, তার পরিচযও তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যে বর্তমান। এই পদগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রবাদ-প্রবচনেবই মর্যাদা লাভ কবেছে ঃ

'হাতে শঙ্খ দেখিতে দর্পণ নাই খুঁজি।'
'না কবে মিথ্যাবে ভয বিশেষে ঘটক।'
'বিবাহ বিষযে মিথ্যা নাহি দোয তায।'
'সুব্যঞ্জন ঝোল ঝালে কুটুম্বিতা হালাহোলে
পবকালে কেহ কার নয।'

৮. মাণিক গাঙ্গুলি ঃ মাণিক গাঙ্গুলি 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যেব আব একজন প্রসিদ্ধ কবি। তাঁব গ্রন্থে যে কাল-পরিচয-জ্ঞাপক শ্লোকটি পাওযা গিযেছে, তাতে লিপিকব প্রমাদ মাবাত্মক আকারে দেখা দিয়েছে। একে প্রমাদ-মুক্ত কবে নিম্নোক্তভাবে এর পাঠান্তব কল্পনা কবা হযেছে ঃ

'শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিদ্ধ (সিদ্ধি?) সহ যুগ পক্ষ যোগ তাব সনে ।।
বারে হল্য মহীপুত্র তিথি অব্যাহৃতি।
শর্বরী শবাগ্নি দণ্ডে সাঙ্গ হইল পুঁথি।।'

এর অর্থ উদ্ধার করে কবির গ্রন্থসমাপ্তির যে কাল নির্ধারণ কবা হয়েছে, তাতে প্রচুব মতভেদেব অবকাশ রয়ে গেছে। আচার্য যোগেশচন্দ্র বায় পেযেছেন ১৭০৩ শকাব্দ (১৭৮১ খ্রীঃ), ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মনে করেন ১৪৬৯ শকাব্দে (১৫৪৭ খ্রীঃ)। অন্য অনেকেই এব মধ্যবর্তী অপরাপর কালের কথা উল্লেখ কবেছেন। এই ক্ষেত্রে গ্রন্থেব আভ্যন্তব প্রমাণ ছাডা এব কাল-নিরূপণ সম্ভব নয়। যে পুথিটি-অবলম্বনে গ্রন্থ মুদ্রিত হযেছে তাব লিপিকাল ১৮০৯ খ্রীঃ। অতএব অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলতে হয। বহু প্রাচীন পুথিও আধুনিক কালে লিখিত হলে তাতে আধুনিকতার ছাপ পড়ে। কাজেই মাণিক গাঙ্গুলির গ্রন্থে আধুনিকতার চিহ্ন থেকে কিছুই বোঝা যায় না। কেউ কেউ আবার এবই মধ্যে কিছু কিছু প্রাচীনত্বের লক্ষণও দেখতে পেয়েছেন। পক্ষান্তরে, অন্য মতাবলম্বীরা 'সুরিক্ষার পাটে বন্দী বিদগ্ধ বিদেশী পুরুষের

তালিকায় কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, কাশীরাম, খেলারাম, ঘনরাম প্রভৃতি নামগুলি' থেকে গ্রন্থের আধুনিকতার কথাই বলতে চান। আবার এই নামগুলি পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্তও হয়ে থাকতে পারে। অতএব মাণিক গাঙ্গুলির গ্রন্থ রচনা-কাল সমস্যাই রয়ে গেল।

মাণিক গাঙ্গুলি গ্রন্থে যে আত্মপবিচয় দান করেছেন, তা থেকে জানা যায় যে কবির পিতার নাম গদাধব, মায়েব নাম কাত্যায়নী। কবিরা ছয় সহোদর ছিলেন। তাঁর জন্মস্থান বেলডিহা গ্রাম। কবি গ্রন্থোৎপত্তিব কারণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে এক বিস্তৃত কাহিনীতে জানিয়েছেন, কীভাবে ধর্মঠাকুর পথিমধ্যে তাঁকে দেখা দিয়ে তাঁকে ধর্মমঙ্গল কাব্য বচনা করতে আদেশ করেছিলেন।

'গীত রচ ধর্মের গৌরব হবে বাড়া।
নকল লেখিয়া দিব লাউসেনী দাঁড়া।।
বিশ্বেব কাবণ আমি বাঁকুড়া রায় নাম।
না করিবে প্রকাশ হইবে সাবধান।।'

ধর্মঠাকুব তাঁকে বাবদিনের মধ্যে বাবমতি পালা সমাপ্ত করতে বলেছিলেন। কবি অতঃপব পদ্য-রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। কবিব কাব্য অন্যদেব মতই ২৪ পালায় বিভক্ত। কাহিনীভাগে সামান্য বৈচিত্র্য দেখা দিলেও মূলত একই প্রকার। মার্কণ্ড মুনিব ধর্মপূজাব উল্লেখ এব প্রাচীনত্বেব দ্যোতক। কবি গতানুগতিক কাহিনী বচনা কবেন নি, তিনি যে সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যযন করে পাণ্ডিত্যেব সঙ্গে রসও আহবণ কবেছিলেন, আলোচ্য গ্রন্থে তাব পবিচযও বর্তমান। লখ্যা ডোমনীব চরিত্র-সৃষ্টিতে তাঁব কবি-কল্পনা সার্থকতা লাভ কবেছে। কবি সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন বলেই অনুপ্রাসাদি অলঙ্কাব এবং অপ্রচলিত শব্দ-প্রয়োগে খুবই তৎপব ছিলেন।

'অম্ভোরুহ অঙ্ঘ্রিযুগে আমার প্রণাম।'

তাঁব বচনায মাঝে মাঝে বেশ সবসতাব পবিচয় পাওয়া যায়। তাঁব বচিত কোন কোন পংক্তিতে প্রবাদ-প্রবচনেব স্বাদও পাওযা যায।—

'চাকর কুকুব তুল্য ডাকে কেন এত।'
'যেই অঙ্গে দৃষ্টি পড়ে সেই অঙ্গ বয।'

৯. সহদেব চক্রবর্তী ঃ সহদেব চক্রবর্তীর বচিত গ্রন্থেব নাম 'অনিলপুবাণ, ধর্মপুবাণ বা ধর্মমঙ্গল'। কবি গ্রন্থবচনা-কাল সম্বন্ধে উল্লেখ কবেছেন—

'দ্বিজ সহদেব গায পূর্ব তপ ফলে।
যাহাবে কবিলে দয়া একচল্লিশ সালে।।
চৈত্রের চতুর্থদিন পূর্ণিমার তিথি।
হেন দিনে যাবো দযা কৈল যুগপতি।।'

অনেকেই অনুমান করেন ১১৪১ সালের ৪ঠা চৈত্র পূর্ণিমাব দিন কবি শিবের দয়া লাভ কবেছিলেন। কিন্তু ১১৪১ সালেব ৪ঠা চৈত্র পূর্ণিমা ছিল না; ইহার একশ বছর আগে বা

পরেও ছিল না। অতএব রচনার কোথাও প্রমাদ রয়ে গিয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন এই তারিখ থেকে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে সহদেব চক্রবর্ত্তীর গ্রন্থরচনাকাল কল্পনা করে থাকেন। কবির পিতার নাম বিশ্বনাথ, জন্মস্থান হুগলী জেলার বাধানগর গ্রাম। সহদেব চক্রবর্ত্তীর গ্রন্থটি প্রধানত 'অনিল পুরাণ' নামেই প্রসিদ্ধ। এর গ্রন্থেই 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' বা 'কলিমা জালাল' যা শূন্যপুরাণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সেই পদটি বর্ণিত হয়েছে। রচনাটি বড় কৌতূহলোদ্দীপক। অংশবিশেষ—

'অন্তরে জানিয়া মর্ম্ম কৈলাস ত্যজিয়া ধর্ম
মায়ারূপী হৈল খোন্দকার।. . .
যতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন
আনন্দেতে পরিল ইজার।
ব্রহ্মা হৈল মহাম্মদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আদম্ফ হৈল শূলপাণি।
গণেশ হৈল গাজী কার্ত্তিক হৈল কাজী
ফকীর হৈল যত মুনি।।'

একে তিনি কোন কোন স্থলে ধর্ম্মমঙ্গল বললেও এটি প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মমঙ্গল নয়। কারণ ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের যে প্রধান ঘটনা 'লাউসেনের কাহিনী' সেটিই এতে সম্পূর্ণ বর্জিত । এতে শিবায়নের মত হর-গৌরী-কাহিনী, ধর্মপুরাণের মত ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা এবং গোর্খবিজয়ের মত মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এতে হবিশ্চচন্দ্র রাজার কাহিনীও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে । কতকগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন বিষয় এতে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় গ্রন্থটি সামগ্রিকতা লাভ করতে পারে নি। এতে চরিত্র-সৃষ্টিরও কোন প্রয়াস নেই ; কাব্য-হিশেবে গ্রন্থটির বিশেষ মূল্য নেই। তবে তাঁর ভাষায় কোন কোন স্থলে গ্রাম্যতার পরিচয় পাওয়া গেলেও মাঝে মাঝে তা বেশ সরল ও মর্ম্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। রচনায় সংস্কৃত সাহিত্যের এবং বৈষ্ণব কবিদের প্রভাবের পরিচয় বিদ্যমান।

১০. অপ্রধান কবিগণ ঃ ইতঃপূর্বে ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের যে সকল কবির বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে, তাঁদের বাইরে আরও অনেকেই কাব্য রচনা করে গিয়েছেন। এঁদের কারও রচনায় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। এঁদের অনেকেই অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে কাব্য রচনা করেছিলেন। আবার সকলেই যে সম্পূর্ণ ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন, তা নয়, অনেকেই অংশবিশেষ-অবলম্বনে খণ্ডকাব্যও রচনা করে গিয়েছেন।

নরসিংহ বসু ১৭৩৭ খ্রীঃ তাঁর ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য-রচনা আরম্ভ করেন। তাঁর পিতার নাম ঘনশ্যাম, মাতা নবমল্লিকা। কবির বাসস্থান ছিল বর্ধমান জেলার শাঁখারী গ্রাম। নবাবের উকিল নরসিংহ বসু নবাব সরকারে টাকা জমা দিতে যাবার পথে বিশ্রামকালে এক সন্ন্যাসী তাঁকে ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচনা করতে বলেন। অতঃপর তাঁর তিনজন বন্ধুও এ বিষয়ে আগ্রহ প্রদর্শন করলে কবি ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

হৃদয়রাম সাউ ১১৫৬ সালে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। কবির পিতার নাম গোবিন্দ, তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার খুরুল গ্রাম। অবশ্য কবি মাতুলালয়েই প্রতিপালিত হয়েছিলেন। দেবসেবায় অংশগ্রহণে বঞ্চিত হওয়ায় কবি মনোদুঃখে আত্মহত্যা করতে গেলে ধর্মঠাকুর তাঁকে দেখা দেন। তাঁর নির্দেশমত হৃদয়রাম এক হ্রদ থেকে ধর্মঠাকুরের মূর্তি উদ্ধার করে তাঁর সেবায় নিযুক্ত হন। ধর্মের গীত রচনার জন্য স্বপ্নাদেশ পেয়ে কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

ধর্মমঙ্গল-রচয়িতা গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত পরিচয় কিংবা কাল-সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন এঁকে পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি বলে মনে করলেও বসন্ত চট্টোপাধ্যায় এর জীবৎকাল স্থির করেছেন অষ্টাদশ শতাব্দী। গোবিন্দরামের রচনায় প্রাচীনতার কিছু কিছু চিহ্ন পাওয়া যায়। রামনারায়ণ নামক অপর এক কবিরও একখানা ধর্মমঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়েছে। তাঁরও পরিচয় এবং রচনাকাল-সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তবে ভাষায় আধুনিকতার লক্ষণ দেখে এঁকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্থাপন করা চলে। রামায়ণ-মহাভারত-কৃষ্ণমঙ্গল-আদি বহু গ্রন্থপ্রণেতা কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী একখানা ধর্মমঙ্গল কাব্যও রচনা করেছিলেন। বীরভূম জেলার শ্যাম পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল কাব্য পাওয়া গেলেও তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে অজয় নদের উত্তর তীরে একমাত্র তিনিই ধর্মমঙ্গলের কবি।

পরবর্তীকালে ধর্মপূজার কিছু কিছু প্রসার ঘটেছিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় ঐ সমস্ত অঞ্চলে নোতুন কোন ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত হয় নি। রাঢ়দেশই ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি উৎসভূমি, এই স্থানেই তার সমৃদ্ধি, এবং এর সমাপ্তিও এইস্থানেই।

[চার] শিবায়ন কাব্য

শিবের প্রভাব বাঙলাদেশে যেমন বহুব্যাপক, তাতে তাঁকে বাঙলার 'জাতীয় দেবতা' বলে অভিহিত করলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। 'ধান ভানতে শিবের গীত'— কথাটা শুধুই কথার কথা নয়, বস্তুত বাঙালীর স্বভাবই এমন যে অপ্রসঙ্গেও শিবের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাঙলাদেশে মঙ্গলকাব্যগুলির কথা উল্লেখ করা চলে। মঙ্গলকাব্যগুলি সাধারণতঃ অনার্য সমাজ থেকে আগত বিভিন্ন দেব-দেবীদের মাহাত্ম্য কীর্তন ও প্রচারের উদ্দেশ্যেই রচিত হতো, কিন্তু তাতেও শিবের একটা আবশ্যিক ভূমিকা রয়েই গেছে। যেমন, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এবং মনসামঙ্গল কাব্যে যথাক্রমে চণ্ডী এবং মনসার মাহাত্ম্য-বর্ণনাই কবিদের অভিপ্রেত অথচ গ্রন্থের প্রথমার্ধ শিব-কাহিনীতেই পূর্ণ। ধর্মমঙ্গল কাব্যের ধর্মঠাকুরকে কেউ কেউ শিব বলেই অনুমান করেন। অন্তত কাব্যে যে দেবতাত্রয়ের উল্লেখ আছে তাঁদেব মধ্যে শিবই শ্রেষ্ঠ এবং এই কারণেই আদ্যাশক্তি শিবকেই পতিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। নাথ-সাহিত্যেও শিবেরই

প্রাধান্য লক্ষিত হয়ে থাকে। যে সমস্ত লৌকিক দেব-দেবী অনার্য সমাজ থেকে আর্যসমাজে গৃহীত হয়েছেন, তাদের শিবের সঙ্গে কোনপ্রকারে সম্পর্কযুক্ত করতে পারলেই যেন তাঁরা অনার্য-কলঙ্ক থেকে মুক্তিলাভ করতে পারেন, — এটিই ছিল কবিদের ধারণা। কুলীনের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করে অনেকেই যেমন জাতে উঠবাব সুযোগ লাভ কবতেন, সেই একই মনোবৃত্তি থেকেই বাঙালী কবিরা তাঁদের উপাস্য দেব-দেবীকে শিবেব হাতে সম্প্রদান করতেন অথবা কোন ভাবে শিবের সঙ্গে সম্পর্কিত ক'রে দিতেন। এ দিক থেকে বিচার করলে বাঙলার প্রায় তাবৎ মঙ্গলকাব্যই শিবমঙ্গলও বটে। কিন্তু আশ্চর্যেব বিষয়, পূর্বোক্ত কাব্যগুলির দেবদেবীগণ মূলতঃ প্রাগার্য সমাজ থেকে আগত বলে আর্যীকরণের নিমিত্ত শিবের সঙ্গে যুক্ত করবার মানসিকতায় ঐ সমস্ত কাব্যে শিবেব অন্তর্ভুক্তির একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ পাওযা গেলেও, স্বযং বৈদিক দেবতা রুদ্রের সঙ্গে যুক্ত পৌরাণিক শিবকে নিয়েও একটি মঙ্গলকাব্যের ধারা সৃষ্টি হযেছে, যাব নাম 'শিবাযন' এবং আবও আশ্চর্যেব বিষয, অন্যান্য কাব্যের দেব-দেবীগণ স্বয়ং অন্তরালে থেকে মানব মানবীকে নাযক-নাযিকা কবে তাদের মাহাত্ম্য প্রচাবেব চেষ্টা করলেও শিবায়ন কাব্যে স্বয়ং শিবই কাব্যের নাযক এবং সাধাবণ মানব-গৃহস্থ-রূপে তাঁর আচবণের মধ্যে মাহাত্ম্য স্থাপনেব কোন চেষ্টাই নেই। ফলে, সমস্ত মঙ্গলকাব্যধারায় 'শিবায়ন' একটি বিশেষ ব্যতিক্রম বলেই চিহ্নিত হতে পারে। বয়সেব দিক থেকে 'শিবায়ন' কনিষ্ঠ হলেও শিবেব মাহাত্ম্য প্রচাব কবে শিবগীত রচিত হয়েছিল অতি প্রাচীনকালেই। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে পাওযা যায় ঃ

শিবের সর্বব্যাপকতা

'একদিন আসি এক শিবের গায়ন।
ডমরু বাজায় গায়—শিবের কথন।'

মহাপ্রভু যখন শিব-গীত শুনতে পেলেন, তখন সেই রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত-তনু কৃষ্ণাবতাব চৈতন্যদেবের মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তা বিস্ময়কর ঃ

'শঙ্করের গুণ শুনি· প্রভু বিশ্বম্ভর।
হইলা শঙ্কর মূর্তি দিব্য জটাধর।।
এক লাফে উঠে তার কান্ধের উপর।
হুঙ্কার করিয়া বোলে মুঞি সে শঙ্কর।।'

অপব দেবতা-সম্বন্ধে বৈষ্ণবদের যে অসহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়, এখানে তাব ব্যতিক্রম দেখে বিস্মিত হতে হয। বস্তুত শিব যে অসাম্প্রদায়িক এবং সর্বজনীন দেবতা, তার পবিচয় এখানেও সুস্পষ্ট। এ সমস্ত কারণেই শিবকে বাঙলার 'জাতীয় দেবতা'র পদ দান কবলে যে বিশেষ আপত্তির কারণ থাকবে না, তা অনুমান করা চলে।

শিব পুরাণাশ্রিত দেবতা হলেও বৈদিক দেবতা নন। কিন্তু এতে শিবের অর্বাচীনতা প্রমাণিত হয় না, কারণ তাঁকে প্রাগার্য দেবতা বলেই অনুমান করা হযে থাকে। সেদিক থেকে বিচার করলে শিবকে ভারতের প্রাচীনতম দেবতা বলেই অভিহিত করা চলে। আর্য-পূর্ব

ভারতে হরপ্পা, মোহেন-জে-দড়োয় যে সকল সীলমোহর পাওয়া গিয়েছে, তাতে শিবের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে,—এ অভিমত ক্রমশ অবিসম্বাদিত্ব লাভ করছে। সেখানে পশুবেষ্টিত পশুপতি-রূপে তাঁর প্রকাশ ঘটেছে। শিশ্নদেব রূপে তাঁর পূজাও সে যুগে আরম্ভ হয়ে থাকতে পারে। বেদে শিবকে পাওয়া না গেলেও রুদ্রদেবতা আছেন। পরবর্তীকালে রুদ্র শিবের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিলেন। প্রলয়ের দেবতা ত্রিশূলধারী তাণ্ডবনৃত্যে মত্ত বৈদিক রুদ্রের রূপটি পৌরাণিক শান্তশিব মহাদেবেও বর্তমান রয়েছে। কেউ কেউ অনুমান করেন যে প্রাচীন দ্রাবিড় জাতির দেবতা ছিলেন শিবশম্ভু (শিবম ও শেম্বু)। পরবর্তীকালে হিন্দু পুরাণ তাঁকে আত্মসাৎ করে নিয়েছে।

শিবের উদ্ভব

এই অনার্যসংস্পর্শ থেকেই শিবের ভস্মাচ্ছাদিত দেহ, পরিধ্যানে ব্যাঘ্রচর্ম, ভূষণ-রূপে সর্প এবং ভূতপ্রেত-প্রমথদের সাহর্যের কল্পনা করা যেতে পারে। পৌরাণিক শিবের উপর বৌদ্ধ এবং জৈন প্রভাবের কথাও বহুশ্রুত। ডঃ ভট্টাচার্য বলেন ঃ "গৌতম বুদ্ধের জীবনাদর্শ হইতে পৌরাণিক শিবের পরিকল্পনা হইয়াছিল, সেইজন্য বাংলার বৌদ্ধমত পৌরাণিক শৈবধর্ম্মমতের মধ্যেও নিজের আদর্শেরই সন্ধান পাইল। জিন তীর্থঙ্করের জীবনাদর্শও গৌতম বুদ্ধ এবং এই পৌরাণিক শিবের আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র ছিল না, সেইজন্য এই বিরাট জৈনসম্প্রদায়ও ক্রমে নব-প্রতিষ্ঠিত শৈবসম্প্রদায়ের মধ্যেই বিলীন হইয়া গেল। এইভাবে দেখিতে পাই, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পর হইতে বাংলার শৈবধর্ম এক বিরাট সম্প্রদায়ে পরিণত হয়।" বস্তুত পৌরাণিক শিব সংহারের দেবতা হলেও প্রধানত তিনি আশুতোষ। ঔদার্যে এবং সহনশীলতায় তিনি তুলনারহিত। এই কারণেই তিনি যেমন সহজেই পরকেও আপন করতে পারেন, তেমনি অপর সকল সম্প্রদায়ও তাঁকে সহজেই আপন করে নিয়েছিল। এইভাবেই প্রাগার্য, আর্য, দ্রাবিড়, বৌদ্ধ এবং জৈন মতের সমন্বয়ে সঙ্কর দেবতা শঙ্করের উদ্ভব ঘটেছিল এবং এই শিবশঙ্করই পুরাণসমূহের অন্যতম প্রধান দেবতা হয়ে দাঁড়ালেন। এই শিবের কাহিনীই বিভিন্ন মঙ্গল কাব্যের (শিবায়ন কাব্যেও) প্রথম ভাগ অধিকার করে আছে। 'শিবায়ন' কাব্যের লৌকিক খণ্ডে যে শিবের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তিনি অপর এক স্বতন্ত্র শিব—এঁকে 'লৌকিক শিব' আখ্যা দেওয়া চলতে পারে।

'শিবায়ন' কাব্যে বর্ণিত লৌকিক শিবের উদ্ভব ঘটেছে বাঙলার কৃষককুল থেকে। অসম্ভব নয়, শিবনামধারী কোন নিম্নবিত্ত গৃহস্থই হয়তো বা নাম-সাদৃশ্যে শিবায়ন কাব্যের 'শিব' হয়ে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু যেভাবেই এই শিবের উদ্ভব ঘটে থাকুক, ইনি মূলে হয়তো বাঙলার কৃষককুলের দেবতা ছিলেন, কিন্তু কবি এঁকে কৃষক-রূপেই চিত্রিত করেছেন। এই শিব হয়তো মূলত কোচজাতির দেবতা ছিলেন, কারণ শিবায়ন-কাব্যে কোচজাতির সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠতম। ইনি কুচনী-সাহচর্যে দীর্ঘকাল কাটিয়েছিলেন। আমাদের পৌরাণিক শিবও কৈলাসবাসী, আধুনিক নৃতাত্ত্বিক ভোট-বর্মী গোষ্ঠীভুক্ত, পর্বতবাসিনী পার্বতী উমাও তাই। আবার এই কোচ-জাতও ভোট-গোষ্ঠীভুক্ত। কাজেই পৌরাণিক শিবের পরিকল্পনায়ও ভোটগোষ্ঠী অর্থাৎ কিরাত-প্রভাব

শিবায়নের লৌকিক শিব

সম্ভবপর। আবার ঘটনান্তরে দেখা যায়, শিব শাঁখারীর ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন। অতএব শাঁখারী-জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত কোন দেবতার সঙ্গেও এর যোগাযোগ থাকা অসম্ভব নয়। তবে কৃষক দেবতা শিবের সঙ্গে পৌরাণিক দেবতা শিবের সাদৃশ্য অন্যান্য প্রভাবের ফলে হওয়াটাও বিচিত্র নয়। শিব বলদ-বাহন, তিনি সিদ্ধি ভক্ষণ করে থাকেন। কৃষকেরও অনন্য-সহায় বলদ, কৃষকরাও দিনান্তে পরিশ্রমের পর একটু নেশাভাঙ করে থাকে। শিবের এই লৌকিক ভাবনার উপর কোন পৌরাণিক প্রভাব নেই। হয়তো বা এক বা একাধিক লৌকিক কাহিনী এর ভিত্তিমূল গঠন কবে থাকতে পারে। বরং এই লৌকিক শিবের প্রভাবই পৌরাণিক শিবকে কিছুটা রূপান্তরিত করেছে, তেমন সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

শিবায়ন কাব্যগুলি প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলকাব্য কিনা এ বিষয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকেন। বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচন করলেই এর স্বরূপ বোঝা যাবে। শিব-সাহিত্য দুটি প্রধান ধারায় বিভক্ত ঃ ১. 'মৃগলুব্ধ' বা শিব চতুর্দশীর মাহাত্ম্য-সূচক কাব্য এবং ২. 'শিবমঙ্গল' বা 'শিবায়ন' কাব্য : প্রথম জাতীয় গ্রন্থে অর্থাৎ 'মৃগলুব্ধ' কাব্যে শুধু পৌরাণিক শিবের কাহিনীই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বিভিন্ন পুরাণ-অবলম্বনে বাঙালী কবিগণ শিবমাহাত্ম্য-রূপে 'মৃগলুব্ধ' রচনা করেছেন। এতে কোন লৌকিক দেবতার কাহিনী স্থান লাভ কবে নি। বস্তুত, একে বিভিন্ন পুবাণেব সাবানুবাদ বলেই অভিহিত করা চলে। মঙ্গলকাব্যের লক্ষণ এতে একেবারেই অনুপস্থিত। দ্বিতীয় ধাবাব কাব্য অর্থাৎ 'শিবায়ন' অবশ্যই অপর সকল মঙ্গলকাব্যের অনুসরণে বচিত। এর দেবখণ্ডে পৌরাণিক হর-পার্বতীর কাহিনী এবং নরখণ্ডে লৌকিক শিবের কাহিনী সন্নিবিষ্ট হয়েছে। লক্ষ্য কববার বিষয়, অপরাপব মঙ্গল কাব্যের নরখণ্ডে সাধারণ মানব-মানবীর কাহিনীই বর্ণিত হয়ে থাকে আর দেবতা অনেকটা অন্তরালে থেকে স্বীয় মাহাত্ম্য-প্রচারে অংশ গ্রহণ কবে থাকেন। সেখানে দেবতার সঙ্গে প্রকাশ্যে মানুষের দ্বন্দ্ব ('মনসামঙ্গল') অথবা মানুষে মানুষে দ্বন্দ্বের মধ্যেই দেবতা আত্মপ্রতিষ্ঠার উপায় খোঁজেন ('চণ্ডীমঙ্গল'), অথবা দুই পক্ষীয় মানুষের সঙ্গে দুই দেবতাও দ্বন্দ্বে রত হয়ে থাকেন ('ধর্মমঙ্গলে' ধর্ম ও চণ্ডী) ; কিন্তু দেবতাবা কখনও কাহিনীর নায়ক-নায়িকার স্থান অধিকার করেননি। কিন্তু আলোচ্য শিবায়ন কাব্যে দেখা যায়, কাহিনীর নায়কই শিব। তাঁব আচাব-আচবণ অবশ্য একান্তই মানবিক এর বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণে পাওয়া যাবে বাঙলার সমকালীন নিম্নবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের একটি চিত্র যা অপর সকল মঙ্গলকাব্যের নরখণ্ডের চিত্রের চেয়েও বাস্তব। কাহিনীর বিষয়বস্তুঃ দারিদ্র্য-পীড়িত হর-পার্বতীর জীবনযাত্রায় দ্বন্দ্ব তথা দাম্পত্যকলহ। দ্বন্দ্ব বলতে এখানে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া। আরো লক্ষণীয়, অন্য সকল মঙ্গলকাব্যে দেবতার মাহাত্ম্য-প্রচারের যে উগ্র প্রচেষ্টা দেখা যায়, আলোচ্য গ্রন্থে দেবতা সে দায় থেকে মুক্ত। এখানে শিবের মাহাত্ম্য প্রচারের কোন প্রচেষ্টাই নেই, এবং শিব -চরিত্রে নিন্দনীয় তথা সমালোচ্য অংশ যথেষ্টই রয়েছে। অতএব শিবায়নকে যদি বা মঙ্গলকাব্য বলা যায় তবু যে এটি আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল, তাতে মতভেদের অবকাশ নেই। এখানে দেব ভাবনাতেও বরং অনেকটা অভিনবত্ব তাকে স্বতন্ত্র্য দান করেছে। অবক্ষয় পর্বের এই ধারায় একটু নোতুন ভাবনার আবির্ভাব অবশ্যই একটা সুলক্ষণ।

শিবায়ন কাব্য কি মঙ্গলকাব্য?

'মৃগলুব্ধ' গ্রন্থে প্রধানত শিবচতুর্দশী ব্রত-পালনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। সংস্কৃত 'শম্ভু-রহস্য' বা 'শিব-রহস্য' নামক গ্রন্থে বর্ণিত শিবচতুর্দশী ব্রতকথা এবং অন্যান্য পুরাণ-কাহিনী অবলম্বন করে 'মৃগলুব্ধ' কাহিনী রচিত হয়েছে। রাজা মুচুকুন্দ শিবচতুর্দশী ব্রত-উপলক্ষ্যে রাত্রি জাগরণ করেছেন, রাণি তাঁকে শিবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে একটি গল্প বললেন। কোন এক ব্যাধ প্রাণপণ চেষ্টায়ও কোন মৃগ সংগ্রহ করতে পারল না। এদিকে নিশাগমে প্রবল ঝড় উঠল; ভয়ে ব্যাধ এক বেলগাছে উঠে গাছেব পাতা নিচে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল। গাছের নিচে ছিল শিবলিঙ্গ, আর সেই দিন ছিল শিবচতুর্দশী। ব্যাধ-বিক্ষিপ্ত বেলপাতা শিবলিঙ্গের উপর পড়লে মহাদেব তুষ্ট হয়ে ব্যাধকে বরদান করলেন। মহাদেবের বরে পরদিনই ব্যাধের জালে এক মৃগ ধরা পড়ল। সঙ্গিনী মৃগী মৃগকে ছেড়ে দেবার জন্য ব্যাধকে বিহিত অনুরোধ করলেও যখন ব্যাধ তাতে রাজি হলো না, তখন মৃগী পাপের কথা, পাপ থেকে মুক্তির উপায়স্বরূপ 'শিব চর্তুদশীর ব্রতকথা' ইত্যাদি শুনালে ব্যাধেব জ্ঞান-দৃষ্টি লাভ হ'লো। সে মৃগকে ছেড়ে দিল। ব্যাধও ব্যাধ-জীবন ত্যাগ করে শিবের শরণ নিল। বাজা মুচুকুন্দের কাহিনী বহু পুরাণেই বর্ণিত হয়েছে। লক্ষ্য করবার বিষয়, 'মৃগলুব্ধ' গ্রন্থের এই কাহিনীতে পৌবাণিক কাহিনীই বিবৃত হয়েছে।

মৃগলুব্ধ-র কাহিনী

'শিবায়নে' কাহিনীটি অন্যপ্রকার। এতেও অতি সংক্ষেপে শিব-চতুর্দশীর মাহাত্ম্যরূপে মৃগলুব্ধের কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে। যা হোক, শিবায়নের দেবখণ্ড অপর সকল মঙ্গলকাব্যেরই অনুরূপ। দক্ষযজ্ঞ থেকে আরম্ভ করে দারিদ্র্যের জন্য হরপার্বতীর কলহ অংশ পর্যন্ত বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নেই। এর পরই আরম্ভ হলো প্রকৃত শিবায়ন কাহিনী। সংসারের দারিদ্র্য দূর করবার জন্য মহাদেবকে মর্ত্যলোকে গিয়ে চাষবাসে মন দেবার জন্য পার্বতী অনুরোধ করলেন। মহাদেব ইন্দ্রেব নিকট থেকে জমি পাট্টা নিয়ে বিশ্বকর্মাকে দিয়ে চাষের যন্ত্রপাতি বানিয়ে কুবেরের নিকট থেকে বীজধান গ্রহণ করলেন। অতঃপর ভীমের সহায়তায় মহাদেব চাষ আরম্ভ করলেন। জমিতে ফসল ফললো। মহাদেব ফসলের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে স্বর্গের কথা ভুলে গেলেন। কৈলাস থেকে দেবী মশা, মাছি, ডাঁশ ইত্যাদি প্রেরণ করলেন পৃথিবীতে; এদের কামড়ে মহাদেব অস্থির, তবু তিনি স্বর্গে ফিরে যান না। তখন পার্বতী বাগ্দিনীর ছদ্মবেশে নরলোকে এসে উপস্থিত হলেন। বাগ্দনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে মহাদেব তাকে বিয়ে করতে চাইলে দেবী কৌশলে তাঁর আংটিটি নিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। পরে মহাদেবও স্বর্গে গিয়ে আংটির জন্য অতিশয় অপ্রস্তুত হলেন। এদিকে পার্বতী মহাদেবের নিকট শাঁখা চেয়েছিলেন, কিন্তু না পেয়ে রাগ করে বাপের বাড়ির চলে গেলেন। এবার মহাদেব শাঁখারীর ছদ্মবেশ ধারণ করে পার্বতীকে ছলনা করতে গেলেন। যা হোক, এখানে শঙ্কর শঙ্করীর হাতে শাঁখা পরিয়ে দিলে আবার তাঁদের মিলন ঘটল।

শিবায়নের কাহিনী

'শিবায়ন' সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত দুটি কাহিনী থেকেই দেখা যায়, এদের সঙ্গে সাধারণ মঙ্গলকাব্যের সাদৃশ্য খুব স্পষ্ট নয়। প্রথমটি অর্থাৎ মৃগলুব্ধ কাহিনীটি তো একেবারেই পুরাণের

ছাঁদে রচিত, এতে লৌকিক জীবনের বিশেষ কোন পরিচয়ই নেই। পরবর্তী 'শিবায়ন' কাহিনীটিতে যদি বা লৌকিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়, তবু এতে দেবতার মাহাত্ম্য-প্রচারের উৎকট ইচ্ছার কোন প্রকাশ নেই বলেই এর মধ্যে কোন দ্বন্দ্বের সম্ভাবনাও দেখা যায় না। ফলত, কাহিনীতে একটা মন্থরতারই পরিচয় বর্তমান। এ দিক থেকে শিবায়ন কাব্যকে অনেকটা 'কৃষ্ণমঙ্গল'-ধর্মী বলে অভিহিত করা চলে। শিবায়ন কাব্যে শিবের মাহাত্ম্য-প্রচার নয়, তাঁহার জীবন-ধর্মেরই প্রকাশ ঘটেছে; তবে এই শিব সাধারণ কৃষক সমাজেরই প্রতিনিধি-স্থানীয়; শিব-পার্বতীব নামেব স্থলে যদি অপর কোন নায়ক-নায়িকার নাম প্রদান ক'রে কবি কাব্যটি রচনা করতেন, তবে তা সমসাময়িক যুগের একখানি প্রামাণিক আলেখ্যের মর্যাদা লাভ করতে পারত। সমালোচক নন্দগোপাল সেনগুপ্ত যথার্থই বলেছেন ঃ "এ দেবাদিদেব মহেশ্বর এবং জগন্মাতা পার্বতীর কৈলাসজীবন নয়, এ অতীত বাংলার কোন শিবদাস ভট্টাচার্য এবং তস্য ভার্যা পার্বতীঠাকুরাণীর জীবন-কাহিনী।"

কাহিনী বিচার

শিব-চরিত্রের কিছু কিছু দুর্বলতার পরিচয় পুরাণে এবং সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যেও পাওয়া যায়; কিন্তু শিবায়ন কাব্যে শিবের যে দুর্গতি বিধান করা হয়েছে, তা তুলনাবিহীন। কোচ-যুবতী এবং বাগ্দিনীর রূপমুগ্ধ মহাদেব-চরিত্রে দেবত্বের কোন স্পর্শ তো নেই-ই, এমনকি নীচ শ্রেণীর মানুষদের মধ্যেও এ ধরনের চরিত্র নিন্দিত হয়ে থাকে। মনে হয়, কবি জনরুচিব তাগিদেই কামুক ও লম্পট শিবের চরিত্র অঙ্কন করবার মত ইতরতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। শিব-চরিত্রের মধ্য দিয়ে আমরা সমসাময়িক যুগমানসেব চিত্রকেই প্রত্যক্ষ করি। মনে রাখা দরকার, 'শিবায়ন' কাব্যগুলি বচিত হয়েছিল একেবারে অবক্ষয়ের যুগে। কাহিনীর দিক থেকে এই অবাঞ্ছিত অবস্থাকে এড়িয়ে যেতে পারলে অবশ্য আমরা রসের সন্ধান পেতে পারি। এতে গৃহ-জীবনের যে আদি-মধুর রসাত্মক চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে, তার তুলনা সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্যেই বিরল। এ ছাড়া পল্লীবাঙলাব জনজীবনের যে বাস্তব চিত্র এতে অঙ্কিত হয়েছে, তাও তুলনাবিহীন। এর দেবতা অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো অপদেবতা নন, ইনি খাঁটি মানব। এর কাহিনীর মধ্যে আমরা পরিপূর্ণ মানব জীবনেরই স্বাদ লাভ কবে থাকি। এ দিক থেকে শিবায়ন কাব্য অনন্য।

বৈশিষ্ট্য

শিবায়ন কাব্যের কবিগণ

১. রতিদেব ঃ 'শিবায়ন' কাব্যের যে ধারাটি শিবচতুর্দশী-মাহাত্ম্য-প্রচারে নিয়োজিত হয়েছিল, রতিদেব সম্ভবত সেই ধারার আদি কবি। কবি-প্রদত্ত তারিখ ('রস অঙ্ক বায়ুশশী শকের সময়') থেকে জানা যায় যে কবি ১৫৯৬ শকাব্দে (১৬৭৪ খ্রীঃ) পুথি রচনা আরম্ভ করেন। কবির পিতার নাম গোপীনাথ, মাতা মধুমতী বা মধুবতী। কবির নিবাস ছিল চট্টগ্রাম জেলার সুচক্রদণ্ডী গ্রাম। কবির রচিত পুথির নাম 'মৃগলুব্ধ'। কাব্যখানি আকৃতিতে বেশি বড় নয়। এতে যে শিবকাহিনী পরিবেশিত হয়েছে, তা সর্বাংশে পৌরাণিক। কবি যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে কৃতবিদ্য ছিলেন, তার প্রমাণ গ্রন্থটিতে সুলভ। গ্রন্থটি মূলত অনুবাদ-জাতীয় বলেই

এতে চরিত্রসৃষ্টির কিংবা কবির মৌলিকত্ব-প্রদর্শনের বিশেষ অবকাশ নেই। কবি ভক্ত ছিলেন। রচনায় ভক্তের আকুলতার সঙ্গে সহজ সরল কবিত্বশক্তির মিশ্রণে বেশ হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। হরিণীর বিলাপে উৎকৃষ্ট করুণ রসের পরিচয় পাওয়া যায়।

২. রামরাজা ঃ 'মৃগলুব্ধ'-পুঁথির আর একজন গ্রন্থকার রামরাজা। গ্রন্থে কবি যেমন গ্রন্থ রচনাকাল-সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত রেখে যান নি, তেমনি আত্মপরিচয়-সূত্রেও নিজের সম্বন্ধে কিছুই বলেননি। ফলত, কবির সম্বন্ধে আমরা প্রায় অন্ধকারেই রয়েছি। একমাত্র ভণিতায়ই কবি মাঝে মাঝে আপনার নামটি উচ্চারণ করেছেন ঃ

'শঙ্কর কিঙ্কর শিশু রামরাজে গাএ।'

গ্রন্থটির আবিষ্কর্তা মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ কবির পরিচয়-সম্বন্ধে বলেন ঃ সাধারণতঃ "চট্টগ্রামের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বড়ুয়া মগদের মধ্যেই নামের সহিত রাজা শব্দের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অধিক দেখা যায়। ...এইসব বিবেচনা করিয়া আমার খুবই সন্দেহ হইতেছে, কবি রামরাজা কোন বড়ুয়া মগ-বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন যে কবির নাম রামরায় বা শিশুরাম রায়ও হতে পারে। রামরাজার কাব্যের বিষয়বস্তু যে রতিদেব থেকে অভিন্ন, তাই নয়, উভয়ের রচনায় বহু সাদৃশ্যও বর্তমান। কে কার নিকট ঋণী, বলা মুস্কিল। অবশ্য এমনও হতে পারে যে, উভয় কবিই হয়তো অপর কোন তৃতীয় সূত্র থেকে স্ব-স্ব কাব্যের উপাদান আহরণ করেছিলেন। রামরাজাও সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন, তবে কবিত্ব-শক্তিতে তিনি রতিদেবের সমান ছিলেন না বলেই মনে হয়।

'মৃগলুব্ধ' পুস্তকের প্রচার বিশেষ হয় নি বললেই চলে। ডঃ ভট্টাচার্য মনে করেন, "একমাত্র চট্টগ্রামের অন্তর্গত চন্দ্রনাথ ও আদিনাথের নব-প্রতিষ্ঠিত শৈব তীর্থগুলিকে কেন্দ্র করিয়াই এই সাহিত্য পুষ্টি লাভ করিয়াছিল, ইহার অন্যত্র প্রসার সম্ভব হয় নাই।"

৩. রামকৃষ্ণ রায় ঃ সম্ভবত রামকৃষ্ণ রায়ই সর্ববৃহৎ 'শিবায়ন'-রচয়িতা। তাঁর কাব্যেই প্রথম নানা কাহিনী যুক্ত হয়েছিল। কবি আত্মপরিচয় দান করে বলছেন—পিতা সর্বশাস্ত্রে ধীর কৃষ্ণ রায়, মাতা রাধাদাসী। কবি জাতিতে কায়স্থ, তাঁর বাসস্থান হাওড়া জেলার রসপুর গ্রাম। কবি যৌবনাগমেই সম্ভবত ১৬২৫ খ্রীঃ কিংবা সন্নিহিত কোন কালে কাব্যটি রচনা করেছিলেন। ১৬৮৪ খ্রীঃ বর্ধমানরাজ কবির বাটী আক্রমণ করে তাঁদের কুলবিগ্রহকে অধিকার করে নিলে নব্বুই বৎসর বয়স্ক কবি শোকে প্রাণত্যাগ করেন। কবি তাঁর গ্রন্থের নাম বলেছেন 'শিবায়ন' বা 'শিবের মঙ্গল'। কবির কাব্যের প্রথামাবধি 'কবিচন্দ্র' উপাধি থেকে মনে হয় যে এই গ্রন্থ-রচনার পূর্বেই তিনি অপর কোন কবি-কৃতির নিদর্শন-রূপেই উপাধিটি লাভ করেছিলেন। সম্ভবতঃ আগে তিনি ভক্তিরসাত্মক পদাবলী সাহিত্যও রচনা করে থাকতে পারেন।

রামকৃষ্ণ রায়ের 'শিবায়ন' কাব্যটি ২৬টি পালায় বিভক্ত। কিন্তু পালাগুলিতে কোন অনিবার্য কাহিনী-সংযোগ লক্ষিত হয় না। কাশীখণ্ড, হরিবংশ, কালিকাপুরাণ, বৃহন্নারদীয়,

শান্তিপর্ব, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি থেকে শিবসম্বন্ধীয় কাহিনী সঙ্কলন করে কবি এতে সন্নিবিষ্ট করেছেন। তাঁর কাব্যে গতানুগতিক হরগৌরীর জীবনযাত্রার কাহিনী তো আছেই, তদুপরি 'মনসার কাহিনী, সমুদ্রমন্থন বলিরাজার উপাখ্যান, সগরের গঙ্গা আনয়ন, ত্রিপুরাসুর প্রভৃতির কাহিনী' 'রাবণ-পরশুরাম পর্ব, উষা-অনিরুদ্ধ কাহিনী' ইত্যাদি পরস্পর-নিঃসম্পর্কিত বহু কাহিনীই স্থান পেয়েছে। এই কাহিনীগুলি পরস্পর-সম্পর্কিত নয়, তবু কবি যতখানি সম্ভব, এদের যোগযুক্ত করতে চেষ্টা করেছেন। কবির কাব্যে গ্রাম্যতা প্রায় নেই বললেই চলে। সম্ভবত বৈষ্ণব কবিতার প্রভাব থেকেই এরূপ হয়ে থাকতে পারে। ছন্দের মধ্যে তিনি যথেষ্ট বৈচিত্র্যের পরিচয় দান করেছেন ঃ

'যত বিলাসিনী রচিল বেশ
বান্ধিল লোটন কুটিল কেশ
অলক তিলক অপরিশেষ
চিত্রবসন ওড়নি।'

ভারতচন্দ্রের পূর্বে এইরূপ ছন্দের প্রয়োগ বিস্ময়কর বলেই মনে হয়। রামকৃষ্ণের 'শিবায়নে' কিছু কিছু গদ্য-রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়,'বচনিকা' নামক এই রচনাগুলি সাহিত্যিক গদ্যরূপেই বিবেচিত হতে পারে। সম্ভবত বাঙলা সাহিত্যে সাহিত্যিক গদ্যের এটিই প্রাচীনতম নিদর্শন ঃ

'ভাইরে নারদের পরিহাসে, মেনকা রোদন করিতেছেন এমত সময়ে কেমন স্ত্রীলিঙ্গ দেবতাসকল আসিতেছেন অবধান কর।'

শিবায়নে কাহিনীর দিক থেকে সামগ্রিকতা নেই, চরিত্র সৃষ্টি- প্রচেষ্টা নেই, তথাপি "ইহাকে শিব-বিষয়ক একটি কোষ-গ্রন্থ (Encyclopaedia) বলা যাইতে পারে। বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে শিব-প্রসঙ্গের এমন সুনিপুণ সংকলন বাঙলা সাহিত্যে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এইদিক দিয়া বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই কাব্যখানির একটা বিশিষ্ট স্থান আছে।" (ডঃ ভট্টচার্য)

৪. কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী ঃ মল্লভূমির কবি শঙ্কর চক্রবর্তী-সম্বন্ধে ইতঃপূর্বে অনেকবারই আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে এমন অপর কোন কবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নি, যিনি একই সঙ্গে এত অধিক গ্রন্থ এবং বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ রচনা করেছেন। রামায়ণ-মহাভারত থেকে আরম্ভ করে কবি প্রায় সর্বপ্রকাব মঙ্গলকাব্য এবং পদাবলী রচনা করে গিয়েছেন। শঙ্কর চক্রবর্তী শিব-সম্বন্ধীয় যে কাব্যখানি রচনা করেছেন, তাঁর নাম 'শিবমঙ্গল'। এতে কবি শিবের লৌকিক কাহিনী যোগ করে প্রকৃতপক্ষে বাঙলা সাহিত্যে নোতুন কাব্যধারার সৃষ্টি করেছেন। কবির ব্যক্তিগত পরিচয় পূর্ববর্তী অধ্যায় সমূহে প্রদত্ত হয়েছে। আনুমানিক ১৬৮০ খ্রীঃ কবি মল্লরাজ বীরসিংহেব রাজত্বকালে কাব্যটি রচনা করেন। কবি এই কাব্যেই প্রথম শিবের লৌকিক জীবনের অবতারণা করে 'মৎস্য ধরা পালা', 'শঙ্খপরা পালা' যোগ করেন। 'মৎস্য ধরা' পালাতেই চাষী শিবের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।

মর্ত্যলোকে চাষ-বাসে রত শিব কৈলাসের কথা ভুলে গেলে পার্বতী বাগ্দিনীর ছদ্মবেশে শিবের চাষক্ষেতে এসে মাছ ধরতে আরম্ভ করেন এবং শিবকে ভুলিয়ে ভালিয়ে কৈলাসে নিয়ে আসেন। শঙ্খ-ধরার পালাটি অন্যান্য কবিদের কাব্যেরই অনুরূপ। কবির পাণ্ডিত্য বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই. কিন্তু এই পাণ্ডিত্য কখনও দুর্ভর হয়ে কাব্যের উপর চেপে বসে নি। তাঁর রচনার ভাষা বেশ সহজ ও সরল। ডঃ সুকুমার সেন 'শিবায়ন'-প্রণেতা কবিচন্দ্রকে শঙ্কর চক্রবর্তী থেকে পৃথক্ কোন ব্যক্তি বলে মনে করেন।

৫. রামেশ্বর ভট্টাচার্য ঃ 'শিবায়ন' কাব্যের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য। রামেশ্বরের পিতার নাম লক্ষ্মণ চক্রবর্তী, মাতা রূপবতী। কবির পূর্ব নিবাস ছিল মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত যদুপুর গ্রাম। কিন্তু হেমৎ সিংহ নামক কোন ব্যক্তির অত্যাচারে পীড়িত হয়ে কবি কর্ণগড়ের রাজা রাজসিংহের আশ্রয় লাভ করেন। রাজার মৃত্যুর পর তৎপুত্র যশোবন্ত সিংহ রাজা হয়ে কবির পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং তাঁরই আদেশে কবি তাঁর 'শিবায়ন' কাব্য রচনা করেন। কবি কিন্তু তাঁর গ্রন্থে সর্বত্র এর নাম উল্লেখ করেছেন শিবসঙ্কীর্তন রূপে। কিন্তু 'রামেশ্বরের শিবায়ন' নামটিই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কবি তাঁর গ্রন্থে কাব্য-রচনার কাল উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

'শকে হাস্য চন্দ্রকলা রাম করতলে।
রাম হাস্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে।।'

কিন্তু এর পাঠোদ্ধার করে কবির গ্রন্থ রচনা-কাল আবিষ্কার করা এখনও পর্যন্ত সম্ভবপর হয়নি। তবে প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে যখন এই গ্রন্থ প্রথম মুদ্রিত হয়, তখন সম্পাদক টীকায় ১৬৩৪ শকাব্দকে গ্রন্থ-রচনাকাল বলে উল্লেখ করেছেন। অপর সূত্র থেকেও এই কালের সমর্থন পাওয়া যায়। অতএব কবি আনুঃ ১৭১২ খ্রীঃ কিংবা সন্নিহিত কালে গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থেই শিবের লৌকিক জীবন সম্বন্ধে বিস্তৃত কাহিনী পাওয়া গেলেও কবি পৌরাণিক কাহিনী-রচনায়ও যথেষ্ট যত্ন নিয়েছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে কৃতবিদ্য রামেশ্বর শুধু যে পুরাণ থেকেই তাঁর কাব্যের উপাদান গ্রহণ করেছেন, তা নয়। তিনি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব'কেও কাজে লাগিয়েছেন। কবির কাব্যে কোন কোন স্থলে সংস্কৃতের অনুবাদই পাওয়া যায়। ফলে 'শিবায়ন'-কাব্যের পৌরাণিক অংশে আড়ষ্টতা ও কৃত্রিমতার পরিচয় বর্তমান। কবির সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে লৌকিক খণ্ডে। এখানে কবি হরপার্বতীর গৃহস্থালির যে চিত্র অঙ্কন করেছেন, তা আমরা নিত্যনিয়ত আমাদের চোখের সম্মুখে দেখতে পাই। বস্তুত এমন বাস্তব চিত্রের নিদর্শন মধ্যযুগে একান্তই দুর্লভ। পার্বতী উমার সংসারের একখণ্ড চিত্র—

'তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটি সুতে সপ্ত মুখ পঞ্চমুখ পতি।।...
তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়।।...

সুক্তা খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া শাকে।
অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্তি ডাকে।।
কার্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য ধরে খা ।।'

দরিদ্রের সংসারে অভাবের জ্বালা যে কী ভয়ঙ্কর, হরগৌরীর জীবন-কাহিনীতে তারও সুন্দর পরিচয় পাওযা যায়। পার্বতীর হাতে শাঁখা নেই। স্বামীর কাছে একজোড়া শাঁখাব আবেদন জানিয়ে বলেছেন ঃ

'লজ্জায় লোকের মাঝে লুকাইয়া রই।
হাত নাড়া দিয়া বাড়া কথা নাহি কই ।।'

গৃহিণী হাত নাড়া দিয়ে কথা বলতে পারেন না, এই দুঃখের কথাযও গৃহপতি মুখ নাড়া দিয়ে বললেন ঃ

'ভিখারীর ভার্যা হয়ে ভূষণেব সাধ।
কেন অকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ।।
বাপ বটে বড়লোক বল গিয়া তাবে।
জঞ্জাল ঘুচ্‌ক যাও জনকের ঘরে।।'

নিরুপায় পার্বতী জনকের গৃহেই যেতে বাধ্য হলেন। তখন আবাব মহাদেব, 'বাপেব কিরা', 'ভাইয়ের কিরা' দিয়ে তাঁকে ঘবে নিযে এলেন।

ডঃ সুকুমার সেন রামেশ্বরেব কৃতিত্ব স্বীকার করে বলেছেন, "অষ্টাদশ শতাব্দীব শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে রামেশ্বর অন্যতম। ইঁহাব কাব্যে ভারতচন্দ্রের মত ভাষায় চটক নাই সত্য কিন্তু সহানুভূতি এবং মানবিকতা বামেশ্বরেব 'শিবায়নে' যেমন আছে এমন অষ্টাদশ শতাব্দীব অপর কোন কবিব কাব্যে পাই না।"

বামেশ্বরের কাব্যে দোযও আছে। তিনি যদিও বলেছেন,—

'ভব্য ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে বামেশ্বব।'

এবং 'মধুক্ষব মনোহব মহেশের গীত।'

তবে এ জাতীয় রচনায় ক্বচিৎ বিদ্যুচ্চমকের মতোই দীপ্তি পায় কিছু প্রবাদোপম পদ, যেমন — "হাঁড়ির মুখের মত মিলে গেল সবা", 'দিনে হও ব্রহ্মাচারী রাতে গলাকাটা', "পুরস্ত্রীর প্রগল্‌ভতা বিবাহেতে বাড়ে।"

কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর কাব্যকে ভদ্র আখ্যা দেওয়া সম্ভবপর নয়। এতে শিবের মধ্যে মানবিকতা আরোপ করতে গিয়ে কবি যে কিছুটা ইতরতাবও প্রশ্রয় নিয়েছেন, তা অস্বীকার করা যায় না।" অবশ্য ডঃ ভট্টাচার্য রামেশ্বরের সমর্থন-উদ্দেশ্যে বলেছেন, ". শেষোক্ত চিত্রগুলি নিতান্ত বাস্তবধর্মী বলিয়া ইহাদের মধ্য হইতে গ্রাম্যতার ভাব সম্পূর্ণ দূর হইতে পারে নাই।" বস্তুত রামেশ্বরের কাব্যে মানবচরিত্র ভারতচন্দ্রের কাব্য অপেক্ষা অধিকতর প্রাণবন্ত। তবে আদিরসের রচনার প্রতি কবির প্রীতির আধিক্য লক্ষ্য করা যায়—হয়তো বা অবক্ষয় যুগেরই সূচনা চিহ্ন।

কবির কাব্যে অনুপ্রাসাদি অলঙ্কার-ব্যবহারেও নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে অনুপ্রাস-বাহুল্য কখন তাঁর কাব্যের ভূষণ হলেও ক্বচিৎ অর্থগ্রহ কষ্টকর বিবেচিত হয়। অবশ্য তিনি যে ভারতচন্দ্রের অব্যবহিত পূর্বসূরী, তার পরিচয় কাব্যে অব্যক্ত থাকেনি।

৬. অপর কবিগণ ঃ 'শিবায়ন' কাব্যের কবি-সংখ্যা প্রচুর নয়। সম্ভবত লৌকিক শিবের কাহিনী অনেকের মনঃপুত হয় নি অথবা অপর সকল মঙ্গলকাব্যেই শিব-কাহিনী সন্নিবিষ্ট হয়েছে বলেই কবিগণ অধিক সংখ্যায় 'শিবায়ন'-রচনায় অগ্রসর হন নি। অপর অল্প যে কয়জন শিবায়ন-কাব্য রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে দ্বিজ কালিদাস অন্যতম। দ্বিজ কালিদাসের কাব্যের নাম 'কালিকা-বিলাস'—কিন্তু এতে দেবী কালিকার কাহিনী নেই, শিবমাহাত্মই এর উপজীব্য। গ্রন্থকারের কাল অথবা পরিচয়-সম্বন্ধে কিছু জানবার উপায় নেই। তিনি তাঁর কাব্যে 'কুমারসম্ভব' এবং পুরাণের কিছু কিছু অনুবাদ করেছেন।

[পাঁচ] কালিকামঙ্গল / বিদ্যাসুন্দর

[ক] অষ্টাদশ শতকের পটভূমিকা ঃ অবক্ষয় যুগ

অষ্টাদশ শতাব্দী বাঙলাদেশের ইতিহাসে একটা স্মরণীয় কাল। অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত মুঘল শাসন তখন অস্তগত-মহিমা ; আঞ্চলিক সুলতানরাই তখন বাহুবলের দাপটে যার যার অধিকার রক্ষায় ব্যস্ত। মুঘল-সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, শিল্প-সংস্কৃতির যুগও তখন অবসিত-প্রায়। কেন্দ্রে কিংবা অঞ্চলে সর্বত্রই কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার শৈথিল্যের সুযোগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামীরাই প্রবল প্রতাপশালী হয়ে উঠলেন। দেশের জনসাধারণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ রইল এই ভূস্বামীদেরই। ঊর্ধ্বতন শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে জনগণের যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন না থাকবার ফলেই রাষ্ট্রীয় শাসনের ঊর্ধ্বস্তরে কোন পরিবর্তনাদি ঘটলে তা জনমানসে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারত না। ভূস্বামীরাই উপরওয়ালার তুষ্টিবিধান করে স্বমহিমায় বিরাজিত থাকতেন। মুঘল রাজপুরুষদের ভোগবহুল বিলাসী জীবনকে আপনাদের আদর্শরূপে গ্রহণ করে তাঁরা তৃপ্তি অনুভব করতেন। ওদিকে সুচতুর ইংরেজ বণিক কোম্পানীর লুব্ধদৃষ্টি পড়ল রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর। তারপর যা ঘটল, তা ভোজবাজির মতই ব্যাপার। 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে' — এমন অনায়াস-চতুরতার সঙ্গে বাঙলার শাসনভার ইংরেজ আপনার হাতে তুলে নিল যে, সাধারণ বাঙালী কিছু বুঝবারও অবকাশ পেল না। ফলে পলাশীর যুদ্ধের মত একটা রাষ্ট্রবিপ্লব-সাধক বিরাট ঘটনাও বাঙলাদেশের সাহিত্যে বিন্দুমাত্র ছায়াপাত করতে পারল না। বস্তুতঃ সমগ্র শতক ধরে চলছিল তার জের। এক কথায় — শতকই ছিল অবক্ষয় যুগের লক্ষণ-লাঞ্ছিত।

যুগ-পরিবর্তন ঃ সমাজ জীবনে প্রভাব

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভাবনা-চিন্তা মূলত পূর্ববর্তী ভাবনা-চিন্তা থেকে পৃথক্ ছিল। যে বিদেশি বিধর্মী শক্তির প্রবলতা খ্রীঃ ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে আকস্মিকভাবে বাঙালীর জীবনকে পরাভূত করেছিল এবং যার ফলে বাঙালী দেবতার আশ্রয় নিয়ে ধর্মের মধ্যেই সান্ত্বনা খুঁজছিল, সেই অবস্থার ক্রমিক পবিবর্তন সাধিত হয়েছিল। শাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে ক্রমে বাঙালীর হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হয়। বাঙালীব দৃষ্টি আবার বহির্মুখী হবার অবকাশ পায়। নগরজীবনে তখন বিলাসিতার স্রোত চলেছে, গ্রামের সাধারণ মানুষও লুব্ধদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সেই বিলাস-বহুল জীবনযাত্রার দিকে। সেই অবক্ষয়ের যুগে স্বভাবতই মানুষের ধর্মবুদ্ধি বা নীতিবুদ্ধির স্থান অধিকাব করেছিল দেহাত্মবুদ্ধি এবং তীক্ষ্ণ বাস্তবতাবোধ। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণে গড়ে উঠে প্রচুর 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য'। এ বিষয়ে একজন আধুনিক সমালোচক যথার্থই বলেছেন ঃ "সমাজে ধর্মের হইয়াছিল অধঃপতন, প্রেম পরিণত হইয়াছিল ইন্দ্রিয়বিলাসে। নাগরিক বাঙালীব মনে দেবতা, ধর্ম ও পরলোক-সম্বন্ধীয় বিশ্বাসের দৃঢ়তা শিথিল হইয়া গিয়াছিল। এই অবস্থার অনিবার্য ফল দেহবুদ্ধির প্রাবল্য ও বস্তুতান্ত্রিক জীবনেব প্রতিষ্ঠা। বিদ্যাসুন্দর কাব্য যতই অশ্লীল হউক না কেন, ইহা বস্তুনিষ্ঠ বটে। ইহা আদর্শ-সর্বস্ব, নির্জীব, শূন্যচারী নহে ; ইহা প্রত্যক্ষ, দেহনিষ্ঠ ও সত্য। এইজন্য ইহাদেব মধ্যে জাতি পাইযাছে মোহমুক্তির সন্ধান।"

কালিকামঙ্গলের পটভূমিকা

কালিকামঙ্গল বস্তুতঃ কোন মঙ্গলকাব্যই নয়, এব বাইরের রূপটাই শুধু মঙ্গলকাব্যেব, আসলে এটি বোম্যান্টিক যৌবনের কাব্য। আদিরসাত্মক, উত্তেজনাময় বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর উপব একটা ভদ্রখোলস চাপিযে একে মঙ্গলকাব্যের রূপ দেবার অভিপ্রায়েই এই কাব্যে কালিকাদেবীর আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে। বস্তুত, কোন কোন বিদ্যাসুন্দব কাব্যে কালিকাদেবীর আদৌ কোন ভূমিকা নেই।

দেবী কালিকা বা কালী চণ্ডীব মতই অনার্য সমাজ থেকে তন্ত্রেব মধ্য দিয়ে আর্য সমাজে গৃহীত হযেছেন। অবশ্য পরবর্তীকালে অনেক পুরাণেই কালিকার কাহিনী এবং মাহাত্ম্য বর্ণিত হযেছে। 'লিঙ্গপুবাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' এবং বিশেষভাবে 'কালিকাপুরাণে'র নাম এই প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। কেউ কেউ অনুমান কবেন যে আসামেব নরমুণ্ডশিকারী নাগা জাতির নিকট থেকে এই কালীব পরিকল্পনা গৃহীত হয়ে থাকতে পারে। বাঙলাদেশে চণ্ডীব চেযেও কালীর প্রভাব এবং জনপ্রিযতা অনেক বেশি। অবশ্য কালীর নানাপ্রকার রূপভেদও কল্পনা করা হযেছে ঃ বক্ষাকালী, দক্ষিণাকালী, ভদ্রকালী, মহাকালী, শ্মশানকালী প্রভৃতি। অষ্টম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ ইলোবা গিবিগাত্রে যে কালীমূর্তি পাওয়া যায, সম্ভবত, ওটিই আমাদের দেশে কালীর প্রাচীনতম রূপ।

কালিকাব উদ্ভব

চোর-তস্কররা কালী পূজা করে থাকে এবং এরূপ কাহিনী-অবলম্বনে বাঙলাদেশে বহু চোরের পাঁচালীও রচিত হয়েছে। বাঙলাদেশের বাইবেও এরূপ কাহিনীর অসদ্ভাব নেই। আলোচ্য কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্যও আসলে এইরূপ 'চোরের পাঁচালী' জাতীয় কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

'কালিকামঙ্গল' বা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের উৎস-সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে সংস্কৃত ভাষায় বররুচি-রচিত যে 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য' পাওয়া যায়, ওটিই বাঙলা বিদ্যাসুন্দরের উৎস। কিন্তু কোন কোন বিশিষ্ট মনীষী ঠিক এর বিপরীত অভিমতই পোষণ করেন। তাঁদের মতে বাঙলা বিদ্যাসুন্দরকেই কোন বাঙালী কবি সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত করেছিলেন।. এই বিষয়ে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের অভিমত একটু বিস্তৃতভাবেই উদ্ধৃত করছিঃ "'বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান' নামে বাংলা ও নাগরীর অদ্ভুত মিশ্র অক্ষরে লিখিত ও বিক্রমাদিত্যের সভাকবি বররুচি-কর্তৃক রচিত বলিয়া উল্লেখিত একটি সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পুঁথিখানি কোন বাঙালী লিপিকর-কর্তৃক অত্যন্ত আধুনিক কালে লিখিত — তাহা যে কেহ ইহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। বাংলাদেশে প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে বররুচি এই শ্রেণীর একখানি কাব্যের রচয়িতা ও উজ্জয়িনী এই কাহিনীর ঘটনা-স্থান। অতএব মনে হয়, এই জনশ্রুতি ভিত্তি করিয়াই এই সংস্কৃত উপাখ্যানখানি পরবর্তীকালে কোন বাঙালী কর্তৃক রচিত হইয়াছে, —ইহা হইতে বাংলা বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছে, বিবেচনা করা সঙ্গত নহে।"

সংস্কৃত ভাষায় 'বিদ্যাসুন্দর'

যে কালে 'বিদ্যাসুন্দর' কাহিনী রচিত হয়েছিল, তার অনেক পূর্ব থেকেই বাঙলাদেশে আরবী ফারসী সাহিত্য থেকে অনুবাদের ধুম পাড়ে গিয়েছিল। সেই সূত্রে 'আরব্য উপন্যাস' 'পারস্য উপন্যাসে'র বিস্তর অনুবাদ বাঙলা ভাষায় যে প্রসার লাভ করেছিল এ সংবাদ সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের সুবিদিত। প্রচলিত এই সাহিত্যধারার নাম 'কিসসা সাহিত্য' কিংবা 'মুসলমানী সাহিত্য'। এ জাতীয় সাহিত্যে অসামাজিক প্রেমের কাহিনীও বিস্তর রয়েছে। সমকালীন গ্রামসমাজের বাঙালীরা এর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন—এ অনুমান অযথার্থ না হওয়াই সম্ভব। তাছাড়াও ঐ যুগে বহু হিন্দুই ফারসী ভাষায় কৃতবিদ্য ছিলেন, তাঁরাও এ জাতীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন অনুমান করা চলে। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের পরিকল্পনায় না হলেও তার উপস্থাপনে ঘটনা বর্ণনা আদি বিভিন্নভাবেই সেই 'কিসসা সাহিত্যের' প্রভাব 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের উপর পড়ে থাকতে পারে।

কিসসা সাহিত্যের প্রভাব

বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর অপর একটি সম্ভাব্য উৎসঃ বিল্‌হণ রচিত 'চৌর পঞ্চাশিকা' নামক একখানি সংস্কৃত কাব্য। রাজকন্যার সঙ্গে অবৈধ প্রেমে আবদ্ধ কবি ধরা পড়ে মশানে নীত হলে নাকি এই পঞ্চাশটি শ্লোক আবৃত্তি করে রাজরোষ থেকে মুক্তিলাভ করেন এবং রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ঘটনাটি অবশ্যই অনুমান মাত্র, — এটি কবির ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী না হয়ে অপর কারো অথবা কল্পিত হওয়াও বিচিত্র নয়। যা হোক, বিল্‌হণের এই 'চৌর-পঞ্চাশিকা'-কেই বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর মূল বলে গ্রহণ করা চলে। আবার ভাগবতের ঊষা-অনিরুদ্ধের কাহিনীতেও প্রায় অনুরূপ ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। কাশ্মীর-কবি বিল্‌হণের কাব্যের চেয়ে ভাগবতের সঙ্গেই বাঙালী কবিদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা সম্ভব, সেদিক থেকে বিচার করলে বলতে হয়, বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীটি ভাগবত থেকে গৃহীত এবং 'চৌর পঞ্চাশিকা'টি এরই

বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর উৎস

ভিতর সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কোন কোন প্রাচীনতর বিদ্যাসুন্দর কাব্যে 'চৌর-পঞ্চাশকা'টি একেবারেই বর্জিত হয়েছে দেখা যায়। লক্ষ্য করবার বিষয়, মূলরূপে উল্লেখিত গ্রন্থ দু'টির কোনটিতেই দেবী কালিকার কোন উল্লেখ নেই ; আবার একাধিক বাঙলা কাব্যেও কালিকা দেবী বর্জিত হয়েছেন। অতএব বিদ্যাসুন্দর কাহিনীতে কালিকা যে আরোপিত, তা বুঝতে কোন কষ্ট হয় না। বস্তুতঃ বাঙলাদেশে ও বাঙলা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্যটিই সুপরিচিত 'কালিকামঙ্গল' প্রায় অনুল্লেখ্য।

কাব্য-বিচার ঃ সুন্দর নামে এক রাজপুত্র গভীর রাত্রিতে 'ভদ্রকালী'র আরাধনায় দেবীকে সন্তুষ্ট করে বরলাভ করলেন যে তিনি রাজকন্যা বিদ্যার সাক্ষাৎলাভ করবেন। অতঃপর দেবী-প্রদত্ত এক শুকপক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যার পিতৃরাজ্যে উপনীত হলেন। তথায় বৃদ্ধা মালিনীকে 'মাসী' বলে ডেকে তাঁর গৃহেই আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এর পর মালিনীর সহায়তায় সুন্দর বিদ্যার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন, সরোবর-স্নানকালে তাদের সঙ্কেতে ভাব-বিনিময়ও হলো। অতঃপর কালিকার বরে সুন্দরের গৃহ থেকে বিদ্যার মন্দির পর্যন্ত এক সুড়ঙ্গ -পথ নির্মিত হলে সুন্দর প্রতি রজনীতে বিদ্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে লাগলেন। এরই মধ্যে তারা গন্ধর্বমতে পরিণয়সূত্রেও আবদ্ধ হয়েছিলেন। এর ফলে বিদ্যার গর্ভ-লক্ষণ দেখা দিলে রাজা অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে নগরপালকে চোর ধরতে আদেশ করলেন। নগরপাল কিছুতেই চোর ধরতে না পেরে অবশেষে বিদ্যার মন্দির সিন্দূর দ্বারা লিপ্ত করে দিল। ফলে সুন্দরের পরিচ্ছদে সিন্দূর চিহ্ন লাগল। রজকগৃহ থেকে সিন্দূর-চিহ্নিত কাপড়ের সূত্র ধরে নগরপাল সুন্দরকে অপরাধী সাব্যস্ত করল। বিচারে সুন্দরের শূলদণ্ডের আদেশ হয়। শ্মশানে সুন্দর 'কালিকা'র আরাধনা করলে দেবী আবির্ভূতা হয়ে রাজাকে সুন্দরের পরিচয় দান করে তাকে মুক্তি দিতে আদেশ করেন। অতঃপর রাজার সম্মতিতে সুন্দর বিদ্যাকে বিবাহ করে স্বদেশে নিয়ে গেলেন।

বিদ্যাসুন্দর কাহিনী

কাহিনী থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এতে বিদ্যা এবং সুন্দরের কাহিনীই প্রধান, দেবী কালিকার ভূমিকা এখানে একান্তই গৌণ। শুধুমাত্র এর উপর একটা মঙ্গলকাব্যের আবরণ দেওয়া ছাড়া কালিকার অন্তর্ভুক্তির অপর কোন উপযোগিতাই নেই। অবশ্য কাহিনীটির আঙ্গিক বিচার করলেও মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে এর একটা রূপগত সাদৃশ্য উপলব্ধি করা যাবে। সেদিক থেকেই 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর'কে মঙ্গলকাব্য বলে আখ্যায়িত করা যায়। অন্যথায়, ভাব ও রসের বিচারে এবং অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলেও বোঝা যাবে — বিদ্যাসুন্দর একান্তই আদিরসাত্মক কামভাবোত্তেজক রোম্যান্টিক কাব্য মাত্র। সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে এ ধরনের অপর কোন সাহিত্য নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও অবশ্য আদিরস আছে, কোথাও কোথাও অশ্লীলতাও আছে, কিন্তু এমন নগ্নভাবে আদিম প্রবৃত্তির ও আদিরিপুর উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াস তাতে নেই। বিদ্যাসুন্দরে একমাত্র ইন্দ্রিয়লালসারই খোরাক পাওয়া যায়, এটি একান্তভাবেই শারীর কাব্য। এতে যে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অশ্লীলতার পরিচয় পাওয়া যায়, তা

আদিরসের প্রাধান্য

একমাত্র সেকালের রাজসভায়ই স্থান লাভ করতে পারত, গৃহস্থঘরে এই কাব্যের প্রবেশ একেবারেই অবাঞ্ছিত। অন্যান্য কাব্য থেকে অশ্লীলতার দৃষ্টান্ত দিয়ে কেউ কেউ বিদ্যাসুন্দর কাব্যের অশ্লীলতাকে লঘু করবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কুকার্যের নজির গ্রহণযোগ্য নয়, এই বিচারে তাদের এই সমর্থনকেও বাতিল করা চলে। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের এই অশ্লীলতাকে বাদ দিলে অবশ্য এতে প্রশংসা করবার মত উপাদানও যথেষ্ট রয়েছে। এটি দেবতা ও ধর্ম-সম্পর্ক-বর্জিত বলে এতে মানবিক আবেদনই প্রাধান্য লাভ করেছে। অধিকন্তু বাস্তবতা এর অপর এক অপূর্ব সম্পদ। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের কাহিনীবিন্যাসে, চরিত্রসৃষ্টিতে ও কথোপকথনে লঘু কৌতুকের ছড়াছড়ি। হাস্যরসাত্মক কাহিনীটি অতিবাস্তব আধুনিক উপন্যাসের মতই সুখপাঠ্য। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে অনেকেই একটা তীব্র স্যাটায়ার-বোধের পরিচয় পেয়েছেন। সমসাময়িক ধনিক সমাজের অন্দরমহলে কিভাবে পাপের বাসা সৃষ্টি হয়েছিল, বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীতে যেন তারই একটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হয়েছে। বস্তুত লঘু কৌতুকের সাহায্যে এতে অভিজাত সমাজের অবক্ষয়েরই একটি সুন্দর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যদি কোন কবি সচেতনভাবে এই উদ্দেশ্য নিয়ে কাব্যটি সৃষ্টি করে থাকেন, তবে স্বীকার করতেই হবে যে, বাঙলা সাহিত্যে বিদ্যাসুন্দর কাব্যেই সর্বপ্রথম আধুনিকতার প্রকাশ ঘটেছে।

মানবিক উপাদান

কবি-পরিচয়

১. **কবি কঙ্ক ঃ** বিদ্যাসুন্দর কাব্যের আদি কবি কে ছিলেন, এ বিষয়ে গুরুতর মতভেদ বর্তমান। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, "কবি-কঙ্কের রচনা হইতে অনুমান করিতে পারা যায়, তিনি চৈতন্যের সমসাময়িক লোক।" কারণ তাঁর রচনায় চৈতন্য-দর্শনের আকৃতি প্রকাশ পেয়েছে—

'কবে বা হেরিব আমি গৌরার চরণ।
সফল হইবে মোর মনুষ্য জনম।। . . .
হউক বা না হউক পদ না ছাড়িব।
বাজন্ত নূপুর হৈয়া চরণে লুটিব।।'

পক্ষান্তরে ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "কঙ্কের রচনা ষোড়শ শতাব্দীর হওয়া অসম্ভব। ...অতএব কবি কঙ্ককে বাংলা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের প্রথম কবি মনে করা চরম বিচারমূঢ়তা।" ডঃ সেন আরও মনে করেন যে, কবি কঙ্কের রচনাটি সত্যনারায়ণের পাঁচালী মাত্র, বিষয় বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী। এইজন্যই এই কাব্য যে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের আগে রচিত হতে পারে না, এ বিষয়ে তিনি নিঃসংশয়। কিন্তু স্কন্দ-পুরাণেও যখন সত্যপীরের পরিচয় পাওয়া যায়, তখন ষোড়শ শতাব্দীর কঙ্কের রচনায় সত্যপীরের অন্তর্ভুক্তি অসম্ভব হবে কেন?

কবি কঙ্ক তাঁর কাব্যে যে আত্মপরিচয় দান করেছেন, তাতে জানা যায় যে তাঁর পিতার নাম গুণরাজ, মাতা বসুমতী। কবির বাসস্থান ময়মনসিংহ জেলার বিপ্রগ্রাম। তিনি ব্রাহ্মণ-

সন্তান হলেও মুরারি ও কৌশল্যা নামক এক চণ্ডাল-দম্পতি দ্বারা প্রতিপালিত হয়েছিলেন—ময়মনসিংহ গীতিকায় 'কঙ্ক ও লীলা' নামে একটি পালাগানে কবি কঙ্কের প্রেম-কাহিনীর একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

কঙ্কের কাব্যের নাম বিদ্যাসুন্দর নয়, 'পীরের পাঁচালী'। জানা যায় যে কবি-কঙ্ক তাঁর গুরুর আদেশে সত্যপীরের বা সত্যনারায়ণের 'পাঁচালী' রচনা করেছিলেন। কবির কাব্য আদিরসাত্মক নয়, এবং এতে 'চৌর-পঞ্চাশিকা'রও কোন প্রভাব পড়ে নি।

২. শ্রীধর ঃ শ্রীধর কবিরাজের যে দুখানি খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়েছে, তাতে গৌড়ের নবাব হোসেন শাহের পৌত্র ফিরোজ শাহের উল্লেখ বর্তমান। ফিরোজ শাহ ১৫৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে অল্প কিছুদিনের জন্য সিংহাসনে ছিলেন। অতএব সম্ভবত এর সমসময়েই কবি তাঁর কাব্য সমাপ্ত করেছিলেন। এই বিচারে শ্রীধরকে বিদ্যাসুন্দর কাব্যের অন্যতম প্রাচীন কবি বলেই অভিহিত করতে হয়। কবির কাব্যে আত্মপরিচয়ের কোন সূত্র পওয়া যায় নি। তবে চট্টগ্রাম অঞ্চলেই পুথি দুখানি পাওয়া গিয়েছে বলে, অনুমান হয়, কবি ঐ অঞ্চলেরই লোক ছিলেন। কবি শ্রীধর তার কাব্যে মাঝে মাঝে সংস্কৃত গদ্য 'বচনিকা' ব্যবহার করেছেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে তার পদ্য অনুবাদও প্রদান করেছেন। মনে হয়, অতি প্রাচীনকালে স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক গ্রন্থে সন্নিবেশ করা একটি রীতি বলে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'ও অনুরূপ ব্যাপার দেখা যায়।

শ্রীধরের কাব্যে পাণ্ডিত্য আছে, তবে কবিত্বের পরিচয় কম। তিনি বিদ্যার যে রূপ বর্ণনা করেছেন, তা সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র-সম্মত। পরবর্তীকালেও প্রায় সর্বত্র এই রীতিই অনুসৃত হয়েছে।

৩. সাবিরিদ খাঁ ঃ সাবিরিদ খাঁ-রচিত বিদ্যাসুন্দর-পুথির অংশবিশেষ মাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এতে আত্মপরিচয়-সূত্রে কবি বলেছেন যে তাঁর পিতার নাম নানুবাজা মল্লিক। জ্ঞি ঠাকুর নামক তাঁর একজন পূর্বপুরুষ তিন সিকে পরগণার সরকার ছিলেন। কবির পূর্বপুরুষগণের নাম থেকে মনে হয় যে তাঁরা মূলত বোধ হয় মগ জাতীয় ছিলেন। সাবিরিদ খাঁ সম্ভবত চট্টগ্রাম অথবা নোয়াখালি-অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। কবির কাব্যে রচনাকাল-সম্বন্ধীয় কোন সূত্র পাওয়া যায় না। তবে ভাষার বহু প্রাচীনত্বের চিহ্ন বর্তমান থাকায় ডঃ ভট্টাচার্য মনে করেন, "... পুথিখানি ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তী যুগে রচিত হইতে পারে ন। অতএব মনে হয়, শ্রীধর কবিরাজের মাত্র অল্পকাল পর, কিংবা সমসাময়িক কালেই সাবিরিদ খাঁ তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন।" শ্রীধরের কাব্যের সঙ্গে আলোচ্য কাব্যের সাদৃশ্যও বিস্ময়কর। মনে হয়, উভয়ই এক সূত্র থেকে উপাদান আহরণ করেছেন অথবা একের উপর অপরের প্রভাব পড়েছে। কবি সাবিরিদ খাঁও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর কাব্যেও মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবিষ্ট হয়েছে। গ্রন্থারম্ভে তিনি পদ্যেই সংস্কৃত শ্লোক রচনা করে অতঃপর তারও বাঙলা পদ্যানুবাদ দিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থে পাণ্ডিত্যের পরিচয়

অতিশয় প্রকট বলে সহজ কবিত্বের প্রকাশ নেই। বিস্ময়ের বিষয়, মুসলমান কবির কাব্য হলেও এতে আরবী-ফার্সীর কোন প্রভাব নেই। সাবিরিদ খাঁ ছন্দ-সৃষ্টিতে কিছুটা বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন, এ ছাড়া তাঁর কাব্যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কিছু নেই।

৪. গোবিন্দদাস ঃ কবি গোবিন্দদাসের 'কালিকামঙ্গল' সুবৃহৎ কাব্য। কবি চট্টগ্রাম জেলার দেআঙ্গ বা দেবগ্রামে বাস করতেন বলে গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কবির পরিচয় অথবা কাল-সম্বন্ধে এর অধিক কোন প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে একটি পয়ারে পাওয়া যায়,—

'অক্ষর বাণ শশী শক পরিমিত।
এই কালে রচিত কালিকা চণ্ডীর গীত।।'

এ থেকে ১৫৩৪ শকাব্দ (১৬১২ খ্রীঃ) পাওয়া গেলেও ডঃ সুকুমার সেন এর প্রামাণিকতায় বিশ্বাসী নন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মনে করেন যে ১৫৯৫ খ্রীঃ কবি গ্রন্থটি রচনা করেছেন। আবার ডঃ সেন অন্য সূত্র থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে গ্রন্থটির লিপিকাল ১১১৬ মঘীসন বা ১৭৫৪-৫৫ খ্রীঃ। এই সমস্ত পরস্পর-বিরোধী অভিমতের মধ্য থেকে প্রকৃত সত্যের উদঘাটন সম্ভব নয়।

কবির রচিত 'কালিকামঙ্গল' পাঁচ অংশে বিভক্ত—প্রথম খণ্ডে বৃত্রাসুর বধ ও দেবী-মাহাত্ম্য প্রচার, দ্বিতীয় খণ্ডে ইন্দ্র-অহল্যা-কাহিনী, তৃতীয় খণ্ডে সুরথ-সমাধি কাহিনী, চতুর্থ খণ্ডে বিক্রমাদিত্যের কাহিনী ও শেষ খণ্ডে বিদ্যাসুন্দর কাহিনী। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, গ্রন্থে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীটি প্রাধান্য লাভ করেনি, কবির বিশেষ লক্ষ্য ছিল, কালিকার মাহাত্ম্য-প্রকাশের দিকেই। প্রাচীন পুরাণাদিতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে কালিকাব যে সমস্ত মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে, কবি গোবিন্দদাস আলোচ্য গ্রন্থে ঐ সমস্ত একত্র সঙ্কলন করেছেন। পরন্তু এর গঠন-বৈশিষ্ট্যও মঙ্গলকাব্যের অনুরূপ নয়।

গোবিন্দদাসের গ্রন্থে পাত্র-পাত্রীদের নাম-ধাম-সম্বন্ধে নোতুনত্বের পবিচয় পাওয়া যায়। গোবিন্দদাস যে ভক্ত কবি ছিলেন, তার সুস্পষ্ট পরিচয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। কবি অনেকগুলি গানও রচনা করেছিলেন,—এদের কোন কোনটি ব্রজবুলি পদ।

৫. কৃষ্ণরাম ঃ কৃষ্ণবাম দাস অপর কয়েকটি মঙ্গলকাব্য-সহ 'কালিকামঙ্গল'ও রচনা করেছিলেন। কৃষ্ণরাম দাসের পিতার নাম ভগবতীদাস, বাসস্থান ২৪ পরগণার নিমতা গ্রাম। কবি রাযমঙ্গল, ষষ্ঠীর পাঁচালী, শীতলামঙ্গল এবং 'কালিকামঙ্গল' রচনা করেন। 'কালিকামঙ্গলে' কবি গ্রন্থ রচনা-কাল সম্বন্ধে বলেছেন —

'সারসা সানের নেত্র ভীমাক্ষিবর্জিত মিত্র
তেজিয়া ঋষির পক্ষ তবে।
বিধুর মধুর নাম রচনাতে কহিলাম
বুঝ সকল বিচারিয়া সভে।।'

আলোচ্য সঙ্কেতটির যথার্থ অর্থ বার করতে না পেরে অনেকেই কৃষ্ণরামের কাল সম্বন্ধে অনুমানের উপর নির্ভর করেছেন। সম্প্রতি ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তির

সাহায্যে যে অর্থ আবিষ্কার করেছেন, তা অন্যসূত্রেও সমর্থিত হয়। তিনি বলেন, কবি ১৫৮৬ শকাব্দে (১৬৬৫ খ্রীঃ) কাব্যটি রচনা করিয়াছিলেন। কবি তাঁর গ্রন্থে 'ক্ষিতিপাল অরংসাহা' এবং নবাব 'সায়েস্তা খাঁ'রও উল্লেখ করিয়াছেন। ১৬৬৪ খ্রীঃ সায়েস্তা খাঁ বাঙলার সুবেদার ছিলেন। অতএব কবির কাল-সম্বন্ধে আর অনুমান নিষ্প্রয়োজন। কবি বলেছেন, তিনি কুড়ি বৎসর বয়সে এই কাব্যটি রচনা করেন, অতএব অনুমান করা চলে, এটিই তাঁর প্রথম রচনা।

প্রাণরাম চক্রবর্তী নামক একজন 'কালিকামঙ্গল'-রচয়িতা লিখেছেন ঃ

'বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম বিকাশ।
বিরচিলা কৃষ্ণবাম নিমতা যার বাস।।'

তাঁর মতে, কৃষ্ণরাম আদি বিদ্যাসুন্দর-রচয়িতা। কিন্তু প্রাণরামের এই উক্তি নির্ভরযোগ্য নয়। কৃষ্ণরামের কাব্যে পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও তার ভাষা বেশ সরল। বিদ্যাসুন্দব-কাহিনী-বর্ণিত হলেও কবি গ্রাম্যতার প্রশ্রয় দেননি। তাঁর কাব্যেব ভাষা বেশ মার্জিত।

৬. কবিশেখর বলরাম ঃ বলরাম চক্রবর্তী-বচিত মাত্র একখানি পুঁথিই পাওয়া গিয়েছে। গ্রন্থে কবি আত্মপরিচয় দান করেছেন অতি সংক্ষেপে, — তাঁব পিতার নাম দেবীদাস, মাতা কাঞ্চন। তাঁর বাসস্থান-সম্বন্ধে তিনি কিছুই উল্লেখ করেন নি। গ্রন্থেব সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মনে করেন যে কবি পূর্ববঙ্গীয় ছিলেন। কিন্তু তাঁব কাব্যে পশ্চিমবঙ্গেব দেবতাদেরই বিশেষভাবে উল্লেখ কবা হযেছে বলে ডঃ সেন ও ডঃ ভট্টাচার্য তাঁকে পশ্চিমবঙ্গীয় বলে মনে করেন। কবিব উপাধি ছিল 'কবিশেখব'। কবিব গ্রন্থে কালনির্দেশক কোন সূত্র আবিষ্কৃত না হওয়ায় তাঁব বচনাকালের জন্য পরোক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভব করতে হয। তাঁর কাব্যে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের কোন প্রভাবের পবিচয না থাকায অনুমান কবা হয যে, তিনি অন্তত অষ্টাদশ শতকেব প্রথমার্ধেই বর্তমান ছিলেন। কবি-কৃত কালিকামঙ্গলে বিদ্যাসুন্দর কহিনী থাকলেও তিনি কালিকার মাহাত্ম্য-বর্ণনাতেই অধিকতর আগ্রহেব পবিচয় দান করেছেন। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীতেও কবির সংযম লক্ষণীয়। তিনি কখনও মাত্রা ছাড়িযে উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দেননি। এ দিক থেকে তিনি ছিলেন আদর্শ-স্থানীয়। কবিব কাব্যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় বর্তমান, আবার তাঁব সহজ কবিত্বও প্রশংসনীয।

৭. রামপ্রসাদ সেন ঃ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন সম্ভবত ১৭২০ খ্রীঃ বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত কুমারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কুমারহট্ট সাম্প্রতিক কালে হালিশহরের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কবি তাঁর গ্রন্থে আত্মপরিচয় দিয়েছেন ঃ তাঁর পিতার নাম রামরাম সেন। মনে হয়, রামপ্রসাদ সম্পন্ন গৃহস্থ ঘরের সন্তান ছিলেন। কর্মসূত্রে তিনি কলকাতার নিকটবর্তী কোন এক ধনী ব্যক্তির নিকট কর্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর সংসারের ভার কাঁধে পড়লে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন। শোনা যায, তিনি তার মনিবের হিশেবের খাতায় গান লিখতেন। মনিব রামপ্রসাদের কবিত্বশক্তি এবং ভক্তি-দর্শনে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর জন্য মাসোহারায় ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রও তাঁর শ্যামাসঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি এবং একশত বিঘা জমি দান করেছিলেন।

রামপ্রসাদের কবি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি তাঁর 'শ্যামাসঙ্গীতে'। তাঁর রচিত 'বিদ্যাসুন্দর' শ্যামাসঙ্গীতের তুলনায় অনেক হীনপ্রভ। রামপ্রসাদের স্বীকৃতি থেকে জানা যায় যে তিনি রাজকিশোরের আদেশেই কাব্যটি রচনা করেছিলেন। কিন্তু রামপ্রসাদ এই কাব্য কবে রচনা করেছিলেন, তৎসম্বন্ধে সঠিক কিছু বলবার উপায় নেই। ডঃ ভট্টাচার্য মনে করেন যে রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের ২/১ বৎসব পূর্বে অথবা পরে তাঁর বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। আবার ডঃ সেন মনে করেন যে রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের পূর্বে কিছুতেই রচিত হতে পারে না। অধিকন্তু তিনি এই কাব্যে ভারতচন্দ্রেরও প্রভাব লক্ষ্য করেছেন।

রামপ্রসাদের কাব্যের নাম 'কবিরঞ্জন'। কালিকার মাহাত্ম্য-বর্ণনাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীই এর মূল লক্ষ্য। কথিত আছে, রামপ্রসাদের 'কবিরঞ্জন' তাঁর কালিকা-মঙ্গল কাব্যের অন্তর্গত ছিল। কালক্রমে কাব্যের পূর্বাপর অংশ বিনষ্ট হয়েছে, একমাত্র বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীই রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু রামপ্রসাদের 'কালিকামঙ্গল' বলে স্বতন্ত্র কোন পুথি পাওয়া যায় না।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর কাহিনীতে কিছু কিছু মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভারতচন্দ্রের তুলনায় তাঁর কাব্যের উৎকর্ষ অনেক কম। ডঃ সেনের ভাষায়, "ভারতচন্দ্রের কাব্যের সহিত রামপ্রসাদের কাব্য তুলনা করিলে দেখা যায় যে, শিল্পচাতুর্যে এবং ভাষার মনোহারিত্বে ভারতচন্দ্রের কাব্য রামপ্রসাদের কাব্যের তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠ কিন্তু চরিত্র-চিত্রণে অপকৃষ্ট। রামপ্রসাদের কাব্যে সকল চরিত্রগুলিই স্বাভাবিক হইয়াছে, কিন্তু ভারতচন্দ্রের চিত্রগুলি typical, প্রায় যেন satirical এবং এইজন্য ভারতচন্দ্রের কাব্যের কাছে রামপ্রসাদের কাব্য অনেকটা নিষ্প্রভ। রামপ্রসাদের কাব্যের আর একটি মহৎ গুণ আছে, কাব্যটি ঘরোয়াভাবে (human touch) ওতপ্রোত।"

শ্যামাসঙ্গীতে রামপ্রসাদের ভক্তিভাবের সঙ্গে বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীলতার সামঞ্জস্য বিধান করা কষ্টকর। মনে হয়, ভারতচন্দ্র অপেক্ষা রামপ্রসাদের কাব্য আরও অশ্লীল, আরও অমার্জিত। রামপ্রসাদ ছন্দের দিক থেকে কিছুটা বৈচিত্র্য প্রদর্শন করলেও ভারতচন্দ্রের তুলনায় তা তত উল্লেখযোগ্য নয়। ভাষাশিল্পের দিক থেকে তো রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের পাশেই দাঁড়াতে পাবেন না। কখন কখন অনাবশ্যক পাণ্ডিত্যের ভারেও রামপ্রসাদের কাব্য পীড়িত হয়ে পড়েছে। এককথায় বলা চলে, বিদ্যাসুন্দর কাব্যে রামপ্রসাদের স্বাভাবিক নৈপুণ্য প্রকাশিত হয়নি।

[খ] ভারতচন্দ্র রায় / অন্নদামঙ্গল

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করেছেন। 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য' এর একটি অংশমাত্র। কাজেই 'অন্নদামঙ্গলে'র আলোচনায় স্বভাবত বিদ্যাসুন্দর অন্তর্ভুক্ত হলেও অতিরিক্ত অংশও যথেষ্ট থাকবে এটিই স্বাভাবিক। ভারতচন্দ্রের প্রতিভার বিচার হবে অন্নদামঙ্গলের সামগ্রিক আলোচনায়, পৃথক্‌ভাবে বিদ্যাসুন্দরের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ভারতচন্দ্রের জন্ম-তারিখ-সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও সাম্প্রতিকতম অভিমত এই যে তিনি ১৭০৭ খ্রীঃ পাঁড়ুয়া বা রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবি বিস্তৃতভাবে যে আত্মপরিচয় দান করেছেন তা থেকে জানা যায় যে ভুরসুটের রাজবংশীয় নরেন্দ্র রায় ছিলেন তাঁর পিতা। বর্ধমান-রাজ কীর্তিচন্দ্র তাঁর রাজ্য অধিকার করলে ভারতচন্দ্র মাতুলালয়ে পালিয়ে যান। অতঃপর এক টোলে কিছুকাল সংস্কৃত পাঠ গ্রহণ করে মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সেই বিবাহ করেন। তাঁর অভিভাবকগণ বিরক্ত হলে ভারতচন্দ্র দেবানন্দপুরে রামচন্দ্র মুন্সীর আশ্রয়ে থেকে ফারসী-ভাষা শিক্ষা করেন এবং এই স্থানেই তিনি সত্যনারায়ণের একখানি পাঁচালী বচনা করেন। এর পর তিনি গৃহে ফিরে আসেন এবং কর্মোপলক্ষ্যে একবার বর্ধমানে গমন করেন। তথায় রাজ-রোষে পতিত হয়ে কারারুদ্ধ হন। উৎকোচ দিয়ে তিনি কারাগার থেকে পলায়ন করেন এবং এক সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে নানাস্থান পরিভ্রমণ করেন। অতঃপর আবার বাড়ি ফিরে আসেন এবং কর্ম-সন্ধানে ফরাসডাঙ্গার দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ রায়ের নিকট উপস্থিত হন। গুণগ্রাহী ইন্দ্রনারায়ণ তাঁকে ১৭৪৭ খ্রীঃ কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে সভাকবি নিযুক্ত করে তাঁকে 'কবি রায়গুণাকর' উপাধি দান করেন। কবি এখানেই রাজার আদেশে 'অন্নদামঙ্গল' বচনা করেন। গুণগ্রাহী রাজাও গুণের পুরস্কার-স্বরূপ ভারতচন্দ্রকে প্রচুর ভূ-সম্পত্তি দান করেছিলেন। কবি ১৭৬০ খ্রীঃ বহুমূত্র রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

ভারতচন্দ্র দুইটি সত্যনাবায়ণেব পাঁচালী রচনা করেন, একটি হীবাবাম রায়ের আদেশে, অপরটি রামচন্দ্র মুন্সীর আদেশে। শেষেরটি রচনা করেন ১১৪৪ সনে। কৃষ্ণনগবে আসবার পর তাঁর প্রথম গ্রন্থ সংস্কৃতের অনুবাদঃ 'রসমঞ্জরী'। 'অন্নদামঙ্গল' রচিত হয, ১৬৭৪ শকাব্দে বা ১৭৫২ খ্রীঃ।

'বেদ লয়ে ঋষি বসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা ।।'

কবির গ্রন্থ তিনখণ্ডে বিভক্ত ঃ প্রথম খণ্ডে অন্নদামঙ্গল, দ্বিতীয় খণ্ডে বিদ্যাসুন্দর, তৃতীয খণ্ডে ভবানন্দ-মানসিংহ কাহিনী। অন্নদামঙ্গল প্রধানত পুরাণাশ্রিত। বিদ্যাসুন্দব লৌকিক কাহিনী এবং ভবানন্দ-মানসিংহ কাহিনী প্রধানত ঐতিহাসিক ঘটনার উপর ভিত্তি কবে বচিত।

কবি গ্রন্থোৎপত্তি-সম্বন্ধে বলেছেন যে, একদিকে দেবীর আদেশ, অপরদিকে বাজার আদেশ—এই উভয় আদেশের ফলেই তিনি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। যে অন্নপূর্ণা মহারাজকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন, সেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে সেই অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য-বর্ণনা করতেই অনুরোধ করেছিলেন — কাব্যের আদর্শ-হিশেবে কবিকঙ্কণের চণ্ডীর কথাও বিশেষভাবেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু চতুর কবি এই সঙ্গে অনেকগুলি উদ্দেশ্য সিদ্ধ কবতে চেষ্টা করেছেন। তিনি রাজার আদেশ-মত অন্নদামঙ্গল রচনা করেছেন, রাজার পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারকে কুবের-বংশজাত এবং দেবীর কৃপাপুষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন এবং রাজা ও তাঁর সভাসদ্‌দের মনোরঞ্জন করবার জন্য কৌশলে গ্রন্থের মধ্যে 'বিদ্যাসুন্দরে'র রোমাঞ্চকর কাহিনী সন্নিবিষ্ট করেছেন।

সমগ্র গ্রন্থের নাম 'অন্নদামঙ্গল' হলেও আসলে প্রথম খণ্ডই 'অন্নদামঙ্গল'। এতে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতই দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ থেকে আরম্ভ করে হরগৌরীর কোন্দল পর্যন্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই অংশে কবি প্রধানত কবিকঙ্কণ মুকুন্দের অনুসরণ করেছেন। এই অংশে শিবের কাশীপ্রতিষ্ঠা এবং ব্যাসকাহিনী অতিরিক্ত যোগ করা হয়েছে। এর পর হরি হোড়ের কাহিনী। দেবীর কৃপায় বড়গাছি গ্রামের বিষ্ণু হোড় পুত্ররূপে লাভ কবল হরি হোড়কে। হরি হোড় অতি দরিদ্র অবস্থা থেকে লক্ষপতি হলো। কিন্তু তাঁর পারিবারিক কলহের সুযোগ নিয়ে দেবী তাঁর গৃহত্যাগ করে আন্দুলিয়া গ্রামের ব্রাহ্মণ রাম সমাদ্দারের বাড়িতে উপনীত হলেন। রাম সমাদ্দারের পুত্র ভবানন্দ মজুমদারকে দেবী কৃপা করবেন, স্থির করলেন। এইখানেই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হয়েছে।

কাহিনী : ১

দ্বিতীয় খণ্ডে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীই প্রধান। এখানে কবি ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ টেনে এনে কাহিনীর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। প্রতাপাদিত্যকে দমন করবার জন্য মানসিংহ বর্ধমান এসেছেন। এখানে সুন্দরের সুড়ঙ্গ দেখে মানসিংহ তাঁর কানুনগো ভবানন্দ মজুমদারের নিকট এর কাহিনী জানতে চাইলেন। ভবানন্দ বিস্তৃতভাবে 'বিদ্যাসুন্দবে'র কাহিনী পরিবেষণ করলেন।

কাহিনী : ২

তৃতীয় খণ্ডে আবার পূর্ববর্তী অংশের সঙ্গে যোগসাধন করা হয়েছে। মানসিংহ যশোরে উপনীত হয়েছেন। তথায় দেবীর কৃপায় ও ভবানন্দের সহায়তা মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে দমন করলেন এবং উপাধি-দানের উদ্দেশ্যে ভবানন্দকে নিয়ে দিল্লী গমন করলেন। দিল্লীতে দেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হলো এবং দিল্লীশ্বরের নিকট থেকে ভবানন্দ 'রাজা' উপাধি লাভকরলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, এই ভবানন্দ মজুমদারই ভারতচন্দ্রের প্রতিপালক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ও রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। প্রথম খণ্ডের কাহিনীর সূত্রের সঙ্গে তৃতীয় খণ্ড যুক্ত ক'রে ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে 'কুবের' - অবতারে বংশধর বলে পরিতুষ্ট করতে চেষ্টা করেছেন, আর দ্বিতীয় খণ্ড যুক্ত হ'য়েছে প্রধানতঃ সভাসদ্‌দের মনসন্তুষ্টির জন্য।

কাহিনী : ৩

ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব সর্বাধিক প্রকাশ পেয়েছে গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে। এই খণ্ডে হরি হোড় ও ভবানন্দ-কাহিনী তাঁর স্বকল্পিত। অবশিষ্ট অংশ তিনি প্রধানত কবিকঙ্কণ, ঘনরাম ও স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ড থেকে গ্রহণ করেছেন। রচনার বহু অংশে কবিকঙ্কণ এবং ঘনরামের সঙ্গে বেশ মিল রয়েছে। তবে পূর্বোক্ত কবিদ্বয় যেমন ভক্তিভাব এবং আন্তরিকতার সাহায্যে পৌরাণিক কাহিনীসমূহ বর্ণনা করেছেন, ভারতচন্দ্রে তার একান্ত অভাব। তিনি দেবীর কৃপার অপেক্ষায় ছিলেন না। তিনি রাজার তুষ্টিবিধান এবং সভাসদ্‌দের মনোরঞ্জন করবার জন্যই কলম ধরেছিলেন। তাই, অনেকটা দায়সারা ভাবেই পৌরাণিক অংশ রচনা করেছেন। ভারতচন্দ্রের এই খণ্ড অপূর্ব। বিশেষত ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে যে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অশ্লীলতার অভিযোগ আনা হয়, আলোচ্য অংশ তা' থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। অধিকন্তু এই খণ্ডেই মুহূর্তের জন্য তিনি যে ঈশ্বরী পাটনীর আবির্ভাব ঘটিয়েছিলেন, তেমন সজীব চিত্র প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে কমই আছে।

প্রথম খণ্ডের বিচার

অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ড প্রধানত বিদ্যাসুন্দর হলেও এটি একান্তভাবেই বিদ্যাসুন্দর নয়। বিদ্যাসুন্দর মূল কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত একটি উপকাহিনী মাত্র। ভারতচন্দ্র অসাধারণ কুশলতায় পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনীকে যুক্ত করে তার মধ্যে আবার একটা লৌকিক কাহিনীকে সন্নিবিষ্ট করেছেন। ঘটনাক্রমে ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহের নিকট বিদ্যাসুন্দর কাহিনী ব্যক্ত করেছেন। এ বিষয়ে জনৈক গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন ঃ "বিদ্যাসুন্দর অন্নদামঙ্গলেরই অন্তর্গত উপকাব্য, কিন্তু ইহাব দেবতা অন্নদা নহে, কালিকা। কাহিনী বৈধ নহে, অবৈধ, প্রেম এবং রসও পৃথক, হাস্য নহে, আদি। উভয়ের মধ্যে সত্যকার আন্তরিক যোগ কিছুমাত্র নাই। ইহার নিরাপত্তা আশঙ্কা করিয়াই কবি ইহাকে অন্নদামঙ্গলের আশ্রয়ে রাখিয়াছেন কিন্তু ফল হইয়াছে বিপরীত। বিদ্যাসুন্দরের জনপ্রিয়তা হইয়াছে বেশী, আশ্রিতই আশ্রয়দাতাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এই জনপ্রিযতার মূল বিদ্যাসুন্দরেব বিষয়বস্তুর মধ্যেই নিহিত। এইরূপ উত্তেজক রোমান্স প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে আর নাই।"

দ্বিতীয় খণ্ডের বিচার

বাঙলা ভাষায় যত বিদ্যাসুন্দর রচিত হয়েছে, তাদের মধ্যে ভারতচন্দ্রের কাব্য যে শুধু শ্রেষ্ঠ তাই নহে, ভারতচন্দ্র অনতিক্রমণীয়। তৎসত্ত্বেও ভারতচন্দ্রের অখ্যাতিও বিদ্যাসুন্দরের জন্যই। তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ—অশ্লীলতা। কিন্তু এর জন্য ভারতচন্দ্রকে দায়ী করা সম্ভবত সঙ্গত নয। কারণ অশ্লীলতা ভাবতচন্দ্রের ভাষায় নয়, অশ্লীলতা রয়েছে কাহিনীর গঠনে। যিনিই বিদ্যাসুন্দর রচনা করেছেন, তাঁর কাব্যেই অশ্লীলতা দেখতে পাওয়া যায়। অপরেরা অল্প ক্ষমতাবশত ভাষাকেও অশ্লীল করে তুলেছেন। এ বিষযে ভারতচন্দ্রের কৃতিত্বের পরিচয় দিতে গিযে ডঃ ভট্টাচার্য লিখেছেন ঃ "ভাষাগত অশ্লীলতা বা গ্রাম্যতা ভারতচন্দ্রে একেবারেই নাই, তাঁহার মধ্যে যে অশ্লীলতা আছে, তাহা ভাব বা অর্থগত অশ্লীলতা; তাহাবও প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে কোনও প্রত্যক্ষতা (directness) ছিল না। অশ্লীলতা যে সাহিত্যিক শিল্পসাধনার বিষয় তাহা ভারতচন্দ্রের রচনাতেই প্রথম বুঝিতে পারা গেল।" এই বিষয়ে বিখ্যাত সমালোচক প্রমথ চৌধুরীর উক্তিটিও স্মরণীয়। "ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার ভিতর আর্ট আছে, অপরের আছে শুধু 'ন্যেচার'।" বস্তুত ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর আদর্শ নাগরিক সাহিত্য—গালাগালি দিতে গিয়াও ভারতচন্দ্র গ্রাম্যতার সহায়তা গ্রহণ করেন নি।

অশ্লীলতাব পরিচয়

বিদ্যাসুন্দরের চরিত্র-সৃষ্টিতে ভারতচন্দ্র বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলি জীবন্ত নহে, যেন 'সুবর্ণপুত্তলী'। এদেরই মধ্যে উল্লেখযোগ্য হীরা মালিনী। তার কথায় হীরার ধার বুড়া বয়সেও কিছু ঠাট বজায় রয়েছে, তবু তা কৃত্রিমতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে নি। হীরাও একটি type হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কেউ কেউ অনুমান করেন, রাজবংশের সন্তান ভারতচন্দ্রকে বহু দুঃখকষ্ট বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে অন্নসংস্থান করতে হয়েছিল বলেই অভিজাত ধনিকদের সম্বন্ধে তাঁর মনে একটা চাপা বিদ্বেষের ভাব বর্তমান ছিল। বিদ্যাসুন্দর রচনা করতে গিয়ে তিনি অতি কৌশলে সেই

বিদ্বেষকে চরিতার্থ করেছেন। স্যাটায়ারের সাহায্যেই তিনি উদ্দেশ্যে উপনীত হতে চেষ্টা করেছেন, হয়তো বা তাঁর ব্যক্তি-জীবনের বহু তিক্ত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন এই রূপকের সাহায্যে। তবে এখানে একটা রূপক-ধর্মিতাও আবিষ্কার করা যায়। রাজার এবং সভাসদদের সম্মুখেই রাজান্তঃপুরের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে আপন মনে যেন একটি হিংস্র উল্লাস অনুভব করেছিলেন। অবশ্যই এই ধারণা আরোপিতও হতে পারে।

রূপক ও স্যাটায়ার

অন্নদামঙ্গলের তৃতীয় খণ্ড বা ভবানন্দ-মানসিংহ কাহিনী খণ্ডত্রয়ের মধ্যে সর্বাধিক দুর্বল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দের প্রশস্তিবন্দনার উদ্দেশ্য নিয়ে কবি এই খণ্ডটি রচনা করেছেন। মনে হয়, এর উপর বিশেষত্ব ও গুরুত্ব আরোপ করবার জন্যই তিনি এতে একটা ইতিহাসের প্রলেপ দিয়েছেন। সমসাময়িক যুগের ভারত-বিখ্যাত মুঘল-সেনাপতি রাজা মানসিংহ এবং বাঙলার বার ভূঁইঞার অন্যতম প্রতাপাদিত্য ঐতিহাসিক পুরুষ। কবি দেখিয়েছেন যে এতদুভয়ের মধ্যে যখন যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তখন ভবানন্দ মজুমদার রাজা মানসিংহকে সহায়তা করেন এবং প্রত্যুপকাব-স্বরূপ মুঘল দরবার থেকে 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মানসিংহ ও প্রতাপাদিত্যের মধ্যে যুদ্ধের কথা অস্বীকার করেন। মনে হয়, বিভিন্ন সূত্র থেকে সাবধানতা সহকারে তথ্য বাছাই করতে পারলে ভারতচন্দ্র প্রকৃত ইতিহাসই রচনা করতে পারতেন। কিন্তু, ভারতচন্দ্রের ইতিহাস-রচনার প্রবণতা কিংবা দায় কিছুই ছিল বলে মনে হয় না। তিনি প্রায় লোকশ্রুতিতে নির্ভর করেই এই কাহিনীটি রচনা করেছেন। ফলে এতে ইতিহ?সর মর্যাদা রক্ষিত হয় নি। অন্য কোন দিক দিয়েও এই খণ্ডের উৎকর্ষ প্রমাণিত হয় না। কাহিনীও জমাট-বাঁধা নয়, ইতস্তত-বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি কোন ঐক্যসূত্রে বিধৃত নয়। চরিত্র সৃষ্টিতেও কবি বিশেষ পারঙ্গমতা দেখাতে পারেন নি। ফলে অন্নদামঙ্গলের তৃতীয় খণ্ডই সর্বাধিক অপঠিত থেকে গিয়েছে।

তৃতীয় খণ্ডের বিচার

কবি-প্রতিভা পরিচয় ঃ সামগ্রিক বিচারে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কাব্য। একমাত্র কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলকে বাদ দিলে সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের অপর কোন মঙ্গলকাব্যই এর সমকক্ষতা দাবি করতে পারে না। ভারতচন্দ্র বিভিন্ন ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করেছিলেন এবং বহুতর গ্রন্থও পাঠ করেছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি তার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করেছেন। তাঁর সর্বতোমুখী জ্ঞানের সঙ্গে স্বভাবসিদ্ধ কবিত্বশক্তি যুক্ত হবার ফলেই তাঁর রচিত কাব্য অসাধারণ জনপ্রিয়তা-অর্জনে সক্ষম হয়েছে। কবি যদি কাব্যে কেবল প্রাণসৃষ্টি করতে পারতেন, তবে তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' অপ্রতিদ্বন্দ্বী হবার সুযোগ পেতো।

কবিরা ক্রান্তদর্শী হয়ে থাকেন, কবি ভারতচন্দ্রও তাই শুধু যুগধর্মকেই স্বরূপে উপলব্ধি করেন নি, তিনি আগামী যুগেরও আভাস পেয়েছিলেন। তাই অন্তঙ্গতমহিমা দেব-দেবীর মাহাত্ম্য-কীর্তন অপেক্ষাও মানবধর্মের উপস্থাপনাকেই কবি স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি রাজনির্দেশে অন্নপূর্ণাকে প্রতিষ্ঠিত করলেও স্বীয় অন্তরের নির্দেশে তাঁকে মানবিক গুণে বিভূষিত করেছিলেন। হরগৌরীর সংসার বর্ণনার যে চিত্র ভারতচন্দ্র অঙ্কন করেছেন, তাতে দেবাদিদেব মহাদেব এবং আদ্যাশক্তি পরমাপ্রকৃতি ভগবতীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না—এটি একান্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের হরঠাকুর আর গৌরীঠাকুরুণের দিনযাপনের গ্লানিময় চিত্র। হরগৌরীর বিবাহের যে চিত্র বর্ণনা করেছেন কবি, মানবসংসারের পক্ষেও তা কুৎসিত এবং ঘৃণ্য বিবেচিত হবে। এখানে শুধু শিবের কদর্য দিক্‌টিই উপস্থাপিত হয়নি, এতে সমভাবেই অংশগ্রহণ করেছেন বৈকুণ্ঠপতি স্বয়ং বিষ্ণুও। হরগৌরীর কোন্দলে পরস্পরের প্রতি দোষারোপে নিম্নবিত্ত ও নিত্য-অভাবগ্রস্ত মানবসংসারের একটা চিরন্তন রূপই জাজ্জ্বল্যমান হয়ে ওঠে।

যুগধর্ম

বস্তুত মঙ্গলকাব্য রচনার দায় ঘাড়ে পড়েছিল বলেই ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যে বিভিন্ন দেবদেবীর অবতারণা করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি ছিল সর্বক্ষণই মাটির পৃথিবীর দিকে। তাই তিনি প্রায় সমসাময়িক একটি ঐতিহাসিক কাহিনী এবং একান্তভাবেই ধর্মসম্পর্কবিহীন অপর একটি কাহিনীকে মূলগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করে নিজের মানবমুখিতার পরিচয় দিয়েছেন। সম্ভবত একমাত্র গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' ব্যতীত অপর কোন গ্রন্থই এর পূর্বে রচিত হয়নি। এটির সঙ্গে ভারতচন্দ্রের পরিচয় থাকার সম্ভাবনা নেই। কবির এই দৃষ্টিভঙ্গিতে রয়েছে আধুনিকতার প্রতিচ্ছবি, মানবিকতার স্বচ্ছ প্রকাশ। ভারতচন্দ্র একটা অবক্ষয়ের যুগে জন্মগ্রহণ করে যুগধর্মকে স্বরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং সেই সমাজে বাস করলেও তিনি সমাজের দোষত্রুটিগুলিকে বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এই প্রভাব পড়েছিল দেবদেবীদের চরিত্রেও, তাই 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের বিভিন্ন দেব-দেবী চরিত্রও মানবভাবাপন্ন, মানবিক দোষ-গুণে পূর্ণ। ত্রিকালজ্ঞ ঋষি ব্যাসদেবকে নিয়েও তাই রঙ্গসিকতা করতে কবিব একটুও বাধে না।

আধুনিকতা

বস্তুতঃ কবি ভারতচন্দ্রের এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই আমরা আধুনিক যুগের লক্ষণ খুঁজে পাই — যে যুগে দেবতা কিংবা আধ্যাত্মিকতা আর সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠতে পারে নি, মানুষ এবং ঐহিকতাই শুধু সাহিত্যের বিষয়রূপে গৃহীত হয়েছিল। এই ঐহিকতা এবং মানবিকতাবোধ যে ভারতচন্দ্রের উপর আরোপিত নয়, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ভারতচন্দ্র-অঙ্কিত বাঙলা সাহিত্যের অমর চিত্র ঈশ্বরী পাটনী চরিত্র। দেবীর পাদস্পর্শে লোহার সেউতি যখন সোনার সেউতিতে পরিণত হলো তখন সেই নারীর দেবীত্বে ঈশ্বরী পাটনীর নিশ্চিতই কোন সন্দেহ ছিল না, অথচ তার প্রার্থনায় ছিল না স্বর্গসুখের কামনা কিংবা দেবীর চরণ প্রসাদ, সে শুধু চাইল 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'—আধ্যাত্মিকতা-বিমুক্ত এমন ঐহিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী তো ঈশ্বরী পাটনী নয়, যিনি এর অধিকারী, তিনি ঈশ্বরী-পাটনীর স্রষ্টা যুগন্ধর কবি ভারতচন্দ্র।

ঐহিকতা বোধ

বিভিন্ন ভাষায় ভারতচন্দ্রের পাণ্ডিত্যের কথা বলা হয়েছে। বস্তুত সে যুগের অপর কোনও কবিরই বিভিন্ন ভাষার উপর এতখানি অধিকার ছিল বলে জানা যায় না। তিনি যেমন খাঁটি সংস্কৃত ভাষায় কবিতা রচনা করেছেন, তেমনি 'যাবনী-মিশাল' ভাষাতেও সমান কৃতিত্বের পরিচয় দান করেছিলেন। যেখানে যে ভাষাটি সর্বাধিক উপযোগী হবে, সেখানে সেই ভাষাটিই তিনি ব্যবহার করেছিলেন। কাব্যের মূল সত্যটি তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি ভাষা-সম্বন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন :

পাণ্ডিত্য

'যেহোক সেহোক ভাষা কাব্য রস লয়ে।'

'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে কবি অকৃপণ হস্তে রস পরিবেশন করেছেন, হয়তো রস একটু কড়াপাক হয়ে গেছে, কখনো বা গেঁজে গিয়েছে।

শুধু বিভিন্ন ভাষাজ্ঞানে নয়, ভাষা-শিল্পে, ছন্দে ও অলঙ্কারে ভাষাকে সুসজ্জিত করে তোলার এমন সযত্ন সার্থক প্রয়াস সমগ্র মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে আর দেখা যায় না। ভাব ও প্রয়োজন-অনুযায়ী শব্দের সুনিপুণ নির্বাচন, একই সঙ্গে সংস্কৃত বাঙলা হিন্দী ও ফার্সী বাগ্‌ভঙ্গির মিশ্রণ ও প্রয়োগ, বাঙলা সর্বপ্রকার ছন্দের প্রয়োগ এবং বিভিন্ন শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার ব্যবহারে কুশলতা তাঁর কাব্যকে বস্তুতঃ অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলেছে। বাঙলার ত্রিবিধ ছন্দের সচেতন ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের পূর্বে একমাত্র ভারতচন্দ্রের কাব্যেই পাওয়া যায়।

ভাবগূঢ় ব্যঞ্জনাময় বাক্য-রচনায় ভারতচন্দ্র প্রকৃতই অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর রচিত বহু পদই প্রবাদবাক্যের মর্যাদা লাভ করেছে। এই সৌভাগ্য বাঙলার অল্প কবির কপালেই জুটেছে। 'বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী', 'খুএঞা তাঁতী হয়ে দেহ তসরেতে হাত', 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন', 'হাবাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়'—ইত্যাদি অসংখ্য ভারতচন্দ্রীয় পদ এখনও লোকের মুখে মুখে ফিরে থাকে।

ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যের বিভিন্ন অধ্যায়ের গোড়ায় কিছু কিছু 'বিষ্ণুপদ' যোগ করেছেন। এই কবিতাগুলি যে শুধু বৈষ্ণব পদাবলীরই সমধর্মী, তা নয়—এদের মধ্যে আধুনিক যুগের গীতিকবিতারও পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

'কমল পরিমল লয়ে শীতল জল
পবনে ঢল ঢল উছলে কূলে।
বসন্ত রাজা আজি ছয় রাগিণী রাণী
করিলা রাজধানী অশোকমূলে।'

—অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ৭ মাত্রার পর্ব একালে অভাবনীয়।

ভারতচন্দ্র অনেকগুলি খণ্ডকবিতা রচনা করেছিলেন। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে চর্যাপদ, মধ্যযুগে বৈষ্ণব পদ ও শাক্ত পদ এরূপ খণ্ড কবিতা হলেও প্রত্যেকটি ধর্মীয় ভাবনা-যুক্ত। কিন্তু ভারতচন্দ্র-রচিত কবিতাগুলি প্রকৃতি-বিষয়ক অথবা ভাবমূলক, কিন্তু বর্ণনা প্রধান। অর্থাৎ দেবতা বা ধর্মভাবনা বর্জন করে মানবিক অথবা প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতা দ্বারা তিনি আধুনিকতার দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন, পরে ঈশ্বর গুপ্ত ঐ ধারাতে অগ্রসর হয়েছিলেন। এ দিক থেকেও ভারতচন্দ্র ছিলেন অনন্য।

খণ্ডকবিতা

(ক) রাজসভার কবি ভারতচন্দ্র ঃ দ্বাদশ শতকে গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেব গোস্বামী এবং চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে মিথিলাধিপতির সভাকবি বিদ্যাপতির পর সুনির্দিষ্টভাবে রাজসভার কবিরূপে আমরা পাই রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রকে, যিনি অর্ধবঙ্গেশ্বর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। এই তিনক্ষেত্রেই দেখা যায় যে এরা যে বাজসভার কবি ছিলেন, এই ঐতিহাসিকতার চেয়েও অনেক বেশি তাৎপর্য বহন করছে তাঁদের কাব্যসম্পদ, যা প্রকৃতই রাজসভার উপযোগী হয়ে গড়ে উঠেছে। কাব্য-বিচারে ইতিহাসের যথার্থতাও মূল্যহীন বিবেচিত হবে, যদি না রসের বিচারে এঁদের কাব্য রাজকণ্ঠের মণিমালা হয়ে উঠতে পারে। আলোচনাক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র-প্রসঙ্গে কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর মাথায় শিরোপা পরিয়ে দিয়েছেন, দুর্ধর্ষ সমালোচক প্রমথ চৌধুরী ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' তথা বিদ্যাসুন্দব কাব্যকে বলেছেন, "রাজার বিলাসভবনের পাঞ্চালিকা—সুবর্ণে গঠিত, সুগঠিত ও মণিমুক্তায় অলঙ্কৃত।"

বাজকণ্ঠের মণিমালা

ব্যক্তিগত জীবনে ভাবতচন্দ্রও ছিলেন একজন ভাগ্যহত রাজপুত্র, রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্যে নানা দেশে ঘুরে ফিরে অবশেষে মহাবাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহ লাভ করেন। ইতিমধ্যে স্বীয় মেধা এবং পরিশ্রমের বিনিময়ে তিনি বিভিন্ন ভাষা ও বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন কবেন। ভারতচন্দ্রের কবিপ্রতিভার পরিচয় পেয়ে মহারাজ তাঁকে স্বীয় উপাস্যা দেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য-প্রচারের নির্দেশ দিলে কবি 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনায ব্রতী হন। ক্রান্তদর্শী কবি বুঝেছিলেন, অবসিতপ্রায় মধ্যযুগের অন্তে নবযুগের সূচনার আব বিশেষ দেরি নেই—তাই গতানুগতিক পন্থায় রচিত মঙ্গলকাব্য রাজার কিংবা তাঁব নাগরিক সভাসদ্‌গণের বিশেষ মনঃপূত হবে না। তাই তিনি 'অন্নদামঙ্গল কাব্য'কে নবরূপ দান করেন। তিনি আরও বুঝেছিলেন যে পৃষ্ঠপোষক মহারাজকে সন্তুষ্ট করতে পারলে ইহজীবনেব দুঃখ-দুর্দশার হাত থেকে নিস্তাব পেতে পারেন। তাই তিনি এক অভিনব প্রক্রিয়াব মঙ্গলকাব্য রচনায় ব্রতী হন। দেবী অন্নপূর্ণাব মাহাত্ম্য-রচনার উপলক্ষেই তিনি কৌশলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারকে কুবের-বংশোদ্ভূতরূপে কাব্যের কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে দেন এবং রাজপারিষদ্‌বর্গের মনস্তুষ্টিব উদ্দেশ্যে অধিকতর কৌশলে কামকলাপূর্ণ 'বিদ্যাসুন্দর' কাহিনীকেও মূল কাহিনীব অন্তর্ভুক্ত কবে দেন। ফলতঃ নাগরিকতাধর্মী অথচ অবক্ষয়িত যুগধর্মের লক্ষণসমূহ যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় 'অন্নদামঙ্গল কাব্যে'। 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' রাজাব এবং বাজসভাব পারিষ্‌দবর্গের মনোমত্‌ রূপ লাভ করে হ'য়ে উঠলো প্রকৃত রাজসভার কাব্য।

নবযুগের আভাস

'অন্নদামঙ্গল' যে শুধু বিষয়গুণেই রাজসভার যোগ্য হ'য়ে উঠেছে তা নয়। রাজসভার ঐশ্বর্য, আড়ম্বর এবং জাঁকজমকও প্রতিফলিত হয়েছে কাব্যের বাহ্য প্রকরণের সাহায্যে। ছন্দ, অলঙ্কার এবং ভাষা ব্যবহারে ভারতচন্দ্র এমন এক উচ্চমানে উন্নীত হয়েছেন, তা একান্তভাবেই নাগরিকতাধর্মী এবং রাজসভারই যোগ্য। গ্রাম্যজীবনের পরিচায়ক অপরাপর মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে অন্নদামঙ্গলের এখানেই বড় পার্থক্য।

ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ পরিচয় শব্দ-শিল্পীরূপে। ছন্দে-অলঙ্কারে তিনি কাব্যকে বস্তুতই রাজসভার উপযোগী ক'রেই সাজিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, "রাজসভা কবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান, রাজকণ্ঠের মণিমালার মত, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য।" ছন্দে ভারতচন্দ্র যে বৈচিত্র্য ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন, তৎপূর্ববর্তী কেন, তৎপরবর্তীও অঙ্গুলিমেয় কয়েকজন ছাড়া সারা বাঙলা সাহিত্যে তাঁর জুড়ি নেই। বাঙলা অক্ষরবৃত্ত পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দেই তিনি অধিকাংশ পদ রচনা করেছেন। এমন নিখুঁত মিল বা অন্ত্যানুপ্রাস তৎকালে খুব কমই দেখা গেছে। আবার পয়ারের মধ্যেও মালঝাঁপ-আদি অন্তর্ভুক্ত করে তিনি যথেষ্ট বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। খাঁটি সংস্কৃত ভুজঙ্গপ্রয়াত, তোটক-আদি বিভিন্ন ছন্দকেও কবি অপূর্ব কৌশলে বাঙলা ভাষায় রূপায়িত করেছেন। এই ছন্দকে আধুনিক পরিভাষায় বলা হয় 'প্রত্নমাত্রাবৃত্ত ছন্দ'। আবার ভাবের অনুসারী করে ছন্দ ব্যবহার করায় তাঁর রচনা অসাধারণ কাব্যোৎকর্ষ লাভ করেছে। এমনকি আধুনিক স্বরবৃত্ত বা ছড়ার ছন্দ অর্থাৎ তাৎকালিক ধামালী ছন্দের ব্যবহারেও কবি নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। অলঙ্কার-ব্যবহারেও কবির ক্ষমতা ছিল নিরঙ্কুশ। তাঁর রচিত অনেকগুলি পদই বাঙলা অলঙ্কারের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত-হিশেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অনুপ্রাস, যমক, ব্যতিরেক এবং ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারেই কবির বিশেষ প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দী-মিশ্রিত বাঙলা কবিতা রচনায়ও কবি সার্থকতা লাভ করেছেন।

শব্দ-শিল্প ছন্দ-অলঙ্কার

ভাষাব্যবহারেও ভারতচন্দ্রের কুশলতা অতুলনীয়। প্রয়োজনবোধে তিনি রসসৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'যাবনী মিশাল' ভাষা যেমন ব্যবহার করেছেন, তেমনি আবার একই স্তবকে বাঙলা, হিন্দী, ফার্সী ও সংস্কৃত বাক্য ব্যবহার করে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বাঙলা সাহিত্যে এ জাতীয় রচনার দ্বিতীয় নিদর্শন নেই।

ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব-বিচারে তাঁর সম্বন্ধে উল্লেখ্য কথা—তিনি ছিলেন হাস্যরসিক, ব্যঙ্গ -নিপুণ একজন উঁচুদরের স্যাটায়ারিষ্ট। সামাজিক কুপ্রথা এবং অভিজাত-জীবনের নানাপ্রকার অসঙ্গতির প্রতি বক্রোক্তি-নিক্ষেপে তিনি একজন নিপুণ শিল্পী ছিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে তিনি দেবতার কৃপাপ্রার্থী ছিলেন না, ফলে তাঁর ব্যঙ্গবাণ থেকে দেবতারাও নিস্তার পান নি। "খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা সাহিত্যে সর্বসংস্কারমুক্ত যে যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, ভারতচন্দ্রের ব্যঙ্গপ্রধান রচনার ভিতর দিয়াই তাহার প্রথম সোপান রচিত হইয়াছিল। . . . . তাঁহার ভক্তিহীন ব্যঙ্গোক্তি, তাঁহার সর্বব্যাপী ও সুগভীর সামাজিক অভিজ্ঞতা প্রভৃতির ভিতর দিয়া তিনি তাঁহার 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে তাঁহার ব্যক্তি- প্রতিভার ছাপ মুদ্রিত করিয়া দিয়া মঙ্গলকাব্যের যুগাবসান ঘটাইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে এই বিশেষত্বগুলি তাঁহার ঐহিক প্রীতির নিদর্শনরূপে গণ্য হইবার মর্যাদা লাভ করিয়া তাহাকে আধুনিক যুগেরও অগ্রদূত বলিয়া নির্দিষ্ট হইবার যোগ্যতা দান করিয়াছে।" (ডঃ ভট্টাচার্য)

হাস্যরস

(খ) যুগসন্ধির কবি ভারতচন্দ্র ঃ রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে সমাজ-শিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র, বলতে গেলে, প্রায় একটিও প্রশস্তি বাক্য উচ্চারণ করেন নি, কিন্তু একটি সার কথা বলে গেছেন ঃ "One other great distinction, however must be accorded to Bharat Chandra. He is the father of modern Bengali." সম্ভবতঃ এই উক্তিটি দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিপন্ন করতে চাইছেন যে ভারতচন্দ্র ছিলেন আধুনিক বাঙলার জনক— বাঙলা সাহিত্যের নয়, সম্ভবতঃ বাঙলা ভাষার। কিন্তু ভারতচন্দ্রের সাহিত্যেও যে আধুনিকতার ছায়াপাত ঘটেছে, তেমন মন্তব্যও অপ্রচুর নয়। পাদ্রী ওয়েঙ্গার ভারতচন্দ্রের কাব্যকে বলেছেন, 'রোম্যাণ্টিক', প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, 'Secular' বা 'ঐহিক', প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, 'Romantic Satire'— বস্তুত এই সবই তো আধুনিকতার লক্ষণ।

আধুনিকতার জনক

অপর কোন কোন সমালোচক আরও স্পষ্ট ভাষায় ভারতচন্দ্রকে 'যুগসন্ধির কবি' বলেই আখ্যায়িত করেছেন। এ বিষয়ে সুপণ্ডিত ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের অভিমত উল্লেখযোগ্য। "ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে এই 'যুগসন্ধির কবি' আখ্যাটি সবদিক হইতেই অতি সুপ্রযুক্ত বলিয়া মনে হয়। মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের মাঝখানে আবির্ভাব হইয়াছিল ভারতচন্দ্রের, তাঁহার কাব্য কাব্যসৃষ্টিতে পরস্পর জড়িত হইয়া রহিয়াছে অস্তগামী এবং উদয়োন্মুখ, এই দুই যুগেরই প্রধান লক্ষণগুলি।" বস্তুতঃ ভারতচন্দ্র বিষয়ে এই উক্তি যথার্থ এবং বিচারসহ।

প্রমথনাথ বিশী একান্তভাবে সাহিত্যধর্মের নিরিখে বিচার করতে গিয়ে বলেছেন, "ভারতচন্দ্রই প্রথম মঙ্গলকাব্যপ্রণেতা যিনি সাহিত্যধর্মের সহিত নিজস্ব কবিপ্রতিভার সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন। সেইজন্যই তিনি মঙ্গলকাব্যের আদি কবি। ইতিহাসের তারিখ হিসাবে দেখিলে তাঁহাকে প্রায় শেষ মঙ্গলকাব্য রচয়িতা বলা যাইতে পারে।" তিনি অন্যত্র বলেছেন, "ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের আদি কবিও বটে, শেষ কবিও বটে।"

বৈজ্ঞানিক সমালোচনা-বুদ্ধির নিরিখে বিচার করে গোপাল হালদার বলেছেন, "ভারতচন্দ্রকে আধুনিক যুগের কবি বলাও অসম্ভব, মধ্যযুগের শেষ কবি বলাও দুঃসাধ্য। তাঁর মনের গড়নে আবেগ-বাহুল্য নেই — সেখানে বুদ্ধির প্রাখর্যই প্রবল, ধর্মবোধে তিনি ভারাক্রান্ত নন, দেবদেবীরা মানব-মানবীর মতোই তাঁর নিকটে রসিকতার উপাদান। ঐহিকতা (Secularity) তাঁর চিন্তার ও কাব্যের স্বাভাবিক গুণ। . . . এই বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য, এই ঐহিকতাবাদ ও প্রণয়রচনায় বাস্তবতাবাদ—আধুনিক কালধর্ম"; — বস্তুতঃ মনীষী সমালোচক এখানে ভারতচন্দ্রের রচনায় আধুনিকতার সুস্পষ্ট লক্ষণই দেখতে পেয়েছেন।

ইতিহাসের বিচারে বাঙলা সাহিত্য তথা ভারতীয় সাহিত্যে আধুনিকতা প্রবর্তিত হয়েছে মাত্র উনিশ শতকের গোড়ার দিকে—বিশ্বসাহিত্যেও মাত্র তার কয়েক বছর পূর্বে। আঠারো শতকের শেষ পাদে ফরাসি বিদ্রোহ এবং ইংরেজি সাহিত্যে রোম্যাণ্টিকতার পুনর্জাগরণের মধ্য দিয়েই সাহিত্যজগতে আধুনিকতার সূত্রপাত। কাজেই আঠার শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ভারতচন্দ্রকে আধুনিক কবি বললে কালাতিক্রমণ দোষ স্পর্শ করে। কিন্তু আধুনিকতা বলতে

তো সন তারিখ বোঝায় না। আধুনিকত্তার লক্ষণ কতকগুলি মানসিকতা বা মনোভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করে। ভারতচন্দ্র যে কালে বর্তমান ছিলেন, সেকালে একদিকে যেমন অবক্ষয়িত মুঘল যুগের চরম দশা, অন্যদিক তেমনি বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্য জাতির আগমনে নোতুন সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে। তাই, ভারতচন্দ্রের রচনায় এই উভয় যুগধর্মের ছায়াপাত ঘটবে—এইটেই একান্তভাবে স্বাভাবিক। ভারতচন্দ্র গতানুগতিকভাবেই মঙ্গলকাব্য লিখতে বসেছিলেন, কিন্তু আসলে এটি ছিল ছদ্মবেশী সাহিত্য—তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যে মঙ্গলকাব্যেব আভাস বা ঢং ছাড়া আর কিছু নেই। 'দেবদেবী বন্দনা' থেকে আরম্ভ করে 'সৃষ্টি কাহিনী, বারমাস্যা, পতিনিন্দা,' প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যের বাহ্য অলঙ্করণ বা ঠাট এখানে পুরোমাত্রায় বজায় রয়েছে, নেই শুধু মঙ্গলকাব্যের প্রাণ। কেউ কেউ 'অন্নদামঙ্গল কাব্য'কে সম্পূর্ণ মজলিশী রচনা বা সভাসাহিত্যরূপেই অভিহিত করেছেন। অতএব ভারতচন্দ্রকে আমরা একান্তভাবে প্রাচীন বা মধ্যযুগের কবি বলেও গ্রহণ করতে পারছিনে। তাঁর কাব্যেই প্রথম সুস্পষ্টভাবে আধুনিক নাগরিক সাহিত্যের তথা ব্যক্তিসাহিত্যের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে বলেই আধুনিকতার নিরিখেও এর বিচার আবশ্যক।

প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হয় যে মননধর্মিতা, আধ্যাত্মিকতার পরিবর্তে ঐহিকতা, একান্তভাবে আত্মময়তা, ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কিংবা প্রকৃতিপ্রেম বা বিশুদ্ধ সৌন্দর্যচেতনা-আদি আধুনিকতার সুস্পষ্ট লক্ষণ ভারতচন্দ্রের কাব্যে সহজলভ্য নয়, কিন্তু যা আছে, তাই বা কম কিসে ! দেবদেবীর মাহাত্ম্য-প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হোলেও অন্নদামঙ্গল কি একান্তভাবেই মানবধর্মী কাব্য নয়? এর দেবদেবীদের জীবনযাত্রায় সাধারণ মানুষের ধর্মই প্রকাশিত। হরগৌরীর কাহিনীতে ও ব্যাসদেবের কাহিনীতেও মানুষের জয়গানই ঘোষিত হয়েছে। ঈশ্বর পাটনীর 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে'—এই একটি মাত্র কথাতেই শাশ্বত মানব-আর্তিই আধুনিকতার স্বরূপে উদ্‌ঘাটিত। কাজেই ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রধান গুণ-রূপে পাওয়া যাচ্ছে ধর্মীয় আবেগকে নয়, মানবিক আবেদনের ঐকান্তিকতা।

ভারতচন্দ্রের ইতিহাস-চেতনাও আধুনিকতার বিষয়বস্তু। সমসাময়িক কালের ইতিহাসকে তিনি সাহিত্যের বিষয় করে তুলেছেন। সমসাময়িকতা তথা সমাজচেতনার দিক থেকে বাঙলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্রই আদিপুরুষ। অবশ্য এই সমাজচেতনা মানবজীবনকে কেন্দ্র করেই প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুতঃ প্রাগাধুনিক বাঙলা সাহিত্যে নাগরিকতাবোধের জন্মও ভরতচন্দ্রের হাতেই।

গীতিকবিতাকে আধুনিক যুগের ফসল-রূপেই চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে যে কয়টি গান তথা 'বিষ্ণুপদ' বর্তমান রয়েছে, ঐগুলির মধ্যে মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র কি অস্ফুট আভাষ পাওয়া যায় না ? ভারতচন্দ্রের কাব্যে মধ্যযুগেরও আধুনিক যুগ-লক্ষণের যুগপৎ উপস্থিতি তথা যুগসন্ধির কবিরূপে ভারতচন্দ্রের স্বীকৃতি-বিষয়ে অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্য বলেন, "বিদ্যাসুন্দরের ভাষায় এমন একটা বুদ্ধি-দীপ্ত, সরল বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, অলঙ্কৃতি ও পরিচ্ছন্নতা আছে যাহা কেবল নাগরিক সংস্কৃতিরই ফল। . . . বিদ্যাসুন্দর কাব্যে

কবির বস্তুনিষ্ঠা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সূচনার জন্যই ভারতচন্দ্রকে বলিতে হয় সন্ধিযুগের কবি।" ভারতচন্দ্রের সম্বন্ধে সর্বশেষ কথা—তাঁর আসাধরণ প্রতিভা-সত্ত্বেও তিনি যুগকে সৃষ্টি করতে পারেন নি, কিংবা যুগকে অতিক্রম করতে পারেন নি, তিনি যুগেরই সৃষ্টি এবং যুগসন্ধির কবি।

অপ্রধান কবিগণ : আরও কয়েকজন কবি 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেছিলেন। ভারতচন্দ্রের সমসময়ে নিধিরাম আচার্য নামে একজন কবি 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য' রচনা করেছিলেন। কবির উপাধি ছিল কবিরত্ন, সম্ভবতঃ তিনি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। দ্বিজ রাধাকন্তের 'কালিকামঙ্গল' কাব্যে আধুনিকতার প্রভাব সুস্পষ্ট। সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্রের প্রভাবেই তিনি কাব্য রচনা করেছিলেন। প্রাণরাম চক্রবর্তী সম্ভবতঃ ১৬৬৬ খ্রীঃ তাঁর কাব্য রচনা করেন। কিন্তু গ্রন্থের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কবীন্দ্র-ভণিতাযুক্ত 'কালিকামঙ্গলে' ভারতচন্দ্রেব প্রভাব নেই, অতএব তিনি তৎপূর্ববর্তী কালের হতে পারেন। তাঁর কাব্যে বৈষ্ণব-প্রভাব লক্ষণীয়।

কালিকামঙ্গলের দুইটি স্পষ্ট ধারার পবিচয় পাওয়া যায়। একটি পশ্চিমবঙ্গের, অপরটি প্রধানত চট্টগ্রামের। চট্টগ্রামের ধারায় কালিকার প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশি, ফলত এতে কিছুটা ধর্মীয় ভাবও বর্তমান, মনে হয এই ধারাটিই প্রাচীনতর। পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যাসুন্দরেব কাহিনীই প্রাধান্য লাভ করেছে। এতে অষ্টাদশ শতাব্দীর নাগরিক জীবনের বিলাসিতাকেই প্রশ্রয় দান করা হয়েছে।

[ছয়] অপ্রধান মঙ্গলকাব্য

বাঙলা সাহিত্যে 'মঙ্গলকাব্যে'র উদ্ভব, পটভূমিকা ইত্যাদি সম্বন্ধে ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এতে একট কথা স্পষ্ট হয়েছে যে প্রধানত লৌকিক গ্রামদেবতাদেব মাহাত্ম্য-কীর্তনই মঙ্গলকাব্যগুলির প্রধান লক্ষ্য ছিল। মূলত 'মঙ্গল' শব্দটি অনেকটা সঙ্কীর্ণ এবং গোষ্ঠীগত অর্থে ব্যবহৃত হলেও পববর্তীকালে এর ব্যবহার এবং অর্থেরও প্রসাব লাভ ঘটেছে। এইজন্যই দেখি ভাগবত-পুরাণের অনুবাদ হয়েছে 'কৃষ্ণমঙ্গল' এবং 'গোবিন্দমঙ্গল', জীবনী-সাহিত্য হয়েছে 'চৈতন্যমঙ্গল', 'অদ্বৈতমঙ্গল', পৌরাণিক দেব-দেবীদের কাহিনী হয়েছে 'দুর্গামঙ্গল, ভবানীমঙ্গল', আবার একান্ত লৌকিক কাহিনী 'বিদ্যাসুন্দর' হয়েছে 'কালিকামঙ্গল'। অবশ্য লৌকিক দেবতাদের মাহাত্ম্য প্রচার শাখাটি কোনকালেই স্তিমিত হয় নি অথবা প্রধান প্রধান কয়টি ক্ষেত্রেই সীমবদ্ধ রইল না। মনসা, চণ্ডী, ধর্ম এবং শিবের পরেও অন্যান্য বহু দেবতা এই মঙ্গলকাব্যের সাহায্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং প্রসার লাভ করেছেন। তাঁদেব মাহাত্ম্য-প্রচারক কাব্যগুলিকেই 'প্রধান মঙ্গলকাব্য'-রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাহিনী বলতে বিশেষ কিছু নেই—প্রধানত দেবতারাই এদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছেন। এই সমস্ত গ্রাম্যদেবতাদের মাহাত্ম্য-কীর্তনের জন্য কোন প্রতিভাশালী লেখকও

মঙ্গলকাব্যের প্রাধান্য

অগ্রসর হয়ে আসেন নি বলেই অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলি আপন গোষ্ঠীর বাইরে বিশেষ পরিচিতি লাভ করতে পারে নি। প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলিতেও সাম্প্রদায়িকতার প্রমাণ সুস্পষ্ট, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কাহিনীর আকর্ষণেই হোক কিংবা রচনার গুণেই হোক, এগুলি অনেকটা অসাম্প্রদায়িক তথা সার্বজনীন আগ্রহের সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলি মঙ্গলকাব্যের বহিরঙ্গ নিয়ে কোন প্রকারে বেঁচে আছে মাত্র। এদের কোনটিই সম্ভবত মঙ্গলকাব্যের সমৃদ্ধি-যুগে সৃষ্টি হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই এদের মধ্যে অষ্টাদশ শতকীয় অবক্ষয়ের চিহ্ন বর্তমান।

১. গঙ্গামঙ্গল ঃ 'গঙ্গামঙ্গল' কাব্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবি মাধবাচার্য বা দ্বিজ মাধব। এই মাধব কবির অপর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নি। ইনি যেমন 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা মাধব হতে পারেন, তেমনি 'কৃষ্ণমঙ্গল' রচয়িতা মাধবও হতে পারেন; এমন কি ইনি যদি তৃতীয় কোনো মাধব হয়ে থাকেন, তা হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তবে 'গঙ্গামঙ্গল' কাব্যে ইনি যে ভণিতা দান করেছেন, তা কৃষ্ণমঙ্গলের ভণিতারই অনুরূপ। কবি ভণিতায় বারবার চৈতন্যদেবের উল্লেখ করেছেন বলেই মনে হয় যে কবি বোধ হয় বৈষ্ণব ছিলেন। এতে মাঝে মাঝে ব্রজবুলি পদেরও ব্যবহার দেখা যায়। গ্রন্থে গঙ্গার উদ্ভব এবং ভগীরথ-কর্তৃক গঙ্গা আনয়ন-কাহিনীই প্রাধান্য লাভ করলেও অন্যান্য অনেক পৌরাণিক কাহিনীও এতে স্থানলাভ করেছে। এই মঙ্গলকাব্যটি পৌরাণিক— কোন লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য এতে বর্ণিত হয় নি।

দ্বিজ গৌরাঙ্গ অপর একখানি 'গঙ্গামঙ্গল' রচনা করেছিলেন। গঙ্গাতীরস্থ কাষ্ঠশালী গ্রামে এঁর বাসস্থান ছিল। কবি সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকে বর্তমান ছিলেন। গঙ্গার পশ্চিমতীরস্থ 'গুপ্তপল্লী যশোহর ধামে' বৈদ্যবংশীয় কবি জয়রাম একখানি ক্ষুদ্রাকৃতি 'গঙ্গামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। তাঁর রচনার উৎস 'ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ'। দ্বিজ কমলাকান্ত-রচিত 'গঙ্গামঙ্গল' অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। মনে হয় কবির 'গঙ্গার সমীপে বসত কোগ্রামেতে স্থিতি' ছিল।

দুর্গাপ্রসাদ মুখুটি-রচিত 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' গঙ্গামঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকাব করেছে। কবির বাসস্থান ছিল উলা-বীরনগব। তাঁব পিতার নাম ছিল আত্মারাম, মাতা অরুন্ধতী। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ-প্রসঙ্গে কবি বলেছেন যে গঙ্গাদেবী কবিপত্নীকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন এবং বলেন ঃ

'ভাষায় আমার গান নাই।
তোমার পতিরে কবে প্রকাশ হইবে তবে
যে বাঞ্ছা করিবে দিব তাই।।'

কবি দুর্গাপ্রসাদ অপর কোন আদর্শের অভাবে নিজেই বিভিন্ন পুরাণ ঘেঁটে এই 'গঙ্গামঙ্গল' কাব্যটি রচনা করেন। এজাতীয় গ্রন্থের মধ্যে এটিই বৃহত্তম। প্রধানত ভগীরথ-কর্তৃক গঙ্গা-আনয়ন এর মূল বিষয়বস্তু হলেও এতে অনেক নোতুন নোতুন কাহিনীও যুক্ত হয়েছে। 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' গানের জন্যই রচিত হয়েছিল। এটিও অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত আট পালায় বিভক্ত। এতে কবির বাস্তবদৃষ্টি এবং সরসতার পরিচয় পাওয়া যায়।

২. **গৌরীমঙ্গল ঃ** 'গৌরীমঙ্গল' কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি পাঁকুড়ের ভূস্বামী পৃথ্বীচন্দ্র। পৃথ্বীচন্দ্র কাব্যে আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে বলেছেন যে তিনি ১২১৩ সালে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর পিতার নাম বৈদ্যনাথ, কবি 'ত্রিবেদী' উপাধি-ধারী ব্রাহ্মণ। 'গৌরীমঙ্গল' অতি বৃহৎ কাব্য। এটি পাঁচ খণ্ডে এবং ৪১৯ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম দেবখণ্ড—সংস্কৃত পুরাণাদির অনুকরণে রচিত। দ্বিতীয় অবন্তী খণ্ড— এতে অবন্তী-নরপতি শালবাহনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। রাজার মৃত্যুর পর রাণীকে সান্ত্বনা দান-প্রসঙ্গে রামায়ণ-মহাভারতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় যুদ্ধখণ্ড, শালবাহন-পুত্র জীমূতবাহনের যুদ্ধ ও পিতৃরাজ্য-উদ্ধার এর বর্ণিত বিষয়। প্রসঙ্গক্রমে এখানে তান্ত্রিকধর্মের মাহাত্ম্য এবং তীর্থ-মাহাত্ম্যও বর্ণনা করা হয়েছে। চতুর্থ—নীতিখণ্ড। এতে জীমূতবাহনের ধর্মরাজ্য স্থাপন, নীতিপ্রতিষ্ঠা-আদি বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চম—স্বর্গখণ্ডে বৃদ্ধ জীমূতবাহনের কাহিনী এবং দেবীর কৃপায় জীমূতবাহনের স্বর্গলাভ-কাহিনী প্রদত্ত হয়েছে।

কবি বাঙলা ভাষায় রচিত বিভিন্ন কাব্য এবং কবিদের কথা উল্লেখ করেছেন। উক্ত কোন কোন কাব্যের এখন আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এইসব কাব্য দেখে শুনেই কবির মনেও কাব্যরচনার বাসনা জন্মে।—

'মূর্খের স্বভাব মনে করিল রচন।
দোষ না লইবে কেহ গুণবান জন।।'

কবি 'ভূষণ্ডী রামায়ণ' নামে একটি সংক্ষিপ্ত রামায়ণও রচনা করেছিলেন।

শিবচরণ সেন-রচিত 'গৌরীমঙ্গল' সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার কাহিনী-অবলম্বনে রচিত। এতে মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডীকাহিনীই বর্ণিত হয়েছে। আবার কালকেতুর উপাখ্যানও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কবি সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন।

৩. **শীতলামঙ্গল ঃ** শীতলা বসন্তরোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং রোগের উপশমকারিণী দেবী। শুধু বাঙলাদেশে নহে, ভারতের প্রায় সর্বত্রই এই দেবীর পূজা প্রচলিত আছে। কাশীতে এক শীতলা মন্দির আছে। উড়িষ্যায় এই দেবীর নাম 'ঠাকুরাণী', আসামে 'আই', দাক্ষিণাত্যেও 'শীতলম্মা' নামে এই জাতীয় এক দেবী আছেন। অনেকেই শীতলাদেবীকে বৈদিক 'তক্মন' বা 'অপদেবী'র সঙ্গে যুক্ত করতে বৃথা চেষ্টা করে থাকেন। আবার অনেকেই বৌদ্ধদেবী 'হারীতী'র সঙ্গে এঁর সম্পর্ক অনুমান করেন। কেউ কেউ প্রাচীন পুরাণেই শীতলার সন্ধান করে থাকেন। কিন্তু মনে হয়, এই সমস্ত অনুমান-কল্পনার পশ্চাতে কোন সত্য নেই। অন্যান্য লৌকিক দেবতার মতই শীতলাও অনার্য সমাজ থেকেই গৃহীত। দাক্ষিণাত্যের 'শীতলাম্মা'র সঙ্গে এর সম্পর্ককে বরং সহজে স্বীকার করে নেওয়া চলে।

শীতলামঙ্গলের বিশেষ কোন কাহিনী নেই—একখানি 'শীতলামঙ্গলে'র চারিটি পালায় চারিটি স্বতন্ত্র কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়। এদের মধ্যে প্রধান 'চন্দ্রকেতুর পালা'—এতে মনসামঙ্গলের প্রভাব সুস্পষ্ট।

নিত্যানন্দকেই শীতলামঙ্গলের আদি কবি বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কবির কাব্যটি

'গোকুল পালা' রূপেই বিখ্যাত। তিনি আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে বলেছেন যে তাঁর পিতার নাম মহামিশ্র, কবির উপাধি ছিল চক্রবর্তী। তাঁর নিবাস ছিল কাঁটাদিয়া গ্রাম। নিত্যানন্দ মেদিনীপুরের কাশীযোড়ার রাজা রাজনারায়ণের সভাসদ্ ছিলেন। উক্ত রাজা এবং কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমিত হয়। এঁর কাব্যে পাওয়া যায় যে, গোকুলে কৃষ্ণ বলরামের বসন্তরোগ হলে পর শীতলাপূজা করে তাঁরা মুক্তিলাভ করেন। নিত্যানন্দের ভাষা মার্জিত, সরল ও সহজ, তবে আধুনিকতার লক্ষণ প্রকট।

শীতলামঙ্গলের অপর কবি বল্লভ। সম্ভবত কবি অষ্টাদশ শতকে বর্তমান ছিলেন এবং তিনি ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী। কবি ঘোরতর বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন বলেই মনে হয়—'পাষণ্ড বৈষ্ণবের মুণ্ডে পড়ুক বজ্জর'। ইনি স্বয়ং বসন্ত চিকিৎসক এবং গ্রহবিপ্রজাতীয় ব্রাহ্মণ হতে পারেন। কারণ তাঁর কাব্যে যে বিভিন্ন জাতীয় বসন্ত এবং তার চিকিৎসাপ্রণালী বর্ণিত হয়েছে, তা' প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা-ব্যতীত সম্ভব নয়। কবির রচনা সরল, সহজ এবং স্থানবিশেষে কবিত্বময় হলেও বিশেষ মার্জিত বা গ্রাম্যতামুক্ত নয়।

৪. **দুর্গামঙ্গল** : 'দুর্গামঙ্গল' প্রধানত পৌরাণিক কাহিনী-অবলম্বনে রচিত হলেও কাব্যকারগণ কোন সুনির্দিষ্ট কাহিনীর অনুসরণ করেন নি। সম্ভবত ভবানীপ্রসাদ রায়ই 'দুর্গামঙ্গল' কাব্যের আদি কবি। কবি বৈদ্যজাতীয় 'কর' উপাধিধারী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল নয়নকৃষ্ণ। কবির নিবাস ময়মনসিংহ জেলাব কাঁচালিয়া গ্রাম। কবি জন্মান্ধ ছিলেন এবং শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন হয়ে অতি দুঃখে জীবন কাটান। ভবানীপ্রসাদের কাব্য প্রধানত মার্কণ্ডেয় চণ্ডী অবলম্বনে রচিত হোলেও এতে রামচন্দ্রের দুর্গাপুজা-আদি কাহিনীও বিবৃত হয়েছে। কবি জন্মান্ধ ছিলেন, সেই বিবেচনায় তাঁর কৃতিত্বকে পরিপূর্ণ মর্যাদা-দান সঙ্গত। তাঁর রচিত অনুবাদগুলি প্রকৃতই মনোহর।

কবি রূপনাবায়ণ ঘোষ যে 'দুর্গামঙ্গল' কাব্য রচনা কবেছিলেন, তাও মূলত মার্কণ্ডেয় পুবাণ-অবলম্বনে রচিত। কবি সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বর্তমান ছিলেন। তাঁর নিবাস ছিল ময়মনসিংহ জেলার আদাজান গ্রামে। কবিব সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে যে পারদর্শিতা ছিল, তার পরিচয় গ্রন্থেই সুলভ। তাঁর রচনার মাঝে মাঝে ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদ পাওয়া যায়।

কবি রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে হরিনাভি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতার নাম রামধন। কবি 'তর্কপঞ্চানন' এবং 'কবিকেশরী' উপাধি পেয়েছিলেন বলে মনে হয়। তাঁর রচিত 'দুর্গামঙ্গল' কাব্যটি দু'টি স্বতন্ত্র খণ্ডে বিভক্ত—গৌরীবিলাস ও কঙ্কালীর অভিশাপ এবং নলদময়ন্তী। মনে হয়, আসলে 'গৌরীবিলাস'ই তাঁর প্রকৃত দুর্গামঙ্গল কাব্য। কবি দেবী ভুবনেশ্বরীর স্বপ্নাদেশ পেয়েই কাব্যটি রচনা করেছিলেন। এটি মূলত পৌরাণিক পার্বতী-উমার কাহিনী। কালিদাসেব 'কুমারসম্ভবে'র প্রভাব এর উপর সুস্পষ্ট। মনে হয়, ভারতচন্দ্রের প্রভাবেই তিনি কোন কোন ছন্দ রচনা করেছেন।

৫. বাসুলী-মঙ্গল ঃ রাঢ় অঞ্চলে বাসুলী বা বিশালাক্ষী যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করলেও চণ্ডীদাসের কারণেই তাঁর খ্যাতির অধিকতর বিস্তৃতি ঘটেছে। কিন্তু বাসুলী দেবীব মাহাত্ম্য কীর্তন-উপলক্ষ্যে রচিত 'বাসুলীমঙ্গল' কাব্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় নি। কবিচন্দ্র মুকুন্দ-রচিত 'বাসুলীমঙ্গল' এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কবির পিতাব নাম-বিকর্তন মিশ্র, মাতা হারাবতী, কবি জাতিতে ব্রাহ্মণ। নামসাদৃশ্য থাকলেও ইনি কবিকঙ্কণ মুকুন্দ কিংবা 'জগন্নাথমঙ্গল' রচয়িতা মুকুন্দ ভারতী থেকে পৃথক। কবির নিবাস ছিল সম্ভবত বর্ধমান জেলায়। তাঁর গ্রন্থে যে রচনাকালের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তা প্রামাণিক হলে কবিকে ষোড়শ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত করতে হয় ঃ 'শাকে রস রথ (রস?) বেদ শশাঙ্কে গণিতে' —লক্ষ্য করবার বিষয়, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ কবির কাব্যেও এই তারিখটিই পাওয়া গিয়েছে। মুকুন্দের কাব্যে এই শ্লোকাংশটি প্রক্ষিপ্ত বলেই এখন অনেকে মনে কবে থাকেন। যদি তাই হয়, তবে অনুমান করা চলে যে কোন লিপিকর হয়তো নামসাদৃশ্যের জনক 'বাসুলীমঙ্গলে'র মুকুন্দের ভণিতা চণ্ডীমঙ্গলে যোগ করে থাকতে পারেন। কিন্তু যেহেতু পরবর্তী কোন কবি এর নাম উল্লেখ করেন নি এবং এর রচনার ভাষাও অপেক্ষাকৃত আধুনিক, এই হেতু কবিকে এত প্রাচীনকালে ঠেলে দেওয়া চলে না। যা হোক, এ বিষযে আবও অনুসন্ধানেব প্রয়োজন। কবিচন্দ্র মুকুন্দ-রচিত 'বাসুলীমঙ্গল' বাবোটি পালায় বিভক্ত। এর প্রথম সাতটি পালায প্রথমে পৌরাণিক সতী ও উমার কাহিনী বিবৃত করে পরে কবি মার্কণ্ডেয় পুবাণেব কাহিনী-অবলম্বনে সুরথরাজার কাহিনী, মধুকৈটভ -বধ, মহিষাসুব বধ ও শুম্ভনিশুম্ভ-নিধনকাহিনী বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থেব অবশিষ্ট পালায় বর্ধমানের ধুসদত্ত সদাগরের কাহিনী তথা লৌকিক কাহিনীটি স্থান লাভ কবেছে। মূলত ধনপতি সদাগরের কাহিনীটিব অনুকরণেই এই কাহিনীটি গঠিত হয়েছে। এই ধুসদত্তের উল্লেখ অবশ্য মুকুন্দের এবং কেতকাদাসেব কাব্যেও বর্তমান। কবির কাব্যে সংস্কৃত সাহিত্য এবং বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব বর্তমান; এব ভাষাও গ্রাম্যতামুক্ত।

৬. ষষ্ঠীমঙ্গল ঃ 'দেবীভাগবত', 'ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণ'-আদি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন পুবাণগুলিতে ষষ্ঠীদেবীর নাম পাওয়া গেলেও ইনি একেবারেই লৌকিক দেবতা। পরে এর আভিজাত্য-প্রতিষ্ঠার জন্য এঁকে কাত্যায়নী বা দুর্গার সঙ্গে অভিন্নরূপে দেখানো হয়েছে। শিশুর জন্মের ষষ্ঠ দিবসে কিছু কিছু জাতকর্ম করা হয়—মূলত এই কারণেই শিশুদের রক্ষয়িত্রীরূপে যষ্ঠীঠাকুরাণীর পরিকল্পনা করা হয়েছে। ষষ্ঠীঠাকুরাণীর মূর্তির বিশেষ পবিচয় পাওয়া যায় না। অধিকন্তু এখনও পর্যন্ত ষষ্ঠীপূজা নারীমহলেই আবদ্ধ। শাস্ত্রকাবগণ বারোমাসে বারো প্রকার ষষ্ঠীপূজার নির্দেশ দান করলেও প্রধানতঃ কন্যা-জামাতার হিতকামনায় 'অরণ্যষষ্ঠী' বা জামাইষষ্ঠীই সর্ববঙ্গে সাড়ম্বরে প্রতিপালিত হয়। অধিকাংশ 'ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যে' এই অরণ্যষষ্ঠীর মাহাত্ম্যই বর্ণনা করা হযেছে।

'কালিকামঙ্গলে'র কবি কৃষ্ণরাম দাস ১৬৭৯ খ্রীঃ তাঁর 'ষষ্ঠীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। কৃষ্ণরামের পিতার নাম ভগবতীদাস, নিবাস নিমতা গ্রাম। তাঁর দুখানা পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে, দু'খানাই আদ্যন্ত খণ্ডিত। তাতে নারীসমাজে প্রচলিত ষষ্ঠী পূজার গল্পটিই রূপায়িত হয়েছে। এতে সপ্তগ্রামের সমসাময়িক সমৃদ্ধ রূপেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

রুদ্ররাম চক্রবর্তী-রচিত 'ষষ্ঠীমঙ্গল' কাব্য এতজ্জাতীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে বৃহত্তম। কবির পিতার নাম গঙ্গারাম চক্রবর্তী—কবির উপাধি ছিল বিদ্যাভূষণ। কবির কাল-সম্বন্ধে কিছু জানবার উপায় নেই, তবে অনুমান, তিনি অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে বর্তমান ছিলেন। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ-সম্বন্ধে কবি বলেছেন—

'ব্যাধিসঙ্কটেতে মোর তনয়া পীড়িত।
তার রক্ষাহেতু মোরে করাইলে গীত ।।'

ত্রয়োদশ পালায় কবির গ্রন্থটি রচিত। এতে অরণ্যষষ্ঠীর কোন পরিচয় নেই—কবি মোটামুটিভাবে বিভিন্ন পুরাণ থেকে তিনটি কাহিনী গ্রহণ করেছেন। প্রথম কাহিনীটি প্রধানত কার্তিকেয়কে অবলম্বনে রচিত ; দ্বিতীয় কাহিনীটি ষষ্ঠীর বরে রাজা ক্ষেত্রমিশ্রের পুত্র প্রাপ্তি এবং পুত্র-কর্তৃক রাজ্যোদ্ধার এবং তৃতীয়টি কলাবতীর কাহিনী। কবির ভাষা খুব পরিচ্ছন্ন এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ, তবে কাব্যে সহজ কবিত্বের প্রকাশ বিশেষ নেই।

সম্প্রতি শঙ্কর চক্রবর্তী নামক এক কবির 'ষষ্ঠীমঙ্গল' আবিষ্কৃত হয়েছে। কবি সম্ভবত মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থটি ১৭৫৯ খ্রীঃ রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। কবির পিতার নাম সীতারাম, অতএব এই কাব্যে যে ষষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন, তিনি জলষষ্ঠী। অরণ্যষষ্ঠীর কাহিনীর সঙ্গেও এর কাহিনীর মিল নেই। শঙ্করের কাব্যে মুকুন্দ চক্রবর্তীর প্রভাব অতিশয় স্পষ্ট।

৭. রায়মঙ্গল ঃ দক্ষিণরায় বাঘের দেবতা। সাধারণতঃ দক্ষিণবঙ্গে অর্থাৎ সুন্দরবনের সন্নিহিত যে অঞ্চলে বাঘের উপদ্রব বেশি, সেই সমস্ত অঞ্চলেই ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের পূজা হয়। দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য-সূচক কাব্যই 'রায়মঙ্গল' নামে প্রসিদ্ধ। বাঘের পূজা ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র প্রচলিত। মহেন্‌জোদড়োর সীলমোহরে ব্যাঘ্রমূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের কোন কোন জাতিও হয়তো ব্যাঘ্রপূজক অথবা নিজেদের ব্যাঘ্র-বংশোদ্ভব বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। বাঙলাদেশে ব্যাঘ্রদেবতারূপে যে দক্ষিণরায়ের পূজা হয়ে থাকে, তার সঙ্গে ভারতের অন্য অংশের সম্পর্ক না থাকাই সম্ভব। বাঙলার দক্ষিণে সুন্দরবন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যাঘ্রকুলের বাসভূমি। সেই দক্ষিণদিকের অধিপতি দেবতা বলে 'দক্ষিণরাজ' বা 'দক্ষিণরায়' নামকরণ হয়ে থাকতে পারে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, তিনি ভাটি অঞ্চলের রাজা মুকুটরায়ের সেনাপতি ছিলেন। এমনও হতে পারে যে, মূলত দক্ষিণরায় ছিলেন একজন উৎকৃষ্ট ব্যাঘ্র-শিকারী। যা হোক, দক্ষিণরায়ও ক্রমে দেবতায় পরিণত হলেন। এই দেবতা একেবারেই লৌকিক দেবতা, পুরাণাদির সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

'রায়মঙ্গলে'র যে কাহিনী পাওয়া যায়, তাতে পুষ্পদত্ত নামে এক বণিকের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। অবশ্য এই কাহিনীটি প্রধানত চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি সদাগরের কাহিনীর অনুসরণে গঠিত। কিন্তু এর মধ্যে যে দক্ষিণরায় ও বড় গাজী খাঁর যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে, তা-ই এই কাব্যের মৌলিক অংশ।

'কালিকামঙ্গল' ও 'ষষ্ঠীমঙ্গল' কাহিনী-রচয়িতা কৃষ্ণরাম-রচিত 'রায়মঙ্গল' প্রসিদ্ধ।

কৃষ্ণরাম তাঁর কাব্যে 'মাধব আচার্য' নামক একজন পূর্ববর্তী 'রায়মঙ্গল' কাব্যকারের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মাধব আচার্যের 'রায়মঙ্গলে'র কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। কবি তাঁর গ্রন্থোৎপত্তির কারণ-বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে দক্ষিণরায় স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাঁকে উক্ত কাব্য রচনার জন্য আদেশ দান করেছিলেন। অধিকন্তু দক্ষিণরায় শাপ দিয়েছেন ঃ

'তোমার কবিতা যার মনে নাই লাগে।
সবংশে তাহারে তবে সংহারিবে বাঘে।।'

'রায়মঙ্গল' নাতিবৃহৎ কাব্য। এটির রচনাকাল ১৬৮৬ খ্রীঃ। কবি পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও রচনারীতি যথেষ্ট সরল।

'রায়মঙ্গল কাব্যে' কুম্ভীরদেবতা কালুরায় এবং বড় গাজীরও মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে। বড় গাজী খাঁর সঙ্গে দক্ষিণরায়ের যুদ্ধের মধ্যে ঐতিহাসিক কোন কাহিনীর ইঙ্গিত থাকতে পারে—কেউ কেউ এরূপ মনে করেন। 'রায়মঙ্গলের'র একটি মুসলমানী সংস্করণ পাওয়া যায়—এরূপ একটি গ্রন্থ 'বনবিবি জহুরানামা'-এর লেখক মুন্সী বয়নদ্দিন। এতে দক্ষিণরায়ের উপর বনবিবির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৮. অপরাপর মঙ্গলকাব্য ঃ পূর্বেই বলা হয়েছে যে কালক্রমে মঙ্গলকাব্যের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারে স্থানীয় দেবতাদের অবলম্বনেও ঐরূপ মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিল। কখনও বা পাঁচালীকেই 'মঙ্গলকাব্য' আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে।

'মনসামঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা রামজীবন ১৭০১ খ্রীঃ 'সূর্যমঙ্গল' বা 'আদিত্যচরিত' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। সূর্যের পাঁচালীকেই তিনি 'সূর্যমঙ্গল' নামে অভিহিত করেছেন। 'কপিলামঙ্গল' নামে একখানি মঙ্গলকাব্য অপেক্ষাকৃত বেশি বিস্তারলাভ করেছিল। 'কপিলাধেনু'-হরণই এর বর্ণিতব্য বিষয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্তর্গত বরদাখাত পরগণার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে পরিচিত বরদাকে অবলম্বন করে দ্বিজ নন্দকিশোর ১৮১৯ খ্রীঃ 'বরদামঙ্গল' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। কুচবিহারে জিলায় গোসানীমারী নামক গ্রামে গোসানীদেবীর মন্দির আছে। এই দেবীর কাহিনী অবলম্বন করে রাধাকৃষ্ণদাস বৈরাগী 'গোসানীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। এর কাহিনীতে ক্ষীণ ঐতিহাসিক-সূত্র থাকতেও পারে। গঙ্গানারায়ণ নামে এক কবি 'ভবানীমঙ্গল' নামে যে কাব্য রচনা করেছিলেন, সম্ভবত তা চণ্ডীকাহিনীরই অনুরূপ। সরস্বতীর মাহাত্ম্য-কীর্তন করে দয়ারাম নামক একজন কবি 'সারদামঙ্গল' কাব্য-রচনা করেন। সরস্বতী বৈদিক দেবী হলেও কাহিনীতে বৈদিক কিংবা পৌরাণিক কোন প্রভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায় না—কাহিনী অনেকটা রূপকথার মত। সুসঙ্গের রাজা রাজসিংহ বাহাদুরও সরস্বতীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে 'ভারতীমঙ্গল' নামক কাব্য রচনা করেছিলেন। এতে কালিদাসের কবিত্বলাভ-কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে। শিবানন্দ-রচিত 'লক্ষ্মীমঙ্গল' কাব্যটি প্রকৃতপক্ষে দেবীভাগবত-পুরাণের একটি অধ্যায়ের অনুবাদ মাত্র।

এই সমস্ত দেব-দেবীর কাহিনী ছাড়াও বিভিন্ন তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণনা করে 'তীর্থমঙ্গল' কাব্য রচনা করা হয়েছে। ২৪ পরগণার ভাজনঘাট-নিবাসী বিজয়রাম সেন এক জমিদারের সহযাত্রী হয়ে উত্তর ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পরিভ্রমণ করেছিলেন। কবির রচনায় কাব্যগুণ না থাকলেও বর্ণনা স্পষ্ট ও বাস্তব।

অধ্যায় ঃ আঠারো

লোকসাহিত্য শাখা

সভ্য শিক্ষিত মানুষ সচেতনভাবে সাাহিত্য সৃষ্টি ক'রে আপন মনের ভাবনা-কামনাকে রূপদান করেন। এই ধরনের সাহিত্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি-মনের স্বরূপটি উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু শিক্ষিত আর সভ্য মানুষকে নিয়ে সমাজের গঠন কখনও সম্পূর্ণ হয় না। সমাজের অধিকাংশ লোক (অন্ততঃ বর্তমান কালেও আমাদের দেশে এবং প্রাচীনতর কালে সর্বদেশেই) শিক্ষা ও সভ্যতাব আলোক থেকে বঞ্চিত হ'য়ে যে জীবন যাপন করে, তার পরিচয় অনেক সময় বহির্জগতে থাকে অজ্ঞাত। সেই অজ্ঞাত অন্ধকার জীবনেও যে কদাচিৎ সাহিত্যকল্পনার বুদ্বুদ সৃষ্টি হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে তা আবার এক সময অপরের অগোচরেই বিলয়প্রাপ্ত হয়ে যায়, তার সত্যতা অস্বীকার করা চলে না। বস্তুত লোক-জীবনকে অবলম্বন ক'রে প্রাচীনকালেও যে এক ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল, সাধারণতঃ তাকেই আমরা 'লোকসাহিত্য' বলে অভিহিত করতে পারি।

লোকজীবন ও লোকসাহিত্য

'লোকসাহিত্য' কথাটি অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালের সৃষ্টি। পাশ্চাত্ত্যের Folk Literature বলতে যে সাহিত্যকর্মকে বুঝিয়ে থাকে, তার নানাবিধ লক্ষণের মধ্যে একটা প্রধান লক্ষণ এই—"which form the popular entertainments of primitive peoples or of the uncultured elements of more civilised peoples." এই প্রসঙ্গে আরও অন্য বহুবিধ লক্ষণের কথা বলা হয়েছে; কিন্তু জটিলতা-বৃদ্ধির ভয়ে আমরা শুধু মোটামুটিভাবে এই সূত্রটিকে অবলম্বন ক'রেই আলোচনায় অগ্রসর হবো।

সংজ্ঞা

প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে আদিম অথবা অশিক্ষিত লোকজীবনের সঙ্গে যুক্ত সাহিত্যকর্ম-রূপে যাদের সন্ধান লাভ ক'রে থাকি, তাদের মোটামুটি তিনটি ধারায় বিভক্ত করা যায়। তবে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে দেববাদ এবং ধর্মীয় চেতনাই প্রাধান্য লাভ করলেও লোকসাহিত্যে এদের প্রভাব লক্ষণীয়ভাবেই অনুপস্থিত। বস্তুত, ধর্ম-প্রভাবমুক্ত সাহিত্য-কীর্তিকেই আমরা তাৎকালিক লোকসাহিত্য বলে অভিহিত করতে পারি। এদের সবগুলি যে লোকজীবন থেকে উদ্ভূত, তেমন দাবি সম্ভবতঃ অবাস্তব এবং অসমীচীন।

ধর্মপ্রভাবমুক্ত সাহিত্য ধারা

প্রাচীন প্রভাবমুক্ত এই লোকসাহিত্যের বিষয়বস্তু এবং রচনারীতির বিচারে সবগুলিকে একই শ্রেণীতে স্থান দান করা সম্ভবপর নয়। এই ধারার বিশেষজ্ঞগণ তাই এই মূল শাখাটিকে তিনটি ধারায় বিভক্ত ক'রে থাকেন। — (১) 'মুসলমানী সাহিত্য' তথা 'কিস্‌সা সাহিত্য' (২) 'পল্লীগীতিকা' তথা 'গাথা কাব্য' এবং (৩) 'লোকসঙ্গীত'। অবশ্য এই মূল শাখার অনেক বচনাই মূলতঃ 'মৌখিক সাহিত্য' ব'লে তার অনেকখানিই যথাকালে সংরক্ষণেব অভাবে কালগর্ভে বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে।

প্রাচীন সাহিত্যের যে একটি ধারাকে সাধারণভাবে 'মুসলমানী সাহিত্য' বলে অভিহিত করা হয়, তা' এই লোকসাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত। এই মুসলমানী সাহিত্যের অপর অথচ সঙ্গততর নামকরণ হওয়া উচিত 'কিস্‌সা সাহিত্য'। প্রকারান্তরে বলা চলে যে, রূপকথা-জাতীয় কাহিনীই এর উপজীব্য। এই কাহিনীগুলিতে কখনো কখনো ঐতিহাসিক ঘটনার স্পর্শ থাকলেও এরা যে মূলতঃ আদিম কল্পনা থেকেই জাত, তা সতর্ক পাঠকের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। 'কিস্‌সা সাহিত্যগুলি'র অপর বৈশিষ্ট্য—প্রায় সর্বক্ষেত্রেই এগুলি অনুবাদ অথবা অনুকরণ মাত্র। বাঙলা ভাষায় স্বাধীন মৌলিক কিস্‌সা সাহিত্য রচনা-প্রচেষ্টা প্রায় দেখা যায় না বলেই মনে হয়। লোকসাহিত্যেব অপর শাখা 'গাথাকাব্য' বা 'পল্লীগীতিকা' এইসব সাহিত্যকৃতির স্রষ্টা যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অশিক্ষিত অথবা অর্ধশিক্ষিত পল্লী কবি, তেমনি কাহিনীও লোকজীবন থেকেই উদ্ভূত। দুর্ভাগ্যক্রমে সমগ্র বাঙলাদেশে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে যে অসংখ্য 'পল্লীগীতিকা'ব সৃষ্টি হয়েছিল, যথাকালে সংগ্রহেব অভাবে এদের অধিকাংশই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। লোকসাহিত্যেব তৃতীয় শাখার উৎপত্তি অপেক্ষাকৃত পববর্তীকালেও—এদের 'লোকসঙ্গীত' নামে আখ্যাযিত কবা চলে। যদি বা প্রাচীনতর কালে এদের সৃষ্টি হয়ে থাকে, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তেমন নিদর্শনগুলি হয়তো সংগ্রহের অভাবেই লুপ্ত হযে গিয়েছে।

কিস্‌সা সাহিত্য

আমরা এই তিনটি শাখাকেই আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত কবলেও এদের বাইরেও লোকসাহিত্যের বিস্তার অনেকখানি। প্রসঙ্গক্রমে রূপকথা, ছেলে-ভুলানো ছড়া, পাঁচালী, ব্রতকথা-আদির কথা উল্লেখ করা চলে। এগুলি নিঃসন্দেহে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যেও বলা হয়েছে, 'Under this rather loose heading are to be included those traditional legends, tales, ballads, songs, proverbs, riddles and plays. ' কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকালেই রূপকথা, ছড়া-আদি বিভিন্ন লোকসাহিত্যের সৃষ্টি হলেও এদের কোন প্রাচীন লিখিত রূপ পাওয়া না যাওয়ায় এদের আমাদের আলোচনার বাইরে রাখতে হলো। এগুলি ছিল মূলতঃ মৌখিক সাহিত্য। কোন কোন ছড়ায় অবশ্য প্রাচীনতর রূপটি অনেকটা অবিকৃত আছে; কিন্তু এদের সংখ্যা এত স্বল্প যে এ নিয়ে আলোচনা অপূর্ণই থেকে যাবে।

পল্লীগীতিকা ও লোকসঙ্গীত

[এক] আরাকানের রোসাঙ রাজসভা

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা গৌড় দরবারের কথা উল্লেখ করেছি। বাঙালী কবি ও বাঙলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় গৌড় দরবারের সহায়তার কথা আমরা যেমন কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করেছি, অনুরূপ কৃতজ্ঞতা সহকারেই আমাদের 'রোসাঙ তথা আরাকান রাজসভা'র কথাও উল্লেখ কবতে হয়। বস্তুত 'মুসলমানী সাহিত্য' তথা 'কিস্‌সা সাহিত্যে'র আলোচনা-প্রসঙ্গে রোসাঙ রাজদরবারের উল্লেখ অপরিহার্য। আরাকান অঞ্চল বর্তমানে ব্রহ্মদেশের অন্তর্ভুক্ত হলেও এক সময় তা বাঙলাদেশেরই অন্তর্বর্তী ছিল। সমসময়ে যে তথায় বাঙালী শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সভ্যতা বিস্তারলাভ করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আরাকান ব্রহ্মদেশের অন্তর্ভুক্ত হলেও এখনও পর্যন্ত নানা দিক দিয়ে তাদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে। অঞ্চলটি চট্টগ্রামের সন্নিহিত-বিধায় উভয় অঞ্চলের শিক্ষাদীক্ষা এবং ভাষায় এখনও পারস্পরিক প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। আরাকানের অধিবাসীদের সাধারণত 'মগ' বলে উল্লেখ করা হয়। বাংলাদেশে অবশ্য 'মগ' শব্দটির নানাপ্রকার তাৎপর্য দাঁড়িয়ে যাওয়ায় এদের সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব খুব শ্রদ্ধেয় নয়। যা হোক, এখানকার আদিম অধিবাসীরা নিষাদ ও কিরাত জাতির সংমিশ্রণে জাত হলেও এককালে এখানে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। এ স্থানের অধিবাসীরাও এক সময় অধিক পরিমাণেই বৌদ্ধধর্মও গ্রহণ করেছিল। লক্ষ্য করবার বিষয়, বাঙলাদেশে মুসলমান তুর্কীদের আগমনের পূর্বেই এই অঞ্চল মুসলমানদের দ্বারা অধ্যুষিত হয়েছিল। ফলত, স্থানীয় শিক্ষা-সভ্যতার উপর মুসলমানী প্রভাবও নগণ্য ছিল না। আরাকানের বৌ ; নৃপ তদের অনেকেই মুসলমানী উপাধিও ব্যবহার করতেন। এই আরাকানের অধিবাসীবা নিজেদের 'রখইঙ' নামে অভিহিত করে এবং তা থেকেই 'রোসাঙ' কথাটির উৎপত্তি হযেছে। বাঙলাদেশে মুঘল-পাঠানের সংঘর্ষের ফলে বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমানও রোসাঙের রাজদরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এভাবেই দেখা যায়, কালক্রমে রোসাঙে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম ধর্মের এবং বর্মী ও বাঙালী জাতির সংমিশ্রণে এক বিশিষ্ট সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই রোসাঙ রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙলাদেশে মধ্যযুগে এক বিশিষ্ট সাহিত্যসম্পদ সৃষ্ট হয়েছিল,—এই সাহিত্য লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত মানবিক ভাবযুক্ত এক জাতীয় 'রোমান্স সাহিত্য'।

রোসাঙ রাজসভা

রোসাঙ রাজদরবারে যে সকল কবি বিভিন্ন কাব্য সৃষ্টি ক'রে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, লক্ষ্য করবার বিষয়, তাঁরা সকলেই মুসলমান। এই কারণেই লোকসাহিত্যের এই বিশেষ ধারাটিকে 'মুসলমানী সাহিত্য' বলে অভিহিত করা হয়। বাঙলাদেশে মুসলিম সাহিত্য-সাধনার শুরু এখান থেকে যদি নাও হয়ে থাকে, তবু তার পুষ্টি বিধান এবং পরবর্তী প্রচারে এর ভূমিকাই যে সর্বপ্রধান ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে আরও লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, রোসাঙ দরবারে মৌলিক সাহিত্য বলতে প্রায় কিছুই সৃষ্ট হয় নি; যা কিছু সৃষ্ট

হয়েছে, সবই অনুবাদ — কোথাও মূলানুগ, কোথাও বা ভাবানুগ। গ্রন্থকারদের অনেকেই ফারসি সাহিত্যের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ হিন্দী সাহিত্য থেকেও তাদেব কাব্যের উপজীব্য আহরণ করেছেন। আরবি ভাষা থেকেও অনুবাদের দৃষ্টান্ত আছে। অতএব লোকসাহিত্যের অন্যতম শাখা 'মুসলমানী সাহিত্য' বা 'কিস্সা সাহিত্য' যে একান্তভাবেই অভারতীয় প্রেরণায় জাত, তা বলবার উপায় নেই। ডঃ সুকুমার সেন এ বিষয়ে যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে এই ধারায় সাহিত্যস্রষ্টা মুসলমান কবিরা ছিলেন 'ফারসী সাহিত্যের মধুকর এবং ভারতীয় সাহিত্যের রসসন্ধানী।' বস্তুত মুসলমান কবিদের অনেকেই ছিলেন

মিশ্র সাহিত্য

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং ভারতীয় পুরাণসমূহের সঙ্গেও এঁদের অনেকের পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। তাই এই সকল মুসলমানী সাহিত্যে সংস্কৃত সাহিত্যের এবং হিন্দু পুরাণের প্রভাব বড় কম পড়ে নি। এমন কি চৈতন্যোত্তর যুগে রচিত সাহিত্যে চৈতন্য-প্রভাবের পরিচয়ও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। ফলত, এই ধারার সাহিত্যকে 'মুসলমানী সাহিত্য' নামে অভিহিত করলেও এদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় ভাবের সমন্বয়-সাধনে তৎপর একটা মিশ্র সংস্কৃতিবোধের পরিচয়ই প্রকট হয়ে ওঠে।

১. দৌলত কাজী ঃ রোসাঙ-রাজ থিরি-থু-ধম্মা বা 'বুদ্ধাচারী' রাজা শ্রীসুধর্মাব 'লস্কব উজীর' আশরফ খানের আদেশে দৌলত কাজী তাঁর 'সতী ময়নামতী' বা 'লোবচন্দ্রানী' নামক কাব্য রচনা করেন। শ্রীসুধর্মার রাজত্বকাল ১৬২২ খ্রীঃ-১৬৩৮ খ্রীঃ। অতএব কবি দৌলৎ কাজী এই কালেই বর্তমান ছিলেন অনুমান করা যায়। কবি গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে শ্রীসুধর্মার লস্কর উজীর পণ্ডিতপ্রধান শ্রীযুক্ত আশরফ খানের সভায় নানা কাব্য পঠিত হতো । তথায় ঠেট হিন্দীতে সাধন-রচিত 'মৈনা-সৎ'-কাহিনী শুনে আশবফ খান কবিকে দেশি ভাষায় তা আবার রচনা করতে অনুরোধ করলেন ঃ

'ঠেঠা ছোপাইয়া দোহা কহিলা সাধনে।
না বুঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জনে।।
দেশী ভাষে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দে।
সকলে শুনিয়া যেন বুঝয়ে সানন্দে।।
তবে কাজী দৌলতে সে বুঝিয়া আরতি।
পাঞ্চালীর ছন্দে কহে ময়নার ভারতী।।'

সেনাপতির আদেশে দৌলত কাজী সাধন কবি-রচিত হিন্দী 'মৈনা সত' কাব্যের বাঙলা অনুবাদ রচনা করেন। সাধন-রচিত কাব্যের অতি ক্ষুদ্র এক পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে। তা থেকে মনে করা যায় যে দৌলত কাজী মূলের কোন কোন অংশ আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন, কোথাও কাহিনীমাত্র গ্রহণ করেছেন। 'সতী ময়নামতী' বা 'লোরচন্দ্রানী' কাব্য তিন খণ্ডে বিভক্ত। কিন্তু কবির আকস্মিক মৃত্যুতে গ্রন্থখানি খণ্ডিত অবস্থায় ছিল। তিনি দ্বিতীয় খণ্ডে সতী ময়নামতীর বারমাস্যার এগার মাসের কাহিনী বর্ণনার পরই দেহত্যাগ করেন। অতঃপর দ্বিতীয় খণ্ডের অবশিষ্ট অংশ এবং তৃতীয় খণ্ড রচনা করেন কবি আলাওল।

'বৈশাখ সমাপ্ত জ্যৈষ্ঠ অসাঙ্গ রহিলা।
তবে কাজী দৌলত স্বর্গেতে হৈল লীন।'—আলাওল

লোররাজার ময়নামতী নামক এক সুন্দরী রাণী ছিলেন। রাণীর প্রতি রাজার আকর্ষণ কিছুটা কমে গেলে রাজা এক যোগীর নিকট গোহারী-রাজকন্যা অপূর্বসুন্দরী চন্দ্রানীর সন্ধান পেলেন। চন্দ্রানী ছিলেন বামনবীরের পত্নী। এই সংবাদ শুনে লোর রাজা গোহারী গমন করলেন এবং তথায় সুযোগ সৃষ্টি করে চন্দ্রানীর সঙ্গে মিলিত হলেন। অতঃপর পলায়ন করতে চেষ্টা করলে বামন তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। কিন্তু লোর রাজার হস্তে তিনি পরাজিত ও নিহত হলেন। এদিকে চন্দ্রানী অকস্মাৎ সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করলে এক ঋষি এসে তাকে বাঁচিয়ে দিলেন। গোহারীর রাজাও সংবাদ পেয়ে এসে পরম সমাদরে লোর ও চন্দ্রানীকে আপন রাজ্যে নিয়ে গিয়ে তাদের বিবাহ দিলেন। এইস্থানে প্রথম খণ্ড সমাপ্ত। দ্বিতীয় খণ্ডে ময়নামতীর বিরহ বর্ণিত হয়েছে। তার অবস্থা দেখে প্রতিবেশী রাজার পুত্র ছাতন এক দূতীর সহায়তায় ময়নামতীকে হস্তগত করতে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু ময়নামতী আপন সতীধর্মে দৃঢ় থেকে ছাতনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তৃতীয় খণ্ডে সতী ময়নামতী এক ব্রাহ্মণের হাত দিয়ে লোর রাজার নিকট এক শুকপক্ষী পাঠালেন। ব্রাহ্মণই কৌশলে লোররাজার মনে পূর্বস্মৃতি জাগিয়ে তুললে লোর চন্দ্রানী-সহ আপন রাজ্যে ময়নামতীর নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন।

লোরচন্দ্রানী

অনেকের মতে দৌলত কাজী লৌকিক সাহিত্যের প্রথম কবি বলেই নয়, প্রাচীনতম এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি বলেই অভিহিত হবার যোগ্যতা রাখেন। ইসলাম ধর্ম ও সুফী সাধনা বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল যথেষ্ট। তিনি সম্ভবতঃ সুফী চিশতিব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। সুফীবাদের সঙ্গে কবির সম্পর্ক থাকায় তাঁর কাব্যে একটা উদার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায। রামায়ণ, মহাভারত ও পুবাণ প্রসঙ্গ তাঁর কাব্যের বহু স্থলেই বর্তমান। কবির পৃষ্ঠপোষক আসবাফ খানও ছিলেন চিস্তি খানদান। কালিদাস, জয়দেব এবং বিদ্যাপতির বচনার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল প্রচুর, এমন কি হিন্দুর বেদ পুরাণেও যে তিনি কৃতবিদ্য ছিলেন, তাঁর কাব্যেই এব যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এই পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি প্রশংসার্হ হলেও মুসলমান কবিদের মধ্যেও তাঁর চেয়ে অধিকতর পণ্ডিতজনের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। দৌলত কাজীর কৃতিত্ব এই পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কবিত্বশক্তির সংমিশ্রণে। ডঃ সুকুমার সেন বলেন ঃ "দৌলত কাজীর কবিত্ব বিশেষ উপভোগ্য। মুসলমান কবিদের মধ্যে তিনি যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দাবী করিতে পারেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কি বাঙলা কি ব্রজবুলি উভয়বিধ রচনাতেই তিনি সমান দক্ষতা দেখাইয়াছেন।" অপর একজন সমালোচক দৌলত কাজীর কাব্য বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে কবির কৃতিত্বের কথা নিম্নোক্ত ক্রমে প্রকাশ করেছেন ঃ "দৌলত কাজীর রচনার এই স্বতো-বিকশিত সারল্য ও অনায়স-সরসতা তাঁর কাব্যকে লোকজীবনের সার্থক রোম্যান্টিক প্রণয়গাথার শিল্পমূল্য দান করেছে। লক্ষ্য করা উচিত, কাব্য-কাহিনীর মধ্যে লোকজীবন-সম্ভব সামাজিক প্রণয়-সৌন্দর্য

কাব্যবিচার

শ্রেষ্ঠাসন-লাভে সমর্থ হয়নি। 'লোরচন্দ্রানীর'র যৌথ প্রণয় মাধুর্যের চেয়েও সতী ময়নামতী একা উজ্জ্বলতর বর্ণে চিত্রিত হয়েছেন দৌলতের কাব্যে। দৌলত কাজীর বিশ্বাসী কবি-কল্পনা রোমান্টিক প্রণয়সৌন্দর্যকে ত্যাগ-তিতিক্ষাপূর্ণ বেদনার রঙে অনুরঞ্জিত করেছে ; যৌবন-প্রেম সাধনার মহিমা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।" আলাওল 'লোর চন্দ্রানী'র যে অংশ রচনা করেছিলেন কাব্যধর্মে তা দৌলত কাজী-রচিত অংশ অপেক্ষা হীন। দৌলত কাজী যদিও অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তৎসত্ত্বেও তাঁর মৌলিক প্রতিভাকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ, কাজী বহুস্থলেই সাধন-রচিত কাব্যের বহির্ভূত অনেক অংশ স্বয়ং রচনা করেছেন। এই মৌলিক রচনা অংশে কবি-প্রতিভার উৎকর্ষ অনুভূত হয়।

২. **সৈয়দ আলাওল ঃ** রোসাঙ রাজসভায় যে সকল কবি বর্তমান ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্তত জনপ্রিয়তায় আলাওল (জন্ম আ. ১৬০৮ খ্রীঃ) ছিলেন শ্রেষ্ঠ। আলাওল তাঁর কাব্যে বিস্তৃতভাবে আত্মপরিচয় দান করেছেন। মুল্লুক ফতেহাবাদের অন্তর্ভুক্ত জালালপুর গ্রামে কবি জন্মগ্রহণ করেন। স্থানটি ফরিদপুর জেলায় হওয়া সম্ভব, আলাওলের পিতা ছিলেন মজলিস কুতুবের অমাত্য। পিতাপুত্র স্থানান্তর যাবার কালে জলদস্যুর হস্তে পড়েন এবং আলাওলের পিতা মৃত্যুবরণ করেন। আলাওল কোনক্রমে রোসঙে উপস্থিত হলেও সভার সদস্য হবার সুযোগ পেলেন না, তিনি অশ্বারোহী সৈন্যদলে ভর্তি হলেন। কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যেই আলাওলের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি রটে গেলে তিনি রোসাঙরাজ 'সাদউ মেংদার' বা থদো মিন্তার মুখ্য অমাত্য মহাজন মাগন ঠাকুরের সৌহার্দ্য লাভ করলেন। কবির পৃষ্ঠপোষক মাগন ঠাকুরের অনুরোধে কবি 'পদ্মাবতী কাব্য' রচনা করেন। থদো মিন্তার রাজত্বকাল ১৬৪৬ খ্রীঃ-১৬৫২ খ্রীঃ। অতএব এরই মধ্যবর্তী কোন সময়ে কবি আলাওল রোসাঙ রাজদরবারে আশ্রয়লাভ করেছিলেন বলে অনুমিত হয়। অতঃপর আলাওল তাঁর দ্বিতীয় কাব্য 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জমাল' রচনা আরম্ভ করেন। ইতোমধ্যে কবির আশ্রয়দাতা মাগন ঠাকুর পরলোকগমন করেন। তখন রোসাঙের রাজা ছিলেন 'থিরি সান্দ থুধম্মা বা শ্রীচন্দ্র সুধর্মা।' বাদশাহ শাজাহানের পুত্র শাহ সুজা এই সময় (১৬৬১ খ্রীঃ) ঔরংজীবের ভয়ে রোসাঙ রাজসভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। কবির সঙ্গে শাহ সুজার সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। শাহ সুজা রাজকোপে পড়ে বিড়ম্বিত হলে অপরের প্ররোচনায় কবি আলাওলও কিছুদিনের জন্য বন্দীজীবন যাপন করেন। যা হোক, মুক্তিলাভ করবার পরও তিনি কিছুদিন নানাপ্রকার দুর্ভোগ ভোগ করে অবশেষে রোসাঙের কাজি সৈয়দ মাসুদের অনুগ্রহ লাভ সুফী সম্প্রদায়ের করে কাদেরী মতে দীক্ষিত হলেন। সৈয়দ মাসুদের নির্দেশেই তিনি অসমাপ্ত 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জমাল' কাব্য সম্পূর্ণ করেন। আলাওলের পাণ্ডিত্যের কথা শুনে রোসাঙ-রাজ শ্রীচন্দ্র সুধর্মার (সম্ভবত ১৬৭২ খ্রীঃ-র পর) প্রধান অমাত্য মজলিস বিরাজ তাঁকে 'সেকেন্দারনামা' অনুবাদ করতে আদেশ করলেন।

'আরবী ফারসী প্লোস্ত নছরানী ইহুদী।
পহলবি সঙ্গে পঞ্চ ভাষ রত্নাবধি ।।'

নেজামী-রচিত 'দারা সেকেন্দারনামা' গ্রন্থে এই পঞ্চভাষার ব্যবহার আছে—আলাওল পিতৃতুল্য 'অন্নদাতা ভয়ত্রাতা' রাজার আদেশে উক্ত গ্রন্থের ফারসী 'বয়েত' ভেঙ্গে পয়ার ছন্দে গ্রন্থ রচনা করলেন সম্ভবত ১৬৭৪ খ্রীঃ বা সমসময়ে। আলাওলের অপর রূপকথা জাতীয় কাব্য 'সপ্ত পয়কর' বা 'হপ্ত পয়কর' শ্রীচন্দ্র সুধর্মার সেনাপতি সৈয়দ মুহম্মদের আদেশে রচিত (১৬৬০-৬১ খ্রীঃ) হয়। মূল গ্রন্থটি নেজামী-কর্তৃক ফারসী ভাষায় রচিত হয়েছিল। আলাওলের আর একটি গ্রন্থ 'তয়ফা' বা 'তোহফা'। য়ুসুফ গদা-কর্তৃক ফারসী ভাষায় রচিত গ্রন্থ-অবলম্বনে আলাওলের এই গ্রন্থ রচিত হয়। ১০৭৩ হিজরী বা ১৬৬৩-৬৪ খ্রীঃ গ্রন্থ সমাপ্তিকাল বলে কবি স্বয়ং উল্লেখ করেছেন। রোসাঙ-রাজের মহাপাত্র সুলেমান এই গ্রন্থটি রচনার জন্য আদেশ করেছিলেন। এছাড়া আলাওল যে দৌলত কাজীর রচনা 'লোর চন্দ্রানী' (১৬৫৯ খ্রীঃ) গ্রন্থ সমাপ্ত করেছেন, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আলাওল বলেছেন যে তিনি বহু গ্রন্থই রচনা করেছেন। পূর্বে যে সকল গ্রন্থের কথা বলা হয়েছে, তা ছাড়াও তাঁর পক্ষে আরও বহু গ্রন্থই রচনা করা সম্ভব—অনেকেই এরূপ অনুমান করে থাকেন। মুন্সী আব্দুল গফুর সিদ্দিকী আলাওল-রচিত 'য়ুসুফ জোলায়খা, লায়লা মজনু, শিরিঁখোসরো-নামা এবং আজিজকুমার-রসবতী' কাব্যের সন্ধান পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর বাস্তব ভিত্তি নেই। বস্তুত সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগে কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী-ব্যতীত অপর কোন কবিই বোধহয় এত অধিক গ্রন্থ রচনা করেন নি। এ সকল ব্যতীতও আলাওল অনেকগুলি রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক বৈষ্ণব পদ রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থ 'রাগনামা'।

বিভিন্ন গ্রন্থ

আলাওলের জন্মকাল এবং গ্রন্থ রচনাকাল-সম্বন্ধে সমালোচকগণ একমত হতে পারেন নি। ডঃ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের মতে কবির জন্মকাল ১৫৯২ খ্রীঃ এবং তিনি যথাক্রমে 'পদ্মাবতী, সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জমাল, সতী ময়নামতীর উত্তরাংশ, হপ্তপয়কর, তোহফা ও সেকেন্দার-নামা' রচনা করেন। কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন এবং অন্যান্য সুধী ঐতিহাসিকদের অনেকেই এই কালক্রম-বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন।

কাব্যবিচার ঃ কবির শ্রেষ্ঠ রচনা 'পদ্মাবতী'। মালেক মহম্মদ জায়সীর হিন্দী ভাষায় রচিত 'পদুমাবতী' নামক কাব্যের অনুবাদ-রূপে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে বলে সাধারণত বলা হলেও একে অনুবাদ কাব্য বলা সঙ্গত নয়। আসলে এতদুভয়ের মধ্যে কাহিনীগত কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও কাব্যাদর্শে, রূপ-কল্পনায় এবং কোন কোন কাহিনীতেও বৈসাদৃশ্যের পরিমাণ বড় কম নয়। জ্ঞানী সাধক মালেক মুহম্মদ জায়সী তাত্ত্বিক আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখেই 'পদ্মাবতী' রূপক-কাব্য রূপে রচনা করেছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন যে তাঁর কাব্যোক্ত চিতোর রাজ্য মানবমন, রাজা রত্নসেন জীবাত্মা, রাণী পদ্মাবতী বিবেক এবং শুকপক্ষী ধর্মগুরু। পক্ষান্তরে আলাওলের কাব্যে এই আধ্যাত্মিক ভাবনার একান্ত অভাব। তিনি প্রেম-কাব্যরূপেই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। কাহিনীর দিক থেকেও উভয়ের পার্থক্য লক্ষ্য করবার মত। মূল গ্রন্থটি বিয়োগান্তক এবং তাতে সম্রাট আলাউদ্দিনকে বিজয়ী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আলাওলের

মূল কাব্যের সঙ্গে পার্থক্য

গ্রন্থ অনেকটা মিলনান্তক এবং এতে আলাউদ্দিন পরাজয় বরণ করেছেন। রসের দিক থেকে বিচার করলেও দেখা যাবে যে আলাওল কাব্যটিকে অনেকটা বৈষ্ণব কাব্যের রসে সিক্ত করেছেন। এগুলি ছাড়া কাব্যের খুঁটিনাটি অনেক বিষয়েই উভয় কাব্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। জায়সীর কাব্যে নেই, তেমন বহুতর বিষয়ও আলাওল আপন কাব্যে সন্নিবিষ্ট করেছেন। এই সমস্ত কারণেই আলাওলের কাব্যকে অনুবাদ গ্রন্থ না বলে স্বাধীন মৌলিক গ্রন্থ বলে গ্রহণ করাই সঙ্গত। 'পদ্মাবতী' গ্রন্থের কাহিনীটি দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে চিতোররাজ রত্নসেনের সিংহল-রাজকন্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ ও চিতোর-প্রত্যাবর্তন-কাহিনী, দ্বিতীয় অংশে সম্রাট আলাউদ্দিন-কর্তৃক পদ্মাবতী-লাভ প্রত্যাশায় চিতোর-আক্রমণ, যুদ্ধ, আলাউদ্দিনের পরাজয় এবং রত্নসেনের মৃত্যু ও পদ্মাবতীর সহমরণ-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রথম অংশ অপেক্ষা দ্বিতীয় অংশে কাহিনীর জটিলতা অনেক বেশি। কিন্তু তা হলেও প্রথমোক্ত প্রেম-কাহিনীটিই আলাওলের প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ এই অংশে আলাওলের কবিত্বশক্তি যেমন স্বচ্ছন্দে ও সহজ গতিতে প্রবাহিত হয়েছে, পরবর্তী অংশের ঐতিহাসিক কাহিনী-বর্ণনায় তা হয় নি। আলাওল যেমন ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন নি, তেমনি ইতিহাসও রচনা করেন নি, তিনি রচনা করেছেন কাব্য, যার প্রধান উপজীব্য প্রেম।

কবির মৌলিকত্ব

কবি আলাওল খাঁটি কবি ছিলেন বলেই তাঁর হৃদয়ানুভূতির ক্ষেত্র ছিল যেমন প্রসারিত, তেমনি গভীর। একটি প্রসঙ্গেব আলোচনাতেই এর স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে। মূল 'পদুমাবতী' কাব্যে মুসলমান-সম্রাট আলাউদ্দিনের জয় প্রদর্শন করা হয়েছে, কিন্তু আলাওলের কাব্যে আলাউদ্দিনের ঘটেছে পবাজয়। কবি সত্যকার কবি বলেই সাম্প্রদায়িকতার নিকট নতি স্বীকার করেন নি। তিনি বৃহত্তব ও মহত্তর মানবধর্মেব অনুশাসনে চালিত হয়েছেন। অধ্যাপক শ্রীভট্টাচার্যের মতে, "আলাওল ছিলেন সৌন্দর্যগত-প্রাণ সত্যকাব কবি ; তাঁহার ধারণা ছিল—বিশ্বজগতে, অন্ততপক্ষে কাব্যজগতে ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়ই চিরন্তন সত্য। কোনোরূপ সঙ্কীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা, স্বজাতিপ্রীতি তাঁহার এ বিশ্বাস টলাইতে পারে নাই। যে সুলতান অধার্মিক, পরপত্নীলুব্ধ, খামখেয়ালী ইতিহাস তাহাকে বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে, কিন্তু সঙ্গতিপূর্ণ কবি-কল্পনার জগতে তিনি পরাজিত হইতে বাধ্য।"

প্রতিভা বিচার

আলাওল ছিলেন সূফী-সাধক, এ দিক থেকে বাঙালী বৈষ্ণব কবিদিগের সঙ্গে তাঁর ভাবগত মিল থাকবার কথা। বস্তুত তাঁর 'পদ্মাবতী' কাব্যে কবির বৈষ্ণব-সমপ্রাণতারই পরিচয় পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র সৌন্দর্যের চিত্র-রচনায় আলাওলের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। জনৈক ঐতিহাসিক আলাওলের 'পদ্মাবতী'কে বাঙলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক রোমান্সের মর্যাদা দান করে বলেছেন, "বঙ্গ সাহিত্যেব ইতিহাসে সম্ভবতঃ ইহাই প্রথম সত্যকার ব্যক্তি-সাহিত্য। এই কাব্যের সূচনায় যেমন কবিব ব্যক্তি-জীবনকে, তেমনি কাব্যের মধ্যে কবি-মানসকে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে ইতিহাসাংশ থাকিলেও ইহা যথার্থ কাব্য এবং রঘুবংশ, কাদম্বরী প্রভৃতি ক্লাসিক্যাল কাব্যের সম-শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য। সপ্তদশ শতকে রচিত হইলেও ইহা উদার ও সর্বজনীন, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের চিহ্নমাত্র ইহাতে নাই।"

আলাওল-রচিত অন্যান্য গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পূর্বেই প্রদত্ত হয়েছে। এদের সবগুলোই ফারসী ভাষা থেকে অনূদিত এবং 'তোহফা' ছাড়া অন্য গ্রন্থগুলি অনেকটা রোম্যান্টিক-ধর্মী কাব্য। 'তোহফা' ধর্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। 'পদ্মাবতী'র তুলনায় আলাওলের অপরাপর গ্রন্থ সর্বপ্রকারেই অনেকটা হীন। হতে পারে, কবির বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কল্পনাশক্তি এবং প্রতিভারও ন্যূনতা ঘটেছিল।

রোসাঙ রাজদরবারে মুসলমান কবিদের যে কাব্যসাধনা শুরু হয়েছিল, তা এই দরবারেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পরবর্তীকালে নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহেও মুসলমান কবিরা কাব্য সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে পূর্ববঙ্গ তথা চট্টগ্রাম এবং ত্রিপুরা অঞ্চলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মুসলমান কবিদের প্রায় সকলেই অনুবাদ সাহিত্য রচনা করেছেন ; একই গ্রন্থও আবার অনেকেই অনুবাদ করেছেন। কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক থেকে তাঁরা সন্তর্পণে দেবতা ও ধর্মকে এড়িয়ে গেছেন। প্রধানত তাঁদের কাব্যে মানুষের কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে, অবশ্য কখনো কখনো সেই কাহিনী রূপকথার ধার ঘেঁষেই গিয়েছে।

কোরেশী মাগন ঠাকুর-রচিত 'চন্দ্রাবতী' নামক একখানি কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়— আরব্য উপন্যাস থেকে গৃহীত হয়েছে। অনেকেই অনুমান করেন রোসাঙরাজের অমাত্য এবং আলাওলের আশ্রয়দাতা মাগন ঠাকুরই কোরেশী মাগন ঠাকুর। এর অতিরিক্ত কবির কোন পবিচয় পাওযা যায় না। মাগন ঠাকুর জাতিতে মুসলমান ছিলেন কি বৌদ্ধ ছিলেন, তারও নিষ্পত্তি হয় নি।

মাগন ঠাকুর

চট্টগ্রাম পরাগলপুরের অধিবাসী সৈয়দ সুলতান নামক একজন কবি 'শবেমেরাজ', 'জ্ঞানপ্রদীপ' এবং 'নবীবংশ' নামে তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন। কবি-প্রদত্ত তারিখ থেকে অনুমান করা চলে যে তিনি সপ্তদশ শতকেব মাঝামাঝি-কালে বর্তমান ছিলেন। কবি তাঁর কাব্যসমূহে ইসলাম ধর্মীয় তত্ত্বোপদেশ ও কাহিনী পরিবেষণ করেছেন। 'শবেমেরাজ' এবং 'নবীবংশে' মুসলমানী পৌবাণিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। উদাব-হৃদয় কবি নবীদের তালিকা করতে গিয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু , শিব এবং কৃষ্ণকেও স্থান দান কবেছেন। সৈযদ সুলতানের রচনায় আধ্যাত্মিকতার পরিচয় বর্তমান। তাঁব কোন কোন রচনা চর্যাপদেব মত সাঙ্কেতিক ভাষায় রচিত। তিনি কযেকটি বৈষ্ণব পদও বচনা কবেছিলেন।

সৈয়দ সুলতান

চট্টগ্রামের মহম্মদ খান 'মুক্তাল হোসেন' নামক যে কাব্যটি বচনা কবেন, তা আরবী ভাষায় রচিত কাববালা-কাহিনীর একটি অনুবাদ। কবি এতে কারবালা-কাহিনী ছাড়াও আপন অঞ্চলের কিছু কিছু পবিচয দান কবেছেন। কবি মহম্মদ খান এই গ্রন্থটি ছাড়াও 'কাসিমের লড়াই', হানিফেব পত্রপাঠ , 'কেয়ামতনামা' নামে কয়খানা কাব্য রচনা করেছিলেন। কবি তাঁর কাব্যে পিতৃবংশ ও মাতৃবংশের যে বিস্তৃত পরিচয় দান করেছেন, এরূপ পরিচয় অপর কোনও কবির কাব্যে পাওয়া যায় না। বাঙলা ভাষায় এবং হিন্দুপুরাণেও যে কবির বেশ অধিকার ছিল, রচনায় তার পরিচয পাওয়া যায়।

মহম্মদ খান

আব্দুল নবী সপ্তদশ শতাব্দীতে ফারসী 'আমীর হামজা'র বাঙলা অনুবাদ রচনা করেন। ফারসী ভাষায় রচিত মূল কাব্যটি অনেক বাঙালীই বুঝতে পারে না, এইজন্যই তিনি তাহা দেশী ভাষায় রচনা করতে মনস্থ করেন। কিন্তু কবির মনে ভয় রয়েছে —

আব্দুল নবী

মুছলমানি কথা দেখী মনেহ ডরাই।
রচিলে বাঙ্গালা ভাসে কোপে কি গোঁসাই।।
লোক উপকারহেতু তেজি সেই ভএ।
দরবারে রচিবারে ইচ্ছিলুম হৃদএ।।

'আমীর হামজা' আশি পর্বে বিভক্ত এক বিরাট কাব্য। কবি যে মূলের শুধু অনুবাদ রচনা করেছেন, তা' নয়, বহুস্থলে তিনি স্বাধীনতাও গ্রহণ করেছেন।

আকবর

সৈয়দ মহম্মদ আকবর 'জেবলমূলক-শামারোখ' নামক একটি অনুবাদ কাব্য রচনা করেন। এতে জেবলমূলক ও শামারোখের প্রণয়-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। অসাম্প্রদায়িক কবি গ্রন্থারম্ভে ফিরিস্তাকে নারদ, হজরত রসুলকে চৈতন্য ইত্যাদি রূপে বন্দনা করেছেন। কবির কাব্যে আলাওলের প্রভাব বর্তমান।

শগীর

সৈয়দ মহম্মদ শগীর 'য়ুসুফ জোলেখা' নামক একখানি প্রণয়মূলক কাব্য রচনা করেন। কবির অপর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নি। কেউ কেউ এঁকে চতুর্দশ শতকের কবি বলে মনে করলেও তার কোন যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় না। মোহম্মদ রাজা, সেরবাজ, আব্দুল হালীম, আব্দুল হাকীম প্রভৃতি আরও অনেক কবিই বিভিন্ন মুসলমানী সাহিত্য রচনা ক'রে গিয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবিদের অক্ষমতার পরিচয় সুপরিস্ফুট।

সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙালী মুসলমানরা এই হিন্দুয়ালি বাঙলা ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করে আসছেন। অবশ্য কোন কোন কবির কোন কোন কাব্যে যে আরবি-ফারসি শব্দেরও মিশ্রণ ঘটেছিল, তা সম্ভবতঃ প্রয়োজনবোধেই। এর একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের 'অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।' কিন্তু সচেতনভাবে যে একেবারে মুসলমানী বাঙলায় লেখা শুরু হলো, তার সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত সম্ভবতঃ খ্রীঃ অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্বে মীরজাফরের পুত্র নবাব নজমুদ্দৌল্লাহ-র কালে। সেকালে রচিত 'ইউসুফ জুলেখা'র অংশ ঃ

মুসলমানী বাঙলা

'হানিফা খোওয়াবে কহে তুমি কোন জন।
টুঙ্গির শহরে থাকি বুলিল স্বপন।।
সোনাভান নাম মোর ছিল আরামেতে।
তোমার ছুরত আমি শুনিনু কাসেতে।।
সেই হৈতে দিলা মেরা আছে বেকারার।
থাকিতে না পারি আইলাম দেখিতে দিদার।।'

তবে সম্ভবতঃ এই ভাষা খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেনি।

এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য—বাঙলা ভাষা চিরকাল বাঙলা অক্ষরে লিখিত হলেও চট্টগ্রামে ফারসি অক্ষরে লেখা কিছু বাঙলা পুথির সন্ধান পাওয়া যায় এবং শ্রীহট্টের মুসলমানগণ আধুনিক যুগেও অনেকেই কিছুটা পরিবর্তিত নাগরী অক্ষরে বাঙলা লিখতেন এটিকে বলা হ'তো সিলেটি নাগরী।

পরবর্তী শতাব্দীতেও মুসলমানী সাহিত্যের ধারা অব্যাহত ছিল। লক্ষ্য করবার বিষয়, এবার কিছু কিছু হিন্দুও এইরূপ প্রণয়-মূলক মুসলমানী সাহিত্য-রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। আবার এই কাব্যের সাধানাক্ষেত্রও পূর্ববঙ্গ থেকে সর্ববঙ্গে বিস্তার লাভ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের গরিবুল্লা 'আমীর হামজা' কাব্য রচনা আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে গ্রন্থটি অসমাপ্তই ছিল। পরে সৈয়দ হামজা নামক এক কবি গ্রন্থটি সমাপ্ত করেন। 'য়ুসুফ জোলেখা' গরীবুল্লার দ্বিতীয় কাব্য। গরীবুল্লার কাব্যে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব সুস্পষ্ট। 'আমীর হামজা'র সমাপ্তিকারক সৈয়দ হামজা 'হাতেম তাই', 'মনোহর মধুমালতী', 'জৈগুনের পুথি' এবং আরও কিছু কিছু কাব্য রচনা করেন।

কারবালার কাহিনী-অবলম্বনে বিভিন্ন নামে অনেকেই অনেক কাব্য রচনা করেছিলেন। চট্টগ্রামের কবি নসরুল্লা খান থেকে বীরভূমের রাধাচরণ গোপ পর্যন্ত অনেকেই এ বিষয়ে 'জঙ্গনামা' রচনা করেন। এই বিষয়টি সম্বন্ধে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, ''কারবালার যুদ্ধ, এজিদের কথা প্রভৃতি যে সকল বিষয় দূব-দেশাগত, তাহা মুসলমান কবিরা বিদেশাগত অতিথির ন্যায় গৃহের বাহিরের একখানা একচালায় স্থান দিয়া তৃপ্ত হন নাই, তাঁহারা এমনভাবে সেই সকল অতিথিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন যে তাঁহাদের রূপ বদলাইয়া তাঁহারা বাঙালী হইয়া গিয়াছেন।'' লায়লা-মজনুর অনুপম প্রেমকাহিনীও বাঙালী মুসলমান কবিদের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। চট্টগ্রামের দৌলত উজীর-রচিত 'লায়লি-মজনু' একটি সার্থক কাব্য।

রোম্যান্সধর্মী সাহিত্যের বাইরে যে সাহিত্য প্রচেষ্টা মধ্যযুগে মুসলমান কবিদের মধ্যে সুফী ধর্ম বিষয়ে কিছু গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। শেখ ফযজুল্লা -রচিত 'গোরক্ষবিজয়', সৈয়দ সুলতান-রচিত 'জ্ঞানপ্রদীপ', হাজি মুহাম্মদ -রচিত 'নব জামাল', শেখ চান্দ-রচিত 'তালিব নামা', মীর মুহাম্মদ সফী, রচিত 'নূরনামা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জীবনীকাব্যসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সৈয়দ সুলতানের 'নবীবংশ', জয়েনুদ্দিনের 'রসুল বিজয় কাব্য', শোকাবহ মহরম কাহিনী অবলম্বনে মহম্মদ খান রচনা করেন 'মুক্তাল হোসেন' এবং হায়াৎ মামুদ লেখেন 'মুহরম্ পর্ব'। চরিত সাহিত্য বিষয়ে কয়েকখানা গ্রন্থ আছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'তাজ কিরাত' এবং 'চাহার দরবেশ'।

মুসলিম ধর্ম এবং সমাজ-বহির্ভূত প্রতিবেশী হিন্দুদের ধর্ম ও সমাজ বিষয়েও যে মধ্যযুগের মুসলমান কবিরা ক্রমশ আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন, তারও প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের রচিত কোন কোন গ্রন্থ থেকে। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য — শেখ চন্দ রচিত 'হরগৌরী সম্বাদ', আলী রেজা-রচিত 'আগমজ্ঞান সাগর', শেহ্ জাহিদ রচিত 'আদ্যা পরিচয়', আব্দুর রহিম-রচিত 'মুহাম্মদি বেদ তত্ত্ব' প্রভৃতি। এ ছাড়া অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে—সাবিরিদ বা

শাহ্ বারীদ খান-রচিত 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য' এবং সৈয়দ মুর্তাজা, শাহ্ আকবার, নাসির মামুদ, গরীবুল্লাহ্ ও অন্যান্য অনেক বৈষ্ণব পদ রচয়িতা কবির কথা। এদের সংখ্যা ন্যূনপক্ষে একশত। মোহাম্মদ খাতের ও করিমুল্লাহ্ অউধী কবির 'মৃগাবতী'র অনুসরণে বাঙলা কাব্য রচনা করেছিলেন।

অপরাপর যে সকল বিষয়-অবলম্বনে বিভিন্ন কবি লোকসাহিত্য রচনা করেছেন, তার উল্লেখ থেকেই বিষয়-বিস্তৃতিব পরিচয় পাওয়া যাবে। 'আমীর সওদাগর, কাফেন চোবা, নছরমালুম, সুরতজামাল ও আধুয়াসুন্দরী, চৌধুরীর লড়াই, নূবন্নোহা ও কবরের কথা, দেওয়ান ভাবনা' প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বহু গ্রন্থই রচিত হয়েছে। অবশ্য এদের অনেকগুলিই অনুবাদ নয়, স্বাধীন রচনা। স্থানীয় প্রেমকাহিনীকে অবলম্বন করে যে সকল সাহিত্য বচিত হয়েছে, পরবর্তী অধ্যায়ে 'পল্লীগীতিকা'-প্রসঙ্গে তাদের পরিচয় দান করা হবে।

[দুই] পল্লীগীতিকা (গাথা কাব্য)

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-আদি নদ-নদীর পলিমাটিতে গড়া বাঙলদেশ, 'মৌসুমী' বায়ু এব প্রাণ—অতএব অতিশয় সঙ্গত এবং স্বাভাবিক কাবণেই এখানে সহজ হৃদযধর্মেব বিকাশই লক্ষ্য কবা যায়। জীবনে যাদের কোন জটিল সমস্যা ছিল না, স্বল্পশ্রমে কিংবা বিনাশ্রমে প্রাপ্ত স্বচ্ছন্দ বনজাত শাকসব্জীতে যাদের উদবপূর্তি হতো, দেশ অধিকাবের জন্য যাদেব কখনও কঠিন সংগ্রাম করতে হয় নি, তারা যে স্বভাবতই কবিধর্মে দীক্ষা পাবে, তাতে বিস্মিত হবাব কাবণ নেই। অতএব খুবই স্বাভাবিক হতো, যদি সহস্রাধিক বৎসর কাল পূর্বেই আমবা মানবিক আবেদনে পূর্ণ গীতিকা-সাহিত্যের সাক্ষাৎ পেতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদেব, তাই জীবনযাত্রা একেবারে নির্বাধ ছিল না। ঘন ঘন রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাব পবিবর্তনে অগণিত জনগণেব মনে বিশেষ কোন প্রতিক্রিযাব সৃষ্টি না কবলেও বিদগ্ধ নাগবিকদেব বিচলিত হবাব কাবণ ছিল। তাঁরা আত্মপ্রকাশ অপেক্ষা আত্মরক্ষাব কঠিন সংগ্রামে ব্রতী হয়ে নবাগত বিভিন্ন দেবতাব উদ্বোধনে সচেষ্ট হলেন। ফলতঃ হৃদযধর্মী গীতিকাসাহিত্যেব স্থলে বচিত হলো অসংখ্য নবাগত আর্য-অনার্য সমন্বযজাত দেবতাব মাহাত্ম্য সূচক মঙ্গলকাব্য এবং তজ্জাতীয় অন্যান্য 'বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্য', যাব ফলে, সাধাবণভাবে মধ্যযুগের সমগ্র বাঙলা সাহিত্যকেই 'ধর্মীয়' তথা 'দেবযাজী সাহিত্য' নামে অভিহিত কবা হয। কিন্তু একসময় দ্বন্দ্বমুখর জীবনেব অবসান ঘটেছিল। এ ছাড়া, রাষ্ট্রকেন্দ্র থেকে দূবে অবস্থিত বিস্তৃত গ্রামাঞ্চলে প্রায় কখনও বাজনৈতিক আবর্তের সৃষ্টি হয নি। বিদগ্ধ নাগরিকদেব অগোচরে সুদূর পল্লী অঞ্চলে হয়তো অতি প্রাচীনকালেই সমসাময়িক সাধাবণ নব নারীব জীবনকাহিনী অথবা ঐতিহ্যাশ্রিত কাহিনীকে অবলম্বন করে পল্লীব অর্ধশিক্ষিত স্বভাবকবি গাথাকাব্য রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। সম্ভবত কালক্রমে কিছুটা মহাকালের বিক্রমে, কিছুটা মার্জিতরুচি নাগরিকদেব উপেক্ষায় এদের অধিকাংশই বিনষ্ট হয়েছে। কিছুটা হয়তো সময়ে।

পল্লীগীতিকার উদ্ভব

সঙ্গে তাল রেখে পরিবর্তিত আকারে আত্মরক্ষার সুযোগ পেয়েছে। অনুমান করি, সারা বাঙলাদেশেই বিভিন্ন কালে মৌখিক সাহিত্য-রূপ এরূপ প্রচুর গাথাকাব্য বা পল্লীগীতিকার উদ্ভব ঘটেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, তাই দেশের হৃদয় থেকে উদ্ভূত এই সাহিত্যসম্পদগুলিকে রক্ষা করবার বিশেষ কোন প্রচেষ্টাই কোন কালে দেখা দেয় নি বলেই দরিদ্র-মনোরথের মতই এদের উদয়ের সঙ্গে বিলয় ঘটেছে। ভাগ্যক্রমেই ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন এই পল্লীগীতিকাগুলির সংগ্রহে উদ্যোগী হয়েছিলেন বলে এদের এক ভগ্নাংশমাত্র সমূহ বিনষ্টির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

প্রধানতঃ চন্দ্রকুমার দে নামক একজন সংগ্রাহকের সহায়তার ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন পূর্ব ময়মনসিংহ এবং পূর্ববঙ্গের অন্যান্য স্থান থেকে অনেকগুলি 'গাথাকাব্য '(Ballad) বা 'পল্লীগীতিকা' সংগ্রহ করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ময়মনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'-রূপে চার খণ্ডে প্রকাশ করেন। গীতিকাগুলি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এ বিষয়ে অভিমত প্রচারিত হতে থাকে। অভিমতগুলির মধ্যে প্রশংসার ভাগই বেশি, কিছু কিছু দেশীয় সমালোচকই কিছু প্রতিকূল মন্তব্য করেছেন। লর্ড রোনাল্ডসে, স্টেলা ক্রেমরিস, রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পল্লীগীতিকাগুলির অকৃত্রিমতায় মুগ্ধ হয়েছেন। আবার কারও ধারণা — এই পল্লীগীতিকাগুলি আসলে আধুনিক কালেরই সৃষ্টি,অধিকন্তু সংগ্রাহকের কারসাজিতেই এগুলি এমন রোম্যান্টিক কাব্যরূপে পরিণতি লাভ করেছে। এ বিষয়ে প্রধান প্রবক্তা ডঃ সুকুমার সেনের অভিমত উদ্ধার করছি ঃ"...পালাগুলিতে স্থানীয় উপভাষার রূপ বজায় রাখিবার চেষ্টা সত্ত্বেও সাধুভাষার এবং কলিকাতা অঞ্চলের কথ্যভাষার প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়। মধ্যে মধ্যে আবার পশ্চিমবঙ্গের উপভাষার (এবং সাধুভাষার) শব্দগুলিকে পূর্ববঙ্গীয় রূপ দিবার চেষ্টা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে এই সন্দেহ হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে পালাগুলি সর্বাংশে অকৃত্রিম নয়। . . . আসলে পয়ারটি হইতেছে সংগ্রহীতার প্রক্ষেপ। ... মধ্যে মধ্যে স্পষ্টতঃ অন্যান্য রচনা হইতে অথবা মৌলিক দুই চারি ছত্র জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ... এই দুই ছত্রই প্রক্ষিপ্ত, এই নিতান্ত আধুনিক ধরনের, রোম্যান্টিক ভাবও পূর্বাপর সঙ্গতিবিহীন। ... শুধু এই ছত্র কেন, 'বনে পর্যটন ও বিপদ' এই অংশের বাঁশী বাজানো motif প্রক্ষিপ্ত। অনেকগুলি পালাতে অন্য গল্পের অংশ যোগ করিয়া অথবা অন্যরূপে কাহিনীকে পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত করিয়া রোম্যান্টিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে। . . মহুয়ার আত্মহত্যা কখনোই মূল কাহিনীতে ছিল না। সন্ন্যাসীর ব্যাপারটি স্বকপোলকল্পিত না হইলে অন্য কাহিনী হইতে গৃহীত হইয়াছে।" এতদরিক্ত ডঃ সেন যে সকল কথা বলেছেন, তা-ও এর কৃত্রিমতা এবং প্রক্ষেপের কথা। এতে যে দু একটি পংক্তি ভাবে ও ভাষায় উৎকৃষ্ট, তাদের সম্বন্ধেও 'বিস্ময়ের হেতু' কিছু নেই বলেই তিনি মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, তিনি সর্বত্রই অন্তর্যামীর মত এদের অন্তঃসত্তার রহস্যভেদ করে সিদ্ধান্তটি মাত্র উপস্থাপন করেছেন, কৃচিৎই দৃষ্টান্ত কিংবা যুক্তির অবতারণা করেছেন। যে কথাটি তিনি স্পষ্টতঃ বলেন নি, অনুমানে বুঝে নিতে হয়, এই গীতিকাগুলির কৃতিত্ব-অকৃতিত্বের দায় যেন

কৃত্রিমতা বিচার

সংগ্রাহকের। অথচ সংগ্রাহকের কাব্যরচনা-ক্ষমতা-সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় কালিদাস রায় মন্তব্য করেছেন, "চন্দ্রকুমারকে ঘনিষ্ঠভাবেই জানিতাম—ছন্দোবন্ধে তাঁহার জ্ঞান ছিল। তাঁহার সুরজ্ঞান ছিল, কিন্তু তিনি এতবড় কবি ছিলেন না যে ঐ অপূর্ব গীতিগুলি রচনা করিতে পরিতেন। ...চন্দ্রকুমারকে মহাকবিত্বের গৌরব ও অসামান্য আত্মোৎসর্গের গৌরব দুইয়ের একটিও দিতে আমরা রাজী নই। যাহা খণ্ডিত, ছন্ন, ছিন্ন, ব্যুৎক্রান্ত ও অঙ্গহীন, তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন চন্দ্রকুমার—এ বিষয়ে সংশয় নাই।" প্রাচীন রচনায় সম্পাদকের হাত কোথায় বা না পড়ে ? ডঃ সেন কৃত্তিবাসের রামায়ণ-সম্বন্ধে বলেছেন, "কৃত্তিবাসের রামায়ণের মধ্যে তাঁহাব নাম ছাড়া আর কিছু অংশ অপরিবর্তিত রহিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।" অথচ তৎসত্ত্বেও সমস্ত ঐতিহাসিকই তাঁকে চৈতন্য-পূর্ব যুগে স্থাপন করে তাঁর গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, প্রক্ষেপবাহুল্যের জন্য কৃত্তিবাস বাঙলা সাহিত্য-প্রাঙ্গণ থেকে বহিষ্কৃত হন নি। পল্লীগীতিকার অপর সংগ্রাহক এবং স্বয়ং পল্লীকবি জসিমউদ্দিন সাহেবও পল্লীগীতিকাগুলির অকৃত্রিমতায় সংশয় প্রকাশ কবেছেন। তিনি সাত আট বৎসব ময়মনসিংহ জেলায় ঘুরেও মাজাঘষা সংস্করণের গীতিকা পান নি বলে মন্তব্য করেছেন। এর উত্তর দিয়েছেন বাঙলাভাষাবিদ চেক পণ্ডিত দুসান জুবাতিয়েল। তিনিও ময়মনসিংহ জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে গীতিকা পান নি, কিন্তু মন্তব্য কবেছেন, "কিন্তু তাতেই কি গীতিকাগুলিব অনস্তিত্ব প্রমাণিত হয়?" ইনি ডঃ সুকুমার সেনের অভিমতেবও জবাব দিয়ে বলেছেন, '. ". কিন্তু এজন্য গীতিকাগুলির প্রামাণিকতায় সন্দেহ করায় উচিত কি ?" বস্তুত পল্লীগীতিকায সংগ্রাহক কিংবা সম্পাদকের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাকে স্বীকার কবে নিয়েই তার সম্বন্ধে সহৃদয় আলোচনা করাই সঙ্গত। গোড়া থেকেই কোন পূর্বসংস্কারবশতঃ বিমুখ মনোভাব নিয়ে আলোচনায় ব্রতী হওয়া ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিব পবিচায়ক নয়।

সাম্প্রতিক কালে 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র তথা পূর্ববঙ্গের গাথাকাব্যের অনেকগুলি সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে। ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক 'ময়মনসিংহ গীতিকা'-সম্বলিত কতকগুলি গাথা 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (প্রথম খণ্ড)' সঙ্কলন কবেছেন এবং এই গাথাগুলি তিনি স্বয়ং ময়মনসিংহের গ্রামাঞ্চল থেকে সংগ্রহ কবেছেন। এ ছাড়া পূর্ববঙ্গের রওশন ইয়াজদানি 'মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য', ঢাকাব বাঙলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত বদিউজ্জমান -সম্পাদিত 'মোমেনশাহী গীতিকা'য় সঙ্কলিত গাথাগুলি স্বাধীনভাবে সংগৃহিত হওযায প্রমাণিত হয় যে এগুলি চন্দ্রকুমাব দে বা আধুনিক কোন কবির রচিত নয়। পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ-কর্তৃক সংগৃহীত এবং সম্পাদিত 'বাদ্যানীর গান' মহুয়া গীতিকারই একটি অমার্জিত আদিরূপের নিদর্শন বলেই সুধীসমাজ কর্তক স্বীকৃত হয়েছে। অতএব ময়মনসিংহ গীতিকার অকৃত্রিমতায যাঁবা সন্দেহ পোষণ করেন, তাঁরা যে বিশেষ উদ্দেশ্য-তাড়িত হয়েই তা করে থাকেন তাতে কোন সংশযেব অবকাশ নেই। গাথাকাব্যগুলি অতিপ্রাচীন না হতে পারে, তবে যে অনাধুনিক কালেই রচিত হয়ে মধ্যযুগে অন্তর্ভুক্তির যথার্থ দাবিদার — এ কথা অস্বীকার করলে ইচ্ছা করেই সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া হবে।

পল্লীগীতিকার রচয়িতাগণ অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত ছিলেন বলেই হোক অথবা গীতাকারে বহুল প্রচলিত ছিল বলেই হোক, মনে হয়, এগুলিকে লিখে রাখবার গরজ কেউ বোধ করেন নি। ফলত, কোন গীতিকারই লেখ্যরূপের সন্ধান পাওয়া যায় নি। সংগ্রাহকগণ গায়কদেব মুখ থেকে এগুলি সংগ্রহ করেছেন। এগুলি ছিল 'মৌখিক সাহিত্য', পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই কোন না কোন পর্বে এ জাতীয় মৌখিক সাহিত্যের বর্তমানতা-বিষয়ে ইতিহাসের সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

পুরুষ-পরম্পরায় যে এইভাবে মূলগীতিকা কিছুটা পরিবর্তন লাভ করবে, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। অতএব প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া উচিত যে পল্লীগীতিকাগুলির কোনটিরই হয়তো যথার্থ মূলরূপ অক্ষুণ্ণ নেই। অধিকন্তু গীতিকারদের প্রায় সকলেই অখ্যাত ছিলেন বলেই তাদের কালনিরূপণ দুঃসাধ্য ব্যাপার। এদেব মধ্যে একমাত্র মহিলাকবি চন্দ্রাবতীর সম্বন্ধেই কিছু জানবাব সুযোগ পাওয়া যায়। ইনি ছিলেন মনসামঙ্গল-কাব্যকার দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা। আনুমানিক সপ্তদশ শতকে ইনি বর্তমান ছিলেন, ধরে নেওয়া যায়। অপরাপর কবিদেব পক্ষে এর সমকালীন হওয়াও বিচিত্র নয়। যা হোক, ভাষা, সামাজিক পরিবেশ এবং দৃষ্টিভঙ্গি-আদি আভ্যন্তর লক্ষণ-বিচাবে পল্লীগীতিকাগুলিকে সাধারণভাবে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা বলে গ্রহণ করলেও এদের প্রতি অবিচার করা হবে না বলে আশা করি।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন সংগৃহীত পল্লীগীতিকাগুলিকে 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে চাবটি খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশ কবেছেন। এদের মধ্যে 'মযমনসিংহ গীতিকা' নামক খণ্ডটিই শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিনিধি-স্থানীয়। পল্লীগীতিকার আলোচনা-প্রসঙ্গে সাধারণত 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র কথাই উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এই খণ্ডে মোট দশটি গাথা সঙ্কলিত হযেছে। 'মহুযা, মলুযা, চন্দ্রাবতী, দেওয়ান ভাবনা, কঙ্ক ও লীলা, কেনাবাম, রূপবতী, কাজলরেখা, দেওয়ানা মদিনা'।

গাথাকাব্যগুলির প্রত্যেকটির মূলে বয়েছে প্রেম এবং প্রত্যেকটিই নায়িকা-প্রধান। আবাব প্রত্যেক নাযিকাই আপন আপন স্বাতন্ত্র্যে দীপ্তিমযী। মঙ্গলকাব্যগুলিব মধ্যে কবিদেব যেমন গতানুগতিক পথেব বাইরে যাবাব উপায় ছিল না, গাথা কাব্যে তেমন নয়। কবিদের প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে কাহিনীকে গড়ে তুলেছেন। ফলে প্রতিটি কাহিনী অপবটি থেকে পৃথক। অধিকাংশ নায়িকার জীবনেই ট্রাজেডি ঘনীভূত হয়ে এলেও নায়ক চরিত্রেব স্বাতন্ত্র্য এবং পবিবেশ-পার্থক্যের ফলেই কাহিনীতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। জনৈক সমালোচক একালেব দৃষ্টিভঙ্গিতে গাথাকাব্যগুলির শ্রেণীবিন্যাস করে বলেছেন—"মহুযা হইয়াছে চলচ্চিত্রের সিনেরিও বা চিত্রনাট্য, মলুযা হইযাছে কাব্য, চন্দ্রাবতী ও দেওয়ান ভাবনা ছোটগল্প, কাজলরেখা শিশুমনেব এবং রূপবতী ও কমলা বযস্কদিগেব রূপকথা, কঙ্ক ও লীলা ছোট উপন্যাস, দেওযানা মদিনা জীবনচিত্র এবং কেনারাম পৌবাণিক উপাখ্যান।"

সমাজ পটভূমিকাব বিচাবেও ময়মনসিংহ গীতিকাব অন্তর্ভুক্ত গাথাকাব্যগুলিব বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এদের মধ্যে 'দেওয়ান ভাবনা' ও 'দেওয়ানা মদিনা' মুসলিম জীবন কাহিনী-অবলম্বনে বচিত এবং 'মহুয়া, মলুয়া', 'চন্দ্রাবতী ও কঙ্ক-লীলা' কাহিনীর সঙ্গে মুসলিম

সম্পর্ক বর্তমান রয়েছে। দুটি সম্প্রদায়ের জীবনকাহিনী কবিরা এমনভাবে যোগ করেছেন যেখানে সাম্প্রদায়িকতাবোধ একেবারেই অনুপস্থিত। বস্তুত, দ্বিবিধ সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের যে প্রচেষ্টা ঐ গাথাকাব্যগুলিতে দেখা যায়, তেমন দৃষ্টান্ত মধ্যযুগে দুর্লভ ছিল। এই কাব্যগুলির অপর বৈশিষ্ট্য—এগুলিতে পৌরাণিক প্রভাব একেবারেই অনুভূত হয় না। এতে মানুষের হৃদয়ানুভূতি, মানুষের সৌন্দর্য এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য প্রথম সুষম সমন্বয়ের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে, যাকে তুলনাহীন বলেই বর্ণনা করা চলে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করেছেন, "মৈমনসিং থেকে যে সব গাথা সংগ্রহ করা হয়েছে তাতে সহজেই বেজে উঠেছে বিশ্বসাহিত্যের সুর। কোনো শহরে পাবলিকের দ্রুত ফরমাশের ছাঁচে ঢালা সাহিত্য তো সে নয়। মানুষের চিরকালের সুখদুঃখের প্রেরণায় লেখা সেই গাথা যদি বা ভিড়ের মধ্যে গাওয়া হয়েও থাকে, তবু এ ভিড় বিশেষ কালের বিশেষ ভিড় নয়। তাই, এ সাহিত্য সেই ফসলের মতো যা গ্রামের লোক আপন মাটির বাসনে ভোগ করে থাকে বটে তবুও তা বিশ্বেরই ফসল—তা ধানের মঞ্জরী।"

'মহুয়া' গাথাটি দ্বিজ কানাই নামক একজন নমঃশূদ্রের ব্রাহ্মণ দ্বারা রচিত। সমগ্র 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র মধ্যে এই কাহিনীটিই যেমন সর্বাধিক প্রচার লাভ করেছে, তেমনি বহির্বিশ্বেও বহু সুধীজনের প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ব্রাহ্মণ জমিদার-পুত্র নদের-চাঁদেব সঙ্গে বেদের পালিতা কন্যা মহুয়া সুন্দরীর রোমাণ্টিক প্রণয়-কাহিনী গাথাটির উপজীব্য। কাহিনীটির অসাধাবণ নাটকীয়তার জন্যই এর সফল মঞ্চাভিনয় এবং চলচ্চিত্রাভিনয় পর্যন্ত সম্ভবপর হয়েছে। স্থানীয় লোকদের ধারণা, কাহিনীটি বাস্তব। গ্রন্থোক্ত স্থানগুলি এখনও বর্তমান। রচনাটির নাটকীয়তা, ট্র্যাজিক পবিসমাপ্তি এবং সংলাপেব মাধুর্য একে অপরূপ রমণীয়তা দান করেছে। এব উপকাহিনী-বর্জিত ঘনসন্নিবিষ্ট কাহিনী, চমকপ্রদ গতি, চরিত্রেব স্বাভাবিকতা এবং বাস্তবতা একে বিশিষ্ট মর্যাদা ভূষিত করেছে। মনীষী ষ্টেলা ক্রেমরিস মহুয়া পড়ে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখেছিলেন, "এমন মর্মস্পর্শী এমন সহজ সুন্দর কোন আখ্যান পড়ি নাই।" কাহিনীটি পূর্ব ময়মনসিংহের গ্রামাঞ্চলে এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে শতাধিক বৎসরের পূর্বেও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান কৃষকদের দ্বারা অবসরকালে এব একজাতীয় নৃত্যসহ-গীতাভিনযের প্রত্যক্ষদ্রষ্টার অভাব ছিল না।

মহুয়া

'মলুয়া' কাব্যটির রচয়িতা কে ছিলেন জানবাব উপায় নেই। কেউ কেউ একে মহিলাকবি চন্দ্রাবতীর রচনা বলে অনুমান করলেও এটি সত্য নয় বলেই মনে হয়। এই গ্রন্থেও যে সকল গ্রামের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, বাস্তবে তাদের অস্তিত্বও বর্তমান। কুড়া-শিকারী চাঁদ বিনোদ এবং মলুয়ার প্রণয়কাহিনী গাথাটির উপজীব্য। কাজির অত্যাচারে মলুয়া নির্যাতিতা হ'লে যখন তার আত্মীয় বন্ধুজন তাকে ঘরে নিতে অস্বীকাব করল, তখন মলুয়া নৌকা ডুবিয়ে আত্মহত্যা করল। কাহিনীর এই অতিশয় করুণ বিয়োগান্তক পরিণতি অনেকটা অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, " 'মলুয়া' গল্পটির মধ্যে রূপকথাব লক্ষণ সর্বাপেক্ষা অধিক প্রকট; যে মন-পবনের-নাও-এ চড়িয়া নায়িকা নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছে, তাহা রূপকথার অতল সমুদ্রে পাড়ি দিতেই অভ্যস্ত।" স্থানীয় অঞ্চলে গাথাটি 'কুড়া শিকারীর পালা' নামে প্রচলিত।

মলুয়া

'চন্দ্রাবতী' গাথাটি নয়ান ঘোষ নামক কবির রচিত। কাহিনীটি যে শুধুই বাস্তব তা' নহে, কাহিনীর নায়িকা বাঙলার প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতী দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা। চন্দ্রাবতীর বাল্যপ্রণয়ী জয়চন্দ্র কোন মুসলমান রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিবাহ করলে চন্দ্রা আজীবন কুমারীব্রত গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ এই অবসরেই তিনি 'রামায়ণ' রচনা করেছিলেন।

চন্দ্রাবতী

এর পর অবশ্য জয়চন্দ্র আবার চন্দ্রাবতীর নিকট ফিরে এলেন; কিন্তু চন্দ্রাবতী তখন অপর এক ভাবজগতের অধিবাসিনী। জয়চন্দ্র উপেক্ষিত হয়ে ফিরে যেতে হয়েছিল। 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র অনেকগুলি গাথাই বিয়োগান্তক, — মৃত্যুতেই ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু চন্দ্রাবতী বেঁচে থেকে যেভাবে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করেছেন, তার ট্রাজেডি তুলনাহীন। অধ্যাপক শ্রীভট্টাচার্য বলেন, "...নিবপেক্ষ রস-বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকা চন্দ্রাবতী। ইহা কেবল বাংলার নহে, বিশ্বসাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট ছোটগল্প — গাঢ় সংবদ্ধ, সূক্ষ্ম ইঙ্গিতপূর্ণ, আদ্যন্ত রিয়ালিষ্টিক এবং যথার্থভাবে ট্রাজিক। ইহাতে ভাবোচ্ছ্বাসের সর্ববিধ চপলতা নিঃশেষে পরিত্যক্ত হইয়াছে, কবি আর্টের কঠোর শাসনে মর্মভেদী হাহাকারকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছেন, ফলে নায়িকা দেখা দিয়াছে অন্তর্গূঢ় মর্মান্তিক বেদনার মূর্তিমতী প্রতিমারূপে।" সমকালীন কাহিনীটিতে নাটকীয়তাও যেমন রয়েছে, তেমনি সামাজিক অবস্থারও প্রতিফলন ঘটেছে। সাম্প্রতিক কালে এর অভিনয় রঙ্গ মঞ্চে ও দূরদর্শনের পর্দায়ও দেখা যাচ্ছে।

'ময়মনসিংহ গীতিকা'র অধিকাংশ গাথাই বাস্তব ঘটনা-অবলম্বনে রচিত হলেও কোন কোনটি রূপকথার লক্ষণাক্রান্ত। এদের মধ্যে গদ্য ও পদ্যাত্মক 'কাজলরেখা' পুরোপুরি রূপকথা। গ্রন্থে ধৃত গদ্য রচনাটি সংগ্রহ-কালের স্থানীয় বাগ্‌ভঙ্গির অনুকরণে কল্পিত হয়েছে — বলা বাহুল্য গীতিকার এই কাহিনীর মতোই অপর সকল কাহিনীও লোকমুখ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এটি একটি শিশুমনের উপযোগী করেই যেন রচিত হয়েছে। 'রূপবতী' এবং 'কমলা' বাহ্যত বাস্তব কাহিনীরূপে রচিত হলেও আসলে দুটিই রূপকথার লক্ষণাক্রান্ত।

অনান্য গাথা

মহিলা কবি চন্দ্রাবতী -রচিত 'কেনারাম' অনেকটা পৌরাণিক কাহিনীর সাদৃশ্যযুক্ত হলেও এটি বাস্তব ঘটনা। চন্দ্রাবতীর পিতা প্রসিদ্ধ 'মনসামঙ্গল'-কাব্যকার দ্বিজ বংশীদাসের সঙ্গে দস্যু কেনারামের জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগ বর্তমান। কেনারাম দস্যুতার সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করত। তারপর বংশীদাসের সংস্পর্শে আসবার পর কিভাবে তার মনোভাব এবং জীবনধারার পরিবর্তন ঘটল, তা'ই কাহিনীটিতে বর্ণিত হয়েছে। চারজন কবির রচিত 'কঙ্ক ও লীলা' কাহিনীটিতে চন্ডাল-পালিত ব্রাহ্মণ-সন্তান কঙ্ক ও কঙ্কের আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণ গর্গের কন্যা লীলার প্রণয়কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা চলে যে সম্ভবত এই কঙ্কই বাঙলা ভাষার আদি 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের রচয়িতা কবি কঙ্ক। 'দেওয়ান ভাবনা' এবং 'দেওয়ান মদিনা' উভয় গাথাই বিয়োগান্তক।

গাথাকবিতা বা Ballad -এর যে সকল সাধারণ লক্ষণের কথা বলা হয়ে থাকে, সেই সমস্ত লক্ষণ মিলাতে গেলে 'ময়মনসিংহর গীতিকা'র অন্তর্ভুক্ত গাথাগুলিকে Ballad নামে

ভূষিত করা সঙ্গত হ'বে কিনা তা বিতর্কের বিষয়। 'Ballad. a widespread category of traditional poetry, mainly narrative in form, direct, simple and often dramatic in style and generally composed to be recited or sung. The ballad is popular in the broadest senses : it deals with themes of universal concern and provided entertainment for the whole community.'

Ballad

গাথা কবিতা কখনও কোন রীতির অনুসরণে কিংবা আলংকারিকের নির্দেশে রচিত হয় না বলেই মনে হয় যে এদের কোনো বিধিবদ্ধ সংজ্ঞায় বিশেষিত করা সহজ নয়। তৎসত্ত্বেও Balllad এর যে সমস্ত লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে, গীতিকার অধিকাংশ কাহিনীতেই তাদের সব কটি অথবা অধিকাংশ লক্ষণই বর্তমান। প্রচলিত কাহিনীর উপর নির্ভর করে আখ্যায়িকার আকারে প্রত্যক্ষ এবং সরল সহজ এমন কি স্থানীয় গ্রাম্যভাষায় যথেষ্ট নাটকীয়তা-সহ এগুলি মুখে মুখে রচিত হয়েছিল প্রধানতঃ পুথিপড়া ভঙ্গিতে সুর-সহযোগে পাঠের জন্য অথবা গানের জন্যই। এ ছাড়া ঐগুলি সাধারণভাবে লোকায়ত ও জনপ্রিয় ছিল; ব্যক্তিগত কাহিনী বা আবেদন নিয়ে বচিত হ'লেও এদের মধ্যে ছিল সার্বজনীনতা। এগুলি সমগ্র সমাজেব নিকটই (হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে) গ্রহণযোগ্য ছিল। যা হোক সাধারণ বিবেচনায় ময়মনসিংহ গীতিকার কাহিনীগুলিই বাংলা ভাষার Ballad বা গাথা কবিতা।

পল্লীগীতিকাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আবিষ্কার করতে পারি। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এদের অধিকাংশের মধ্যে প্রেমই প্রাধান্য লাভ করেছে। এই প্রেমও আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসামাজিক। অল্পবিস্তর নাটকীয়কতা প্রায় সবগুলি কাহিনীতে বর্তমান। কোনটায় কম, কোনটায় বেশি। পল্লীগীতিকাগুলির কয়েকটি তো একালেও সার্থকতার সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। এই গাথাগুলি যে প্রধানত গানের জন্যই রচিত হয়েছিল, তার পবিচয় এদের ভিতর বর্তমান। প্রায় সব গাথাতেই নারীর প্রাধান্য ঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগের অধিকাংশ কাব্যেই এই বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। কবিবা নির্লিপ্তভাবে কাহিনী রচনা করলেও প্রকৃতির প্রভাবকে তারা অস্বীকার করতে পারেন নি। অধিকাংশ গাথায়ই প্রকৃতি যেন সজীব হয়ে উঠেছে। গাথাকাব্যের গীতি-প্রবণতাও আলোচ্য প্রত্যেকটি গাথায় বর্তমান। গাথাগুলিতে সমসাময়িক যুগের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাদের যাথার্থ্যে সন্দেহ করবার অবকাশ নেই। কবিবা ঔপন্যাসিকের সত্যনিষ্ঠা এবং বাস্তবধর্মকে পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করে নিয়েই গাথাগুলি রচনা করেছেন। মানবীয় রসের আশ্চর্য উৎসার এই কাব্যগুলির সাহিত্যধর্মও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। স্থানে স্থানে এদের ভাষার ও কবিত্বের সৌন্দর্যে অনেক সংশয়ীও তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। বস্তুত এই সমস্ত লক্ষণ-বিচারে সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে মানবিক ভাবধারা ও জীবনরসে পূর্ণ এই পল্লীগীতিকাগুলির স্থান একক ও অনতিক্রমণীয়। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় ঃ

সাধারণ লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য

"...এই সমস্ত দিক দিয়াই ময়মনসিংহ গীতিকা উপন্যাস সাহিত্যের উৎপত্তির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত। বাঙ্গালাদেশের সাহিত্যের আর কোথাও অবিমিশ্র বাস্তবতার এমন তীক্ষ্ণ, তীব্র আত্মপ্রকাশ দেখা যায় না। আখ্যায়িকাগুলির কোথাও অতি প্রাকৃতের স্পর্শ বা দেবকীর্তি-প্রচারের প্রয়াস আছে। কিন্তু মোটের উপর যে মনোবৃত্তির প্রাদুর্ভাব, তাহা অকৃত্রিম বাস্তবপ্রীতি, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, পরিবেশের ও সমাজ আবেষ্টনের নিখুঁত চিত্রাঙ্কন, ভাব-প্রকাশে কথ্য ভাষার প্রয়োগ ইহাদিগকে উপন্যাসের আরও নিকটবর্তী করিয়াছে। পল্লী-সাহিত্যের ধারা যদি আমাদের সাহিত্যে অক্ষুণ্ণ থাকিত, গ্রামের অখ্যাত আবেষ্টন ও অশিক্ষিত গায়কের সংস্পর্শের পরিবর্তে ইহা যদি কেন্দ্রস্থ সাহিত্যের পদমর্যাদা লাভ করিত, ভারতচন্দ্রের বিকৃত, কুরুচিপূর্ণ প্রভাব যদি আমাদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টাকে কৃত্রিম প্রণালীতে প্রবাহিত না করিত, তবে সম্ভবত বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের জন্মদিনও আরও অগ্রবর্তী হইত। উপন্যাস সাহিত্যের পূর্ব-সূচনার দিক দিয়াও ময়মনসিংহ গীতিকার প্রয়োজনীয়তা সর্বথা স্বীকার্য।"

ঔপন্যাসিক লক্ষণ

[তিন] লোকসঙ্গীত

সম্ভবত সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে বাঙলা সাহিত্যের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। চর্যাপদগুলিতে আমরা প্রাচীন বাঙালীর এই সঙ্গীত-চেতনাই লক্ষ্য করে থাকি। অতঃপর এই সঙ্গীত-পরায়ণতা দু'টি ধারায় প্রবাহিত হ'তে থাকে ঃ একটি পদাবলী শাখা, অপরটি লোকসঙ্গীতের ধারায়। লোক-সঙ্গীতের ধারায় কালে কালে যে সকল গীত রচিত হয়েছিল, সম্ভবত তা মুখে মুখে চলত বলেই ক্রমে কাল-কবলিত হয়েছে। বাঙলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার মধ্যে নাথপন্থীরাই এই ধরনের সঙ্গীতগুলিকে পৃথক্ মর্যাদা দিতেন বলে মনে হয়। তাই দেখা যায় শৈব সিদ্ধাদের কাহিনীতে এবং নাথসাহিত্যে এই জাতীয় কিছু কিছু গান বর্তমান রয়েছে।

বাউল গান ঃ

যে ধরনের গানগুলিকে লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাদের মধ্যে 'বাউল' সঙ্গীতই প্রধান। এছাড়া 'মুর্শিদী' এবং 'মারফতী' গানও অন্যতম। বাঙলাদেশে তথা সমগ্র উত্তর ভারতেই এক মরমীয়া সাধক সম্প্রদায় এই ধরনের সঙ্গীতের রচয়িতা। তারা কোন প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাসী নয়, বিশেষতঃ যে কোন আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় কৃত্যই তাদের দু'চোখের বিষ। তারা নিজেদের 'সহজিয়া' বা 'সহজপন্থী' বলেই পরিচয় দিয়ে থাকেন। এই সাধক সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দু' সম্প্রদায়ের লোকই আছেন, কিন্তু কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার বন্ধনই তারা মানতে চান না। এইজন্যই তারা আপনাদের মুক্ত পুরুষ বলে বিবেচনা করে থাকেন। এই সহজপন্থী অথবা সাধু সম্প্রদায় দেহাত্মবাদী। তাদের যোগ-সাধনা-প্রক্রিয়াদি সবকিছুই দেহকে কেন্দ্র করে। তাই দেহের ঊর্ধ্বে অপর কোন শক্তিতে তাদের আস্থা নেই। এঁরা 'গুরুবাদী' — তাই এঁদের বিভিন্ন সম্প্রদায় 'সাঁই, কর্তাভজা, দরবেশ' প্রভৃতি নামে পরিচিত। মনের মানুষই তাদের মতে একমাত্র

বাউলদের বৈশিষ্ট্য

সাধনযোগ্য। এই মনের মানুষের ধারণা-সম্বন্ধে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন ঃ "In the conception of the 'Man of the heart' of the Bauls, we find a happy mixture of the conception of the Parmatman of the Upanisads, the Sahaja of the Sahajiyas, and Sufi-istic conception of the Beloved" তাঁর মতে উপনিষদের পরমাত্মা, সহজিয়াদের সহজ এবং সুফীবাদের প্রিয়ানুভূতির মিলনেই বাউল ধর্মের উৎপত্তি।

বাউলগণ আপনাদের অতি হীনরূপে চিত্রিত করে স্বেচ্ছায় নানা অপনাম গ্রহণ করে থাকেন। যেমন পদ্মলোচন নিজেকে বলেন 'পোলা', কুবের হলেন 'কুবীব'। 'বাউল' শব্দটিও সম্ভবত 'বাতুল' (পাগল) শব্দের অপভ্রংশ। বাউল সঙ্গীত তাদের সাধনার এক অপরিহার্য অঙ্গ। সাধারণত একতারা যন্ত্র-সহযোগে এক ধরনের বিশেষ নৃত্যভঙ্গিমার সঙ্গে তারা বাউল সঙ্গীত গেয়ে থাকেন। এইজন্যই যেন সঙ্গীতের মধ্যেও একটা নৃত্যচ্ছন্দ অনুভব করা যায়।

বাউল সঙ্গীত

অধ্যাপক শ্রীভট্টাচার্য বাউলদের ধর্মসাধন-পদ্ধতি সম্বন্ধে অতিশয় নিষ্ঠুর মন্তব্য করলেও বাউল-সঙ্গীত সম্বন্ধে বলেছেন ঃ "বঙ্গীয় সঙ্গীত সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে বাউল-সঙ্গীত। ভাষাভঙ্গী ও সুরের এতখানি সরলতা, সাবলীলতা ও বাঙালীভাব বাংলার অন্য কোন সঙ্গীতে দেখা যায় না। বাউল সুর মৌলিক ও বঙ্গজ। ইহা লঘু, তরল ও দ্রুতলয়বিশিষ্ট, স্বভাব-ধর্মে গ্রাম্য। ...বাউল-সঙ্গীত সর্ববিধ ভার হইতে মুক্ত, ইহার সুর সহজ প্রাণের সুর, অমার্জিত পল্লীভাষার নিত্য-সহচর, তা ছাড়া নৃত্য-সহচরও বটে।"

প্রাচীন বাউল গানগুলি অনেকটা mystic বা রহস্যমণ্ডিত। বাইরের দিক থেকে দেহতত্ত্ববিষয়ক গানগুলির একটি অর্থ খুঁজে পাওয়া গেলেও এদের গুহ্য তত্ত্ব একমাত্র মরমীয়া-পন্থীরাই বুঝতে পারেন। 'চন্দ্র, রস, ফুল, ত্রিবেণী, অম্বুবাচী' প্রভৃতি শব্দগুলি বিশেষ অর্থেই কবিতায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চর্যাপদের মতই এগুলিও 'সন্ধ্যাভাষা'য় রচিত বলা

রহস্যময়তা

চলে। শিক্ষিত ভদ্রসমাজে এদের বিশেষ কোন মর্যাদা না থাকলেও অশিক্ষিত গ্রাম্যসমাজে বাউল গানগুলি অতি সুপরিচিত এবং জনপ্রিয় সঙ্গীত। এই গানগুলির আধ্যাত্মিকতাও ধর্মপ্রাণ গ্রামবাসীদের সহজেই আকর্ষণ করে থাকে। অষ্টাদশ, ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতেও প্রাচীন বাউল গানের অনুসরণে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি একপ্রকার ভক্তিমূলক সঙ্গীত রচনা করেছেন।

বাউল গানের উদ্ভবভূমি বাঙলাদেশ হলেও কবে কোথায় বা কে প্রথম বাউলধারার প্রবর্তন করেন, এ বিষয়ে নিশ্চিতভবে কিছু বলা যায় না। তবে বাউল গান বিষয়ে বিশিষ্ট গবেষক ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, "আনুমানিক ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া

বাউলের উদ্ভব

১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাঙলায় বাউল গান এক পূর্ণ রূপ লইয়া আবির্ভূত হয়। অতএব সপ্তদশ শতকেই বাউল গানেরও উদ্ভব ঘটিয়াছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়। যে সকল বাউল গান অজ্ঞাত কবির রচিত তাদের মধ্যে কোন কোনটি সমকালে রচিত হইয়া থাকিতে পারে।"

সর্বপ্রকার ধর্মবন্ধন থেকে মুক্ত বাউল গান মনোভাবের দিক্ থেকে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। তাই হিন্দু গুরুর মুসলমান শিষ্য এবং মুসলমান গুরুর হিন্দু শিষ্য যথেষ্টই দেখা যায়। সর্বপ্রকার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানেরও তাঁরা সম্পূর্ণ বিরোধী। তাই তাঁরা মনে করেন — 'পথ ঢাইকেছে মন্দিরে মসজিদে।' তাঁদের এই মনোভাব বিশ্লেষণ ক'রে ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার বলেন, "নিজস্ব পৃথিবীর মধ্যে থেকে বাউলরা জীবনের আর্তি থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেছেন। তাঁদের আকাঙ্ক্ষার পথ হলো প্রেমের পথ। সহজিয়াদের মত তাঁদের লক্ষ্যও হলো সহজ হওয়া। শাস্ত্রীয় আচারবিধি বিধান সহজ মানুষের সৃষ্টি নয়। ভেদ-বিদ্বেষে জর্জরিত বিষয়কর্মে নিয়োজিত স্বার্থান্ধ মানুষের সৃষ্টি। সেই স্বার্থান্ধ মানুষের পথ বর্জন করে তাঁরা প্রেমের পথে অগ্রসর হলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই প্রেমের আয়ুধ সামগ্রিক ক্রিয়ায় সমবেতভাবে প্রয়োগ করার আয়ুধ নয়। আদর্শটা এখানে ব্যক্তিগত। বড় জোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে অন্য এক মানুষ লুক্কায়িত রয়েছেন যিনি 'মনের মানুষ', যিনি প্রেমময় কল্যাণস্বরূপ আনন্দস্বরূপ। সেই মনের মানুষের সঙ্গে মিলনের জন্যই বাউলদের আকৃতি।"

বাউলতত্ত্ব

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, বাউলদের এই মনের মানুষকে তাঁরা দেহের মধ্যেই সন্ধান করেন, দেহের বাইরে অপর কোন ঊর্ধ্বতর শক্তিতে বাউলরা বিশ্বাস করেন না। দেহকে কেন্দ্র করেই বাউলদের যাবতীয় যোগ-সাধনা-আদি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে—এদিক থেকে বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া এবং নাথপন্থীদের সঙ্গে তাঁদের ভাবনাগত সাদৃশ্য রয়েছে, কিন্তু হিন্দু সাধনায় এর কোন সমর্থন নেই। দেহভাণ্ডকে ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক বলে স্বীকার করা হলেও হিন্দুমতে দেহের ঊর্ধ্বে মন, মনের ঊর্ধ্বে বুদ্ধি এবং বুদ্ধির ঊর্ধ্বে আত্মাকে স্থান দেওয়া হয়। বাউলদের বড় জোর দেহাত্মবাদী বলা চলে কিন্তু হিন্দু অধ্যাত্মবাদী।

সুপণ্ডিত ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে, উপনিষদের পরমাত্মা সহজিয়াদের সহজ এবং সুফীবাদের প্রেমিক-ধারণার সংমিশ্রণ ঘটেছে বাউল ধর্ম ও সাধনায়। দেবতা বা ঈশ্বর বিষয়ে বাউলগণ নিস্পৃহ—তাঁদের প্রত্যক্ষ ইষ্টদেবতা বলতে গুরু বা সাঁইকে বোঝানো হয়। অবশ্য 'মনের মানুষ', 'সোনার মানুষ' প্রভৃতি রূপকের সাহায্যেও তাঁদের আরাধ্য ব্যক্তি বা বিষয়ের ইঙ্গিতও দেওয়া হয়। ক্বচিৎ ঈশ্বরার্থে কেউ কেউ 'মনের মানুষ' কথাটিও অবশ্য ব্যবহার করেছেন।

'সারি, জারি, ভাটিয়ালী, মালসী'-আদি বহুতর লোকসঙ্গীতের মতই বাউল গানগুলিও হয়তো শিক্ষিত সমাজের অবজ্ঞাবশতঃ লোপ পেয়ে যেতো, যদি না রবীন্দ্রনাথের মতো বিশিষ্ট মনীষীর দৃষ্টি ঐ দিকে আকৃষ্ট হতো। তিনি গগন হরকরা নামক এক বাউলের মুখে শুনে মুগ্ধ হলেন এবং স্বয়ং বাউল-সঙ্গীতসংগ্রহে উদ্যোগী হলেন। তিনিই বিবিধ প্রবন্ধে এবং বক্তৃতায় এদের প্রতি সুধীসমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। অতঃপর রবীন্দ্রনাথেরই প্রবর্তনায় শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী প্রভৃতি বাউল সঙ্গীত সংগ্রহ করেন এবং এ বিষয়ে বিবিধ তাত্ত্বিক আলোচনা ও গবেষণায় ব্রতী হলেন। ফলতঃ আমাদের দেশের এই সম্পদগুলি নিশ্চিত বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেল। সাম্প্রতিক কালে বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে লোক-সংস্কৃতির

বিভিন্ন শাখা — লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে পাঠক্রম প্রচলিত হওয়াতে লোকসঙ্গীত-বিষয়ে সংগ্রহ ও গবেষণা কার্য চলছে।

লালন ফকির ঃ একালে সেকালে বাঙলা দেশে অগণিত বাউল জন্মগ্রহণ করেছেন এবং এঁদের অনেকেই বাউল গানও রচনা করেছেন, কিন্তু এঁদের প্রায় সকলই অজ্ঞাত পরিচয়, শুধু গানের ভণিতা থেকেই নামের সন্ধান পাওয়া যায়, — যেমন 'লালন শাহ, পাঞ্জু শাহ, পদ্মলোচন, যাদুবিন্দু, হাউড়ে গোসাঁই, রসিক গোসাঁই, গোপাল, লালশশী, এরফান শাহ, অনন্ত বাউল, মদন বাউল, জগা কৈবর্ত' প্রভৃতি। এঁদের কারো কারো পরিচয় পাওয়া যায় এবং কেউ কেউ যে ছদ্মনাম গ্রহণ করেছেন, তা জানা যায়। তবে এঁদের মধ্যে খ্যাতিতে যে লালন শ্রেষ্ঠ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হয়তো বা রবীন্দ্রনাথের সাগ্রহ দৃষ্টি তাঁর উপর পড়েছিল বলেই কালে তিনি সুধীসমাজেরও দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিলেন।

লালন ফকির একালেই জন্মগ্রহণ করলেও দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু জানা যায় না। অনুমান ইনি ১৭৭৪ খ্রীঃ কুষ্ঠিয়ার ভাঁড়রা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রবাদ আছে, তিনি কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করলেও একবার অসুস্থতার সময় এক মুসলিম গৃহে দীর্ঘ সেবা গ্রহণ করায় সমাজচ্যুত হয়েছিলেন। অতঃপর তিনি ফকিরি গ্রহণ করে সেউরিয়া গ্রামে এক আখড়া স্থাপন করেন। অবশ্য অনেকে অনুমান করেন যে তিনি এক মুসলিম-কন্যাকে বিবাহ করেন ও আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু এর সমর্থনেও খুব জোরালো প্রমাণ নেই। তবে বাউল সাধনাকেই তিনি স্বধর্ম বলে গ্রহণ করবার পর যে তিনি কোন আনুষ্ঠানিক ধর্মমতেই বিশ্বাস করতেন না তা তাঁর বহু রচনা থেকেই অনুমান করা চলে। এমন কি তাঁর রচনায় রাধাকৃষ্ণ এবং গৌর-বিষয়ক গানেও যথেষ্ট আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

লালন ফকির-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁরই প্রবর্তনায় লালনের বহু গানও সংগৃহীত হয়েছিল—এর সংখ্যা ২৯৮টি। 'লালনগীতিকা' নামক অপর যে সঙ্কলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তাতে লালনের গানের সংখ্যা ৪৬২। এর বাইরেও যে লালনের রচিত অসংখ্য গান বর্তমান রয়েছে, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। অনেকেই অনুমান করেন, ১১৬ বৎসর বয়সে ১৮৯০ খ্রীঃ লালন সেঁউরিয়া আখড়াতেই দেহত্যাগ করেন।

লালনের বাউল গান-সম্বন্ধে অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "সীমা-অসীম বা জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্পর্কও তিনি অতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর ভাষা স্নিগ্ধ গীতিমূর্ছনায় পূর্ণ, উপমারূপকে সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের ব্যঞ্জনা এবং ভাবের গভীরতা এ যুগেও বিস্ময়কর। মূলতঃ তিনি বাউল সাধনার সঙ্কেত দিয়ে গানগুলি লিখেছিলেন। কিন্তু তত্ত্বকথাও তাঁর ভাষায় বিচিত্র কাব্যশ্রী লাভ করেছে; সর্বোপরি আধুনিক মনের সঙ্গে তাঁর গানগুলির কেমন যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে; সেইজন্য তিনি রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিলেন (যদিও তাঁদের দেখা শুনা হয়নি) এবং আধুনিক শিক্ষিত সমাজে এখনও স্মরণীয় হয়ে আছেন।"

রবীন্দ্রনাথ লালনের শিষ্য গগন হরকরার গান শুনেই মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তার রচিত সঙ্গীতও সংগ্রহ করে বিভিন্ন বক্তৃতায় ব্যবহার করেছেন। "আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে"—এই জনপ্রিয় সঙ্গীতটি গগন হরকরারই রচিত। আর একজন বিশিষ্ট বাউল কবি পাঞ্জ শাহ্। তিনি শতাধিক বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইনি 'নেড়ার ফকীর' নামেই অধিকতর বিখ্যাত। রবীন্দ্রনাথের আর একজন প্রিয় বাউল কবি ছিলেন শ্রীহট্টের হাসন রজা চৌধুরী। 'রূপ দেখিলাম রে নয়নে, আপনার রূপ দেখিলাম রে' সঙ্গীতটি তাঁর রচিত। মতিলাল সান্যাল ছিলেন উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণ সন্তান। তিনি 'হাউড়ে গোঁসাই' ভণিতায় কয়েকটি অতি উচ্চাঙ্গ পদ রচনা করেছেন। নবদ্বীপের 'চণ্ডীদাস রজকিনী' আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা চণ্ডীদাস গোঁসাইও কয়েকটি উৎকৃষ্ট বাউল সঙ্গীত রচনা করেন। সমগ্র দেশে বাউল-কবির সংখ্যা অসংখ্য। সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বহু বাউল সঙ্গীত রচিত হয়ে চলছে। এমন অনেকগুলি উচ্চাঙ্গ বাউল সঙ্গীতের নিদর্শন পাওয়া যায়, যার রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। এমন অনেক "বাউল গানেব মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্বের প্রকাশ আধুনিক-পূর্ব বাঙ্গালা সাহিত্যের গতানুগতিকতার বহু ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে।" বাউল সঙ্গীতের প্রভাব-সম্বন্ধে শেষ কথা এই — স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এর প্রভাবে অনেক সঙ্গীত রচনা করেছেন, এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে'।

শাক্ত পদাবলী

'মঙ্গলকাব্য'-প্রসঙ্গে এবং বিশেষভাবে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে বাঙলা সাহিত্যে শক্তিদেবতার উদ্ভব-সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত শক্তি-সাধনার ফলশ্রুতি-রূপে মধ্যযুগে আমরা বিরাট 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের সাক্ষাৎ লাভ করেছি। মনে হয়, তখনও পর্যন্ত দেবীর সঙ্গে ভক্তের সম্পর্কটি ছিল প্রধানত ভয়ের — দেবী যেন ভয় দেখিয়ে অথবা লোভ দেখিয়ে ভক্তের নিকট থেকে পূজা আদায় করবার জন্য সচেষ্ট। দেবী তখনও পর্যন্ত আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ কবতে পারেন নি, ব্যক্তিজীবনে ঘনিষ্ঠতা তো দূবেব কথা। কিন্তু তারপর গঙ্গার অনেক জল সাগরে পড়েছে। পরিবেশেব পরিবর্তনে দেবীর সঙ্গে ভক্তের পারস্পরিক সম্পর্কেরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। অনার্যকুল থেকে উদ্ভূত চণ্ডী জগজ্জননী কালীমাতায় রূপান্তরিতা হয়েছেন। এখন আর ভয় কিংবা লোভের প্রয়োজন হয় না, ভক্ত নিজেই প্রাপ্তি-কামনা নিয়ে মায়ের নিকট নালিশ জানায়। বলা বাহুল্য, ভক্ত-মানসের এই পরিবর্তনেব জন্য প্রচুব সময়ের প্রয়োজন হয়েছিল। বস্তুত অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই মাত্র সাধককবি রামপ্রসাদ এই অভিনব মনোভাবের প্রবর্তন করলেন। এই প্রসঙ্গে, যে পটভূমিতে এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, তার বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

শক্তিদেবতার রূপান্তর

[এক] শাক্ত পদাবলী-উদ্ভবের পটভূমিকা

চৈতন্যদেব বাঙলাদেশে যে ভাবের প্রবাহ বইয়ে দিয়েছিলেন, তারই জের চলেছিল দীর্ঘকাল পর্যন্ত (আঃ ১৫০০-১৭০০ খ্রীঃ)। বস্তুত চৈতন্যোত্তর কাল তথা মুঘল শাসনকাল ছিল বাঙলাদেশে শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ। বাঙালী জনসাধারণও শান্তসমাহিত চিত্তে প্রেমভাবের সাধনায় ব্রতী হবার সুযোগ পেয়েছিল এবং এই অবসরেই প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ 'বৈষ্ণব পদাবলী'গুলি রচিত হয়েছিল। তারপর অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভেই সুদূর রাজধানী দিল্লীর বুকে যে রাষ্ট্রনৈতিক আবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল, অনতিকাল পরেই তা আঘাত করল বাঙলাদেশকেও। ফলে দেশে যে শুধু শান্তি ও শৃঙ্খলার অভাবই দেখা দিয়েছিল, তা' নয়, সর্বপ্রকারেই বাঙলাদেশ একটা অবক্ষয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। বস্তুতঃ এই অষ্টাদশ শতকই বাঙলা

কবি রামপ্রসাদ

সাহিত্যের ইতিহাসে 'অবক্ষয় যুগ' নামে চিহ্নিত হয়ে থাকে। চৈতন্যদেবের যে সমুন্নত ব্যক্তিত্ব একটা বিরাট বিপর্যয়ের সময়েও বাঙালীর সামনে একটা স্থির আদর্শ রূপে বর্তমান ছিল. তেমন কোন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব না ঘটায় বাঙালী যেন চোখে অন্ধকার দেখছিল। বস্তুত, ঐ কালটা ছিল অপেক্ষাকৃত তমসাবৃত। তেমন কোন উৎকৃষ্ট কবিপ্রতিভার অনুপস্থিতিও অংশত এই অবস্থার জন্য দায়ী। ইতঃপূর্বে একবার তুর্কী-আক্রমণকালে অনুরূপ অবস্থায় বাঙালী কবিরা দেবতার কৃপার উপর নির্ভর করে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়েছিলেন। এবারও অন্তত একজন কবি এই অন্ধকারের মধ্যেও যেন বিদ্যুচ্চমকের মতই আলোর স্ফুরণ লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি এই সামগ্রিক অবস্থায় জগজ্জননীর নিকট শরণ গ্রহণের মধ্যেই আত্মরক্ষার উপায় দেখতে পেলেন। কিন্তু যেভাবে প্রাক্তন কবিরা দেবীকে অর্চনা করেছিলেন, ইনি তা থেকে ভিন্নপথে অগ্রসর হলেন। এই কবি একেবারেই দেবীর নিকট সুখ দুঃখ-সমন্বিত জীবন নিয়ে আত্মসমর্পণ করে বসলেন। এই কবিই সাধকশ্রেষ্ঠ 'রামপ্রসাদ'।

রাজনৈতিক পরিবেশই যে শুধু রামপ্রসাদের উদ্ভবের জন্য দায়ী, তা নয়। আমাদের সামাজিক অবস্থা এবং বাঙালীর মনোভাবও এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গি-সৃষ্টিতে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছে। চৈতন্যদেবের যুগজয়ী ব্যক্তিত্ব দীর্ঘকাল পর্যন্ত বৈষ্ণব কাব্যের ধারাকে নিষ্কলুষ রাখলেও পরবর্তীকালে তাতে বহু বিকৃতি প্রবেশ করায় এক সময় শিক্ষিত ভদ্রসমাজ বৈষ্ণব কাব্যের প্রতি বিমুখ হয়ে উঠেছিলেন। সহজপন্থী বৈষ্ণব সাধনার প্রতি গৃহী মানুষের একটু সভয় উপেক্ষার ভাব থাকাই স্বাভাবিক। পরন্তু পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে এমন কোন প্রতিভার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, যার সযত্ন প্রয়াসে বৈষ্ণব কবিতার নোতুনভাবে উজ্জীবন ঘটতে পারে। আবার বৈষ্ণব কাব্যের মূল সুরটি প্রেমের, এবং সেখানেও 'পরকীয়া প্রেমেরই শ্রেষ্ঠত্ব' — এ ছিল প্রমত্ত যৌবনের জয়গানেই মুখর। কাব্যে তা যতই মধুর হোক কিংবা এর উপর যতই আধ্যাত্মিকতা আরোপ করা যাক না কেন, সুস্থ গৃহী-জীবনের পক্ষে বৈষ্ণবীয় প্রেম কখনও কাম্য নয়। বৈষ্ণব পরকীয়া তত্ত্বের অসামাজিক হৃদয়বৃত্তি যে গৃহজীবনে একান্ত অনাকাঙ্ক্ষিত, তা বাঙলাদেশে চিরকাল স্বীকৃত হয়েছে। এইজন্যই বাস্তব জীবনে রাধা-কৃষ্ণের লীলাভিনয়ের স্থান ছিল গ্রামপ্রান্তে অবস্থিত 'বোষ্টম-বোষ্টমীর আখড়া'। বৈষ্ণব রসতত্ত্বকে বাস্তব জগতে রূপায়িত করবার কথা কোন সামাজিক মানুষই চিন্তা করতে পারেন না, এই কারণেই বৈষ্ণব গীতিকাব্যের সঙ্গে বাঙালীর বাস্তব জীবনের কোন যোগ নেই।

বৈষ্ণব প্রেমের সঙ্গে বাঙালী হৃদয়ের যোগ নেই

পক্ষান্তরে শক্তি-সাধনায় যখন জগজ্জননীকে আপন গৃহে মাতৃরূপে অথবা কন্যারূপে স্থাপন করা হ'লো তখন একদিকে যেমন আত্মশক্তি বৃদ্ধি পেল, অপরদিকে তেমনি নিষ্কলুষ ভক্তিরস ও বাৎসল্যরসের প্রবাহ বইতে লাগল। তান্ত্রিক শক্তি-সাধনার সঙ্গে আলোচ্য শক্তি-সাধনার পার্থক্য আকাশ-পাতাল—কথাটি স্মরণ রাখা প্রয়োজন। আরাধ্য দেবতাকে যখন কল্পলোক থেকে বাস্তব জীবনে স্থাপন করা যায়, তখন শক্তিসাধনায় দেবী বাঙালীর অন্তরের দেবতা বাস্তব জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গেও তাঁকে জড়িত হয়ে পড়তে হয় — তিনি বৈষ্ণব

শক্তি সাধনার দেবী বাঙালীর অন্তরের দেবতা

কাব্যে আরাধ্য-আরাধিকার মত ভাবলোকের অধিবাসী থাকেন না। বৈষ্ণব-সাধনায় সমাজ-সংসার আরাধনার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, 'শাশুড়ী-ননদী' পথের কাঁটা; শক্তি-সাধনায় সাধক কবি সমাজ-সংসারে থেকেই তার বিভিন্ন দায় থেকে উদ্ধার পেতে চাইছেন।

শক্তি-সাধক কবি বৈষ্ণব কবির মত বিষয়-বিমুখ নন, তিনি বিষয়-প্রত্যাশী, তাই তাঁর কাব্যে "পদের ফাঁকে ফাঁকে, উল্লেখে-ইঙ্গিতে-তুলনায়-রূপকল্পে সমাজ-জীবনের বাস্তব সমস্যা ছায়াপাত করিয়াছে। এখানে আমরা ডিক্রি-ডিসমিস, তহবিল-তছরূপ, হিসাবের খাতা প্রভৃতি বৈষয়িক জীবনের অনুষঙ্গের কথা শুনি; ঘুড়ি-ওড়া, পাশা-খেলা প্রভৃতি আমোদ-প্রকরণকে রূপক-রূপে ব্যবহৃত হইতে দেখি; বহু বিবাহ-বিড়ম্বিত পরিবারে বিমাতার স্নেহহীন, বিমাতৃ-শাসিত পিতার ঔদাসীন্যেব খবর পাই। ..শাক্ত পদাবলীতে সংসাবের সমস্ত গ্লানি কুশ্রীতা, দারিদ্র্য, রিক্ততা অনাবৃতভাবে প্রকট ও ইহার সাধনাক্রম অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত, উহার মধ্যে কোন নিগূঢ় ব্যঞ্জনা নাই।. বৈষ্ণব পদাবলীতে বাঙালীর মনের কথা যেন বেনামীতে ব্যক্ত হয়; শাক্ত পদাবলীতে উহাব একেবাবে সরাসরি, প্রত্যক্ষ প্রকাশ। সেইজন্য মনে হয যে অষ্টাদশ শতকে বাঙালীব সংসার ও ভাবজীবনে যে একটা গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহাই তাহার ভক্তি-সাধনার নূতন রীতিতে ও কাব্যপ্রকাশের নূতন ভঙ্গীতে স্বতঃই প্রতিফলিত হইযাছে।" (ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

শাক্তকাব্যে বাঙালী জীবনের প্রত্যক্ষ প্রকাশ

বাঙলাদেশে শক্তি-সাধনার এক কাব্যিক প্রকাশ ঘটেছে শাক্ত পদাবলীতে। প্রাচীনতব শাক্ত-সাহিত্যে (মঙ্গলকাব্যে) দেবী আপন মাহাত্ম্য-প্রচাবের জন্য ভক্তকে দিয়ে কাব্য রচনা করিয়েছেন। মঙ্গলকাব্যেব দেবী তার ভয়ঙ্কব রূপ ত্যাগ করে এখানে এত কোমল যে কোথাও তিনি আমাদের কন্যা উমা, কোথাও জননী শ্যামা। বৈষ্ণব কাব্যেব বাৎসল্য বস শাক্ত কাব্যকেও বাৎসল্য রসে সিক্ত কবেছে, যদিও শাক্ত কাব্যেব বাৎসল্যের অকৃত্রিমতা ও গভীরতা বৈষ্ণব কাব্যকেও অতিক্রম করেছে। আলোচ্য শাক্ত পদাবলীগুলি ভক্তেব হৃদয থেকে স্বতঃ-উৎসারিত বলেই তা গীতিকাব্যের আকার ধারণ কবেছে। ভক্ত হৃদয়েব আন্তবিকতায় এগুলি বৈষ্ণব কবিতাকে অতিক্রম করে যায। তবে এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব গীতিকবিতার প্রভাবের কথাও অস্বীকাব করা যায় না। বস্তুত বৈষ্ণব কবিতাকে আদর্শ করেই যে শাক্তপদকর্তাগণ পদ-রচনায় অগ্রসব হয়েছিলেন তা' বাস্তব সত্য। বৈষ্ণব কবিতা যেমন ভাব ও বসানুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত — শাক্ত পদাবলীও এইরূপ বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত। বৈষ্ণবগণ ক্ষুদ্রাকৃতি পদে যেমন সহজে ভাব প্রকাশ কবেছেন, শাক্ত কবিগণও সেই রীতিবই অনুসরণ কবেছেন, বৃহৎ কোন কাব্য বচনায় ব্রতী হন নি। রামপ্রসাদের কাব্য-আলোচনা-প্রসঙ্গে ডঃ সুশীলকুমার দে এই কথাটিই বলেছেন ঃ " Not only does he imitate in places characteristic diction and imagery of Vaisnaba Padabalis but he deliberately describes the Gostha, Rasa, Milana of Bhagabati in imitation of the Brindabana Lila of Srikrisna."

বৈষ্ণব পদাবলীব প্রভাব

শাক্ত পদাবলীগুলির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যে অবক্ষয়ের যুগে শাক্ত পদাবলী রচিত হয়েছিল, সেই যুগটি ছিল প্রধানত বিলাস-ব্যসনের যুগ। মানুষের মনে মধ্যযুগোচিত ধর্মভাব সাধারণভাবে অন্তর্হিত, আধুনিক যুগের যুক্তিবাদ তখনো অপেক্ষিত। এ হেন অবস্থায় শাক্ত পদগুলিতে ভক্তির যে আন্তরিকতা প্রকাশিত হয়েছে, তা সমকালের তুলনায় অকল্পনীয়। সাধারণভাবে বলতে গেলে শাক্তপদাবলীগুলিকে গীতি-কবিতা বলেই অভিহিত করতে হয়। কিন্তু আধুনিক যুগের গীতিকবিতাগুলি যেমন সুরবর্জিত হওয়া সত্ত্বেও সুখপাঠ্য কিংবা বৈষ্ণব কবিতাগুলি থেকে সুর-বর্জন করলেও যেমন রসানুভূতিতে পাঠকের মন মুগ্ধ হয়, শাক্ত পদাবলীর এতখানি ক্ষমতা নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের মধ্যে তত্ত্বের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তা ছাড়া একটা বিশেষ সুরের সঙ্গে এই পদাবলীগুলি এমনভাবে জড়িয়ে গিয়েছে যে সাধারণ আবৃত্তিতে পাঠকের মন পূর্ণ হয় না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এগুলিতে কবিহৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস ঘটেছে বলেই এদের গীতিকবিতা বলে আখ্যায়িত করতে হয়। নিঃসন্দেহে ধর্মীয় বিষয়কে অবলম্বন করেই শাক্ত পদাবলীর সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে এদের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে ধর্ম-সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে পাঠ করলেও এদের আবেদন বিঘ্নিত হয় না। শুধু তাই নয়, বৈষ্ণব কাব্যে কবির হৃদয়োচ্ছ্বাস কখনো আত্মকথা নয়, সর্বদাই পরোক্তি, কিন্তু শক্তিপদের ভাবোচ্ছ্বাসে কবি-হৃদয়ের প্রত্যক্ষ প্রকাশ ঘটেছে যার সঙ্গে আধুনিক কবিদেরই তুলনা চলে। অধ্যাপক চৌধুরী বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলীর তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে স্বীকার করেছেন, "বৈষ্ণব পদাবলী গোষ্ঠীগত প্রেমবিশ্বাসের ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত। তাই, এই পদসাহিত্যে ধর্ম ও মর্মানুরাগ সমসূত্রে বিধৃত। একে অন্য থেকে অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু শাক্তসঙ্গীতের ধর্মোৎসারিতা ধর্ম-নিরপেক্ষ ; ব্যক্তি-চিত্ত-প্রবাহে সমাকুল। এইখানেই এই দুই শ্রেণীর ধর্মনির্ভর গীতিসাহিত্যের ঐতিহাসিক পার্থক্য-মূল।" শাক্ত পদাবলীগুলি একান্তভাবে জীবনাশ্রয়ী। সমাজসংসারকে কেন্দ্র করেই এগুলি আবর্তিত হয়েছে, ব্যক্তিজীবন এবং সমাজ-জীবনের রূপ এগুলিতে বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। শাক্তসাধকরা কখনো সংসার ধর্ম ত্যাগ করে সাধনার কথা বলেন নি, তাদের প্রার্থনায় তাই একান্ত ঐহিক কামনাই প্রকাশ পেয়েছে। তারা মায়ের কাছে অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-বেদনার কথা নিবেদন করেছেন, তাদের হাত থেকে পরিত্রাণের-উপায় প্রার্থনা করেছেন। মানবিক আবেদনে পুষ্ট এবং জীবনরসে অভিষিক্ত এই পদগুলিতে বাঙালী গৃহস্থজীবনের যে অকৃত্রিম চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে, প্রাগাধুনিক যুগের কোন সাহিত্যেই তার তুলনা মিলবে না। এ দিক থেকে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে শাক্ত পদাবলীগুলির স্থান একক ও অনন্য। সমকালীন বাঙালী সমাজের এমন বাস্তব ঘরোয়া চিত্রের অকৃত্রিম বর্ণনা অন্যত্র দুর্লভ। কবি তাঁর স্বানুভূত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে প্রাণের আকৃতি-রূপে বর্ণনা করেছেন বলেই তো এমন জীবন্ত অথচ স্বাদু হয়ে উঠেছে।

শাক্ত পদাবলীর বৈশিষ্ট্য

বিষয়বস্তু ও রসের বিচারে শাক্ত পদাবলী দ্বিধাবিভক্ত — একদিকে বাৎসল্য রসাশ্রিত উমাসঙ্গীত, আর একদিকে, ভক্তিরসাশ্রিত শ্যামাসঙ্গীত, যেগুলি প্রকৃত অর্থেই সাধন-সঙ্গীত

[দুই] বিষয়-বিভাগ ঃ দুই ধারা

বিষয়বস্তুর দিক্ থেকে শাক্ত পদাবলীকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে ঃ ১. মাতৃসাধনা, শ্যামাসঙ্গীত বা কালীকীর্তন ২. কন্যাসাধনা, উমাসঙ্গীত বা আগমনী-বিজয়াব গান। মূলত শক্তি-সাধনাই কবিদের লক্ষ্য হলেও সম্পূর্ণ পৃথক্ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই পদগুলি রচিত হয়েছে। শ্যামাসঙ্গীতগুলিতে তত্ত্বের প্রাধান্য কিছুটা বেশি বলেই এগুলিতে মনোধর্মের প্রভাব রয়েছে; কিন্তু উমাসঙ্গীতগুলি একান্তভাবেই হৃদয়ধর্মী।

মাতৃ-সাধনায় কবি জগজ্জননীকে জননীরূপেই গ্রহণ করেছেন। এই শ্রেণীর পদগুলিতে একদিকে যেমন শক্তিতত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি সাধনতত্ত্বের পরিচয় বর্তমান। শক্তিতত্ত্বেব পদগুলিতে মাযেব বিভিন্ন রূপেব পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এই রূপ-চিত্রাঙ্কনে কবিরা কৃতিত্ব প্রদর্শন কবলেও যেভাবে বিভিন্ন রূপকের সাহায্য নেওযা হয়েছে, তার ফলে ভক্ত-সাধক ব্যতীত অপবের পক্ষে এদের পবিপূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়।

শ্যামাসঙ্গীত ঃ
মাতৃসাধনা/সাধনসঙ্গীত

এই পদগুলিতে তন্ত্রোক্ত দেবীব ধ্যানেব মূর্তিও সাবধানতা সহকাবে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা কবা হয়েছে। আবার দেবীকে ব্রহ্মময়ী বলেও অনেক পদে বর্ণনা করা হযেছে। বস্তুত তন্ত্র-সাধনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলে শক্তিতত্ত্বের স্বরূপ উপলব্ধি কবা কষ্টকব। সাধনতত্ত্ব-সম্বন্ধেও অনুরূপ উক্তিই প্রযোজ্য। এই পদগুলিতে শক্তি-সাধনার যে সকল গূঢ় তত্ত্বেব ইঙ্গিত রয়েছে, ভাবের ভাবুক না হলে তাদের মর্মোদ্ধার করা সহজ নয়। অবশ্য এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি পদে ভক্তের আকৃতি যে ভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে এদের সর্বজনীনতাকে স্বীকার কবে নিতে হয়। এখানে মাযের কাছে সন্তানের অভিযোগ, আব্দার এমন মানবিক আবেদন নিযে উপস্থিত হয়েছে যে সাধ্য আর সাধকেব অন্তরঙ্গ যোগটি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। শাক্ত পদাবলীর এই অংশেই সমাজ সংসারেব জটিলতা ও তা থেকে মুক্তির জন্য দেবীর নিকট আত্মনিবেদন করা হয়েছে। এইভাবেই কবি-প্রাণের আকৃতি প্রকাশ পাওয়াতেই সাধনসঙ্গীতগুলিও গীতিকাব্য হয়ে উঠবার অবকাশ পেয়েছে।

উমাসঙ্গীতগুলিতে দেবীকে কন্যারূপে ভজন করা হয়েছে। এই উমা আর পূর্বোক্ত শ্যামা মূলত পৃথক্ ছিলেন, পরে এদের অভিন্ন বলে প্রচার করা হযেছে। শ্যামা মূলত ভীষণা, তিনি অনার্যকুল থেকে উদ্ভূতা। পক্ষান্তরে উমা পৌরাণিক দেবী। দক্ষকন্যা সতী পর্বতরাজ হিমালয়-দুহিতা-রূপে জন্মগ্রহণ কবেছিলেন। এরই নাম উমা। কিন্তু এর যে কাহিনী পদাবলীগুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে, তা পৌরাণিক নয়, তা একান্তভাবেই বাঙালীর ঘবের কথা। এতে যেন বাঙলা মঙ্গলকাব্যেবই পদধ্বনি শোনা যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "বাঙ্গালার জলবায়ুতে মধুর রস বিরাজ করে, তাই বাঙ্গলাদেশে অত্যুগ্র চণ্ডী ক্রমশঃ মাতা অন্নপূর্ণারূপে, ভিখারীর গৃহলক্ষ্মীরূপে, বিচ্ছেদ-বিধুরা কন্যারূপে, মাতা, পত্নী ও কন্যা, রমণীর এই ত্রিবিধ মঙ্গলসুন্দররূপে দরিদ্র বাঙ্গালীর ঘরে মধুর রস সঞ্চার করিয়াছেন।"

উমাসঙ্গীতগুলি প্রধানত বৈষ্ণব কবিতার আদর্শে রচিত হলেও মানবিক আবেদনের দিক থেকে এগুলি নিঃসন্দেহে শ্রেয়ঃতর। উমাসঙ্গীত প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত—বাল্যলীলা, আগমনী ও বিজয়া। এই তিন খণ্ডেই বাৎসল্যরসের অনুপম প্রকাশ ঘটেছে। দুর্গাপূজা বাঙলাদেশে আর ধর্মীয় আচরণ বলে গণ্য হয় না, এটি এক বিরাট সামাজিক মহোৎসব। কন্যারূপী ভগবতী দুর্গা যেন স্বামীগৃহ থেকে তিনদিনের অবকাশে পিতৃগৃহে আগমন করেন, এই দিনগুলির প্রত্যাশায় সারাটি বছর কেটে যায়। তারপর সপ্তমী অষ্টমী পার হয়ে নবমীর আগমনেই কন্যাবিদায়ের কথা মনে জাগে। নবমী নিশি পার হলেই বিদায়লগ্ন—বিজয়া দশমী; কন্যাকে ঘিরে মাতৃমনের আনন্দ ও ব্যাকুলতা এই আগমনী ও বিজয়া গানগুলিতে অপূর্বসুন্দররূপে প্রকাশ পেয়েছে। এই বেদনা দুর্গা প্রতিমা-বিসর্জনের বেদনা নয়, কন্যা-বিদায়ের বেদনা। শাক্তপদাবলীর এই কবিতাগুলি পাঠ করলেই বোঝা যায়, কোন্ উপলব্ধি থেকে ইংরেজ কবি লিখেছিলেন, "Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts." পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন অনুভূতির এমন সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গীণ প্রকাশ বিশ্বসাহিত্যের কোথাও খুঁজে পাওয়া ভার।

উমাসঙ্গীত ঃ বাৎসলরস/কন্যাসাধনা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শাক্ত পদাবলীর যে সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সম্পাদক সত্যই বলেছেন, "শক্তি-বিষয়ক সঙ্গীত আমাদের ভাষা-ভাণ্ডারে যে কত আছে, তাহা ঠিক করিয়া বলা অসাধ্য ব্যাপার।" বস্তুত, বৈষ্ণব কাব্যের ধাবা বহুকাল গত হলেও শাক্ত পদাবলীর ধারা এখনও পর্যন্ত অব্যাহত বলেই মনে করি। বাঙলাব আধুনিক কবিদেরও অনেকেই যে শাক্তপদ রচনা করেছেন, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গন কাব্য' রচনা করলেও তা' বৈষ্ণব পদাবলী বলে গণ্য হয় না, অথচ তাঁব একটি কবিতাকে নিঃসন্দিগ্ধভাবেই শাক্ত পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। গভীর আনন্দের বিষয় এই, রবীন্দ্রনাথকেও শাক্ত-পদকর্তাদের তালিকায় স্থান দান করা হয়। শাক্ত পদাবলীর উদ্ভাবক কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন। এই ধারায় এঁকে শ্রেষ্ঠ কবির স্বীকৃতিও দান করা হয়। অপরাপর প্রাচীন কবিদের মধ্যে সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, প্রেমিক সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মহারাজ মহাতাব চাঁদ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, মহারাজ নন্দকুমার প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা চলে। যে সকল কবি কবিগান, টপ্পা, তর্জা, পাঁচালী-আদি লোকসঙ্গীত রচনা করে গিয়েছেন, তাঁদের অনেক রচনাই শাক্ত পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত। দাশু রায়, রাম বসু, ঈশ্বর গুপ্ত-আদি কবির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়, মৃজা হুসেন নামক একজন মুসলমান কবি এবং এন্টনি নামক একজন ফিরিঙ্গি কবিও শক্তি-বিষয়ক পদ রচনা করে গিয়েছেন। কাজি নজরুল ইসলাম অনেকগুলি শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেন। পরবর্তী কবিকুলের মধ্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশ ঘোষ, নবীন সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতির রচনায় শাক্তপদের সন্ধান পাওয়া যায়।

শাক্তপদ ও কবির প্রাচুর্য্য

[তিন] শাক্ত-কবিগণ

রামপ্রসাদ সেন ঃ সাধক কবি রামপ্রসাদ বাঙলা সাহিত্যে 'শ্যামাসঙ্গীত' এবং 'উমাসঙ্গীত' উভয় ধারারই প্রবর্তন করেন। কিন্তু 'বিদ্যাসুন্দর' নামক আদিরসাত্মক এক কাব্যও সমকালীন জনরুচির তাগিদেই হয়তো রচনা করেছিলেন, তবে তা পাঠক মহলে অন্ততঃত একালে বিশেষ সাড়া জাগাতে পারেনি। তিনি শ্যামাসঙ্গীতের প্রবর্তক-রূপেই জনসমাজে পরিচিত। যে সকল কবি এই জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেছেন, সংখ্যায় এবং উৎকর্ষে রামপ্রসাদ তাঁদের শীর্ষস্থানীয়। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর বিভিন্ন কবিদের পরিচয় সম্বন্ধে আমরা বার বার যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি রামপ্রসাদের ব্যাপারেও তাঁর ব্যতিক্রম ঘটে নি। কুমারহট্টের কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনই শাক্ত পদাবলীর প্রবর্তক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু বিভিন্ন পদে ভণিতার বৈচিত্র্যই সমস্যা সৃষ্টি করেছে। দীন রামপ্রসাদ, দ্বিজ রামপ্রসাদ, শ্রীরামপ্রসাদ, প্রসাদ -আদি নানারকম ভণিতাই শাক্তপদে সুলভ বলে কেউ কেউ একাধিক রামপ্রসাদের অস্তিত্বে আস্থা স্থাপন করে থাকেন। 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' ভণিতাটি যে কোন ব্রাহ্মণ রামপ্রসাদের, সাধারণভাবে তা' বিশ্বাস করতে হয়। ঢাকা জেলার মহেশ্বরদি পরগণার অন্তর্গত চিনিশপুরে রামপ্রসাদ নামে একজন ব্রাহ্মণ কালীসাধক ছিলেন। তিনি বৈদ্য রামপ্রসাদের সমসাময়িক বলে বিশ্বাস করা হয়। তাঁর সম্বন্ধে গবেষকগণ বলেন যে এঁর কন্যার নাম জগদীশ্বরী এবং দেবী কালী এই কন্যার ছদ্মবেশ ধারণ করে রামপ্রসাদের বেড়া বেঁধে দিয়েছিলেন। এই পক্ষের অনুমান—দ্বিজ রামপ্রসাদের সম্বন্ধে যে সকল কাহিনী প্রচলিত আছে, তাই বৈদ্য রামপ্রসাদের নামে প্রচলিত হয়েছে। যে সকল পদের ভণিতায় 'দ্বিজ' পাওয়া যায়, সেই সকল পদ চিনিশপুরের ব্রাহ্মণ রামপ্রসাদের রচনা। এটি অভিমত মাত্র, কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নয়। বস্তুত, কবিদের স্বহস্তলিখিত পদ পাওয়া না গেলে এই সমস্যার সমাধান হবে কি না সন্দেহ। এ ছাড়া একজন কবিওয়ালা রামপ্রসাদ চক্রবর্তী রচিত কিছু কিছু শ্যামাসঙ্গীত বিষয়েও কেউ কেউ উল্লেখ করে থাকেন। যে সকল পদে 'ডিক্রি' 'ডিসমিস' প্রভৃতি শব্দ রয়েছে, সেগুলিই তার লেখা বলে মনে করা হয়।

পরিচয় সমস্যা

পূর্বেই বলা হয়েছে, রামপ্রসাদ 'শ্যামাসঙ্গীত' এবং 'উমাসঙ্গীত'—উভয় প্রকার সঙ্গীত রচনায়ই পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি সঙ্গীত-রচনায়ই আপন প্রতিভাকে নিঃশেষ করেন নি, উক্ত সঙ্গীতে একপ্রকার বিশেষ সুর আরোপ করে তিনি সঙ্গীতগুলিকে আরও তাৎপর্যময় করে তুলেছেন। উক্ত বিশেষ সুরকে 'প্রসাদী সুর' বলে অভিহিত করা হয়। মনে হয়, এই বিশেষ সুরটি ছাড়া যেন শ্যামাসঙ্গীতের পূর্ণ আমেজ আসে না। অপর সকল কবির রচনাও সাধারণত প্রসাদী সুরেই গাওয়া হয়। কালক্রমে প্রসাদী সঙ্গীতগুলি এত জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নাগরিক-গ্রাম্য-নির্বিশেষে প্রায় যে কোন বাঙালীই কখনও না কখনও প্রসাদী সঙ্গীতে গুন্‌গুন্ করে থাকেন। যিনি তান্ত্রিক সাধনার কিছুই বোঝেন না, তিনিও অন্তত উমাসঙ্গীতের মাতা ও

কাব্যবিচার

সন্তানের সহজ সম্বন্ধটির জন্যই প্রসাদী সঙ্গীতের স্বাদ গ্রহণ করে থাকেন। "রামপ্রসাদ আবার তাঁহার কালীস্তুতির সহিত দুর্গার বাল্য ও বিবাহিত জীবনের কাহিনী সংযুক্ত করিয়া এবং আগমনী ও বিজয়া-বিষয়ক গান প্রবর্তন করিয়া বাঙালীর মাতৃকল্পনাকে সম্পূর্ণতা দান করিলেন। কালীর দুর্বোধ্য, ভয়-দেখানো আচরণের সহিত উমার বাৎসল্য-রসে অভিষিক্ত, স্নেহের দুলালী কন্যামূর্তি এক হইয়া গিয়া বাঙালীর মনে মায়ের কঠোর ও কোমল রূপ যেন অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশিয়া গেল—শ্মশানের নিঃসঙ্গ ভয়াবহতা ও গৃহাঙ্গনের পরিচিত স্নেহ আবেষ্টনের মধ্যে আর কোন ব্যবধান রহিল না। বিশ্ববিধানের দুর্জ্ঞেয়তা মমতা-পারাবারে ডুবিয়া গেল।" সাধক কবি রামপ্রসাদ কালী সাধনার দুটি ধারাতেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে মনে হয়, অন্তত তাঁর রচিত উভয়বিধ সঙ্গীত থেকে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়। কন্যাসাধনার ধারায় তিনি যে উমাসঙ্গীত তথা আগমনী-বিজয়ার গান রচনা করেছেন, তাতে মাতৃ হৃদয়ের যে বেদনা কোথাও বাধা পায় না, তা'ও সচ্ছন্দরূপে আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে। মাতৃত্বের বেদনা ও বাৎসল্যমহিমা এ জাতীয় পদগুলিকে পরম মাধুর্যে মণ্ডিত করে আস্বাদ্য করে তুলেছে। এ ছাড়া এ পদগুলিতে বাঙালীর গার্হস্থ্য, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের রূপ যেমন প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি এদের আধ্যাত্মিকতার দিকটিও সম্পূর্ণতঃ বজায় রয়েছে। ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য এ জাতীয় পদগুলি-সম্বন্ধে বলেন, "বিশ্বজননীকে কন্যারূপে কল্পনা ও আরাধনা ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার অন্যতম আশ্রয় এবং এই সাধনাকে আশ্রয় করিয়াই মাতৃ-হৃদয়ের বাৎসল্য অপূর্ব অধ্যাত্মরূপ লাভ করিয়াছে। ...অধ্যাত্ম-সাধনার গূঢ়রসকে দৈনন্দিন জীবনে এই ধরনের রূপান্তর বিরল। রামপ্রসাদের আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীতের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ইহাদের সহজ, সরল, অকপট প্রাণবন্ত ভাষা, এবং এই ভাষারূপের সঙ্গে বাঙালীর দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনের পরিচয় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ...এই জাতীয় গানের ভাষার সকরুণ ইঙ্গিত, ইহার অনাবিল আবেগ এবং ইহাদের একান্ত ঘরোয়া সুরের মধ্যে করুণ মাধুর্যের ব্যাপ্তি বাঙালীর ভাবমুগ্ধ চিত্তকে এক মুহূর্তে জীবনের গভীরতার মধ্যে টানিয়া লয়।"

কন্যাসাধনায় সাধনার দিক্‌টি শুধু আভাসে ইঙ্গিতে ব্যঞ্জিত হয়, মাতৃসাধনার দিক্‌টিই প্রধানরূপে প্রকট হয় বলে রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতে নিগূঢ় অধ্যাত্মসাধনার তত্ত্বই প্রাধান্য লাভ করেছে। অধিকন্তু এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভাব, ভাষা, ছন্দ এবং অলঙ্কারাদির ঐশ্বর্য। ফলতঃ রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতগুলি আস্বাদ্যতায় পরম রমণীয়। পল্লীবাঙলার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকে উপমা রূপকাদি অলঙ্কার আহরণ করে রামপ্রসাদ তাঁর কাব্যে যে অপরিমেয় ঐশ্বর্য যুক্ত করেছেন, তাতে অধ্যাত্ম সাধনার কোন হানি না ঘটিয়েই কবি সমসাময়িক বাঙালীর সমাজজীবনের একটা বাস্তব ও বিশ্বাস্য চিত্র ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। বাঙলার জনমজুর, চাষী, কামার, কলু বা মাঝির জীবনও কবির রচনায় একটা বিশেষ মাত্রা লাভ করেছে। 'মা, আমায় ঘুরাবে কত, খুলে দাও মা চোখের ঠুলি, একে তোর জীর্ণ তরী' প্রভৃতি পদের মধ্য দিয়ে রূপকে আভাষিত যে সকল চিত্র রামপ্রসাদ ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতে তাঁর অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে জনজীবনের যোগাযোগের পরিচয়টি সুন্দরভাবে

ফুটে উঠেছে। বেদ-বেদান্ত-পুরাণাদির প্রসঙ্গ বা বিবিধ তত্ত্বকথার জটিলতা ও দুর্বোধ্যতাকে পরিহার করে কবি তাঁর শাস্ত্রবোধকে বিভিন্ন শ্যামাসঙ্গীতের পদে জীবনবোধের সঙ্গে সমন্বিত করে নিয়েছেন। দৈনন্দিন জীবন ও অধ্যাত্মসাধনাকে এমনভাবে এক করে নেবাব মধ্যেই কবির শাক্তসঙ্গীতের চরম সাহিত্যিক সার্থকতা সম্পাদিত হয়েছে। রামপ্রসাদেব রচিত নিম্নোক্ত পদগুলি জনপ্রিয়তা ও উৎকর্ষে শীর্ষস্থানীয় ঃ

'আমায় দেও মা তবিলদারি।'
'আর কাজ কি আমার কাশী।'
'এবাব কালী তোমায় খাব।'
'এমন দিন কি হবে তারা।'
'গিরিবর, আব আমি পারি না উমারে।'—ইত্যাদি।

কমলাকান্ত ঃ সাধক কবি কমলাকান্তের পৈতৃক নিবাস ছিল কালনাব অম্বিকানগর গ্রামে। পরে তিনি তাঁর বাসস্থান পবিবর্তন কবেন। কবি ছিলেন বর্ধমান-রাজের গুরু ও সভাপণ্ডিত। তান্ত্রিক সাধক কমলাকান্ত 'সাধকরঞ্জন' নামে তান্ত্রিক যোগপদ্ধতিব এক গ্রন্থে তাঁর পাণ্ডিত্যেব পরিচয় দিয়েছেন, আর কালীকীর্তনগুলিতে সাধনা ও আধ্যাত্মিকতাব পরিচয় দান করেছেন। কিন্তু তাঁর কবিপ্রতিভাব সর্বাধিক স্ফুরণ ঘটেছে 'উমাসঙ্গীতে'। অনেকেই মনে কবেন, এ বিষয়ে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ শিল্পী। জনপ্রিয় উমাসঙ্গীতগুলির অধিকাংশই কমলাকান্তেব রচনা। তাঁর বচনার প্রধান গুণ — আন্তরিকতা। অনেক সময় তাব সঙ্গে নানাপ্রকার উচ্চ-ভাব কল্পনা কিংবা রূপকাদিব মিশেল দিয়ে তিনি তাঁর পদগুলিকে পবম স্বাদু করে তুলেছেন।

কমলাকান্তের ব্যক্তিগত জীবন-বিষয়ে নানাপ্রকার জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। বাগ্দীকন্যারূপে জগজ্জননী কালী তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন এবং তাঁর শ্যামাসঙ্গীতে মুগ্ধ হ'য়ে জনৈক দস্যুসর্দারেব অধিনায়কত্বে এক দস্যুদল তাঁব কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল — এ জাতীয় কাহিনীর সত্যতা নির্ধারণ আজ আর সম্ভব নয়। তবে এ থেকে অনুমান কবা যায় — সমসাময়িক এবং পরবর্তী কালের মানুষের মনে তিনি এক সশ্রদ্ধ আসন লাভ কবেছিলেন।

তাঁব ন্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসরের জীবৎকালে (আঃ ১৭৭২ খ্রীঃ জন্ম ও ১৮২১ খ্রীঃ মৃত্যু) তিনি যে সকল সঙ্গীত রচনা করেছিলেন তার সংখ্যা তিনশতাধিক। এ জাতীয় সঙ্গীতেব সবই উমাসঙ্গীত বা আগমনী-বিজয়াব গান নয়, অনেক শ্যামাসঙ্গীতও বয়েছে। উমার বাল্যলীলা, কন্যা উমার জন্য মা মেনকার অন্তর্বেদনা, কন্যাদর্শনে অভিলাষিণী মেনকার স্বামীর প্রতি অভিমান, উমার প্রতি আদবযত্ন এবং তাঁর প্রত্যাগমন বিষয়ে স্বামী শিবের ঘোবতর আপত্তি প্রভৃতির বর্ণনায় কবি কমলাকান্ত যে গার্হস্থ্য ও পারিবাবিক পরিবেশ সৃষ্টি কবেছেন, তাতে বাঙালী জীবনের বাস্তব এবং শাশ্বত চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে।

কমলাকান্ত শুধু যে উমাসঙ্গীত রচনাতেই যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, তা নয়; তাঁর রচিত শ্যামাসঙ্গীতগুলিতে ভক্তহৃদয়ের আকূতি যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আরাধ্যা দেবীর স্বরূপ এবং কবির ব্যক্তিগত ধ্যানধারণার প্রকাশে তাঁর কয়েকটি পদ সত্যিই অপূর্বতা

লাভ করেছে। 'সদানন্দময়ী কালী, তাই শ্যামরূপ ভালবাসি', 'শুকনো তরু মুঞ্জরে না', 'মজিল মনভ্রমরা' প্রভৃতি গানের ভাষা ও বিন্যাস পদ্ধতি অতিশয় মার্জিত ও দৃঢ়বদ্ধ। কল্পনা, ভক্তিভাব প্রভৃতির সঙ্গে উৎকৃষ্ট রচনারীতির মিশ্রণে কমলাকান্তের রচিত পদগুলি কালজয়ী হবার সুযোগ পেয়েছে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যেতে পারে যে, কমলাকান্ত সাধনা জগতেও অতি উচ্চ স্থানে আরোহণ করেছিলেন এবং তাঁর সাধনালব্ধ অনুভূতিই কবি-প্রেরণায় শাক্ত পদ-রূপে মুক্তি লাভ করে। তাই তাঁর পদে একদিকে যেমন রয়েছে ভাবের গাঢ়তা, অপরদিকে রয়েছে সেই আন্তরিকতা। 'সাধক কবি কমলাকান্ত' নামকরণে তারই সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। উমার বাল্যলীলা-অঙ্কনে কমলাকান্ত বৈষ্ণব কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁদের অনুকরণ করেছিলেন বলে মনে হয়। কারণ যাদবেন্দ্র-আদি বৈষ্ণব কবিগণ যেমন নিজেদের বালক শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সহচর বলে মনে করতেন ('যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইও'), উমার বাল্যলীলার পদে কমলাকান্তও তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গলাভ করেছেন।

প্রেমিক মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ঃ 'প্রেমিক' উপনামে রচিত বেশ কয়েকটি শ্যামা সঙ্গীত রচয়িতা মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রধান শাক্ত কবিদের মধ্যে একজন ছিলেন। খ্রীঃ অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে তিনি আন্দুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কবি, নাট্যকার এবং ঔপন্যাসিকও ছিলেন। তিনি একটি বাউল সম্প্রদায় ও একটি কালী-কীর্তন সম্প্রদায় গঠন করেছিলেন। মাতৃভাবে আত্মহাবা মাতৃ-প্রেমিক পুত্রের অভিমান নিয়ে তিনি তার পদগুলি রচনা করেছেন। তাঁর 'পারি না ক্ষ্যাপা মাযেরে', 'ফিরিয়ে নে, তোর বেদের ঝুলি', 'বড় ধূম লেগেছে হৃদি-কমলে', 'ব্যাভারেতে জানা গেল' প্রভৃতি পদগুলিতে কবি- প্রাণের আকৃতি এবং অভিমান যথাযথভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

অপরাপর কবি ঃ শাক্ত পদাবলীর ধারা একালে পর্যন্ত বিস্তৃত হলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ রামপ্রসাদ এবং কমলাকান্তের পাশে ঠাঁই পাবার মতো কবির সংখ্যা কম। এ ধারায় বিভিন্নভাবে অনেকেই দু'টি চারটি মাত্র পদ রচনা কবেছেন বলে এদের সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নয়। যাঁরা এ জাতীয় পদ রচনা করেছেন তাঁদের অনেকেই ছিলেন 'কবিওয়ালা' এবং অপর অনেকেই ছিলেন বিশিষ্ট ভূম্যধিকারী।

এ ছাড়া কবিওয়ালারা অনেকেই কবিগানের ভূমিকা-স্বরূপ 'মালসী' বা 'আগমনী-বিজয়াব' গদ গেয়ে নিতেন—এই প্রয়োজনেই তাঁদের অনেকে শাক্তপদ রচনা করেন। কবিশেখর কালিদাস রায় লিখেছেন, "রাম বসুর — 'কও দেখি উমা, কেমন ছিলে মা ভিখারী হরেব ঘবে, ওহে গিরি গা তোল হে, মা এলেন হিমালয়' ইত্যাদি গান উমাসঙ্গীতের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। গদাধর মুখোপাধ্যায়ের 'পুরবাসী বলে উমার মা, তোব হারা তারা এল ঐ' গানটি বড় মর্মস্পর্শী। দাশরথি রায়ের 'গা তোল, গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল, ঐ এল পাষাণী তোর ঈশানী', 'কই হে গিরি, কই সে আমার, প্রাণের উমা নন্দিনী' ইত্যাদি গান একদিন বাঙালীর চোখে জল ঝরাইত।" কবিওয়ালা রাম বসু, নীলু ঠাকুর প্রভৃতির মতোই রমাপতি

বন্দ্যোপাধ্যায়ও একজন শাক্তপদ-রচয়িতা কবিওয়ালা ছিলেন। তবে তাঁর নিজস্ব দল ছিল না, দলেব জন্য গান রচনা করতেন। তিনি রমাপতি ঠাকুর নামেই বিশেষ পরিচিত ছিলেন।

পাঁচালীকার 'দাশরথি রায়' তথা দাশু রায় একজন প্রকৃত গুণী কবি ছিলেন, তবে কবিওয়ালাদের দলের গান বেঁধে অর্থাৎ বাঁধনদার রূপেই কাব্য-জীবন শুরু করেন। পরে পাঁচালী-রচনায় মনোনিবেশ করেন এবং উৎকৃষ্ট অলঙ্কৃত ভাষায় 'চণ্ডী, দক্ষযজ্ঞ, গোষ্ঠলীলা, মানভঞ্জন, আগমনী ' প্রভৃতি পালাগান-রূপে রচনা করেন। পালাগানে তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায়, "মুখে মধু কিন্তু হূলে বিষ. কিন্তু 'আগমনী পালা'য় তথা শাক্তপদে শুধুই অন্তরের আকূতি, আকুলতা আর অনুতাপ।" রসিক বায় নামক একজন পাঁচালিকারও পাঁচালিতে যথোচিত আদিরসের ভিয়েন চড়ালেও শাক্তপদে শুধু আকুলতা আর নিবেদন। তাঁর 'আয় মা সাধন-সমরে' কিংবা 'আয় গো ভুবনেশ্বরী জগৎ-জননী' প্রভৃতি পদে ভক্তের আকূতিই প্রাণ পেয়েছে। পাঁচালিকার নবীন চক্রবর্তীও কয়েকটি উৎকৃষ্ট শাক্তপদ রচনা করেন। তিনি ইহজীবনে যেমন ভোগ কামনা করেন নি, কিন্তু পরলোকে মুক্তিও কামনা করেন নি, তাঁর আকাঙ্ক্ষা শুধু মায়ের চরণ। 'মদনমাস্টার' নামক একজন যাত্রাওয়ালাও 'চণ্ডীযাত্রা' রচনা করতে গিয়ে অনেকগুলি শাক্তপদ রচনা কবেন। তাঁব বক্তব্যেও ভক্তি-মুক্তি নয়, মায়ের চরণই একমাত্র কাম্য বস্তু।

বাঙলার ভূস্বামীদের অনেকেই ছিলেন শাক্ত এবং তাঁদের অনেকেই দু'টি একটি পদ বচনা করে গেছেন। একটু প্রাচীনদের মধ্যে ছিলেন মহারাজ নন্দকুমার, মহাবাজ বামকৃষ্ণ ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়। পরবর্তীদের মধ্যে আছেন—মহারাজ মহাতাপ চাঁদ, মহাবাজ শিবচন্দ্র রায়, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রায়, মহারাজ হরেন্দ্রনাবায়ণ, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুব, কুমার শম্ভুচন্দ্র রায় প্রভৃতি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রচিত 'অতি দুরারাধ্যা তারা ত্রিগুণ রজ্জুধারিণী' এককালে খুবই বিখ্যাত ছিল। মহারাজ নন্দকুমার শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে ক্রমে নাকি সিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। তাঁর 'ভুবন ভুলাইলি মা, হরমোহিনী। মূলাধারে মহোৎপলে, বীণাবাদ্য বিনোদিনী' গানটিতে নাকি তান্ত্রিক মতে নাদের আরোহণ পদ্ধতিতে ছয় রাগ আব তাদের একুশটি মূর্ছনায় মায়ের রূপ কল্পনা করা হয়েছে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশেই শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, নরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। নরচন্দ্রের একটি বিখ্যাত গান, 'যে ভাল করেছ কালী, আর ভালতে কাজ নেই'। রাজা রামকৃষ্ণ ছিলেন নাটোবের রাজা । তিনি রানী ভবানী-প্রতিষ্ঠিত কিরীটীশ্বরী মন্দিবে পঞ্চমুণ্ডী আসনে বসে সাধনা করতেন। তাঁকে রাজর্ষি বলা হতো।

বর্ধমানের রাজা মহতাবচন্দ্র দশমহাবিদ্যার তন্ত্রোক্তধ্যান এবং কালীব বিভিন্ন রূপ কবিতা ও গানে বর্ণনা করেন। তিনি ভণিতায় শুধু 'চন্দ্র' ব্যবহার করতেন। দেওযান রঘুনাথ, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, দেওয়ান রামদুলাল প্রভৃতিও পদ রচনা করেছেন।

একালের কবিদের মধ্যে শাক্ত-পদ-রচয়িতা রূপে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতির রচনা থেকে শাক্তপদ উদ্ধার করা চলে।

বিভিন্ন পৌরাণিক নাটকে গিরিশচন্দ্র বেশ কয়েকটি শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেন। তার মধ্যে নানা রসও পরিবেষণ করেছেন তিনি। কখনো 'মদমত্ত মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে যায়', 'ধিয়া তাধিয়া নরমালী' জাতীয় মায়ের ভয়াল ভীষণ মূর্তি ফুটিয়ে তুলেছেন, কখনো বা শান্তরসাস্পদ 'রাঙ্গা কমল রাঙ্গা পায়' বা 'হের হের মনোমোহিনী' জাতীয় পদও রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের 'উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে', দ্বিজেন্দ্রলালের 'একবার গাল ভরা মা ডাকে' এবং আরো গান, রজনীকান্ত সেনের 'আর কত দিন ভয়ে থাকিব মা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বাঙলার মুসলমান কবিদেব মধ্যে প্রাচীন কবি মৃজা হোসেন আলি ও মহঃ সুলতান এবং একালের কাজী নজরুল ইসলামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাজী নজরুল ইসলাম-বচিত 'কালো মেয়েব পায়ে তলে', 'বলবে জবা বল', 'মহাদেবের কোলে এসে' প্রভৃতি বহূ প্রচলিত শ্যামাসঙ্গীত।

অধ্যায় ঃ বিশ

নাথ সাহিত্য

[এক] নাথ ধর্মমত

বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগেব আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন যদিও 'ময়নামতীব গান' এবং 'গোর্খবিজয়', নামীয় নাথ-সাহিত্যকে প্রাচীন যুগের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তৎসত্ত্বে এদেব স্থান তৎকালে নয়। প্রকৃতপক্ষে এ জাতীয় সাহিত্য বহু পরবর্তীকালেই রচিত হয়েছে। পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলিতে প্রধানত মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা, কানুপা-আদি সিদ্ধাচার্যদের কাহিনী বর্ণিত হযেছে। সম্ভবতঃ এঁবা সকলেই ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন; এই নামীয় কোন কোন সিদ্ধাচার্যের বচনাবও সন্ধান পাওযা গিয়েছে। [দ্রষ্টব্য — 'বৌদ্ধগান ও দোহা'।] ভাষা-সাহিত্যেব ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে এঁরা সম্ভবত খ্রীঃ দশম-একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু তাঁদেব জীবিতকালেই যে তাঁদেব অবলম্বন কবে সাহিত্য রচিত হযেছিল, তা' অনুমান কববার কোন সঙ্গত কারণ নেই। বিশেষত যে কোন প্রাচীন সাহিত্যেরই যখন কিছু কিছু প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, তখন নাথ-সাহিত্যের কোন প্রাচীন পুথির সার্বিক অপ্রাপ্তি বিস্ময়জনক বৈকি। তা ছাড়া প্রাপ্ত পুথিগুলিব ভাষায়ও অপেক্ষাকৃত আধুনিকতাব লক্ষণ সুপবিস্ফুট। যে পাণ্ডুলিপিগুলি পাওযা গিয়েছে, তাদেব প্রাচীনতমটিও অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে লিখিত। এই সমস্ত কাবণে অনুমান কবা হয়, নাথ-সাহিত্যের বিষয়বস্তু যদিও প্রাচীন এবং এব মূল কাঠামোটি যদিও প্রাচীনকালেই রচিত হয়ে থাকে, তবুও যে আকাবে এদের পাওয়া গেছে, তাতে এদের বচনাকালকে অষ্টাদশ শতকের পূর্ববর্তী বলে মনে করা সম্ভব নয়।

নাথ সাহিত্যের অর্বাচিনতা

নাথ সাহিত্যের উদ্ভব-সম্বন্ধে সম্প্রতি জনৈক গবেষক অভিমত প্রকাশ কবেছেন যে শৈবধর্ম থেকেই নাথধর্মের উদ্ভব হযেছে। "কিন্তু নাথসম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি আলোচনা করিয়া ও বিভিন্ন মোহান্তদের সহিত আলোচনা কবিযা আমি তাঁহাদের মূলতঃ শৈব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি।" (কল্যাণী মল্লিক)। নাথ সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে কিন্তু উক্তিটির সমর্থন পাওয়া যায় না। নাথ সাহিত্যে শিবও একজন জ্যেষ্ঠগুরু এবং দেবতা বলে স্বীকৃত হলেও অন্যান্য নাথগুরুদের কেউ কেউ তাঁকে তেমন সম্মান দান করেন নি। এমন কি নাথপন্থী কবিরাও তাদের কাব্যে শিবকে খুব শ্রদ্ধাব আসনে স্থাপন করেন নি। স্থানে স্থানে ববং শিবকে উপহাস্যাস্পদ করেই তোলা হয়েছে। অতএব, অনুমান হয়, অপর সকল মঙ্গলকাব্যে যেমন

অনার্যকুলোদ্ভব দেবদেবীরা শেষ পর্যন্ত শিবের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন করে জাতেউঠবার প্রয়াস পেয়েছেন, নাথপন্থীরাও এইভাবে শিবের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে আর্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে চাইছেন। আসলে নাথধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল বৌদ্ধধর্মের বিকারে — এই অনুমানই সঙ্গত। যে আদিম অনার্য সমাজ বহুকাল পূর্বেই বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে হিন্দু-বিরোধী মনোভাবের অধিকারী হয়েছিল, কালক্রমে তাদের মধ্যেই নাথধর্মের উদ্ভব হয়। পূর্বসংস্কার তারা তখনও ত্যাগ করতে পারেন নি বলেই একদিকে পৌরাণিক দেব-দেবীরা যেমন তাদের দৃষ্টিতে শ্রদ্ধার আসন লাভ করতে পারেন নি, তেমনি হিন্দু আচার-আচরণও তাদের নিকট হাস্যকর বলে মনে হয়েছে। তা' ছাড়া নাথ সাহিত্যে যাদের গুরুর আসন দান করা হয়েছে, প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাদের আমরা 'সিদ্ধাচার্য' নামেই অভিহিত করেছি। এই সিদ্ধাচার্যগণ ছিলেন বৌদ্ধ সহজিয়াপন্থী সাধক। অতএব, নাথধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধদের যোগাযোগই ছিল ঘনিষ্ঠ—এই অভিমত অনুমান মাত্র নয়। এ বিষয়ে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের সাক্ষ্য অতিশয় মূল্যবান বলে বিবেচিত হতে পারে ঃ "The Nath cult seems to represent a particular phase of the Siddha cult of India. THis Siddha cult is a very old religious cult of India with its main emphasis on a psychochemical process of Yoga, known as the Kaya Sadhana or the culture of body with a view to making it perfect and immutable and thereby attaining an immortal spiritual life."এই প্রসঙ্গে আর একটি সূত্রের উল্লেখ প্রয়োজন। এযাবৎ কোন মুসলমান কবি-রচিত কোন মঙ্গলকাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। অথচ নাথ সাহিত্য রচয়িতারূপে একাধিক মুসলমান কবির পরিচয় পাওয়া যায়। এই নাথ সাহিত্যে কিংবা নাথ-ধর্মে যে কোন মুসলমানী প্রভাব বর্তমান তাও নয়। তাই অনুমান, যে অনার্য সমাজ থেকে নাথধর্মের উদ্ভব হয়েছে, তাদের অনেকেই পরবর্তীকালে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। পূর্বসংস্কার ও ঐতিহ্যের জন্যই তারা নাথধর্মের প্রতি কিছুটা পক্ষপাতিত্ব দেখাতে পারেন। অতএব, নাথ ধর্মের উৎপত্তি-সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতে হয় যে, এটি মূলত ছিল অনার্য ধর্ম। পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবেই এর কাঠামো গঠিত হয়েছিল। আরও পরে শিবকে এই ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করে এর আর্যীকরণের চেষ্টা করা হয়।

নাথ ধর্মের উদ্ভব

প্রাগার্য আদিম জনতা-ধর্মই নাথ সাহিত্যে পরিস্ফুট হলেও উক্ত সাহিত্য-বিশ্লেষণে সূত্রাকারে কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণের কথা উল্লেখ করতে পারি। অবশ্য এই লক্ষণগুলিকে আর এখন পরিপূর্ণ অনার্যোচিত বলে অভিহিত করবার উপায় নেই, কারণ বৌদ্ধ এবং হিন্দুধর্মের কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেও এদের অস্তিত্ব বর্তমান। সন্ন্যাসজীবনের প্রতি আকর্ষণ অন্য অনেক ধর্মেই বর্তমান, কিন্তু নাথধর্মে এর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। নাথপন্থীদের ধারণা, যোগসাধনার দ্বারা 'মহাজ্ঞান' লাভ করে মানুষ দৈহিক অমরতা লাভ করতে পারে—এই অমরতা লাভের আকাঙ্ক্ষাই নাথপন্থীদের চরম ও পরম আকাঙ্ক্ষা। এই উদ্দেশ্যেই তাঁরা ব্রহ্মচর্য আচরণ ও সন্ন্যাস গ্রহণ

নাথ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

করে থাকেন। এর ফলে এই পথের পথিকদের নিকট নারী-বিদ্বেষও একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিশেষ সাধনাটিকে 'কায়সাধনা' নামে অভিহিত করা হয়। এব উদ্দেশ্য যে কোন আত্মিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ, তেমন মনে হয় না। কারণ, সন্ন্যাস-আদি অনুষ্ঠানে একদিকে বৌদ্ধ ভিক্ষুজীবনের প্রভাব পড়েছে, অন্যদিকে হিন্দু বর্ণাশ্রম ধর্মের বিরোধিতাও প্রকাশ পেয়েছে। সহজিয়া সাধনার যে ধারাটি বৌদ্ধ এবং বৈষ্ণবদের মধ্যে দেখা যায়, নাথপন্থীদের মধ্যেও তা প্রসার লাভ করেছিল। তারাও বেদবিধিসম্মত তথা শাস্ত্রীয় পূজা-আচরণের প্রতি বিশ্বাসী নয়। নাথপন্থীদের আব এক বিষয়ে সমধিক আগ্রহ লক্ষিত হয়, যেটি 'সিদ্ধাই লাভ' কাবণ এর সাহায্যে অলৌকির শক্তিব অধিকাবী হওযা সম্ভবপব। নাথ সাহিত্যে এ জাতীয় অলৌকিকতার দৃষ্টান্তও রয়েছে যথেষ্ট।

[দুই] নাথ সাহিত্য পরিচয়

নাথ সাহিত্যকে দুটি প্রধান ধারায় বিভক্ত করা চলে, একটি 'গোর্খবিজয়' বা 'মীনচেতন', অপরটি 'ময়নাবতী' বা 'গোপীচন্দ্রের গান'। প্রথমোক্ত ধাবায় গোরক্ষনাথ কর্তৃক আদিগুরু মীননাথেব উদ্ধার কাহিনী বিবৃত হযেছে। এই ধারাব কাব্যসমূহে ধর্মীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠাই প্রাধান্য লাভ কবেছে। শেযোক্ত ধাবাব কাব্যে রাণী ময়নাবতী-কর্তৃক পুত্র গোপীচন্দ্রকে সন্ন্যাসধর্মে প্রবর্তিত কববাব কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এই গোপীচন্দ্রেব গানে ধর্মীয মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অপেক্ষা কাব্যগুণই প্রাধান্য লাভ কবেছে।

নাথ সাহিত্যেব দুই ধাবা

মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথ আদি নাথগুরু। তিনি পার্বতীর শাপে কদলীব দেশে গমন করলেন এবং তথায আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হযে সংসারধর্মে আসক্ত হয়ে পড়লেন। এদিকে শিষ্য গোবক্ষনাথ শুনলেন যে গুরু মীননাথ কদলী রাজ্যে নারীব মোহে পড়ে মৃত্যুব পথে অগ্রসব হচ্ছেন। এই সংবাদ পেয়ে গোরক্ষনাথ গুরুকে উদ্ধাব করবার আকাঙ্ক্ষায় কদলী রাজ্যে গিয়ে উপনীত হলেন। প্রথম তিনি ব্রাহ্মণেব বেশে গেলেন, তাতে কোন ফল হলো না। পরে তিনি যোগীর বেশ ধারণ করলেন, কিন্তু তাতেও মীননাথের দেখা পেলেন না ; সর্বশেষ তিনি নর্তকীর বেশ ধারণ কবে মীননাথের সামনে উপস্থিত হলেন। তিনি বিহিত বিধানে মীননাথকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেষ্টা কবলেও যখন মীননাথ কেবল আত্মপক্ষ সমর্থন কবতে লাগলেন, তখন গোরক্ষনাথ মীননাথের পুত্রকে আছড়ে হত্যা কবলেন এবং আবার এক তুড়ি দিয়ে বাঁচিয়ে দিলেন। এতক্ষণে মীননাথের চেতনা হলো। কিন্তু কদলীর অধিবাসীরা গোরক্ষনাথকে রাক্ষস ভেবে হত্যা কবতে সচেষ্ট হলে গোরক্ষনাথ শাপ দিলেন এবং সব কদলী বাদুড় হয়ে উড়ে গেল। এইবার গোরক্ষনাথ গুরু মীননাথকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন।

গোর্খা বিজয়ের কাহিনী

নাথপন্থীদের আদিগুরু মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ সম্ভবত ঐতিহাসিক ব্যক্তি। কেউ কেউ এঁকে সিদ্ধাচার্য লুই-পা (রোহিত পাদ) বলে মনে কারে থাকেন। লুই-পার রচিত প্রাচীন

বাঙলা পদ চর্যাপদের অন্তর্ভুক্ত। গোরক্ষনাথও ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাঁর রচিত সংস্কৃত 'গোরক্ষ-সংহিতা' বিদ্যমান। গোরক্ষনাথ যদি বাঙলাদেশের অধিবাসীও হয়ে থাকেন, তবু একসময় সারা ভারতবর্ষেই তাঁর প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল এবং সর্বত্র তাঁর শিষ্যমণ্ডলীও বর্তমান ছিল। কিন্তু তাঁদের অবলম্বন করে যে কাহিনী রচিত হয়েছে, তা উপকথারই তুল্য।

কাব্য বিচার

এতে ধর্মীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলেছিল বলেই কাহিনীতে অলৌকিকত্বের এবং অস্বাভাবিকতার অভাব নেই। এমন কি গোরক্ষনাথের কেরামতি দেখাবার জন্য দাম্ভিকতা, কুটিলতা এবং হিংস্রতারও যথেষ্ট প্রশ্রয় দান করা হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, আশঙ্কা হয়, গ্রন্থটি সম্বন্ধে নিরাসক্ত আলোচনা বিশেষ হয় নি। একপক্ষ যেমন উচ্ছ্বসিতভাবে কাহিনীটির প্রশংসা করেছেন, অপরপক্ষ তেমনি তীব্র ভাষায় এর নিন্দা করেছেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন গোরক্ষনাথের চরিত্রকে শরৎ-শেফালী বা যুথিকার ন্যায় শুভ্র বলে অভিহিত করেছেন। ডঃ সুকুমার সেন গোরক্ষনাথ কর্তৃক গুরু মীননাথের চৈতন্যসম্পাদনকে সমগ্র বাঙলা সাহিত্যের একটি মহনীয় কাহিনী বলে বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে অধ্যাপক শ্রীভট্টাচার্যের মতে গোরক্ষচরিত্রে "নাথসংস্কারের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা ছাড়া অপর কোন গুণ নেই — যা আছে তা আকাশস্পর্শী দম্ভ, অহংকার, ক্রুবতা, হৃদয়হীনতা, ক্রোধ ও প্রতিহিংসা।" তিনি মীননাথের চৈতন্য সম্পাদন-কাহিনী সম্বন্ধে বলেছেন, বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে এইরূপ বীভৎস কাহিনী অদ্বিতীয়। অধ্যাপক শ্রীভট্টচার্য 'গোরক্ষবিজয়' সম্বন্ধে অতিশয় নিষ্ঠুর মন্তব্য করেছেন ঃ "সাহিত্য-বিচাবে গোর্খবিজয় হইতেছে অন্ধ তমসাবৃত প্রেতরাজ্য। অতিমানবীয় জড়শক্তিই ইহার অধিপতি। এখানে স্নেহ নাই, প্রেম নাই, ভক্তি নাই, হৃদয়স্পন্দনের কোন চিহ্ন নাই, এই জগতে বহিঃপ্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ঈশ্বরের বিধান অস্বীকার করিয়া দৈহিক অমরতার লোভে নাথধর্ম এখানে স্থাণু হইয়া বসিয়া আছে ...এই জগতের জীবন দানবীয়, ভাষা হেঁয়ালী, উর্চ্চার্য ডাকিনীমন্ত্র। একটা অস্পষ্টতা ও রহস্যের ধূমল ছায়া ইহাকে হিম-শীতল মৃত্যুপুরীতে পরিণত করিয়াছে।" 'গোরক্ষবিজয়' কাব্য যে জীবনবিমুখ তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রথমত স্মবণ রাখা দরকার যে ধর্ম-প্রতিষ্ঠার জন্যই নাথপন্থীদের এই কাহিনী গঠন করতে হয়েছে; এতে গোরক্ষনাথের চরিত্রে হিংস্রতা-আদি সবকিছুই বর্তমান। কিন্তু যে প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে করে তাদের প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য সচেষ্টা হতে হয়েছে, তার কথা বিবেচনা করলে একে কাব্যের একটা অসাধারণ অপরাধ বলে মনে করা চলে না। মঙ্গলকাব্যসমূহে দেবতাদের যে হিংস্রতা, নীচতা ও কুটিলতার পরিচয় পেয়ে থাকি, তার তুলনায় গোরক্ষনাথ এমন বেশি কিছু অপরাধ করেন নি। 'গোরক্ষবিজয়ে' দেবতার স্থান নেই, গোরক্ষনাথ নিজেই এখানে দেবতার আসন গ্রহণ করেছেন। অতএব দেবতার কাজ তাঁকে দিয়ে সেরে নিতে হয়েছে। তবে একে যদি ঐতিহাসিক কাব্য বলে বিচার করতে হয়, তবে অবশ্যই গোড়াতেই গণ্ডগোল থেকে যাবে, কারণ ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের নিয়ে কাব্যে উপকথাই রচিত হয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে মীননাথ এবং গোরক্ষনাথ ঐতিহাসিক পুরুষ হলেও 'গোবক্ষবিজয়' কাব্যটি একান্তই অর্বাচীন কালে রচিত হয়েছে। তবে গোরক্ষনাথের অলৌকিক লীলাকাহিনী এবং মীনচেতন-কাহিনী যে বহু পূর্বেই সর্বভারতে বিস্তার লাভ করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র গোর্খ-পন্থী যোগী বা যুগী সম্প্রদায বর্তমান। পশ্চিম ভারতেও মীনচেতন-সম্বন্ধীয় ছড়া প্রচলিত আছে। বাঙলা ভাষায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে সহদেব চক্রবর্তী-রচিত 'অনিলপুরাণে'ই (তাহা দ্রষ্টব্য) সর্বপ্রথম 'মীনচেতন' কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

কাব্য পরিচয়

মৌলবী আব্দুল কবিম সাহিত্যবিশারদই সর্বপ্রথম 'গোর্খবিজয়' নামক পৃথক্ গ্রন্থ উদ্ধার করে তা প্রকাশ করেন। তিনি যে সমস্ত পাণ্ডুলিপি থেকে গ্রন্থটি সম্পাদন করেছিলেন, তাদের প্রাচীনতমটি ১৭৭৮ খ্রীঃ লিখিত। গ্রন্থের ভণিতায় ভীমদাস, ভীমসেন রায়, শ্যামদাস সেন, কবীন্দ্র দাস এবং ফৈজুল্লাব নাম পাওয়া যায়। অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতেই ফয়জুল্লার নাম পাওযা য়ায়, অপবদের নাম কোন কোনটিতে বর্তমান। এদের কে বা কারা গ্রন্থটি বচনা করেছিলেন, তা অনুমান কবাও সম্ভব নয়। শ্যামদাস, ভীমদাস বা কবীন্দ্র-সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। চট্টগ্রম অঞ্চলেব ফযজুল্লা নামক একজন কবি বৈষ্ণব পদ রচনা করেছিলেন। হযতো ইনিই এই গ্রন্থটিরও রচয়িতা হতে পারেন।

'গোরক্ষবিজয়ে'ব তুলনায 'ময়নামতী বা গোপীচন্দ্রেব গানে' মানবিক আবেদন অপেক্ষাকৃত বেশি। জালন্ধরিপাদ বা হাড়িপা শিবের শাপে হাড়ি হয়ে গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্যে হীনকর্মে নিযুক্ত ছিলেন। রাজমাতা ময়নামতী ছিলেন সিদ্ধা, তিনি তা জানতে পেরে গোবিন্দচন্দ্রকে হাড়িব নিকট থেকে দীক্ষা নিতে আদেশ করলেন। কিন্তু হাড়ির নিকট থেকে দীক্ষা নিতে গোবিন্দচন্দ্র অসম্মত হলে রাণী ময়নামতী আপন সিদ্ধাই দেখালেন। তখন গোপীচন্দ্র হাড়িপাব নিকট দীক্ষা চাইলেন। হাড়িপা গোপীচন্দ্রকে পরীক্ষা

গোপীচন্দ্রের গানেব কাহিনী

কবতে চেয়ে তাকে ভিক্ষায় পাঠালেন। গোপীচন্দ্র গুরুর সঙ্গে দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করতে লাগলেন। শেষে গোপীচন্দ্রকে হীরা নামক এক বারাঙ্গনাব কাছে বাঁধা রেখে হাড়িপা চলে এলেন। বাবো বৎসর পব হাড়িপাব এ কথা মনে পড়লে তিনি গোপীচন্দ্রকে উদ্ধার কবে আনলেন। এইবাব গোপীচন্দ্র রাণী অদুনা ও পদুনার পরামর্শে হাড়িপাকে মাটির নীচে পুঁতে রাখলেন। হাড়িপাব শিষ্য কানুপা বহুকাল গুরুর সন্ধান না পেয়ে গোরক্ষনাথের নিকট শুনলেন যে গুরুকে মাটির নীচে পুঁতে রাখা হয়েছে। কানুপা শিশুব মূর্তি ধাবণ করে গোপীচন্দ্রের রাজ্যে উপনীত হয়ে আপন সিদ্ধাই দেখালেন। গোপীচন্দ্র তার শরণ নিযে হাড়িপাকে মুক্ত করলেন। এব পব রাজা গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করে অমর হলেন। রাণী ময়নামতীও পরম সুখ অনুভব করলেন।

এই কাহিনীর মধ্যেও 'গোরক্ষবিজয়ে'র মত অলৌকিকত্ব এবং আজগুবি কাহিনীব ছড়াছড়ি। জনৈক সমালোচকেব মতে, "শিশুচিত্ত লইয়াই ইহার কাহিনী অনুধাবন করিতে হইবে। দেবতা ভূত পশু কীট উদ্ভিদ সকলেই এখানে মানুষেব সহচর ও সমধর্মী, কোন অলৌকিকতাই এখানে অবিশ্বাস্য নহে। কেবল অলৌকিকতা নহে, রূপকথার আঙ্গিক ও

বর্ণনাও গোপীচন্দ্রের গানে দেখা যায়।" কিন্তু তৎসত্ত্বেও গোপীচন্দ্রের গান অপেক্ষাকৃত মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ। ময়নামতী প্রথমাবধি পুত্র গোপীচন্দ্রকে সন্ন্যাসী সাজাবার চেষ্টা করছেন, সঙ্গে সঙ্গে আপন ঘরে তার প্রতিক্রিয়াটুকুও স্বরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণ-কালে অদুনা-পদুনার অন্তর্ভেদী বিলাপের মধ্য দিয়ে অদ্ভুত অলৌকিক ক্ষমতার মাহাত্ম্যও মুহূর্তের জন্য ভুলে থাকা যায়। তদুপরি রচনার ফাঁকে ফাঁকে কবিরা যেন বাস্তবে নেমে এসেছেন আর সেই অবসরে বাস্তব জীবনানুভূতিরই পরিচয় দান করেছেন। গ্রন্থটির ভালোমন্দ বিচার করে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ মন্তব্য করেছেন : "যে সমাজের পটভূমিকায় কাহিনীটি বিন্যস্ত হইয়াছে তাহা হিংস্র, ক্রুর, বর্বরোচিত প্রবৃত্তির অমার্জিত উচ্ছ্বাসে অসংবৃত ভোগ-লালসায়, শৈশবসুলভ উদ্ভট কল্পনার আতিশয্যে এবং সমাজ ও পরিবার-জীবনের রূঢ়, সুষমাহীন ছন্দে এক অর্ধ-সভ্য, অপবিণত সংস্কৃতি ও জীবনবোধেরই পরিচয় বহন করে। এই অশিক্ষিত, আদিম সংস্কবাচ্ছন্ন সমাজ হইতেও যে এরূপ উন্নত, যথাযথ ভাব-প্রকাশক্ষম, সূক্ষ্ম তত্ত্ব পরিস্ফুট করিতে নিপুণ, কাব্যগুণসমৃদ্ধ রচনার প্রেরণা আসিয়াছে ইহাই বাঙালী-জীবনের এক চিরন্তন বিস্ময়।"

কাব্য বিচার

'গোপীচন্দ্রের গানে'র মূল কাহিনীটিকে অনেকেই বাস্তবতার কাঠামোয় গঠিত বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু বর্তমানে তা' থেকে ইতিহাস উদ্ধার করতে গেলে বিড়ম্বনাই সাব হবে। তবে এ কথা সত্য যে গোপীচন্দ্রের কাহিনীর উদ্ভব বাঙলাদেশে। উড়িষ্যার রাজেন্দ্র চোলেব (১০৬৩ খ্রীঃ—১১১২ খ্রীঃ) এক শিলালিপিতে বঙ্গরাজ গোবিন্দচন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। কেউ কেউ এঁকেই আলোচ্য গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্র বলে মনে করেন। কেউ বা অনুমান করেন, নাথ সাহিত্যে উক্ত গোপীচন্দ্র আরও বহু পূর্ববর্তীকালে বর্তমান ছিলেন। যা হোক, তিনি যে বাঙালী ছিলেন তা ঐতিহ্যসম্মতও বটে। ভারতবর্ষের সর্বত্র গোর্খপন্থী ভিক্ষুকরা একতারা বাজিযে যে গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাসের গান গেয়ে থাকে, তাতে ওঁকে বঙ্গেশ্বর বলেই অভিহিত কবা হয়। গুজরাটে প্রচলিত কাহিনীতে গোপীচন্দ্রের পিতাকে গৌড়বঙ্গের অধিপতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পাঞ্জাবী কাহিনীতেও গৌড়বঙ্গালকে গোপীচন্দ্রের জন্মভূমি বলে বর্ণনা কবা হয়েছে। গোপীচন্দ্রের কাহিনীর প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় ষোড়শ শতকে রচিত মালিক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দী 'পদুমাবৎ' কাব্যে। নেপাল থেকে বাঙলা ও নেওয়ারী ভাষায় লিখিত একটি নাটক উদ্ধাব করা হয়েছে, এর বিষয়বস্তু 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস'। এতেও গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রকে বঙ্গের অধিপতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থটি অন্তত সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত। কাজেই মূল কাহিনী যে ষোড়শ শতাব্দীর বহুপূর্বেই ঘটে গিয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত অনুমান করেন, 'Stories of Gorakhnath and Gopicand, at least the skeleton of such, had been in all probability, current in Bengal (and not only in Bengal, but in many other parts of India) before the time of conquest of Bengal by the muslims in the thirteenth century.' স্যার জর্জ

ঐতিহাসিকতা

গ্রীয়ার্সন ১৮৭৩ খ্রীঃ সর্বপ্রথম এই জাতীয় একটি কাব্য আবিষ্কার করে 'The song of Manikchandra' নামে প্রকাশ করেন। গোপীচন্দ্রের পিতার নামই মাণিকচন্দ্র। এ বিষয়ে যত পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে, তাদের মধ্যে প্রাচীনতমটি ১৭৯৯ খ্রীঃ লিখিত। মনে হয় কবি দুর্লভ মল্লিকই গোপীচন্দ্রের গানের আদি কবি। দুর্লভ মল্লিকের রচনার ভাষা অনেকটা প্রাচীন, সহজ ও সরল। তাঁর রচিত কাহিনীতে অপেক্ষাকৃত সুরুচি ও সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দুর্লভ মল্লিক তাঁর কাব্যে আত্মপরিচয় দান না করায় তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানবার উপায় নেই। এই কাব্যের অপর দু'জন কবি ভবানীদাস ও সুকুর মামুদ। এঁরা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ অথবা ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই তত্তৎ কাব্য রচনা করেছিলেন বলে অনুমিত হয়। ভবানীদাস সম্ভবত পূর্ববঙ্গের এবং সুকুর মামুদ উত্তরবঙ্গের কবি ছিলেন। এর অধিক এঁদের সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তাঁদের উভয়ের কাব্যেই কিছু কিছু কাহিনীগত বৈশিষ্ট্য বর্তমান।

অধ্যায় ঃ একুশ

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম-ভূমিকা

[এক] বাঙলাদেশে মুসলিম আগমন

আনুঃ ১২০৪ খ্রীঃ ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী সেন বংশীযদেব হাত থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ত করার কাল থেকেই বাঙলায মুসলিম আধিপত্যের শুরু এবং ইতিহাসে-সাহিত্যে মধ্যযুগের আরম্ভকালও তখন থেকেই গণনা কবা হয়। কিন্তু বাস্তবে বাঙলায় মুসলিম আগমন এই প্রথম নয়, তাবও অনেক আগে থেকেই সম্ভবতঃ আববীয় বণিকরা সমুদ্রপথে চট্টগ্রামে উপনিবেশ স্থাপন কবেন এবং বাঙলাদেশেব সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলেন। আবার বখতিয়ারের 'নুদীযা' তথা নবদ্বীপ বিজযের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু সমগ্র বাঙলা মুসলিম শাসনাধীনে আসেনি। লক্ষ্মণসেনেব বংশধরগণ তাবপরও শতবর্ষকাল পূর্ববাঙলায় রাজত্ব করতেন বলে জানা যায। জালালউদ্দিন ইউসুফ শাহ্ (১৪১৮-১৪৩৩ খ্রীঃ)-কর্তৃক ত্রিপুবা, শামসুউদ্দিন ইউসুফ শাহ্ (১৪৭৪-১৪৮০ খ্রীঃ)-কর্তৃক হুগলি এবং আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৮ খ্রীঃ)-কর্তৃক কামরূপ ও কুচবিহাব বিজযেব পবই সম্ভবতঃ সমগ্র বাঙলাদেশ মুসলিম শাসনাধীন আসে। অর্থাৎ বাঙলায মুসলিম শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে কিঞ্চিদধিক দু'শত বৎসবেব প্রযোজন হযেছিল।

বাঙলাদেশ-অভিযানকারীরা বাঙালী ছিলেন না, তাবা তুর্কী, মুঘল, পাঠান বা আফগান বংশীয় ছিলেন, অতএব বাঙলা ভাষা-ভাষীও ছিলেন না। এঁবা এবং এঁদেব সঙ্গে আগত আশবফ বা অভিজাত মুসলমানবাই গোড়ার দিকে বংশমর্যাদায এবং শাসনব্যবস্থাযও 'কাজী, উলেমা, শেখ' বা 'লস্কব' পদের অধিকাবী ছিলেন। অপবদিকে এদেব আগেই এবং সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত সাধুসন্ত-জাতীয সুফীবাদী মুসলমান এসেছিলেন, তারা প্রধানত ধর্মপ্রচারেব দাযিত্ব গ্রহণ কবেছিলেন। একে ত হিন্দু সমাজেব ঘুণ-ধবা ব্যবস্থা এমনিতে টাল-মাটাল অবস্থায ছিল, তার উপর একদিকে মুসলিম বাজশক্তিব পৃষ্ঠপোষকতা, কোথাও বা অত্যাচাব উৎপীড়ন, অন্যদিকে উদার সাম্যবাদী হিন্দু অতীন্দ্রিয়বাদেব সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সুফীবাদেব আকর্ষণে হিন্দুসমাজের নীচেব তলা প্রায ধ্বসে পড়লো — বাঙলায মুসলিম জনসংখ্যা

একেবারে জ্যামিতিক প্রক্রিয়ায বেড়ে চললো এবং এই অগণিত মুসলমান, যাবা সমাজেব 'আতরফ গোষ্ঠী' বা নিম্নশ্রেণীরূপে পবিচিত হলো, তাদেব মধ্যে 'জোলা মুখেবি (জেলে), কাবাড়ি, হালাম (মিষ্ট-বিক্রেতা), দবজি, বংবেজ, হাজাম, কাগজি' প্রভৃতি বৃত্তিধাবী দেখা দিল। এরা কিন্তু সকলেই ছিল বাঙালী এবং বাঙলা ভাষা-ভাষী এবং এবা বাস কবতো হিন্দুদের প্রতিবেশী-রূপে পাশাপাশি।

মুসলমানদের বাঙালীয়ানা ঃ কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁব কাব্যে এই হিন্দুব প্রতিবেশী মুসলমানদের বিবাট তালিকা দিয়েছেন, তাতে অনুমান হয, তৎকালেই বাঙলাদেশে মুসলমানেব সংখ্যা হিন্দুদেব চেয়ে সম্ভবতঃ কম ছিল না। ঐ আমলটা ছিল মুসলিম আমল, বাজশক্তি মুসলমানেব কবাযত্ত, বাজ্যেব 'আশবাফ শ্রেণী' অর্থাৎ অভিজাত শ্রেণীব ভাষা ছিল ফাবসি, অতএব স্বাভাবিক কাবণেই এই ফাবসি হলো 'বাজভাষা' অর্থাৎ সবকাবী কাজকর্মেব ভাষাও বটে। গ্রামে হযতো মক্তব-মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু তথায সবকাবী ভাষা ফাবসি এবং ধর্মীয ভাষা আববী শিক্ষাবই ব্যবস্থা ছিল মনে কবি, কাবণ ফাবসিভাষী উলেমাদেব হাতেই থাকতো শিক্ষা-দীক্ষাব ভাব। অতএব বাঙালী 'আতবফ গোষ্ঠী' শিক্ষাব সুযোগ থেকে একেবাবে বঞ্চিত না হলেও যে পবিমাণ বিদেশি ভাষা শিখতো, তাতে আব যাই হোক, সাহিত্য বচনা কবা যায না। অতএব সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও মধ্যযুগেব বাঙালী মুসলমানদেব হাতে বাঙলা সাহিত্য-বচনা যে শুধু বিলম্বিত হয়েছিল, তা-ই নয, পবিমাণেও ছিল একান্ত সামান্য। কাবণ ভাষাটা যে ছিল 'হিন্দুযালী ভাষা'। আবও বিস্ময়েব বিষয হলো, ফাবসি শিক্ষিত মধ্যযুগেব বাঙালী মুসলমানবাও ফাবসি ভাষাযও কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য বচনা করেন নি। তৎকালে বাঙলা দেশে যা স্বল্পপবিমাণ ফাবসি-সাহিত্য বচিত হয়েছিল, বচযিতাদেব নাম দেখে অনুমান কবা যায, এঁবা বাঙলা ভাষা-ভাষী ছিলেন না।

তবে মধ্যযুগেব বাঙালী মুসলমানবা বাঙলা ভাষায কোনই সাহিত্য বচনা কবেন নি, এমন কথা বলা হযনি, প্রথমতঃ সেই প্রচেষ্টা ছিল বিলম্বিত এবং দ্বিতীযতঃ সেই স্বল্প-পবিমাণ বচনাব মধ্যে মৌলিক বচনা প্রায ছিলই না, প্রায সবই ছিল অনুবাদমূলক এবং সেই অনুবাদও ছিল মূলতঃ বিভিন্ন ফাবসি কিংবা কদাচিৎ আববী গ্রন্থেব অনুবাদ। তাদেব মধ্যে সামান্য পবিমাণ হিন্দী সাহিত্যেব অনুবাদও দেখা যায। তবে সাহিত্যেব অপব একটি ধাবায শতাধিক মুসলমান কবিব নাম পাওযা গেলেও তাঁদেব বচনাব পবিমাণ খুবই সামান্য এবং খুবই আশ্চর্যেব বিষয, সেই ধাবাটি 'বৈষ্ণব পদ'। এছাড়া গ্রামেব অর্ধশিক্ষিত কিছু স্বভাবকবিই হযতো গাথা কাব্য নামে কোন কোন মৌলিক কাব্য বচনা করে থাকতে পাবেন। 'বাউল গান' নামক লৌকিক কাব্যশাখাব কিছু অসাম্প্রদাযিক মনোভাব সম্পন্ন অথচ একটা সম্প্রদায গোষ্ঠীভুক্ত গান বচনা কবেছিলেন। বাঙালী মুসলমান কবিদেব অন্যতম কৃতিত্ব, তাঁবাই মধ্যযুগে দেবতা ও ধর্মীয ভাব বর্জিত মানবিক আবেদনযুক্ত ধাবাকে সচল বেখেছিলেন।

[দুই] মুসলিম সুলতানদের প্রেরণা দান

বাঙলা ভাষায় কোন্ মুসলমান কবি প্রথম কাব্য-রচনায় উদ্যোগ গ্রহণ কবেছিলেন, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে আদি-মধ্য তথা চৈতন্য-পূর্ব যুগেই মুসলমান সুলতান বা আমীব-ওমরাহদের কেউ কেউ যে বাঙলা ভাষায় সাহিত্য রচনায় বাঙালী কবিদের উৎসাহ দিয়েছেন, সে কথা কবিগণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মবণ করেছেন। সম্ভবতঃ সুলতান রুকনউদ্দিন বাববক শাহ (১৪৫৫-৭৪ খ্রীঃ) ভাগবতের অনুবাদ রূপে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য' রচনা করতে উৎসাহিত কবেছিলেন। প্রায় সমসাময়িক কালে কৃত্তিবাসও কোন এক গৌড়েশ্বরের নির্দেশেই 'বামাযণ' অনুবাদ কবতে নির্দেশ পেযেছিলেন। কিন্তু এই গৌড়েশ্বব রাজা গণেশ ছিলেন কিংবা অপব কোন মুসলমান সুলতান ছিলেন, এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান হোসেন শাহেব নাম স্বহু কবিই অতি সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করেন। সুলতান হোসেন শাহের পুত্র সুলতান নসবৎ শাহ, এবং তৎপুত্র ফিরোজ শাহও যে বাঙালী হিন্দু কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা কবে গেছেন কবিদেব স্বীকৃতিতে তাব উল্লেখ পাওয়া যায়। আবাব হোসেন শাহেব লস্কর বা সেনাপতি পবাগল খাঁব আদেশে কবীন্দ্র পবমেশ্বব সমগ্র মহাভাবতেব অনুবাদ 'পবাগলী মহাভাবত' রচনা কবেন। পবাগল খাঁব পুত্র ছুটি খাঁ-এর আদেশে শ্রীকব নন্দী জৈমিনি ভাবতেব 'অশ্বমেধ পর্বে'ব অনুবাদ 'ছুটি খা-এব মহাভাবত' বচনা কবেন।

আরাকান রাজসভা ঃ ওদিকে সপ্তদশ শতকে বোসাঙ-বাজ থিরি-থুধম্মার লস্কর-উজীর আশবফ খানেব আদেশে দৌলত কাজী হিন্দী ভাষায় বচিত 'মৈনা সৎ'-এর অনুবাদ-রূপে 'সতী মযনামতী' বা 'লোবচন্দ্রানী' নামে কাব্য বচনা কবেন। অপর বোসাঙ রাজ থদো-মিন্তাব মুখ্য অমাত্য মাগন ঠাকুবেব অনুবোধে সৈযদ আলাওল মালিক মুহম্মদ জাযসী-রচিত হিন্দী কাব্য 'পদুমাবতী' বাঙলায 'পদ্মাবতী' নামে অনুবাদ-রূপে রচনা করেন। বোসাঙের অপর বাজা থিবি সান্দ সুধর্মাব কাজি সৈযদ মসুদ শাহেব অনুবোধে তিনি 'সযফুলমুলুক বদিউজ্জমাল' এবং প্রধান অমাত্য মজলিস বিবাজেব অনুরোধে 'সিকিন্দাবনামা' অনুবাদ কবেন। বাজাব সেনাপতি সৈযদ মুহম্মদেব আদেশে আলাওল অনুবাদ কবেন 'হপ্ত পযকব' এবং মহাপাত্র সুলেমানেব আদেশে 'তোয়ফা' অনুবাদ করেন।

মরদান ঃ রোসাঙ্গরাজ শ্রীসুধর্মার সভায়ই সম্ভবতঃ মবদান নামক কবি 'নসীবানামা' নামক এক কাব্য রচনা করেন। তিনি ঐ রাজ্যেই কাঞ্চীনগবে বাস করতেন। কাব্যটিকে মৌলিক বচনা বলে অনুমান করা হয, তবে কাব্য-কাহিনীটি লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। কাব্যটি সম্বন্ধে অধ্যাপক মাহবুবুল আলম বলেন, "দেশীয় উপাদানে এমন কাব্য রচনার কৃতিত্বে কবি মবদান গৌরবান্বিত। কাব্যের কাহিনীতে নিয়তির অমোঘ লীলা প্রতিফলিত হয়েছে। তবে উপাখ্যানে আছে বোমান্স ও আদিবসেব পরিচয়। কবি লোকশিক্ষাব উদ্দেশ্যে লোকশ্রুতিব উপাখ্যানকে স্বাধীনভাবে কাব্যে রূপায়িত করে তুলেছিলেন।"

কোরেশী মাগন ঠাকুর ঃ রোসাঙরাজের প্রধান অমাত্য ও কবি আলাওলের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক কোরেশী মাগন ঠাকুর স্বয়ং একজন কবি ছিলেন এবং 'চন্দ্রাবতী' নামে একটি কাব্য রচনা করেন। কাব্যটির আদি ও অন্ত্য ভাগ খণ্ডিত। তিনি বিভিন্ন ভাষা ও শাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন।

এ জাতীয় সহায়তা আরও কোন কোন মুসলমান সুলতান বা আমীর-ওমরাহ্ করে থাকতে পারেন এই সম্ভাবনার কথা অস্বীকার করা যায় না। উপর্যুক্ত ঘটনাগুলি থেকে মনে হয় বংশানুক্রমে যে সমস্ত সুলতান বা আমীর-ওমরাহ্ এদেশে বাস করতেন, তাঁরা বাঙলা ভাষা-ভাষী না হলেও সম্ভবতঃ বাঙলা ভাষা বুঝবার ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন।

[তিন] কিস্‌সা সাহিত্য বা প্রণয়োপাখ্যান

হিন্দুয়ালি ভাষা ঃ কেউ কেউ মনে করেন যে, গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের সুলতানী আমলেই (খ্রীঃ ১৩৯০-১৪১০) শাহ মুহম্মদ সগীর প্রখ্যাত ফারসি কবি ফিরদৌসির 'যুসুফ-জুলেখা'র অনুসরণে বাঙলায় অনুরূপ কাব্য রচনা করেন এবং পঞ্চদশ শতকে জৈনুদ্দিনও একটি বাঙলা কাব্য অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কিন্তু গবেষকদের অনুমান—এগুলি অনুমান মাত্র, প্রমাণসিদ্ধ নয়। তবে ষোড়শ শতাব্দীতে মুহম্মদ কবীর-রচিত 'মনোহর-মধুমালতী' ই (১৫৮৮-৯৪ খ্রীঃ) সম্ভবতঃ অসন্দিগ্ধভাবে বাঙালী মুসলমান লিখিত প্রথম বাঙলা এবং অনুবাদ গ্রন্থ। তাঁর গ্রন্থে একটি অদ্ভুত অথচ কৌতূহলোদ্দীপক উক্তি পাওয়া যায় ঃ

> 'মোহাম্মদ কবিরে কহে মন কুতুহলি।
> আছিল ফারসি কিতাব করিল হিন্দুয়ালি।।'

মুহম্মদ কবীরের কয়েক বৎসর পর সৈয়দ সুলতান 'নবীবংশ' নামক যে গ্রন্থটি রচনা করেন, সেটি একটি আরবী গ্রন্থের অনুবাদ বলে লেখক উল্লেখ করেছেন। তিনিও তাঁর পূর্বসূরীর মত বলেন ঃ

> 'আছিল আরবী ভাষা হিন্দুয়ালি কৈলু।
> বঙ্গদেশী বুধে মত প্রচারিয়া দিলু।।
> না বুঝি আরবী শাস্ত্র জ্ঞান না পাইলা।
> হিন্দুয়ানি ভাষা পাই আচারি রহিলা।।'

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে — ষোড়শ সপ্তদশ শতকের মুসলমান কবিরা বাঙলা ভাষাকে 'হিন্দুয়ালি ভাষা' বলছেন কেন? এর যথার্থ উত্তর হতে পারতো, যদি এমন হতো যে এই কবিরা বাঙলা ভাষা-ভাষী ছিলেন না, কিন্তু তা সম্ভবতঃ নয় কারণ, এর পূর্বে মুকুন্দ চক্রবর্তী মুসলিম সমাজবিন্যাসের যে চিত্র এঁকেছেন, তাতে স্পষ্টতঃই মনে হয় যে এরা বাঙালী হিন্দুর প্রতিবেশীরূপে বাস করতেন এবং বাঙালীই ছিলেন। অন্ততঃ এদের পূর্বপুরুষদের কেউ

কেউ বিদেশাগত হলেও এবা পুবাদস্তুব বাঙলা ভাষা-ভাষীই ছিলেন। তাছাড়া যে স্বচ্ছ ভাষায বাঙলা লিখেছেন, তা সাধাবণতঃ অপব ভাষা-ভাষীব পক্ষে সহজসাধ্য নয। তাহলে বাঙলা ভাষা হিন্দুযালি ভাষা কেন? এব অপব একটি সম্ভাব্য উত্তব এই হতে পাবে যে, এবা এবং সাধাবণ মুসলমানবাও হযতো নিজেদেব ঘবে এবং নিজেদেব সমাজে আববি-ফাবসি-মিশ্র বাঙলাতেই কথা বলতে অভ্যস্ত ছিলেন। এই বীতিটি একালেও সমভাবেই প্রচলিত। কিন্তু সাধাবণভাবে শিক্ষিত বাঙলা-পাঠক মুসলমানেব সংখ্যা কম ছিল, তাদেবও অনেকেই আববি-ফাবসিতে হযতো কৃতবিদ্য ছিলেন। তৎকালে মুসলমান কবিগণ প্রধানত ফাবসি ভাষা থেকেই বাঙলা ভাষা অনুবাদ কবতেন। ফাবসি-শিক্ষিত মুসলমান পাঠক যথেষ্টই ছিলেন, অতএব কবিদেব লক্ষ্য ছিল সম্ভবতঃ হিন্দু পাঠক-কুল। এবং তাদেব নিকট উপভোগ্য কবে তোলবাব জন্যই ভাষাব পবিমার্জনা প্রযোজন। তাই তাবা বিশুদ্ধ সাধু বাঙলা ভাষায কাব্য বচনা কবেছেন, ঐতিহাসিকগণও স্বীকাব কবেন যে ষোড়শ সপ্তদশ শতকে মুসলমান কবিদেব বচিত কাব্যগুলিতে আববি-ফাবসি শব্দেব মিশ্রণ প্রায নেই বললেই চলে এবং এই আববি ফাবসি-বর্জিত বাঙলা ভাষাকেই হযতো কবিবা 'হিন্দুযালি ভাষা' নামে অভিহিত কবেছেন।

কিন্তু এই 'হিন্দুযালি ভাষায' কাব্য বচনা কবতে গিযে কবিবা যে স্বীয সমাজেব কিছু আলেম বা তজ্জাতীয ফাবসি উর্দুভাষী মুসলমানদেব দ্বাবা ধিক্কৃত কিবা ভর্ৎসিত হযেছিলেন, তা অনুমান কবা চলে সপ্তদশ শতকেব শেষদিকে আব্দুল হেকিম বচিত তাঁব 'নূবনামা' কাব্য থেকে। সেখানে তিনি ঐ সমস্ত মযূব পুচ্ছধাবী ফাবসি উর্দু ভাষী বাঙালী মুসলমানদেব লক্ষ্য কবে লিখেছেন ঃ

'যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহাব জন্ম নির্ণয না জানি।।
দেশী ভাষা বিদ্যা যাব মনে না জুযায।
নিজ দেশ ত্যাগি কেন বিদেশে না যায।

বোঝা যায, কবি মাতৃভাষাব সপক্ষতা কবে বিরুদ্ধবাদীদেব প্রতি অতি কঠোব বাক্যই প্রযোগ কবেছেন। যা হোক, এব পূর্বেই বাঙলা সাহিত্যে সম্ভবত, মুহম্মদ কবীব বচিত 'মনোহব মধুমালতী' নামক বোম্যান্সপূর্ণ ফাবসি অনুবাদ কাব্যেব অনুসবণে মুসলমান কবিদেব দ্বাবা এ জাতীয বোমাঞ্চ জাতীয কাব্য বচনাব একটা ধাবা বইতে শুরু কবে এবং ধাবাটি প্রবাহিত হযেছিল দীর্ঘকাল ধবে।

প্রণযকাব্য-ধাবা ঃ বাঙলা সাহিত্যেব ইতিহাসেব মধ্যযুগে বাঙালী মুসলমান কবিগণ প্রধানভাবে যে সহাযতা দান কবেছেন, তাব মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বোম্যান্টিক প্রণযকাব্যেব ধাবা। ড. সুকুমাব সেন বলেন, "বোম্যান্টিক কাহিনী কাব্যে পুবানো মুসলমান কবিদেব সবদাই একচেটিযা ছিল। ধর্মীয পবিবেশেব বহির্ভূত একান্ত জীবনধর্মী সাহিত্য বচনা দ্বাবা মুসলিম সাহিত্যিকগণ বাঙলা সাহিত্যধাবায একটা ব্যতিক্রম সৃষ্টি কবলেও দুর্ভাগ্যক্রমে

তা সমান্তরালভাবে প্রবাহিত গতানুগতিক বাঙলা সাহিত্যকে কখনো প্রভাবিত করতে পারেনি। অথবা, হয়তো এরি প্রভাবে বাঙলা ভাষায় এখনো উপেক্ষিত অথচ বিশ্বের জ্ঞানী গুণী সমাজ দ্বারা সম্বর্ধিত 'গাথাকাব্য' তথা 'পল্লীগীতিকাগুলি'ব সৃষ্টি হয়েছিল যেগুলিকে মনীষী সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও নিঃসংশয়িতভাবে উপন্যাসের প্রতিরূপ বলে স্বীকাব করে নিয়েছেন।

বর্তমান বাঙলাদেশের গবেষক অধ্যাপক মাহবুবুল আলম তাঁর গ্রন্থে উক্ত রোম্যান্টিক কাব্যধারার উল্লেখযোগ্য কবি ও তাদের কাব্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর তালিকায়

পনের শতক	শাহ্‌ মুহম্মদ সগীর	ইউসুফ-জোলেখা
ষোল শতক	দৌলত উজীর বাহ্‌রাম খান	লায়লী মজনু
	মুহম্মদ কবীর	মধুমালতী
	সাবিরিদ খান	হানিফা কয়রাপরী
		বিদ্যাসুন্দর
	দোনাগাজী চৌধুরী	সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জমাল
সতের শতক	দৌলত কাজী	সতীময়না-লোরচন্দ্রানী
	আলাওল	পদ্মাবতী, সপ্তপযকর
	কোরেশী মাগন ঠাকুব	চন্দ্রাবতী
	আবুল হাকিম	লালমতী সয়ফুলমুলুক
	নওয়াজিস খান	গুলে বকাওলী
	মঙ্গলচাঁদ	শাহ্‌জালাল-মধুমালা
	সৈয়দ মুহম্মদ আকবর	জেবলমুলুক-শামারোখ
আঠার শতক	মুহম্মদ মুকীম্‌	মৃগাবতী
	শেখ সাদী	গদামল্লিকা

এই তালিকাব বাইবেও বয়েছেন অনেক কবি এবং উপর্যুক্ত বিষয় নিয়ে আবাব অনেকেই কাব্য রচনা করেন—সবই অবশ্য অনুবাদ মাত্র।

এই সমস্ত প্রণয়কাব্যের বিষয় এবং পাত্রপাত্রীব বিবরণ ধবা পড়েছে পরবর্তীকালেব কোন কবির লেখনীতে, তার সামান্য নিদর্শন :

'খাবাব করিল যত আশকেব তরে।
জোলেখা খারাব হৈল ইউসুফ উপবে।।
লায়লু উপরে মজনু হৈল আসব।
সংসার বিদিত যার আসকি সাদক।। ইত্যাদি।

এই প্রণয়কাব্যগুলির বৈশিষ্ট্য-বিষয়ে পণ্ডিতগণ মনে কবেন, মূল কাব্যগুলিতে মানবীয় কাহিনী এর বহিরঙ্গে প্রণয়-উপাদান সৃষ্টি করলেও এব অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ছিল মানবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনাকাঙ্ক্ষা যা সুফী সাধনারই ভাবসম্পদ। কিন্তু যখন এগুলি বাঙলা

ভাষায় রূপান্তরিত হলো, তখন কাব্যগুলি একান্তভাবেই মানবীয় ভাবেই পরিপূর্ণ। ডঃ ওয়াকিল আহমেদ বলেন, "মধ্যযুগের বাংলা রোম্যান্টিক কাব্যগুলিতে মানবপ্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত ভোগসর্বস্ব মর্ত আকৃতির এক স্বপ্নসৌন্দর্য ও আনন্দলোক রচিত হয়েছে। এখানে দেও-দানব, জীনপরী, রাক্ষস-খোক্কস প্রভৃতি অলৌকিক উপাদান আছে, কিন্তু এ সব কাল্পনিক চরিত্র কখনও মানব চরিত্রকে অতিক্রম করে যায়নি, অবাস্তব ঘটনা মূল কাহিনীকে আচ্ছন্ন করে ফেলেনি। মধ্যযুগীয় চিন্তার অনুকূলেই এ সব মানবেতর উপাদান এসেছে। তখন মানুষের চিন্তাধারা অন্ধবিশ্বাস ও কল্পনা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এরূপ মিশ্রভাবের রচনা হিসাবে এগুলি রোম্যান্টিক প্রেমকাব্য বা রোম্যান্টিক প্রণয়োপাখ্যান নামেই অভিহিত হওয়ার যোগ্য।" এদের কতকগুলি কাহিনীর মূলে আছে ফারসী কাহিনী, অবশিষ্টগুলি আরবী-হিন্দী গ্রন্থ থেকে গৃহীত। কাহিনীগুলি আক্ষরিক অনুবাদ প্রায় কোথাও নেই, প্রায় সর্বত্রই ভাবানুবাদ, তাই অনেক সময় মৌলিক রচনার স্বাদ অনুভব করা যায়।

মুহম্মদ সগীর ঃ বাঙলা সহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি শাহ্ মুহম্মদ সগীর-বচিত গ্রন্থ 'ইউসুফ জোলেখা'র কাহিনী বাইবেলে এবং কোরানেও নৈতিক উপাখ্যান-রূপে বর্ণিত হযেছে। গৌড়ের সুলতান গিযাসউদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে (১৩৯০-১৪১০ খ্রীঃ) কবি গ্রন্থটি রচনা করেন বলে কেউ কেউ অনুমান করেন। পূর্বে মহাকবি ফিরদৌসি এবং জামী শাহও 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্য রচনা করেছিলেন। শাহ্ মুহম্মদ সগীর মনে হয ফিবদৌসিকেই অনুসরণ কবেন। ডঃ এনামুল হক গ্রন্থটি সম্পর্কে বলেন," কাব্যটিতে কোন বিদেশী আবহ নাই বলিলেই চলে । বাংলাব পবিবেশে এই কাব্যের রক্তমাংস এবং বাংলার আবহ ইহার প্রাণ বলিয়া কাব্যখানি পাঠ করিতে করিতে মনেই হয় না যে ইহা কোনো বিদেশীয় পুস্তকের অনুবাদ অথবা ভাবানুবাদ।"

দৌলত উজীব বাহরাম খান ঃ ফারসী কবি জামী-বচিত 'লাইলী-মজনু'ব ভাবানুবাদ-রূপেদৌলত উজীর বাহবাম খান তাঁর 'লায়লী মজনু' কাব্যটি রচনা কবেন। একমতে আঃ ১৫৬০ খ্রীঃ কিংবা তৎসন্নিহিত কালে নিজাম শাহ্ সুর কবিকে 'দৌলত উজির' উপাধিতে ভূষিত কবেন এবং প্রায় সমকালেই কবি কাব্যটি বচনা করেন। কিন্তু ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে কাব্য রচনাকাল ১৬৬৯ খ্রীঃ। কবি অন্যান্য ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায়ও পারঙ্গম ছিলেন বলে মনে হয়, কারণ তাঁর কাব্যের কোন কোন অংশের সঙ্গে 'কুমারসম্ভব, শিবপুরাণ, নলদময়ন্তী' প্রভৃতি কাব্যের চিত্রকল্পের সাদৃশ্য আছে। গ্রন্থটি সম্বন্ধে ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন, "লায়লীমজনু আদিরসাত্মক কাব্য। কিন্তু অন্তর্নিহিত সুফী ভাবের জন্য কোন স্থানে অশ্লীলতা নাই। সুফীগণ বলেন, পার্থিব প্রেম পারমার্থিক প্রেমের সেতু। ইহাতে কাব্যে যথেষ্ট সংযম লক্ষিত হয়। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরকে যদি বলা হয় মদনানন্দ মোদক, লায়লা মজনুকে বলিতে হইবে মদনজ্বালামলম।" আবার ডঃ আহমদ শরীফ বলেন ঃ "এর যুগদুর্লভ পাঁচটি বৈশিষ্ট্য চিরকাল অম্লান থাকবে। প্রথমত, এটি যথার্থ tragedy, কারণ রামায়ণ,

মহাভাবত, কাববালা কাহিনী কিংবা অন্যান্য বিযোগান্ত বা করুণসুন্দব বসাত্মক বচনায যথার্থ Tragic effect নেই। দ্বিতীযত, এ কাব্য আশ্চর্যভাবে অশ্লীলতামুক্ত। তৃতীযত, ফাবসী প্রণযকাব্যগুলি সাধাবণ অধ্যাত্মরূপকাশ্রিত কিন্তু দৌলত উজীবেব কাব্য নিছক মানবিক প্রণযোপাখ্যান। চতুর্থত, এ কাব্য কোনো কাব্যেব অনুবাদ নয, লোকশ্রুত পুবানো কাহিনীব স্বাধীন অনুসৃতি। পঞ্চমত, এ কাব্যকাহিনী অলৌকিকতামুক্ত প্রায বাস্তব ঘটনাভিত্তিক।" উপমা রূপক অলঙ্কাবাদি ব্যবহাবে শব্দ নির্বাচনে ও ভাষা প্রযোগেও কবি অসাধাবণ কুশলতাব পবিচয দিযেছেন। বিষয বৈগুণ্যে তাঁব কাব্য পাঠকসমাজে বিশেষ পবিচিত নয, নতুবা তিনি সমগ্র মধ্যযুগেব বাঙলা সাহিত্যেব ইতিহাসে একজন বিশিষ্ট কবিরূপেই স্বীকৃতি লাভ কবতেন।

সাবিরিদ খান ঃ সাবিবিদ খান ছিলেন একাধিক গ্রন্থবচযিতা। (১) তাঁব 'হানিফা ও কযবাপবী' গ্রন্থটি খণ্ডিত আকাবে পাওযা যাওযাতে এব প্রকৃত নামটি জানা যায না। কাব্যে নাযকেব প্রণয-কাহিনী বোমান্সেব পর্যাযে উঠলেও কাব্যে যুদ্ধেব ঘনঘটা বড বেশি বলে একে 'জঙ্গনামা' বলেও অভিহিত কবা যায। কাব্যেব বচনাবীতি বিশেষ প্রশংসনীয নয। ডঃ ওযাকিল আহ্‌মদ বলেন ঃ "কবি এখানে কথকেব ভূমিকা নিযেছেন, সূত্রধবেবও ভূমিকা নয। জীবননাট্যসূত্রে তিনি চবিত্রগুলিতে নাচাতে পাবেন নি। ফলে 'হানিফা কযবাপবী'তে আর্টেব স্বাদ পাওযা যায না। কাব্যেব ঘটনাব ক্রমবিবর্তন আছে সত্য, তবে কবি সকল ঘটনাকে অনিবার্য সম্পর্কে বাধতে পাবেন নি। কবিব ভাষাও খুব দুর্বল, স্থানে স্থানে তা স্থূল ও আডষ্ট পবিচর্যাহীন।"(২) 'বসুলবিজয' গ্রন্থটি খণ্ডিত আকাবে পাওযা যায বলে গ্রন্থটিব বিষযে আলোচনা সম্ভবপব নয। (৩) সাবিবিদ খান 'কালিকামঙ্গল' কাব্যধাবাব বিদ্যাসুন্দব কাব্যটিকও অনুবাদ বচনা কবেন। তবে তিনি 'কালিকা মাহাত্ম্য' বাদ দিযে শুধু বিদ্যাসুন্দবেব বোমান্সকেই অবলম্বন কবেই কাব্যটি বচনা কবেন। তিনি এই কাব্যটিকে 'নাটগীতি' রূপে উল্লেখ কবেছেন এবং এব গীতিধর্মিতা এবং নাটকীযতা উভযেই সমভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ তাঁব কাব্যটি সর্বতোভাবেই উপভোগ্য বিবেচিত হযে থাকে।

সাবিবিদ খান ষোডশ শতকেব প্রথমার্ধে চট্টগ্রামে বসবাস কবতেন বলে মনে কবা হয এবং এখানেই তিনি জন্মগ্রহণ কবেন।

দোনাগাজী ঃ দোনাগাজী সম্ভবত খ্রীঃ ষোডশ শতকে চাঁদপুব মহকুমা অঞ্চলে বাস কবতেন। তাঁব বচিত 'সযফুলমুলুক বদিউজ্জমাল' খণ্ডিত আকাবে পাওযা গেছে। কাব্যটি আবও অনেকেই অনুবাদ কবেন, তাব মধ্যে আলাওলই শ্রেষ্ঠ। দোনাগাজী ছিলেন সাধাবণ স্তবেব কবি, কাব্যেব ভাষা সাধাবণ, বর্ণনা নগ্নস্থূল এবং অনেক স্থলেই কামভাবনাব উদ্দীপক। কাব্যটিও রূপকথাধর্মী, অতএব বোমান্সেব দিক থেকে নোতুনত্ববিহীন।

মুহম্মদ কবীর ঃ 'মধুমালতী' কাব্যেব বচযিতা মুহম্মদ কবীব সম্ভবতঃ পঞ্চদশ অথবা ষোড়শ শতকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বর্তমান ছিলেন। 'মধুমালতী' কাব্যেব মূল উৎস সম্ভবত

ভারতীয়। সুধী অধ্যাপক ডঃ এনামূল হক বলেন, "...মনে হয়, মূল গল্পটি হিন্দিতে ছিল, কোনো ভারতীয় মুসলমান কবি এই মূল হিন্দি হইতে গল্পটিকে ফারসী ভাষায় কাব্যিক রূপ দিতে গিয়া পরী প্রভৃতি ইবানী উপাদান ঢুকাইয়া দেন। এই ফারসী কাব্য হইতেই বাংলায় কবি মুহম্মদ কবীর গল্পটি গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।" তবে কোন্ গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করেছেন, তার সন্ধান পাওয়া যাযনি। কাব্যটিতে রূপকথাব আমেজ আছে, অলৌকিকতাও যথেষ্ট। প্রেম ও সৌন্দর্যের রোম্যান্টিক চিত্রাঙ্কনে কবি সার্থক ; বিশেষত বিশুদ্ধ বাঙলা ভাষার ব্যবহার, আলঙ্কাবিক প্রয়োগ, ধ্বনিসৌন্দর্য ও শব্দার্থ মহিমাব সৃষ্টিতে কবি কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন।

'মধুমালতী' কাব্যটি আরও অনেকেই অনুবাদ কবেছেন, যেমন—সৈয়দ হামজা, মুহম্মদ বুহর, শাকের মুহম্মদ, গোপীনাথ দাস প্রভৃতি।

নওয়াজিস খান ঃ নওয়াজিস খান -রচিত কাব্য 'গুলে বকাওলী' । তিনি চট্টগ্রাম জেলার এক স্থানীয় জমিদার বৈদ্যনাথ রায়ের আদেশে কাব্যটি রচনা কবেন। ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র মতে নওয়াজিস খান সম্ভবতঃ আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফারসী থেকে গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। কাহিনীটি আপরাপব কাহিনীর মতোই প্রণয়-উপাখ্যান, অলৌকিকতায় পূর্ণ এবং রোমান্সের লক্ষণ এতে পূর্ণমাত্রায বিদ্যমান । নওয়াজিস 'গুলে বকাওলি' ছাড়াও কয়েকটি কাব্য রচনা করেছিলেন বলে জানা যায।

আব্দুল হাকিম ঃ বহুবিধ কাব্য রচয়িতা আব্দুল হাকিম সম্ভবতঃ খ্রীঃ সপ্তদশ শতকে বর্তমান ছিলেন। তাঁব রচিত কাব্যসমূহেব মধ্যে ফারসী কবি জামী-রচিত 'ইউসুফ-জোলেখা'র অনুবাদই সর্বোৎকৃষ্ট। অবশ্য উক্ত গ্রন্থেব এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট অনুবাদও রয়েছে। আব্দুল হাকিম রচিত অপব উল্লেখযোগ্য রোম্যান্টিক কাব্য 'লালমতী সযফুল মুলুক'। তাঁর এই দুটি বোমান্স-জাতীয় প্রণযোপাখ্যান -এব জন্যই খ্যাতিমান হলেও তাঁর কবিত্বের সঙ্গে পাণ্ডিত্য যুক্ত হয়েছিল বিভিন্ন তত্ত্বকাব্য রচনায। এ জাতীয় রচনাগুলিব মধ্যে রয়েছে 'নূরনামা, নাসিরতনামা, সভারমুখতা, চারিমোকামভেদ, দোররে মজলিস' প্রভৃতি।

[চার] 'মর্সিয়া সাহিত্য' ও 'জঙ্গনামা'

বাঙলা ভাষায় মুসলমান কবিদের কাব্যসাধনার আর একটি ধারায় রয়েছে 'মর্সিয়া সাহিত্য' বা 'শোকগাথা'। এই গাথাগুলির বিষয় সর্বত্রই এক — হজরত মহম্মদের দৌহিত্র হাসান ও হোসেনের শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ। কিন্তু এই কাব্যগুলিতে যুদ্ধ-বিবরণও সমানভাবে প্রধান হয়ে ওঠায় অনেকে এগুলিকে 'জঙ্গনামা' বা 'যুদ্ধকাব্য' নামে অভিহিত করে থাকেন। মুঘল শাসনকাল অর্থাৎ ষোড়শ শতকের শেষদিকেই বাঙলা ভাষায় 'মর্সিয়া সাহিত্যে'র উদ্ভব ঘটে। মূলতঃ শিয়াপন্থী মুসলমানরাই ছিলেন এই শোকগাথার অংশীদার, পরবর্তীকালে সহানুভূতিবশতঃ সুন্নীপন্থী মুসলমানরাও এতে অংশগ্রহণ করেন।

কালের পরিবর্তনে মর্সিয়া সাহিত্যেও যথেষ্ট বৈচিত্র্য দেখা দেয়। ঐ কারণে ঐতিহাসিক মার্সিয়া সাহিত্যকে নিম্নোক্তক্রমে চারটি ধারায় বিভক্ত করেনঃ "প্রথম ধারা মুঘল আমলের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মর্সিয়া সাহিত্য। হামিদুল্লাহ খান এই ধারার অনুসারী। দ্বিতীয় ধারাঃ মুসলমানী বাংলায় রচিত মর্সিয়া সাহিত্য। গরীবুল্লাহ, রাধারমণ গোপ প্রমুখ এই ধাবাব অনুসারী। তৃতীয় ধারাঃ আধুনিক বাংলায় রচিত মর্সিয়া সাহিত্য। এই গদ্যধারায় সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন মীর মশরফ হোসেন, হামিদ আলী প্রমুখ এবং কাব্যধারায় সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন কায়কোবাদ প্রমুখ। চতুর্থ ধারাঃ লোকসাহিত্যে মর্সিয়া। জারীগান এই পর্যায়ভুক্ত।"

বাঙলা ভাষায় 'মর্সিয়া সাহিত্য' ও 'জঙ্গনামা' রচনার কারণ নির্ণয় কবতে গিয়ে অধ্যাপক মাহবুবুল আলম বলেনঃ "মার্সিয়া সাহিত্য সৃষ্টির পিছনে ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে বিদ্যমান ছিল। এদেশে শিয়া মতবাদ প্রসারের ফলে মর্সিয়া সাহিত্য সৃষ্টিব অনুকূল পরিবেশেব সৃষ্টি হয। এ প্রসঙ্গে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের কথাও উল্লেখযোগ্য। মুসলমান শাসনেব শেষদিকে এবং ইংবেজ শাসনেব প্রথমদিকে মুর্শিদাবাদের নবাবদের শাসনশৈথিল্য, বর্গীর হাঙ্গামা ও পলাশীর যুদ্ধ ইত্যাদি মিলে সমস্ত দেশে বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের নগর-সমাজের সকল স্তরে ধনী সামন্তগণের যথেচ্ছাচাব ও উচ্ছৃঙ্খলতা নগ্নমূর্তিতে প্রকাশ পেয়ে সমাজের ভিত্তি নষ্ট করে ফেলে। এ সময়ে মুসলমানেরা আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তি হারিযে ফেলে। এতে তারা অদৃষ্ট-নির্ভর ও দৈববাদী হয়ে পড়ে। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর মুসলমানী বাঙলায় রচিত মর্সিয়া সাহিত্য পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে 'সাধারণ বাঙালী মুসলমান তাহাব বিড়ম্বিত জীবন ও লাঞ্ছনা হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য সত্যপীর, বড়খাঁ গাজী, ইসমাইল গাজী প্রভৃতি ইষ্টপীর, বা শক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কবেছিলেন এবং মুসলিম কবিগণ জাতীয় বীরপুরুষগণকে (যেমন ইমাম হুসেন, হযরত আলী প্রভৃতি) কাব্যমধ্যে আমদানি করিযা কাব্য রচনা করিতে প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন।' তখন মুসলমানরা ধর্মমূলক সাহিত্যপাঠের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। বহুকাল তারা হিন্দু দেবদেবী-অবলম্বনে রচিত সাহিত্যপাঠে কাব্যপিপাসা মিটাত। তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধমূলক কাব্যপাঠের দিকে তারা ঝুঁকে পড়ে। পাঁচালীর আঙ্গিকে রচিত মর্সিয়া সাহিত্যে পীরের মাহাত্ম্য ও শক্তির প্রতি বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে এবং ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কারবালার বিষাদময় কাহিনীর প্রতি আকর্ষণ ফুটে উঠেছে।"

অতএব দেখা যাচ্ছে, মর্সিয়া সাহিত্য মুসলিম ধর্মীয় ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হলেও এগুলির উপাদান একান্তভাবেই মানবিক এবং এর ঘটনাও ইতিহাস-নির্ভর। তবে একালের 'এলেজি' (Elegy) বা শোকগীতিকাগুলি যেমন ব্যক্তিজীবনানুভূতিসিক্ত হওয়াতে গীতিকবিতার মর্যাদা লাভ করে, আলোচ্য মর্সিয়া কাব্য তদনুরূপ ব্যক্তিভাবানুরঞ্জিত রচিত নয়। বিষাদান্তক কাহিনী বর্ণনামূলক ভঙ্গিতে রচিত এই মর্সিয়া কাব্যগুলি 'গাথাকাব্য'রূপে বরং পরিচিত হতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, মর্সিয়া কাব্যধারা বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করেছিল অবক্ষয় যুগে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তর্বর্তী কালেই।

সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকে শেখ ফয়জুল্লাহ্-রচিত 'জয়নবের চৌতিশা' নামক ক্ষুদ্র কাহিনীটিই প্রথম মর্সিয়া কাব্য। 'লায়লী মজনু' -রচয়িতা বাহ্‌রাম খান 'জঙ্গনামা' নামে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। চট্টগ্রামের কবি মহম্মদ খান ১৬৪৫ খ্রীঃ ফারসি মর্সিয়া কাব্য 'মক্তুল হোসেন' -এর ভাবানুবাদ রচনা করেন। কাব্যটি কবির 'নবীবংশ' নামক কাব্যের পরিপূরক, অতিশয় বৃহদায়তন, এবং এ জাতীয় কাব্যসমূহের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়। অষ্টাদশ শতকে 'কাশিমের লড়াই' নামক মহরমের এক ক্ষুদ্র বিবরণী রচনা করেন কবি শেরবাজ। এই শতকেই রংপুরের হায়াত মামুদ নামে একজন বিশিষ্ট কবি বর্তমান ছিলেন। ফারসি কাব্যের অনুসরণে রচিত তাঁর প্রথম কাব্য 'জঙ্গনামা'। তাঁর অপরাপর রচনার মধ্যে রয়েছে —'চিত্ত উত্থান', 'হিতজ্ঞানবাণী' ও 'আম্বিয়াবাণী'। সম্ভবতঃ ঐকালেই কবি 'জাফব' রচনা করেন 'শহীদ-ই-কারবালা' ও 'সখিনা বিলাপ' — দুটিই মর্সিয়া জাতীয় কাব্য। ঐ সময় হামিদ নামক অপর এক কবি 'সংগ্রাম হুসন' নামক মার্সিয়া কাব্য রচনা করেন। একজন হিন্দু কবিও মর্সিয়া কাব্য রচনা করেন, তাঁর নাম রাধাচবণ গোপ, তাঁব রচিত কাব্য 'ইমামগণের কেচ্ছা' ও 'আফৎনামা'। ফকিব গরীবুল্লাহ্ বচিত মার্সিয়া কাব্য 'জঙ্গনামা'—এ ছাড়াও তিনি 'সোনাভান', 'আমীর হামজা', 'ইউসুফ জোলেখা' এবং 'সত্যপীর' নামে কাব্য রচনা করেন।

মুঘল যুগের শেষ পর্বে রচিত এই কাব্যগুলি এবং এ জাতীয় আরো বহু কাব্যের ভাষা ছিল ফারসি-উর্দু মিশ্রিত বাঙলা। বিষয়বস্তু, আবহ, শ্রোতা বা পাঠক সবই ছিল প্রকৃতপক্ষে এ জাতীয় ভাষারই অনুকূল, কাজেই এ জাতীয় ভাষাই যেন মর্সিয়ার পক্ষে সর্বাধিক উপযোগী ছিল।

[পাঁচ] শায়ের ও পুথিসাহিত্য

যথার্থ অবক্ষয় যুগ বলতে অষ্টাদশ শতকের যে শেষার্ধকে বোঝায়, এবং যে সময় হিন্দু কবিগণ প্রধানতঃ 'কবি, তর্জা, পাঁচালী' প্রভৃতি রীতিব কাব্য বচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় বাঙলার মুসলমান কবি তথা শায়েরগণ এক ভিন্ন ধরনের কাব্য রচনায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা গীতি-কবিতাব দিকে না ঝুঁকে মুঘল যুগের শেষপর্বের ধাবারই অনুসরণ করে যেতে লাগলেন। পূর্ববর্তী আলোচনার শেষ দুটি অনুচ্ছেদ কবিদের যে সমস্ত কাব্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, বস্তুতঃ ওগুলি নিয়েই শায়েরদেব পুথিসাহিত্যের উদ্ভব। তবে এই পুথিসাহিত্য নামটি অনেকের মনঃপূত নয়। এ জাতীয় গ্রন্থের ভাষা মিশ্র অর্থাৎ ফারসী ও উর্দু-মিশ্রিত, তাই ডঃ আহমদ শরীফ বলেন, "এই হিন্দুস্থানী তথা উর্দুর সঙ্গে বাংলার মিশ্রণে গড়ে উঠেছে আমাদের দোভাষী রীতি, অতএব দোভাষী রীতিই এর যোগ্য ও যথার্থ অভিধা।"

বিষয় বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাবো, মোটামুটি পূর্ববর্তী ধারারই অনুসরণ ঘটেছে, বিষয় অনুযায়ী শায়েরী সাহিত্য চতুর্ধা বিভক্ত : (১) প্রণয়োপাখ্যান জাতীয়, (২) যুদ্ধ-

সম্পর্কিত — যথা 'জঙ্গনামা, সোনাভান, আমীর হামজা, কারবালা' যুদ্ধ প্রভৃতি. (৩) পীরের পাঁচালী, যেমন—'সত্যপীরের পুথি, গাজী কালু, চম্পাবতী' প্রভৃতি এবং (৪) ইসলাম বিষযক, যেমন—'নবীবংশ কিংবা বিভিন্ন তাত্ত্বিক গ্রন্থ—কাকাসুল আম্বিয়া, হাজার মশলা' প্রভৃতি।

এই ধারার প্রথম কবির সম্মান দেওয়া হয় 'রায়মঙ্গল' (১৬৮৬ ৮৭ খ্রীঃ) -রচযিতা কৃষ্ণরাম দাসকে । তবে মিশ্র ভাষারীতির প্রবর্তক গরীবুল্লাহ্ অষ্টাদশ শতকের অবক্ষয যুগের কবি। কবিদের সংখ্যা ২৫০ এবং তাঁদের রচিত কাব্যের সংখ্যা কয়েকশত বলে অনুমান করা হয়। এই পুথিগুলি সাধারণভাবে 'বটতলার পুথি' নামেই পরিচিত ।

গরীবুল্লাহ্-রচিত 'ইউসুফ-জোলেখা', 'আমীর হামজা', 'জঙ্গনামা', 'সোনাভান' এবং 'সত্যপীরের পুথি'তে শায়েরী সাহিত্যের চারটি ধারারই পরিচয় পাওয়া যায় এবং তিনিই এই ধারার শ্রেষ্ঠ কবি। 'সৈয়দ হামজা'-রচিত প্রথম কাব্য 'মধুমতী' প্রণয়োপাখ্যান কাব্য এবং সাধুভাষায় রচিত। তিনি গরীবুল্লাহর অসমাপ্ত 'আমীর হামজা' সমাপ্ত করতে গিয়ে যে দোভাষী রীতি অনুসরণ করেন, অতঃপর সেই ভাষাতেই আরও কয়েকটি কাব্য রচনা করেন। তাঁর পুথিসমূহের মধ্যে রয়েছে 'জৈগুনের পুথি' ও 'হাতেমতাই'। শেষোক্ত গ্রন্থটি একটি উর্দু কাব্যের ভাবানুবাদ।

পুথিসাহিত্যে গরীবুল্লাহ এবং সৈয়দ হামজা-রচিত কাব্যগুলিতেই যা কিছু কাব্যরসের সন্ধান পাওয়া যায়, পরবর্তী শায়েরগণ শুধু পুথির পাতা বোঝাই করে চর্বিতচর্বণ করে গেছেন মাত্র, কাব্যগুণ বলতে প্রায় কিছুই নেই।

উনিশ শতকেও এই পুথি সাহিত্যের ধারা প্রবহমাণ ছিল। এই ধারায় 'মহম্মদ দানেশ' রচিত অনুবাদ কাব্য 'চাহার দরবেশ' কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এ ছাড়া তিনি 'গোলাবে ছানুয়ার', 'নূরুল ইমান' ও 'হাতেমতাই' কাব্য রচনা করেন।

'গাজী-কালু' ও 'চম্পাবতী'র পুথিতে পীরফকিরদের কেরামতির কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। দক্ষিণরায়ের সঙ্গে যুদ্ধে গাজীর জয় ও প্রতিষ্ঠাই এর প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। একালেও পুথি-সাহিত্য রচিত হয়েছে, কিন্তু তাদের সম্বন্ধে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহ্সান বলেন, "উনিশ শতকে দোভাষী পুথি সাহিত্যের কাব্যগত কোনো মূল্য নেই, তার কারণ, প্রথমত ও প্রধানত প্রতিভাবান কবির অভাব, দ্বিতীয়ত ইংরেজি শিক্ষা ও সাহিত্যের সঙ্গে যোগসূত্রের ফলে বাংলা সাহিত্যের যে পরিবর্তন এল, সে পরিবর্তনের সঙ্গে পুঁথির রচযিতাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তৃতীয়ত, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসার অভাব কাব্যকে প্রাণহীন করেছিল। তবু একটি ক্ষীণধারা এখনো অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে।"

অধ্যায়ঃ বাইশ

বঙ্গেতর অধিবাসী-কর্তৃক ও লিপিতে বাঙলা সাহিত্য

বঙ্গদেশের সীমানা বারবার পরিবর্তিত হবার ফলে বাঙলা ভাষা-ভাষী অনেক বাঙালীই পশ্চিমবঙ্গের বাইরে তো বটেই, এমন কি প্রাচীন বঙ্গদেশের বাইরেও পড়ে গিয়েছিলেন। যেমন শ্রীহট্টের অধিবাসীরা পুরোপুরি বাঙলা ভাষা-ভাষী হলেও ব্রিটিশ আমলে শ্রীহট্ট আসামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অবশ্য ভারতের স্বাধীনতা কালে এই শ্রীহট্টেব একটা বৃহৎ অংশকে আবার পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করায় তা বর্তমানে বাঙলাদেশের একটি অঞ্চলে পরিণত হয়েছে, অপর অংশ আসামের সঙ্গেই যুক্ত রয়েছে। এছাড়া কাছাড় জেলাও বাঙলা ভাষা-ভাষী প্রধান। এটিও আসামের অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিমদিকে মানভূম, সিংভূমের কিছু কিছু বাঙালী-প্রধান অঞ্চল এখনও বিহার রাজ্যের কুক্ষিগত হয়ে আছে। এইভাবে দেখা যায়, বাঙলার বাইরেও স্থায়িভাবে প্রচুর সংখ্যক বাঙলা ভাষা-ভাষী রয়ে গেছেন। এ ছাড়াও কর্মব্যপদেশে অথবা পুরুষানুক্রমেও বহু বাঙলা ভাষা-ভাষী ভারতের বহু স্থানে ছড়িয়ে আছেন। বিশেষভাবে, আসাম, উড়িষ্যা, বিহার প্রভৃতি সংলগ্ন অঞ্চল ছাড়াও মধ্যভারত এবং দিল্লিতেও অনেক বাঙলাভাষী পুরুষানুক্রমে বাস করেন। তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঙলা ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করেন। বাঙলা সাহিত্যের রথী মহারথীদের মধ্যেও এঁরা বর্তমান রয়েছেন। এ ছাড়া কোন কোন ভিন্ন ভাষাভাষীও যে বাঙলা ভাষা শিখে নিয়ে বাঙলা সাহিত্য রচনা করে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তেমন দৃষ্টান্তও দুর্লভ নয়। এটা হলো বাঙলাদেশের বাইরে অথবা ভিন্ন ভাষাভাষী-কর্তৃক বাঙলা সাহিত্য রচনার একটা দিক।

এর চেয়েও বেশি আশ্চর্যের বিষয় হ'লো বাঙলা ভাষা লেখার ব্যাপারে ভিন্ন লিপির ব্যবহার। এর প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পেয়েছি, পর্তুগীজ পাদ্রি ম্যানুএল দ্য আস্‌সাম্পশাঁও-রচিত 'কৃপারশাস্ত্রের অর্থভেদ' নামক (Crepar Xaxtrer Orth 'Bhed) গ্রন্থে। এই গ্রন্থটি এবং খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত ভূষণার রাজপুত্র দোম আন্তনিও -রচিত 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' নামক গ্রন্থটি পর্তুগালের রাজধানী লিসবন শহরে ১৭৪৩ খ্রীঃ রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হয়েছিল। তবে বাঙলা লিপির মুদ্রিত রূপের প্রাচীনতম নিদর্শন ১৬৯২ খ্রীঃ নাকি পাওয়া গেছে বলে ফাদার হস্টেন উল্লেখ করেন। ১৭২৫ খ্রীঃ জার্মানিতে মুদ্রিত Urent Szeb নামক গ্রন্থে 'শ্রীসরজন্ত বল পকামার' (Sergeant Wolfgang Meryer) নামটি বাঙলা অক্ষরে মুদ্রিত আছে।

১৮০০ খ্রীঃ শ্রীরামপুরে বাঙলা মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে সম্ভবতঃ বাঙলা ভাষা লেখার জন্য আর বাঙলা লিপি ছাড়া অপর কোন লিপি ব্যবহারের প্রয়োজন হয় নি। অনুমান

কবা যায়, এব পবই ক্রমে আবও কিছু বাঙলা মুদ্রণ যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কাবণ শ্রীবামপুব মিশন ছাড়াও ফোর্ট উইলিযম কলেজ এবং অল্পকাল পবই বাজা বামমোহন বাযেব গ্রন্থসমূহ, বিভিন্ন বুক সোসাইটি কর্তৃক বচিত ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ, সংবাদপত্র প্রভৃতিব জন্য কয়েকটি মুদ্রণ যন্ত্রেবই প্রযোজন দেখা দিয়েছিল। অতএব মুদ্রণেব প্রযোজনে আব বাঙলাব জন্য ভিন্ন লিপি ব্যবহাবেব প্রযোজন বইল না।

কিন্তু ব্যাখ্যা কবা যায না, বাঙলা ভাষা-ভাষী লেখক যখন ভিন্ন লিপিব ব্যবহাব কবেন, তাব কাবণ। ব্যাপাবটা ঘটেছিল শ্রীহট্টে এবং কালটা ছিল মুঘল আমলেব শেষ দিক। সিলেটে অর্থাৎ শ্রীহট্টেব মুসলমান অধিবাসীব একটা অংশ বাঙলা ভাষা-ভাষী হওযা সত্ত্বেও তাবা এক বকম নাগবী ভাষায বাঙলা লিখতো, তাকে বলা হতো সিলেটী নাগবী। এই 'সিলেটী নাগবী' লিপিতে কিছু কিছু বাঙলা বইও বচিত হয়েছিল। এ ছাড়া চাটগাঁব সম্ভবতঃ কিছু আশবাফ অর্থাৎ অভিজাত শ্রেণীব মুসলমান যাবা সাধাবণতঃ ঘবেও উর্দু অক্ষব ব্যবহাব কবতেন, তাবা হযতো বাঙলা ভাষা শিখে নিযে সেই বাঙলা লিখতেন উর্দু ভাষায। অথবা এমনও হতে পাবে, হযতো সাধাবণ বাঙালভাষী মুসলমানই, যাবা মক্তবে কোন কাবণে লেখাপড়া কবাব সুযোগ পেয়েছেন উর্দু ভাষায, তাবা বাঙলা ভাষাব সঙ্গে পবিচিত হলেও বাঙলা লিপিব সঙ্গে পবিচিত হবাব সুযোগ পায নি। তথায এমন কিছু বাঙলা বচনাব নাকি নিদর্শন পাওয়া গেছে যা লিখতে উর্দু লিপি ব্যবহাব হয়েছে।

এতক্ষণ পর্যন্ত সাধাবণভাবে বাঙলাদেশেব বাইবে বাঙলা ভাষায অথবা বাঙালী কর্তৃক ভিন্ন লিপিতে কিন্তু বাঙলা ভাষায বচিত সাহিত্যেব কথা বলা হলো। খুব সাম্প্রতিক কালে জনৈক গবেষক অধ্যাপক উড়িষ্যায এমন ভিন্নজাতীয বেশ কিছু বাঙলা সাহিত্যেব সন্ধান পেয়েছেন, যেগুলি ওড়িযা লিপিতে বচিত এবং লেখকগণ সম্ভবতঃ প্রায সকলেই ওড়িযা ভাষা ভাষী।

বাঙলা ভাষা [illegible] সঙ্গে [illegible] সম্পর্ক উড়িষ্যা [illegible] ঘনিষ্ঠ উভয় ভাষাই [illegible] ভাষামাতৃকাব সন্তান এব সম্ভবতঃ বাঙলা সাহিত্যেব আদিযুগে অর্থাৎ দ্বাদশ শতক পর্যন্ত উভয় ভাষাব মধ্যে কোন লক্ষণীয় পার্থক্য বিশেষ কিছু ছিল না। তা ছাড়া বাঙলা ও উড়িষ্যা পবস্পবেব সন্নিহিত অঞ্চল বলে এব [illegible] বাঙলাদেশে গঙ্গাস্নানেব আকর্ষণ ও উড়িষ্যায পুবী ভুবনেশ্বব আদি তীর্থস্থানেব আকর্ষণে উভয় অঞ্চলেব অধিবাসীদেব পবস্পবেব পবিচিতিব প্রসাবে সহায়তা ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। এবপব ষোড়শ শতাব্দীব প্রথমার্ধে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবেব [illegible] বিশেষভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তদেব [illegible] উড়িষ্যাব [illegible] তেমনি চৈতন্যদেবেব প্রভাবে উড়িষ্যাবাসীগণও বৈষ্ণব [illegible] সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিল। ফলে উড়িষ্যাব বাঙলা [illegible] পবিচিত হয়েছিলেন। অতএব ওড়িযা ভাষা ভাষীবা [illegible] ব্যবহাবে দক্ষতা অর্জন কবে থাকবেন। এ ছাড়া কর্মসূত্রে [illegible] বাঙলা [illegible] উড়িষ্যায গিয়ে স্থায়ীভাবেই সেখানে বসবাসেব সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবেন

তাঁরা এবং তাঁদের বংশধররাও অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে মাতৃভাষা বাঙলার সঙ্গে সঙ্গে ওড়িয়া ভাষাকেও আপন করে নিয়েছিলেন। এইভাবেই বাঙলা ভাষা আর ওড়িয়া ভাষায় একটা ঐতিহাসিক মেলবন্ধনের সূত্রপাত ঘটে এবং সেই পথ ধরেই বহু ওড়িয়া ভাষা-ভাষীও বাঙলা ভাষায় কাব্য রচনা করেন। কিন্তু বাঙলা লিপির সঙ্গে তাঁদের পরিচয় না থাকায় তাঁরা ওড়িয়া লিপিরই শরণাপন্ন হয়েছিলেন এবং এ দুয়ের ব্যবধানও খুব দুস্তর ছিল না।

মনে হয়, চৈতন্যমহাপ্রভুর ব্যক্তিগত প্রভাবই ওড়িয়া ভাষা-ভাষীদের বাঙলা ভাষায় কাব্যরচনার তাৎক্ষণিক প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। কারণ ঐ ধারার কবিদের মধ্যে যাঁরা প্রাচীনতম, তাঁরা ছিলেন চৈতন্যদেবেরই সমসাময়িক এবং সম্ভবত অনেকেই তাঁর সহচরও বটে। অবশ্য জগন্নাথ দাস, সাবলা দাসের মতো কবিরা পঞ্চদশ শতাব্দীতেই বর্তমান ছিলেন বলেই কেউ কেউ অনুমান করেন। উনিশ শতকে চৈতন্য প্রভাব স্তিমিত হবার পরই ওড়িয়া কবিদের বাঙলা ভাষায় কাব্যরচনা প্রচেষ্টা ক্রমক্ষীয়মাণ হয়ে এসে ধারাটির স্বাভাবিক বিলুপ্তি ঘটে। হয়তো, নোতুন যুগ ভাবনা এতে সহায়তা দান করেছিল।

যে সমস্ত বিষয় অবলম্বনে ওড়িয়া কবিগণ বাঙলা ভাষায় কাব্য বচনা কবেন, তাতে যথেষ্টই বৈচিত্র্যের পবিচয় পাওয়া যায়। বাঙলা সাহিত্যে চৈতন্য-পূর্ব যুগেই যেমন রামায়ণ-ভাগবতাদির অনুবাদ বচনা আবম্ভ হয়েছিল, উড়িষ্যাতেও তেমনি আলোচ্য ধারার প্রথম পর্ব শুরু হয়েছিল সম্ভবত রামাযণ মহাভারত, ভাগবত, হবিবংশ প্রভৃতির অনুবাদের মধ্য দিয়েই। এরপরই মনে হয়, চৈতন্যজীবনের প্রভাব এবং উড়িষ্যাব গণদেবতা কিংবা জাতীয় দেবতা জগন্নাথদেবেব প্রভাব যুগপৎ উড়িষ্যাবাসীদের হৃদয়-মন অধিকার করে বসে থাকায় ওড়িযা কবিগণ একদিকে যেমন চৈতন্য-জীবনী, ভক্ত-জীবনী, চৈতন্যপদ রচনায় তৎপর হন, অপরদিকে তেমনি বাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক বৈষ্ণব পদ এবং বৈষ্ণবীয় তত্ত্বগ্রন্থ ও আত্মতত্ত্ব রচনায়ও বহু কবি এগিয়ে আসেন। বাঙলা সাহিত্যের মতোই মঙ্গলকাব্য ধারাও ওড়িয়ালিপিতে বঙ্গ ভাষায় নিজস্ব ধারা সৃষ্টি করে নিয়েছিল। 'মনসামঙ্গল কাব্যে' প্রাচীন রীতি অক্ষুণ্ণ ছিল. কিন্তু এটি ছাড়া ছিল স্বতন্ত্র শৈলীতে লিখিত কিছু নোতুন মঙ্গলকাব্য. যেমন 'কপিলামঙ্গল, স্মরণ-মঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, অদ্বৈতমঙ্গল ও ভুবনমঙ্গল' প্রভৃতি। লক্ষণীয়, বাঙলাদেশে মঙ্গলকাব্যগুলি যেমন প্রাগার্য সমাজ থেকে আগত দেবদেবীদের মাহাত্ম্য বর্ণনার উদ্দেশ্যেই প্রধানত কল্পিত হয়েছিল, সম্ভবত উড়িষ্যার সামাজিক পরিবেশের ভিন্নতায় তথাকার মঙ্গ লকাব্য ভিন্নতর ধারায় প্রবাহিত হয়। এ ছাড়া রয়েছে বিচিত্র ধারার অনেক কাব্য — 'সত্যনারায়ণ ও সত্যপীরের সমন্বয়ধর্মী পাঁচালি বা কাহিনী কাব্য, রাধাকৃষ্ণের বাসন্তরাস, জগন্নাথ দেবের ভজন', এমন কি জয়দেব গোস্বামী -রচিত 'গীতগোবিন্দে'র টীকাভাষ্যেরও সন্ধান পাওয়া যায়। বিভিন্ন পালা, পুরাণ, ব্রতকাহিনীও বাঙলা ভাষায় ওড়িয়া অক্ষরে লিখিত হয়েছে। আবার বিচ্ছিন্নভাবে রামায়ণের লক্ষ্মণের 'শক্তিশেল' বা 'নারদ গীতা' অথবা 'পঞ্চামৃতসিন্ধু' নামক গ্রন্থে বিভিন্ন জীবনী বা কাহিনী প্রভৃতিও তথাকার উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তবে এ বিষয়ে নোতুনভাবে গবেষণা আরম্ভ হয়েছে, অনেক তথ্য এখনও অনাবিষ্কৃত রয়েছে। সমস্ত তথ্য উদ্ধার হবার পরই এ বিষয়ে সামগ্রিক আলোচনা সম্ভবপর।

যে সমস্ত ওড়িয়া কবি বাঙলা ভাষায় কাব্যরচনা করেছেন, জনৈক ঐতিহাসিকের অনুসরণে তাঁদের কালভিত্তিক নাম ঃ ষোড়শ শতকের 'রায় রামানন্দ', 'জগন্নাথ দাস'; সপ্তদশ শতকে 'দ্বারিকা দাস, ধনঞ্জয় ভঞ্জ, দ্বিজ লোকনাথ, মাধব রথ, পুরুষোত্তম দাস, যদুরঞ্জন দাস, শেখর দাস, মধু দাস, কবি প্রসাদ'; অষ্টাদশ শতকে 'কবি কর্ণ, ভৃঙ্গবর রায়, ব্রজবন্ধু সিংহ, দুঃখী শ্যামদাস, রঘুরাম দাস, পিণ্ডিকা শ্রীচন্দন , রামচন্দ্র দেব, শ্যামসুন্দর ভক্ত, দিব্যসিংহ দেব'; উনিশ শতকে 'দ্বিজ গৌরচরণ, গৌরচন্দ্র, নটবর দাস, নারায়ণ মর্দরাজ' প্রভৃতি।

তবে এই কবিদের জীবৎকাল বিষয়ে সকলে একমত নন। কারো মতে কবি সাবলা দাস ও জগন্নাথ দাস ছিলেন পঞ্চদশ শতকের কবি — আবার কবি জগন্নাথ দাস, বলরাম দাস, অচ্যুতানন্দ, অনন্তদাস, যশোবন্তদাস এই পাঁচজন ভক্ত কবিকে চৈতন্যদেবের পরম অনুরাগী বলতে তাঁদের ষোড়শ শতকের কবি বলে মেনে নিতে হয়। এঁরা ছাড়াও আরো কবির কাব্য পাওয়া যায়, যাঁরা বিভিন্ন কালপর্বে জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন — 'বলরামদাস, অনন্তদাস, নীলকণ্ঠ, শীতলাচরণ, রঘুনাথ দাস, অচ্যুতানন্দ দাস, দীনবন্ধু দাস, কৃষ্ণচরণ পট্টনায়েক, জানকীবল্লভ, সনাতন, গোবিন্দসরণ দাস, যদুনন্দন, কানাই খুঁটিয়া, মাধবী দাসী, সালবেগ, চম্পতি-ভূপতি , কবিচন্দ্র জগন্নাথ, নারায়ণ দাস কবিরাজ, জগন্নাথ মিশ্র' প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, অনাবিষ্কৃত গ্রন্থ এখনো বহু রয়ে গেছে।

গ্রন্থের বিষয়সমূহ সম্বন্ধে গ্রন্থনাম থেকেই মোটামুটি অবহিত হবার সুযোগ রয়েছে। তবে এ সমস্ত কাহিনীতে বাঙলাদেশে যেমন সমকালীন সমাজ জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে, উড়িষ্যায় রচিত কাহিনীতেও তেমনি সমকাল ও সমকালীন সমাজ জীবনের বেশ কিছু খুঁটিনাটি পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন — 'দশকর্মাদি বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের বিবরণ , খাদ্যতালিকা, পূজাপদ্ধতি, বিবাহ-বর্ণনা' প্রভৃতি যেমন রয়েছে, তেমনি কৃষ্ণাবতারেরও খাঁটি মানবিক রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। জাতিভেদের তীব্রতা, স্ত্রী স্বাধীনতার অভাব প্রভৃতি যুগচিহ্নবাহী পরিচয়ও অনুপস্থিত নয়। তবে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই, কোন কোন বিষয়ের বর্ণনায় কবিরা ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করেছেন। আবার কৃষ্ণকথায় কিংবা তত্ত্বজিজ্ঞাসায় আধ্যাত্মিকতার দিকটাই বেশি করে পরিস্ফুট হয়েছে, সমাজ জীবনের পরিচয় সেখানে গৌণ।

ভাষা-ব্যবহারে কবিরা যথেষ্ট সতর্ক থাকা-সত্ত্বেও বাঙলার মধ্যে অসতর্কতার চিহ্নরূপে কিছু ওড়িয়া শব্দও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। অবশ্যই এর পশ্চাতে যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণও ছিল। কবিদের মাতৃভাষা ছিল ওড়িয়া, আর বাঙলা ছিল দ্বিতীয় ভাষা। কাজেই সর্বত্র মাতৃভাষার প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া দুষ্কর। ছন্দব্যবহারেও কবিরা মধ্যযুগীয় বাঙলা ভাষার ছন্দোরীতিই অনুসরণ করেছেন। প্রায় সকলেই মিশ্রবৃত বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দে চতুর্দশাক্ষর পয়ার এবং কিছু ৮+৮+১০ অক্ষরের দীর্ঘত্রিপদী ছন্দ ব্যবহার করেছেন। দ্বারিকা দাস ১০ মাত্রার দিগক্ষরা ছন্দের ব্যবহারে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। সমস্ত বিষয়টি এখনো অনুসন্ধান-সাপেক্ষ বলেই এখনো বিস্তৃত আলোচনার সময় আসেনি। তবে বিস্ময়ের বিষয় এই, এতদিনের মধ্যেও বিষয়টি ঐতিহাসিকদের গোচরে আসেনি কেন?

[এক] যুগ-পরিচয়

১৭৬০ খ্রীঃ রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলা সাহিত্যে মধ্যযুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। ভারতচন্দ্রই ছিলেন মধ্যযুগের শেষ ও সক্ষম প্রতিনিধি। ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের কবি হলেও তাঁর রচনায় যে আধুনিক যুগোচিত লক্ষণও যথেষ্ট বর্তমান ছিল, সেই বিচারে অবশ্য তাঁকে যুগসন্ধিকালের কবি বলে বিবেচনা করাই সঙ্গত। তবে ইতিহাসের বিচারে তাঁকে মধ্যযুগের কবি বলে অভিহিত করে আমরা এবার প্রকৃত যুগসন্ধিকালের তাৎপর্য-নির্ণয়ে অবহিত হচ্ছি। ১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশীর যুদ্ধে বাঙলার স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হলে বাঙলায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামক এক ইংরেজ বণিক কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে এই বণিক কোম্পানীর কবল থেকে বাঙলার শাসনভার হস্তান্তরিত হ'য়ে তা ন্যস্ত হয় ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া তথা ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের হাতে। এই শতাব্দীকালেই (১৭৫৭ খ্রীঃ-১৮৫৭ খ্রীঃ) বাঙলাদেশ ও জাতির জীবনে এক অন্ধ তমসাচ্ছন্ন যবনিকা প্রলম্বিত ছিল। বাঙলা সাহিত্যের বিচারে ১৭৬০ খ্রীঃ ভারতচন্দ্রের মৃত্যু এবং ১৮৫৮ খ্রীঃ ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন এই যুগটিকে 'যুগসন্ধিকাল' রূপে অভিহিত করা হয়।

তমসাচ্ছন্ন শতাব্দী

১৭০৭ খ্রীঃ দিল্লীতে বাদশা আলমগীরের (ঔরংজীবের) মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশের রাজনৈতিক আকাশ ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হয়। দিল্লীতে ধাবমান মারাঠা শক্তি এবং দেশময় সুযোগসন্ধানী বিদেশি বণিক্‌বেশী দস্যুদলের তৎপরতা সমগ্র দেশের শান্তিস্বস্তিকেই বিঘ্নিত করে তোলে। বাঙলার রাজনৈতিক আকাশেও কালো মেঘের ছায়াপাত ঘটে। দিল্লীর বাদশার অক্ষমতার সুযোগ নিয়েও অন্যান্য অনেক স্থানের মতো বাঙলায়ও বিভিন্ন শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। অতঃপর ১৭১৭ খ্রীঃ নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ সুবে বাঙলার সুবেদারি লাভ করে দেশে কিয়ৎ পরিমাণে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। মুর্শিদকুলি খাঁ ছিলেন অপুত্রক—তাঁর মৃত্যুর পর ১৭২৭ খ্রীঃ জামাতা সুজাউদ্দিন বাঙলার নবাবী লাভ করেন। নানাবিধ বিলাস-ব্যসনে আসক্তির কারণে তিনি দেশকে যথোপযুক্ত নায়কত্ব দিতে পারেন নি — তাঁর উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য দেশে শান্তিস্বস্তি বিঘ্নিত হয়েছিল। ১৭৩৯ খ্রীঃ সুজাউদ্দিনের মৃত্যু পর তৎপুত্র সরফরাজ খাঁ বাঙলার নবাবী লাভ

বাঙলার নবাবগণ

কবেন। তিনিও ছিলেন উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতিব। ফলে দেশেব আমীব ওমবাহ জমিদাব এবং দেশি বিদেশি বণিকবাও মাথা তুলে দাঁড়াতে আবম্ভ কবে। এই সুযোগ নিয়ে ১৭৪০ খ্রী নবাবেব প্রধান কর্মচাবী আলিবর্দি খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা কবে নবাব সবফবাজকে হত্যা কবে বাঙলাব মসনদ লাভ কবেন। নবাব আলিবর্দিব প্রচেষ্টায় দেশে শান্তি শৃঙ্খলা অনেকটা ফিবে এলেও দেশময় ববগীব হাঙ্গামা বিস্তাবলাভ কবে। ১৭৪২ খ্রীঃ থেকে ১৭৫১ খ্রীঃ পর্যন্ত এই সন্ত্রাস বর্তমান ছিল।

১৭৫৬ খ্রীঃ অপুত্রক নবাব আলিবর্দিব মৃত্যুব পব তাঁব অন্যতম দৌহিত্র নবীন যুবক সিবাজউদ্দৌলা, বাঙলাব মসনদেব উত্তবাধিকাবী মনোনীত হন। কিন্তু তাঁব স্বল্পকালেব বাজত্ব ছিল বড়ই দ্বন্দ্বসঙ্কুল। তাঁব প্রধান কর্মচাবীদেব অসহযোগিতা এবং বিশ্বাসঘাতকতায় ১৭৫৭ খ্রীঃ জুন মাসে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীব সঙ্গে এক যুদ্ধে পলাশী প্রান্তবে তিনি পবাজিত হন এবং পবে নিহত হন। কোম্পানীব কর্মচাবী এবং যুদ্ধ নায়ক ক্লাইভেব আনুকূল্যে সিবাজেব আত্মীয় এবং প্রধান সেনাপতি মিবজাফব সিংহাসন লাভ কবেন। কিন্তু তিনি ছিলেন ক্লাইভেব হাতেব পুতুল মাত্র। এবপব কিছুকাল তাব জামাতা মীবকাশিম আলি খাঁ এবং মীবজাফব পুত্র নাজমউদ্দৌলা সিংহাসনেব নামমাত্র অধিকাব ভোগ কবলেও ১৭৬৫ খ্রীঃ ক্লাইভ দিল্লীব বাদশাব কাছ থেকে বাঙলাব দেওয়ানি লাভ কবেন। ফলে বাঙলাব শাসনব্যবস্থায় দ্বৈত নীতি বহাল হলো শাসনভাব নামে বইলো নবাবেব হাতে কিন্তু দেওয়ানি ও অর্থ আদায়েব ভাব কোম্পানীব হাতে। এই অব্যবস্থাব ফলে ১৭৭০ খ্রী (বাঙলা ১১৭৬ সলে) দেশময় যে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, তাতে কোটি লোকেব প্রাণহানি হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। বাঙলাব ইতিহাসে এটি 'ছিয়াত্তবেব মন্বন্তব' নামে অভিহিত।

পলাশীব যুদ্ধ

এবপব বাঙলাব শাসনভাব সর্বতোভাবেই কোম্পানীব হাতে চলে যায়। ওয়াবেন হেস্টিংস, কর্ণওয়ালিশ, শোব, ওয়েলেসলি প্রভৃতি বড়লাট বা গভর্নব জেনাবেলদেব অপশাসনে দেশেব সাহিত্য সংস্কৃতি হয়ে ওঠে বিপন্ন। তাদেব অত্যাচাব, অবিচাব ও অনাচাবে দেশবাসীব মনেব মধ্যে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি কবছিল, ১৮৫৭ খ্রীঃ তা দাবানলেব রূপ লাভ কবে সিপাহী বিদ্রোহেব মাধ্যমে। বস্তুতঃ ইংলণ্ডেব পার্লামেণ্ট তা উপলব্ধি কবেই কোম্পানীব হাত থেকে দেশেব শাসনভাব স্বহস্তে গ্রহণে কবেন। শতাব্দীব অন্ধকাবময় যবনিকা অপসাবিত হলো।

অবক্ষয় পর্ব (১৭০৭ ১৭৯৯ খ্রীঃ) : মুঘল যুগে ভাবতবর্ষেব বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্প স্থাপত্য ভাস্কর্য আদিতে রুচিবোধেব যে স্বাক্ষব বয়ে গেছে বাঙলাব বুকে কিন্তু তেমন কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন নেই। পক্ষান্তবে মুঘল দববাবে বিলাস ব্যসনেব যে [illegible] তা কিন্তু যথাকালেই বাঙলাব নবাব আমীব ওমবাহদেব মহলে [illegible] ক্রমে মুঘল মহিমা অস্তমিত হলে যখন বাঙলাব নবাবই স্বাধীন শাসকেব [illegible] আচবণ কবতে লাগলেন, তখন প্রথমে আমীব ওমবাহ প্রভৃতি সভাসদগণ [illegible] সমাজেব বিবিক্ত

প্রতিনিধিদের মধ্যেও সেই মুঘল যুগের বাইরের চাকচিক্য দেখা দিতে লাগলো। বাইরে যত বাহার, ভিতরে তত দৈন্য। এদিকে পর্তুগীজ, ওলান্দাজ, ইংরেজ প্রভৃতি বণিক্‌রা এদেশে এসে কাঁচা পয়সা ছড়াতে লাগলো। সুযোগ সন্ধানীর দল এই সুযোগে ধনবান্ হয়ে উঠতে লাগলো। অন্তরের দৈন্য এইভাবে বাইরের আড়ম্বরে ঢাকা পড়ে যেতে লাগলো। এইভাবেই বাঙলার মানস-ভূমি যে অন্তঃসার শূন্য হয়ে পড়েছে তার প্রমাণ মধ্যযুগের সর্বাধিক প্রতিশ্রুতিমান কবি ভারতচন্দ্রের এবং পরম ভক্ত কবি রামপ্রসাদের অশ্লীল অপসৃষ্টি 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য। তারপর এলো কোম্পানীর আমল একেবারে -- সোনায় সোহাগা। অষ্টদশ শতকের গোড়াতেই যে অবক্ষয় যুগ দেখা দিয়েছিল, তাব পূর্ণতা সাধিত হ'লো।

১৭৬০ খ্রীঃ ভারতচন্দ্রের মৃত্যুতে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগেব সমাপ্তি ঘটলেও ভারতচন্দ্রকে একান্তভাবে মধ্যযুগীয় কবি বলে আখ্যাযিত কবা যায না। কাবণ তাঁর বচনায় আগামী যুগের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া গেছে। বস্তুতঃ তাঁকে 'যুগসন্ধির কবি' বলেই অভিহিত করা সঙ্গত। সিপাহি বিদ্রোহের এক বৎসর পব ১৮৫৮ খ্রীঃ ঈশ্বব গুপ্তেব মৃত্যু এবং কবি রঙ্গলালের আবির্ভাবেব মধ্য দিয়ে আধুনিক কালেব সূচনা। অন্তর্বর্তী শতাব্দীকালই বাঙলা সাহিত্যেব ইতিহাসে 'যুগসন্ধিকাল' রূপে পবিচিত। মধ্যযুগ অস্তমিত, আধুনিক যুগ অনুদিত — অতএব এই মধ্যবর্তী কাল তামসী রজনীর সঙ্গেই তুলনীয হতে পারে। ইতিহাসেব বিচারে এই অন্তবর্তী 'যুগসন্ধিকাল'কে বলা চলে সার্বিক 'অবক্ষয়ের যুগ'।

যুগসন্ধিকাল

১৭০৭ খ্রীঃ দিল্লীর বাদশা আলমগীরের মৃত্যুর পব থেকে কার্যত মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বসে যায়, আঞ্চলিক শাসনকর্তারাই প্রধান হয়ে মাথা তুলে দাঁড়ান। বাঙলাব বুকেও এই সময পব পর মুর্শিদাকুলি খাঁ, সুজাউদ্দিন, সবফবাজ খাঁ, আলিবর্দি খাঁ, সিবাজউদ্দৌলা-ব শাসন অপশাসনেব মধ্য দিযে একটা বিদেশি তৃতীয় শক্তি ইংবেজ বণিক্ কোম্পানি মাথা-চাড়া দিয়ে উঠছিল। অবশেষে এই কোম্পানিব কর্মচাবীবা নবাব সিবাজউদ্দৌলাব সেনাপতি ও সভাসদ্‌দের সঙ্গে ষড়যন্ত্র কবে পলাশীব যুদ্ধেব অভিনয়ে সিবাজকে পরাজিত কবে বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মীরজাফরকে সিংহাসনে বসিয়ে দেশ শাসন কবতে থাকে। বস্তুতঃ অর্ধশতাব্দী পূর্বে যার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল ১৭৫৭ খ্রীঃ থেকে সেটাই বাস্তবে রূপাযিত হলো। যথার্থ 'অবক্ষয যুগ' ১৭০৭ খ্রীঃ থেকে আরম্ভ কবে সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়েই, অর্থাৎ ১৭৯৯ খ্রীঃ পর্যন্ত। এব পববর্তী আরও অর্ধশতাব্দীকালব্যাপী 'যুগসন্ধিকাল' -এর সীমা বর্ধিত হ'লেও ইতিহাসেব বিচাবে আমবা উনিশ শতককে কোনক্রমেই অবক্ষয় যুগেব অন্তর্ভুক্ত করতে পাবিনে। কাবণ ১৮০০ খ্রীঃ থেকেই নবজাগবণেব নবসৃষ্টির প্রস্তুতি-পর্ব শুরু হয়ে যায। কাজেই, অষ্টাদশ শতকের প্রাবম্ভেই বাদশা আলমগীবের মৃত্যুর পর সমগ্র শতক জুড়েই 'অবক্ষয যুগ'। এ যুগেব উল্লেখযোগ্য কবি রাযগুণাকব ভাবতচন্দ্র, শাক্তকবি রামপ্রসাদ আব কমলাকান্ত। এঁদেব বচনায়ও কিন্তু যুগলক্ষণের পরিচয় অনুক্ত নয়।

কিন্তু অমারজনীব আকাশেও দেখা যায় নক্ষত্রের দ্যুতি — এই আলোতেই পথ চলতে হয় পথিকেব। এই যবনিকাব অন্তরালেই প্রস্তুতি চলে পববর্তী প্রভাতের। এই প্রাকৃতিক

জগতের তুল্য ঘটনা ঘটেছিল বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসেও । এই অবক্ষয় যুগ ও যুগসন্ধিকালেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন যুগন্ধর পুরুষ রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২ / ১৭৭৪ খ্রীঃ) — যাঁকে আধুনিক ভারতের জনক-রূপে অভিহিত করা হয়। এই যুগসন্ধিকালেই কোম্পানীর কাজে অথবা মিশনারী-রূপে এসেছিলেন কিছু মহামনা বিদেশি — যাঁদের একান্ত প্রচেষ্টায় এদেশে মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'লো, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হ'লো এবং তৎসহ বাঙলা গদ্যের বুনিয়াদ গাঁথা হলো। এছাড়া কিছু কিছু বইও রচিত হয়েছিল। এ সবই পরবর্তী আধুনিক যুগের প্রস্তুতি পর্ব [এ বিষয়ে 'আধুনিক যুগ' পর্বে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—তবে কি বাঙলা সাহিত্যের বিচারে যুগসন্ধিকাল একেবারেই বন্ধ্যা? সাহিত্যসৃষ্টির কোন প্রয়াসই কি একালে লক্ষিত হয়নি ? এর উত্তরে বলতে হয় যে এই যুগে মধ্যযুগের পূর্বানুবৃত্তিরূপে কিছু কিছু মঙ্গলকাব্যের অক্ষম অনুকরণ, অনুল্লেখ্য পাঁচালী রচনা এবং কিস্সা সাহিত্যের ধারায় কিছু কিছু রোম্যান্টিক প্রণয় কাহিনীর বাইরে উল্লেখযোগ্য কিছু সাহিত্য রচনা প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল — 'কবি, তর্জা, টপ্পা, আখড়াই, যাত্রা, খেউড়' প্রভৃতির মাধ্যমে। নক্ষত্রের দীপ্তি নিয়ে এরাই অমারজনীর আকাশে শোভা পাচ্ছিল। এদের বিশেষ কোন চিরন্তন সাহিত্যিক মূল্য না থাকলেও ঐ যুগের অপর কোন উৎকৃষ্টতর সাহিত্যের অভাবে ঐগুলিই ছিল জনমনের তৃপ্তিবিধায়ক। এগুলি সবই মূলতঃ গান এবং লৌকিক সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত। নগরমণ্ডলেই এদের উৎপত্তি এবং নাগরিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত পালিত এই লৌকিক সঙ্গীতগুলি ছিল প্রধানতঃ নিম্নরুচির পরিচায়ক। বস্তুতঃ এগুলি ছিল অবক্ষয় যুগেরই লক্ষণাক্রান্ত। এই নাগরিক লৌকিক সঙ্গীতগুলিকে এককথায় 'কবিগান' বলা হতো এবং রচয়িতাগণ 'কবিওয়ালা' নামেই পরিচিত ছিলেন। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,

লৌকিক সঙ্গীত

"তখন পুরাতন ঐতিহ্যের পথ রুদ্ধ হয়ে এসেছে, নতুন শিক্ষাসভ্যতার স্বর্ণদ্বার উন্মুক্ত হয়নি, অথচ নাগরিক সমাজের অনেকের হাতে কাঁচা পয়সা জমেছে প্রচুর। সেই বিকৃতরুচির নাগরিকদের রসের তৃষ্ণা মেটাবার জন্য এক প্রকার নাগরিক লোকগীতি, অভিনয় ও কাব্যকলার অনুশীলন হয়েছিল। একে এককথায় কবিসঙ্গীত ও উক্ত গায়কদের কবিওয়ালা বলা হলেও এর মধ্যে অনেক ভাগ উপবিভাগ আছে। মোটামুটি কবিগান, আখড়াই, টপ্পা, যাত্রা ও পাঁচালী—এই ক'শাখায় এই নাগরিক সাহিত্যের শ্রেণী বিন্যস্ত হতে পারে।"

অবক্ষয়িত সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এই যে কবিওয়ালাদের উদ্ভব ঘটেছিল, তাদের আবির্ভাব যেমন ছিল আকস্মিক, নাগরিক জীবন থেকে এদের তিরোধানও তেমনি আকস্মিক। পরবর্তীকালে এদের কোন কোন শাখা গ্রামজীবনকে আশ্রয় করে আত্মরক্ষার প্রয়াস পেলেও কখনো আর পূর্বতন ঐশ্বর্যের যুগে ফিরে যাবার সুযোগ পায়নি। রবীন্দ্রনাথ এদের তুলনা করেছেন গোধূলি মুহূর্তে অকস্মাৎ-দৃষ্ট সপক্ষ পতঙ্গের সঙ্গে। উচ্চতর শিক্ষাসভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন বিকৃতরুচি অর্থাৎ অর্থসম্পদশালী এক তাঁবেদার গোষ্ঠীর তুষ্টি সাধনে তৎপর

এই কবিওয়ালাদের শিক্ষাদীক্ষার যতই অভাব থাক না কেন, এরা ছিল দুটি বিশেষ গুণের অধিকারী—(এক) এদের ছিল সহজাত কবিত্বশক্তি এবং অশিক্ষিতপটুত্ব ও (দুই) উপস্থিত বুদ্ধি ছিল অসাধারণ।

যুগসন্ধিকালের সমুদয় সাহিত্য-কৃতিকেই একটু নোতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকপাতে উজ্জ্বল করে তুলেছেন অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, "ভারতচন্দ্রের মৃত্যুতে বঙ্গীয় কবিপ্রতিভা লুপ্তও হয় নাই, গুপ্তও হয় নাই, বরং পুরাতন কাব্যের প্রশস্ত পথ না পাইয়া নূতনতর তেজে শত শত গানের রন্ধ্রপথে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে প্রথম প্রকাশের পরে বাঙ্গালীর নবজীবনচেতনা রূপ লইয়াছিল দরিদ্র সমাজের জনসঙ্গীতে। ইহাব কারণ অষ্টাদশ শতকের সামাজিক অবক্ষয় দরিদ্র সমাজকেই বেশী পীড়িত কবিয়াছিল। জনসঙ্গীত পীড়িত গণ-মানসের প্রতিক্রিয়া। ইহার মধ্য দিয়া জনগণ আপনাদের মনেব ভার অনেকটা লঘু করিয়াছে। এই জনসঙ্গীত প্রধানতঃ চতুর্বিধ — উমা-সঙ্গীত, কবি-তর্জা-খেউড়, যাত্রা এবং পাঁচালী। প্রচলিত প্রথা-অনুসারে ইহাদেব বিষয় অধিকাংশই পৌরাণিক, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ আধুনিক; পাত্র-পাত্রী উমা, শিব, মেনকা, কৃষ্ণ, রাধা, বৃন্দা প্রভৃতি; কিন্তু ইহাদের কাহারও পৌরাণিক মহিমা নাই, সকলেই ছদ্মবেশী বাঙ্গালী। ভক্তি-প্রচার নহে, বিদ্রোহের উত্তেজনা-সৃষ্টিই ইহাদের উদ্দেশ্য। সেইজন্য বাদপ্রতিবাদমূলক উক্তি-প্রত্যুক্তির নাটকীয ভঙ্গিতেই এইগুলি রচিত হইযাছে। এইগুলি দেবতাব নৈবেদ্য নহে, রাজাবও বিলাসোপচার নহে, জনতারই উপভোগ্য বস্তু। ইহাদের স্রষ্টাও জনতা, কারণ জনতার ভাবে আবিষ্ট ব্যক্তির অর্থাৎ গণ-মনেরই ইহারা রচনা। সেইজন্য ইহাদের ভাষা অমার্জিত ও গ্রাম্য, রুচি স্থূল, রচনা শিল্পকলাহীন। ইহারা পৌরাণিক কাহিনীর 'কার্টুন' চিত্র।"

জনসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশেব মন্বন্তর এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভজনিত বঙ্গচ্ছেদের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ এই জনসঙ্গীত প্রায় বিলুপ্তিব সীমান্তে উপনীত হযেছে। এদেব কোন কোনটি, বিশেষতঃ কবিগান শহরাঞ্চল থেকে বহিষ্কৃত হযে পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের গ্রামজীবনে আশ্রয় লাভ করেছিল। পূর্বোক্ত কারণে একালে আর এদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। সেকালের কবিগান কীভাবে অনুষ্ঠিত হতো, তাব একটা মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায। "দু'দলে প্রথমে ঠাকুরদেবতার গান দিয়ে শুরু করতেন, ক্রমে রাত বাড়তো, চাঁদোযার তলে রেড়ীর তেলেব প্রদীপশিখা ম্লান হয়ে আসতো, কবিওয়ালাদেব সুর দুন থেকে চৌদুনে পৌঁছতো, ঠাকুর দেবতাকে ঠেলে ফেলে দিযে তখন তারা নিজমূর্তি ধারণ কবতেন, সরস্বতী প্রদত্ত যৎকিঞ্চিৎ শক্তিকে অশ্লীল ও অশিষ্টতায ব্যবহাব করতেন। শ্রোতাদের নেশা লেগে যেতো, চূড়ান্ত অশ্লীল জাযগায এসে ঢোল কাঁসি তারস্বেবে চীৎকাব করে উঠতো, পৃষ্ঠপোষক ধনী-ভূস্বামী বাহ্‌বা দিযে জয়ী পক্ষকে প্রচুর খেলাত দিতেন। শাল-দোশালার তো কথাই নেই, দরিদ্র কবিওয়ালাদেব ভাগ্যে বহু টাকাকড়িও জুটে যেতো। প্রতিভায় এরা যে স্তরেরেই হোক না কেন, উপস্থিত বুদ্ধি, পুরাণের জ্ঞান, ভাষা, ছন্দ ও সঙ্গীতে অসাধারণ দখলের জন্য এরা

কবিব আসর

[দুই] কবিগান

কবিগানের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গেলে একে 'জনসাহিত্য' বলে অভিহিত করাই সঙ্গত। উঠতি বড়লোক ব্যবসায়ী বা ভূ-স্বামীরাই এর পৃষ্ঠপোষক হলেও আপামব জনসাধাবণই ছিল এর শ্রোতা এবং রসভোক্তা। রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যে বলেছেন,"ইংরেজদের নূতন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্যরস আলোচনার অবসব, যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয়েকজনের, তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিক সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা রস সাহিত্য চাহিত না।"

জনসাহিত্য কবিগানের সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছে আবো অপর জাতীয় কিছু গান। অনেকে মনে করেন 'উমাসঙ্গীত' বা 'মালসীগান' অর্থাৎ 'আগমনী-বিজয়া' গানকে অবলম্বন কবেই হয়তো কবিগানের উদ্ভব ঘটেছিল। অন্ততঃ এক সময় এই উমাসঙ্গীত দিয়েই কবিগানেব সূচনা হতো। আর কবিগানের সমাপ্তিতে থাকতো অশ্লীল 'খেউড় গান'। তবে খেউড় গানের অশ্লীলতায় ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা নেই, এতে রয়েছে গ্রামীণ বসিকতা। কবিগান মূলত গানের মাধ্যমে বাগ্‌যুদ্ধ। এব আদিতে রয়েছে ভক্তিমূলক মালসী বা উমাসঙ্গীত, সমাপ্তিতে খেউড়। যাত্রা, তরজা, পাঁচালী প্রভৃতি কবিগানেরই পরিণত রূপ।

মালসী

কবিগানেব তথা কবিওয়ালাদের বচিত গানের একটা বিরাট অংশই 'উমাসঙ্গীত' বা 'মালসী' বা 'ভবানীবিষয়ক' গান। এ জাতীয় গানের স্রষ্টারূপে সাধক কবি রামপ্রসাদের খ্যাতি থাকলেও এর প্রধান পুষ্টিসাধনে নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু রাম বসু-আদি কবিওয়ালারাই। অপর-বিষয়ক কবিগানে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, উমাসঙ্গীতে শুধু যে তার অভাবই রয়েছে, তা নয়—বরং একে বলা চলে বাঙালীর সামাজিক জীবনের বিষাদ-সঙ্গীত। এতে উমা-মহেশ্বর এবং কার্তিক-গণেশাদির নাম উল্লেখ করা হলেও বস্তুতঃ এর সঙ্গে পৌরাণিক দুর্গাপূজার কোন সম্পর্ক নেই। আবার এগুলি শ্যামাসঙ্গীতের মতো সাধনসঙ্গীতও নয়, এতে কোন গূঢ় ইঙ্গিত নেই। এ জাতীয় সঙ্গীতে একপ্রকার মধুর রসাত্মক বাৎসল্যরসের আস্বাদন লাভ করা যায়। এতে রয়েছে বাঙালীর ঘরের কথা, বাঙালীর প্রাণের স্পর্শ।

কবিগান চারি অঙ্গে বিভক্ত — 'মালসী বা ভবানী-বিষয়, সখীসংবাদ, বিরহ ও খেউড়'। অবশ্য পরবর্তীকালে নানা বিষয়ের অবতারণার ফলে এতে সমধিক বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছিল। সাধারণতঃ কবিগানের আসরে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের উপস্থিতি ছিল আবশ্যিক। প্রথম দল ভবানীবিষয়ে গান গেয়ে সখীসংবাদের অবতারণা করতো। এর বিষয় রাধাকৃষ্ণ-কাহিনী থেকে গৃহীত হতো। এতে রাধার দূতীরূপে কোন সখী কৃষ্ণের নিকট কোন প্রশ্ন উত্থাপন করতো। একে বলা হয় 'চাপান'। এর পর

উতোর-চাপান

প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিতীয় দল সখীসংবাদের বিষয় নিয়ে এর উত্তর দিতো — একে বলা হয় 'উতোর' (< উত্তর)। পরবর্তী বিষয় ছিল একান্তই লৌকিক বিরহ-নির্ভর। কবিগানের শ্রেষ্ঠ অংশ ছিল এটিই। কবিগানের সমাপ্তি ঘোষিত হতো অশ্লীল অশ্রাব্য খেউড় গান দিয়ে।

ঈশ্বর গুপ্তের কালেই কবিগানের সমৃদ্ধির যুগ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল বলে তিনি কবিওযালাদের জীবনী এবং কবিগান সংগ্রহ করেন। তিনি পদরচনার বৈশিষ্ট্যরূপে এর তিনটি ভাগ দেখিয়েছেন — 'মহড়া, চিতেন ও অন্তরা'। এর মধ্যে আবার 'পবচিতেন, ফুকা, মেলতা, শওয়ারি, খাদ' প্রভৃতি উপবিভাগও ছিল। এদের মধ্যে শুধু 'অন্তরা' নামক কলিটিই ভারতীয় রাগ-সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত—অপর কোন অংশই বাগ-সঙ্গীতেব আদর্শে সংগঠিত হয়নি। কবিগানেব এই রীতিটি প্রাচীন — পববর্তীকালে, হাফ-আখডাই প্রবর্তিত হবার পর এই প্রাচীন রীতিটি 'দাঁড়া কবি' নামে অভিহিত হয। অনুমান কবা হয় যে এই রীতির প্রবর্তক ছিলেন বঘুনাথ দাস।

দাঁড়া কবি

[তিন] কবিওয়ালা

বাঙলাদেশে কবে, কখন কীভাবে প্রথম কবি গানেব প্রচলন হয়েছিল, তা জানা যায না। তবে মধ্যযুগেব অন্তিম লগ্নেই এব আরম্ভ। এর স্থাযিত্বকাল-বিষযে গবেষক সুপণ্ডিত ডঃ সুশীলকুমাব দে বলেন, "The existence of kavi-songs may be traced to the beginning of the 18th century or even beyond it to the 17th,but the most flourishing period of the kaviwalas was betweeen 1760 and 1830...After these greater kaviwalas, came their followers who maintained the tradition of kavir-poetry upto the fifties or beyond it. The kavi-poetry, therefore, covers roughly the stretch of [illegible] to 1830, although after 1830, all the greater kaviwalas one by [illegible] and kavi-poetry had rapidly declined in the hands of the [illegible] followers." বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম কবিওযালাব সম্মান কাব প্রাপ্য, এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা না গেলেও অনুমান, খ্রীঃ অষ্টাদশ শতকেব প্রাবম্ভে আবির্ভূত 'গোঁজলা গুই'-ই উক্ত শতকের মাঝামাঝি কালে প্রথম কবিগান বচনা কবেন। কবিওয়ালাদের জীবনী-লেখক ঈশ্বর গুপ্ত এব সমর্থক। 'ভাবতচন্দ্র' অন্নদামঙ্গল কাব্যে (১৭৫২ খ্রীঃ) 'খেড়ু' (খেউড়) গানেব উল্লেখ করেছেন। সম্ভবতঃ কবিগান এবং খেউড় গান সমার্থক ব্যাপাব। প্রায সমকালেই অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগেই সম্ভবতঃ আবো কযেকজন কবিওযালা আবির্ভূত হযেছিলেন — 'লালু নন্দলাল, রামজি রঘুনাথ দাস ও কেষ্টামুচি'। এঁদেব মধ্যে বঘুনাথ দাসকে 'দাঁড়াকবি' বা 'লহর' গানের প্রবর্তকের মর্যাদা দেওয়া হয়। সম্ভবতঃ ঐ জাতীয গানে কবিওয়ালাবা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করতেন।

কবিওয়ালাদেব যুগ

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে উনিশ শতকের প্রথম পাদকে কবিগানের সমৃদ্ধির যুগ বলে অভিহিত করা চলে। এই যুগের বিশিষ্ট কবিওয়ালাদের মধ্যে ছিলেন 'রাসু'(১৭৩৫-১৮০৭ খ্রীঃ), 'নৃসিংহ' (১৭৩৮-১৮০৭ খ্রীঃ), 'হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী' বা 'হরুঠাকুর' (১৭৪৯-১৮২৪ খ্রীঃ), 'নিতাই বৈরাগী' (১৭৫১-১৮২১ খ্রীঃ), 'আন্টুনি ফিরিঙ্গি', 'ভবানী বণিক' প্রভৃতি । এঁদের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ ছিলেন সম্ভবতঃ রাম বসু (১৮২৮ খ্রীঃ মৃত্যু)। ১৮৩২ খ্রীঃ হাফ-আখড়াই-এর সৃষ্টিতেই কবিগান নগরজীবন থেকে নির্বাসিত হয়ে কোনরকমে পল্লীজীবনে আশ্রয় লাভ করে বেঁচে বর্তে ছিল।

'হরু ঠাকুর' শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। সমস্যা-পূরণে ইনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। 'ভোলা ময়রা' ছিলেন কবিগানেব একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী। ভোলা ময়বাব প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল অসাধারণ। এক কবিব লড়াই-এ তিনি আত্মপরিচয়ে বলেছিলেন,

'আমি ময়বা ভোলা ভিঁযাই খোলা,
(ওগো) সর্দি গর্মি নাহি মানি,
ফুরাইলে বারোমাস ষড় ঋতুব হয় নাশ,
কেবল এই কথাটা জানি। . . .
নহি কবি কালিদাস বাগবাজারে করি বাস
পূজা এলে পুরী মিঠাই ভাজি,
তবে যদি কবি পাই হাটে কভু নাহি যাই ..'

তবে দুঃখেব বিষয়, কবিব লডাইযে তিনি অত্যধিক অশ্লীলতার প্রশ্রয় দিযে কুরুচির পরিচয দান কবেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন, "ভোলার যে সকল গান প্রসিদ্ধ, সেগুলি অ্যান্টুনি সাহেব অথবা অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে কুরুচিপূর্ণ গালাগালি। ভোলাব নির্ভীকতাব কিংবা প্রগলভতার সীমা ছিল না; দেশের বড় বড় ভূস্বামীদেব সম্মুখে অম্লানবদনে নিঃসঙ্কোচে ভোলা অশ্লীল খেউড়ের সহিত এবং প্রযোজন হইলে তাঁহাদিগকেও দুকথা শুনাইয়া দিত।" আন্টুনি ফিরিঙ্গিব সঙ্গে তাঁব বাগ্‌যুদ্ধ প্রায় ইতিহাসেব মর্যাদা লাভ করেছে। ভোলা ময়বা ছিলেন বাগবাজাবেব বাসিন্দা আব আন্টুনিব জন্মস্থান ছিল পর্তুগাল। ঠাকুব সিংহ নামক এক কবিওয়ালার প্রশ্নের জবাবে আন্টুনি নিজের পবিচয দিয়ে বলেছিলেন—

'এই বাঙলায বাঙালীর বেশে আনন্দে আছি।
হয়ে ঠাকরে সিং-এব বাপের জামাই
কুর্তি টুপি ছেড়েছি।।'

আন্টুনি বাঙালী পোষাক পরতেন, বাঙালী রমণীকে বিয়ে করেছিলেন এবং কালী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি ছিলেন মূলতঃ পর্তুগীজ বংশীয। কিন্তু তাঁর জন্মস্থান পর্তুগাল অথবা এদেশেই তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। সম্ভবতঃ তাঁর পূর্ববর্তী পুরুষই কেউ এদেশে

এসেছিলেন। যাহোক, তিনি একান্তভাবে বাঙালী জীবনে মিশে গিয়ে বাঙালীই হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন কালী-উপাসক, যদিও হিন্দুধর্মের যাবতীয় তত্ত্বেরই সন্ধান রাখতেন। তাই, যেমন, কবির আসরে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা জানান—

'মাগো তারা, দয়া করবি কি না
বল মা মাতঙ্গি,
আমি ভজনসাধন জানিনা মা জেতেতে ফিরিঙ্গি।'

অন্যত্র আবার তেমনি রাম বসুর বিদ্রূপের উত্তরে বলেছিলেন,

'খৃষ্টে কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নাই রে ভাই।
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথা শুনি নাই।
আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে,
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে,
আমার মানবজনম সফল হবে, যদি রাঙা চরণ পাই।'

কবিওয়ালাদের মধ্যে 'রাম বসু' একটি বিশিষ্ট নাম। তাঁর রচিত 'সখীসংবাদ' এবং 'বিরহসঙ্গীত' অনেকের উচ্চ প্রশংসা অর্জন করেছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, ''রাম বসুর 'বিরহে' বঙ্গবধুর প্রেমপূর্ণ সলাজ হৃদয়টি অঙ্কিত হয়েছে।'' 'মালসী' বা 'আগমনী সঙ্গীত' রচনাতেও রাম বসু যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অনেকে মনে করেন যে রাম বসুব গানে আধুনিক মন ও গীতিমূর্ছনার আবেশ বর্তমান। তবে রাম বসুর গানে অনুপ্রাস-যমকাদিব অতিশয়িত ব্যবহার কখন কখন বিরক্তিকর পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। যেমন—

'গেল গেল কুল, যাক কুল, তাতে নই আকুল।
লয়েছি যাহার কূল, সে আমার প্রতিকূল।
যদি কুলকুণ্ডলিনী অনুকূলা হন আমার
অকূলের তরী কূল পাবে পুনরায়।'

রবীন্দ্রনাথের মতেও এখানে কুলের কূল পাওয়া দুষ্কর।

পূর্বোল্লিখিত কবিওয়ালারা ছাড়াও অনেক কবিওয়ালা ছিলেন যারা শিক্ষাদীক্ষা কিংবা আভিজাত্যে ছিলেন প্রায় ব্রাত্য। এদের মধ্যে ছিলেন—নীলমণি পাটনি, বলরাম বৈষ্ণব, রামসুন্দর স্যাকরা, জগন্নাথ বেনে, গুরু দুম্বো, ভীমদাস, মতি পসারী প্রভৃতি।

[চার] যাত্রা গান

যুগসন্ধিকালের জনসাহিত্যের ধারায় যাত্রা গানই ছিল সম্ভবতঃ সর্বাধিক জনপ্রিয়। 'যাত্রা' শব্দের একটা বিশেষ অর্থ দীর্ঘকাল পূর্বেই বাঙলা ভাষায় প্রচলিত হয়েছিল, সেটি—''উৎসব-পরিবেশে কোনও গ্রথিত কথাবস্তুর গীত-নৃত্য-সংলাপ সহযোগে অভিনয়। হাজার বছর আগে এদেশে দেবপূজা অথবা অন্যবিধ ধর্মানুষ্ঠানে শোভাযাত্রা হইত, তাহাই যাত্রা নাম

পায়।" (ডঃ সুকুমার সেন)। খ্রীঃ চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য এবং চৈতন্যদেবের জীবন-কাহিনী থেকে অনুমিত হয় যে মধ্যযুগেও সম্ভবতঃ কোন এক ধরনের গীতপ্রধান যাত্রাগান অভিনীত হ'তো। কিন্তু বাস্তবে কোন প্রাচীন যাত্রাগানের পুথি পাওয়া যায়নি। উনিশ শতক থেকেই নানাজাতীয় যাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে সবই উন্মুক্ত মঞ্চে অভিনীত হ'তো — এই সঙ্গীতপ্রধান নাটগীতগুলি ছিল অপেরা জাতীয়। যাত্রার বিষয় ছিল প্রধানতঃ তিনপ্রকার —'কৃষ্ণলীলা বা কালীয়দমন', 'রামলীলা' ও 'বিদ্যাসুন্দর'। প্রাচীন যাত্রায়ও ছিল 'উমা-সঙ্গীতে'র মতো গান—এমন কি এর সংলাপ বা উক্তি-প্রত্যুক্তিও ছিল পদ্যে রচিত। এগুলি ছাড়া শিবযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা প্রভৃতিরও প্রচলন ছিল। মনে হয়, লোকসাহিত্যের এই ধারাটি সুপ্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ করে সমগ্র মধ্যযুগ ধরে গ্রামীণ জনসাধারণের সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গরূপেই পরিচিত এবং প্রচলিত ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এরূপ প্রাচীন কোন রচনার কোন সন্ধান আজো পাওয়া যায় নি।

যাত্রার বিষয়

অষ্টাদশ শতকে কৃষ্ণযাত্রার প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। যাত্রার পূর্বে হাস্যরসাত্মক অনুষ্ঠান দ্বারা প্রথমে দর্শকদের মুগ্ধ করবার চেষ্টা হতো। অনেক সময় সমসাময়িক কাহিনী বা পাত্রপাত্রীদের নিয়ে রঙ্গ-ব্যঙ্গ করা হতো, তার প্রচলিত নাম ছিল 'সঙ' (<স্বাঙ্গ)। 'কালুয়াভুলুয়া, কেশোবেশো, মেথর-মেথরানি' প্রভৃতি স্থূলরুচির সঙ দর্শকগণ বিলক্ষণ পছন্দ করতো। উনিশ শতকের শেষভাগে বিলিতী রঙ্গমঞ্চের প্রভাব বাঙলা যাত্রার পালাগঠনে ও অভিনয়ে যথেষ্ট পরিবর্তন সাধন করে।

নবকলেবরে যে যাত্রা প্রবর্তিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ব্রজমোহন রায় (১২৩৮-৮২ বঙ্গাব্দ) এবং মতিলাল রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যাত্রার গান লিখে বা দল করে যে সকল যাত্রাওয়ালা তৎকালে বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন তাঁদের সর্বাগ্রে অবস্থান করেন গোপাল উড়ে। ইনি উড়িষ্যাবাসী হয়েও বাঙলা গান রচনায় যথেষ্ট পটুত্ব দেখিয়েছেন। 'বিদ্যাসুন্দর' পালায় হীরা মালিনী-রূপে এঁর অভিনয় সেকালে যথেষ্ট উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল। উনিশ শতকের প্রথম দশকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী। এঁর 'স্বপ্নবিলাস', 'রাই উন্মাদিনী' প্রভৃতি কৃষ্ণযাত্রার পালাগান এককালে যেন দিগ্বিজয় করেছিল। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে কবি-হিশেবে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পরই নাকি এঁর স্থান, তবে অপরেরা এ মতে বিশ্বাসী নন। তৎকালে যাত্রাওয়ালাদের অনেকেই ছিলেন 'অধিকারী' পদবীধারী। এঁদের মধ্যে আছেন—'কৃষ্ণযাত্রার প্রথম যুগের লোচনদাস, পরমানন্দ, শ্রীদাম, সুবলদাস এবং কৃষ্ণনগরের গোবিন্দ, কাটোয়ার পীতাম্বর প্রভৃতি। রাসযাত্রায় পাতাই হাটের প্রেমচাঁদ, আনন্দ এবং জয়চাঁদ অধিকারীদের নামও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

যাত্রার নবরূপ

[পাঁচ] পাঁচালি

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে রামায়ণ মহাভারত-আদি অনুবাদ কাব্যগুলিও সাধারণভাবে 'পাঁচালি' নামে পরিচিত ছিল। গ্রন্থকারগণ নিজেরাই এদের 'রামায়ণ-পাঁচালি', 'ভারত পাঁচালি' প্রভৃতি নামে অভিহিত করতেন। এছাড়া দীর্ঘ কাহিনীমূলক মঙ্গলকাব্যগুলিও 'পাঁচালি' বা 'পাঁচালিপ্রবন্ধ' নামে পরিচিত ছিল। বস্তুতঃ 'পাঁচালি' শব্দটির সংজ্ঞা এবং অর্থ নিয়ে পণ্ডিতমহলে যথেষ্ট মতপার্থক্য বর্তমান রয়েছে। শব্দটির সম্ভাব্য নানাবিধ অর্থের উল্লেখ করে এ বিষয়ে গবেষক অধ্যাপক হরিপদ চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন, "বলবত্তর অনুমান এই যে, পূর্বে মুখ্যতঃ কাহিনীমূলক গানের সহিত পুতুল (পঞ্চালিকা) নাচ দেখাইবার প্রথা ছিল বলিয়া এই গীতকে পঞ্চালী বলা হইত।"

অষ্টাদশ শতকেব শেষে পাঁচালির অর্থ এবং প্রাচীন রূপ পরিত্যক্ত হয়। নবরূপে পাঁচালিব আবির্ভাবেব ফলে যুগসন্ধিকালে একে যে ভাবে পাওয়া যাচ্ছে, তার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়েছেন অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত। তিনি বলেন, "এই সময়ে এক মিশ্র সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছিল ; ইহাতে আখ্যান বহিল, কবিগানের ছড়া কাটান বহিল, অঙ্গভঙ্গী ও অভিনয়ও যুক্ত হইল। পাঁচালীতে পৌরাণিক, লৌকিক অথবা সমসাময়িক যে কোন বিষয় উপজীব্য হইতে পারিত। ইহাতে গায়েন থাকিত একজন। সে নাটকীয় ভঙ্গিতে আবৃত্তি, ছড়া ও গীত দ্বারা মূল কাহিনী বিবৃত করিত। গানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গায়ক থাকিত। পাঁচালীর পালাতেও ঢোল, কাঁসি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল। নুতন পদ্ধতির পাঁচালীতে ছড়া প্রধান স্থান লইল।'

জনসাহিত্যগোষ্ঠীর মধ্যে 'পাঁচালি'ই সর্বাধিক পরিণতি লাভে সক্ষম হয়েছে। অর্বাচীন কালের এ ধরনের পাঁচালিতে অনেক ক্ষুদ্রাকার উপকাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়, যেমন— 'শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব, বিধবা বিবাহ, নলিনী-ভ্রমরোক্তি' প্রভৃতি। পাঁচালি গানে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার হালচাল, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতি বিষয়ে শ্লেষাত্মক রঙ্গরসিকতা আধুনিকতারই পরিচয় দান করে। অবশ্য কোন কোন পাঁচালি গানে যুক্তিসিদ্ধ ভক্তিরসেরও অভাব নেই। একালের পাঁচালির মূল্যায়ন করে অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "অষ্টাদশ শতকের অবক্ষয়ী সমাজাদর্শ পূর্বতন ধর্ম ও ভক্তিপ্রধান পাঁচালীকে একেবারে জাতিচ্যুত ও ভ্রষ্টাচার করে ফেলেছিল। এ সমস্ত নাগরিক লোকসাহিত্যের বিশেষ কোন সাহিত্যমূল্য নেই; আমোদের উত্তেজনা, রঙ্গ রস, রুচিহীন বিষয়বস্তু ও শব্দের আস্ফালন দ্বারা অশিক্ষিত, অমার্জিত জনচিত্ত আকর্ষণ করাই ছিল এই যুগের এই ধরনের রচনা ও গীতির একমাত্র উদ্দেশ্য।"

পাঁচালীর বিষয়

পাঁচালিকারদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ দাশু রায় বা দাশরথি রায় (১৮০৬-৫৭ খ্রীঃ)। তাঁর বাড়ি ছিল কাটোয়া মহকুমায়। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে সহজাত কবিত্বপ্রতিভার স্ফুরণ লক্ষিত হয়। তখন ছিল কবিগানের যুগ। তিনি স্বভাবতঃই কবির দলে যোগদান করেন। কিন্তু কোন এক কবিগানের আসরে প্রতিপক্ষ তাঁর জাতকুল তুলে গাল দিলে অপমানিত হয়ে তিনি কবির দল ত্যাগ করেন এবং

দাশু রায়

১৮৩৬ খ্রীঃ পাঁচালির নববিন্যাস করে এক আখড়া স্থাপন করেন। অসংখ্য গান রচনা ছাড়াও দাশরথি রায় ৬৮টি পালাগীত রচনা করেছিলেন। ঐ গীতগুলি দশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

দাশরথি রায় তাঁর পাঁচালি রচনা করে সমকালে জনমানসে অতুলনীয় সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। জনসাধারণই শুধু নয়, বিশিষ্ট নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণও তাঁর গুণবত্তায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। সাময়িক জীবনসত্য ও সাময়িক সমাজসমস্যাকেই দাশু রায় তাঁব পাঁচালির বিষয় করে নিয়েছিলেন বলে তিনি সমকালে যেমন প্রতিষ্ঠা অর্জন কবেছিলেন, তেমনি কালাতিক্রমে হয়েছিলেন উপেক্ষিত। তিনি শুধু যুগের দাবিকেই মেটাতে পেবেছিলেন, যুগকে অতিক্রম কবে যেতে পারেন নি। এ ছাড়াও তিনি সভার মনোরঞ্জনেই সমস্ত শক্তি ব্যয় কবেছেন, প্রতিভার যথার্থ ব্যবহাবে স্থায়ী কীর্তি অর্জনে সচেষ্ট হন নি বলেই দাশু রায় অকৃত্রিম ও অবিমিশ্র বাঙলা ভাষায় এবং বাঙালী মনোভাবের সর্বশেষ কবি হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীকালের বাঙলা সাহিত্যে প্রায় উপেক্ষিত থেকে গেলেন। দাশবথি বাযের প্রতিভার বিচার বিশ্লেষণ করে ডঃ তারাপদ ভট্টাচার্য বলেন, 'ইনি ইংবেজ-পূর্ব আধুনিক যুগের যুগন্ধর কবি। এই যুগের সমস্ত কবির সমগ্র শক্তির কেন্দ্রীভূত বিগ্রহ দাশরথি। তাঁহাব প্রাণশক্তি বিপুল, রচনাশক্তি অসামান্য। .. কেবল প্রাচুর্যে নহে, ঐশ্বর্যেও দাশবথিব কবিপ্রতিভা অসামান্য। একদিকে প্রাচীন পদাবলীর মতো ভাবোদ্দীপক গানে এবং মঙ্গলকাব্যের মতো নানা জ্ঞাতব্য বস্তুতালিকায়, অপরদিকে অর্বাচীন তর্জার বাগ্‌বিতণ্ডায কবিগানেব বসকলহে, যাত্রা অভিনযে, কৌতুকে তিনি পাঁচালিকে করিয়া তুলিয়াছেন সম্পূর্ণ ঐশ্বর্যময। দাশরথির পাঁচালিতে ভক্তের ভক্তি, সমাজসেবীর লোকশিক্ষা, সংস্কারকেব সমালোচনা, বিদূষকের রঙ্গ কৌতুক এবং সভাসদের বাগ্‌বৈদগ্ধ্য একত্র দেখা যায়।"

পাঁচালিকারদের মধ্যে অপর উল্লেখযোগ্য নাম 'মধুকান' বা 'মধুসুদন কিন্নব'। তিনি 'ঢপ' পাঁচালিব প্রবর্তক। এ জাতীয পাঁচালিতে ভাষণ অংশ গদ্যে বচিত হয।

[ছয়] টপ্পা

টপ্পাগান জনসাহিত্যের ধাবায় অন্তর্ভুক্ত হলেও উত্তর ভাবতীয মার্গ সঙ্গীতেরই ধাবাভুক্ত এই টপ্পা। ১৬৬৬ খ্রীঃ ফকীবউল্লাহ্-র রাগদর্পণে এর প্রথম উল্লেখ পাওযা যায়। অনেকে মনে করেন, পাঞ্জাবেব উষ্ট্রচালকদের মধ্যেই সর্বপ্রথম এই গান প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বহু টপ্পার ভণিতায় 'শোরী' নামটি জড়িত থাকায় অনেকে শোরীমিয়াকে টপ্পাব উদ্ভাবক বলে মনে করেন। কিন্তু কোন কোন গবেসকের মতে অযোধ্যার গোলাম নবী বহু টপ্পা গান বচনা করেন এবং অনেক গানে তাঁর প্রণয়িনী বা পত্নী শোরীর নাম এতে যুক্ত করেন। যাহোক অযোধ্যা-লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে প্রচলিত হিন্দী টপ্পা ভেঙেই বাঙলা টপ্পা প্রবর্তন করা হয়। এই টপ্পার উপাদান বিশুদ্ধ মানবীয় প্রেম। অবশ্য টপ্পার ঢঙে ভক্তিমূলক গানের রীতিও প্রচলিত ছিল। কোন কোন গানে রাধাকৃষ্ণের নাম উল্লেখ করা

টপ্পাব মানবিকতা

হলেও আসলে তাদের অধিকাংশ লৌকিক প্রেমেরই গীত। টপ্পা গানের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে ডাঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "একদা এই টপ্পা গানের খুব কদর ছিল। প্রথমতঃ এই সমস্ত গানের বিশেষ কোন সুরুচিপূর্ণ ব্যাপার থাকতো না, দ্বিতীয়তঃ এর প্রণয়ঘটিত বর্ণনাও আবেগবিশিষ্ট লীরিকের পূর্বাভাস বলে গৃহীত হয়েছিল। তৃতীয়তঃ এতে মার্গ রীতি ও নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হত বলে, ঈষৎ অভিজাত শ্রেণীর ও মার্জিত রুচির বিলাসী সম্প্রদায় এর খুব অনুরাগী ছিলেন। আখড়াই গানে বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণী, তালমান অনুসৃত হত, মার্গরীতি পদে পদে অনুসরণ করা হত, নানাপ্রকার জটিল বাদ্যযন্ত্রের কৌশলও এ গানকে বড়ই দুঃসাধ্য করে তুলেছিল। তখন এই আখড়াই গানকে কিছু সহজসাধ্য করে, মার্গরীতিকে কিছু লঘুচপল করে এবং বাদ্যযন্ত্রের সমারোহ কমিয়ে ফেলে 'হাফ আখড়াই' গানের উৎপত্তি হল। যাঁরা হাফ আখড়াই গানের পৃষ্ঠপোষক ও উহার ভক্ত ছিলেন তাঁরাই টপ্পাগানের জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছিলেন।"

বাঙলায় টপ্পাগানের প্রবর্তক 'নিধুবাবু' বা 'রামনিধি গুপ্ত'। ১৭৪১ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করলেও দীর্ঘজীবী নিধুবাবু ১৮৩৭ খ্রীঃ পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন। নিধুবাবুর টপ্পাগানে মাঝে মাঝে রাধাকৃষ্ণের নাম উল্লেখ করা হলেও আসলে এগুলি একেবারেই Secular বা মানবীয় প্রেমের দৃষ্টান্ত। এগুলি গান করা হতো বলে এর ভাষা ছন্দে ততোটা মনোযোগ দেওয়া হয়নি, নতুবা বিষয়বস্তু এবং মনোভাবের দিক থেকে টপ্পা গানগুলি খাঁটি গীতিকবিতা হয়ে উঠতে পারতো। নিধুবাবুর টপ্পাগানের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। নিধুবাবু প্রেমকে রাধাকৃষ্ণের পৌরাণিক রোমান্স থেকে মুক্ত করে মানবিক আধারে স্থাপন করেন। প্রেম যে সহজ সাধারণ বস্তু—কোন কঠিন সাধনা নয়, তাও প্রমাণিত হয়েছে নিধুবাবুর টপ্পায়। টপ্পায় বর্ণিত প্রেমে বৈষ্ণব প্রেমের গভীরতা না থাকলেও এতে ঔদার্য অনেক বেশি।

নিধুবাবু

ডঃ তারাপদ ভট্টাচার্য নিধুবাবুর টপ্পা বিচার-বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করেছেন, "নিধুবাবুর টপ্পার প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার মননশীলতা। এই মননশীলতা তাৎকালিক নাগরিক জীবনের ফল। এইখানেই টপ্পা আধুনিক। ইহা প্রেমের কবিতা বটে, কিন্তু ভাবসর্বস্ব সরল ও কোমল কবিতা নহে। ইহা জটিল চিন্তায় সবল এবং বুদ্ধির দ্বারা সুসংহত। আধুনিক মনের কবি বলিয়া নিধুবাবুর দৃষ্টিও রিয়্যালিষ্টিক—তাঁহার কবিতা প্রাচীন রোম্যান্টিক মনোবিলাসের প্রবল প্রতিবাদ।"

টপ্পা রচয়িতাদের মধ্যে নিধুবাবু ছাড়া অপর দুই কবির নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়—শ্রীধর কথক ও কালী মীর্জা। এঁদের গানগুলিও বিশুদ্ধ লীরিক কবিতার সূচনা রূপে প্রশংসিত হবার যোগ্য।

অধ্যায় ঃ চব্বিশ — অষ্টাদশ শতক - 'অবক্ষয় যুগ'

বাঙালা সাহিত্যেব ইতিহাসে সামগ্রিকভাবে অষ্টাদশ শতক পুরোটাই সাধারণভাবে 'অবক্ষয়যুগ' -রূপে অভিহিত হবার যোগ্য। দেশের ভাষা-সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয় প্রধানত তাব সামাজিক অবস্থাব প্রেক্ষাপটে। আবার সমাজও দেশের রাজনৈতিক অবস্থাব উপর নির্ভরশীল। অতএব সর্বাগ্রে সমকালীন ইতিহাসটুকু জেনে নেওয়া দবকাব।

বাঙলায় পাঠান সুলতানগণ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করতেন। মুঘল বাদশা আকবরের আমলেই বাঙলা মুঘলের শাসনাধীনে আসে এবং দিল্লিব প্রতিনিধি-রূপে একজন সুবেদার এ প্রদেশ শাসন করতেন। তখন থেকেই বাঙলার অর্থ দিল্লিতে চালান যেতে আরম্ভ করে। কিন্তু আকবব, জাহাঙ্গীব এবং শাহ্‌জাহানের বাজত্বকালেও যথার্থ অর্থে বাঙলাব অবস্থায় খুব একটা বিপর্যয় দেখা দেয়নি। সপ্তদশ শতকের শেষার্ধ থেকে অর্থাৎ ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকাল থেকেই (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীঃ) বিপর্যয় শুরু হয়। তাঁকে বস্তুত এই অর্ধশতাব্দীকাল-ব্যাপী রাজত্বকাল জুড়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। দেশজুড়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নভাবে কত স্থানে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল — রুশ ঐতিহাসিকগণ একে 'গণ অভ্যুত্থান'বলে অভিহিত করেছেন। জাঠ, শিখ, আফগান, সৎনামী, আফ্রিদি, রাজপুত, মারাঠা, বিজাপুর প্রভৃতি বিদ্রোহী শক্তি দমন করতে গিয়ে ঔরঙ্গজীবের রাজকোষ শূন্য হয়ে গেলেই প্রজাশোষণ কবে সেই অর্থ আদায় করতে হয়। অতএব সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে, ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকালেই বাঙলায় যে অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল, ১৭০৭ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যুব পর কার্যতঃ মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বসে পড়লে আবার প্রায় স্বাধীন হয়ে ওঠা বাঙলায 'অবক্ষয় যুগ' যথাযথ অর্থেই আরম্ভ হয়ে যায়। ঐ কালের বিবরণ দিতে গিয়ে ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, আকবরের সময় ভূমিব রাজস্ব ছিল উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীযাংশ, ঔরঙ্গজীবের কালে তা হলো ফসলেব অর্ধেক এবং বায়তদের কাছ থেকে নানাবিধ আদায়ের পরিমাণ ছিল এর চেয়েও বেশি। বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারত অনুকূল অবস্থায় থাকলেও উদ্বৃত্ত অর্থ পুঁজির প্রাথমিক সঞ্চয়-রূপে গণ্য হতো না, সেই অতিরিক্ত অর্থ অভিজাত সম্প্রদায়ের বিলাস-ব্যসনে অথবা দালালদের সিন্দুকে স্থান পেতো। সেকালে বণিক ও কারুশিল্পীদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু, ফলে তারা ঔরঙ্গজীবের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার বলি-রূপে উৎপীড়নের শিকারে পরিণত হলেন। তাদের উপর অতিরিক্ত

ইতিহাসের কথা

মাত্রায় খাজনা বা জিজিয়া কর ধার্য করা হলো, যা আকবরের আমলে উঠে গিয়েছিল। ধর্মীয় নীতির দিক থেকে ঔরঙ্গজীব ছিলেন অত্যন্ত অসহিষ্ণু ; হিন্দুদের উপর নানাবিধ অত্যাচার—তাদের মর্যাদাসূচক কোন চিহ্ন ধারণ, হাতির পিঠে চড়া প্রভৃতি নিষিদ্ধ। হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হতে লাগলো, জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তিত হলো। ফলে দেশের সর্বত্র অসন্তোষ, কোথাও কোথাও গণবিদ্রোহ এবং তা দমনের নামে নির্যাতনের পালা। বস্তুত এই যখন দেশের সামগ্রিক পটভূমি, তখন প্রায় যুদ্ধরত অবস্থাতেই ৮৯ বৎসর বয়স্ক ঔরঙ্গজীব দেহত্যাগ করেন।

সমগ্র ভারতভূমি জুড়ে যে বিপর্যস্ত অবস্থা ছিল, বাঙলাদেশও কোন অংশে তার চেয়ে ভাল ছিল না। মুঘল সুবেদারদের মধ্যে মীরজুমলা, শায়েস্তা খাঁ বা আজিম-উস্-সান ব্যক্তিগতভাবে যিনি যেমনই হোন না কেন, কিংবা নবাব শায়েস্তা খাঁর আমলে চাউলের দাম যতই সস্তা হয়ে থাক, বাঙলাকে শোষণ করে দিল্লির রাজকোষ বোঝাই করবার ব্যাপারে কেউ কম যান নি। ঔরঙ্গজীব কর্তৃক নিযুক্ত মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭১৭ খ্রীঃ নিজেকে কার্যত স্বাধীন নবাব-রূপেই ঘোষণা করেন এবং তৎকালীন বাদশা ফারুকশিয়ার-কর্তৃক প্রদত্ত ইংরেজ বণিকদের প্রদত্ত ফরমান কার্যকর করতে অস্বীকার করেন। তিনি নিজে সুশাসক ছিলেন সত্য, কিন্তু হিন্দুবিদ্বেষী হবার কারণে হিন্দুপ্রজাগণ তার নিকট সুবিচার পায়নি। এরপর সুজাউদ্দিন বা

সমকালে বাঙলাদেশ

সরফরাজের আমলে শান্তি-শৃঙ্খলা বলতে কিছুই ছিল না, এঁরা মুঘল দরবারের বিলাস-ব্যসনটুকুই আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। অসচ্চরিত্র, লম্পট এবং অর্থলিপ্সু এই সব বিলাসী নবাবদের আমীর-ওমরাহরাও অনুরূপ কদর্য দূষিত লালসা-শিথিল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। নবাবদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে একজন রাজকর্মচারী হয়েও বিশ্বাসঘাতকতা করে প্রভুকে হত্যা করে আলিবর্দি খাঁ নবাব হয়ে বসেন। তিনি অপেক্ষাকৃত সুশাসক হলেও বহিঃশত্রু বর্গীদের আক্রমণে এমনভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন, যে তাঁব মৃত্যুর পরই সিংহাসনের অধিকাব নিয়ে বাজ দরবারে যে বিরাট ষড়যন্ত্র চলছিল, তাঁর কিছুই তিনি পূর্বে বুঝে উঠতে পারেন নি। তাই অনায়াসেই তাঁব বালক দৌহিত্র সিরাজেব বিরুদ্ধে ইংবেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়ে তাঁরই আত্মীয় বন্ধুজন বাঙলার স্বাধীনতা বিকিয়ে দিল ইংরেজ বেনিয়া কোম্পানির হাতে। শুরু হলো, পবাধীনতার কাল,—'যুগসন্ধিকাল'।

সমকালে পৃথিবীতে ইংরেজই ছিল সর্বাধিক শক্তিশালী, শিক্ষিত এবং সুসভ্য জাতি। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এদেশের শাসনভার ন্যস্ত হয়েছিল 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' নামক

কোম্পানির আমল

এক বণিক কোম্পানির উপব। ব্যবসা-বাণিজ্যে এদের দক্ষতা থাকলেও শাসন-ব্যাপারে এদের কোন অভিজ্ঞতা থাকবার কথা নয়। যদিও বিলেত থেকে কিছু কিছু উচ্চবর্গের কর্মচারীও নিযুক্ত করে পাঠান হয়েছিল, তবু দেশবাসীদের সঙ্গে যারা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন, তারা ছিলেন প্রধানতঃ কোম্পানির কর্মচারী অথবা এদেশীয় ব্যক্তি। অতএব এদের শাসনকার্যে যথাবিধি অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে প্রায়

অর্ধশতাব্দীকালের প্রয়োজন হয়েছিল। ফলতঃ কোম্পানি-শাসনের প্রথমার্ধ অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ বাঙলা জুড়ে চলছিল পূর্বমতোই দুঃশাসন-ব্যবস্থা। ইংরেজ কর্মচারীরাও কোম্পানির স্বার্থের প্রতি নজর রেখেই শাসনদণ্ড পরিচালনা করতেন। দেশের তাঁতশিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'লো, অপরাপর কুটির শিল্পও বিপন্ন হয়ে উঠলো। এদিকে করভারে নির্যাতিত প্রজাদেরও নাভিশ্বাস উঠছে। এর মধ্যে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে' (১৭৭০ খ্রীঃ) সমগ্র বাঙলাদেশে যে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দিয়েছিল, সেই ক্ষত আর নিরাময় হয়নি। বাঙালীর সমাজ ব্যবস্থাই ভেঙে তচনচ হয়ে গেল। ওদিকে ইংলণ্ডে প্রতি বৎসর অর্থ-প্রেরণের পরিমাণ ক্রমশঃই বেড়েই চলছিল আর বাঙালীর দুর্দশাও সেই অনুপাতেই ক্রমবৃদ্ধির পথে চলছিল। ফলতঃ অষ্টাদশ শতক তথা 'অবক্ষয় যুগে' বাঙলার সামাজিক জীবন কী অবস্থায় এসে দাঁড়ালো, একটু পর্যালোচনা ক'রে দেখা যেতে পারে।

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে ষোড়শ-সপ্তদশ-শতক পর্যন্ত বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে একটা নোতুন সমন্বয়বাদী সংস্কার ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল। এর প্রথম পর্বে এটি ছিল আর্য-অনার্য সংস্কৃতি সমন্বয়-রূপে। তুর্কী আক্রমণের আকস্মিকতায় বিপন্ন হিন্দু সমাজ আপৎকালীন ব্যবস্থা-হিশেবে স্থানীয় প্রতিবেশী অনার্য কোল-মুণ্ডা-সাঁওতাল গোষ্ঠীকেও সমাজে স্বীকৃতি দান করে তাদের ধর্মবিশ্বাস, আচার-আচরণাদিও গ্রহণ করে নিয়েছিল। এর ফলে প্রাচীনতর হিন্দু সমাজের জীবনযাত্রায় আবার নোতুন মাত্রা সংযোজন করতে হয়। অনেক নোতুন ধর্মভাবনা ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ তাতে যুক্ত হয়। পরবর্তী পর্বে, যখন তুর্কীরা এখানে যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত হয়ে শাসনক্ষমতা হস্তগত করে সমস্ত দেশেই তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ধর্ম প্রচার করে দেশময় মুসলিম জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি ঘটাতে থাকে, তখনই আবার নোতুন করে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের প্রয়োজন অনুভূত হয়। তৎকালে বাঙলাদেশে আগত মুসলমানদের মধ্যে দুটি বিরুদ্ধবাদী গোষ্ঠী ছিল — একদল ছিল কঠোর নিয়মনিষ্ঠ শরীয়তপন্থী মুসলমান — এঁরা কখনো কোরান-হাদিসের বাইরে পদার্পণ করতো না; অপর দল ছিল ভক্তিবাদী 'সুফীপন্থী' মুসলমান — এঁরা হৃদয়ধর্মের উপর, গুরুবাদের উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতেন। বাঙলার ভক্তিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে এর সাদৃশ্য উভয় ধর্মমতের মধ্যেও একটা সমন্বয়ের ধারা প্রবাহিত হ'লো। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে মুসলমানরাও সাদরে স্থান পেয়েছিল। এমন কি যবন হরিদাস গুরুর আসন পর্যন্ত লাভ করেছিল। অন্ততঃ শতাধিক মুসলমান কবি বৈষ্ণব পদ রচনা করেন। বৈষ্ণবদের 'কীর্তন গান' এবং সুফী সম্প্রদায়ের অনুরূপ সঙ্গীত তৎকালে গ্রামের আকাশ মুখরিত করে রাখতো। অপরদিকে, সম্ভবতঃ মঙ্গলকাব্যগুলোও সুরে গাওয়া হতো, — অন্ততঃ সুর করে পাঠ করা হতো এবং মাঝে মাঝে গানও হতো। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' যে রীতিতে রচিত, তাতে অনুমিত হয়, তৎকালে নাট্যগীতিও প্রচলিত ছিল। 'নাটুয়া নাচ' নাচার উল্লেখও পাওয়া যায়। মোটামুটি সপ্তদশ শতক পর্যন্ত এই ধারা অক্ষুণ্ণ থাকলেও ক্রমশঃ সব কিছুতেই অবক্ষয়ের সূচনা দেখা

বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবন

দিয়েছিল। যেমন, গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ক্রমশঃ বিকৃতি লাভ করে তৎকালে সহজিয়া সাধনায় পরিণত হয়েছিল এবং এটিই অষ্টাদশ শতকে 'বোষ্টম-বোষ্টমী' তথা 'ন্যাড়ানেড়ীর আখড়ায়' পরিণত হয়েছিল। শুধু বৈষ্ণব ধর্মেরই যে এই বিকৃতি ঘটেছিল তা নয়, অষ্টাদশ শতকের বিলাসবৈভবপূর্ণ অন্তঃসারশূন্য ভঙ্গুর দুনীতিপূর্ণ সমাজজীবনের প্রভাব জীবনের সর্ববিধ ক্ষেত্রেই সংক্রামিত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে সাংস্কৃতিক জীবনের বিশেষ রূপটি ফুটে উঠেছে, তৎকাল প্রচলিত 'কবিগান, যাত্রা গান, পাঁচালী, তরজা, খেউড়, আখড়াই' প্রভৃতি নিম্নরুচির পরিচায়ক কিছু নাগরিক লোকসঙ্গীতেব প্রসারে। জনগণের মানসিক জীবনের মান তথা সাংস্কৃতিক রুচির পরিচয়েই তো অবক্ষযিত জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সমগ্র অষ্টাদশ শতক অর্থাৎ 'অবক্ষয় যুগ' জুড়েই বাঙলারী সামাজিক জীবন এই অবস্থায় এসে দাঁড়িযেছে।

প্রাগাধুনিক কাল অর্থাৎ সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগে কখনো যে বাঙলা সাহিত্যের মান খুব উন্নত ছিল, এমন কথা বলা যায় না। তবে এ কথা স্বীকার্য, সদ্য উদ্ভূত বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্য দেশ-কাল-পাত্র-সাপেক্ষভাবে অর্থাৎ সমকালীন অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে যথাযথভাবেই অগ্রগতির পথে চলছিল। এইভাবে বিষয়ে, ভাবে, রূপে, আরোপে তাতে নানা বিকাশ সাধিত হচ্ছিল। যুগধর্মের বশবর্তী হয়ে সাহিত্যকেও ক্রমশ, আধুনিকতার পথে এগুতে হচ্ছিল। কিন্তু বারবার বৈদেশিক আক্রমণে বাঙলাব বাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্যবিপর্যযের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের গতি হয় ব্যাহত, সাহিত্যকেও তখন থমকে দাঁড়িয়ে ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিযে আবার নোতুন পথের হদিশ করতে হয়। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে আমরা সেই ভাঙ্গার রূপটিই দেখতে পাই, দ্বিতীয়ার্ধ একেবারেই শূন্যতায় পূর্ণ, হযতো বা গড়ার প্রয়োজনটুকু অনুভব করবার জন্য দম নেওয়া হচ্ছে, আর ফাঁকটুকু পূবণ করতেই তার মধ্যে প্রবেশাধিকার পেয়ে গিয়েছিল কিছু কবি, যাত্রাওয়ালা, টাপ্পাওযালা প্রভৃতি। এঁদের কথা যথাকালে পরে বলছি, আগে প্রথমার্ধের কথাটা বলে নিই।

অষ্টাদশ শতকের সাহিত্য

অষ্টাদশ শতকেব প্রথমার্ধে দু জন মাত্র কবিকেই বিশেষভাবে স্বীকার করে নেওযা চলে। তাঁদের একজন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়, যাঁকে নিঃসন্দেহ প্রাগাধুনিক যুগের সবচেয়ে শক্তিমান কবি বলে স্বীকার করে নেওয়া চলে। কিন্তু ভাগ্যদোষ রাজাব সন্তান হয়েও তাঁকে এমনভাবে অপরের চাটুবৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকার্জন করতে হতো, যে রাজসভার পারিষদ্‌বর্গের মনস্তুষ্টির প্রযোজনে তাঁকে একদিকে 'অন্নদামঙ্গল কাব্যে'র অর্থাৎ দেবীমাহাত্ম্য-সূচক গ্রন্থের এবং অপরদিকে পৃষ্ঠপোষক মহারাজের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ ও ঐতিহাসিক পুরুষ মানসিংহের কাহিনীর আড়াল দিযে মাঝখানে 'বিদ্যাসুন্দর'-এর মতো অশ্লীল কাব্যকে দাঁড় করিয়ে আড়াল করে রাখতে হযেছিল। একজন অত্যন্ত কঠোর সমালোচকের ভাষায় 'অন্নদামঙ্গল' বাঙলার প্রথম মঙ্গলকাব্য এবং এটিই শেষ মঙ্গলকাব্য। অথচ এবই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় খণ্ড অলঙ্কাবাদির সার্থকতম ব্যবহারে এমন একটি 'বাজকণ্ঠের মণিমালা'-রূপে গড়ে-ওঠা 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যটি ছাত্রপাঠ্যরূপে ব্যবহার করবাব উপায় নেই। প্রতিভাব এই অপচয়কে 'অবক্ষয় যুগে'র দোহাই দেওয়া ছাড়া আব উপায় কী ?

এই শতকের প্রথমার্ধের অপর উল্লেখযোগ্য কবি ভক্তপ্রবর কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ। বৈষ্ণব গীতিকবিতাধারা তখন লুপ্ত প্রায়, রামপ্রসাদ এই গীতিকবিতার ধারাটিকে ভিন্ন খাতে বইয়ে দিলেন — উমাসঙ্গীত আর শ্যামাসঙ্গীতের ধারায় ভক্তির গভীরতা এবং তৎসহ ব্যক্তিজীবনের স্পর্শও এই শাক্তপদগুলিতে সুলভ। শ্যামাসঙ্গীতে কবি মায়ের নিকট সংসার থেকে মুক্তির জন্য যে আকৃতি জানিয়েছেন, তাতে কিন্তু অবক্ষয়িত ধ্বস-নামা জীবনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। সর্বোপরি বলতে হয়, যুগের প্রভাবে রামপ্রসাদের মত ভক্তকবিকেও 'কালিকামঙ্গল' নামের আড়ালে চরমতম অশ্লীল 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করতে হয়েছিল। 'অবক্ষয় যুগে'র এর চেয়ে উৎকৃষ্টি দৃষ্টান্ত আর কি আশা করা যেতে পারে ?

অষ্টাদশ শতকের অবক্ষয় পর্বে পূর্ববর্তী ধারাসমূহের অনুসৃতি চলছিল, তবে তাদের মধ্যেও যুগলক্ষণ প্রকট। 'মনসামঙ্গল কাব্যধারায়' তন্ত্রবিভূতির রচনায় কাহিনী বর্ণনা কিংবা চরিত্র-চিত্রনে কুশলতার পরিচয় থাকলেও আদিরসের প্রাধান্য বড় বেশি। ত্রিখণ্ডে বিভক্ত ষষ্ঠীবরের কাব্যেও বাহ্যাড়ম্বর বাহুল্যই বিশেষভাবে নজরে আসে। জীবন মৈত্রের কাব্য-বিষয়ে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, " ... জীবনের কাব্য আদিরসের বর্ণনায় ভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে।... কবিত্ব অপেক্ষা পাণ্ডিত্যই তাঁহার অধিক ছিল।" 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য'ধারার অকিঞ্চন, মুক্তারাম, জয়নারায়ণ এবং ভবানীশঙ্করের রচনা পাওয়া যায়, কিন্তু পূর্ববর্তী ধারার প্রতিতুলনায় এগুলি একেবারেই উল্লেখযোগ্য নয়। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরামের কাব্যটি ১৭১১ খ্রীঃ সমাপ্ত হলেও তিনি মানসিকতার বিচারে বস্তুতঃ পূর্ববর্তী শতকেরই অন্তর্ভুক্ত। 'শিবায়ন' কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি রামেশ্বর এই পর্বেই বর্তমান ছিলেন। তাঁর রচনায় প্রশংসনীয় অনেক বিষয়ই রয়েছে, বস্তুতঃ তিনিও একজন শক্তিমান কবি ছিলেন। কিন্তু ভাগ্যদোষেই সম্ভবতঃ যুগধর্মের তাগিদে তাঁকেও বড় বেশি আদিরসের জোগান দিতে হয়েছে। শিব-চরিত্রটিকে তিনি লম্পট ক'রে তুলেছেন।

পূর্ববর্তী ধারাগুলির পূর্বানুবৃত্তি ছাড়াও এই পর্বেই সম্ভবত আরও কিছু কিছু নোতুন মঙ্গলকাব্যধারার সৃষ্টি হয়েছিল। 'ষষ্ঠীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল' প্রভৃতি, সুন্দরবনের বীর দক্ষিণরায়কে অবলম্বন করে 'রায়মঙ্গল', 'সত্যপীর' বা সত্যনারায়ণকে অবলম্বন করে অনেক পাঁচালীও রচিত হয়। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতাদির আংশিক অনুবাদও অনেকেই করেছেন। বৈষ্ণব কড়চা এবং বৈষ্ণব পদ রচনার ধারাটি একালেও বর্তমান ছিল, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব পদসঙ্কলনসমূহ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উল্লেখযোগ্য প্রতিভার স্বাক্ষর নেই কোথাও। সামগ্রিকভাবে 'নাথসাহিত্য'ই একালের সামগ্রী। শাক্ত পদাবলী ও একালেরই সৃষ্টি। অপর উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে রয়েছে 'কবি যাত্রা, পাঁচালী, তর্জা, খেউড়, আখড়াই, হাফ-আখড়াই প্রভৃতি নিম্নরুচির পরিচায়ক বেশ কিছু নাগরিক লোকগীতি। এদের মধ্যে অশ্লীলতা থাক্‌লেও কচিৎ উৎকৃষ্ট রচনাও একেবারে অপ্রাপ্য নয়। এগুলিই অন্ধকার আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্ররাশি।

অধ্যায় ঃ পঁচিশ — মধ্য যুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ

প্রতি ভাষার সাহিত্যের ইতিহাস-আলোচনা-প্রসঙ্গে ভাষার পরিবর্তন এবং কিছু যুগলক্ষণের উপর নির্ভর করেই সাহিত্যেরও বিভিন্ন যুগের লক্ষণ নির্ণীত হয়ে থাকে। তদনুযায়ী সাহিত্যেব ইতিহাসপ্রণেতা এবং ভাষাবিজ্ঞানীরা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকে প্রধান দুটি পর্বে বিভক্ত করেছেন,—একটি 'প্রাচীন যুগ', অপরটি 'আধুনিক যুগ'। ভাষাগত কারণে প্রাচীন যুগকে আবার 'আদি' ও 'মধ্য'—দুই যুগে বিভক্ত করা হয়েছে। খ্রীঃ দশম

যুগসন্ধি

থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত 'আদিযুগ এবং ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত 'মধ্য যুগ'। এরপর উনিশ শতকের শুরু থেকেই 'আধুনিক যুগ'। প্রতি দুটি যুগের অন্তর্বর্তীকাল 'যুগসন্ধিকাল' নামে অভিহিত হয়। সেই হিশেবে ১২০০-১৩৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত বিস্তৃত 'তুর্কী আক্রমণকে কাল'কে 'প্রথম যুগসন্ধিকাল' এবং ১৭৬০-১৮৫৮ খ্রীঃ পর্যন্ত বিস্তৃত 'কোম্পানীর শাসনকাল'কে 'দ্বিতীয় যুগসন্ধিকাল' নামে অভিহিত করা চলে। যে কোন যুগসন্ধিকালেই একদিকে যেমন দেখা যায় পুরাতনের পূর্বানুবৃত্তি, অপরদিকে তেমনি নোতুনের পদধ্বনিও শ্রুত হয়ে থাকে।

বাঙলা সাহিত্যের আদিযুগ এবং মধ্যযুগের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য কিছুটা বর্তমান থাকলেও বিষয়গত কিংবা দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য কিছুই ছিল না বলা চলে। সমগ্রভাবে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত পবিব্যাপ্ত প্রাচীন যুগে আমরা সাহিত্যের বহু বিচিত্র ধারার সঙ্গে পরিচিত হলেও তাদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণও বর্তমান ছিল বলেই দেখতে পাই। ঐ যুগের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকৃতিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাতে রয়েছে—বিবিধ অনুবাদ সাহিত্য, নানাবিধ মঙ্গলকাব্য, পদসাহিত্য, চর্যাপদ, বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্তপদাবলী এবং জীবনী সাহিত্য। বিষয়-নির্বিশেষে সব শাখাতেই কিন্তু ধর্মীয় লক্ষণ সুস্পষ্ট। ফলতঃ এই

মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য

কারণেই সমগ্র আদি ও মধ্যযুগের সাহিত্যকেই 'ধর্মীয় সাহিত্য' বলে অভিহিত করা হয়। অনুবাদ সাহিত্যে রয়েছে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতপুরাণ। সংস্কৃতে 'পুরাণেতিহাস' নামে অভিহিত এই শাখার অনুবাদের মধ্যে দিয়ে সুপ্রাচীন ধর্মীয় আদর্শ এবং ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠাই ছিল লেখকদের কাম্য। বিবিধ ধারার মঙ্গলকাব্যগুলিতে অনার্য সমাজ থেকে আগত চণ্ডী, মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী-আদি দেবদেবীদের আর্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রচেষ্টা এবং তাদের মাহাত্ম্য-কীর্তনই ছিল লেখকদের উদ্দিষ্ট।

অবশ্য পরে কিছু পৌরাণিক দেবতাও এ জাতীয় মঙ্গলকাব্যে স্থান করে নিতে পেরেছিলেন। 'চর্যাপদে' বৌদ্ধ সহজিয়াপন্থীদের সাধনা-সঙ্কেত, বৈষ্ণব পদাবলীগুলিতে বাধাকৃষ্ণের বিচিত্র লীলাকাহিনী পরিবেষিত হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত এই সাহিত্য একান্তভাবেই একটি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী-সাহিত্য হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু এই কাবাধারার মধ্যে একটা সার্বজনীনতা এবং উদার মানবিকতাবোধের স্বাদ পাওয়া যায়। অবশ্য তৎসত্ত্বেও এর উপর একটা আধ্যাত্মিক আবরণও দুর্লক্ষ্য নয়। জীবনী সাহিত্যেও চৈতন্য-আদি বৈষ্ণব মহাজনদের জীবনকাহিনী গ্রথিত হয়েছে, কিন্তু মহাজনদেব চরিত্রে অলৌকিকত্ব আরোপ করে জনমানসে তাঁদের ধর্মীয় মাহাত্ম্য-স্থাপনের ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টার পরিচয় সুস্পষ্ট।

সাহিত্যের আঙ্গিক বিচারে মধ্য যুগের দুটি ধারারই পরিচয় পাওয়া যায়। একটি ধারা কাহিনীকাব্যের, এতে দীর্ঘাযত কাব্যকাহিনী, রামায়ণ, মহাভারত আদি অনুবাদ সাহিত্য, চণ্ডী-মনসা আদি মঙ্গলকাব্য সাহিত্য এবং চরিত্র সাহিত্য আর কিস্‌সা সাহিত্য কিম্বা পল্লীগীতিকা বা গাথাকাব্যগুলি এই পর্যায়ভুক্ত। অপর ধারাটি হলো গীতিকাব্যেব—চর্যাপদ, অসংখ্য বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী এবং অন্তর্বর্তীকালের কবি, টপ্পা-আদি গানগুলি এই পর্যাযের অধীন। সপ্তদশ শতক পর্যন্ত এই সকল ধারাই অব্যাহত গতিতে আপনাদের পথ করে এগিয়ে যাচ্ছিল। অষ্টাদশ শতক থেকেই পট-পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওযা যাচ্ছিল। এই শতকেই প্রথম উল্লেখযোগ্যভাবে মধ্য যুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তবণ প্রযাস লক্ষিত হয়েছিল।

সাহিত্য সমাজ-জীবনের দর্পণ। কাজেই সমাজে যখন কোন বিশেষ পরিবর্তন দেখা দেয়, তার প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যে। অষ্টাদশ শতকের সাহিত্যে যে পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তার কাবণ নিহিত বয়েছে সমাজ ইতিহাসেব পৃষ্ঠায। তাই আঠারো শতকেব বাজনৈতিক পটভূমিকার কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ আবশ্যক। এই শতকের গোড়াতেই দিল্লীর বাদশা ঔরংজীবের মৃত্যুব (১৭০৭ খ্রীঃ) পরই দেশব্যাপী সামন্ত বাজগণ আত্মপ্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়ে ওঠায় সর্বত্র শাসন-শৃঙ্খলায় লক্ষণীয় অবনতি সূচিত হয়েছিল। বাঙলা মুলুকেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

সমাজ জীবন

অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙলাব সিংহাসন নিযে যে অন্তর্দ্বন্দ্বেব সূত্রপাত হয়, তারি ফলে ইংবেজ বণিক কোম্পানী মাথা তুলে দাঁড়ানোর সুযোগ পায়। আবার ঐ সমযই মারাঠা বর্গীর দলও এক দশক কাল দেশের সর্বত্র অবাধ লুণ্ঠনে মত্ত থাকায দেশের সুশাসন বিঘ্নিত হয়। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা ক্ষমতার লোভে একে অপবেব প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় প্রবৃত্ত হয। ফলে ১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশীর যুদ্ধে বাঙলার তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত ও পরে নিহত হন। এই সঙ্গে বাঙলার স্বাধীনতা সূর্যও অস্তমিত হয়। অতঃপর দেশের শাসনভার হস্তান্তরিত হয় ইস্ট ইণ্ডিযা কোম্পানীর হাতে। এই ব্যবস্থা চলছিল ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহের কাল পর্যন্ত। বস্তুতঃ এই শতাব্দীকাল বাঙলা নিমজ্জিত ছিল অমানিশার অন্ধকাবে।

অষ্টাদশ শতকের শুরু থেকেই দেশের সর্বত্র অবক্ষয়ের চিহ্ন দেখা দেয়। এই রাজনৈতিক অব্যবস্থা সমাজ-জীবনেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করায় সাহিত্য-সংস্কৃতিতে আমরা তেমন

উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের কোন পরিচয় পাই না। এর মধ্যে ব্যতিক্রম শুধু রামেশ্বরের 'শিবায়ন কাব্য' এবং ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল কাব্য'। এই দুই কবিই অসাধারণ প্রতিভাধর হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা সামাজিক পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন। তাই যথার্থ পাণ্ডিত্য এবং কবিত্বশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের কাব্যে সামাজিক অবক্ষয়ের চিহ্নই ফুটে উঠেছিল। তাঁদের মধ্যে যে সুযোগ-সম্ভাবনা বর্তমান ছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে কাব্যে তার প্রতিফলন ঘটলো না। এই দুই কবি-ব্যতীত সমগ্র অষ্টাদশ শতকে আর কোন উল্লেখযোগ্য কবির সাক্ষাৎ আমরা পাইনি। তখন চলছিল শুধুই পুরাতনের চর্বিত চর্বন, যা মানসিক অস্বাস্থ্যই সূচনা করে। সামগ্রিক অবক্ষয় একদিকে যেমন পুরাতন মূল্যবোধে ধ্বস নামিয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি দেহবুদ্ধি এবং বস্তুতান্ত্রিকতার প্রাবল্য আধুনিক যুগের প্রবর্তনেও কিছুটা সহায়তা করেছিল।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বস্তুতঃ মধ্যযুগের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল, এবং এরপরই শুরু হয় যুগসন্ধিকাল। ঐতিহাসিক দিক থেকে সমকালেই অর্থাৎ ১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশীর যুদ্ধে বাঙলার স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ে বাঙলার রাজশক্তির হস্তান্তর ঘটে — ইংরেজ বেনিয়া কোম্পানী কার্যতঃ বাঙলার শাসনভার গ্রহণ করে। ওরা এই অধিকার বজায় রেখেছিল পুরো এক শতাব্দী কাল। ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহের পর

আধুনিক যুগের সূচনা

ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া কোম্পানী থেকে শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং এর পরবর্তী বৎসর ১৮৫৮ খ্রীঃ যুগসন্ধিকালের শেষ কবি ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত কবি রঙ্গলালের আবির্ভাব-এর ফলে যুগসন্ধিকালের সমাপ্তি ঘোষিত এবং আধুনিক যুগের আবির্ভাব সূচিত হয়। যুগসন্ধিকালে পুরাতনের যে সকল অনুবৃত্তি লক্ষিত হয়েছিল, আধুনিক যুগে যেমন তার সমাপ্তি ঘটে, তেমনি আভাসে ইঙ্গিতে বর্তমান ছিল যে সকল আধুনিকতার লক্ষণ তাও হলো সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত।

অষ্টাদশ শতকে, হয়তো বা যুগধর্মেই, সাহিত্যের কয়েকটি নোতুন ধারা প্রবর্তিত হয়, যেখানে আধুনিকতার পদধ্বনি সুস্পষ্টভাবেই শ্রুত হয়েছিল। এই সাহিত্যধারায় রয়েছে — শাক্ত পদাবলী, পল্লীগীতিকা বা গাথাসাহিত্য এবং বাউল-আদি লোকসঙ্গীত। শাক্ত পদাবলী রচনার পেছনে বৈষ্ণব প্রভাব অবশ্যই থেকে থাকতে পারে, কিন্তু এতে পারিবারিক, গার্হস্থ্য ও সমাজজীবনের পরিচয় এমনভাবে ফুটে উঠেছে যে এগুলিকে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীসাহিত্য রূপে চিহ্নিত করা সত্ত্বেও শাক্ত পদাবলী ছিল আধুনিক সাহিত্যের মতোই একান্তভাবে জীবনমুখী — এ সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই। এই সাহিত্যশাখার একটি ধারা

শাক্ত পদাবলী

'উমাসঙ্গীত' বা 'আগমনী-বিজয়ার গান'কে একান্তভাবেই মানবিক সাহিত্য বলে উল্লেখ করতে হয়। এতে সমকালীন নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালীর পারিবারিক জীবনের চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে। এর পাত্রপাত্রীগণ হিমালয়, মেনকা, উমা এবং মহেশ্বর-আদি দেবদেবী হলেও দেবমাহাত্ম্য ছিল সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। শাক্ত পদাবলীর

অপর ধারা — 'শ্যামাসঙ্গীত'। শ্যামাসঙ্গীত মূলত সাধনসঙ্গীত— এতে সাধনতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা থাকলেও এতে যে সকল উপমা-রূপক এবং চিত্রকলা-আদি ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে আমাদের জটিল সামাজিক জীবনের চিত্রই ফুটে উঠেছে। শ্যামাসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত। ডঃ তারাপদ ভট্টাচার্য বলেন, "বঙ্গসাহিত্যে রামপ্রসাদ-প্রবর্তিত শ্যামাসঙ্গীতের দান অল্প নহে। ইহাই বঙ্গীয় গীতি কবিতাকে বন্ধনদশা হইতে মুক্তি দিয়াছে। ইহার বিষয় ভাব ও রূপের মধ্যেই দেখা দিয়াছে প্রথামুক্তি।" এই প্রথামুক্তিই আধুনিকতার লক্ষণ। বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে দেখা যাবে যে শ্যামাসঙ্গীত রচনার বন্ধন থেকেও গীতিকবিতাকে মুক্তি দিয়েছে। সর্বোপরি কবি রামপ্রসাদ বাস্তব জীবনের তুচ্ছ, নিষ্প্রভ ও রূঢ় পরিবেশ থেকে চিত্রকল্প আহরণ করে যে রিয়ালিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন, "সেই রিয়ালিস্টিক দৃষ্টির জন্যই রামপ্রসাদকে আধুনিক যুগেরই অধ্যাত্মকবি বলা চলে।"

সাধারণভাবে মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে একদিকে ছিল ইতিহাস-চেতনার অভাব, অপরদিকে ছিল মানবধর্মী সাহিত্যের অভাব। সেই অভাব পূরণের কিছু কিছু লক্ষণ বর্তমান ছিল 'গাথা' এবং 'গীতিকা সাহিত্যে'। সাঁওতাল হাঙ্গামা, কৃষক বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, বর্গীর হাঙ্গামা, পীর-ফকিরের অত্যাচার, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, নীলকরের অত্যাচার, কোম্পানির জুলুমবাজি প্রভৃতি সমসাময়িক ঘটনার উপর নির্ভর করে রচিত হয় অসংখ্য ছড়া ও গাথা — যাতে ইতিহাস-চেতনার পরিচয় সুস্পষ্ট। এছাড়া 'রাজমালা' নামক কাব্যে ত্রিপুরার রাজবংশের কাহিনী এবং 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' বর্গীর হাঙ্গামার কিছু ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়। পূর্ব ময়মনসিংহ থেকে প্রাপ্ত 'ময়মনসিংহ গীতিকা' এবং 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় যে সকল কাহিনী সঙ্কলিত সংকলিত হয়েছে এবং যে ভাবে কাহিনীগুলিকে সাজানো হয়েছে, তাতে তাদের কোন কোনটিতে রূপকথার অমেজ থাকলেও অপর কয়েকটিতে আধুনিক উপন্যাসেরই পূর্বরূপকে খুঁজে পাওয়া যায়, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বাস্তবজীবন-নির্ভর এই গীতিকাগুলি-সম্পর্কে মনীষী অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "...ময়মনসিংহ গীতিকা উপন্যাস সাহিত্যের উৎপত্তির সহিত ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কিত। বাঙ্গলাদেশের সাহিত্যের আর কোথাও অবিমিশ্র বাস্তবতার এমন তীক্ষ্ণ, তীব্র আত্মপ্রকাশ দেখা যায় না। পল্লীসাহিত্যের ধারা যদি আমাদের সাহিত্যে অক্ষুণ্ণ থাকিত, গ্রামের অখ্যাত আবেষ্টন ও অশিক্ষিত গায়কের সংস্পর্শের পরিবর্তে ইহা যদি কেন্দ্রস্থ সাহিত্যের পদমর্যাদা লাভ করিত, ... তবে সম্ভবতঃ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের জন্মদিনও আরও অগ্রবর্তী হইত।" কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, প্রথম মানবমুখী ধারার ঐতিহ্য আমরা বজায় রাখতে পারিনি বলেই আমাদের বাঙলা সাহিত্যে আধুনিক উপন্যাসের আবির্ভাব এত বিলম্বিত হয়েছিল।

ময়মনসিংহ গীতিকা

অষ্টাদশ শতকে যে তিনটি নোতুন ধারা প্রবর্তিত হয়েছিল, তার তৃতীয়টি 'লোকসঙ্গীত'। নানাবিধ লোকসঙ্গীতের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'বাউলগান'। এই বাউলগানের

আবির্ভাব এক অভিনব ব্যাপার। এই গানগুলি মূলতঃ আধ্যাত্মিক অথচ এতে কোন সাম্প্রদায়িক চিহ্ন না থাকায় হিন্দু-মুসলমান সমভাবেই বাউল সাধনায় এবং বাউল গান রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। যে সকল উপমা রূপক অথবা চিত্রকল্প-আদির সাহায্যে বাউলগণ তাঁদের তত্ত্বকথা প্রকাশ করেছেন, তাতে আধুনিক জীবনযাত্রার বহু উপকরণকেই সাদরে গ্রহণ করা হয়েছে। 'কর্তাভজা', 'সাহেবধনী' প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকসঙ্গীতেও অনুরূপ আধুনিকতার লক্ষণ দেখা যায়।

বাউল

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধটি প্রধানতঃ 'কবিওয়ালাদের যুগ'। কবিগান ছাড়াও 'টপ্পা, পাঁচালি, যাত্রা, তরজা, খেউড়, আখড়াই' প্রভৃতি নানাবিধ লোকসঙ্গীতই একালের বাঙালীর সাহিত্যপিপাসা মেটানোর ভার নিয়েছিল। সঙ্গীত-রচয়িতাদের মধ্যে শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিতও যেমন ছিলেন, তেমনি বিষয়বস্তুর দিক থেকেও তাঁরা সমভাবে প্রাচীন এবং নবীনকে গ্রহণ করেছিলেন। যুগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা পা মিলিয়ে চলেছিলেন। বস্তুতঃ সমগ্র যুগসন্ধিকালই ছিল এই নাগরিক লোকসঙ্গীতের উৎপত্তি, বিকাশ এবং প্রায় সমাপ্তির যুগ। সাহিত্যের নিরিখে যুগসন্ধিকালকে বুঝতে গেলে শুধু এদেরই শরণ নিতে হবে। বলতে গেলে, যুগসন্ধিকালে এর বাইরে আর সাহিত্য ছিল না, আবার যুগসন্ধিকালের বাইরেও এব প্রসার ছিল না। অতএব যুগসন্ধিকালেব সাহিত্য বলেই এগুলিতে আগামী নবযুগের আভাস পাওযা গিয়েছিল। এ জাতীয় গানে আধুনিক মানব-মানবীর মনোভাব কীভাবে আত্মপ্রকাশ লাভ করেছিল তার একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা চলে। মধ্যযুগের ধর্মীয় এবং বস্তুনিষ্ঠ কাব্যধারা আধুনিক যুগের একান্ত মানবিক ও ব্যক্তিনিষ্ঠ কাব্যে রূপায়িত হবাব পূর্বে এই যুগসন্ধিকালে কীভাবে দুগের মাঝামাঝি স্থান করে নিয়েছিল, 'টপ্পা গান' তার একটি দৃষ্টান্ত। অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "পরবর্তী কালের গীতিকবিতার এই হল যথার্থ সূচনা। মানবিকতাই হচ্ছে নিধুবাবু ও অন্যান্য টপ্পাগায়কদের গানের মূল প্রেবণা। এই গানগুলির মধ্যে সুপ্ত একক প্রাণের উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস এখনও শ্রোতাব মনকে স্পর্শ করে, ব্যক্তির ব্যক্তিগত মর্মানুভূতি এখনও আমাদেব মনকে উদাসী অপরাহ্নের বৈবাগ্যে ভবিযে দেয, বিবহিণী প্রিয়ার ব্যাকুল মিনতি ভরা ছলো-ছলো দৃষ্টি কেমন একটা অব্যক্ত-ব্যথা সঞ্চার কবে। তাই পববর্তীকালেব বাংলা গীতিকাব্যেব চন্দ্র সূর্যের তুলনায় নিধুবাবু ও অন্যান্য বচনাকারের টপ্পাগানকে প্রভাত শর্বরীর শুকতারা বলা যেতে পারে—নিধুবাবুব টপ্পাব যথার্থ কবিত্ব ও আবেগ মানবীয় রসে অপূর্বতা লাভ কবেছে, যাব সঙ্গে আমাদেব কালের মানুষেবও স্বচ্ছন্দে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হতে পাবে।"

নাগরিক লোকসঙ্গীত

অষ্টাদশ শতকেব সমাপ্তিবর্ষটি (১৮০০খ্রীঃ) বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি দিক্‌চিহ্ন-নির্দেশক কাল-রূপে পবিগণিত হয়ে থাকে। ১৮০০ খ্রীঃ শ্রীবামপুবে মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং বাইবেলের বাঙলা গদ্য অনুবাদ প্রকাশিত হয। এই বৎসরই ইংরেজ সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা শিক্ষাদানেব উদ্দেশ্যে কলকাতায় 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুটি

ঘটনাই বাঙলা গদ্য সাহিত্য সৃষ্টির ইতিহাসে এবং বাঙালীব চিন্তাধারায় নবযুগের সূচনা করে। তাই উনবিংশ শতকের আবির্ভাবও বাঙলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে নবযুগের স্মারক বলে অভিহিত হতে পারে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মহামতি কেরী সাহেবের প্রত্যক্ষ প্রবর্তনায় এবং কলেজের পণ্ডিত-মুন্সীদের সহায়তায় বাঙলা গদ্যসাহিত্য-সৃষ্টির সূত্রপাত ঘটে এবং প্রায় বাতারাতি বাঙলা সাহিত্য একটা নোতুন যুগে ও জগতে উপনীত হয়।

১৮০০ খ্রীঃ

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হবার পূর্বে বাঙলা সাহিত্য ছিল একান্তভাবেই পদ্যাশ্রিত। তৎকালে বাঙলা গদ্যের যে কোন চিহ্নই ছিল না তা নয়, তবে তাকে সাহিত্য বলা চলে না। সাধারণতঃ সেই গদ্য ছিল চিঠি-পত্রে, দলিল-দস্তাবেজে এবং ক্বচিৎ বৈষ্ণব তত্ত্বগ্রন্থের অথবা অপর কোন কাব্যগ্রন্থের দুই একটি পংক্তি বা বাক্যে নিবদ্ধ । বাঙলা গদ্যে অবশ্য সম্পূর্ণ দুই একটি গ্রন্থও রচিত হয়েছিল। একটি, পর্তুগীজ পাদ্রী মানো'এল দ্য আসাম্পশাঁও-কর্তৃক রচিত (১৭৩৪ খ্রীঃ) 'কৃপার শাস্ত্রেব অর্থভেদ' (Crepar Xaxtrer Orth 'Bhed)—১৭৪৩ খ্রীঃ পর্তুগালের রাজধানী লিসবন শহর থেকে বোমান অক্ষরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। অপরটি, বাঙালী খ্রীস্টান ভুষণাব রাজপুত্র দোম আন্তনিও-কর্তৃক রচিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' — এটিও ১৭৪৩ খ্রীঃ সম্ভবতঃ রোমান হরফে মুদ্রিত হয়ে থাকতে পারে। এ ছাড়া বাঙলা ব্যাকরণ এবং আইনের গদ্য অনুবাদও অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে বচিত হয়েছিল। কিন্তু সচেতন সাহিত্য-প্রচেষ্টা শুরু হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সংস্থাপনার পর থেকেই ফোর্ট উইলিযম কলেজ নামতঃ ১৮৫৪ খ্রীঃ পর্যন্ত বর্তমান থাকলেও কার্যতঃ ১৮১৫ খ্রীঃ সাহিত্যজগতে বাজা বামমোহন বায়ের আবির্ভাবের পর থেকেই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। ১৮১৭ খ্রীঃ স্থাপিত হিন্দু কলেজ প্রত্যক্ষভাবে বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টিতে কোন অংশগ্রহণ না করলেও বাঙলার নবযুগের সাহিত্যিক-সৃষ্টিতে এবং বাঙালীর মানস-জগতে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারাব উদ্বোধনে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল।

বাঙলা গদ্যেব উদ্ভব

এই হিন্দু কলেজ সৃষ্টির ফলে সাধারণ বাঙালী ঘরের ছেলেও ইংবেজী সাহিত্যের সংস্পর্শে আসে। তার ফলে, তাঁদের সম্মুখে এক নতুন জগতের দ্বার উন্মোচিত হয়। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে একদিকে তাঁরা যেমন যুরোপীয় ক্ল্যাসিক, রোম্যান্টিক ও আধুনিক সাহিত্যের স্বাদ পেলেন, অন্যদিকে তেমনি পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের সঙ্গেও-পরিচিত হবার সুযোগ পেলেন। আধুনিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙ্গালী সাহিত্যের উপকরণ-রূপে আর দেবতা ও ধর্মের প্রয়োজন বোধ করলেন না, মৃত্তিকাতলচারী মানবজীবনই হলো তাদের সাহিত্যের উপজীব্য। বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে তাঁরা কখন কখন মহাকাব্য, নাটক কিংবা প্রবন্ধ সাহিত্যে পুরাণ আদির সহায়তা গ্রহণ করলেও তাঁরা আধুনিক জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি দিযেই তাদের সংস্কার সাধন করে নিয়েছেন। উনবিংশ শতকের আবির্ভাব বাঙলা সাহিত্য এবং বাঙালীর ভাবধারায় কী অপরিমেয় পরিবর্তন সাধন

আধুনিকতাব লক্ষণ

করেছিল, সে বিষয়ে যথার্থ মন্তব্য করেছেন অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর মনে আগল ঘুচে গেল, সে যুগের বাঙলা সাহিত্যে বিশাল বিশ্বের ছায়া পড়ল, বিচিত্র জীবনের কল্লোল ধ্বনিত হল, পশ্চিম সমুদ্রপার থেকে মুক্তির ঝড়ো হাওয়া এসে খাঁচার পাখীর দুর্বল পাখার মধ্যে সাগর সঙ্গীত শুনিয়ে গেল। তারপর খাঁচার শলা ভেঙে গেল, হংস-বলাকা পাখা মেলে নীল আকাশের বুকে উড়ে গেল। সামনে তখন তার প্রসারিত নীল গগনাঙ্গন আর নিম্নে কলমন্দ্রমুখর সমুদ্রতরঙ্গ। এক কথায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যে শুধু দেবদেবীর কথা নয়, জীবনের বিশাল প্রত্যয় বিচিত্র বর্ণসুষমায় ফুটে উঠল। যাকে আমরা মডার্ন বলি, উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে সেই আধুনিকতার বাণী সঞ্চারিত হল, বাঙালীর জীবন থেকে মধ্যযুগ স্খলিত হয়ে পড়লো, বাংলা সাহিত্য থেকেও তার পদচিহ্ন মুছে গেল।"

গদ্যভাষা তৈরির ফলে বাঙলা সাহিত্যে নতুন নতুন ধারার প্রবর্তন ঘটলো। প্রথমেই এলো সাময়িক পত্রিকা — তাতে সংবাদ ছাড়াও বিশেষভাবে স্থান পেলো জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি বিষয়ের আলোচনা। ফলে গড়ে উঠে 'প্রবন্ধ সাহিত্যের' শাখা। রাজা রামমোহন রায় ১৮১৫-৩০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রায় ৩০ খানা গ্রন্থ রচনা করলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রাথমিক সাহিত্য-প্রচেষ্টাও শুরু হয়েছিল এই সময়-সীমার মধ্যেই। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ এবং অনেক মৌলিক নাটকও রচিত হতে আরম্ভ করলো। এর সঙ্গে নাগরিক লোকসঙ্গীত যাত্রা-গানের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না — এগুলি একান্তভাবেই পাশ্চাত্ত্য অনুপ্রেরণা-জাত। একালেই রচিত হলো বাঙলা 'উপন্যাস'ও।

আধুনিক যুগ ঃ রেনেসাঁস

মাইকেল আধুনিক রীতিতে রচনা করলেন 'মহাকাব্য'। বিহারীলাল লিখলেন 'গীতিকবিতা'। সাহিত্যের সর্বশেষ সন্তান 'ছোটগল্প'ও এলো রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে। এইভাবেই মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের উত্তরণ ঘটলো আধুনিক সাহিত্যে। মাত্র ষাট বৎসরের সঙ্কীর্ণ সময়সীমায় বাঙালী যেন ছয়শত বৎসরের যুগসঞ্চিত ব্যবধানকে লঙ্ঘন করে এদেশে সম্পূর্ণ নোতুনভাবেই—এ একটি এ যুগের বিস্ময়। আরম্ভ থেকে পরিণতির এই বিদ্যুৎগতি পৃথিবীর ইতিহাসে ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায় নি। বাঙালী জীবনে এবং বাঙলা সাহিত্যে এই যে যুগ-চেতনার সঞ্চার — এটি একটি সাধারণ ঘটনা মাত্র নয়, একে আমরা অনায়াসে আখ্যাত করতে পারি 'উনিশ শতকী রেনেসাঁস' বলে। ঐতিহাসিকের ভাষায়, " Such a Renaissance has not been seen anywhere else in the world's history." অতঃপর এই ধারাটি ক্রমবর্ধমান শতমুখী গতিতে বহমান রইলো বিংশ শতকের প্রথমার্ধ কাল পর্যন্ত। এই শতকের প্রথম প্রহরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তজ্জনিত মন্দা, দ্বিতীয় প্রহরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বাঙলাদেশে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর, প্রত্যক্ষ যুদ্ধের ক্ষেত্ররূপে বাঙালীর অস্তিত্বের সঙ্কট, রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ, যুদ্ধশেষের পুর্নগঠন দেশের স্বাধীনতা লাভও তৎসহ ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদ, বিশেষভাবে বৃহত্তর বাঙলার ব্যবচ্ছেদ ঘটিয়ে বৃহত্তর অংশকে স্বাধীন পাকিস্তানের অঙ্গরূপে সত্তাদান,

প্রায় সমগ্র দেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং তার ফল-স্বরূপ লক্ষ কোটি উদ্বাস্তু বাঙালী হিন্দুর প্রধানতঃ ক্ষুদ্রতর খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতের অন্যত্র অবশ্রয় গ্রহণের জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা — এই সমস্ত ঘটনা-দুর্ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বিশেষভাবে বাঙলা ও বাঙালীর সমাজ-জীবনে যে ভারসাম্যের সাময়িক অবনতি দেখা দিয়েছিল, তাতে স্থিতিশীলতা-আনয়নে এরপরও কয়েক বৎসর কেটে যায়। ক্রমশঃ দুর্দিনের ঘনঘটা অপসারিত হয়।

বিশ শতকের পঞ্চাশের দশক থেকেই আবার একদিকে যেমন পূর্ববর্তী দশকের কবি-সাহিত্যিকরা নোতুন অভিজ্ঞতা-লব্ধ জীবনবোধ নিয়ে যুগোচিত সাহিত্য-রচনায় এগিয়ে এলেন, তেমনি আবার নোতুন যুগের নোতুন ভাব-ধারায় উদ্বুদ্ধ কনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবকরা নোতুন আঙ্গিক, ভাষা, ভাব নিয়ে সাহিত্য-রচনায় ব্রতী হলেন। বস্তুতঃ বাঙলা সাহিত্যে এখানে আবার কিছুটা পটপরিবর্তন ঘটলো। — এ আর এক পর্ব।